CU'e - M04288 - 4 - 262744

যুগলমূর্ত্তি

ত্রিগুণতৈল

যাবতীয় শিরোরোগের মহৌষধ

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

ক্রয়কালীন বোতলের মুখে
লালরং-এর জ্বালানিবারণী
ছিপির উপর পরিচালকের
ফটো ও [illegible] নাম
দে[illegible]

দৈনিক দুবার যাত্রা

কলিকাতা	বাগডোগরা		কলিকাতা
ভাইকাউণ্ট	এফ-২৭	এফ-২৭	ভাইকাউণ্ট
আইসি-২২৩	আইসি-২২১	আইসি-২২২	আইসি-২২৪

দৈনিক	দৈনিক			দৈনিক	দৈনিক
১৪০৫	০৭০০ ছাঃ	কলিকাতা	পেঁাঃ	১০৫০	১৭৩৫
১৫৩৫	০৮৪০ পেঁাঃ	বাগডোগরা	ছাঃ	০৯১০	১৬০৫

দিল্লী ও বোম্বাই পর্যন্ত/হইতে সংযোগ ব্যবস্থা

(সকল সময়ই স্থানীয় সময়)

Airlines

শারদীয় অমৃত ১৩৭৫

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১১	সম্পাদকীয়		
১২	রবীন্দ্রনাথের রচনা		
১৪	প্রত্যাখ্যান	(গল্প)	—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪	রাবণের সিঁড়ি	(গল্প)	—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
২৮	পরাশর এবার জহুরী	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৫২	সেকালের কলকাতায় ছাত্রাবাস	(নিবন্ধ)	—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫৮	আর্যশেখরের জন্ম মৃত্যু	(গল্প)	—শ্রীসত্যজিৎ রায়
৬২	মৃত্যুর আগে	(গল্প)	—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
৬৭	গ্রন্থতত্ত্ব	(নিবন্ধ)	—শ্রীসুকুমার সেন
৭০	হাওয়া বদল	(ভ্রমণ)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
৭৬	পুঁজি	(গল্প)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৮৮	পাতক	(উপন্যাস)	—শ্রীসমরেশ বসু
১১৪	অভিনয়কলা	(গল্প)	—শ্রীশ্রীলেখা বসু
১২০	ভারতীয়	(সচিত্র)	—শ্রীশ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
১২৪	ত্রিপার্শ্বিক	(গল্প)	—শ্রীআশা দেবী
১২৬	ইন্দিরি	(গল্প)	—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৯	নর ও বানর	(গল্প)	—শ্রীমনোজ বসু
১৩৩	সৈনিক সেন	(গল্প)	—শ্রীবনফুল

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য: দুই টাকা

লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম: তিন টাকা

প্রকাশক:

এম সি সরকার এণ্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

উলঙ্গ আত্মা ॥ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ৯·০০

অবক্ষয়িত সমাজ ও সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আছে আপনার? যদি থাকে তবে এ-বই পড়তেই হবে এবং অন্যকে পড়তে অনুরোধও করতে হবে। 'উলঙ্গ আত্মা'র প্রতিটি পৃষ্ঠায় জীবন ও যৌবনের অন্ধকারের হাহাকার ও প্রতিটি ছত্রে মাটি ও মানুষের আলোর তৃষ্ণা। এ-বইকে কেন্দ্র করে হয়তো পরস্পরবিরোধী মতের আলোড়ন জাগবে। কেউ বলবেন—অসহ্য সত্য; কেউ বা বলবেন—সুন্দর সৃষ্টি। তবে একটা কথা বোধহয় সকলকেই স্বীকার করতে হবে—'উলঙ্গ আত্মা' বর্তমান শতাব্দীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ চিত্র। বিগত দিনের বহু প্রতীক্ষিত ও আগামী দিনের বহু আলোচিত সদ্য প্রকাশিত দুঃসাহসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস —'উলঙ্গ আত্মা' ॥

কালপুরুষ ॥ মিহির মুখোপাধ্যায় ৮·৫০

পূর্ববঙ্গের একটি সুপ্রাচীন অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। দেশ বিভাগের ফলে এদের ঐতিহ্যময় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ভিত্তিটি কিভাবে ভেঙে গেল, কিভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল পারিবারিক সম্পর্ক ও সংস্কারের মধ্যে—জীবন্ত রেখার আঁচড়ে সেই ছবিটি অঙ্কিত। 'কালপুরুষ' নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যে চিরায়ত উপন্যাসরূপে চিহ্নিত হবে ॥

মহাপ্রেম ॥ শ্রীপারাবত ৭·০০

'নারায়ণ গৌরবেশে এল নদীয়ায়..... শান্তিপুরে ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'। সুরধুনী তীরে সঞ্জয়মান সেই 'অভিনব হেমকল্পতরু'র দিব্য জীবনকথা বাঙালীর নিত্য কালের প্রিয় প্রসঙ্গ। ভক্তের আকুতি ঐতিহাসিকের তথ্যচেতনা ও ঔপন্যাসিকের রসসৃষ্টি—এই তিনটি বিরল সমন্বয় 'মহাপ্রেম' উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করেছে ॥

চেনা অচেনা ॥ চতুর্মুখ ৫·০০

লালদীঘির আয়নায় প্রতিবিম্বিত ডালহৌসী স্কোয়ার এক চলমান জীবনপ্রবাহের ছবি। সেই ছবি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। নানা ফুলে গাঁথা একখানি মালা 'চেনা অচেনা' কেরাণী পাড়ার চিরায়ত মহাকাব্য ॥

সামনে সমুদ্র ॥ রামপদ মুখোপাধ্যায় ৬·০০

'সবচেয়ে দূরের যে মানুষ সেখান অন্তরালে' তার মনের গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তো এনেছেন লেখক। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের আঙ্গি অবিস্মরণীয় কয়েকটি নতুন মাত্রা উপহার দিয়েছেন ॥

পরস্পর ॥ বিমল কর ৪·০০

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত এই উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের এক উষ্ণ নিবিড় অন্তরঙ্গ আলেখ্য উন্মোচিত হয়েছে। কিশোর প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি অংকনে সিদ্ধহস্ত লেখক তাঁর 'পরস্পর' উপন্যাসে পরিণত প্রেমের তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন ॥

প্রতিলিপি ॥ মানবেন্দ্র পাল ৩·৫০

একটি কঠিন বিমূঢ় প্রশ্নের আশ্চর্য সমাধান এই উপন্যাস। কাহিনীর উত্থান পতনে ও জটিল মানস বিবর্তনে মনস্তত্ত্বনির্ভর 'প্রতিলিপি' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস ॥

ভারত আমার ৩·০০
বঙ্গ আমার অমরনাথ রায় ৩·০০

দুটি গ্রন্থই ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্ত। ভারতের ও বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়, আদিবাসী, স্বাধীনতা সংগ্রাম রাজধানী, ভাষা ও লিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান সাধনা, তীর্থক্ষেত্র দর্শনীয় স্থান ও বস্তু, লোকসংগীত, লোকমাতা এবং আরো অনেক কিছু। দুটি গ্রন্থই মূল্যবান স্বদেশ পরিচয় ॥

• ইতিহাস ও প্রবন্ধ •

K. C. Ghosh
The Roll of Honour 30.00

[দুশো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস। শতাধিক দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত ৮৫০ পৃষ্ঠায় নতুন মহাভারত।]

বিপিনবিহারী গুপ্ত
পুরাতন প্রসঙ্গ ১৫·০০

[ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্দরমহলের চলচ্চিত্র 'পুরাতন প্রসঙ্গ'। বহুকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থের নতুন শোভন সংস্করণটির সম্পাদনা করেছেন বিশু মুখোপাধ্যায় এবং ভূমিকা লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী।]

বিমলকুমার দত্ত
ভারত শিল্প ৬·০০

[৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল্যবান আর্টপেপার ও অসংখ্য খণ্ড চিত্র-শোভিত। শিল্পী ও চিত্ররসিকদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।]

• উপন্যাস •

পরিতোষ রাজমদার
সায়াহ্ন-আকাশ ২·৫০

নিখিল চট্টোপাধ্যায়
অন্তরঙ্গ ২·৫০

মানবেন্দ্র পাল
প্রতিলিপি ৩·৫০

বিমল কর
পরস্পর ৪·০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়
সামনে সমুদ্র ৬·০০

চতুর্মুখ
চেনা অচেনা ৫·০০

শ্রীপারাবত
মহাপ্রেম ৭·০০

মিহির মুখোপাধ্যায়
কালপুরুষ ৮·৫০

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী
উলঙ্গ আত্মা ৯·০০

• কিশোর গ্রন্থ •

অমরনাথ রায়
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ২·০০
মনীষী আশুতোষ ২·০০
ভারত আমার ৩·০০
বঙ্গ আমার ৩·০০

• কৃষি - বিজ্ঞান

শুধু মশালে নয় ১·৫০

মোহিত রায়
[ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত]

বিদ্যাভারতী • ৮সি, ট্যামার লেন, কলকাতা—৯

জেনারেলের পূজা অর্ঘ্য

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং) ৮.০০
স্মরণী (৬ষ্ঠ সং) ৫.০০ ছন্দচতুর্দশী ২.০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (২য় সং ৫.০০
॥ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ॥
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর ৫.০০
॥ ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥
একদিগন্ত দিনান্তের ৬.০০
॥ অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ৭.০০
॥ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ॥
বাংলা নাটকের ইতিহাস (৪র্থ সং) ১৩.৫০
॥ কুমুদবন্ধু সেন ॥
গিরিশচন্দ্র (২য় সং) ৫.০০
॥ হিমাংশু চৌধুরী ॥
বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা (২য় সং) ৬.০০
॥ অধ্যাপক সরোজকুমার বসু ॥
রবীন্দ্র সাহিত্যে হাসারস — ২.০০
অমলেন্দু দাশগুপ্ত ॥
ঋষি রবীন্দ্রনাথ ৩.০০
॥ আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ॥
বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)
৪র্থ সং ১০.০০
বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ) ২০.০০
॥ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ॥
হালের গাথা সপ্তশতী ১০.০০
রাজচরিত .. ৫.০০
প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি ২.৫০
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (সংস্কৃত মূলসহ)
১ম ও ২য় খণ্ড প্রতি খণ্ড ১৫.০০
॥ রণজিৎকুমার সেন ॥ সমাজ-দর্শন ৩.০০
॥ জনার্দন চক্রবর্তী ॥ স্মৃতিভারে ৫.০০
॥ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ॥
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ৫.০০
॥ তামসরঞ্জন রায় ॥
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ৪.০০
॥ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ॥
বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন ৫.০০
॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সংস্কৃতি ও গুপ্তাগার ৫.০০
॥ বসুধা চক্রবর্তী ॥
রাষ্ট্র-সাহিত্য-জীবন-যৌবন ৩.০০
॥ গীতসম্রাকর দিলীপকুমার রায় ॥
দ্বিজেন্দ্র-গীতি ৮.০০ হাসির গান ৩.০০
॥ সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥
রাগ-রূপায়ণ ৮.০০
॥ দিবজেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥
চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে ৬.০০
দিনগুলি মোর কোথায় গেল ৬.০০
এতটুকু ভুল ৩.০০
॥ বোম্যানস বিশ্বনাথম ॥
ভারতীয় গল্প-সংকলন ... ৪.০০
ঘণ্টাকর্ণ ॥ হিমালয়ের চিঠি ৬.০০
॥ কণা সেনগুপ্ত ॥ ডলারের দেশে ৪.০০
॥ স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ ॥ উত্তরসাধক গিরিশ ৩.০০
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রেডিও লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ৬.০০

জেনারেল বুকস্
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি-১২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা			লেখক
	দিদির সঙ্গে	(গল্প)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩৯	গৃহপ্রবেশ	(গল্প)	—শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত
১৪৪	মর্যাদার প্রশ্ন	(গল্প)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
১৫০	ফের	(গল্প)	—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৫৫	উনিশ তিন সাল	(গল্প)	—শ্রীলীলা মজুমদার
১৫৭	রাতের কবিতা	(গল্প)	—শ্রীপ্রণতোষ ঘটক
১৬১	কবিতা—সর্বশ্রী		অরুণ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, রাম বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, হরণ সান্যাল, শান্তিকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক সরকার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, হুরেন্দ্রনাথ সিংহ মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাশ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, রাজলক্ষ্মী দেবী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, আশিস সান্যাল, মণীন্দ্র রায়।
১৬৯	আত্মদর্শন	(গল্প)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১৭২	দূরবীন	(গল্প)	—শ্রীদীপক চৌধুরী
১৭৬	সন্দেশ	(গল্প)	—শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
১৮৩	কালীদহের কুমীর	(শিকার)	—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ

প্রশ্নোত্তরে ডিজেল ইঞ্জিন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত বাংলা ভাষায় ডিজেল ইঞ্জিন, পেট্রোল ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক সম্বন্ধে চিত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক Engineer, Engine Driver এবং Mechanic (Marine & Land) -এর প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত।

Rear-Admiral, Retd. T. B. Bose (Ex-Tech. Director, Jayanti Shipping Corp Ltd.) এবং Shri S. K. Paul (Engineer Superintendent, Calcutta Port Commissioner) কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

দাম ঃ দশ টাকা

বিঃ দ্রঃ—ভি, পি-তে পাইতে হইলে অগ্রিম দুই টাকা পাঠাইবেন।

RABINDRA LIBRARY
15/2, Shyama Charan De Street, Calcutta-12; Phone: 34-8356.

নকশি-কাঁথা বাংলা দেশের বিশিষ্টতার নিদর্শন। এ-দেশের গ্রামীণ মেয়েদের হাতে-তৈরী এই লোকশিল্পের তুলনা নেই কোথাও। সাধারণতঃ নকশার মাঝখানে থাকে পদ্মফুল। আর তার চারপাশ ঘিরে কলকা, লতা-পাতা, মানুষ বা পশু-পাখির বহুবর্ণ অলংকরণ।

আশুতোষ মিউজিয়াম ও গুরুসদয় মিউজিয়ামের কাঁথা-সংগ্রহ প্রসিদ্ধ। কলা-লক্ষ্মীর অমৃত-স্বাক্ষরে চিহ্নিত বহু শিল্পবস্তু ছড়িয়ে আছে বাংলা দেশের চতুর্দিকে। এদেশ দেখার আনন্দ তাই অন্তহীন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায় আমাদের যাত্রীনিবাসে ওঠাই সুবিধে।

শান্তিনিকেতন, দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, দুর্গাপুর, দীঘা, ডায়মণ্ড-হারবারের লাক্সারি ও ইকনমি ট্যুরিস্ট লজে বুকিং-এর জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

অনুপম বঙ্গভূমি

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহাউসি স্কোয়ার ঈস্ট কলিকাতা ১
ফোন ২৩-৮২৭১ গ্রাম TRAVELTIPS
মালদায় শিগ্‌গিরই একটি ট্যুরিস্ট লজ খোলা হচ্ছে।

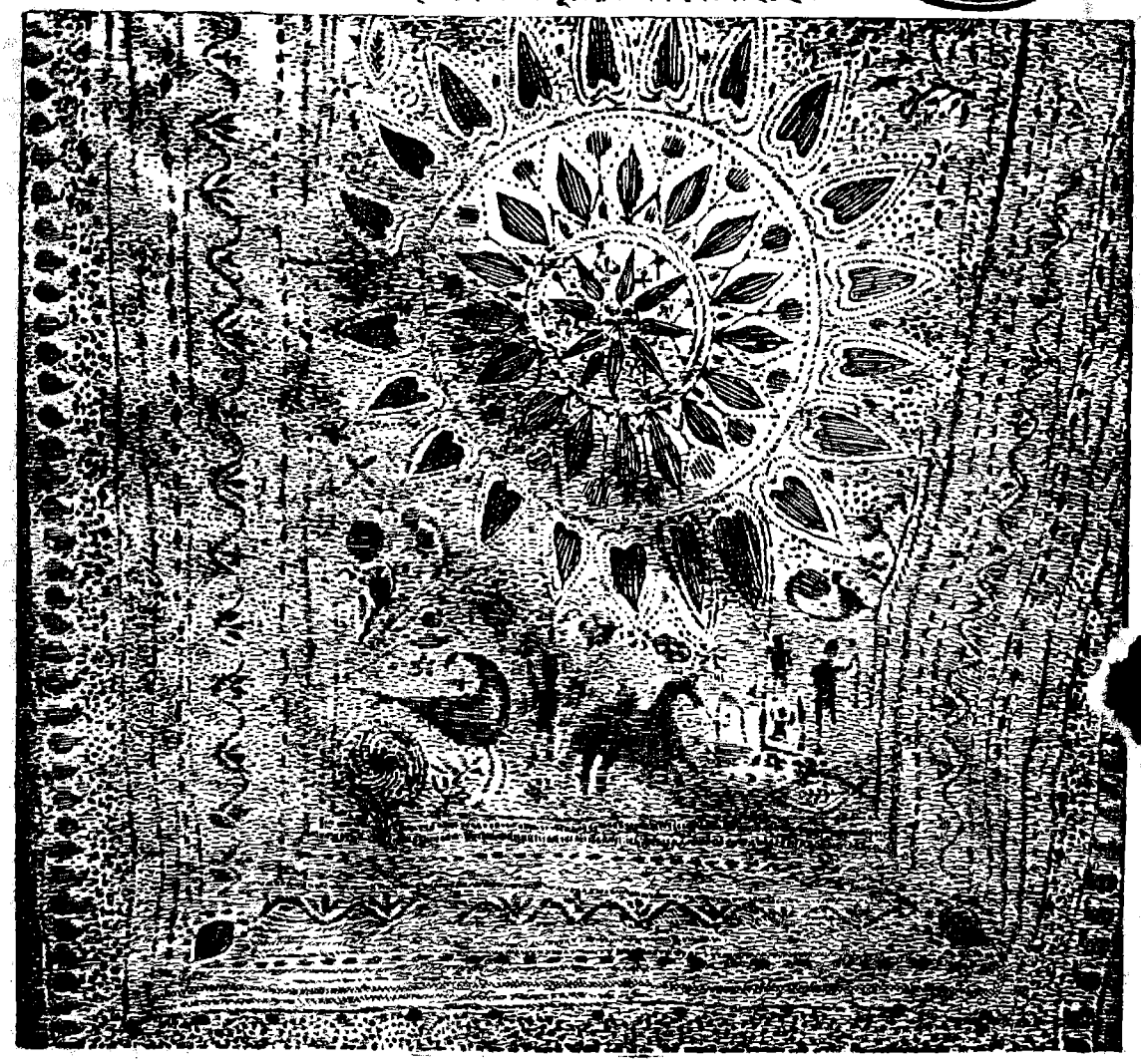

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৮৪	দৃশ্যের গভীরে	(গল্প)	—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
১৮৮	দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ	(গল্প)	—শ্রীপরিমল গোস্বামী
১৯০	পুষ্পে কীট সম	(গল্প)	—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ
১৯৭	মনোনয়ন	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
২০০	তুষের আগুন	(গল্প)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২০৭	বিস্মৃত মাস্টারপীস	(নিবন্ধ)	—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
২১০	বৃত্তের বাইরে	(গল্প)	—শ্রীপ্রফুল্ল রায়
২১৪	রোজমেরি হত্যার রহস্য	(গল্প)	—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
২২৩	হারজিৎ	(গল্প)	—শ্রীশেফালি চট্টোপাধ্যায়
২২৪	চাঁদের দেশে	(নিবন্ধ)	—শ্রীদিলীপ বসু
২২৬	মধুরা	(গল্প)	—শ্রীনমিতা চক্রবর্তী
২২৮	অনুসন্ধান অফিস	(গল্প)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৩০	খালাস	(গল্প)	—শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য
২৩৯	পতিগৃহে	(গল্প)	—শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়
২৪০	বিজয়িনী	(গল্প)	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
২৪৪	জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী	(নিবন্ধ)	—শ্রীনারায়ণ দত্ত

Books on Philosophy

বর্তমান যুগের দর্শনচিন্তা—
অধ্যাপক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪·০০

Dr. S. R. DASGUPTA'S

A STUDY OF ALEXANDER'S SPACE TIME & DEITY
(A thesis approved by the University of Dacca) 12.b0

SOME PROBLEMS OF THE PHILOSOPHY OF RELIGION
(Hon's & Post-graduate Students of all Indian Universities) 8.00

METAPHYSICS AT A GLANCE
(B. A. Pass & Hon's Students of all Universities) 7.00

* Please write to us for our Publication list.

সাহিত্যশ্রী প্রকাশিত :—

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—
(২য় সংস্করণ) অধ্যাপক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক—
অধ্যাপক শান্তি ভট্টাচার্য

বাঙলা গদ্য প্রসঙ্গ—
ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী ও নারায়ণা গোস্বামী

সিক্ত সিঁথি দুরন্ত শ্রাবণ (কবিতা)
শান্তি ভট্টাচার্য

খেয়াল খুশীর ফুল (কবিতা)
সুষমা দাশগুপ্ত

Books For B.Com.

THE ESSENTIALS OF INCOME TAX
— A. K. RAY

THE ESSENTIALS OF SECRETARIAL PRACTICE—A. K. RAY

নিরীক্ষা শাস্ত্রের রূপরেখা
(AUDITING)
অধ্যাপক রায় ও রায়
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রদত্ত ভূমিকা সম্বলিত)

* আমাদের পূর্ণ গ্রন্থ তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রমথ চৌধুরী

গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর গল্পসংগ্রহ গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। লেখকের আলোকচিত্র সংবলিত।

মূল্য ১০·০০; শোভন সংস্করণ ১২·০০ টাকা

প্রবন্ধসংগ্রহ

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল।

মূল্য ১৬·০০; শোভন সংস্করণ ১৮·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

দুটি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

পশু ও প্রেমিক দীপক চৌধুরী ৫·০০

সূর্য্যের সন্তান শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·০০

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল। এই করুণার ধারাস্নানেই লেখকের যাত্রারম্ভ।

'কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
কেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউক সবার জীবন ধনপ্রাণ॥'

নাম কীর্তনই ভক্তের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সত্যযুগে ধ্যান, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে শুধু হরিকীর্তন। কৃষ্ণ কথায় কি তৃষ্ণা মেটে...? শ্রীনাম কীর্তনই কৃষ্ণভজন। প্রেমভক্তির রসঘনবিগ্রহ, সর্বযুগ সমস্যায় দীপস্তম্ভ। বরণীয় লেখকের শ্রদ্ধাসম্ভাষণ নিবেদনের অমৃতপীযূষ ধারায় ভক্তের সর্বদেহ মনপ্রাণ এক অজ্ঞাত ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে উঠবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রথম খণ্ড (২য় মুদ্রণ) ৮·৫০ দ্বিতীয়খণ্ড ৮·০০ তৃতীয় খণ্ড ৭·৫০

'...বন্ধু প্রভাতকুমারকে নমস্কার করি, তিনি ফাঁকি দেননি। তাড়াতাড়ি বাজারে চলনসই একখানা বই লেখেননি। হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু চেষ্টার অগভীরতা বা শৈথিল্য দেখিনি।' আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বয়ং **রবীন্দ্রনাথ**। সুন্দর সরল করে গল্প বলার মনোরম অথচ অনায়াস ও অনিন্দ্য ভঙ্গীতে প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছেন বাংলা দেশের পাঠকদের জন্যে। ভাবসমৃদ্ধ তথ্য এবং তত্ত্বের অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন এই গ্রন্থে অথচ কোথাও তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত মনে হবে না। বাড়ীতে বাড়ীতে যেন সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা, গতি, বিবর্তন, অজ্ঞাত কাহিনী সবই জানা হয়ে যায়, জানতে জানতে সব ঘটনা ভেসে ওঠে চোখের সামনে চলচ্ছবির মতো.....

পৃথিবীর ইতিহাস

সুদৃশ্য রঙিন জ্যাকেটে মোড়া, জমকালো রেক্সিনে বাঁধাই, সোনালি এম্বস করা নামাঙ্কণ, মূল্যবান আর্ট পেপারে ছাপা ৩২টি দুষ্প্রাপ্য ও আকর্ষণীয় ছবিসহ। দাম : ১৬·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তাঁর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ

ভারতে জাতীয় আন্দোলন দাম : ১১·০০

গল্প-উপন্যাস

অরণ্য-বহ্নি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০

দীপশিখা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬·০০

পাড়াগাঁয়ের স্বর্গ
দীপক চৌধুরী ৭·০০

মাণিকরাজের প্রেমকথা বেদুইন ৫·০০

মরুকন্যা ধনঞ্জয় বৈরাগী ৭·০০

সুবর্ণশিখা মায়া বসু ৩·৫০

বায় বদল (চলচ্চিত্রে রূপায়িত)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০

বিচিত্র মানবী শ্রীপান্থ ৫·০০

গরকীরা
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০

ছেলে কার্পেগীর দুটি অবিস্মরণীয় বই
প্রতিশোধ ও বন্ধুলাভ ৪·৫০
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ৫·৫০

অনুবাদ গ্রন্থ

হেনরি ব্রানডন **মনীষীদের সঙ্গে** ৫·০০
রিক্তা ধরণী এলেলন গ্লাসগো ৩·৫০
চার্লস স্টেইনমেজ হেনরি টমাস ২·০০

২৬ জন লেখক-লেখিকার অলৌকিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি উপভোগ্য গ্রন্থ
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৪·০০

প্রবন্ধ, জীবনী

স্মৃতিচারণ পরিমল গোস্বামী ৭·০০
অধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা
বাণী রায় ৭·০০

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা
১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পার্ফম্যান্স এক্ট সম্বলিত)
মন্মথ রায় ৫·৫০

নাটক

কল্লোল
উৎপল দত্ত ২·৫০

দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ
মন্মথ রয়ি ৩·৫০

এক পেয়ালা কফি॥
আর হবে না দেরী
ধনঞ্জয় বৈরাগী ২·৫০

নতুন তারা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·২৫

NETAJI MYSTERY
by DR. SATYANARAYAN SINHA
PRICE Rs. 3.00

THE CENTENARY BOOK OF TAGORE
EDITED BY SOOKAMAL GHOSE Price Rs. 6.00

THE GREAT WANDERERS
by Maitrayee Devi Price Rs. 8.50

ছোটদের মজার মজার বই

দাদুনাতির দৌড়
শিবরাম চক্রবর্তী ২·২৫

বাঘের চোখ
লীলা মজুমদার ২·৫০

রোল নম্বর ২০৪
পরিমল গোস্বামী ২·৫০

বিস্তারিত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড ১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলকাতা ১৬ টেলিফোন : ২৪-৭৫৩১

স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং সুবিধাজনক সর্তে আমরা পুস্তক সরবরাহ করি :
বিস্তারিত জানিতে হইলে অবিলম্বে লিখুন

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই-চরিত
(৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড ৩·০০

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩·০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২টি খণ্ড)
(ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩·০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২·০০

নয়শো রুপিয়া ও বাজারের লড়াই
(নাটক) ১·৫০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা
(৮ম সংস্করণ) ১·৫০

Life of Sisir Kumar Ghosh
De-luxe Ed. — Rs. 6.50

Life of Sisir Kumar Ghosh
Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৪৭	ঘাতক	(গল্প)	—শ্রীবশোদাজীবন ভট্টাচার্য
২৫০	তুমি কী সুন্দর !	(নিবন্ধ)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
২৫২	মোহিনী সুলতারাজেন	(গল্প)	—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
২৫৬	যন্ত্রণা	(গল্প)	—শ্রীসুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২৬৩-২৮৪	প্রেক্ষাগৃহ		
	সেকালের নায়িকা প্রসঙ্গে		বীরেন্দ্রনাথ সরকার
	সবারে আমি নমি		—শ্রীকানন দেবী
	সাহিত্যানুহিত সিনেমা		—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি)
	স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি		—শ্রীমহেন্দ্র সরকার
	সিনেমায় বিবর্তন		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
	থিয়েটার সম্পর্কে		—শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
	অভিনয় বিভ্রাট		—শ্রীকমল চৌধুরী
	ভিন্নস্বাদের ছবি		—শ্রীনির্মল ধর
২৮৫	অলিম্পিক গেমস্		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অলংকরণ : সর্বশ্রী সুধীর মৈত্র, ধ্রুব রায়, নিতাই দে, অমল চক্রবর্তী, সুব্রত ত্রিপাঠি, নিতাই ঘোষ, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
সিনেমার অফসেট ছবি শ্রীসুকুমার রায়

জীবনী শক্তির প্রেরণায়

এলিকসার
আদর্শ টনিক
হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে। ওজন বাড়ায়।

একজামণ্ট
সমস্ত চর্মরোগের বিখ্যাত প্রলেপ ঔষধ।

নসিডল
অম্বল, গলাজ্বালা ও ডিসপেপসিয়ায় অব্যর্থ শরীর সতেজ করে।

ডাইটালিন
স্নায়ুবিধান বলিষ্ঠ করে। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

পরিবার পরিকল্পনায় নির্ভরযোগ্য AMENOL—
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়।

• এত সহজ পারিবারিক চিকিৎসার বই আর নেই •

পারিবারিক চিকিৎসার বই

ডাঃ প্রনব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
মিহিজামের চিকিৎসা পদ্ধতি
এবং নির্দেশাবলী সম্বলিত।

পি, ব্যানার্জী
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫

যাঁদের রেডিও আছে—
ভেবে দেখুন তো:

"আপনার রেডিও ব্যবহার করে পুরো দাম উশুল করে নিতে পারছেন কি?"

আপনার রেডিওতে এইচ এম ভি-র ক্যালিপ্‌সো লাগিয়ে নিয়ে নিজের পছন্দসই গানবাজনা

যখন খুশী শুনুন!

আর এর জন্যে লাগবে মাত্র ১৭৫.৬০ টাকা

এইচ এম ভি ক্যালিপ্‌সো

দাম মাত্র ১৭৫.৬০ টাকা

আপনার কাছাকাছি 'এইচএমভি' ডীলারের কাছেই পাবেন।
*উৎপাদন শুল্ক সহ:
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

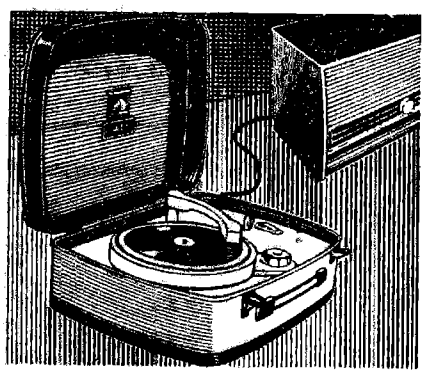

একমাত্র **এইচ এম ভি-ই** আপনাকে আপনার বাছাই করা রেকর্ডে নিজের পছন্দমত গান-বাজনা শোনার সুযোগ দিচ্ছে। আপনার সকল রকম খেয়াল-খুশী-মেজাজ মাফিক নানা রকমের গান-বাজনা—একেবারে পুরোপুরি আপনার নিজের পছন্দমত।

এইচ এম ভি-র ক্যালিপ্‌সো সহজেই রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে নিতে পারা যায়। সুশ্রী রাপ-আরাউণ্ড ক্যাবিনেট। এসি এবং ব্যাটারী—দু রকম মডেলই পাওয়া যায়। সব রকম সাইজের ও স্পীডের রেকর্ডই বাজানো যায়। আর ক্যালিপ্‌সো তৈরী করেছে **এইচ এম ভি**—ভারতে গান-বাজনার শিল্পকর্মে যারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস—কাজে ভালো, দামে কম

এইচ এম ভি-র সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি রেকর্ড শুনে আনন্দ পাবেন

নতুন লং প্লেইং রেকর্ডে —

ট্রেজার্ড জেমস্ ফ্রম টেগোর
মীরা ভজন — লতা মঙ্গেশকর
('MONO' ও 'STEREO' রেকর্ডে)
উচ্চাঙ্গ সংগীত—সরোদ—আমজাদ আলী
গীটার—ব্রিজভূষণ কাবরা

এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ডে

আরতি মুখোপাধ্যায় — আধুনিক
দিলীপকুমার রায় (পণ্ডিচেরী) — ভজন

যেকোনো এইচ এম ভি ডীলারের কাছে আরো হাজার হাজার রেকর্ড থেকে আপনি পছন্দমত বেছে নিতে পারবেন

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেড
পোঃ বক্স ৬৯৯, কলিকাতা-১

অনুগ্রহ ক'রে নিম্নলিখিত বিষয়ে

এল পি | ৪৫ আর পি এম | ৭৮ আর পি এম
(যেটা আপনার প্রয়োজন তার পাশে √ চিহ্ন দিন)

রেকর্ডের এক পূর্ণ তালিকা পাঠান—

নাম: শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী.....

বয়স.....পেশা.....

ঠিকানা.....

.....

GC 4627 BEN

শারদীয়া অমৃত ১৩৭৫

CALCU
CENTI
LIBRA
UNIVE

এবার বাংলা দেশে মাতৃআবাহনের উৎসবের পটভূমিতে রয়েছে অশ্রুসজল দিনের স্মৃতি। যে-বর্ষার পিছু পিছু আসে শরৎ তার সোনার অঞ্জলি নিয়ে, আকাশে খুশির নীল ছড়িয়ে সেই বর্ষণ বাংলা দেশের গ্রাম-গ্রামান্তর এবার ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। এখনও বন্যার্তদের দুঃখ শেষ হয় নি। এখনও চলছে ত্রাণকার্য। তাই এবারের শারদোৎসবে আমরা দেশবাসীকে আনন্দের দিনেও মনে করিয়ে দিই আমাদের ভাগ্যহত ভাই-বোনদের কথা, প্রকৃতির নিষ্করুণ খেয়ালে যারা বিপর্যস্ত, গৃহহারা এবং সর্বস্বান্ত। তাদের জন্য যেন উৎসব প্রাঙ্গণের উদ্বৃত্ত আনন্দ সান্ত্বনা ও সাহায্যের রূপ নিয়ে সযত্নে তোলা থাকে।

দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এ উৎসবে সকলের উদার আমন্ত্রণ। যিনি শক্তিরূপের প্রতীক তিনিই আবার শান্তশ্রী প্রসন্নরূপা। তাঁর আঁখিতে একদিকে যেমন অকল্যাণের বিরুদ্ধে আগুন ঝরে, অন্যদিকে তেমনি শান্তি ও সম্পদের নিশ্চিত আশ্বাস। এই দুইরূপেই তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত। বাংলা দেশের হৃদয় থেকে তিনি এক অপরূপ ললিত-কঠোর মূর্তিতে স্বতঃ-উৎসারিত। তাঁকে অন্নদাত্রী, জীবধাত্রীরূপে আমরা আবাহন করি। তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টির আলোকে আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতপ্রায় রচনা

এখানে, রবীন্দ্রনাথ কোন্ পত্রিকায় কোন্ সংখ্যায় সমকালীন কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যার লেখার কিরূপ সমালোচনা করেছিলেন কিছু কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে তার পরিচয় দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যে পত্রিকার যে সংখ্যায় সমালোচনা করেন তা প্রথমে প্রদত্ত হল পরে সমালোচিত পত্রের নাম ও সংখ্যা উল্লিখিত হল। পত্র-পত্রিকা সমালোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কতগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করতেন এবং তাঁর এই 'বিস্মৃত-প্রায় রচনাগুলির সামগ্রিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য, পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যাও দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ যে সকল স্থানে লেখকের নাম উল্লেখ না করে রচনার সমালোচনা করেছেন সে সকল ক্ষেত্রে মূল পত্রিকা থেকে রচনাকারের নাম যথাসাধ্য সংগ্রহ করে প্রাসঙ্গিক স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হল। অনুষঙ্গিক তথ্যাদিও উক্ত বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। —অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃঃ ৮৪—৯২

(ক) ভারতী ১২৯৮ আশ্বিন ও কার্তিক। এবারকার ভারতীতে 'লক্ষ্মীবতী' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে [মূল পত্রিকায় লেখকের নাম নেই]। এ রচনাটি ছোটগল্প লেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি একটি বাঙ্গালী অন্তঃপুর-বাসিনীর জীবনলেখার ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোন প্রকার কাল্পনিক রঙ্গভূমি করিয়া বসান হয় নাই যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোন বাড়াবাড়ি নাই চমক-সকল নাই রোমহর্ষণ ভাষা প্রয়োগ নাই, অথচ পাঠ সমাপ্তিকালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। 'বিলাপ' একটি গদ্যপ্রবন্ধ [ক্ষীরোদচন্দ্র রায় লিখিত]। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোন আবশ্যক দেখি না।.....

(খ) নবাভারত ১২৯৮ আশ্বিন ও কার্তিক। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় 'শকাব্দ' প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন সাধারণের বিশ্বাস এই শকাব্দ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে এক সময়ে মধ্য-এশিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্স বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে সাধারণত বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অমাংস কঙ্কালকে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে, এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না—আশ্চর্য এই যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য।...

ভারতী ১৩০৫ আষাঢ়

পৃঃ ২৮২—২৮৮

(ক) নবাভারত ১৩০৫ বৈশাখ। "কি চাই কি পাই?" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের [দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী] জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষদর্শিতা আমাদের সকলেরই আছে এবং মর্ত্য পৃথিবীতে দোষগুণে জড়িত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। নব্য-ভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন "পঞ্চদশবর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।" এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলক চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোন একটি নবাতর ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দৈবক্রমে বিগলিততর হয় তবে তিনি কি তাঁর অভিজ্ঞতা লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি।।।। তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন—এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। একথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় মানিবেন, তাহার ভাষাই যথেষ্ট তাহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে তাহার পর যদি আবার যুদ্ধঘোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

(খ) প্রদীপ ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ। 'নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তি-পূর্ণ অপরদিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে।...

(গ) উৎসাহ ১৩০৫ বৈশাখ।...'সে দেশে' শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরসমাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে—ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য এবং তাহারা অতি বিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম:—

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে,
তাই ফুল ফোটে গাছে
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে

তারি নীল কাল-কেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই নাহি মেঘচয়।...

[উৎসাহ পত্রিকা থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাসের মূল কবিতার অংশ উদ্ধৃত হল:

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে,
তাই ফুল ফোটে গাছে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পরিমলময়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে,
তাই শ্যামা ডাকে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে কথা যদি হয়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সরলা আছে সে দেশে,
তারি নীল কাল-কেশে,
খেলে প্রেম-ইন্দ্রধনু চারু শোভাময়।

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।...

গোবিন্দচন্দ্র পরবর্তীকালে 'বৈজয়ন্তী' নামক কাব্য গ্রন্থে এই কবিতার স্বকৃত পাঠই পুনর্মুদ্রিত করেন।]

প্রত্যাখ্যান

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

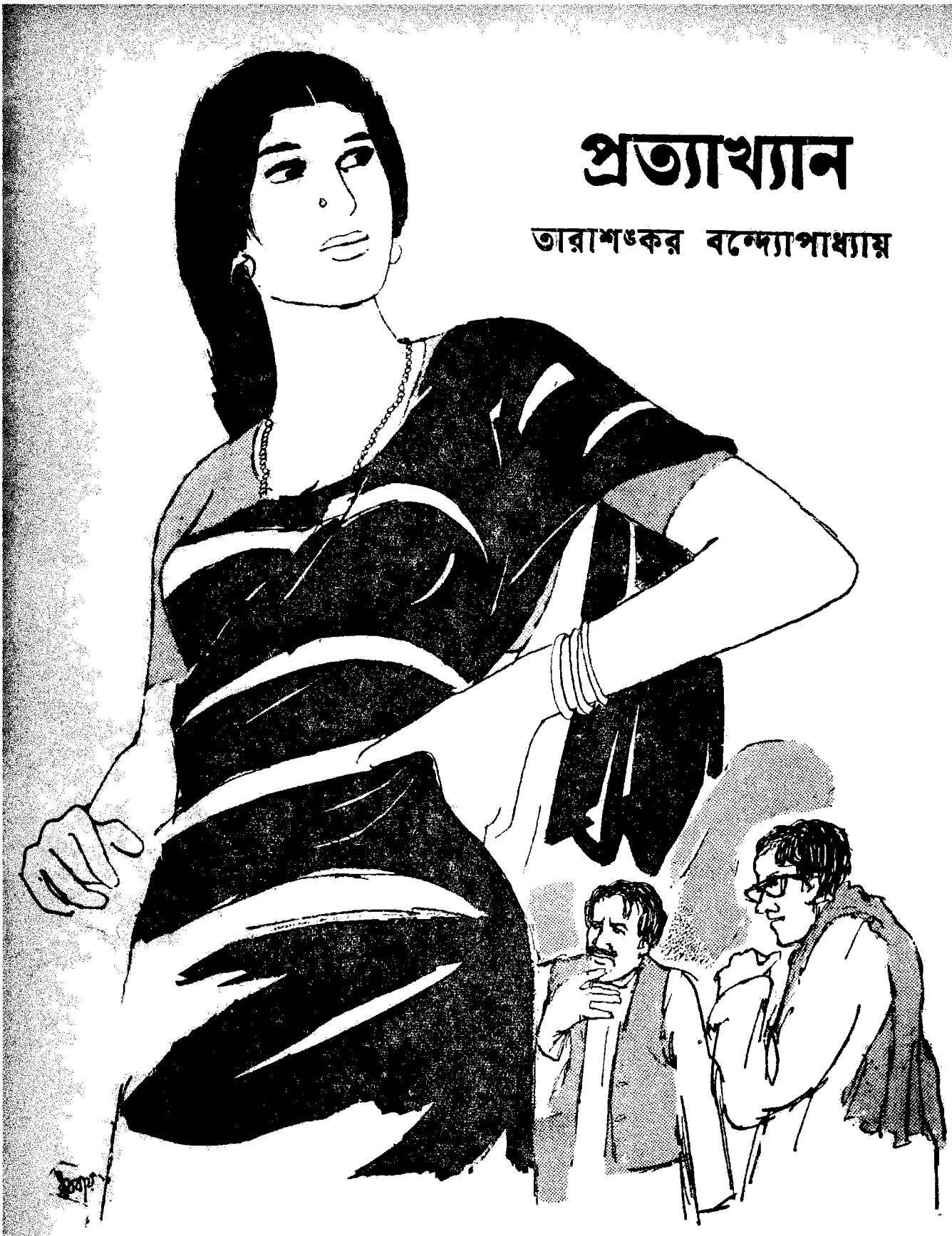

রেজিস্টার্ড পোস্টের মোটা একটা প্যাকেট। সুন্দর ক'রে প্যাকেটটি বাঁধা। কাগজের মোড়ক সুন্দর, প্যাকিং সুন্দর, দড়ি সুন্দর; রঙিন শক্ত দড়ি। প্রেরকের নাম দেখলাম। রেভারেন্ড পে'ত্যা। এক কৃশ্চান মিশন থেকে পাঠিয়েছেন। মিশনের নামটা থাক।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বার কয়েক ঘুরিয়ে দেখলাম। পিওন বললে—রসিদটা।

এ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ শুদ্ধ দেওয়া আছে।

পিওন আবার বললে—বাবু। পিওনের তাড়া আছে। ভর্তি দুপুর বেলা রেজেস্ট্রী মণিঅর্ডার, বেয়ারিং, ইনসিওর বিল করে সে। এলাকাটা কত বড় জানিনে—তবে অনেকটা হবে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—তাই তো হে। এ যে—। একটু থমকে থেমে গেলাম। বলতে পারলাম না—রেজেস্ট্রী করা ব্যাপার—কি আছে এতে? নিয়ে কি শেষে কোন ফ্যাসাদ না হোক ফেরে পড়ব।—

পিওন হেসে বললে—বই টই পাঠিয়েছে হয়তো।

সেই তো বিপদ। বই পাঠান অনেক জনেই। বুক পোস্টেই বেশী আসে। তাতে দায় থাকে না তা নয় কিন্তু সে দায় স্বচ্ছন্দে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানেই বই রেজেস্ট্রী ডাকে আসে সেখানেই মতামতের জন্যে তাগিদ অবশ্যম্ভাবীরূপে জোরালো হয়ে থাকে। চিঠির পর চিঠি আসে। তার ভাষা তীক্ষ্ণ হয় এবং উত্তাপও থাকে। অথচ সত্য মতামত দেওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কোন রেভারেন্ড পে'তা যার নামের মধ্যে তাঁর ফরাসী পরিচয় সুস্পষ্ট, তিনি বাংলা বই লিখে থাকলে এবং সে সম্পর্কে মতামত চেয়ে থাকলে—তা যে কতখানি কঠিন এবং গুরুভার ব্যাপার হতে পারে তাই ভাবছিলাম। যদি আমাদের ধর্ম এবং সমাজের নিন্দা করে থাকেন—তা হ'লে জীবনের শান্তিভঙ্গ ক'রে বালপ্রতিবাদে নামতে হবে। লেখা খারাপ হলে খুব আশঙ্কার হেতু নেই—কারণ সে সহ্যগুণ এবং উদারতা তাঁদের আছে।

ওই উদারতার উপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত পিওনের কাছে কলমটা নিয়ে রসিদ দুটো সই করে তার হাতে দিলাম। এবং প্যাকেটটাকে আর একবার নেড়েচেড়ে অনুভব করে দেখলাম। বইয়ের বাঁধানো মলাট হাত না দিয়েও বোঝা যায়। তবে শুধু বইই নয়—তার সঙ্গে কাগজও আছে।

'রেভারেন্ড পে'তা'.....মিশন। সাঁওতাল পরগনার গ্রামাঞ্চলের একটি মিশন। মিশনটি অনেক দিনের।

অবশেষে খুলে ফেললাম। উপরের মোড়কের নিচে আবারও একটা মোড়ক ছিল, নতুন টোয়াইন সুতো দিয়ে বাঁধন দেওয়াও ছিল। খুলে পেলাম একখানা বাঁধানো খাতা। বই নয়। বইয়ের মলাটে বইয়ের পরিচয় থাকে—তা নেই তা ছাড়াও বইয়ে এবং বাঁধানো খাতায় যে প্রভেদ থাকে—সে প্রভেদ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হচ্ছিল। কিন্তু খাতাখানা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি; দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একখানা রেজেস্ট্রী করা দলিল। মাঝখানে ভাঁজ ক'রে মোড়া লম্বা সাইজের ডেমি কাগজ—তার মাঝখানে রেজেস্ট্রী আপিসের গোল রবারস্ট্যাম্পের ছাপ মারা। তার নিচে লাল এবং কালো কালিতে রেজেস্ট্রী আপিসের দু-তিন লাইন মন্তব্য। মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠল। কতকগুলো প্রশ্নই হুড়মুড় ক'রে একসঙ্গে, যেন এ ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিজেকে শোনাতে চাইলে। দলিলখানা তুলে নিলাম।

ভাঁজটা খুলে দলিলখানা চোখের সামনে ধ'রে চমকে উঠলাম। প্রথমেই চোখ পড়ল দলিল সম্পাদনকারীর নামের দিকে : সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে—শ্রীসুকুমার চৌধুরী।

সেবানন্দ ব্রহ্মচারী? সুকুমার চৌধুরী?

দলিলটার মধ্যে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে চোখ বুলিয়ে গেলাম। দলিলখানা উইল। উইল ক'রেছে সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে সুকুমার।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তীর্ণ খোয়াই এবং প্রান্তর পড়েছিল এককালে। সেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় দেড়শো বিঘা আজকে যাকে বলে পঞ্চাশ একর—জমি দখল ক'রে বসে প্রায় অর্ধেকটার উপর বাগান করেছিলেন এবং বাকী অর্ধেকটা মাটির মোটা পগার দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই পতিত অংশ থেকে এককালে পনের বিঘা অর্থাৎ পাঁচ একর জমি আমি পাঁচটাকা বিঘা সেলামী নিয়ে সুকুমার চৌধুরী নামক একজন ডেটিনাকে মোকররী মৌরসী বন্দোবস্ত করেছিলাম। সুকুমার ডিটেনশন থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে বসবাস করেছিল। নিজে করত ডাক্তারী—মেডিকেল কলেজে ফিফথ্ ইয়ার পর্যন্ত পড়া ছেলে ছিল সুকুমার। তা ছাড়া এখানে খানিকটা চাষ খানিকটা পশুপালন তার সঙ্গে খানিকটা গোলাপ বাগানও করেছিল সে। এবং কিছুকালের মধ্যেই এ অঞ্চলটিকে তার প্রায় সাম্রাজ্যে পরিণত করে ফেলেছিল। মুকুটহীন সম্রাট বা রাজা বলে একটা কথা জানাই ছিল তখন পর্যন্ত চোখে দেখিনি। প্রথম তার চেহারাটা দেখেছিলাম—সুকুমারের মধ্যে। এ অঞ্চলের জমিদার-ধনী-মহাজন-ব্যবসাদার জোতদারদের সমবেত বাধাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে দেশের মানুষের যাকে বলে বুকের ওপর সিংহাসন পাতা তাই পেতে সগৌরবে চেপে বসেছিল।

*

আমাদের গ্রাম প্রায় আড়াই শো বছর ধ'রে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেকালে—নবাবীআমলে এখানে নদীর ঘাটে বন্দর ছিল। নদীর ঘাটটার নাম এখনও নৌকাঘাটা এবং ঘাটের উপরেই যে একটা উঁচু ঢিবি আছে—যার পরিমাণ হবে—বিঘা পাঁচেকেরও বেশী—সেটার নাম এখনও বন্দর ঢিবি।

নদীর ঘাট থেকে গ্রামের মধ্যে আধ মাইলের মত দূরত্ব আছে। গ্রামেও বাজার আছে। একটা লালমোরামের পাকা রাস্তা এই অঞ্চল জুড়ে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে; আমাদের গ্রামের মধ্যেও এই রাস্তাটা গোটা তিন-চার হাটভাঙা দ-য়ের মত এঁকে বেঁকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে। এই রাস্তাটার উপর অর্থাৎ দুদিকে বাজার আছে বরাবর। মিস্টির দোকান, তেলেভাজার দোকান, কাপড়ের দোকান গোলদারী দোকান, তার সঙ্গে মণিহারী ছোটতে বড়তে দুতিন খানা।

আমাদের আমলে দর্জির দোকান হয়েছিল। তিনুমিয়া সাহেব কালীময়রার বাড়ীর একটা বারান্দায় চোখে চশমা পরে সেলাইয়ের কল চালাতেন, বাঁ পাশে একটা টুলের উপর থাকত তাঁর ফুরসী—ফুরসীর নলটা লাগানো থাকত তাঁর মুখে। কলও চলত এবং ফুরসীও টানতে। তার পাশে তাঁর মাখানো তামাকের কারবার ছিল। হীরু বৈরাগীর ছোট মণিহারীর দোকান ছিল—চুড়ি ছোট টিনের আয়না কাঁকুই চাবকী কাম মাদুলী সস্তা ছেলে পাওয়া যেত। কাঁচিমার্কা সিগারেট এবং গোটা পান কলি চুন বেচত—হীরুর বড় মেয়ে মোনা'—মনমোহিনী—। তার সঙ্গে সে পানও তৈরী করে বেচত। চন্দ মশায়ের গোলদারী দোকানে ছিল মস্ত দোকান। সন্ন্যাসী দত্তের দোকানও বড় ছিল তবে তাঁর বড় ছিল—ধানচালের কারবার।

এই বাজারের ঠিক মাঝখানে আছে থানা। গ্রামে পোস্ট আফিস ছিল—রেজেস্ট্রী আফিস ছিল এখনও বেশ কলেবর বাড়িয়ে রয়েছে। আরও অনেক সরকারী আপিস হয়েছে এখন কিন্তু কথা এখনকার নয়। কথা সেই—সাতাশ-আটাশ সালের। এই মুহূর্তে এই রেজিস্টার্ড পার্সেলের ভিতর থেকে পাওয়া দলিলখানি চোখের সামনে ধরে আমার মন চলে গেছে সেই ১৯২৭ সালে। চলে গেছে আমাদের গ্রামে, বাজারের ভিতরের শড়কটার ঠিক মাঝ বরাবর—উত্তর দিকে থানা; থানার পশ্চিম গায়ে একটা গ্রাম্য রাস্তা বেরিয়ে গেছে ঠাকুর পাড়া। রাস্তাটার ওপাশে পশ্চিমে মিছারাম মোদকের দোকান এবং বাড়ী। ১৯২৭ সালে মিছারাম বা তার স্ত্রী জীবিত ছিল না, তাদের ছেলেপুলে ছিল না ব'লে বাড়ীটা পেয়েছিল—তার ভাইপোরা। তারা বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছিল গভর্নমেন্টকে। থানার পাশেই—দারোগা বাবুদের চোখের উপর—এই বাড়ীটায় ডেটিনরা থাকত। বাড়ীটার নামই হয়ে গিয়েছিল 'নজরবন্দী থানা'। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই নানান নামের রকম ফেরের মধ্য দিয়ে—বিনা বিচারে আটক চলছে। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্ট বা রুল—রাউলাট এ্যাক্ট, এমনি কত নাম। ডেটিনরা প্রথম এসেছিলেন সুশীলবাবু—আমাদের থেকে বড় ছিলেন তিনি। অসীম বাবু, সৌমনাথবাবু, অনন্তবাবু, অতুল বাবু, মুরেশ বাবু, তারপর একদিন এল এই সুকুমার চৌধুরী।

সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে। বয়স বাইশের বেশী হবে না বয়েস। বীরের মত চেহারা। একসারসাইজ করা শরীর দেখেই বোঝা যায়।

আমার উপর পুলিশের দৃষ্টি ছিল। মেলামেশার সহজ পথটা নিরাপদ ছিল না। তবুও ডেটিনদের আমার সঙ্গেই আলাপ হত সর্বাগ্রে।

কেমন করে যে তারা খবর দিয়ে আসতেন তা বলতে পারিনে—তবে হয় তাঁরা নিজেরাই আসতেন আমার বাড়ীতে নয়তো

কোন-না-কোন লোক এসে বলত—নতুন নজরবন্দী বাবু আপনার খোঁজ করছিলেন। তেমন-তেমন থানা অফিসার সে-কালেও ছিলেন যিনি আমার বাড়ীর পাশের স্টেশন আবার রাস্তাটা ধরে যাবার পথে হেঁকে বলে যেতেন — নতুন একটি ভদ্রলোক এসেছেন ডেটিন্যু। একবার যাবেন। অথবা নিজেই ডেটিন্যুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতেন—'আছেন নাকি মশায়?' এবং আলাপ করিয়ে দিয়ে—চা খেয়ে উঠে দাঁড়াতেন। হেসে বলতেন—যাবেন আপনি। এখন যদি গোপন কথা টথা থাকে—বলে নিন। তবে দেখবেন—যা রয়সয় তাই করবেন।

সুকুমার সকলের থেকে আলাদা। সেটা সে প্রথম আলাপ থেকেই প্রমাণ করেই আমার দেখা করেছিল। আমার বাড়ীতে সে একেবারে একলা এসে হাজির হয়েছিল। সে সময় আমাদের দেশে প্রবল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। পুরনোকালের বর্ধমান নদীয়ার মত অবস্থায় প্রায় এসে পৌঁচেছিল। পেটে পিলে এবং জীর্ণ হাড় বের করা বুক ও যেমনই রঙ হোক—তার উপর আলো ছাপ পড়া রঙ এই ছিল সাধারণীন অবস্থা। সেদিন আমার তিনদিন জ্বর বা জ্বরের তৃতীয় দিন। টেম্পারেচার উঠেছে—একশো চারের উপরে। বিছানায় শুয়ে ছট-ফট করছি। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। বেলা দিকেল পাঁচটা। আমার বড় ছেলে এসে বললে—একজন খুব সুন্দর ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম—বাবার জ্বর হয়েছে—তো বললে—বলুক—আমি ডাক্তার।

ডাক্তার! কে ডাক্তার আমাকে দেখতে এল উপযাচক হয়ে? কথাটা একটু বিভ্রান্ত করেছিল। উদ্বিগ্নতায় বিভ্রান্ত করেছিল—তা বলছি নে—তবে একটু ধাঁধা লাগিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল; অর্থাৎ কি উত্তর দেব ভাবছিলাম—। কিন্তু তার আগেই ম' একটি প্রিয়দর্শন তরুণকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তরুণটি মাথায় একটু বেশী উঁচু—আমার পুরোনো আমলের মাটির দোতলার পাঁচ ফুট দরজার মাথার চৌকাঠে মাথা ঠুকে—'বাপরে' বলে ঘাড়টা হেঁট করেছিলেন। পর-ক্ষণেই হেসে উঠে বলেছিলেন—করেছেন ভাল। মাথা উঁচু করে ঢুকবার জো নেই।

মা বলেছিলেন — কেটে-টেটে যায়নি তো বাবা? দেখি?

আগন্তুক বলেছিলেন—কেটে গেলে মন্দ হবে না। দিব্যি ওই বাড়ীটার নাম দিয়ে চালিয়ে খানিকটা হুজ্জুৎ করা যাবে। হুজ্জুৎ না করলে জমে না—দিন কাটে না!

মা বলেছিলেন—উনি এখানে ডেটিন্যু হয়ে এসেছেন। ডাক্তারী পড়তেন—

বাধা দিয়ে আগন্তুক বলেছিলেন—এই দেখুন। আমি বললাম—আপনি আমার মা হবেন এখানে— আর আপনি আমাকে সকার লাগিয়ে কথা বলছেন?

এরপর আমার বিছানায় বসে পড়ে বলেছিলেন—আমার নাম সুকুমার চৌধুরী। আপনার নাম আমি জানি কিন্তু এ ক'রে-ছেন কি বলুন তো? একেবারে জ্বরে কাৎ হয়ে পড়ে আছেন।

বলেই আমার কপালের উপর হাত রেখে একটু যেন চমকে উঠে বলে-ছিলেন—ওঃ এযে টেম্পারেচার খুব চড়ে গেছে?

কপাল থেকে হাত সরিয়ে আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে নাড়ী ধরেছিল। বলেছিল আমি থ্রি ফোর্থ ডাক্তার কিন্তু ঠাকুরদা ক'বরেজী করতেন—বাবা কবরেজী কম ডাক্তার ছিলেন—তাঁরা নাড়ী দেখতেন খুব ভাল। বাবার বাড়ী আমাদের মেয়েরাও হাত দেখতে জানেন। আমি হাত দেখতে জানি খুব ভাল। যা বলব নাড়ী দেখে তাই থারমোমিটারে উঠবে।

তাই হয়েছিল। নাড়ী দেখে সে বলে-ছিল—জ্বর পাঁচ ছাড়িয়ে গেছে।

থারমোমিটারেও তাই উঠেছিল একশো পাঁচ পয়েন্ট দুই ছাড়িয়ে একটু। এরপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল কিছুক্ষণ। এবং গরম জল তৈরী করিয়ে সারা দেহটাকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে ভাপ দিয়েছিল—তারপর মুছিয়েও দিয়েছিল। পাদুটিকে জল ভরা গামলায় কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে মুছে মোজা পরিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল: মাথা কপালে ঘণ্টি তিনচার জল ঢেলে ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে টেম্পারেচার কমিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিল—একশো চারে।

তারপর বলেছিল—একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

ঘুম আমার আসেনি। এখানে সুকুমার পারেনি। হেরেছিল। হেসে বলেছিল—অত্যন্ত সেনসিটিভ নার্ভ আপনার। আপ-নার ঘুম আনা সহজ নয়। জ্বর কমতে সুরু করবে তবে ঘুম আসবে।

তারপর বলেছিল—উঠলাম আজ। কাল ভোরে খোঁজ নিয়ে যাব। জ্বরটা বোধ হয় তখনই ছাড়বে।

বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে দেখে বলেছিল সাতটা। দু ঘণ্টা হয়ে গেছে। আপনার এই খাতাখানা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছি আমি।

একখানা বাঁধানো একসারসাইজ বুকে একখানা নাটক লিখেছিলাম। ঐতিহাসিক নাটক। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে লেখা। জলের গেলাস ঢাকা দেওয়া ছিল খাতাটা দিয়ে; সেটাকে যে সে কখন খুলে দেখেছিল তা জানি না তবে সে দেখেছিল এবং কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখেও ছিল এরই মধ্যে তার প্রমাণ সে দিয়ে গেল। বললে—গানগুলিও আপনার লেখা নাকি? ওই—'আমার মাধুরী—তোমার নয়নে মধুর করিয়া নাও।'

বলেছিলাম—হ্যাঁ।

—ভাল লাগল।

—সুরও বেশ ভাল।

—আপনি গাইতে পারেন নাকি?

—না। ওখানে একেবারে নিরক্ষরের দামিল।

—তবে? সুর দিল কে?

—ওই যে পাটের মুখে ওই গান—

—দ্বিতীয় আলমগীরের নাতনী—দেলেরা—

—হ্যাঁ।

—ঐতিহাসিক চরিত্র তো নয়?

—না। কাল্পনিক।

—হজরৎ বেগমকে আনেননি কেন? মহম্মদশাহের বেটী?—যাকে আমেদ শা আবদালী জোর ক'রে বিয়ে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল?

—যখন লিখেছিলাম—তখন হজরৎ বেগমের খোঁজ পাইনি। কিন্তু আপনি জান-লেন কেমন ক'রে। পড়েন ডাক্তারী। আওড়াচ্ছেন ইতিহাস।

—ইতিহাস আমার ফেবরিট সাবজেক্ট। ভারী ভাল লাগে।

এর পরই সে সেদিন চলে গিয়েছিল। গানের সুর নিয়ে যে প্রশ্নটা করেছিল—তার উত্তর পাবার কথা বোধকরি তখন ভুলে গিয়েছিল সে। ওদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছিল। ডিটেনশন আইনে সন্ধ্যার পর ডেটিন্যুর বাইরে থাকবার অধিকার ছিল না। ছেলে-টিকে অসমসাহসী বা বেপরওয়া বলে সেইদিনই চিনেছিলাম এই ঘটনাটি থেকেই।

তবে ছেলেটির মধ্যে আরও কি আছে। ঘর জোরে মানুষকে জিতে নিতে ওর দেরী লাগে না।

(খ)

তখনকার গান কাজী নজরুলের গান। গলা ছিল ভাঙ্গাভাঙ্গা। এবং মোটা। তবে প্রাণ ঢেলে গাইতে পারত। গানও বুঝত। একটা সহজাত সুরবোধ ছিল। মিছারাম ময়রার বাড়ীর বারান্দায় তার দুপুরুষের পুরনো খুব মজবুদ একটা বেশ লম্বা চওড়া তক্তাপোষ ছিল। যেটা নিয়ে মিছা-রাম মেলায় যেত—তার উপর মিষ্টির দোকান সাজাত' এবং অন্য সময় বারান্দায় পাতা থাকত—তারই উপর মিছারাম তার বাক্স এবং খাতা নিয়ে বসে থাকত। খদ্দেররাও এসে এই তক্তাপোষে বসত। সেই তক্তাপোষখানা সমতেই ভাড়া নিয়ে-ছিল গভর্ণমেন্ট; ডেটেন্যুরা যে এসেছে সেই এটার উপর বসত। সুকুমার এটাকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করত। দুই হাতে তক্তাপোষ বাজিয়ে গান গাইত—'কারার ওই লৌহকপাট'। এবং 'ভেঙে ফেল-করবে লোপাট' গাইবার সময় তক্তাপোষটাকে ভেঙে ফেলতেই চেষ্টা করত। তবে—বল-ভাই মাভৈ মাভৈঃ—নবযুগ ওই এল ওই—গানখানা গাইতে গাইতে অভিভূত হয়ে পড়ত। আবার 'কে বিদেশী মন উদাসী'ও ছিল সুকুমারের প্রিয় গান। বাঁশের বাঁশীও বাজাত সুকুমার।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সত্যি ক'রে বলতো তোমায় ধরলে কেন? কাদের সঙ্গে যোগ তোমার।

—কেন? সে শুনে কি করবেন?

বলেছিলাম—না-বল, শুনতে চাইব না। কিন্তু তুমি ঠিক কোন পার্টির লোক বলে আমার মনে হয় না।

—কেন?

—তুমি সেদিন নিজেই বলেছিলে—

পার্টি ফার্টি আমার ভাল লাগে না। দাদাদের মন জুগিয়ে চলা আর দেশের সেবা করা এক কথা নয়। আমি দেশের সেবা করতে চাই। দাদাদের চরণোদক খেয়ে আমি স্বর্গে যাব না।

কথাগুলো সুকুমার বলেছিল একদিন।

সুকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল—খুব নোট করে রেখেছেন তো!

বলেছিলাম—তা রেখেছি। তা ছাড়া—।

—কি তা' ছাড়া?

—জেলা কংগ্রেসের ওরাও খবর দিতে পারেননি তুমি কোন পার্টির লোক। ওরা বললেন—মুরশিদাবাদের বৈদ্যবাড়ীর ছেলে—ওদের সঙ্গে মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই টুকু জানি।

মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের বাড়ী বিখ্যাত বংশ। ও'দের বাড়ীর ছেলেদের নাম শুনেছি; বালেশ্বরের নীরেন দাশগুপ্ত—মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ওই বাড়ীর ছেলে। তাঁদের বাড়ীর আরও ছেলেরা সেকাল পর্যন্ত এই দেশসেবার এবং দেশোদ্ধারের অবিচলিত সংকল্পে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের সঙ্গে সুকুমারদের সম্পর্ক থাকাটাই যথেষ্ট হয় তো। তবুও জেলা কংগ্রেস থেকে আমার মত যারা কর্মী তাদের মনে প্রশ্ন না-জেগে পারেনি। ওই বংশের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে সে কোন গ্রুপের একথাটা স্পষ্ট নয় কেন? কথাটা সেই হিসেবে মনকে উদ্বিগ্ন করেছিল, সেদিন বলেই ফেললাম। কথাটা হয় তো জিজ্ঞাসা করা নিয়ম নয়—তবু এমন ক্ষেত্র আসে যেখানে নিয়ম থেকে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে।

সুকুমার বলেছিল—ঠিক কথা। প্রশ্ন লাগবার কথা বটে।

আমি বলেছিলাম—কিছু মনে করলে না তো?

হেসে উঠেছিল সুকুমার। বলেছিল—কিছু মনে করাকরির মধ্যে আমি নেই। তবে আমার উত্তর শুনে বিশ্বাস করেন তো বলি। না-করেন তো বলে কি করব? বলুন?

—বল আমি বিশ্বাস করব।

—কথাটা ঠিক—আমি দাদা কোন দলের টলের নই। দল আমার ভালও লাগে না। পুলিশ আমাকে কেন ধরেছে—তা পুলিশই জানে। বোমা আমি দেখিনি। পিস্তল দেখেছি কিন্তু ছুঁইনি। তবে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিলাম। ম্যাট্রিকে তিনটে লেটার পেয়েছিলাম। আই এস সিতে স্কলারশিপ পেয়ে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিলাম। স্কুলে যখন পড়েছি তখন আমি একটা সেবা সমিতি অরগানাইজ করেছিলাম। তাতে খুব নাম হয়েছিল। দশ বারোখানা গ্রামে আগুন লাগলে—আমাদের 'অগ্নি যোদ্ধা দের' নিয়ে ছুটে যেতাম। কলেরা হ'লে—সেবাব্রতীদের নিয়ে গ্রামে আড্ডা গেড়ে সেখানে কাজ করতাম। ম্যালেরিয়ার সময় পুকুরে ডোবায় কেরোসিন ছড়াতাম। ওই 'অগ্নি যোদ্ধা' নামটাই বোধহয় মহাপণ্ডিত আই বি দের বিচলিত করেছিল। অগ্নিযুগ শব্দটার সঙ্গে মিল থাকার জন্যে আর গাই না বলদ বিচার করেননি। তাছাড়া থানা অফিসার থেকে একেবারে ডিস্ট্রিক্ট আই বি ইন্সপেক্টার পর্যন্ত কাজ দেখাবার ভাওতা পেয়েছিল—তারা ছাড়বে কেন? আমার নাম খাতায় তুলে সার্বিস-বইয়ে দু ছত্র মূল্যবান মন্তব্য সংগ্রহ করেছিল। অতঃপর কলকাতায় মেডিকেল কলেজে এসে—'সুকুমারের পাখা গজাল'। হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছিলাম। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে—সর্বত্র বানের আগে ছুঁদির' মত সুকুমার থাকতেন। প্রফেসাররা ভালবাসতেন। বলতেন—একটু সাবধান হও সুকুমার। কিন্তু কাকে বলছেন? কে শুনছে? কথাটা একটু খুলে বলি। পুলিশ টুলিশের কেউ কলেজে হসপিটালে এলে আমার স্বভাব ছিল খানিকটা টাঁ-ফু করা। ফাঁক পেলেই মানে একটু সুযোগ পেলেই ক্যাণ্টর অয়েল খাইয়ে দিতাম। কেটেকুটে গেলে ব্যাণ্ডেজ করবার সময়—টিংচার আইডিন টাইডিন প্রয়োগের সময় যাতে বেশী জ্বালা ক'রে তেমনি সবের ব্যবস্থা করতাম। তারপর ইঞ্জেকশন দেবার সময় ভোঁতা নিডল নিয়ে যতখানি পারি দুঃখ দিতাম। এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট মহাত্মা ব্যাপারটা নিয়ে উপরে নাড়াচাড়া করেন। লোকটার পায়ে চোট লেগেছিল। হাড়টাড় ভাঙেনি। আমি তার পা প্লাস্টার ক'রে দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে দড়িতে ওজন ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলাম।

FOR P.U. & UNIVERSITY ENTRANCE COURSE)

অধ্যাপক চৌধুরী ও অধ্যাপক সেনগুপ্ত প্রণীত

1. **তর্কবিজ্ঞান-প্রবেশ** (Deductive & Inductive) —৫ম সংস্করণ 6.50
[Recommended by C. U. and N. B. U. as a Text book]

FOR THREE-YEAR DEGREE COURSE (Pass & Hons.)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

1. **দর্শনের মূলতত্ত্ব** (ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন একত্রে)—৫ম সংস্করণ 15.00
2. **ভারতীয় দর্শন** (Indian Philosophy)—৫ম সংস্করণ 8.00
3. **ভারতীয় দর্শন** (২য় পর্যায়) for B. U. 2.00
4. **পাশ্চাত্ত্য দর্শন** (Western Philosophy)—৫ম সংস্করণ 7.50
5. **পাশ্চাত্ত দর্শন** (For B. U. Part II) —২য় সংস্করণ 10.00
6. **নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন**—(৭ম সংস্করণ) 15.00
7. **নীতিবিজ্ঞান** (Ethics) —৭ম সংস্করণ 8.00
8. **সমাজদর্শন** (Social Philosophy) —৬ষ্ঠ সংস্করণ 8.00
9. **মনোবিদ্যা** (Psychology) —২য় সংস্করণ 14.00
10. Handbook of Social Philosophy—2nd Edition 12.00
11. **পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**—
(আধুনিক যুগ : বেকন—হিউম) 6.00

অধ্যাপক ধতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

1. **শিক্ষা-তত্ত্ব** (Principles and Practice of Education) 6.50
2. **ভারতের শিক্ষা সমস্যা** (Indian Ed. Problems) —২য় সংস্করণ 12.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক রায় প্রণীত

1. **শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান** (Ed. Psy. with Statistics) —২য় সংস্করণ 16.00

FOR B.T., B.ED. & P.G. BASIC

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

1. **শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা** (Teaching of Social Studies) 8.00
2. **ভারতের শিক্ষা সমস্যা**— —অধ্যাপক রায়—২য় সংস্করণ 12.00
3. **শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান**— অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায়—২য় সংস্করণ 16.00

HELP BOOKS

By S. Banerjee: Revised by Prof. P. B. Sengupta.

1. **P. U. Logic Made Easy (in Bengali)** 2.25
2. **Ethics Made Easy (in Bengali)** 2.50
3. **Psychology Made Easy (in Bengali)** 4.50
4. **H. S. Logic Made Easy (in Bengali)** 4.00

BP

BANERJEE PUBLISHERS

Calcutta.9 Phone: 34-7234

তারপর পেট টিপে দেখে বলেছিলাম মলে ঢাঁই হয়ে আছে পেট। ক্যাস্টর অয়েল খাওয়াও। ভাল ছাত্র ছিলাম এবং উটের মত সর্বত্র নাক গলানো অভ্যাস ছিল। মাস্টাররা ভালবাসতেন। এগুলো করতাম আমি। যোগ্যতার সঙ্গে করতাম। লোকটা বলেছিল —হ্যালো ডক—এ তুমি কি বলছ? আমি যে মাসে একদিন ক্রুশেন খাই। আমি ওদিকে খুব পার্টিকুলার। এই তো গত সপ্তাহ আমার ক্রুশেন সপ্তাহ গেছে। আমি তার পেটটা আবার টিপে দেখে বলেছিলাম—মিস্টার — এ তোমার বিসুবিয়াসের মত ফিউরিয়াস এ্যান্ড ফেরোসাস হয়ে রয়েছে। এতে সুকুমারের সঙ্গে আমার কতকগুলি আশ্চর্য মিল ছিল। সে-মিল ওই কর্মসূত্রের বা কর্মপন্থার। নিজের জীবন সম্পর্কে সুকুমার যে-কথাগুলি সেদিন আমাকে বলেছিল—সে কথাগুলির সঙ্গে আমার জীবনের কথা আশ্চর্য মিলে যায়। আমার জীবনের প্রারম্ভে নিতান্ত কৈশোরে ১৯০৮।৯ সালে আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রথম নব-জীবনের নব-যুগের সাড়া জেগেছিল। তার প্রকাশ হয়েছিল একটি সেবাধর্মী সংগঠনের মধ্যে এবং আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে। হয়তো কথা-গুলো খুব ভারী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভঙ্গির হয়ে গেল। সহজ করেই বলা ভাল। দরিদ্র ভাণ্ডার নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন—আমাদের নিত্যবাবু। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে রবিবার রবিবার পাড়া ঘুরে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল আদায় করা হ'ত। সাতদিনের সাত-মুঠো চাল একটা ভাঁড়ে জমা করতেন গৃহস্থেরা। সেই চাল জমা থাকত আমাদের গ্রামের মণ্ডল ফকীর মণ্ডল মশায়ের দোকানে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দিলে গরীবেরা অনাহারের সম্মুখীন হত। তাদের সাহায্য করা ছিল দরিদ্র ভাণ্ডারের কাজ। মধ্যে মধ্যে এককালের সম্পন্ন গৃহস্থেরা দুঃখে পড়তেন—তাদেরও সাহায্য করা হ'ত। এ ছাড়াও সারা বাংলা দেশের মধ্যেও দুর্ভিক্ষে অভাবে সাহায্য পাঠাতেন। আর একটি প্রতিষ্ঠান—গ্রাম্য থিয়েটার। তার সঙ্গে লাইব্রেরী। দুটির সঙ্গে আমার জীবনের নিবিড় সংযোগ অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছিল। তবে দরিদ্র ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে আমি ছিলাম বলতে গেলে একেশ্বর।

ছেলে-বয়স থেকে মুষ্টিভিক্ষা আদায়ের দলে আমিই ছিলাম একমাত্র অক্লান্ত জন। পনের ষোল বছর বয়সে একদিন দেখলাম আমার বেশী বয়সীরা কেউ নেই দরিদ্র-ভাণ্ডারে। তাঁরা কেউ কলেজে পড়ছেন—কেউ চাকরীতে ঢুকেছেন, কেউ গ্রামেই ঘরে ব'সে জমি-জমা দেখছেন এবং খিয়েটারের মধ্যে ঢুকেছেন। এবং আমার সমবয়সীরাও ঠিক এই দরিদ্র ভাণ্ডারের কাজে আর সাহস পাচ্ছেন না। ইস্কুলের মাষ্টার মশায়েরাও সাবধান করছেন সকলকে—বলছেন, ওতে যেয়ো না। পুলিশের নজরে পড়বে। সে-দিন কি জানি কোন সাহসে বা আকর্ষণে চোদ্দ পনের বছরের ঊর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে একমাত্র আমিই দরিদ্র-ভাণ্ডারকে ছাড়তে পারিনি। সেদিন আমিই আমার ছোট-বয়সীদের মধ্য থেকে একটি আট-দশজনের দল গ'ড়ে দরিদ্র-ভাণ্ডারের ভার নিয়েছিলাম। শুধু ভার নেওয়া নয় দলটিকে ক্রমে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বড়ও করে তুলেছিলাম।

আমাদের দেশে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের বাড়ী। এবং বাড়ীগুলি সব ঘন সন্নিবিষ্ট। গ্রীষ্মকালে আগুন লাগত। মানুষেরা এখানে জুটত এবং আগুনের সঙ্গে লড়াই করত প্রাণের দায়ে। এই লড়াইয়ের জন্য একটি দল গড়েছিলাম আমি। বেশী কিছু করতে হয়নি—ভিক্ষে করে টাকা সংগ্রহ করে গোটা পনর বালতি কিনেছিলাম। আশে-পাশের গ্রামে কোথাও আগুন লাগলে সেই বালতী নিয়ে পনের-কুড়িটি ছেলে ছুটত। পল্লীগ্রামে আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ে অভাব হ'ত জল-তোলার পাত্রের। এ'টো হাঁড়ি টেনে বের করতে হ'ত লোকের হেঁসেল থেকে। তাও মাটির হাঁড়ি —ক্রমাগতই ভাঙত। সেই ক্ষেত্রে বালতীর আবির্ভাব চমক লাগিয়েছিল সেদিন। এবং নাম হয়েছিল দরিদ্র-ভাণ্ডারের। ক্রমে বালতী হয়েছিল—পঞ্চাশটি। ছেলেরাও হয়েছিল দলে ভারী। আশপাশ গ্রাম ছেড়েও দূর-দূরান্তরেও ছুটত তারা। পঞ্চাশ ষাট বা তারও বেশী সংখ্যক ছেলে যখন বেশ লাইনবন্দী হ'য়ে বালতি নিয়ে গ্রামান্তরের মধ্য দিয়ে মাঠ ভেঙ্গে আরও দূরের গ্রামান্তরে ছুটত—তখন সে একটা দৃশ্য হয়ে উঠত। ফিরবার সময়ও তারা ফিরত লাইন-বন্দী হয়ে। এবং মার্চের ভঙ্গিতে ফিরত। এটা শুধু পুলিশের নয় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী বা রেভুলুশনারী বা এনার্কিস্ট যারা তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্রমে দরিদ্র-ভাণ্ডার রূপান্তরিত হয়েছিল সোস্যাল সার্ভিস ইউনিয়নে। এতে কাজও বেড়েছিল। ম্যালেরিয়ার সময় ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজ এবং কলেরার সময় এ্যান্টি-কলেরা কাজ এসে ঘাড়ে চেপেছিল। এসব-গুলি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে সুকুমার চৌধুরীর পায়ের ছাপ আঁকা পথের প্রতিটি বাঁকের সঙ্গে আমার পথের ও পথের বাঁকগুলির আশ্চর্য মিল আছে। যাক। মিলের কথা বলতে গিয়ে সম্ভবতঃ নিজের কথাই এক কাহন বলা হয়ে গেল।

গরমিল এর পর থেকেই।

সুকুমার মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের আত্মীয়। তাদের টানেই বোধকরি ওদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে ধরেছে। এই অংশের কথা সুকুমার আমাকে ঠিক বলেনি। আমি আমার কথা বলেছি—সেই দাবীতেও তার ওপর জোর ঠিক করিনি। কারণ আমার সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সামান্য যোগাযোগ ১৯২১ সালের আগে হয়েছিল—১৯২১ সালে গান্ধীজীর আদর্শ তাকে প্রায় মুছেই দিয়েছিল। সুকুমারের তা নয়। সেই কথাটা প্রমাণ ক'রেই সে একদিন ওই ডেটেন্যু হয়ে থাকতে থাকতেই দস্তুরমত একটা রক্তাক্ত সংগ্রাম ক'রে ফেললে। নিজে ডান হাতে উপরের অংশে অর্থাৎ বাহুতে ছুরি খেলে কিন্তু তার ঘুষিতে একজন কনেস্টবলের নাকটা এবং ডান চোখটা এমন জখম করে দিলে যে তাকেও হাসপাতালে যেতে হ'ল। সুকুমারের সঙ্গে যেতে হ'ল। আর একজনও ছিল—সে গ্রামেরই একজন মন্দ-চরিত্রের লোক। পুলিশের খাতায় দাগী আসামী।

সকাল বেলা আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে গরুর গাড়ীতে চড়ে সিউড়ি হাস-পাতালে যাবার সময় সুকুমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দেখিয়ে বলে গেল জানি না ফিরব কিনা। যদি না-ফিরি তবে এইটেই বিদায়-সম্ভাষণ। তবে মশায় ওই হাসির গল্পগুলো লিখবেন যেন। ছেড়ে দেবেন না। পূর্ণিমা কাগজখানা যেন উঠে না-যায়।

বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। গত রাত্রে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ও'র ওপরের ঘরে বসে নতুন লেখা হাসির-গল্প—ভালচার ক্লাব —বা শকুনিসংঘ শুনিয়ে এসেছি সুকুমারকে। সুকুমার হেসে গড়াগড়ি গিয়েছে। এরপর ঘন্টা-কয়েকের মধ্যে ঘটেছে ঘটনাটা। এক্ষেত্রে বিস্ময়-বোধটা অবশ্যম্ভাবী। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে সেটা আমার বেশীই হল।

সুকুমারের বাসা, অর্থাৎ ডেটেন্যুর বাসটা যাকে ওখানকার লোকে বলত 'রাজ-বন্দীখানা'—সেটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ঝাঁকা সড়কটার উত্তর দিকে। বাড়ীটার পূব গায়ে ঠাকুরপাড়া যাবার একটা কুণী রাস্তা চলে গেছে উত্তর-মুখো। তার পূব গায়েই থানা। রাস্তার দক্ষিণ দিকে রাজবন্দীখানার সামনা-সামনি—'হ'রে বৈরাগীর বাড়ী'। তার পিছনে হালদার পুকুর। হালদার পুকুর বেশ বড় পুকুর। চার পাড়ের মধ্যে তিনটে পাড়ে বসতি। এবং অনেকগুলি ঘাট। উত্তর দিকের ঘাটটা একটা বড় ঘাট। পুরোপুরি পাকা শড়কের ধারে হ'লেও সেকালে এই ঘাটেই মেয়ে-পুরুষে স্নান করে, বাসন মাজে, রান্নার এবং অন্য সব ব্যবহারের জল নেয়। এই ঘাটটাই রাজবন্দী-খানা নামক মিছারাম ময়রার বাড়ীর ঠিক সামনে পাকা শড়কের দক্ষিণে। একটু আড়াল আছে কয়েকটা তাল গাছের, নইলে ডেটেন্যু বাসার বারান্দায় সেই পুরনো-ভারী তক্তাপোষটায় বসলে ঘাটের কিছুটা অংশ নজরেও পড়ত। বাড়ীটা কোঠা-ঘরের বাড়ী...দক্ষিণ দিকের কোঠার অর্থাৎ মেটে দোতলার দক্ষিণের জানালাটা খুললে গোটা ঘাটটা একেবারে অনাবৃত অবস্থায় দেখা যেত। ব্যাপারটা লোকেদের চোখ এড়ায়নি, যখন থেকেই বাড়ীটায় ডেটেন্যু এসেছেন—তখন থেকেই জানালা-টাকে পেরেক পিটে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। দিয়েছিলেন — বোধহয় দ্বিতীয় ডেটেন্যু—সেটা ১৯২৩।২৪ সালে। তবে ঘরখানা টিনের ঘর। উপরতলার ঘরখানা টিনের, গরম এবং ঠাণ্ডার জন্য অব্যবহার্য। কেউ বাসই করত না। তবে আমি জানি—ওই ঘরে যিনিই ডেটেন্যু থাকতেন তিনিই ওই উপরতলার ঘরটাকেই—আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রুম হিসেবে ব্যবহার করতেন। গোপনে রাজনৈতিক কর্মীরা আসতেন—তাঁরা ওই

উপরের ঘরের অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকতেন এবং ওখানে বসেই পরামর্শ সেরে চলে যেতেন।

এই ঘাটের উপর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় এই মারপিট হয়েছে। সাব-ইন্সপেক্টর বললেন—এ ওই কনেস্টবল আর ওই বদমাস বেটারই পেজোমি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। থানার একেবারে সামনে। রাত্রি দেড়টা তখন। একটা মেয়ে-গলার চীৎকার উঠল। আমি জেগেছিলাম তাই রক্ষে। না-হলে আরও বিশ্রী কিছু ঘটত। ছুটে গিয়ে দেখলাম — কনেস্টবলটা তো দুই হাতে নাক ধরে—খোনা আওয়াজে বাঁবারে বাঁবারে ক'রে প্রায় মাথা কাছড়াচ্ছে; লণ্ঠনের আলোয় দেখি রক্তে ভিজে গেছে জামার সামনেটা। আর ওই হারামজাদা বদমাসটা একেবারে পুকুরের কাদার উপর ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে—ওর বুকে বসে আছেন সুকুমারবাবু—ও'র হাতে বসে গেছে ওই ছুরিটা। সেটা ওই বদমাইসটাই বসিয়ে দিয়েছে। ওদিকে হ'রে বৈরাগীর বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে সেঁটে লেগে রয়েছে, খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিতের মেয়ে সুধা। থরথর ক'রে কাঁপছে ভয়ে। চেঁচিয়েছিল সুধার মা—খোঁড়া পণ্ডিতের স্ত্রী। কনেস্টবলটা বলে—সে থানা-কম্পাউণ্ডে এই শচী ঘোষের সঙ্গে বসে একটু নেশা করছিল। বলব কি বলুন, চোলাই মদ এনেছিল শ'চে —তাই খাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল— দুটো মেয়েলোক—নজরবন্দী বাবুর বাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে—রাস্তাটি পার হয়েই টুক ক'রে নেমে গেল হালদার পুকুরের ঘাটে। ওরা কে—কে—বলে চ্যালেঞ্জ করে ছুটে গিয়ে ধরেছিল সুধাকে। ওরা পুকুরের জলের ধারে ধারে চলে যাচ্ছিল নিজেদের বাড়ীর দিকে। সুধাকে ধরতেই ওর মা চেল্লাচেল্লি করে। ডেটেনুবাবু দড়াম ক'রে দরজা খুলে এসে—কনেস্টবলটাকে আচমকা ঘুঁষি। আর এ-লোকটা মানে শ'চেকে লাথি মেরে ফেলে বুকে চেপে বসেছিল। শ'চে কোন উপায় না পেয়ে ছুরি মেরেছে হাতে। সুকুমারবাবু নাকি সুধাকে আর তার মাকে ছুটে চলে যেতে বলছিল কিন্তু সুধা ভয়ে তা পারেনি। মেয়েটি আর তার মা বলে — মাঝরাতে, সুধার পেট কামড়েছিল তাই ঘাটে উঠেছিল। ঘাটে নেমেছে—এমন সময় শচী আর কনেস্টবল এসে তাদের আগলায়। কনেস্টবলটা সুধাকে জাপটে ধরে। মা চীৎকার ক'রে ওঠে। ডেটেনুবাবুর বাড়ীর সামনে। উনি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে — প্রথমেই কনেস্ট-বলটাকে নাকে মুখে ঘুঁষি মারেন। সে বাপ বলে ছেড়ে দিয়ে নাক-মুখ দুই হাতে ঢেকে বসে পড়ে। শ'চে ছুরি বের করে লাফ দিয়ে পড়ে—সুকুমারবাবুর উপর। সুকুমারবাবু লাথি মেরে ওকে ফেলে ওর বুকের ওপর চেপে বসেন। সুকুমার তো অদ্ভুত লোক। তিনি হেসে বললেন—আমি আর কি বলব? যা-ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন। দুটোর একটা তো সত্যিই।

কেস হ'ল শেষ পর্যন্ত। কেসে সুকুমার চৌধুরী আসামী। তিনি কনেস্টবলের নাক ভেঙেছেন। এবং ওই শচী নামক ব্যক্তিটির বুকে চেপে বসেছেন। সুকুমার চৌধুরী কোন কথাই বললেন না। বলা নিয়মও নয়। এসব ফৌজদারী মামলায় আসামীর নিজেকে নির্দোষ ব'লে মুখ বন্ধ করাই নিয়ম। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একট কেস ছিল—ডিটেনশন আইন ভঙ্গ করার কেস, রাত্রে তিনি বাড়ীর বাইরে এসেছেন। সেটা পরে হবার কথা। এবং সেটা মোক্ষম কেস। ওতে আর রেহাই নেই। মেয়াদ হবেই। তবে ভাগ্যক্রমে একজন কাঁচা বয়সের কচি ইংরেজ বাচ্চা সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে এসে আমাদের জেলায় এস-পি হয়ে বসেছেন এবং ইংল্যাণ্ডের সুনাম রক্ষার্থে ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তি হেতু ন্যায় সত্যকে জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন বলেই সেটাকে এখন স্থগিত রেখেছেন। সেন্ট্রাল আই বি'র সঙ্গে চিঠি লড়ালড়ি করছেন। সেজন্য এদিকে এই কনেস্টবলের নাক-ভাঙার কেসটার তদন্ত করছিলেন নিজে। না-হলে এ কেসের ফয়সালা হ'তে আদৌ দেরী হ'ত না। বলতে গেলে সুকুমার চৌধুরীর কোন ডিফেন্সই ছিল না। যার জন্যেই হোক অর্থাৎ কারণ যাই হোক—সুকুমার চৌধুরী যে কনেস্টবলের নাক ভেঙেছে—তাতে কোনই সন্দেহ নেই; সে নিজমুখে স্বীকার করেছে যে, সে তিন-চারটে ঘুঁষি কনেস্টবলটার নাকে মেরেছে। এবং ডাক্তার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে লিখেছেন, এর নাকের দুটো হাড় এমনভাবে জখম হয়েছে যে এ আর মেরামত হবে না। এ ছাড়াও এর জন্য লোকটার খোনা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এক কলমেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদা-লতে রায় হয়ে যেতে কোনই বাধা ছিল না। বাধা দিয়েছিল এই ইংরেজ তনয়টি। সে পুলিশের তরফ থেকেই সময় নিয়ে-নিয়ে চলছিল। ক্রমাগত আমাদের গ্রামে আসছিল আর যাচ্ছিল। আমার কাছেও একদিন এসে—আমার বৈঠকখানায় ব'সে আমাকেও জিজ্ঞাসা-বাদ করে গেল। বলে গেল দেখ—আমার একটা দারুণ সন্দেহ লাগছে। চাউট্রি একটা কি লুকুচ্ছে। সেটা বের হলে—কনেস্টবলের নাক ভাঙলেও ওকে বাঁচানো যাবে বলে আমার মনে হয়। আমি বলেছিলাম—আমি কিন্তু কিছু জানি না সাহেব। আমাকে উনি কিছু বলেননি। আই মীন তোমাদের বলেননি এমন কোন কথা আমাকেও বলেননি উনি।

ছোকরা সাহেব বলেছিল—এরা অদ্ভুত। Strange people you see.—

কেসটা কিন্তু আপনাআপনি চাপা পড়ে গেল। মাস-দুয়েকের মাথায় সুধা মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে একজন সায়া সেমিজ ব্লাউস কামিজ ফ্রক ফেরিওলা। বয়সে তরুণ দেখতে সুশ্রী এই ফেরিওলাটি মাস ছয়েক ধরেই এ অঞ্চলে এসে ঘুরছিল। লোকটি জাতিতে ভিন্ন। এবং এতদিনে প্রকাশ পেল যে, খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিতের বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিয়ে পণ্ডিতের স্ত্রীকে দিয়ে ফ্রক-ব্লাউস সেলাই করিয়ে নিত।

খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিত দরিদ্র মানুষ। একখানা পা খোঁড়া, গার্লস প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করত। সে নিজেও ওই চাকরীর তাগিদে সেলাই, কাটাই শিখেছিল। এবং সেও সেলাইয়ের কল নিয়ে কাজ করত। সন্তান-ভাগ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তি; চার-চারটি মেয়ে দুটি ছেলে। এবং একটি সন্তানও তার হয়ে নষ্ট হয়নি। মেয়েরাই বড় এবং মেয়েদের মধ্যে সুধাই বড়। সুধা এল-পিতে স্কলারশিপ পেয়েছিল। ইউ-পি দিয়েছিল প্রাইভেটে। এরপর তাকে সে প্রাইভেটে পড়িয়ে ম্যাট্রিক দেবার জন্য তালিম দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে এই ফিরিওয়ালাটি এসে জুটে সবদিক থেকেই উৎসাহিত করে তুলেছিল পণ্ডিতের সংসারটিকে। উৎসাহিত হননি কেবল সুধার মা এবং সুধার ঠিক পরের বোনটি।

সুধা চলে যাওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ পেয়েছিল। ঘটনাটি রীতিমত ঘোরালো। সুধার সঙ্গে ওই ফিরিওলার সম্পর্কের নিগূঢ় সংবাদটি প্রথম জেনেছিল সুধার বোন। সেটির বয়স তখন বার বছর। সেই বলেছিল তার মাকে। মা সুধাকে সাবধান করেছিল — ফল হয়নি। তারপর শাসন করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ষোড়শী সুধা তা উপেক্ষা করেছিল। এবং ফিরিওলাটি তার হাতের মুঠো শক্ত করেছিল। ফলে পণ্ডিত ক্ষিপ্ত হয়েছিল তার স্ত্রীর উপর। স্ত্রী তাকে সব বললেও তার কিছুই সে বিশ্বাস করেনি। অথবা বিশ্বাস করেও জোর করে প্রগলভ ভাবে শিক্ষার গুণগান ক'রে অবিশ্বাস ক'রে বলেছিল—'তার মেয়ে সরস্বতীর উপাসিকা সে পড়ছে। তার সম্পর্কে একথা বললে—জিহ্বা খ'সে যাবে।"

জিহ্বা খসার ভয়ে ঠিক চুপ করেনি সুধার মা। চুপ করেছিল কেলেঙ্কারীর ভয়ে। কলঙ্কের ভয়ে; কিছুটা আর্থিক সংকটের ভয়ে; কিছুটা স্বামীর ভয়ে কিছুটা মেয়ের ভয়ে। সুধা ক্রমশঃ এদিক দিয়ে সকল সংকোচ ফেলে দেবার জন্যেই উদ্যত হচ্ছিল।

এটা এই সময় চোখে পড়েছিল শচী ঘোষের। শচী ঘোষ একজন পুলিশ স্পাই, তেমন দরাজ বড়বাবু হলে—তাঁর জুতোর সুখতলা। শচী ঘোষ পারে না এমন কর্ম নাই। সে ঘটনাটি বলেছিল ওই কনেস্টবল দোস্তকে। মতলব ছিল এই ছিদ্রপথেই তারা সুধার জীবনে প্রবেশ করবে।

ঘটনার দিন ওই ফিরিওলা রাত্রে এসে পণ্ডিতের বাড়ীর পিছনে দাঁড়িয়ে সুধাকে সংকেত দিয়ে ডেকে—তাকে নিয়ে চলে যাবারই চেষ্টা করেছিল। আয়োজনও করা ছিল। রাস্তার উপর একখানা ছইওয়ালা গাড়ীও রেখেছিল সে। কিন্তু সুধা বেরিয়ে আসতেই জেগে উঠেছিল তার ছোট বোন গীতা। সে তাকে আটকাতে চেষ্টা ক'রেও পারেনি। অগত্যা সে ডেকে দিয়েছিল মাকে। মা দরজা খুলে বেরিয়ে গলিপথে মেয়ের অনুসরণ করে তাকে ধরতে চেষ্টা

ওরে। সুধা তাকে ফেলে দিয়েই ছুটে যাচ্ছিল ওই ফিরিওলার পিছু পিছু। হালদার পুকুরের ঘাটে তখন ওৎ পেতে বসেছিল শচী এবং ওই কনেস্টবলটি। ডোলাই মদ খেতে খেতে তারা ব্যাপারটা আঁচতে পেরেছিল।

ছুটেই বেরিয়ে আসছিল সুধা। যাকে বলে লম্বা দ্রুতপদে।

কনেস্টবলটা এগিয়ে গিয়ে সামনে দু-হাতে মেলে দাঁড়িয়েছিল শুধু। ওদিকে কনেস্টবল দেখে ফিরিওলাটা তখন অন্তর্হিত হয়েছে। এদিকে মেয়ের পিছনে পিছনে এসেছিল সুধার মা। সুধা আপনার ছোটার বেগেই এসে পড়েছিল কনেস্টবলটার বুকের উপর। কনেস্টবলটা তাকে বুকের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেয়নি। তখন গভীর রাত্রি। এবং মেয়েটা নিজে অভিসারিকা। তাকে আস্বাদন করতে সে বিলম্ব করেনি। ক্ষুধার্ত পশুর মতই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সুধার উপর।

সুধার মা চীৎকার করে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়ে বেরিয়ে এসেছিল—ছোটদুবোবু। সুকুমার কি দেখেছিল আদালতে কিছুই বলেনি। থানায় বলেছিল শুধু, হুঁয়ে বৈরাগীর বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল থরথর ক'রে।'

মেয়ে চলে যাবার পর সুধার-মা মেজ মেয়ে গীতাকে দিয়ে চিঠি লিখেছিল পুলিশ-সাহেবকে। পুলিশ সাহেব এসে ওদের বাড়ীতে বসেই তার এজাহার নিয়ে-ছিলেন। শুধু সুধার মায়েরই নয় গীতার এজাহারও নিয়েছিলেন।

গীতাই বলে ফেলেছিল—কনেস্টবলটা সুধার উপর বলপ্রয়োগ করেছিল মায়ের চোখের সামনেই—এবং গীতাই বলেছিল—মা সেই দেখেই চিৎকার করেছিল আর নজরবন্দীবাবুর সামনেও বলেছিল—আমার মেয়ের কি গতি হবে.....হে ভগবান! তা নজরবন্দীবাবু বলেছিল—ভয় নাই। আমি কোন কথা প্রকাশ করব না।

সায়েব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—That's it, She tells the truth.

এরপর কেসটা তুলে নেওয়া হয়েছিল পুলিশ বিভাগ থেকে। সুকুমার এটায় খালাস পেল। কিন্তু ডিটেনশন আইনে জেল খাটতে হয়েছিল এক মাস। সে-ও অবশ্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ডিটেনশন। কিন্তু আর তাকে আমাদের এখানে পাঠানো হয়নি। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সারা বাংলা দেশেই ডিটেনশন থেকে সমস্ত বন্দীদেরই মুক্তি দিয়েছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট। তখন খোদ টেগার্টের শাসন চলছে। সুকুমারকে সর্বপ্রথম যাদের ছাড়া হয়েছিল—তাদের সঙ্গেই ছেড়েছিল। সময়টা কখন ঠিক আজ আর মনে নেই। তবে ডিটেনশন থেকে ছাড়া পেয়েই সে একবার আমাদের গ্রামে এসেছিল। আমাদের গ্রামে আমারই বাড়ীতে, আমারই কাছে।

সুকুমারের কিছু জিনিষ গচ্ছিত ছিল আমার কাছে। সেইগুলো নিতে এসেছিল সে।

সেও কিছু কিছু লিখত। সেই লেখা-গুলি আমার কাছে ছিল। আর ছিল তার কিছু সোনার জিনিষ। গহনা কয়েকখানা। গহনাগুলি তার মায়ের।

তার চৌদ্দ বছর বয়সে তার মা মারা গিয়েছিলেন। সেই ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র। আর ছিল দিদি। মৃত্যুর সময় তাদের দু'জনের মধ্যে গহনাগুলি ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। সে কালের সিঁথি আর টিক্‌লি এবং দুগাছি বালা। ছেলেকে দিয়ে বলেছিলেন—"তোর বাবা আবার বিয়ে করবে আমি জানি। এগুলো তোকে দিচ্ছি, তুই যেন বিক্রী করিসনে নষ্ট করিসনে। বিয়ে ক'রে বউমাকে দিস।" এগুলি সে কাছছাড়া করত না কখনও। এখানে এসে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে একদিন আমার হাতে এগুলি দিয়ে বলেছিল—এগুলি আপনাদের বাড়ীর জিনিসপত্রের সঙ্গে রেখে দেবেন। আমার রাজবন্দীর নড়বড়ে দরজা—ভাঙা খিল দুর্গ বা শালা যাই বলুন—এর মধ্যে সব-সময় খুব নিরাপদ নয়। আমি তো দুবেলা বেড়াতে বের হই। বাড়ীটা খালি প'ড়ে থাকে। এ পাড়ার ক'টা ছেলে দেখেছি আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধান পেলে—কে জানে—!

একটু হেসে নিয়ে বলেছিল — ওদের বয়সে আমাদের মনে পড়ে দুপুরে লোকের বাড়ী ঢুকে আমরা আম পেয়ারা চুরি করেছি, আমসত্ত্ব রোদ্দুরে দিলে চুরি করেছি—আচারও—। আমাদের গাঁয়ে যাত্রার দল ছিল —আমাদেরই জ্ঞাতির ঘরে সাজপোষাক থাকত। পরচুলো পরে বসে থাকতাম। আর কাচের মালা চুরি করতাম। মায়ের জিনিষ আমার। আমার বউকে দেব। অবিশ্যি বিয়ে হবে কিনা ভগবান জানেন।

আমি রেখে দিয়েছিলাম। সেই গচ্ছিত গহনাগুলি নিতে এসেছিল। আমি নিজেও বিব্রত ছিলাম মামলাটায় যবনিকাপাত হল, ডিটেনশন আইনে জেল হ'ল এক মাস—তারপর জেলের মেয়াদ শেষ হতেই জেল থেকেই সুকুমারকে পাঠিয়েছিল বাঁকড়োতে। আমি আর দায়মুক্ত হতে পারি নি। এসে-ছিল মাস আষ্টেক পরে তো বটেই। তখন খোঁড়া চক্রবর্তীদের বাড়ীতে বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। সুধা চলে গেছে সেই ফেরিওলার সঙ্গে তার ফলে লোকে বা সমাজে ঘোষণা করে তাকে পতিত কেউ ঠিক করে নি—তবে কাজেকর্মে তাই একরকম দাঁড়িয়েছে। নেমন্তন্ন-টেমন্তন্নের ক্ষেত্রে খোঁড়া চক্রবর্তী গ্রামের বাসিন্দা নয় ব'লে সচরাচর কর্মে তার নেমন্তন্ন হ'ত না। বড় বড় কর্মে হ'ত। চক্রবর্তী ছেলেমেয়েকটাকে নিয়ে খান দুই তিন থালা নিয়ে অবশিষ্ট তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা এবং দুই পুত্রকে নিয়ে হাজির হত'। এবং সাধারণ ব্রাহ্মণদের পংক্তির সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটি স্বতন্ত্র স্থান বেছে নিয়ে খেতে বসত। দু'চারজন বা পাঁচ সাতজনে দশ বিশটা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করত কিন্তু খোঁড়া চক্রবর্তীর গায়ের চামড়া তখন এতই পুরু হয়েছে যে তাকে বিদ্ধ করতে না-পেরে ভোঁতা হয়ে পড়ে যেত।

এই সময় সুকুমার চৌধুরী এখানে ফিরে এল—আমার কাছে গচ্ছিত জিনিষ-গুলি নেবার জন্য। তখন সে ডেটেন্যু নয়। আমার বাড়ীতেই উঠেছিল। দিন দুয়েক থেকেই চলে যাবার কথা। সুকুমার বিচিত্র সুকুমার—। বাংলাভাষায় একটা কথা আছে —ছেলের ছাগল বুড়োর পাগল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানে ঠিক হয় না। তবে এই যদি সত্য হয় যে ছেলেরা ছাগল ভালবাসে এবং বুড়োরা পাগল ভালবাসে তাহ'লে কথাটার মানে হতে পারে। কারণ ওইটেই ওর অর্থ। ছেলে এবং বুড়ো এই দুই বয়সের মানুষের কাছে সমান প্রিয়। সচরাচর এ হয় না। কিন্তু সুকুমারের পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ কাজ ছিল। বুড়োদের আসরে বসে বৈদ্যসন্তানটি কারও নাড়ী ধ'রে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকত দু' মিনিট। তারপর বলত—ডাক্তার যা বলছে বলুক—যে-ওষুদ দিচ্ছে খান—কিন্তু সিন্ধ মকরধ্বজ একমাত্রা ক'রে খাবেন। আর ঋতু-হরিতকী খাবেন শোবার সময়। এবং মাছটাছগুলো আর খাবেন না। বার্ধক্য হ'ল দ্বিতীয় শৈশব। দাঁত উঠলে যেমন দুধ ছেড়ে ভাত দেয় ছেলেকে চিবুবার সামগ্রী দেয় খেতে, তেমনি দাঁত পড়ে গেলে শক্ত জিনিষ ছেড়ে আবার দুধভাতুতে আসতে হয়।

সমাজ নিয়ে তর্ক করত। ওই সুধার কথা নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে গাল দিত বৃদ্ধ-দের।—আপনারা আর মুখ দেখাবেন না। বড়াই করে বড় বড় কথা বলবেন না। এমনি একটা মেয়ে দেখতে মেয়েটা ভাল ছিল, লেখাপড়া করছিল। সেই মেয়ের পাত্র জুটল না। আপনাদের হিঁদুর ছেলেরা প্রেম করবে—দেহ ভোগ করে সরে পড়বে। বেশ করেছে সে—চলে গেছে অন্য জাতের সঙ্গে। সে ওকে বিয়ে করে ঘরে নেবে। এ-সমাজ আপনাদের থাকবে ভেবেছেন!

আবার ছেলেদের সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়ে জুটল দু'-তিনদিন। এই ক'দিনে নজরবন্দী সুকুমারকে যতটুকু দেখতে পাইনি, সেটুকুও দেখে সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাড়ী বাড়ী গেল দেখা করলে।

খোঁড়া চক্রবর্তী এল। তাকে সুকুমার পাঁচটা টাকা দিলে। বললে, আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন।

চক্রবর্তী-স্ত্রী এসেছিল গীতাকে সঙ্গে নিয়ে। গীতা তখন তের পার হচ্ছে-হচ্ছে। রোগা দেখতে, মাথায় লম্বা, পিঙ্গলবর্ণা—চুলগুলিতেও পিঙ্গলাভা, গীতা একটু বেশী লম্বা বলেই কোলকুঁজো হয়ে নুইয়ে পড়েছে। ১৯২৮ সাল তখন। আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তখনও সায়া-ব্লাউজ ওঠেনি। সম্পন্ন ঘরের বউয়েরা সাধারণত সেমিজ পরত, নেমন্তন্ন বাড়ী যেতে হলে সেমিজের উপর বডিজ পরত। পাতা কেটে চুল বাঁধার যুগ। তাও বিকেলবেলা। সাধারণ ঘরে শুধু একখানা কাপড়ই ছিল

মেয়েদের সব অর্থাৎ বেশও বটে বাসও বটে। ভূষার মধ্যে শাঁখা বুলি। বড়ঘরের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, তখন বেশে যতই থাকুক সোনার গয়নার তখন রেওয়াজ যথেষ্ট। একহাতে সোনার চুড়ি থেকে নাকে কানে হীরে এবং বুনি পর্যন্ত। গীতার পরনের বস্ত্রখানি শুধু মলিনই ছিল না, কিছু ছেঁড়া ছিল। সেলাইগুলি প্রকট হয়েছিল। মেয়েটা সদা উদ্ভিন্ন যৌবনের সঙ্কোচে কুঁজো হয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করেছিল।

সুকুমার ওকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—এ যে মস্ত বড় হয়ে উঠেছে আয়ে বাপরে

পণ্ডিতের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর থেকে বলেছিল—ওর ভাবনাই তো ভাবনা আমার এখন। একটি ভাল ছেলেটেলে দেখে যদি আপনি ওর ব্যবস্থা করে দেন বাবা—

সুকুমার বলেছিল—দেখব আমি নিশ্চয় দেখব। তবে মেয়েরা শুধুই বিয়ের জন্যে —এটা ঠিক নয়। মেয়েরাও পুরুষদের সমান কাজ করতে পারে।

একটা দীর্ঘ বক্তৃতা সে দিয়েছিল।

অবশেষে ওদের জন্যে একটা ব্যবসা পত্তন করে দিয়ে গিয়েছিল। আগেও বলেছি আবারও বলছি সুকুমার আশ্চর্য। অনায়াসে একটি সহজ ব্যবসা ওদের জন্য পত্তন করে দিলে; মুখে মুখে লাভ-ক্ষতি খতিয়ে নিশ্চিত লাভ দেখিয়ে দিলে।

পৈতের ব্যবসা ধূপকাঠির ব্যবসা, আর চরখায় সুতো কাটার কাজ জুড়ে দিলে তার সঙ্গে। বেশী নয়—বোধ করি শ'-দেড়েক টাকা সে একটা দোকানে দিয়ে বলে গেল—ধারে মাল দেবে সে-ধার শোধ করলে আবার দেবে। অর্থাৎ মূলধনটা ভাঙবে না। আর খোঁড়া পণ্ডিতের জন্যে গ্রামের লাইব্রেরীতে বন্দোবস্তে সাত টাকা মাইনের কেরানীর কাজ জুটিয়ে দিলে।

তারপর চলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে পৈতে এবং ধূপকাঠি কেনার জন্য দুটো মেয়ে আর দুটো ছেলের তাগাদায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা খুব বেশীদিন স্থায়ী হল না। কারণ ওদের মূলধন দেড়শো টাকা—ওই পাঁচটা ছেলেমেয়ে এবং চক্রবর্তী স্বামী-স্ত্রীর কাছে কতদিন অটুট থাকতে পারে?

ইতিমধ্যেই কানে আসতে লাগল—খোঁড়া চক্রবর্তীর বাড়ীর সামনে এবং আশপাশটা কিছুটা চঞ্চল বা উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

পল্লীগ্রামের পথ বা ঘাটের পাশে যে জঙ্গলগুলি থাকে মধ্যে মধ্যে সেইগুলির আশেপাশে মৌমাছি-ঝাঁক উড়তে দেখা যায় এবং তখনই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় জঙ্গলটার দিকে এবং বাতাসের মধ্যে নাকও সচেতন হয়ে ওঠে। বোঝা যায় ফুল ফুটেছে।

একদিন চক্রবর্তীর স্ত্রী গীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এল। গ্রামের একটি অতি অভদ্র ব্রাহ্মণ-তনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। ছেলেটি মদ্যপ, ব্যভিচারী, বিবাহিতও বটে তার দাবী গীতার দিদি সুধা যখন ভিন্নজাতের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তখন সে স্বজাতি ব্রাহ্মণ এবং এ-গ্রামের প্রাচীন বংশের ছেলে, তার সঙ্গে গীতা সহকারের সঙ্গে লতার মত জড়িয়েই বা থাকবে না কেন? কোন্ শালাকে কি ভয়?

আমাকে বললে চক্রবর্তীর স্ত্রী—এর কি কোন উপায় হবে না বাবা? ওদিকে ওর বাবা কোথায় কোথায় যেন কি করছে—কার সঙ্গে গীতার বিয়ের কথা বলছে—। বিয়ে না ছাই বাবা। মেয়েটাকে বিক্রী করবে শুনেছি।

আমি তাকিয়েছিলাম গীতার দিকে। আরও ছমাস চলে গেছে, এর মধ্যে শত অভাব-অনটনের মধ্যেও গীতার রূপ হয়েছে বসন্তের মাধবীলতার মত। মাধবীর কচিপাতার যে চিকনতা রৌদ্রের ছটায় ঝিকমিক করে, তেমনিই একটি ঝিকিমিকি যেন ওর সেই পিঙ্গলবর্ণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিঙ্গলবর্ণটা কোন যাদুতে ওই চিকনতা নিয়ে মাখন বর্ণের মত বর্ণ ও কোমল আভাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে তার রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হয়েছে। চোখের পাতাদুটো এত ভারী হয়েছে যে, সে আর চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সমস্ত দেহখানায় একটা পুষ্টি যেন সে বাতাস আর আলো থেকে পাচ্ছে। হাতের বাঙ্গিদুটো নিটোল হয়ে উঠেছিল।

বললাম—ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?

চক্রবর্তীর স্ত্রী বললে—কার কাছে রেখে আসব বাবা? ছেলেদুটো বাউণ্ডুলে হয়েছে। কি করব, বিড়ি বাঁধতে দিয়েছি—বিড়ি বাঁধে। তাদের ছোট মেয়েদুটোর একটা হাবলি। একে রেখে আসব কার কাছে? ওর বাবা একটা ছুরি নিয়ে রাখে চব্বিশ ঘণ্টা। কোথা কি হবে? তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

চমকে উঠলাম। বললাম—তুমি ছুরি রাখ কাছে?

গীতা মুখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে অকারণে পাকা মেঝে খুঁড়তে চেষ্টা করছিল। সে তেমনিভাবেই বললে—হ্যাঁ।

বললাম—দেখি।

দেখালে সে। সেটা এমন ছোরাছুরি কিছু নয়, নেহাতই কাঠের বাঁট-লাগানো দেশী কামারের গড়া আঙুল-তিনেক লম্বা একটুখানি একট ছুরি। অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি লম্বা। আগে এই ছুরি দিয়ে পৈতেসল কাটা হত। কলম কাটা হত। পণ্ডিতরা রাখত, জমিদারী সেরেস্তায় থাকত। আমি চিনতাম।

বললাম—বলে দেব আমি।

* * * *

বিচিত্রভাবে কালের গুণে গীতার ভাগ্য পাল্টালো। গীতা পাল্টালো। গোটা গাঁয়ের লোক বিস্মিত হয়ে গেল।

ঃ ১৯২৯ সালের পুজোর পর; ১৯৩০ সালের আগমনী তখন বাজতে শুরু করেছে। একটা ঋতুর অন্তে আর একটা ঋতু আসবার সন্ধিক্ষণে তার প্রভাব যেমন আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করি তেমনি করেই ব্যাপারটা অনুভব করছি। এমনি দিনে একদা সুকুমার বাঁড়ুয্যে এসে হাজির হল। এল, উঠল আমারই বাড়ীতে। বললে —এখানে কবিরাজী করব। বাপের ছেলে—ডাক্তারী পড়েছি পাঁচ বছর, ছেড়েছিলাম—ডাক্তারীটা পাশ করব কিন্তু না—সে থাক। ঠিক করেছি কবিরাজী করব। এবং এইখানেই করব।

মনে পড়ছে আমি এবং সে দুজনে গোটা গ্রাম ঘুরে সকলকে কথাটা বলে এসেছিলাম।

বাজারে একখানা কোঠাবাড়ী ভাড়া নিয়ে সুকুমার বাঁড়ুয্যে ওষুধের আলমারি, তক্তাপোষ, টেবিল চেয়ার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে পড়ল। খোঁড়া চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে খান-চারেক বাড়ীর পর একখানা কোঠাবাড়ী; পাকা মেঝে; চুনকাম-করা দেওয়াল; সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলে—"ভারত আয়ুর্বেদ ভবন"।

তার ঠিক পাশে না-হলেও বাড়ীটার আর একটা ঘরের দরজার মাথায় আরেকটা বোর্ড ঝুলল—তার নাম হল—"স্বদেশী ভাণ্ডার"। খদ্দর পাড়ী ধুতি জামার কাপড় তৈরী জামা দেশী কালি পেন্সিল পাওয়া যায়।

আমাকে সুকুমার বললে—গুছের পেশেণ্ট আসছে। এটাকে তার সেণ্টার করব। লেগে পড়ুন আমার সঙ্গে। যা আমিই এসেছি আপনাদের সঙ্গে লাগাতে।

সুকুমারের কম্পাউণ্ডার হল খোঁড়া চক্রবর্তীর বড় ছেলেটা, গীতার ছোট দাদা। তখন তার বয়স বছর-তের হবে। সঙ্গে রইল খোঁড়া নিজে। আর সুকুমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলে চক্রবর্তী বাড়ীতে। দিনে সুকুমার এসে খেয়ে যেত। রাত্রে ওই ছেলেটা টিফিন-কেরিয়ারে করে পৌঁছে দিয়ে আসত। কিছুদিন পর দেখা গেল—ওই স্বদেশী ভাণ্ডারে—গীতা বসছে সেল-গার্ল হয়ে। শুধু সেল-গার্ল নয়—দেখতে-দেখতে প্রচারিকা হয়ে উঠল সে। গোটা গ্রামটায় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চক্রবর্তী-গৃহিণী তার জন্য আর শঙ্কিত হলেন না।

সকল শঙ্কা কাটিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াতে লাগল মেয়েটা নির্ভয়ে।

১৯৩০ সাল এল।

সুকুমার জেলে গেল, আমি গেলাম, আরও অনেকে গেল। ১৯৩০ সালের কথা যাদের বিশেষ করে মনে আছে তাঁরা মনে করতে পারবেন—আমাদের জেলায় অন্তত। মেয়েরা জেলে যায়নি। পুলিশ বিভাগও এদিক দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে। তারা মেয়েদের এ্যারেষ্ট করেনি। গীতা জেলে যায়নি। তবে যতজন জেলে গিয়েছে, তাদের ফুলের মালা পরিয়ে সব গ্রামের মেয়েদের বিভাগের মিছিলের আগে থেকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে। সেদিন

একসাইজ শপে পিকেটিংয়ের জন্য ছেলে-দের ধরে এনে বেত মারলে, সেদিন দলবল নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল থানায় প্রতিবাদ জানাতে।

মুভমেণ্ট ঠাণ্ডা হল। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষের কথা হতে লাগল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সকলে খালাস পেলে। গীতা স্বদেশী ভাণ্ডার চালাচ্ছিল। স্বদেশী ভাণ্ডার সার্চ হল ক'বার কিন্তু হল না কিছু। তাতেও ভাণ্ডারের ক্ষতি হল না। ভাণ্ডার ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত জেঁকে উঠল। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে চালিয়ে-ছিল গীতা। সুকুমার জেল থেকে খালাস পেয়ে এখানেই এল। তখন সে খুব অসুস্থ। কিছুদিন থেকে সে সারল। তারপর আমাকে বললে—আমাকে কিছু জমি দিন। টাকা আমি দেব। বাগান করব, পোলট্রি করব—চাষ করব।

জমি আমি তাকে দিয়েছিলাম। লোকটা পারঙ্গম—সে বীরভূমের লাল কাঁকর পাথর-ভরা মাটিতে গোলাপ ফুল ফুটিয়েছিল। চক্রবর্তীর গোটা পরিবারটা তার সঙ্গে খেটেছিল। তারপর সুকুমার একদিন চলে গেল। শেষের দিকটায় যাচ্ছিল আসছিল, যাচ্ছিল আসছিল; ক্রমে বেশী বেশী দিন বাইরে থাকছিল। তারপর একদিন আসা বন্ধ করলে।

খোঁড়া চক্রবর্তী মরল। ছেলেদুটোর বড়টা একটা হ্যাতা মেয়েকে নিয়ে পালাল। ছোট মেয়েদুটোর মধ্যে বড়টা—যেটা ছিল হাবলি, সেটা মরেছে অপঘাতে। হত্যা বলা চলে। গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিছল। চারদিন পর খবর পাওয়া গিছল মেয়েটা জঙ্গলের ভিতর মরে পড়ে আছে। তার পাশে একটা মৃত ভ্রূণ। একেবারে ছোট-বোনটা মরল কি একটা রোগে। সামান্য অসুখ। অনাহার জীর্ণ এবং তার উপর অমিতাচারে অপব্যয়িত দেহখানা ফাটা কাঁচের বাসনের মত অল্প গরম জল পড়তেই দুখানা হয়ে গেল। বাকি রইল একটা ভাই—সে বিড়ি বাঁধত। তার মা ভিক্ষে করত। একলা গীতা কেবল এরই মধ্যে কোনরকমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে প্রাইমারী স্কুলের সবথেকে ছোট মাস্টারণী হয়েছিল। মেয়েটি ছিল সুন্দরী। সে-সৌন্দর্য রূপের একটি মহিমা পেয়েছিল একেবারে প্রথম যৌবনে। সেটি দিন দিনে রূপ এবং মর্যাদার মহিমায় গরিমাময়ী হয়ে উঠেছিল ১৯৪০-৪২ সাল পর্যন্ত। সে হাতে সেলাই খদ্দরের ব্লাউস সাদা-শাড়ী পরে বইয়ের গোছা নিয়ে প্রাইমারী স্কুলে যেত, কোনদিকে তাকাতো না। তার যৌবন এবং স্বাস্থ্য—এই দুটিই যেন একটি অজ্ঞাত উৎস থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে অটুট ছিল।

অনেক লোকে অশ্লীল মন্তব্য করত। তাকে বিয়ে করবার জন্য গ্রামের জন-কয়েক ছেলেই প্রায় পাগল-গোছের হয়ে-ছিল। চিঠি লিখেছে – আত্মীয়দের পাঠিয়েছে। আত্মীয়া সঙ্গে করে নিজেরা এসেছে। এর মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে ছিল—চাকরে ছিল। দু'-তিনজন মাস্টারমশাইও ছিলেন। কিন্তু গীতার সেই এক কথা—না।

বেশী জোর করলে বলেছে—বিয়ে আমি করব না। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

* * * *

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট অকস্মাৎ সুকুমার চৌধুরী এসেছিল আমাদের গ্রামে। আমাদের গ্রামের স্বাধীনতা উৎসব একে-বারে অমিত উৎসাহে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সুকুমার একলা আসেনি। সস্ত্রীক এসেছিল। একদিন থেকেই চলে গিয়েছিল। সুকুমার পতাকা তোলার সম্মান দিয়েছিল গীতাকে। ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যা-বেলা সুকুমার চলে গেল। রাত্রে কপালে একটা আঘাত পেয়েছিল সে। ভুরুর উপরটা কেটে গিছল। সেইটের জন্যে মুখটা খানিকটা ফুলেছিল এবং যন্ত্রণা হচ্ছিল বলেই চলে গিছল। আমরা আটকাইনি।

এরপর ১৯৪৮ সালে সুকুমার আর একবার এল। এবার সে একা। তার স্ত্রী নেই—সে মারা গেছে।

বলেছিল—আবার থাকব বসে এলাম। কবিরাজী করব। পোলট্রি ফার্মিং বাগান। আর নড়ব না কোথাও। এবং স্ট্রিক্টলি ব্যবসাদার মানুষ হব। পৃথিবীতে মানুষের উপকার বা মানুষের সেবা করতে কোনদিন চেষ্টা করব না। গীতাকে একটা খবর দেবেন। আমি এসেছি।

গীতা তখন আর এক গীতা।

পুরনো গীতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কথায় বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং।—নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়ই বটে। কিন্তু তা দিয়েও গীতার চরিত্রের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের কোন হদিসই মেলে না। ১৯২৭ সালে যে-মেয়ের বয়স ছিল ১২ বারো, ১৯৪২-৪৩ সালে যার বয়স ছিল আটাশ-ঊনত্রিশ এবং সেই আটাশ-ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে যার রূপ এবং যৌবন একটি দুর্লভ সুষমা এবং আকর্ষণীয়তায় মনোরমা ও লোভনীয়া ছিল—যার মন ভালঘরের ছেলে, শিক্ষিত পুরুষ, মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের প্রার্থনায় টলে নাই, সেই মেয়েটার যে কি হল কে জানে, হঠাৎ ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুর ক'দিন আগে বিয়ে করে বসল ওদেরই স্কুলের প্রবীণ পণ্ডিতমশাইকে। বছর-পঞ্চাশের উপরেই বয়স—সম্প্রতি বিপত্নীক হয়েছেন—সন্তান-টন্তান নেই; বাড়ী আমাদের ঠিক পাশের গ্রামে। এবং এই কয়েক মাসে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ মাসের মধ্যে মেয়েটা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ আলাদা এক মেয়ে। কোথায় গেল তার মাস্টারণীর ছাপ, কোথায় গেল সভা-সমিতিতে অংশ নেওয়া, কোথায় গেল তার সেই পরিচ্ছন্নতা, সে হয়ে উঠল আর পাঁচটা গাঁয়ের বউবেচারীর মত একটি বউবেটী। কথাটা মিথ্যে বলিনি—সে বেটীও বটে, বউও বটে। আমাদের পাড়ার পরের পাড়ার বেটী—তার ওপাশে যে-বসতিটা খানকয়েক ধানজমির পরই—সেটা নামে অন্য গ্রাম হলেও, সেটা এই গ্রামেরই পাড়া হিসেবে গণিত হয়। শুধু তাই নয়, দেখতে দেখতে মেয়েটার মুখে যে একটি প্রসাধনের শ্রী ছিল, সেটা যেন মুছে গেল। বেশ একটু শীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু শীর্ণ হলেও প্রসাধনের মার্জনার শ্রী না-থাকলেও, আর একটি অনির্বচনীয় শ্রী তার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল। অনেকের এটা চোখে ধরত না। একালের চোখ যাদের, তারা তেলচকচকে মুখ, মোটা করে সিঁদুরের মাড়ুলী-আঁকা কপাল, ফেরতা-দিয়ে কাপড় পরার বদলে পুরনো-কালের ঢলকো করে কাপড় পরা—তাকে তাদের ভাল লাগত না।

আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম —গীতা, তুই বিয়ে করলি তো—। বাকিটা বলতে পারিনি।

সে বলেছিল—শঙ্করকাকা, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। তা যদি না মান তো বলি বুড়োকে সত্যি মায়া হল—আর ওই লোকটি আমাকে যে কি ভালবাসাই বাসত'! আমি হেঁটে গেলে ও বুক পেতে দিতে পারত। ছেলেপুলে নেই। যেদিন বউ মরে গেল সেদিন ওর কি কান্না। ছোট ছেলের মা মরলেও ছেলে এত কাঁদে না!

যাক। কথা সুকুমারকে নিয়ে, গীতাকে নিয়ে নয়।

১৯৪৮ সালের সেটা পুজোর পর; নভেম্বর মাস। সুকুমার এল। তার স্ত্রী মারা গেছে। এবার সে স্থির করেছে এখানে এসে বাকি দিনগুলো এখানকার দীন-দুঃখীদের চিকিৎসার সেবা করবে—আর ওই জমিতে ফার্মিং পোলট্রি ইত্যাদি করবে। বললে—গীতাকে একটু খবর দেন। তার সাহায্য আমার দরকার হবে।

আমি বললাম গীতার কথা। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—বিয়ে করেছে? বুড়ো পণ্ডিতকে?

—হ্যাঁ।

—তবু একটা খবর দিন। বলবেন, যাব তার বাড়ী সন্ধ্যেবেলা।

লোকটা ফিরে এল, সঙ্গে এল বুড়ো পণ্ডিত, পণ্ডিত নমস্কার করে শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সুকুমারকে বললে—আপনাদের দুজনকে আমাদের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ওর বড় ইচ্ছে।

রাত্রে খেতে বসে আয়োজন দেখে অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম। তার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেটা সেদিন কোন অর্থই বহন করেনি আমার কাছে, আজ তার একটা অন্য অর্থ পাচ্ছি। সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ওঃ, ভুরুর কাটা দাগটা তো অনেকটা হয়ে থেকে গেছে? সেদিন তাহলে অনেকটা কেটেছিল।

তারপর নমস্কার করে বলেছিল—এখন দীক্ষা নিয়েছি। বামুনের মেয়ে বামুনের বউ। আজকার বিদ্যি আপনি—আপনাকে দাদা বলে ডাকি, তা-বলে প্রণাম করতে পারব না। —বসুন। একেবারে জায়গা করা ছিল।

সেখানে বসিয়ে খাবারের থালা দুখানা সামনে ধরে দিয়ে পাখা হাতে বসেছিল।

জিজ্ঞাসা করতে বসেছিল—নানান খবর। সুকুমারের মৃতা স্ত্রীর খবরই বেশী। ওর সঙ্গে বিয়ে হ'ল কি ক'রে। প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন? না বাড়ীর গার্জেনরা দিয়েছিল—এই ধরনের অনেক প্রশ্ন।

সুকুমার এ প্রশ্নে ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। যাবারই কথা। আমি ইসারা করে গীতাকে বারণ করেছিলাম—এ সব জিজ্ঞাসা করো না। কিন্তু ঠিক শোনে নি সে।

খেয়ে আঁচিয়ে উঠলাম—পণ্ডিত আমাদের একখানি নতুন তোয়ালে দিল মুখ মুছতে। সবিনয়ে বললে—নতুন, ব্যবহার করা নয়।

পান নিয়ে এসে দাঁড়াল গীতা। পান দিয়ে বললে—আপনি এখানে নাকি আবার প্র্যাকটিস করব বলে এসেছেন—সুকুমারদা?

সুকুমার বলেছিল—ভাবছি।

'না'। একটা এমন কঠিন 'না' শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল ওই মেয়েটির কণ্ঠ থেকে যে, আমরা দুজনেই চমকে না উঠে চকিত হয়েছিলাম এবং বিস্মিতও হয়েছিলাম। সে 'না' যেন অলঙ্ঘনীয় 'না'।

* * * *

সুকুমার চলে গিয়েছিল সেদিন। তারপর তার আর কোন সন্ধান পাই নি। দীর্ঘ এত বৎসর পর—এটা ১৯৬০ সাল—১৯৪৮ সালের বারো বৎসর পর—হঠাৎ এই রেজেস্ট্রী প্যাকেটটা এল। জানতে পারলাম সুকুমার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল—নাম নিয়েছিল সেবানন্দ ব্রহ্মচারী। উত্তরপ্রদেশের এক কৃশ্চান মিশন হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে এই দলিল রেজেস্ট্রী করে আমার কাছে পাঠিয়েছে। ওই যে পাঁচ বিঘে জমি এবং ওই যে বাড়ীটা সে কিনেছিল সে সবই সে দান করে গেছে গীতাকে। পড়ে চোখে জল এসেছিল।

দানপত্রখানা হাতে করে গেলাম গীতার বাড়ী। গীতা বিধবা হয়েছে। গীতা আজও যুবতী। বিধবা হয়ে এই পরিণত যৌবনে ৪৪ বৎসর বয়সে তার রূপ যেন আরও বেড়েছে। দু'একগাছি রুপোলী রেখাও তার মাথায় দেখা যায় না। মুখে এখনও রেখা পড়ে নি। দেহে মেদ হয় নি। ফিতেপাড় কাপড়ে এবং সরু-বর্ডার-দেওয়া-হাতা ব্লাউসে খুব চমৎকার দেখায় তাকে। তার কাছে গিয়ে বললাম—দুঃসংবাদ আছে গীতা।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে—সুকুমারবাবু মারা গেছেন?

—তুমি কেমন করে জানলে

—একখানা চিঠি পেয়েছিলাম—তাঁর অসুখ করেছে।

—হ্যাঁ। সে আর নেই।

—দানপত্র পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ।

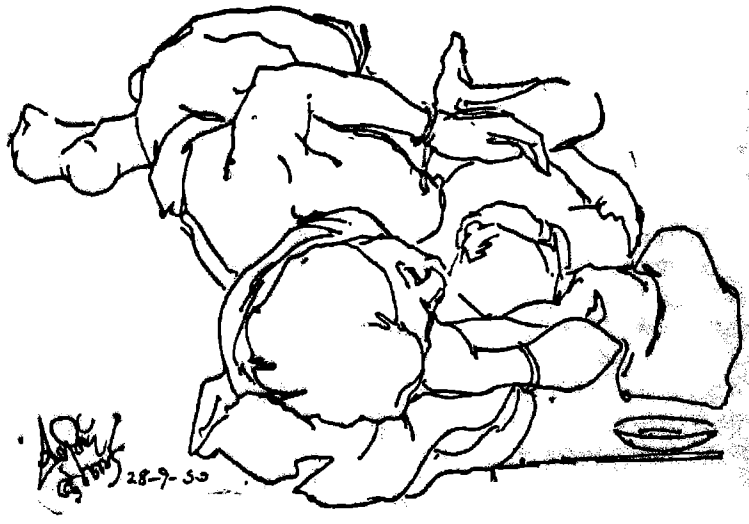

—আমি পাঠাতে বারণ করেছিলাম। অনুমান করেছিলাম হয়তো আপনার নামে পাঠাবে। ভেবেছিলাম বারণ করব আপনাকে—রেজেস্ট্রী এলে নেবেন না। কিন্তু ভাল লাগে নি।

একটু চুপ করে থেকে বললে—লোকটিকে প্রথম মনে হয়েছিল—দেবতা। তারপর মনে হয়েছিল—ভগবান বুঝি ওকে আমার জন্যেই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। গত জন্মে তপস্যা করেছিলাম কোন সাধু তপস্বীকে জীবনে পাবার জন্য—তাই এ জন্মে আমাকে ক'রেছে গরীবের মেয়ে আর ওকে করেছে—দেশের সেবক। তারপর দেখলাম—একটা লোভী কুকুর—

বলে উঠলাম—ছি!

হেসে সে বললে—বেশ তবে একটা কাপুরুষ—একটা ইতর—একটা—মানুষের চেহারায় পশু—।

চোখদুটো ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলে উঠল তার। আজ আপনাকে লুকোব না শংকরকাকা। স সে মি রা বলে একটা গল্পে আছে — বিক্রমাদিত্যের রাণী ভানুমতীর একখানি ছবি এঁকে এনেছিলেন এক চিত্রকর। সে আমলের ছবি। তার পরনের কাপড় ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে কাপড় এত স্বচ্ছ যে সর্বাঙ্গের সবটুকুই দেখা যাচ্ছিল। সকলেই যখন মুগ্ধ তখন কালিদাস বলেছিলেন জংঘায় একটি তিল থাকা উচিত। বিক্রমাদিত্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাণীর জংঘার তিলের কথা কালিদাস জানে কি ক'রে! গল্পটা আপনি জানেন। শংকরকাকা, এই জনসেবকটি একদিন আমার মুকুলিত যৌবন দেখে রূপ দেখে করজোড়ে আমার কাছে এসে আমাকে ভিক্ষা চেয়েছিল। আমাদের অনেক সেবা করেছিল। গোটা সংসারকে বাঁচাতে চেয়েছিল। আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। তাকে অদেয় কিছু ছিল। কাকা তাকে আমি নিজেকে দিতে চেয়েছিলাম। সে নিতে চেয়েও নিতে পারে নি। আমার জন্যেই সে এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছিল। আমার জন্যেই স্বদেশী ভাণ্ডার করেছিল। আমাকে পড়িয়ে পাশ করেছিল। সে আমার কাছে বাপের ভক্তি চাইলে আমি খুশী হতাম না। সে আমার কাছে আমার দেহ চেয়েছিল—আমি তাকে তা দিতে চেয়েছিলাম। এই কাপুরুষটি আমার এই দেহখানার কোথায় কোন তিলটি আছে—তা জানে। কিন্তু যা নিলে সব নেওয়া হয় তা নেয় নি। নিতে সাহস করে নি। আমার সর্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে হাত দিয়ে আহার করেছে। আপনি ভাবুন আমি অনাহত বিবশ তনু হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। জানতাম একদিন সে আমাকে গ্রহণ করবে।

আমাকে বলেছিল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হোক—তখনই তোমাকে আমি গ্রহণ করব। কিন্তু—। কিন্তু সেই দিনই লোকটা এল এখানে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করে।

বিচিত্র হেসে বললে—জানেন লোকটার ইতরতা—লোকটা ১৫ই আগস্ট গভীর রাত্রে আমার বাড়ী এসে আমাকে চেয়েছিল। আমি তার কপালে মেরেছিলাম হাতের পেতলের বালা দিয়ে ভুরুটা তার ফেটে গিয়েছিল। তারপর তুলেছিলাম ছুরি। তখন পালিয়েছিল। আপনি ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যান কাকা। লোকটার অতিবড় দুর্ভাগ্য যে সারা জীবনটাই মুখোস প'রে কাটাল। কোনদিন আয়নায় দেখলে না নিজে দেখতে কেমন।

আমার মনে হল — ঘরের কোণে বুঝি সুকুমারের প্রেতাত্মাটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছে। বলছে—ক্ষমা কর তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

রাবনের সিঁড়ি

অন্নদাশঙ্কর রায়

বন্ধুজায়ার চিঠি জীবনে কোনোদিন পাইনি। এই প্রথম। হকচকিয়ে গিয়ে আত্মজায়ার হাতে দিয়ে বলি, 'তুমি পড়। তোমাকেই লিখেছেন মনে হয়।'

খামখানা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে যান উনি। বলেন, 'না, আমাকে নয়, তোমাকেই। তবে ভদ্রতার খাতিরে আমাকেও যেতে বলেছেন। নাও, পড়।'

আমার বন্ধু সোমদেবের এখন এমন অবস্থা যে সে নিজের হাতে লিখতে পারে না। তাই লিখেছেন বন্ধুজায়া মঞ্জুরাণী। শুনেছিলাম বেচারা পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। খুঁটিনাটি জানতাম না। শুধু একটা পোস্টকার্ড লিখে সমব্যথা ও শুভকামনা জানিয়েছিলুম। তারই বিলম্বিত উত্তর এ চিঠি।

লিখেছেন ও নাকি প্রায়ই আমার নাম করে। বোধহয় কিছু বলতে চায়। আমি যদি দয়া করে একবার দেখতে আসি তো ওঁরা বিলক্ষণ সুখী হন। আরো সুখী হন যদি ইরা দেবীও আসেন। চিকিৎসার ত্রুটি নেই যদিও, তবু কিছু বলা যায় না। মেরুদন্ডে চোট। অপারেশনের প্রস্তাব উঠেছিল। ও কিন্তু রাজী হয়নি।

'কী দুঃখের কথা!' ইরা হতবাক হন।

'হাঁ তবে অপারেশন হলে ও হয়তো সেরে উঠবে। দেখি যদি ওকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি।' আমি আশা দিই।

'অপারেশন হলে নয়, অপারেশন সফল হলে। ও ঝুঁকি নেবে কে? তুমি? ওসব সিদ্ধান্ত ওঁদের উপর ছেড়ে দিয়ে এমনি একবার দেখা করে এস। কতকালের বন্ধু!' ইরা কলকাতা যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু সস্ত্রীক নয়।

'বন্ধু বলে বন্ধু। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। 'পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করে কেউ? করলুম কার যুক্তি শুনে? কেমন অকাট্য যুক্তি! বলেছিল, ছেলে হলে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পঁচিশ বছর লাগে। মেয়ে হলে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার বিয়ে দিতে একুশ বছর লাগে। তা হলে তোমাকে এমন বয়সে বিয়ে করতে হয় যখন বিয়ে করলে তুমি ঝাড়া হাত পা নিয়ে রিটায়ার করতে পারবে। নইলে পেনসনের টাকায় কুলোবে না। তোমার মরবার স্বাধীনতা থাকবে না। ওঃ কত বড়ো একটা আর্যবাক্য!'

'কই, একথা তো কোনোদিনই বলনি!' ইরা শুনে অবাক।

'ওঃ কত বড়ো একজন প্রোফেট! দেশ ওকে চিনল না। কিন্তু ও যা চেয়েছিল ও তা পেয়েছে। সময়ে বিয়ে, সময়ে ছেলেমেয়ে, সময়ে তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ। ওর এখন ঝাড়া হাত পা। বাড়ীও করেছে কলকাতায় —বালীগঞ্জ অঞ্চলে। সব ভালো। মন্দ কেবল এই যে বেচারা এখন শয্যাশায়ী। কে জানে, এটাই হয়তো শেষশয্যা। মেরুদন্ডে চোট। হায় ভগবান!' আমি বিমর্ষ হই।

আমরা দুই বন্ধু সমবয়সী। ও যদি অকালে চলে যায় আমিও কি

বেশীদিন বাঁচব! এটা তো আমাকেও নোটিশ দিয়ে বলা যে, অদ্রীশ-চন্দ্র, তোমারও দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মরবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? ছেলের চাকরি জোটেনি, মেয়ের পাত্র মেলেনি, বাড়ীও করনি যে তোমার অবর্তমানে তোমার স্ত্রী সেখানে আশ্রয় নেবে।

'অপারেশনের ভাবনায় তুমিও নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি?' ইরা আমাকে তাড়া দেন। 'যেন সমস্যাটা সোমদেবের নয়, তোমার নিজের।'

সমস্যাটা কেবল সোমদেবের নয়, আমার তোমার, সব মানুষের। কিন্তু কী করে বোঝাই সেকথা! মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন ছিল, যাতে আমাকে অমৃত করবে না কী করব আমি তা নিয়ে? আর আমার প্রশ্ন হলো, বেঁচে কী হবে যদি মরবার স্বাধীনতা না থাকে?

(২)

মডার্ন আসবাবে ভরা মডার্ন ডিজাইনের বাড়ী, তারই একপ্রান্তে একটা খালি ঘরের মেজেয় ঢালা বিছানায় শুয়ে আমার বন্ধু সোমদেব। এককোণে একটা ক্যাম্প-খাটও ছিল, সেটা ওর চিরসাথী। সেটল-মেন্টের শিবিরে আমরা দুই বন্ধু যখন একই তাঁবুতে থাকতুম তখন দু'জনের ছিল দুই ক্যাম্পখাট। আমি সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি, ও কিন্তু কোনোদিন ছাড়েনি। কলেকটরের কুঠিতে, কমিশনারের ভবনে যখনি যতবার ওর অতিথি হয়েছি ততবার লক্ষ করেছি সোমদেব শোয় ওর সেই পুরোনো ক্যাম্পখাটে।

ঢালা বিছানার একপাশে বসে ওর এক-খানা হাত আমার হাতে টেনে নিয়ে রাখি। বলি, 'সেরে উঠে আবার তুমি ওই ক্যাম্প-খাটে শোবে, দেখে আমার দু চোখ জুড়োবে।'

'সেরে ওঠা আমার হাতে নয়, অদ্রীশ! তবে কেওড়াতলায় যাবার সময় ওই ক্যাম্প-খাটই আমার বাহন হবে।' সোমদেব বলে মমতার সঙ্গে। পুরোনো সৈনিকের যেমন পুরোনো ঘোড়া পুরোনো অফিসারের তেমনি পুরোনো ক্যাম্পখাট।

এমনি দু'চার কথার পর আসল ব্যাপারে আসি। ঘটনাটা ঘটল কবে আর কী করে? এখন তো ওকে আর ঘোড়ায় চড়তে হয় না। পড়ল কিসের থেকে?

'ঘোড়ায় চড়ার পাট কি আর আছে হে, অদ্রীশ? সেক্রেটোরিয়াটে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। সারাদিন চেয়ারে চড়ে কাটে। তার-পর মোটরে চড়ে বাড়ী ফিরি। এমন কার আমার তো বাত হবার দাখল একজন পরামর্শ দিলেন যৌগিক আসন করতে। চমৎকার পদ্ধতি। রোজ কিছুক্ষণ শীর্ষা-সন করি। সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। শরীর তাজা থাকে। শেষে আমিই কতজনকে যৌগিক আসনের পাঠ দিই।' সোমদেব গর্ব করে বলে। তার মুখে চোখে আত্মপ্রত্যয়ের আভা।

'শুনেছি তুমি মাথার উপরে দাঁড়াতে সিদ্ধহস্ত। না, না, সিদ্ধমস্তক।' আমি তামাশা করে বলি। 'যেমন জবাহরলাল।'

'তাঁর দেখাদেখি মন্ত্রীরাও এখন মাথায় দাঁড়াতে শিখছেন। সেক্রেটারিরাও। এরপরে দেখবে কেরাণী ও চাপরাশিরাও।' সোম-দেব কিন্তু সীরিয়াস।

'গান্ধী শিক্ষা দিয়েছিলেন দেশের লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। নেহরু দিচ্ছেন নিজের মাথায় দাঁড়াতে। তারপর? আমি চাই কাহিনীটা শুনতে।

'মাথায় দাঁড়ানো যখন ভালো করে রপ্ত হয়ে গেল তখন আমি ভাবলুম কী, জানো? ভাবলুম দাঁড়াতে যদি পারি তো হাঁটতে পারব না কেন?' সোমদেব বলে গম্ভীর ভাবে।

'সে কী! তুমি মাথায় হাঁটতে চেষ্টা করেছিলে নাকি!' আমি আঁতকে উঠি।

'তাই করতে গিয়েই তো এ শিক্ষা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পতনের হেতু।' বলতে বলতে সোমদেবের গলা ধরে আসে।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, 'যা করতে গিয়ে তোমার শির-দাঁড়া ভেঙেছে তাই করতে গিয়ে একদিন দেশেরও শিরদাঁড়া ভাঙবে।'

সোমদেবের চোখে জলের আমেজ। বলে, 'পতন হলে উত্থান হয়, এই তো নিয়ম। দেশ আবার উঠবে। কিন্তু আমি কি আর উঠতে পারব, অদ্রীশ!'

'তুমিও পারবে। কতলোক পারছে। বিজ্ঞানের বলে কী না হয়। তোমাকে আমরা আমেরিকায় বা রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেব। এরা না পারে ওরা পারবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে তো ভাবনা? সে হবে।' আমি আশ্বাস দিই।

'আমার ভাগ্য ভালো তোমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা সব আছেন। শুনে সুখী হবে যে ভিয়েনায় পাঠানোর প্রস্তাব সরকার থেকেই উঠেছিল। আমি কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি যে মরতে হয় নিজের বাস-ভবনে নিজের শয্যায় শুয়ে মরব। হাস-পাতালে বা নার্সিংহোমে নয়। বাঁচবই তার কোনো নিশ্চয়তা যখন নেই।' সোমদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

ওর যখন এতই অনিচ্ছা তখন ওকে জোর করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া

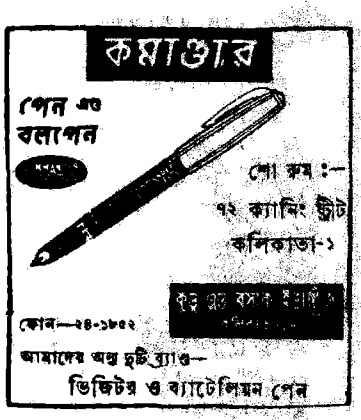

পূজার দিনগুলি
আরও আনন্দমুখর
হোক----

এইচ • এম • ভি ফিয়েস্টা ও ক্যালিপ্সো
নগদ অথবা
সহজ কিস্তিতে

অনেক রকমের রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার, রেকর্ড রিপ্রডিউসর, ট্রানজিস্টর রেডিও ও রেডিওগ্রাম, রেকর্ড, টেপরেকর্ডার, এ্যামপ্লিফায়ার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি সর্বসময় বিক্রয় করি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ • ফোন ২৪-৪৭৯৩

চলে না। প্রকৃতি হয়তো ভাঙা হাড় আপনি জোড়া দেবে। প্রকৃতিকে সময় দিয়ে দেখা যাক। এই হলো আমার অভিমত।

'ও প্রসঙ্গ থাক, ভাই অদ্রীশ।' সোমদেব আমাকে অনুরোধ করে। 'জানো তো, আমার এখন ঝাড়া হাত পা। মরবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কিসের ভাবনা! কে আমার উপর নির্ভর।'

'কেন? বন্ধুজায়া?' আমি সবিস্ময়ে বলি।

'দেখছ তো কত বড়ো সৌধ বানিয়ে দিয়েছি। আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি মানে বাড়ীভাড়া।' সোমদেব রসিকতার ভান করে।

'ছি! অমন কথা বলতে নেই। তুমিই যদি না থাক তবে সুখ রইল কোথায়! তোমাকেই তিনি চান। তোমাকে থাকতে হবে, ভাই সোমদেব।' আমি অনুনয় করি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সোমদেব বলে, 'অদ্রীশ, তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা ছিল। আমি তো জীবনের দিকে তাকাবার সময় পাইনি, তুমিই বরং পেয়েছ। সিদ্ধির জন্যে জীবনভর সাধনা করে দেখছি সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই।'

'সিদ্ধাই!' আমি চমকে উঠে বলি, 'কেন ওকথা মনে এলো!'

'এখন তো আমার হাতে কোনো কাজ নেই। সেক্রেটারিয়াট থেকে একটাও ফাইল আসে না। শুয়ে শুয়ে অর্ডার দিতে কি পারতুম না? মস্তিষ্ক তো জখম হয়নি। তবু পাঠাবে না। তা হলে কী নিয়ে বাঁচি? গীতা উপনিষদ নিয়ে? সব মুখস্ত হয়ে গেছে। তোতাপাখীর মতো আওড়াই। কিন্তু এক-বিন্দু বুঝিনে। সংস্কৃত দুর্বোধ্য নয়। ভাবটাই দুর্বোধ্য। সন্ধ্যাবেলা একটু কীর্তন হয়। ওর মধ্যে কিছু পাই।' সোমদেব অকপটে বলে।

'বেশ তো। যাতে আনন্দ পাও তাই শোনা বা পড়। আনন্দও একপ্রকার চিকিৎসা। আনন্দেও মানুষ সেরে ওঠে। তোমার সেরে ওঠা চাই, তা সে যে পদ্ধতিতেই হোক।' আমি বিধান দিই।

'সেরে ওঠা এ জীবনে হবে না, ভাই অদ্রীশ। আমি তো বুঝি আমি কী ছিলুম, কী হয়েছি। সংসার থেকে মনও উঠে গেছে আমার। আমাকে ঠকিয়েছে।' সোমদেব ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে।

'কে তোমাকে ঠকিয়েছে?' আমি হতভম্ব হই।

'সিদ্ধাই।' এককথায় উত্তর দেয় সোমদেব।

আমি আর প্রশ্ন করিনে। চুপ করে শুনি। ও যা বলতে চায় বলে যাক।

'যতই ভাবছি, ভাই অদ্রীশ, ততই আমার কান্না পাচ্ছে ভেবে যে, জীবনে কত কী করবার স্বপ্ন দেখেছিলুম, কিছুই করা গেল না। আমারি দোষ। রাবণের মতো আমিও সংকল্প করেছিলুম যে স্বর্গে যাবার জন্যে একটা সিঁড়ি গড়ে দিয়ে যাব, তা হলে মানুষকে আর মরতে হবে না, সশরীরেই সে স্বর্গারোহণ করবে।' সোমদেব চোখ বুজে আত্মস্থ হয়।

আমি তা শুনে চমৎকৃত হয়ে ভাবি এই ঘোরতর কাজের লোকেরও অমন এক অবাস্তব স্বপ্ন ছিল। আক্ষরিক অর্থে স্বর্গের সিঁড়ি নয় যদিও।

(৩)

কৃত্তিবাসের রাবণ বলেছিল রামকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে।

"করিব এমন পথ সবে যেন উঠে
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে
থাকিবে অপূর্ব কীর্তি সংসার মাঝার
ত্রিভুবনে যশ সবে ঘুষিবে আমার।
সেইক্ষণে করিতাম যবে হৈল মনে
কোন্‌কালে কার্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে।'

যখনকার যেটা তখন যদি সেটা না কর তো আর কোনোকালেই করা হয় না। মরণকালে আপসোস সার হয়।

'আমার জীবনেও' সোমদেব বলে যায়, 'মাঝে মাঝে এক একটা স্বপ্ন এসেছে যা রাবণের সিঁড়ির মতোই অপূর্ব। তৎক্ষণাৎ যদি কাজে হাত দিতুম তবে কবে সারা হতো। কিন্তু রাবণের মতো আমিও করছি করব বলে শিকেয় তুলে রেখেছি। মন দিতে পারিনি। জানো তো শাসনের কাজ কেমন জরুরি আর জটিল। চব্বিশ ঘন্টা টেলিগ্রাম আর টেলিফোন আসছেই। দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। রাস্তায় গণ-মিছিল। শান্তির আশায় গ্রামে গিয়ে তাঁবু ফেলি। সেখানেও শত রকমের আর্জি আর নালিশ।"

'জানিনে? আমিও তো সমান ভুক্তভোগী।'

'না সমান নয়। সোমদেব বলে, 'তোমাকে ওরা সরিয়ে দিয়ে সময় দিয়েছিল, অদ্রীশ। নইলে তুমি তোমার রাবণের সিঁড়ির সিকিভাগও গড়তে পারতে না। কিছুটা যে পেরেছ এর জন্যে দুর্ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। দুর্ভাগ্যই সৌভাগ্য।"

তার জন্যে কী ভীষণ মাশুল দিতে হয়েছে বন্ধুরা তা জানে না। আমি জানাইনি। বলি, 'সোমদেব, আমার প্রসঙ্গ আজ থাক। তোমার স্বপ্নের কথাই শুনি।'

প্রথম যেদিন ওকে দেখি তখন থেকেই ও ঘোরতর বাস্তববাদী। কতখানে কত চাল ও ঠিক হিসেব করে বলতে পারে। ভাবালুতা বা ভাবপ্রবণতা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে দেখিনি। ওর সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তাঁদের মুখে শুনেছি ও তো মানুষ নয়, ও একটা মেশিন। ও যখন ইনস্পেকশনে যায় তখন অধীনস্থরা থরথর করে কাঁপে। সাজাও দেয় কঠোর হাতে। পুকুর চুরির দেশে ও একটা বিস্ময়।

এমন যে সোমদেব তারও একটা রাবণের স্বপ্ন ছিল। কোনোদিন আমাদের কাউকে জানতে দেয়নি। পরিবারকেও না।

'বলে কী হতো, ভাই? কেউ বুঝত না। সবাই ঠাওরাত পাগলামি। বদনাম রটে যেত। সরকার আমাকে দায়িত্বের কাজ দিত না। কেরিয়ারটা মাটি হতো। তাই মনের বাসনা মনে গোপন রেখেই জীবনটা কেটে গেল।' সোমদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমাকে যদি বলতে আমি বুঝতুম। পাগল ঠাওরাতুম না। কিন্তু এখনো হয়তো খুব বেশী দেরি হয়ে যায়নি। এখনে তোমার সিঁড়ি শুরু করে দেওয়া যায়। আজকেই শুরু হোক না? যদি বলসাপেক্ষ না হয়।' আমি উৎসাহ দিই।

'আরে, না। তুমিও যেমন।' সোমদেব ম্লান মুখে বলে। 'কখনো তা আরম্ভ হোরো না, যা তুমি শেষ করতে পারবে না।'

সেদিন ও কি সহজে মুখ ফুটে বলবে কী ওর জীবনের স্বপ্ন। অথচ ওইজন্যেই আমাকে ডাকা। ধৈর্য ধরি। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে যাই। যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আমার। ওর খুশি হলে ও বলবে। নয়তো বলবে না।

কিন্তু বলবার জন্যে ও আকুলিবিকুলি করছিল। না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। কখন একসময় বলতে শুরু করে দেয়। আমার খেয়াল নেই।

'তোমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগে আমি যখন স্কুলের ছাত্র,' সোমদেব বলতে থাকে, তখনি ও স্বপ্ন দেখি। তখনকার দিনে আমি ছিলাম স্বপ্নালু বালক। পড়াশুনায় ভালো নয়। খেলাধুলোয়ও না। ছবি আঁকতুম। গান করতুম। কবিতাও লিখেছি যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ওর চেয়ে বড়ো কথা আমি যাত্রার পালা লিখতুম।'

অবাক করল সোমদেব। যাত্রার পালা!

'হ্যাঁ। রামায়ণ মহাভারত ভেঙে ভেঙে যাত্রার পালা। সেসব অবশ্য প্রকাশ্যে অভিনয়ের জন্যে নয়। তার জন্যে চাই যাত্রার দল। দল আমার কোথায়! দল থাকলেও কি সকলের সামনে দাঁড়াবার সাহস ছিল! বাবা যখন হাঁক দিয়ে বলতেন, বেত কেটে নিয়ে আয় রে, তখন জানতুম ও বেত আমার পিঠেই পড়বে। আমার ওসব যাত্রা আমি বেনামী করে দিতুম। হয়তো দুটো একটা দূরে কোথাও অভিনয় হতো। বড়ো হয়ে চাকরিতে ঢুকে একবার এক যাত্রা দেখে আমার অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে আমারি সোমদেবোত্তর সম্পত্তি। খোল আর নলচে বদলে দিয়েছে।' বন্ধুর হাসিতে আমিও যোগ দিই। অবিশ্বাস্য যদিও।

'তারপর হঠাৎ কেমন করে আমি অন্য মানুষ হয়ে উঠি। খেলাধুলোয় চোকস। লেখাপড়ায় ততটা নয়, তবে পরিশ্রমী। যাত্রা দেখা ছেড়ে দিই। তাতে সময়ের অপচয় হয়। সেই সময়টা কাজে লাগালে ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া যায়। সময়ের এই মূল্যবোধ আমাকে মানুষ করে দিয়েছে। এ যেমন সত্য তেমনি সত্য আমার স্বপ্ন ভুলিয়ে দিয়েছে। গড়তে চেয়েছিলুম আমার যাত্রার দল। যে দল আর সব দলকে হারিয়ে দিয়ে সারা দেশের সেরা দল হবে। আর রামায়ণ মহাভারতের স্রোতে সারা দেশকে প্লাবিত করে দেবে।' সোমদেব অতীতের স্বপ্নে মগ্ন হয়।

'ওটা তো চিরকাল হয়ে এসেছে, সোমদেব। ওই রামায়ণ মহাভারত ভাঙিয়ে তো তিন হাজার বছর খাওয়া হয়েছে। নতুন কী তুমি দিতে যা আর কেউ কখনো

দেয়নি।' দেশে কি যাত্রার দলের অভাব! না সেরা দলের অভাব?' আমি তর্ক করি।

'তুমি ঠিক ধরতে পারলে না, ভাই অদ্রীশ। আমার আইডিয়া ছিল মামুলী যাত্রা নয়। এমন এক যাত্রা যাতে দর্শক বা শ্রোতারাও অংশ নেবে। আমার দল যেখানেই যাবে সেখানেই সারা গ্রাম জমায়েৎ হবে। আর সারা গ্রাম যোগ দেবে। ছেলে-বেলায় অবশ্য অতদূর ভাবিনি। পরে আমার চিন্তার বিকাশ হয়েছে। দর্শকরা বা শ্রোতারা প্যাসিভ হবে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য সবাইকে অ্যাকটিভ করে তোলা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নগরকীর্তনের মতো। আমি অবশ্য তুচ্ছ মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা! কিন্তু আমার যাত্রার আইডিয়া তাঁর ওই নগর-কীর্তনের দোসর।' সোমদেব উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

'সেই রাধাকৃষ্ণ! সেই রামায়ণ মহাভারত! দূর!' আমি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিই। 'বাড়ী করেছ মডার্ন। আসবাব কিনেছ মডার্ন। আর স্বর্গের সিঁড়ির বেলা সেই আদি-কালের যাত্রা! সেই মান্ধাতার আমলের ভীম অর্জুন রাম সীতা! ও জিনিস চলত না, সোমদেব। তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হতো।'

কথাটা বলে ফেলে পরে খেয়াল হয় যে কাজটা ভালো হয়নি। যে মানুষ যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে তার যাওয়া তাতে পেছোবে না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা হচ্ছে ওর বাল্যকালের। তখন আমারও তো রামায়ণ মহাভারতে অবিচল বিশ্বাস ছিল। দেশের লোকেরও। কেউ কি সে-সময় ভেবেছিল যে ওজিনিস চলবে না? ওর দিন গেছে?

সোমদেব মর্মাহত হবে মনে করে-ছিলুম। কিন্তু তা নয় সে খুশি হয়ে বলে, 'বাঁচালে! স্বর্গের সিঁড়ি গড়তে গিয়ে আমি মর্ত্যের কাজে অবহেলা করতুম। পরে হৃদয়ঙ্গম করতুম ও সিঁড়ি অচল। ও পথ দিয়ে কেউ স্বর্গে যায়নি। দেখছি তো লোকের মতিগতি। ওরা পারলে স্বর্গটাকেই মর্ত্যে নামিয়ে আনে। এই ধরণী হবে ওদের অমরাবতী। আমার পক্ষে যাত্রা একটা অযাত্রা হতো, অদ্রীশ।'

'যাত্রায় আমার আপত্তি নয় সোমদেব।' আমি বুঝিয়ে বলি। 'আমার আপত্তি ওই-সব পৌরাণিক বিষয়ে। কর না তুমি একটা নতুন ধরনের যাত্রা। বিষয় বেছে নাও আধুনিক জীবন থেকে। নায়ক নায়িকারাও হবে আধুনিক। তেমনি সব বীরপুরুষ, তেমনি সব বীরাঙ্গনা। কুন্তী দ্রৌপদীও কি এযুগে নেই? থাকলে কেন বাদ যাবে?'

'আমাকে মাফ কোরো, ভাই অদ্রীশ।' হাত জোড় করে সোমদেব। 'এযুগের কুন্তী দ্রৌপদীদের আমি জলচল করতে অক্ষম। জানো তো আমার নীতিবোধ কীরকম কঠোর। রামায়ণ মহাভারতের আধুনিক সংস্করণ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি বর্জন করতে হবে।'

শুনে তো আমি থ! প্রতিবাদ করতেও ভরসা পাইনে। মৃত্যুপথযাত্রী।

'রাজাগুলো শত অনাচার করে অসমর্থ। রানীগুলো কুলগুরু, কুল-পুরোহিত বা ঋষিদের কাছে নিস্তার। ব্রাহ্মণদের দয়ায় শরীর। পরেরটিও চাই, ঘরেরটিও চাই। দেবতারাই বা কম কিসে! কেউ যখন বলে দেবতুল্য চরিত্র তখন মারতে ইচ্ছে করে। কোন্ দেবটি দেবতুল্য, শুনি? এক গণেশ ঠাকুর বোধহয়। ওটা তাঁর চেহারার গুণে। ভাই অদ্রীশ, স্বর্গের সিঁড়ি যে আমি গড়িনি এটা আমার জীবনের ব্যর্থতা নয়। এমন কি রাবণেরও নয়। ও সিঁড়ি দিয়ে দেবতারাই মর্তে নেমে আসত। ওদের পেলে মেয়েরাও কি আর আমাদের দিকে ফিরে তাকাত? পুজো তো করছে দু'বেলা ওদেরই।' বলতে বলতে সোমদেব অগ্নিদেব হয়ে ওঠে।

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি, 'চুপ। চুপ।'

সোমদেব সামলে নিয়ে বলে, 'না, আমার মনে লেশমাত্র খেদ নেই। আমি এখন খেদহীন মন নিয়ে মরতে পারব। কোথায় যাব, জানিনে। স্বর্গে যেতেও রুচি হয় না। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য পবন কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারব না।'

'তাহলে তুমি যাবে কোথায়? নরকে? এমন কোনো পাপ তো তুমি করনি, সোম-দেব, যে নরকেই তোমার গতি হবে?' আমি সহাস্যে বলি।

ও ধাঁধায় পড়ে। স্বর্গে যাবার স্পৃহা নেই, নরকে যাবার হেতু নেই, তাহলে ও যাবে কোথায়? ভাবে। ভেবে কূল পায় না।

'সমস্যা হচ্ছে এই যে মানুষের নীতি-বোধ এখন দেবতাদের নীতিবোধকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই স্বর্গসুখও তার কাছে স্বর্গীয় নয়। তার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে কী হবে? গড়তে হবে নতুন একটা স্বর্গ।' এই বলে আমি সেদিনকার মতো উঠি।

'আবার আসবে তো?' ও ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমি ঝাঁকানি দিয়ে বলি, 'আবার আসব।'

(৪)

বন্ধুজায়া আমাকে এগিয়ে দেবার সময় জানতে চান, 'কেমন দেখলেন?'

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অপারে-শন ছাড়া কি কেউ বাঁচে না? অস্টিওপ্যাথী বলে একরকম চিকিৎসা আছে। খোঁজ নিতে পারেন।' আমি ভরসা দিই।

কিন্তু মনটা হাহা করে। ও কি বেশী-দিন বাঁচবে! ওই যন্ত্রণা কি বেশীদিন সহ্য হবে! আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিল যন্ত্রণার বিরাম ছিল না।

ভাবছিলুম ওর মতো ঝুনো নারকেলের ভিতর এত রস ছিল। যাত্রার দল গড়ে নগরসংকীর্তনের মতো সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া। তার বদলে যা হলো তা শমনের কাছে দাপট দেখিয়ে সবাইকে দূরে ঠেলে দেওয়া। এখন আর ফিরে যাবার পথ নেই। রাবণের সিঁড়ি গড়তে হলে স্বপ্ন দেখার বয়সেই আরম্ভ করতে হয় পদে পদে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। অন্যমনা হতে হয়।

কিন্তু গড়েই বা হতো কী! লোকে যদি স্বর্গে যেতে না চায় যদি চায় স্বর্গই চলে আসুক স্বর্গ ছেড়ে মর্তে। কার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি! লোকের জন্যেই তো।

চিন্তাকুল মন নিয়ে বাড়ী ফিরি। ইরাও জানতে চান কেমন দেখলুম।

'মুক্ত পুরুষ।' আমি উত্তর দিই। 'স্বর্গের জন্যে স্পৃহা নেই, নরকের জন্যে শঙ্কা নেই। জীবনের উপর আসক্তি নেই। মরণের উপর বিরক্তি নেই। তবে ধাত্রা বোধহয় সারা হয়ে এল।'

'কী বলতে ডেকেছিলেন?' ইরা কৌতূহলী হন।

'যে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল তার কথা। স্বর্গের সিঁড়ি। রাবণের স্বপ্ন। ওরই রকমফের আর কী!' আমি করুণস্বরে বলি।

অনুবাদ গ্রন্থ

প্রবীর ঘোষ অনূদিত

আলবার্তো মোরাভিয়ার
(The Woman of Rome)

১। রোমের রূপসী (১ম খণ্ড)
(২য় সংস্করণ) ৪·০০

২। রোমের রূপসী (২য় খণ্ড)
(২য় সংস্করণ) ৫·০০

এমিল জোলার
(Human Beast)

৩। পাশবিক
(২য় সংস্করণ) ৬·০০

আলবার্তো মোরাভিয়ার
(The wayward wife)

৪। স্বৈরিণী ৪·৫০
(Two women)

৫। দুই নারী ৬·৫০
সমরসেট মম-এর
(Theatre)

৬। অভিনেত্রী ৬·০০
গ্রেট মেটলিয়স-এর
(Peytton Place)

৭। পেটোন প্লেস ৮·০০
যোগেশচন্দ্র নন্দী অনূদিত
ম্যাক সিম গোর্কীর
(A man who was afraid)

৮। অঙ্কুশ ৫·৫০

চলন্তিকা প্রকাশক
২১২/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

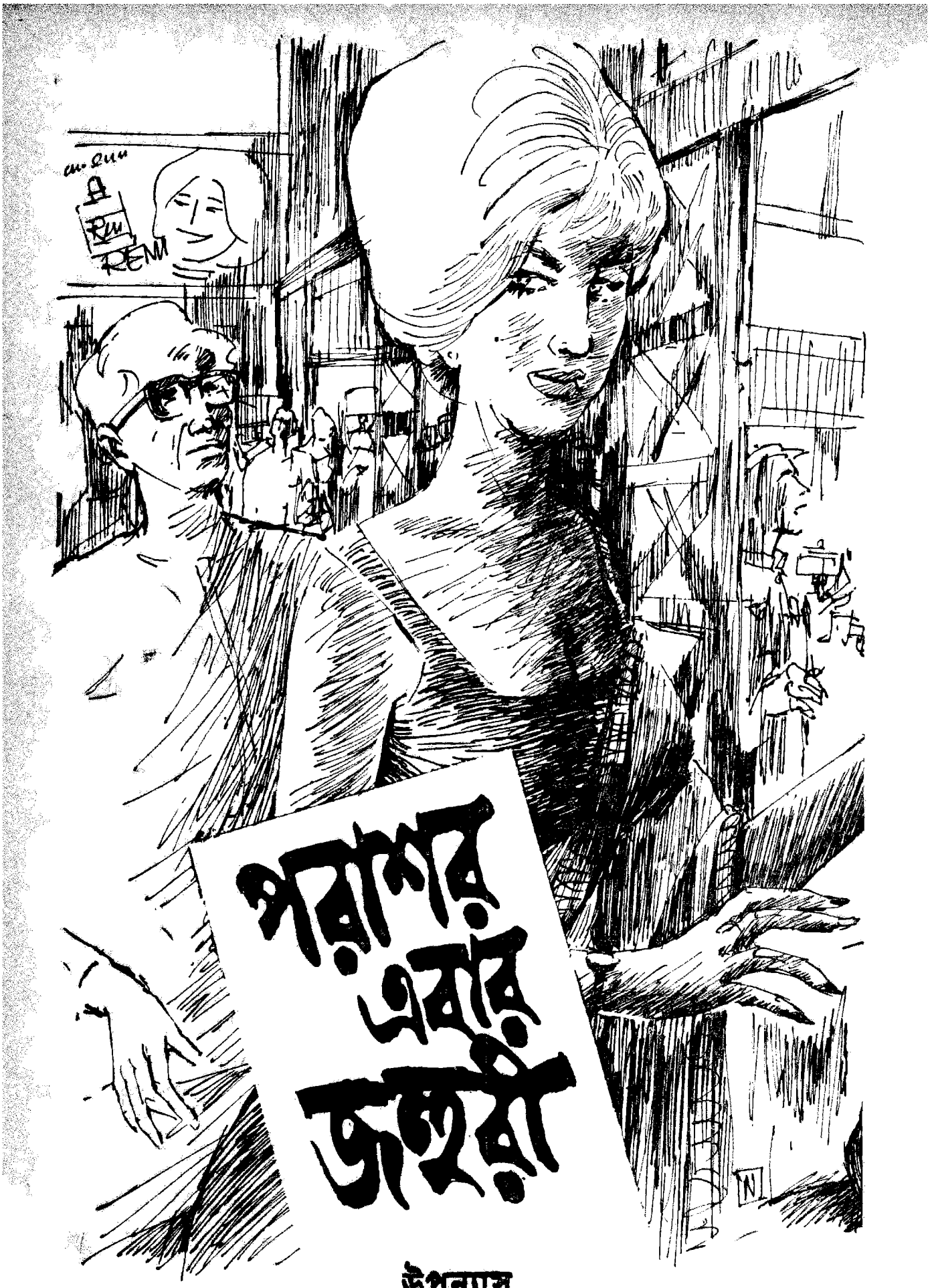

পরাশর এবার জহুরী

উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ট্যাক্সিতে অনেক সময়ে গোলমাল করে। ওয়েটিং চার্জ দিলেও দাঁড়াতে চায় না। তাই বেশ একটু বেশী খরচ করে প্রাইভেট একটা গাড়িই সারাদিনের জন্যে ভাড়া করেছিলাম।

গাড়িটা স্ট্যান্ডে রেখে ড্রাইভারকে একেবারে সারাক্ষণ তৈরী থাকবার নির্দেশ দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম চোখ কান যতদূর সম্ভব সজাগ রেখে।

জায়গাটা চৌরঙ্গীর মোড়। সময় বেলা দুটো, আমার সামনে পূর্ব দিকে রাস্তার ওপারে মেট্রো সিনেমা, পেছনে পশ্চিমে আগেকার কার্জন পার্ক দু'ভাগ করা ট্রাম-লাইনের এসপ্ল্যানেড জংশন।

বেলা সাড়ে বারোটা থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। নজরটা প্রধানতঃ পুবের রাস্তা আর ওপারের ফুটপাথের ওপরই রেখেছি। তবু ডাইনে বাঁয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোড আর ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ের দিকটা একেবারে অবহেলা করি নি।

মুস্কিল হয়েছে অতক্ষণ এক জায়গাতেই ঘুরে ফিরে বেড়ানোটাকে স্বাভাবিক চেহারা দেওয়া।

অনেক রকম ফিকিরই তার জন্যে করতে হয়েছে। কখনো যেন রাস্তা পার হতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছি। সস্তায় ফাউন্টেন বিক্রীর আসল ঘাঁটি রাস্তার ওপারে। তবু দু'একজন ফিরিওয়ালা সহজ শিকারের খোঁজে এক আধবার এদিকটাতেও টহল দিয়ে যায়। তাদেরই একজন পাশ দিয়ে যেতে যেতে খুব গোপন খবর দেবার মত চাপাগলায় বলে গেছে, আসল পাকার ষাট বাবু, সলিড গোল্ড। স্মাগ্‌লড মাল, সস্তায় পাবেন। খানিকদূরে চলে যাবার পর সময় কাটাবার ছুতোর সন্ধান করে তাকেও পিছন থেকে ডেকেছি। সস্তায় স্মাগ্‌লড্ মালের স্বরূপ জানা সত্ত্বেও অনাড়ির মত তার সঙ্গে দরদস্তুর করেছি বেশ খানিকক্ষণ ধরে। দরাদরি করতে করতে সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাটা তার কাছেও ঠিক গোপন রাখতে পারি নি। ফেরিওয়ালা সেটা আমার পুলিশ সম্বন্ধে শঙ্কিত সাবধানতা বলে ধরে নিয়েছে বলেই রক্ষে। লোভের সঙ্গে আমার ভয়টাকেও আরো উস্কে দেবার চেষ্টা করে সে গম্ভীর চাপাগলায় বলেছে,—তাড়াতাড়ি করুন স্যার। দেড়শ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় ছাড়ছি, আর কি চান? কখন কোথা দিয়ে কে হানা দেবে তার ত ঠিক নেই। শাদা পোষাকে সব ঘুরছে। দেখে চিনতেও পারবেন না। নিন স্যার যা বলবার বলে ফেলুন।

কিছুক্ষণ সময় কাটাবার ফন্দিটা সফলভাবে খাটিয়ে ফেরিওয়ালাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করেছি তারপর। তাড়াতাড়ি যাতে কেটে পড়ে তার জন্যে দেড়শ টাকার স্মাগ্‌ল্‌ড মালের দাঁও-মারা দাম পঞ্চাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছি পাঁচে। গালাগাল না হোক একটা কান লাল করবার মত জবাবের জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম। তার বদলে হ্যাঁ—তার বদলে পকেট থেকে করকরে একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে সেই রাঙতামোড়া অমূল্য স্মাগ্‌ল্‌ড মালটি গ্রহণ করতে হয়েছে। ভদ্রলোকের কথার খেলাপ করবার সুযোগ ফেরিওয়ালা আমায় দেয় নি।

এক দাঁও-এ একেবারে একশ প'য়তাল্লিশ টাকা লাভ করার ধাক্কা সামলাতে খানিকক্ষণ গেছে। কোনো কিছু কিন্তু তখনও ঘটে নি। পুরানো 'হোয়াইট ওয়ে লেডল' বাড়ির গম্বুজ ঘড়িতে দুটো বাজবার পর একটু অস্থির ও চিন্তিত হয়েছি।

সত্যিই লক্ষ্য রাখবার মত কিছু ঘটে নি, না, আমারই সজাগ পাহারার ত্রুটি?

ইঙ্গিত যা পেয়েছিলাম তাতে বেলা দুটোর মধ্যেই ত কিছু না কিছু হবার কথা।

তাহলে এবার কি আমার রণে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত?

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আর খানিক এদিক-ওদিক পায়চারী করলাম।

ঘড়ির বড় কাঁটাটা পাঁচ ছাড়িয়ে দশের দাগে গিয়ে পৌঁছেছে। আর মিথ্যে টহল দেবার কোনো মানে হয় না। দুনিয়াটা সত্যিই গোরেন্দা গল্পের স্বর্গ নয়, যে থেকে থেকে যেখানে-সেখানে রোমাঞ্চকর শিহরণ লাগাবার তাড়জোড় চলেছে।

ভাবনাটা মনে ভেসে উঠতে না উঠতেই শরীরটায় শিহরণের ঢেউ খেলে গেল।

ওই ত, যার জন্যে এই উদ্বিগ্ন অপেক্ষা, ওপারে মেট্রো সিনেমার সামনেই সে দাঁড়িয়ে। কেমন একটু উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির ভাব সত্যিই।

ভাড়াটে গাড়ির ড্রাইভারকে শেষ নির্দেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হবার জন্যে পুব দিকের সীমানার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের চৌরঙ্গী সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ের ট্রাফিক ছেড়ে দিয়েছে। স্রোত বইছে বাস, লরী মোটরের। এর মধ্য দিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব।

এত কষ্টের শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না কি এই সুযোগে?

না, এদিক-ওদিক চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে মেট্রোর ভেতরে টিকিটের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডান দিকের অ্যাডভান্স টিকিটের কাউন্টার। সেখান একটু দেরী হবে নিশ্চয়। তার মধ্যে রাস্তা পার হয়ে যাব। আর তা না পারলেও এপার থেকে লক্ষ্য রাখতে পারব ঠিকই।

একবার দেখলে ও চেহারার ওপর নজর রাখার বিশেষ অসুবিধে নেই। দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত কেউ নয়। দূর থেকেই চেহারার বিশেষত্বটা মনে একেবারে ছাপ দিয়ে যায়।

সুন্দরী বলতে যা সাধারণতঃ বোঝায় তা হয়ত নয়, কিন্তু পাংলা একহারা দেহের সাবলীল স্বচ্ছন্দ চলায় ফেরায় যেন যৌবনের অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ বিকীরিত হচ্ছে মনে হয়।

এবার উত্তর-দক্ষিণের ট্রাফিক থামায়, এপার থেকে ওপারে যাবার সুযোগ পেলাম। ঠিক সামনেই পেয়েছি। মেয়েটি কাউন্টার থেকে কাজ সেরে এসে বাঁয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে সুরু করেছে। হাঁটার গতিছন্দটি চমৎকার কিন্তু এখনো কোথায় যেন একটা দ্বিধান্বিত ভাব আছে। যেতে যেতে দুবার থামল। একবার হঠাৎ পিছু ফিরে তাকাল।

সন্দেহ কিছু করেছে নাকি? সন্দেহ করলেও আমায় বিশেষ-ভাবে করা অসম্ভব। চৌরঙ্গীর ডান দিকের ফুটপাথে ধর্মতলা থেকে সেই লিণ্ডসে স্ট্রীট পর্যন্ত সারাক্ষণ জনস্রোত বইছে দুমুখো। তার মধ্যে বিশেষ কেউ পিছু নিয়েছে বলে চেনবার কোনো সুযোগই তরুণীকে দিই নি। আমি জনস্রোতের একটা কুটি মাত্র। মেয়েটি আমার সম্পূর্ণ অচেনা, আমাকেও সে কস্মিন-কালে দেখে নি। আমার সঙ্গে আর দশজনের কোনো তফাৎ বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব।

পিছন ফিরে তাকালেও মেয়েটির দৃষ্টি বিশেষ কাউকে খুঁজছে বলে মনে হল না। ফিরে চাওয়াটা নেহাৎ অভ্যাসমাফিক সাবধানতার একটা ভঙ্গি।

কিন্তু একি! মেয়েটি যে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

মেট্রো পার হয়ে একটা রেস্তোরাঁ তারপর হোয়াইটওয়ে বিল্ডিংস আরম্ভ। ফুটপাথের বাঁ ধারে বড় বড় কাঁচ দেওয়া শো-উইনডো। বহুকাল আগে হোয়াইট ওয়ে লেডল-র সাহেবী খানদানি দোকানের রকমারী পোষাক আসাক সওদা সাজানো থাকত। কাঁচের জানলার ওধারে নতুন পোষাক পরা মেমের মূর্তি দেখতে ভিড় জমে যেত পথচারীর।

এখনও ভিড় একটু-আধটু জমে। যা জমে, তা কাঁচের শো-কেসে মার্কিন মুলুকের প্রচারচিত্র দেখবার জন্যে।

মেয়েটি ফুটপাথ থেকে সরে এই শো-উইনডোগুলিই যেন অনামনস্কভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। হঠাৎ এরকম ঝট করে বাঁদিকে চোখের আড়ালে যে চলে যাবে তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় নি। সমস্ত ব্যাপারটা রুজুতে হয়ত সর্প ভ্রম বলে মনে একটু যে সন্দেহ জাগছিল মেয়েটির এ ব্যবহারে তা একেবারে মুছে গেল। গভীর কিছু রহস্য এর মধ্যে আছেই।

কিন্তু বাঁ দিকে চোখের আড়ালে মেয়েটি যাবে কোথায়? বাঁ দিকে নিচের তলায় একটিমাত্র যাবার জায়গা। ইউ-এস-আই-এস-এর অফিস। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসের কাঁচের স্প্রিং দেওয়া দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢুকলেই ত যেখানে খুশি যাওয়া যায় না। সামনে রিসেপসনিস্ট আছে। চেনা কারুর কাছে গেলেও তাকে একবার জানিয়ে যেতে হয়।

এ ছাড়া আর একমাত্র যাবার রাস্তা চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে। ওপরে এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর আরো কি সব ব্যাঙ্ক ইত্যাদির অফিস আছে। সেখানে গিয়েই বা লুকোবে কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল দোতলার একেবারে পুব-দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রীটে গিয়ে নামবার। একটা লিফ্‌টও আছে সেখানে। বেশীর ভাগই যদিও অচল।

সেই পথ দিয়ে যদি নেমে চলে যায়?

সন্দেহটা জাগার পর ব্যস্ত হয়ে ভিড় ঠেলে এগুতে গিয়ে প্রায় ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে বাড়িটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কোণ থেকে সুরেন ব্যানার্জি রোডের আর চৌরঙ্গীর দুদিকের গেটেই লক্ষ্য রাখা যায়। এ দুটি ছাড়া বার হবার রাস্তা নেই। সুতরাং যেদিক দিয়েই বার হোক আমার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।

এই কোণটায় স্বাভাবিকভাবে পাহারায় থাকবার সুবিধেও আছে কিছু। ফুটপাথের ধারে ধারে ফাউন্টেন পেন চশমার কাঁচ, ছেলেদের খেলনা পেন শোয়েটার থেকে সস্তা জাপানী দূরবীনের পসরা সাজিয়ে বসেছে ফড়েরা। সস্তা দূরবীন কেনার ছল করে দাঁড়ানোটাই সুবিধের মনে হল। দূরবীন চোখে দিয়ে একবার এদিক আর একবার ওদিকে নজর রাখলাম।

ছলটা মন্দ নয় কিন্তু রহস্যময়ী তরুণী যদি বার হয়ে আসতে খুব বেশী দেরী করেন তাহলে দূরবীন ছেড়ে আর কিছু সওদায় মনোযোগ দিতে হবে। অন্য সওদার বেলা মুস্কিল এই যে তা পরীক্ষা করার ভান করতে করতে ঘন ঘন এদিক ওদিক চাওয়াটা সন্দেহজনক মনে হ'তে পারে।

ভাগ্য আমার ভালো। মেয়েটির অপেক্ষায় বেশীক্ষণ দূরবীন কেনার ভান করতে হ'ল না। দূরবীন চোখে দিয়েই তাকে দক্ষিণ-

পুবের সিঁড়ির গেট দিয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডে বার হ'তে দেখলাম।

দূরবীনটা চোখে থাকায় লাভ হ'ল একটা। সস্তা খেলনা-দূরবীন হলেও চৌরঙ্গীর মোড় থেকে ইউ-এস-আই-এস-এর লাইব্রেরী ছাড়িয়ে ওই গেটটুকু পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েটির মুখটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

না, শুধু দেহসৌষ্ঠবই নয় মেয়েটির মুখের সৌন্দর্যও আছে। সৌন্দর্যটা অবশ্য একটু উগ্র-কঠিন ধরণের। লালিত্যের একটু অভাব আছে।

রূপ বিশ্লেষণের অবশ্য তখন সময় নয়। দূরবীনের ভেতর দিয়ে মেয়েটিকে পুবদিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে দেখে তাড়াতাড়িতে দূরবীনটা হাতে করেই সেদিকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলাম।

ফেরিওয়ালার ডাকে থামতে হ'ল।

কি বাবু! মালটা মুফৎ নিয়ে যাচ্ছেন যে!

ফেরিওয়ালাদের সাধারণত বেশ সাধা গলাই হয় সওদার ঘোষণা হেঁকে হেঁকে। দূরবীনের ফেরিওয়ালা তাদের মধ্যেও বোধহয় কালোয়াত। তার চাঁছা গলার বিদ্রূপের খোঁচা একেবারে তীরের মত পিঠে এসে বিঁধল।

অপ্রস্তুত হয়ে থেমে পড়ে লজ্জার মাথায় দূরবীনটা আর ফেরৎ দিতে পারলাম না। যা দাম হাঁকলে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে ফেলে পেছন ফিরে সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকে চেয়ে চক্ষুস্থির।

যত দূর চাই নাই নাই সে পথিক, মানে পাথিকা নাই।

সেই মুহূর্তে এ কবিতার কলি মাথায় অবশ্য আসে নি। যা এসেছে তা নিজের প্রতি ধিক্কার! চোখের ওপর থেকে এরকম শিকার ফস্কাতে দিলাম। এ আহাম্মুকির জবাবদিহি দিতে যে মাথা কাটা যাবে।

আশা নেই তবু দূরবীনটা হাতে নিয়েই সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে সামনের দিকে প্রায় ছুট দিলাম।

একটিমাত্র সম্ভাবনার কথা তখন ভাবছি। সামনে এলিট সিনেমা আর করোপোরেশন বিল্ডিং-এর শেষ পর্যন্ত দু ফুটপাথ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি সেদিক দিয়ে হাঁটলে নজর এড়াত না।

সুতরাং পুরনো অ্যালবিয়ন সিনেমার ধার দিয়ে যে রাস্তা মার্কেটের পশ্চিম থেকে এসে সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হয়ে ধর্মতলার স্ট্রীটে গেছে সেই রাস্তাতেই মেয়েটি ডান দিকে বা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে।

কোন দিকে গেছে কিছুই অবশ্য জানি না। কিন্তু ভাগ্য একটু অনুগ্রহ করলে এখনই একেবারে হাল ছেড়ে দিতে হয়ত হবে না।

মোড়টায় পৌঁছে আকুলভাবে একবার ধর্মতলার আর একবার মার্কেটের দিকে তাকালাম।

না, ভাগ্যের দয়া আমার উপর নেই। দুদিকের রাস্তায় পথচারিণী সুন্দরী তরুণীর একেবারে অভাব না থাকলেও আমি যাকে খুঁজছি সে মেয়েটি নেই।

হতাশ হয়ে আবার পশ্চিম দিকেই ফিরলাম।

মোড়ের ট্রাফিক কন্ট্রোলের দরুন একটু দেরী হলেও আমার নির্দেশ মত ভাড়াকরা গাড়িটা তখন সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে আমার দিকেই আসছে।

আমার কাছে এসে গাড়িটা থামতে তাতে উঠে পড়তেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ চমকে উঠতে হ'ল।

না, ভাগ্য একেবারে নির্মম নয়। সেই মেয়েটিই মার্কেটের দিক থেকে সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকেই আসছে। ঠিক মার্কেটের দিক থেকে নয় ডান দিকের যে রাস্তাটা একদিকে রক্সি সিনেমা আর একদিকে কেশোরামের ভ্যারাইটি স্টোর-এর মাঝখান দিয়ে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পড়েছে সেই রাস্তাটা দিয়েই মেয়েটি এসেছে।

ওদিকে মেয়েটি কোথায় গেছল? রক্সিতে না ভ্যারাইটি স্টোরে?

যেখানেই গিয়ে থাকুক তা এখন গবেষণা করবার নয়। তার দেখা যে আবার পেয়েছি এই আমার কাছে কল্পনাতীত অঘটন। প্রাণ থাকতে আর তাকে নজর ছাড়া করছি না।

গাড়িটার কাছেই দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলবার ছলে মেয়েটির ওপর লক্ষ্য রাখলাম।

কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা কি? মেয়েটির গতিবিধি গভীর সন্দেহ জাগাবার মত নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সঙ্গে তার মাথায় একটু ছিটও আছে নাকি।

পুরানো অ্যালবিয়ন এখনকার গ্লাজার পাশ দিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ সে থামল। পুলিশের হাত নাড়ায় পুব-পশ্চিমের গাড়ি লরী থেমে উত্তর-দক্ষিণের যানবাহনের স্রোত তখন বইছে। পার হবার এ সুবিধে সত্ত্বেও মেয়েটির থামবার কারণ এবার সন্দেহ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

মেয়েটি কি আমার অনুসরণ করা টের পেয়েছে নাকি?

কয়েক মুহূর্ত যেরকম তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাল তাতে সেরকম ধারণা হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি যা করল তাতে সন্দেহটা আরো দৃঢ়ই হল।

একটা খালি ট্যাক্সি পুব থেকে এসে দক্ষিণ দিকে তখন বাঁক নিয়েছে।

মেয়েটি হাত তুলে তাকে থামাল। তারপর প্রায় হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে করপোরেশন বিল্ডিং-এর দিকে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেই চালাবার নির্দেশ দিলে।

ভাগ্য সত্যিই ভালো বলে গাড়িটা অমন সময় মত পেয়েছিলাম। পুব-পশ্চিমের যানবাহনের প্রবাহ প্রায় তখন থামাবার সময় হয়েছে। ড্রাইভারকে নম্বর দেওয়ার বকি নিয়েই দরকার হলে ট্যাফিক পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে ডান দিকে ঘুরে ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করতে বললাম।

ড্রাইভার সত্যিই তুখোড়। পুলিশের ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো স্রোতের নির্দেশ হাত তোলার টায় টায় মুহূর্তের মধ্যে ডান দিকে বাঁক নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

ট্যাক্সিটা তখন সোজা মার্কেটের পশ্চিম ধরে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে চলেছে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটে ট্রাফিক-এর বাধা পেয়ে অনেক গাড়ি আটকে আছে। মেয়েটির ট্যাক্সিটাও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইচ্ছে করলে অনায়াসে তখন তার একবারে কাছে আমার গাড়ি দাঁড় করানো যায়।

তা করলে চলবে না। একটু পিছিয়ে থাকবার জন্যে আস্তে চালাতে হবে।

ড্রাইভারকে সে নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলাম। তার দরকার হল না। সত্যিই পাকা লোক। নিজে থেকেই লাইট হাউস-এর বাঁকটায় পৌঁছোবার আগেই গাড়ির গতি সে কমিয়ে নিলে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের বাধাটা সরে যেতে দেখলাম। মেয়েটির ট্যাক্সি লিণ্ডসে স্ট্রীটের ডান দিকে মোড় নিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে চলল।

একটু দুর্ভাবনায় আছি তখন। মেয়েটি আমার গাড়ির চেহারা ও নম্বর তখন লক্ষ্য করেছে সন্দেহ নেই। একবার গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনে তাকালেই আমার গাড়ি দেখতে পাবে।

মেয়েটিকে পিছু ফিরতে কিন্তু দেখলাম না।

অমন মোক্ষম সময়ে ট্যাক্সি পেয়ে সরে পড়তে পারায়

বলকে সে অনুসরণদের অতীত নিরাপদ
ন করছে বোধহয়।

সামনে আবার চৌরঙ্গী রোডের বাধা।
গের গাড়িগুলো দ্রুতবেগে বেরিয়ে
চ্ছে। ট্র্যাফিক সিগন্যালের সবুজ
লোটা এখানো জ্বলছে। মেয়েটির ট্যাক্সি
র সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে গেল। আমার
াড়ির সামনে কিন্তু আরো সাত-আটটি
ড়ী রয়েছে। সেগুলি পার হবার পরও
বুজ প্রসন্নতা থাকবে কি না সন্দেহ।

যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। সবুজ প্রসন্নতা হলুদ ভ্রূকুটি করে লাল নিষেধ হয়ে গেল আমার সামনের গাড়িকে রুখে। আর উপায় নেই। ট্র্যাফিক আইন ভেঙেও আর এ বাধার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।

ট্যাক্সিটা ডান দিকে বেঁকে চৌরঙ্গীর মোড়ের দিকেই আবার গেছে এই যা ভরসা। ওখানে সেই সুরেন ব্যানার্জির মোড়ে আর একটা গাড়ি পার হতেই হবে। শুধু বাঁয়ে না ডাইনে কিংবা সোজা কোন দিকে বাঁক নেয় সেইটেই দেখা দরকার।

বেপরোয়া হয়ে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথের কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাল নিষেধ এখনো কিছুক্ষণ আছে আর মধ্যে ট্যাক্সিটা কোথায় দেখে নিতে হবে। গাড়ির ভেতরে বসে সেটা সম্ভব হ'ত না।

ট্যাক্সিটা দেখতে পেলাম। যা আশা করেছিলাম তাই অন্ততঃ ঘটেছে। সবচেয়ে জ্বালানো মোড়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতেই হয়েছে অমন প্রায় দুকুড়ি গাড়ির ভিড়ে।

এদিকে আমার সময়ও তখন ফুরিয়ে এসেছে। সবুজ থেকে হলদে পেরিয়ে লাল হবার প্রায় কাঁটায় কাঁটায় লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে উঠলাম। পেছনের গাড়ির সারির হর্নের আওয়াজগুলো অনুবাদ করলে দুনিয়ার বাছা বাছা গালাগালগুলো পাওয়া যেত।

ডান দিকে ঘুরে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ খুলে গেছে দেখলাম। এবারে আটকা পড়লে শিকারকে চোখে চোখে রাখার আশা ছাড়তে হবে।

বাহাদুরী দেখলাম আমার ড্রাইভারের। এইটুকুর মধ্যেই সাপের মত এঁকেবেঁকে ধাক্কা বাঁচাতে বাঁচাতে আর গাল খেতে খেতে ট্যাক্সিটার প্রায় নাগাল ধরে ফেললে কমিনিটের মধ্যে।

ততক্ষণে ট্যাক্সিটা বাঁক নিয়েছে একেবারে প্রায় উল্টো মুখে ডাফরিন রোড ধরে। আমাদেরও তাই নিতে হ'ল।

ডাফরিন রোড থেকে একটু ক্যাজুরিনা ছুঁয়ে খিদিরপুর রোড।

উন্মাদের মত এ এলোমেলো ছোটার মানে কি? মেয়েটা কি আমার অনুসরণ করা টের পেয়েছে?

পেয়েছে বলে ত মনে হয় না। পাবার কোনো কারণই এখন নেই। এক লিন্ডসে স্ট্রীটে পিছন ফিরে তাকালে হয়ত সন্দিগ্ধ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপর থেকে কিন্তু আমার গাড়ি রীতিমত একটা দূরত্ব বজায় রেখে আসছে। ডাফরিন রোড থেকে ক্যাজুরিনা ছুঁয়ে খিদিরপুর রোডে পড়ার মধ্যে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করবার কোনো সুযোগই তাকে দেওয়া হয়নি। লম্বা সোজা রাস্তা। নজর এড়াবার উপায় নেই বলে আমাদের গাড়ি ফেলে রেখেছি অনেক পেছনে।

এদিক ওদিক এলোমেলোভাবে গাড়ি নিয়ে ঘোরাটা সাবধানের মার নেই বলে নেহাৎ মামুলী নিয়ম রক্ষা বলে মনে হয়।

ধারণাটা যে আমার কতখানি ভুল কমিনিট বাদেই বুঝতে পারলাম। পাগলামি বলে যা মনে হয়েছে তার আড়ালে রীতিমত হুঁসিয়ারী প্যাঁচ লুকানো।

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম ট্যাক্সিটার বেগ কমে এসেছে। রেস-কোর্সের মেম্বারদের গেটের কাছে হঠাৎ সেটাকে থেমে যেতে দেখলাম। তখন আর আমাদের থামবার উপায় নেই। কমাবার বদলে স্পীড বাড়িয়ে সোজা গিয়ে সেন্ট জর্জেস রোডে ডাইনে বাঁক নিতে হ'ল। কিছুদূরে গিয়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মোড়ের কাছে এসে দাঁড় করালাম।

এখানটা একেবারে ফাঁকা। বাড়ি-ঘরের বালাই নেই বলে রাস্তার ওপর ত' বটেই রেসকোর্সের বেড়ার শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়।

যা দেখলাম তাতে বোঝা গেল মেয়েটি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের গাড়ি ঘোরাবার সময়টুকুর মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া বুঝে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার এসপ্লানেডের দিকেই রওনা হয়েছে।

মেয়েটি অকারণ ওখানে নামেনি। একটি প্রাইভেট মোটর সেখানে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। খামখেয়ালীর অভিনয় দিয়ে এতক্ষণ অনুসরণ যদি কেউ করে থাকে তার চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোড়া থেকেই ঠিক ছিল এইখানে এসে গাড়ি বদল করা হবে। হচ্ছেও তাই।

মেয়েটিকে এবার একটু এদিক-ওদিক চেয়ে প্রাইভেট গাড়িটায় গিয়ে উঠতে দেখলাম।

আমাদের অবশ্য ধরা পড়বার কোনো ভয় ছিল না। দুটো মোটা গাছের গুঁড়ির

আড়ালে আমাদের গাড়িটা মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একরকম অদৃশ্যই বলা যায়। তাছাড়া আমাদের সামনে ইতিমধ্যে বড় বড় দুটি লরী ও গুটিপাঁচেক মোটর পার হবার সঙ্কেতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছে।

মেয়েটির নতুন গাড়ি আবার এস-প্লানেডের দিকেই চলল। এবার যাওয়ার মধ্যে তাড়া নেই।

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আমিও পেছনে লেগে রইলাম আমার গাড়িতে।

খিদিরপুর রোড থেকে এবার রেড রোড তারপর অকল্যান্ড রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড।

স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া পোলে গিয়ে ওঠবার পর সন্দেহ হ'ল মেয়েটির গন্তব্য হাওড়া স্টেশনও হতে পারে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। গাড়ি নিয়ে মেয়েটি স্টেশনের ভেতরে অবশ্য ঢুকল না। স্টেশনের বাইরের গেটেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

এবারে বিনা দ্বিধাতেই যতটা কাছাকাছি সম্ভব তার পেছনে লেগে রইলাম। লাগেজ বুক করবার কাউন্টারের কাছে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি সামনের বোর্ডে ট্রেনের সময়-নির্দেশিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ভেতরের হল দিয়ে কোনাকুনি উত্তর দিকের কোনো প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশে তখন চলেছে।

সাজ-পোষাক চেহারা যেরকম তাতে দক্ষিণ দিকের টিকিট ঘরে প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কিনবে ভেবেছিলাম। তা না কেনাতে ও উত্তর দিকের ইস্টার্ণ রেলের লোক্যাল ট্রেনের সব প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়াতে মাসিক টিকিটের যাত্রিনী বলেই তখন ধরে নিয়েছি।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এ-ধারণা অমনভাবে পালটাতে হবে ভাবতেই কি পেরেছি!

হাত বিশেক দূর থেকে মেয়েটিকে অনুসরণ করছিলাম। সত্যি কথা যদি স্বীকার করি তাহলে বলতে হয় এ অনুসরণের মধ্যে শুধু নীরস কর্তব্যের দায়ই ছিল না, যৌবনোদ্ধত একটি সুঠাম দেহের গতিছন্দ উপভোগের ঈষৎ সঙ্কোচভরা আনন্দও একটু ছিল।

হলের মাঝখানের যানবাহনের জন্যে নির্দিষ্ট রাস্তা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চমকে উঠলাম। মেয়েটি তার হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে কি যেন বার করতে করতে যাচ্ছিল। অসাবধানে তারই ব্যাগ থেকেই ছোট একটা নোটবই যে পড়ে গেছে তা সে খেয়ালই করেনি।

নোটবইটা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে স্বাভাবিক সৌজন্যে ও শিভ্যালরিতে মেয়েটিকে দিতে যাচ্ছিলাম। দু-পা গিয়েই হুঁস হ'ল। এ 'শিভ্যালরি' দেখাতে যাচ্ছি কাকে? সৌজন্য আর যারই হোক গোয়েন্দাগিরিতে অচল।

নোটবইটা পকেটেই রাখতে যাচ্ছিলাম। তার মাঝখানে নোটবই-এর চেয়ে আকারে বড় একটা আলগা কাগজ দেখে থামতে হল।

আলগা কাগজটা বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটো যেন সেখানকার মেঝেতেই জমে গেল।

কাগজের বড় বড় হাতের লেখার অক্ষরগুলো চোখে না পড়ে উপায় নেই। আমার সম্পূর্ণ চেনা বড় বড় হরফে লেখা ছোট্ট একটা চিঠি।

ভাষাটা এই,—ধন্যবাদ! আর কষ্ট করতে হবে না। লীনা-কে ছেড়ে দিয়ে এবার নিরামিষ ভোজনাগারে চলে এসো। আমি সেখানেই অপেক্ষা করে আছি।

পরাশর।

দুই

সেই সাড়ে বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত এই হায়রানির পর এরকম চিঠি পেলে মনের ভাবটা কিরকম হয়?

খুন জখমের বাসনা যদি না-ও হয় তবু এরকম বিশ্রী মোটা রসিকতা যে বন্ধুর সঙ্গে করতে পারে তার মুখদর্শন করতে ইচ্ছে হয় না নিশ্চয়।

নোটবই-এর ভেতরে পাওয়া চিঠিটি পড়ে সেখান থেকেই চলে যেতে পারতাম। সে রকম একটা সঙ্কল্প জেগেও ছিল মনে। শুধু তখনকার মতই চলে যাব না, পরাশরের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ওইখানেই শেষ করে দেব চিরকালের মত।

ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখলে পরাশরও যা করেছে তার মধ্যে ত' ক্ষমা করবার কিছু পাওয়া যায় না। শুধু আমাকে বোকা বানিয়ে অপদস্থ হাস্যাস্পদ করবার জন্যে যেন সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো।

মেট্রো সিনেমার বিপরীত দিকে রাস্তায় ওধারে চোখ-কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করার নির্দেশ পরাশরই বলেছিল। কার জন্যে, কেন, অপেক্ষা করতে হবে কিছু বলেনি শুধু জানিয়েছিল যে বেলা দুটো নাগাদ একটি অবাঙালী চটকদার চেহারার মেয়েকে একলা মেট্রো সিনেমার কাছে যদি ঘোরা-ফেরা করতে দেখি তাহলে তার পিছু নিয়ে কিছুতে যেন তাকে চোখের আড়াল না করি।

মেয়েটির চেহারার বিবরণ বিশেষ কিছু দেয়নি। শুধু তার শাড়ী পরার ধরনটা পাশীদের মতই হতে পারে এইটুকুই জানিয়েছিল।

বেলা দুটো নাগাদ একজনের বেশী চটকদার চেহারার অবাঙালী মেয়ের একলা মেট্রোর সামনে ঘোরাফেরা করা দস্তুরমত অস্বাভাবিক বলেই অনুসরণের পাত্রী চিনতে আমার অসুবিধা হবে না সে ধরে নিয়েছিল।

অসুবিধে আমার হয়নি সত্যিই। কিন্তু শেষকালে এ রসিকতার মানে কি?

সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরের রহস্যটা কি? কে এই অবাঙালী মেয়েটি যে এই নাটকীয় ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে? শুধু আমায় নিয়ে একটু তামাসা করবার জন্যেই কি এমন একটা বিস্তারিত দৌড়-ঝাঁপ লুকোচুরির আয়োজন করা হয়েছে ওই মেয়েটিকে নায়িকা করে?

এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও মনে আর শান্তি থাকবে না সারাজীবনে।

তাছাড়া পরাশর যা করেছে তার জন্যে চিরকালের মত তার সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদের আগে তাকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে আসাও দরকার।

সেই শোনাতে গিয়েই পরাশরের এক কথায় সব রাগ জল হয়ে গেল।

স্টেশনের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দুটি ভোজনাগার। নিরামিষ আর আমিষ। সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই পরাশরকে দেখতে পেলাম। ম্যানেজারের কাউন্টারের ধারে একটি টেবিলে বসে আছে। একা নয়, সঙ্গে আর একজনকেও দেখলাম।

আমার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল বোঝা গেল। আমায় ঢুকতে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে দূর থেকে উৎসাহভরে ডাক দিলে,—এই যে এই টেবিলে!

তার ওই উৎসাহভরা ডাকেই মেজাজটা আবার বিগড়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে আবার বাইরে বেরিয়ে যাই।

তা পারলাম না। তার বদলে তার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। আমার মুখের চেহারাটা দেখলে অবশ্য একটা খুনোখুনি গোছের কিছু করতে যাচ্ছি ভাবা যেত। দেখবার তেমন কেউ ছিল না, এই যা। এ সময়টা শাকাহারীদের পক্ষে বোধহয় প্রস্তুত নয়। রেস্তোরাঁটা প্রায় খালি।

পরাশরের টেবিলের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সে সোৎসাহে বললে,—মার্ভলস্! একেবারে কামাল করেছ ভাই।

তার উচ্ছ্বাসের মধ্যে কপটতার আভাস পেলাম না। ব্যাপারটা তাই কিছুই না বুঝে ভেতরে ভেতরে হতভম্ব হলেও বাইরে মুখের চেহারাটা আষাঢ়ের মেঘ করে রেখেই বললাম,—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ত?

গলার স্বরে যতখানি সম্ভব তিক্ত বিদ্রূপই ফুটিয়েছিলাম বলে আমার ধারণা। তার ফল অমন উল্টে হবে ভাবতেই পারিনি।

আমার প্রশ্নে যেন উপচে পড়া প্রীতিরই সন্ধান পেয়ে পরাশর জবাবে তার মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উৎসাহের আতিশয্যে শব্দটা নিয়ে একটু প্যাঁচ খেলে বললে—সিদ্ধ হয়েছে মানে? একেবারে গলে কাদা হয়ে গেছে। পুলিশের লোকের দৌড় যে কত তাই আমি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পুলিশের ধুরন্ধর চর যেখানে হার মেনেছে সেখানে অনায়াসে কাজ হাসিল করে তুমি আমার বড় মুখ করে বলা কথার মান রেখেছ। যা চেয়েছিলাম তাই প্রমাণ হয়েছে তোমার বাহাদুরীতে। কি বলেন মিঃ মুগলভাই?

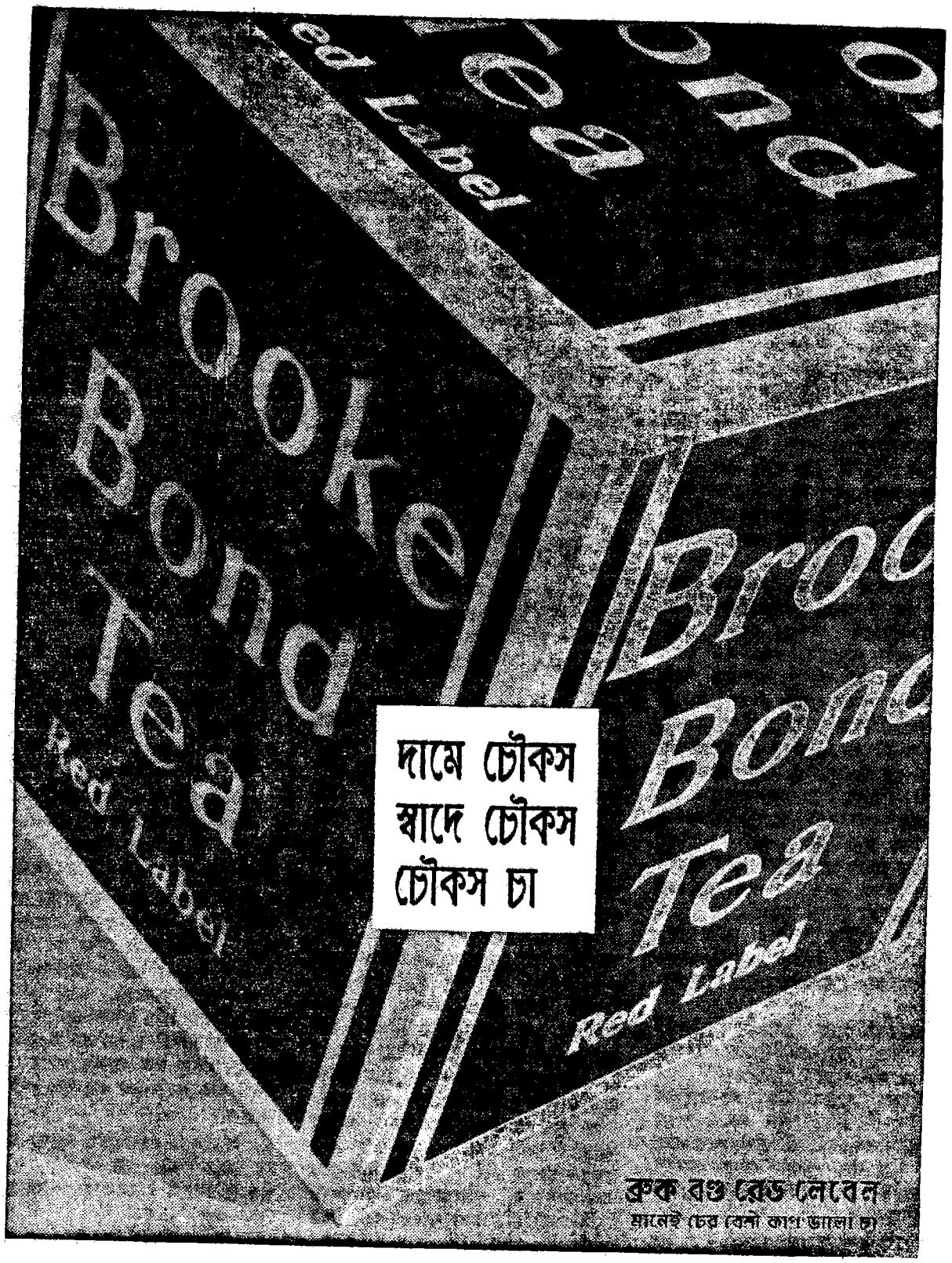
Brooke Bond Tea
Red Label
দামে চৌকস
স্বাদে চৌকস
চৌকস চা
ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল
মানেই চের বেশী কাপ ভালো চা

জানালে,—ওদিকে পসরাও সাজানো। না-টা শুধু ঘাটে লাগুক।

হাঁ, হাঁ, যুগলভাই সোৎসাহে পরাশরের আশ্বাসে সায় দিলেন, —সব কুছ বেলবে ইসি লিয়ে তো আপনাকে লিয়ে যেতে আছি আমার গরীবখানামে'। সিরফ ইয়ে গাড়ি পেঁছিনে কি ওয়াস্তা।

এরপর আর কিছু বলবার নেই। ধৈর্য ধরে তাই চুপ করে রইলাম।

গাড়িটা তখন রেড রোড থেকে ক্যাজুয়া বনা রোড ধরেছে। ডাইনে খিদিরপুর রোডটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ আগেকার ছোটাছুটির খেলাটা মনে পড়াতেই বোধহয় লীনা আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে,—ওই খিদিরপুর রোডে রেসকোর্সের ধারেই আপনাকে গুলিয়ে দিয়ে হারিয়ে দেব ভেবেছিলাম কিন্তু পারলাম না। আপনি সত্যিই মিঃ বর্মার উপযুক্ত বন্ধু!

এ প্রশংসাটাও ইংরেজিতে। প্রশংসাটা অবশ্য ভালোই লাগল। মৃদু একটু হেসে নীরবেই সেটা জানালাম।

গাড়িটা কাজুয়ারিনা থেকে হসপিটাল রোড ধরে আচার্য জগদীশ বসু রোড পার হয়ে ভবানীপুর রোড ছেড়ে রিফরমেটরী স্ট্রীট দিয়ে আদিগঙ্গার পোল পেরিয়ে আগেকার ছোটলাট ভবন এখনকার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রদক্ষিণ করে আলিপুর রোডে পড়ল।

সেখান থেকে এক জায়গায় একটু বাঁক নিয়ে যে প্রকান্ড বাগানওয়ালা একেবারে আধুনিক হাল ফ্যাশানের জমকালো ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে এসে থামল কলকাতার পুরানো বাসিন্দা বলেই বোধহয় তার খবর আমার মত সামান্য এক সাপ্তাহিকের সম্পাদকের কাছে পেঁছোয় নি।

যে জগতে আমাদের ঘোরাফেরা করতে হয় এসব নতুন কুবের-ধাম তার বাইরে কিছু দিন হল গড়ে উঠতে সুরু করেছে। স্থাপত্য থেকে এসব বিলাসপুরীর সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সবই আলাদা।

গাড়ি থেকে নেমে লিফটে গিয়ে উঠে এই কলকাতা শহরেই আছি কিনা সন্দেহ হল।

বাড়ীটার বাইরের পরিবেশ যেমন আলাদা, ভেতরটাও তাই।

লিফটাতেই যেন খাস মার্কিনমুলুকে পেঁছিবো মনে হল। লোহার কোলাপসিবল ডবল গেট টানা যে কাঠের বাক্সে আমরা অভ্যস্ত সে লিফট নয়। একেবারে ঝক্‌ঝকে স্টিলের নিখুঁত ধাতব খাঁচা। ভেতরে ঢুকে যে তলায় যাব তার বোতাম টিপলেই আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর যে যে তলা বেয়ে উঠছি তাও নম্বর-দেওয়া বোতাম জ্বলে উঠে টের পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট তলায় এসে আপনা থেকেই লিফট থামে আর দরজা খুলে যায়।

কলকাতা শহরে আমি গাঁইয়া নই। এ শহরে এরকম লিফটে আগে কখনো চড়িনি এমনও নয়! কিন্তু গাড়ীবাড়ী পরিবেশ তার ওপর লীনা যুগলভাই আর দুপুরের ঘটনা সবকিছু মিলে আমার মাথাটা তখন বেশ একটু গুলিয়ে দিয়েছে। লীনা লিফটে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছে, তার গা থেকে দামী বিদেশী সেন্টের যে গন্ধটা পাচ্ছিলাম সময় ও ভূমিকা অন্যরকম হলে তার মাদকতা স্বীকার না করে পারতাম না।

অটোমেটিক লিফট সাততলায় গিয়ে থামল। দরজা খুলে বেরিয়ে যে-ফ্ল্যাটে যুগলভাই আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন তার ঐশ্বর্য-বিলাসের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা আর করবো না। আমরা গিয়ে পুবের বারান্দায় বসেছিলাম। সাততলার ওপর সেখানে বিরল ফুলের একটা বাগান যেন কাছেরই হর্টিকালচারাল গার্ডেন থেকে তুলে আনা হয়েছে।

সেই বারান্দায় সংগে মনানসই বাহারি কেদারায় বসবার পর যুগলভাই কি আমরা পান করতে চাই জানতে চাইলেন।

ধোপ-দুরস্ত যথাযোগ্য উর্দিপরা এক-জন বেয়ারা তখন অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এইমাত্র ত চা খেয়ে আসছি' পরাশর বললে, 'আমার আর কিছুই চাই না। তবে মিঃ ভদ্র সুপা না গরল কিসে চুমুক দিতে চান ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

পরাশরের হঠাৎ বেখাপ্পা এই বাক্‌-চাতুরী আর তার সংগে এসব ফাঁকা লোক-লৌকিকতা তখন আমার আর ভাল লাগছে না। আসল কথা পাড়বার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠছি। আপ্যায়নের ঝামেলা চুকোবার জন্যে এক কাপ কফি চেয়ে নিজের প্রশ্নটা জানালাম।

'সমস্ত ব্যাপারটা এবার কেউ আমায় খুলে বলবেন?' গলাটা যতটা চেয়েছিলাম ততটা মোলায়েম রাখতে পারলাম না, একটু রুক্ষই হয়ে গেল।

নিশ্চয় নিশ্চয়!—পরাশর তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিলে। তারপর যুগলভাই-এর দিকে ফিরে বললে,—কি যুগলভাই আপনিই বলবেন না আমি? ব্যাপারটার উনকুট চৌষট্টি অনেক আছে ত! আমি আবার হাড়ির খবর সব এখনো পাই নি!

অরে আপনেই বোলে দিন না।—যুগলভাই পরাশরকে উৎসাহ দিলেন,—আপনার যেখানে গলতি হোবে হামি বাংলা বোললে আপলোক ত থোড়েই সমঝাবেন। হিন্দী বোললে ভি ওই মাফিক।

তার চেয়ে মিস লীনাই বলুক!—পরাশর হঠাৎ সমস্যাটার সমাধান করে ফেললে।

আমি!—লীনার মৃদু একটু আপত্তি দেখা গেল!—আমি তো মিঃ ভদ্রের মতই বাইরের লোক। আমি আর কতটুকু জানি।

তবু বাইরের লোক হিসেবে আপনার বলার দামই বেশী। পরাশর লীনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে,— যুগলভাই প্রথমতঃ ভালো করে গুছিয়ে বলতেই পারবেন না, দ্বিতীয়তঃ উনি নিজেই এ ব্যাপারের সংগে জড়িত বলে, বলার মধ্যে নিরপেক্ষতা রাখতে পারবেন না। আমার বেলা অসুবিধে আর এক দিক দিয়ে। প্রথমতঃ আপনি যা জানেন তার চেয়ে বেশী কিছু আমি জানি না—তার ওপর বলতে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনের যে তোলপাড় চলছে সেসবও বেরিয়ে পড়ে বিবরণটা একপেশে করে দিতে পারে। আপনার বেলা সেসব ভয় নেই একটা সোজা সরল বিবরণ অন্ততঃ পাব।

পরাশরের যুক্তিগুলো খুব যে জোরালো তা আমার মনে হল না। কিন্তু যা সে চেয়েছিল সে কাজ অন্ততঃ তাতে হল। লীনা ওই যুক্তিই মেনে নিয়ে একটু হেসে আমার দিকে ঈষৎ লজ্জিত কটাক্ষ একবার ছুঁড়ে বললে,— মিঃ ভদ্রকেই আমার ভয়। সম্পাদক মানুষ আমার বর্ণনার কত না খুঁত ধরবেন!

জবাবে রসিকতা করে বলতে পারতাম, কোনো ভাবনা নেই আপনার। খুঁত বেছে কপি কারেক্ট করেই আপনার রিপোর্ট ছাপব।

কিন্তু রসিকতার সে মেজাজ তখন নেই। শুধু বললাম—আপনি ত পরীক্ষা দিতে বসেন নি। তাতে আপনার অত ভয় কিসের?

পরাশর এই কথা শুনেই হঠাৎ অমন করে হেসে উঠবে ভাবতেই পারিনি। যেন কৌতুকে ডগমগ হয়ে হাসতে হাসতে বললে, —খুব ভালো বলেছ কৃত্তিবাস। এ তো আর পরীক্ষা দেওয়া নয়!

আমার ওই কথায় অত হাসবার কি পেল পরাশর সত্যিই বুঝে উঠতে পারলাম না। বিশেষ না ভেবেচিন্তে যে অন্যায় হায়রানিটা আমায় করিয়ে ফেলেছে তার গ্লানি একটু বি'ধছে বলেই সবকিছুর মাত্রা সে ঠিক রাখতে পারছে না বলেই মনে হল।

ভেতরে ভেতরে একটু গরম হয়ে বললাম,—নিন, আরম্ভ করুন মিস লীনা। বুঝতেই পারছেন কিরকম উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

লীনাকে আর বোধহয় সাধতে হত না। কিন্তু আরম্ভ করা তার হল না।

হঠাৎ ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমাদের টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাঃ দিব্যি আসর জমিয়েছ দেখছি তোমরা! আমি তাই ভাবি লীনা এমন অসময়ে তার ঘর ছেড়ে গেল কোথায়?

লোকটিকে বারান্দায় আসবার সময়েই টলতে দেখেছিলাম। এখন কাছে এসে দাঁড়াবার পর তার জড়ানো স্বর আর নিঃশ্বাসের সুবাসেই তার অবস্থাটা এই বিকেল বেলাতেই যে তুরীয় তা গোপন রইল না।

তাঁকে আসতে দেখার সংগে সংগে লীনার মুখে যেন একটা অস্বস্তি ও ভয়ের ছায়া আর যুগলভাই-এর মুখে একটা বিরক্তির ভ্রূকুটি দেখা গিয়েছিল।

যুগলভাই মুখের ভাবে না পারলেও গলার স্বরে তীব্র বিরক্তিটা দমন করে বললেন,—আমাদের অত্যন্ত দরকারী একটা আলোচনা হচ্ছে ভাইজি। লীনাকে যদি তোমার দরকার থাকে তাহলে একটু পরেই সে তোমার ওখানে যাচ্ছে।

একটু পরেই আমার ওখানে যাচ্ছে! বাঃ, চমৎকার! এতক্ষণ তোমাদের কাছে বসে লীনা ভঙ্গ দেবে কেমন? কেন আমি তোমাদের দরকারী আলোচনায় থাকতে পারি না!—জড়ানো অস্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলতে বলতে যুগলভাই-এর ভাইজি পাশের অন্য

চেহারা পোষাক চালচলন দেখে যুগলভাই মনুভাই দুজনেরই যাকে বলে ভক্তি হয়েছে। বোম্বাইএর যে জুয়েলার্স কোম্পানী মিস জাভেরীকে পরিচয়পত্র দিয়েছে তাদের সঙ্গে কিভাবে কতদিনের যোগাযোগ যুগলভাই একটু বুঝি জানতে চেয়েছিলেন। মনুভাই সে প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে হাসি-ঠাট্টার মেজাজে বলেছেন বোম্বাই-এর কথা কলকাতায় কেন? সে পুরোন সম্পর্ক ভুলে নতুন সম্পর্ক এখন পাতানো হচ্ছে কি বলেন মিস জাভেরী?

মিস জাভেরী গায়ে পড়া রসিকতা কতটা পছন্দ করেছে তার মুখ দেখে বোঝা যায় নি, কিন্তু সে সরাসরি কাজের কথায় নেমেছে।

ভেতরে আসবার সময় সঙ্গের বাক্সটা সে নিজেই বয়ে এনেছিল। কাউন্টারের কর্মচারী চাইলেও তাকে বইতে দেয় নি।

ঘরে এসে বসবার পর নিজের সামনে টেবিলের ওপরই বাক্সটা সে রেখেছিল। এবার সে সাবধানে বাক্সটার ডালা খুলে একটা আশ্চর্য জিনিষ বার করেছে।

একটা অত্যন্ত বিরল প্রাচীন যুগের অলঙ্কার। মিস জাভেরী তার ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণে নাম বলছে ভদ্রিকা। নাম যাই হোক অলঙ্কারটা সত্যিই অপরূপ। বিশেষ করে তার মণি-রত্নগুলি বসাবার কৌশল অপরূপ।

মিস জাভেরীর ডালা খোলা বাক্সে এই ভদ্রিকার মত আরো কয়েকটি অলঙ্কার দেখা গেছে ওপর থেকেই। সেই সঙ্গে কিছু চুনি পান্না হীরে গোছের পাথরও যা অত্যন্ত দামী বলেই মনে হয়েছে।

ভদ্রিকা নামের অলঙ্কারটি একটু ভালো করে দেখবার জন্যে যুগলভাই হাত বাড়িয়েছিলেন কিন্তু দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। তার আগেই মনুভাই সেটা নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেছেন,— এ রকম প্রাচীন অলঙ্কার আপনি পেলেন কোথায় মিস জাভেরী!

মিস জাভেরী তাতে জানিয়েছে যে দিল্লীর এক পাঁচপুরুষের বনেদী জহুরীর কাছে এ জিনিষ সে পেয়েছে।

বাক্স থেকে আর একটি অলঙ্কার বার করে দেখিয়ে সে তারপর বলেছে যে ভদ্রিকাটির মত অত প্রাচীন হোক না হোক ক্ষতি নেই, তার হাতের জিনিষটির মত ভারতীয় অলঙ্কারশিল্পের বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে এমন অলঙ্কার সে চায়। প্যারিসের প্রদর্শনীতে সেই ধরণের জিনিষের কদর হবে।

মিস জাভেরী এবার যে গয়নাটি বার করেছিল সেটি পরীক্ষা করবার সুযোগ যুগলভাই পেয়েছেন। দামী পাথর বসানো একটি চুড়ি। বারাণসীর স্বর্ণশিল্পের উঁচু দরের কাজ।

যুগলভাই সে কাজের তারিফ করেছেন আর তারপর মিস জাভেরীর অনুরোধ রাখতে তাঁদের নিজেদের ওই ধরণের অলঙ্কারের সংগ্রহ নিয়ে আসতে বলেছেন এ বিভাগের কর্মচারীকে।

কর্মচারী দুটি বাক্সে সে সংগ্রহ টেবিলের ওপর এনে রেখে যাবার পর মিস জাভেরী তার একটি দুটি অলঙ্কার তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষায় খুশি হয়ে একটি গলার হার সে নিজের বুকের ওপর রেখে তার কারুকার্যটা ভালো করে লক্ষ করবার জন্যে সেই ঘরের এক ধারে আয়নার কাছে যাবার জন্যেই বোধহয় উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই সময়েরই তার হাত থেকে ফসকে হারটা পড়ে গেছে নিচের মেঝের ওপর।

মেঝেয় মোটা কার্পেট পাতা। হারটা সুতরাং নরম কার্পেটের ওপর হাল্কাভাবেই পড়েছে। সেটা তখনই মেঝে থেকে তুলেও দিয়েছেন মনুভাই।

যুগলভাই সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে কিন্তু একটু অস্থির হয়েছেন।

পুরোনো গয়না, একটা আলগা পাথর কি করে তা থেকে খসে গিয়েছে!

পাথরটা অবশ্য এক রত্তি একটা পান্না। তবু সেটা না পেলে হারটার খুঁত হয়ে যাবে

মিস জাভেরী অত্যন্ত অপ্রস্তুত লজ্জিত হয়ে মেঝেয় কার্পেটের ওপর পাথরটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার সাহায্যে যুগলভাই মনুভাইও লেগেছেন। মনুভাই-এর চেষ্টা একটু বেশী আন্তরিক বলেই হয়ত ব্যাকুলতা অবশ্য একটু বেশী বলেই তিনিই সবার আগে পান্নাটা খুঁজে পেয়েছেন মিস জাভেরীর শাড়ির ভাঁজের মধ্যে। পাথরটা খুঁজে পেতে মিনিট খানেকও সময় লাগে নি।

মিস জাভেরী তার অসাবধানতার জন্য মাপ চেয়েছে।

যুগলভাই ও মনুভাই দুজনেই তাকে জানিয়েছেন যে মাপ চাইবার মত কিছুই হয় নি।

মিস জাভেরী এরপর যে কটি গহনা তার পছন্দ সেগুলি দেখিয়ে দিয়ে মোট তার একটা দাম জানতে চেয়েছে এবং দাম জানবার পর সন্তুষ্ট হয়ে সেইদিনই বিকেলে এসে গহনাগুলো নিয়ে যাবে বলে তার বাক্সটা হাতে নিয়ে বিদায় নিয়েছে।

মনুভাই-এর পক্ষে এবার যেটা স্বাভাবিক ছিল তা কিন্তু তিনি করেন নি। দোকানের মাঝখানে ব্যাপারটা একটু বেশী বিসদৃশ দেখাবে বুঝে কিংবা সকাল থেকেই রং চড়িয়ে থাকার দরুন নিজের পায়ের ব্যালেন্সের ওপর খুব বিশ্বাস না থাকায় মিস জাভেরীকে গাড়ি পর্যন্ত আর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন নি।

তার বদলে মিস জাভেরী চলে যাবার পর ছোট ভাইএর বিরুদ্ধে নালিশের সুরে বলেছেন,— একেবারে গলাকাটা দাম হাঁকলে ত?

যুগলভাই তখন দোকানের ও অফিসের 'ইনটারকম' ফোনে মেয়েটির গাড়ির নম্বরটা আর কোথায় যায় দেখে আসবার নির্দেশ দিচ্ছেন প্রধান গুপ্ত প্রহরীকে।

নির্দেশ দেওয়া শেষ করে মনুভাইএর কথার জবাবে একটু অপ্রসন্নভাবে বলেছেন,— গলাকাটার বদলে জলের দামে দিতে চাইলেও ওই মিস জাভেরী আর আসত না মনে করছ? এসব খদ্দের আমি চিনি। শুধু চাল দেখিয়ে বেড়ানো। তুমি নেহাৎ মেয়ে শুনলেই গলে যাও তাই, নইলে আমি এ ঘরে ওকে খাতির করে এনে বসাতাম ভেবেছ!

কিন্তু তুমি ওর পেছনে গোয়েন্দা লাগালে কেন?—বেশ একটু অপ্রসন্নভাবেই বলেছেন মনুভাই।

গোয়েন্দা লাগাই নি, তোমার ভাবনার কিছু নেই!—যুগলভাই আশ্বস্ত করেছেন বড় ভাইকে,—শুধু গাড়িটায় নম্বর আর কোন দিকে যায় একটু দেখে আসতে বলেছি। অন্যায় কিছু করেছি কি? মিস জাভেরীর মত মেয়ের খোঁজ-খবর একটু নিয়ে রাখা ত ভালো। তোমারই কাজে লাগতে পারে।

মিস জাভেরী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনুভাই অফিস ঘরের আলমারী থেকে বোতল গেলাস বার করে মৌতাত শুরু করে দিয়েছিলেন। অফিসে তাঁর খেয়ালমত শুভাগমনের জন্যে এসব সর্বদা মজুত থাকে।

ছোট ভাই-এর বিদ্রূপের জবাবে সে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে বলেছেন,—দেখি তোমার ধুরন্দর গোয়েন্দা কি খোঁজ-খবর আনে!

ধুরন্ধর গোয়েন্দা কোনো খোঁজ-খবরই কিন্তু আনতে পারেন নি। গোয়েন্দার নাম মিঃ ঘোষাল। গোয়েন্দা হিসেবে তিনি কাঁচা আনাড়ি ত ননই বরং রীতিমত অভিজ্ঞ পাকা লোক। আসলে পুলিশের কাছ থেকেই তাঁকে পাওয়া। পুলিশ বিভাগ থেকে গাফিলতি কি অক্ষমতার জন্যে কাজ তাঁর যায় নি। কলকাতা থেকে বদলী হতে চান না বলে মিঃ ঘোষাল নিজেই সসম্মানে সে চাকরী ছেড়ে মনুভাই যুগলভাই-এর বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এ কাজের জন্যে মনোনীত হয়েছেন।

মিঃ ঘোষাল যুগলভাই-এর নির্দেশ পেয়ে গাড়ির নম্বর ও কোন দিকে তা যায় জেনে আসবার জন্যে মিস জাভেরীকে অনুসরণ করেছিলেন।

বাইরে বেরিয়ে কিন্তু তিনি দস্তুরমত ফাঁপরে পড়েছেন। তাঁর তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। কি করবেন ঠিক করতেই তাঁকে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে।

মেয়েটি তার গাড়িতে গিয়ে উঠবে আর মিঃ ঘোষাল গাড়িটার পরিচয় ও নম্বর নিয়ে কোন দিকে সেটা যায় তা দেখে এসে যুগলভাইকে জানাবেন এই কথা ছিল। কিন্তু সোজা ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে একটি কারণে।

তাঁদের দোকানের কাছেই যে ছোট একটা পার্কিং লট আছে তার মধ্যে মেয়েটি যে গাড়িতে এসেছিল বলে জানেন তার কোন চিহ্নই নেই।

মেয়েটি সেদিকে যায়ও নি। হাতের বাক্সটা নিয়ে মনুভাই যুগলভাই-এর দোকান থেকে বেরিয়ে সে পাশের ফুটপাথ দিয়ে

মাসোহারা ব্যবস্থা করে গেছলেন। কোনো লেখাপড়া না থাকলেও সেটা আমি প্রাণে আমরা দিয়ে যাই। চাকরি-টাকরি পছন্দমত ও এখনো পায়নি তবে ওই মাসোহারা আর বাড়িভাড়াতেই ওর মা —ওর যে মাসী ওর সঙ্গে থাকেন তাঁদের একরকম চলে যায়।

যুগলভাই তাঁর কথা শেষ করবার পর একটু চুপ করে থেকে পরাশর বললে—আপনি এতটা বেশী করে বিবরণ দিয়ে যা চাপতে চাইলেন, তা কিন্তু আপনার একটা মুখ-ফসকানো কথাতেই ধরা পড়ে গেল যুগলভাইজি।

কি মুখ-ফসকানো কথায়?—যুগলভাই একটু প্রতিবাদের সুরেই বললেন।

ওই 'আমি' বলতে গিয়ে থেমে 'আমরা' বলায়।—পরাশর একটু হেসে বুঝিয়ে দিলে, ও মাসোহারাটা আপনিই অন্যের মতের বিরুদ্ধে দিচ্ছেন।

না, না তা ঠিক নয়।—যুগলভাই তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানালেন,—ওকে মাসোহারাটা দেওয়ায় কারুর আপত্তি নেই। তবে, তবে...

যুগলভাই দ্বিধাভরে একটু থামলেন।

তবে কি? পরাশর জিজ্ঞাসা করলে।

তবে, বাবা থাকতে যা কোনদিনও বুঝতে পারেনি,— যুগলভাই আর ঢেকে রেখে লাভ নেই বলে কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলেই ফেললেন,—এখন মাঝে মাঝে সেটা বোধহয় একটু স্পষ্ট করেই টের পায়। আশ্রিতা হিসেবে অনুগ্রহ নিতে হলে একটু ছোট হয়ে মন রাখবার চেষ্টা ত' করতেই হয়।

পরাশর কয়েক সেকেণ্ড কথাগুলো যেন ভালো করে বোঝবার জন্যে চুপ করে থেকে বললে,—মাপ করবেন, আর একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনি আর মনুভাই কি বিবাহিত?

যুগলভাই হেসে বললেন, ভাঁওাই ঘোষালের কথায় আপনাকে এবার গোয়েন্দা হিসেবে ডেকে ভুল করেছি। এখন গোয়েন্দাগিরির চেয়ে ঘটকালিতেই আপনার ঝোঁক বেশী মনে হচ্ছে। আপনি ত এরপর আমাদের চোদ্দপুরুষের ঠিকুজি চাইবেন; তবু আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে আমার এখনো বিয়ে হয়নি আর ভাইজি বিপত্নীক। বছর-দুই হল ও'র স্ত্রী মারা গেছেন।

আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন এইখানেই শেষ। —বললে পরাশর, এবার যা জেনে আমায় ডেকেছেন, সেই গোয়েন্দা হিসেবেই নতুন একটা-দুটো প্রশ্ন করছি। আপনাদের কার-ঘরে এর আগে এরকম চুরি কখনো হয়েছে কি?

না, এরকম হয়নি। যুগলভাই জবাব দিলেন, তবে ছোটখাটো একটা চুরির কথা ত' আপনিই জানেন। আপনাকেই সেবার ডাকা হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার প্রথম সামান্য পরিচয় সেই তখনই।

হ্যাঁ, পরাশর সায় দিলে, তবে আপনি ব্যাপারটা একেবারে চাপা দিলেও ছোটখাটো চুরি সেটা ছিল না। আপনাদের মত ধনীরা কি আনেন জানি না কিন্তু দশ হাজার আমাদের কাছে অনেক টাকা যুগলভাইজি।

যাক সে কথা মেতে দিন।—যুগলভাই প্রসঙ্গটা স্পষ্টই এড়াতে চাইলেন।

সেবারও আপনি অনুসন্ধানের মাঝপথে ব্যাপারটা হঠাৎ চাপা দিয়েছিলেন।—পরাশর একটু ক্ষুণ্ণস্বরে জানালে, সমস্ত খেই যখন আমার হাতের মুঠোয় আপনি তখন আর ব্যাপারটা নিয়ে এগুতে চাননি। সে চুরির সঙ্গে এটার কিছু সংশ্রব থাকতে পারে যুগলভাইজি!

আমি তা মনে করি না। —যুগলভাই জোর দিয়ে বললেন, তাছাড়া সামান্য যা পেয়েছেন এ-চুরির রহস্যভেদের জন্যে তাই বোধহয় যথেষ্ট।

বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। পরাশর একটু হেসে বললে, এখন মনুভাই কোথায় থাকেন যদি একটু জানান।

ভাইজি এই বাড়িরই আর একতলা ওপরে উত্তরের উইং-এ থাকে। উত্তরের দুটো ফ্ল্যাটেই সে নিয়ে আছে সুতরাং খোঁজার জন্যে ফ্ল্যাট নম্বর দরকার হবে না। জানালেন যুগলভাই।

কিন্তু মনুভাই ত' বিপত্নীক বললেন! —আমিই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না,—দু-দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি কি করেন? ছেলেপুলে আছে অনেক!

না,—যুগলভাই দুঃখের হাসি হাসলেন —বিয়ের ছমাসের মধ্যে আমার ভৌজী মারা যান। সুতরাং ছেলেপুলে কোথায়! ভাইজি ওখানে একাই থাকেন। বাড়তি ফ্ল্যাটটা নিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্যে। নতুন ভৌজী এলে তাঁর সম্মানে হাত-পা ছড়াবার জায়গাটা বাড়াতে হবে ত!

শেষ কথাগুলো বলবার সময় যুগল-ভাই-এর চোখ-মুখের প্রসন্ন কৌতুকটা লুকোনো রইল না।

তাইতেই একটু ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—নতুন ভৌজী শীগগিরই আসছেন বুঝি?

আসছেন কিনা জানি না।—যুগলভাই-এর মুখটা আপনা থেকেই কি একটু বিষণ্ণ দেখালো এবার?—তবে তোড়জোড় ত' চলছে দেখতে পাচ্ছি।

আচ্ছা, মনুভাই-এর ফ্ল্যাট ত জানলাম। —পরাশর কথাটা ঘোরালে,—লীনা দেবীর বাড়ির ঠিকানাটা যদি দেন।

লীনা দেবীর ঠিকানায় কি হবে!— যুগলভাই মৃদু একটু আপত্তি জানালেন, বেচারাকে এমনিতেই যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়েছে, এর ওপর আরো জ্বালাতে চান?

না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।—পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, পারতপক্ষে ওঁকে আর এ-ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করব না। ঠিকানাটা তবু রুটিন হিসেবে জেনে রাখতে চাই।

যুগলভাই ঠিকানাটা দেবার পর আমরা উঠে পড়েছি বিদায় নেবার জন্যে।

দাঁড়ান! দাঁড়ান! যুগলভাই হেসে অনুরোধ জানালেন, মিঃ বর্মার কাছে হারা বাজির টাকাটা দিয়ে দিই।

সেটা এখন থাক্। পরাশর হেসে বললে,—বাজির টাকা আর আমার গোয়েন্দা-গিরির ফী একসঙ্গেই নেব।

তাই দেবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে রইলাম মিঃ বর্মা। যুগলভাই একটু জ্বালার সঙ্গেই জানালেন,—লোকসান যা হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়ে বেশী লাগছে একটা বলতে গেলে একরত্তি মেয়ের এমন করে আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে ঠকিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাবো না।

নিষ্পত্তি শীগগিরই হবে। পরাশর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাস দিলে, —যদি না আপনি আবার মাঝপথে আমায় থামতে বলেন।

না, না মতটা যত অপ্রিয় হোক এবার আপনাকে থামতে বলব না। যুগলভাই দৃঢ় স্বরে জানালেন।

এই আশ্বাসটুকুই আপনার কাছে চাইছিলাম। বলে পরাশর লিফটের দিকে পা বাড়ালে। সেই সঙ্গে আমিও।

যুগলভাই একজন পরিচারককে বোতাম টিপে ডেকেছিলেন লিফটে আমাদের নামিয়ে দেবার জন্যে। পরাশর অটোমেটিক লিফট নিজেই চালাতে পারবে বলে সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে।

প্রত্যাখ্যান করবার কারণটা অটো-মেটিক লিফটের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারলাম।

নিচে নামবার নয় পরাশর তখন ওপরে ওঠবার বোতাম টিপেছে। যুগলভাই-এর ঠিক ওপরের তলায় যাবার বোতাম।

কয়েক সেকেণ্ডেই লিফট সেখানে পৌঁছে দরজা আপনা থেকে খুলে গেল।

পরাশরের এসব রেয়াড়াপনা আমার জানা। হেসে তাই বললাম, তুমি মনুভাই-এর ফ্ল্যাটে আসতে চাও তো যুগলভাইকে জানাতে কি হয়েছিল?

জানালে 'ভাইজিকে এখন আবার বিরক্ত করবেন!' বলে সাতটা ওজর তুলতেন হয়ত। পরাশর হেসে বললে,—উনি ত চান কাউকে কিছু জানাতেন না করে আমি ফুসমন্তরে মিস জাভেরীকে হাজতে পুরে দিই।

তবে, যদি বলি,—পরাশর একটু থেমে নিজের ভুল স্বীকারের ভঙ্গিতে আবার বললে,—শুধু চেহারা দেখেই মানুষকে আগে থাকতে যে বিচার করতে নেই যুগল-ভাই-এর বেলা তা ভালো করেই আজ বুঝলাম।

ঠিক বলেছ, পরাশরকে সমর্থন না করে পারলাম না,—ওই কুমড়োপটাশের মত চেহারা, ঘাড়ের মাংসের থাক, তার ওপর গাড়ি, বাড়ির সঙ্গে একেবারে বেমানান গলার হার, দশ আঙুলের আংটি সমেত ওই সৃষ্টিছাড়া বাংলা শুনে লোকটাকে একটা হাঁদা সং গোছের মনে হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু পরে কথাবার্তা আর ব্যবহারে দস্তুরমত সমীহ করবার মানুষ বলে টের পেলাম। ভাঙা ভুল বাংলার বদলে নিজের ভাষা বলার সঙ্গে মানুষটাই যেন চোখের ওপর বদলে গেল।

তাহলে তুমিও তা লক্ষ্য করেছ? বলে আর কি যেন একটা জানাতে গিয়ে পরাশরকে হঠাৎ থামতে হল।

আমিও তখন সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

লিফট থেকে বেরিয়ে চওড়া করিডর দিয়ে তখন আমরা মনুভাইয়ের জোড়া ফ্ল্যাটের একটি দরজার সামনে এসে উপস্থিত।

আধুনিক ফ্ল্যাট হলেও কিম্বা বলা উচিত বোধহয় আধুনিক ফ্ল্যাট বলেই দেয়াল থেকে দরজা সবই একটু পাৎলা, শব্দ আটকাবার মত শক্তি ধরে না।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভেতর থেকে একটা হুমকি গোছের শোনা গেল—না না এখন তোমায় যেতে দিচ্ছে কে?

গলাটা স্পষ্টই মনুভাইয়ের। নেশায় বেশ জড়িত।

তার উত্তরে লীনার কাতর আবেদনটাও শুনলাম,—দোহাই আপনার! এখন জোর করে আমায় ধরে রাখবেন না!

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ নেপথ্য নাটিকার আরো কিছু সংলাপ বোধহয় শোনা যেত।

কিন্তু পরাশর সে লোভ জয় করে কলিং বেলটা জোরে জোরে টিপল। টিপল দুবার।

ওধার বেশ কয়েক সেকেণ্ড একেবারে নীরব। তারপরে দরজাটা এসে খুলে দিলেন স্বয়ং মনুভাই।

দরজা খুলে নেশায় আবিষ্ট চোখে আমাদের দিকে যেভাবে তাকালেন তাতে মনে হল আমাদের চিনতেই পারছেন না।

আমরা,—বলে পরাশর প্রায় পরিচয় দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ যেন স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে বললেন,—ও, আপনারা সেই টিকটিকি! তা আমার এখানে কেন? এখানে ত আরশুলা-টারশুলা নেই। কী? আছে লীনা?

মনুভাই নিজের রসিকতাতেই হেসে মাৎ করে পিছনে ফিরলেন লীনার জন্যে।

কিন্তু কোথায় সেখানে লীনা!

দরজা খোলার সংগে সংগেই সে ভেতরে চলে গেছে নিশ্চয়।

লীনাকে দেখতে না পেয়ে অদ্ভুত মুখ-ভংগী করে আমাদের দিকে ফিরে মনুভাই বললেন,—ভেলকি! প্রেফ ভেলকি! এই ছিল এই নেই!

মনুভাইয়ের অবস্থা এখন একটু বেশী-রকম বেসামাল বলে বুঝলাম। পরাশরকে একটু টিপে দিয়ে সেই কথাই একটু ঘুরিয়ে জানালাম,—আজ হেড অফিসে ছুটি বুঝেছ? সাড়া দেবার কেউ নেই!

আছে! আছে! —মনুভাই হেসে উঠলেন,—ছুটি হলেও হেড অফিসের দারোয়ান যাবে কোথায়। টিকটিকিদের জন্যে সে খাড়া পাহারায় আছে। আসুন, আসুন পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন।

মনুভাই-এর অভিনয়ের ভাঁড়ামিতে যত [illegible] তার কথায়। মনুভাই গোড়া থেকে আমাদের সংগে বাংলা কথাই বলছিলেন কিন্তু আমার ওই ঠারে কথাও বুঝে বাংলায় অমন চোস্ত জবাব তিনি দিতে পারবেন ভাবতে পারি নি।

আমি মনুভাই-এর বাংলা অভ্যর্থনায় ভেতরে যেতে একটু দ্বিধা করছিলাম কিন্তু পরাশর যেন পরম আপ্যায়িত হয়ে গট গট করে ভেতরে চলে গেল।

তখন তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর উপায় কি?

বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকবার পরই ডাইনের একটি প্রশস্ত ড্রইংরুম। পরাশর মনুভাই-এর পথ দেখানোর জন্যে অপেক্ষা না করেই পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

তার পেছনে পেছনে ঢোকবার সময়ই পরাশরের যেন বিস্মিত সম্ভাষণ শুনলাম।

এই যে লীনা দেবী! আপনার সংগে আবার তাহলে দেখা হয়ে গেল। আপনি এখনো এখানে আছেন ভাবি নি।

লীনা দেবীর সম্বন্ধে একটু যেন বেশী ভাবছেন মনে হচ্ছে! পরাশরের কথার পিঠেই বিদ্রূপটা করে মনুভাই তখন ঘরের ভেতর এসে ঢুকেছেন।

নিজেই সবার আগে ধপ করে লীনার পাশে সেটী-টার ওপর বসে পড়ে আবার আমাদের বাংলা আপ্যায়ন জানালেন জড়িত স্বরে,—

কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন! না, সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই এসেছেন! এখনই তল্লাসী শুরু করে দেবেন!

তল্লাসীতে ধরা পড়বার জন্যে আপনি এ ফ্ল্যাটে কিছু রেখে দিয়েছেন,—পরাশর মনুভাই-এর উপযুক্ত শ্লেষের সংগেই জবাব দিলে,—এমন বোকা আপনাকে ভাবি না মনুভাই।

ভাবেন না? মনুভাই একটা হাত লীনার কাঁধের ওপর চড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আপনার এ তারিফে ধন্য হলাম। তাহলে এ ফ্ল্যাটে এসে অধমের প্রতি কৃপা করার কারণটা জানতে পারি। আপনাদের লীনা দেবীকে আর একবার দেখবার জন্যে এসেছেন কি!

কথা শেষ করার সংগে সংগে আমাদের সামনেই মনুভাই অভদ্রভাবে লীনাকে একটু কাছে টানবার চেষ্টা করলেন। লীনা অত্যন্ত অস্বস্তির সংগে লজ্জিত কাতর মুখে তাঁর হাতের নাগালের বাইরে সরে গেল।

সে দৃশ্যটা দেখে আমার মুখটা তখন আপনা থেকে কঠিন হয়ে উঠেছে। মনুভাই-এর গালে একটি চপেটাঘাত করে একটু ভদ্রতার শিক্ষা দেবার জন্যে হাতটা নিশপিশ করছে তখন।

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের পুণ্যপীঠ

মহাজাতি সদনে সংরক্ষিত দুইশত শহীদ, দেশনেতা ও সমাজসেবকের প্রতিকৃতির চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ

মৃত্যুঞ্জয়ী

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্নয়ন তথা নবভারতের জীবনাদর্শ গঠনে এই শিক্ষামূলক গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩·০০।

রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠালে ৪·৮০। ভি পি ডাকে পাঠানো হয় না।

মহাজাতি সদন। ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। কলিঃ—৭। ফোন ঃ ৩৪-৬৫০৯

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান ঃ বুকল্যাণ্ড অফ্ টো স্টোর্স। ১৬ গড়িয়াহাট রোড। কলি—১৯। জয়ন্তীপুর বুক ব্যুরো। ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড। কলি—২৫

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

শিক্ষা বিভাগ ও মনীষীবৃন্দ প্রশংসিত

॥ ছোটদের সচিত্র ইংরেজী-বাংলা অভিধান ॥

Common Words

A Simple English-Bengali Dictionary for Boys and Girls

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ

॥ মূল্য দুই টাকা ॥

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

পরাশরকে কিন্তু নির্বিকারই মনে হল। সেটা যদি তার অভিনয় হয় তাহলে তার আত্মসংযমকে বাহাদুরী দিতে হয়।

কিছুই যেন লক্ষ করে নি এমনিভাবে একটু হেসে মনুভাই-এর উপহাসটারই যেন জবাব দিতে পরাশর বললে,—লীনা দেবীর দেখা পাওয়াটা ত সৌভাগ্য। তবে—সেজন্য নয়, আপনার কাছে এসেছি শুধু একটা কথা জানবার জন্যে। যুগলভাই-এর ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসায় সেটা তখন জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পাই নি। অনুগ্রহ করে যদি প্রশ্নটার জবাব দেন তাহলে আর এক মুহূর্তও আপনার শান্তিভঙ্গ না করে চলে যাবো।

অত ভণিতায় কি দরকার টিকটিক সাহেব! মনুভাই ব্যঙ্গ আপ্যায়ন ছেড়ে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞাটা ভালো করেই এবার মুখে ফুটিয়ে বললেন,—কি প্রশ্ন আছে করে ফেলুন ঝটপট, তারপর সরে পড়ুন চটপট। নইলে টিকটিক-গিরগিটি তাড়াবার ওষুধ আমি জানি।

আমার কান দুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রাগে কিন্তু পরাশর অপমানটা গ্রাহ্যই না করে শান্তভাবে বললে,—আপনি আজ আপনাদের দোকানে কেন গেছলেন এইটুকু শুধু জানতে চাই।

মনুভাই প্রথমটা যেন এ প্রশ্নে অবাকই হলেন।

বললেন,—বাঃ আমার দোকানে আমি গেছি তার আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি?

না, কৈফিয়ৎ নয় মনুভাইজি,—পরাশর আগের মতই শান্তস্বরে বললে,—কিন্তু আপনি ত দোকানে সাধারণত যান না। ন মাসে-ছ মাসেও আপনাকে দোকানে দেখা যায় না বলে শুনলাম। আজ হঠাৎ সেখানে গেলেন সেইটুকু তাই জানতে চাইছি। গেছলেন আবার ঠিক ঘটনার সময়টাতেই...

শাট আপ! গেছলাম আমার খুশি। মনুভাই পরাশরকে হঠাৎ গর্জন করে উঠে থামিয়ে দিলেন,—আমার দোকানে আমি কখন যাই না যাই, দ্যাট্স নন্ অফ ইয়োর বিজনেস্। গেট আউট!

এ অপমানের পর গালে একটা থাপ্পড় যদি মারা না যায় তাহলে অন্তত আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ানো অসম্ভব।

পরাশর কিন্তু অম্লানবদনে এ অপমান হজম করে প্রায় মিষ্টি গলাতেই বললে,—আপনি হঠাৎ রেগে গেলেন কেন মনুভাইজি! নিজের দোকানে সত্যিই ত আপনি যখন খুশি যেতে পারেন। তাই নিয়ে একটা নির্দোষ প্রশ্নে হঠাৎ অমন চটে উঠলে যে একটু অন্যরকম সন্দেহ হতে পারে। যেমন আমার মনে হচ্ছে যে.....

গেট আউট! আই সে,—গেট আউট! মনুভাই এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে চিৎকার করলেন। পরাশরের অতগুলো কথা যে তিনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন সেইটেই আশ্চর্য।

মনুভাই-এর শেষ চিৎকারের সঙ্গে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল যা দেখে মনুভাই-এর মত আমরাও রীতিমত অবাক!

মনুভাই-এর শেষ 'গেট আউট' উচ্চারিত হতে না হতে দেখলাম লীনা হঠাৎ তার আসন ছেড়ে উঠে সবেগে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এই, এই..., তুমি...বলে মনুভাই একবার টলমল পায়ে এগিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লীনা তখন তাঁর নাগালের বাইরে আর তিনি নিজে টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে সেটীর পিঠের ওপরে।

সেই অবস্থাতেই যেন কোন বাধাই পড়ে নি এমনিভাবেই পরাশর তার গর্জনে থামানো কথাটা শেষ করে মনুভাইকে শুনিয়ে দিলে অবিচলিতভাবে,—মনে হচ্ছে কেন বলি, দৃঢ় ধারণাই হচ্ছে যে মিস জাভেরী আপনার অচেনা নয়।

মুখ চোখ প্রায় ফেটে পড়বার মত লাল করে মনুভাই শুধু আর একবার চিৎকার করলেন,—গেট আউট!

এবার তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে পরাশর বেরিয়ে এল।

আবার লিফটে নিচে নামতে নামতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, — হঠাৎ ওকথাটা বলতে গেলে কেন? মিস জাভেরীকে মনুভাই সত্যি জানে বলে মনে করো!

জানুক, না জানুক—পরাশর অদ্ভুতভাবে হেসে বললে,—বলে ত দিলাম।

এমনি বলে দিলে! সত্যি অবাক হয়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

না এমনি ঠিক নয়,—পরাশর আগের মতই হেসে বললে,—ওই কথা বলে থামিয়ে লীনাকে পালাবার আর একটু সময় ত দেওয়া গেল!

লিফট তখন নিচে নেমে অটোমেটিক দরজা খুলে গেছে। কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওঠবার জন্যে।

পরাশরকে আর কিছু তাই আর জিজ্ঞাসা করা হল না। তার শেষ কৈফিয়ৎটা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না একেবারেই।

মনুভাই যুগলভাইদের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা করে ট্যাক্সি নিয়ে পরাশর ও আমি যে যার বাসায় চলে এসেছিলাম।

সারা দুপুর আর বিকেল অসহ্য ধকল আর হায়রানি গেছে।

বাসায় গিয়ে ভালো করে স্নান করে একটু নিজের কাগজের কাজ নিয়ে বসব ভেবেছিলাম।

তা আর হল না।

স্নান সেরে এসে কাগজের কাজ নিয়ে বসতে বসতেই একটা ফোন।

ফোন করেছেন মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানের ঘোষাল। পরাশরকেই ফোন করেছিলেন। তাকে বাড়িতে না পেয়ে খবরটা অত্যন্ত জরুরী বলে আমাকেই জানাচ্ছেন। আমি যদি পরাশরের [illegible] থাকার কথা জানি তাহলে সম্ভব হলে সেখানেই ফোন করে যেন খবরটা দিই।

খবরটা যা শুনলাম, তা তুচ্ছ নয় বলেই মনে হল।

মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানের সামনে যে ক্যাডিল্যাকটা দাঁড়িয়েছিল তার রহস্য জানা গিয়েছে।

গাড়িটা যার-তার নয়, মধ্যপ্রদেশের মাঝারি গোছের এক রাজ এস্টেটের। সেখানকার দেওয়ান কি কাজে তাঁদের স্টেটের গাড়ি নিয়ে কলকাতায় মাত্র কয়েক দিন হল এসেছেন। গাড়িটা কদিন ধরেই দুপুরে ওই রকম সময়ে দেওয়ানকে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফিসে নামিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় পার্ক করে। সকালে পার্ক করতে যাবার সময়েই গাড়িটা একবার দোকানের সামনে বাধা পেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থেমেছিল। ঘোষাল দুপুরে বেরিয়ে ওই এলাকারই একটি পার্কিং লটে একটা ক্যাডিল্যাক দেখে কৌতূহলী হন। রাজ এস্টেটের ইউনিফর্ম-পরা ড্রাইভারের সঙ্গে কৌশলে আলাপ জমিয়ে তারপর কথায় কথায় এসব খবর জেনেছেন।

পরাশরকে পেলেই এসব খবর দেব আশ্বাস দিয়ে ফোন ছাড়লাম।

বাড়িতে ফিরে এরই মধ্যে পরাশর কোথায় আবার গেল ভাবতে ভাবতেই ফোন বেজে উঠল আবার।

একবারে অচেনা মেয়ের গলা পেলাম ফোন তুলে।

প্রথমে আমার কাগজের কোন গ্রাহিকা বা লেখিকা হবেন ভেবেছিলাম। আমার নাম করে আছি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন। আমিই কথা বলছি জানিয়ে ফোন যিনি করছেন তাঁর নামটা জানতে চাইলাম।

জবাব যা পেলাম শুধু তাইতে নয়, বলার ধরনের একটি বিশেষত্বে একেবারে চমকে উঠতে হল।

একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ঈষৎ খসখসে ধরা গলায় ওধারের মেয়েটি বললে,—আমায় আপনি চেনেন না, তবে নামটা শুনলে একটু শিউরে উঠতে পারেন। আজ সারা দিন এ নামটা অনেকবার শুনেছেন। নামটা হল মিস জাভেরী। হ্যাঁ ফোনের ভেতরেই আপনার চমকে ওঠাটা টের পেলাম।

শুধু মিস জাভেরী নামটা শুনে চমকে আমি উঠি নি, চমকে উঠেছি ফোনের কথাতেও ঈষৎ তোৎলামির আভাস পেয়ে মেয়েটির পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে।

ওধারে মিস জাভেরী তখন বলে যাচ্ছে —আপনাকে ফোন করা থেকেই বুঝতে পারছেন যে, আপনারা আমাদের যেটুকু খোঁজ-খবর এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন তার চেয়ে আপনাদের নাড়ী-নক্ষত্র আমরা অনেক বেশী জানি। আপনারা আজ যা যা করেছেন সব কিছুর ওপর আমরা নজর রেখেছি। এ ফোনটা প্রথমে আপনাদের বড় গোয়েন্দাকেই করেছিলাম, তাঁকে বাসায় না পেয়ে আপনার [illegible]

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট

লিলির থিন এরারুট

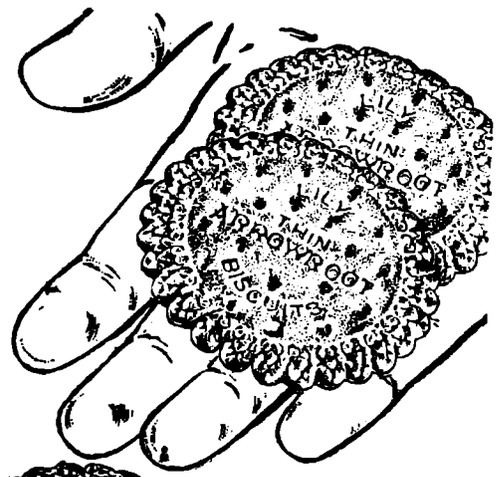

রোগী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী

সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

LB-32/63

লিলি বিস্কুটই কিনবেন

সেকালের কলকাতায় ছাত্রাবাস

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

(মানবিকবিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক)

[রচনাটি ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের রেণ্ডল এজুকেশনাল জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হয়। ওই বছরের আগস্ট সংখ্যায় রচনাটির প্রথম অংশ কলকাতার ছাত্র-জীবন (Student life in Calcutta) প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তখন ছাত্র। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগেকার কলকাতার ছাত্রদের কৌতুক-ময় জীবন-চিত্র এবং অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে আমরা তাঁর Hostel life in Calcutta রচনাটি বাংলাতে অনুবাদ করে দিলাম। — সঃ অঃ।]

কলকাতার সব ছাত্রাবাসের চিত্র একই ধরনের। কোনো কোনো ছাত্রাবাসে আরাম-আয়াসের সুযোগ-সুবিধা কিছুটা বেশি—তফাৎ এ-ই যা। ছাত্ররা হোস্টেলে একই ঘরে তিন-চারজনে, কখনো বা কোনোমতে একজনের একটা তক্তপোষ পড়ে—এমনি ছোটো ছোটো কুঠরিতে একাই বাস করে। কোনো কোনো ঘরে হয়তো জানালাও নেই। ঘরের সাদা দেওয়াল কোথাও একেবারে ফাঁকা, কোথাও-বা ক্যালেণ্ডার বা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের ফোটো ঝুলছে। ঘরের এখানে-ওখানে দেখা যায় টেবিলে ছড়ানো বই-খাতা; তক্তপোষের ওপর বিছানা দুমড়ানো। ওই বিছানায় বসেই ছাত্ররা আড্ডা জমায়, সারাদিন গড়াগড়ি যায়, ঘুমোয়, কখনো-বা তাস খেলে। একজন বাইরের লোক হয়তো এ-ধরনের জীবনে কোনো আনন্দ খুঁজে পাবে না, সবকিছুই হয়তো তার কাছে নীরস মনে হতে পারে কিন্তু একজন বাঙালী যুবকের কাছে এর চেয়ে প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় জীবন কিছুই হতে পারে না। যাঁরা হোস্টেলে থেকেছেন বা যারা এখনো রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে।

শয্যা-ত্যাগ — কাক-ভোরেই হোস্টেল-গুলোতে প্রাণের সাড়া পড়ে যায়। গরমের দিনে আরও আগেই ছাত্ররা উঠতে শুরু করে। শীতকালে বা বৃষ্টির দিনে তাদের বিছানা ত্যাগ করতে কিছুটা বেলাই হয়ে যায়। অবশ্য কিছু কিছু মার্কা-মারা কুঁড়ে ছাত্র আছে যতক্ষণ পারে তারা বিছানায় শুয়ে থাকে। ওঠার আগেও কিছুক্ষণ ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকে। একটা পুরো ঘরে যাদের একা থাকার সৌভাগ্য হয় তাদের পক্ষে যতক্ষণ খুশি শুয়ে থাকা সম্ভব; কিন্তু যাদের সে-সুযোগ নেই তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। হুটগোল আর অন্যদের আলাপ-আলোচনায় ঘুমের আমেজ উবে যায়। এসব অগ্রাহ্য করেও ঘুমিয়ে থাকার মানসিক শক্তি যাদের আছে বন্ধুদের জ্বালায় তাদেরও ঘুমোবার জো নেই। নানারকম দুষ্ট কৌশলে তারা তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বন্ধুদের হাসি-তামাসায় যারা সত্যি-সত্যিই চটে যায় তারা এবং যাদের রুমমেটরা নেহাতই শান্তশিষ্ট—এই দুই দল অবশ্য একটু বেলা পর্যন্তই ঘুমুতে পারে।

নাম-ডাকা—সাড়ে ছ'টার মধ্যেই মনিটর বা আবাসিক সুপারিনটেনডেণ্ট নাম-ডাকা সেরে ফেলেন। হোস্টেলের দারোয়ান তার-পর গেট খুলে দেয়। ঘুম থেকে উঠেই ছাত্রদের প্রথম কাজ হল দাঁত মেজে মুখ ধোয়া। তারপর অনেকে প্রাতঃকালীন স্নান সেরে নেয়। হিন্দু ছাত্ররা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুবই যত্নবান। কী গ্রীষ্ম, কী শীত তারা রোজ অন্তত একবার স্নান করবেই। কেউ-কেউ দু'বার, কেউ-কেউ বা দিনে তিনবারও স্নান করে।

গুলি-খোর—দু'চারজন আদুরে গোপাল তার ব্যতিক্রম। তাদের ধারণা, স্নান করলেই ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বন্ধুরা এই নিয়ে তাদের ঠাট্টা করে বলে : ও হল আদত 'Water-duck' বছরে দু'বার কি তিনবার স্নান করে। জন্মানোর সময় একবার স্নান করেছে, চিতায় উঠে আর একবার করবে। ওর অবস্থা হয়েছে জলাতঙ্কগ্রস্ত গুলিখোরের মতো। শোনা যায়, সেই গুলিখোর নাকি কয়েক বছর বাদে বাদে একবার স্নান করত।

এমনকি পুকুরের ধারে গিয়ে জলে গামছা ফেলে দিয়েও সে স্নান করতে পারেনি। ডুবন্ত গামছার দিকে চেয়ে সে ভেবেছে, চার আনার সামান্য এক গামছার জন্য আট আনার গাঁজার নেশা নষ্ট করা নেহাৎই বোকামি।

তেল বনাম সাবান—স্নানের সময় ছাত্ররা মাথায় নারকেল তেল বা সুগন্ধী কোনো তেল এবং গায়ে সরষের তেল মেখে নেয়। তারপর সারা শরীর গামছা দিয়ে খুব করে রগড়ে মাথায় বালতি বালতি জল ঢেলে, কেউ-কেউ বা সরাসরি জলের কলের নীচে বসেই স্নান সেরে নেয়। গ্রামের চিত্র অবশ্য আলাদা। সেখানে অনেক খাল-বিল-পুকুর রয়েছে। ছাত্ররা সেখানে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে স্নান সারে। কিছু ছেলে আছে যারা গায়ে তেল মাখাটা পছন্দ করে না; পরিবর্তে খুব করে সাবান মাখে। এসব ছেলেদের মধ্যে যাদের গায়ের রঙ ফর্সা নয়, বন্ধুরা তাদের নিয়ে রসিকতা করে; শরীর ফর্সা করবার নানা ধরনের উপায় বলে দেয়। শহরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের পাতায় নতুন কোনো প্রসাধন দ্রব্যের খবর বেরুবামাত্রই বন্ধুরা তাকে তা জানাতে ভোলে না।

প্রার্থনা—হিন্দু হোস্টেলগুলোতে খৃস্টান বা ব্রাহ্মসমাজের মতো নিয়মিত প্রার্থনার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এ-ব্যাপারে হিন্দুধর্ম উদার। অবশ্য ছাত্ররা ওপর দিকে চেয়ে দু-এক মিনিট চোখ বুজে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় রোজই; অন্তত দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম বা সমাজের রীতি-নীতিগুলো মেনে চলে। কিছু ছেলে আছে যারা যে-যার পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে স্মরণ করে। তবে ঈশ্বর-প্রার্থনায় যে তারা খুব মনোযোগী সেটা অন্যদের জানাতে দিতে চায় না কখনো। ওপর-ওপরে সকলেই এ-ব্যাপারে একটা খামখেয়ালির ভাব ফুটিয়ে রাখে। কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছাত্র অবশ্য আছে যারা সন্ধ্যা-আহ্নিক না সেরে গলা দিয়ে জলটুকু পর্যন্ত গলাবে না। রোজ সকালে স্নানের পর এবং সন্ধ্যায় তারা কুশাসনে বসে সামনে ছিপ-কোষে গঙ্গাজল নিয়ে যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করে পনের থেকে বিশ মিনিট আহ্নিক করবে।

শরীরচর্চা—স্নানের আগে অনেকে ডাম-বেল বা মুগুর নিয়ে কেউ-কেউরা ডজন-ডজন দণ্ড-বৈঠক দিয়ে কিছু সময় শরীরচর্চা করে।

প্রাতঃক্রিয়া—স্নান সারা হয়ে গেলে ছাত্ররা যে-যার চেয়ার-টেবিলে বই নিয়ে বসে। এক পরীক্ষা ঘনিয়ে না এলে সকালে সাধারণত কখনো সত্যিকারের পড়াশুনা হয় না। বন্ধুদের নিয়ে গল্পগুজব করতে, আড্ডা দিতে বা উপন্যাস পড়তেই তারা তখন বেশি ভালোবাসে। কেউ-কেউ বা প্রভাতী সংবাদ-পত্রের ওপর বেশ বুদ্ধিমানের মতো মন্তব্য বা আলোচনা করে সকালটা কাটাতে ভালোবাসে। মোট কথা, কলেজের পাঠ্য-পুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে সবকিছুই তার পছন্দ।

সাড়ে নয়টা থেকে বারোটা-একটা পর্যন্ত দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চলে। এমনিতে হোস্টেলে জলখাবারের কোনো বন্দোবস্ত নেই। কিছু কিছু ছাত্র বাইরে থেকে মাখন-রুটি-ডিম, রুটি-হালুয়া, কেউ-কেউ বা শুধু চা-বিস্কুট আনিয়েই প্রাতঃরাশ সেরে নেয়। রবিবার বা ছুটির দিনে সকলে একটু বেলা করেই জলখাবার খায়। বেশির ভাগ ছাত্রই অবশ্য সকালে কিছু খায় না। যাদের ক্লাশ প্রথম দিকে, তারা সকাল-সকালই তাড়াহুড়ো করে কোনোমতে মুখে চারটি গুঁজে কলেজে চলে যায়। আর যাদের দেরীতে ক্লাশ বা যাদের ক্লাশ নেই, তারা একটু বেলা করেই ধীরেসুস্থে একজন-দুজন করে বা পাঁচ-সাতজন একত্রে খাবার-ঘরে ঢোকে। যে-যখন আসে ঠাকুর তখনই তাকে খেতে দেয়। তখন ছেলেরা গল্প-গুজব, হাসিঠাট্টা করতে করতে খেয়ে চলে। ডাল-ভাত, তরকারী এবং একটা চাটনিই প্রধানত দুপুরের খাদ্য।

'ঠাকুর'—হোস্টেলের পাচকদের সম্মান দিয়ে বলা হত ঠাকুর। ডকটর সর্বাধিকারীর ছাত্র-জীবনের মতো ঠাকুররা এখনো আগের মতোই খেয়ালি। তাদের নিয়ে পেরে ওঠা দায়। না বলে-কয়েই একদিন হুট করে তারা কামাই করে বসে। বড়ো বড়ো হোস্টেলে হয়তো ততটা অসুবিধা হয় না, কিন্তু পাচকের সংখ্যা যেখানে দু-তিনজন, সেই-সব ছোটো ছোটো হোস্টেলে ছাত্রদের তখন খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। ছাত্রদের হোটেল বা মিষ্টি দোকানে গিয়ে যার-যার ব্যবস্থা তখন তার-তারই করে নিতে হয়। এক পরীক্ষার সময়টা ছাড়া ছাত্ররা সাধারণত এ-নিয়ে বিশেষ কিছু মনে করে না। ফীস্টের দিন ছাত্ররা সকলে একত্রে খেতে বসে। ঠাকুরদের পক্ষে সেদিন সব কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া খাবার-দাবার পাচার হবার ভয়টাও থাকে। তাই ছাত্রাবাসের ব্রাহ্মণ ছেলেরাও ঠাকুরদের সঙ্গে হাত লাগায়।

ক্লাসে : পিছনের বেঞ্চে—খাওয়া-দাওয়ার পর প্রথম দিকে ক্লাস থাকলে কলেজে চলে যায়; ক্লাস দু-একঘণ্টা বাদে থাকলে বিছানায় গড়িয়ে তন্দ্রার আমেজে একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ করে। কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য বা রুম-মেটরা অবশ্য সময়মতো তাকে ডেকে দিতে ভোলে না। নতুন নতুন ক্লাস করার উৎসাহ খুবই থাকে। ক্রমশ তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। তখন ক্লাসে যেতে হয় তাই যায়। সুযোগ পেলে অনেকেই পিছনের বেঞ্চে বসে ঘুমিয়ে নেয়। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায়, অধ্যাপকরা 'গুড বয়' বলে তাদের অনেকে বিশেষ করে সত্যি সত্যি মেধাবী অথচ চলনে-বলনে যারা একটু চটুল, তারাও মাঝে মাঝে পিছনের বেঞ্চে এসে আড্ডা জমায়। অধ্যাপকদের চোখের সামনে একনাগাড়ে 'নোট' লেখায় ছাত্রের বড়োই আলস্যেমি। কোনো কোনো অত্যুৎসাহী অধ্যাপক যখন বারবার জনে-জনের কাছে গিয়ে দেখেন তার লেকচারের 'নোট' ছাত্ররা তুলে নিচ্ছে কিনা, তখন তো ব্যাপারটা রীতিমতো বিরক্তির পর্যায়ে চলে যায়। এই বিরক্তিকর নোট লেখার চেয়ে কোনো পাঠ্যবই বা বোধিনীর প্রচ্ছদ মুড়ে বা তাদের আড়ালে লুকিয়ে-চুরিয়ে উপন্যাস বা রোমহর্ষক কোনো কাহিনী পড়তে তাদের বেশি পছন্দ। ভাব দেখায় যেন একাগ্রচিত্তে অধ্যাপকদের 'নোট' নিচ্ছে। আসলে গল্প-উপন্যাসের পাতায় সে তখন ডুবে আছে।

সামনের বেঞ্চে—সামনের বেঞ্চে বসা নিয়ে ঝগড়া করে এমন নিষ্ঠাবান ছাত্রেরও অভাব নেই। একাগ্রচিত্তে সর্বদাই তাদের খাতায় নোট নিতে ব্যস্ত দেখা যায়। পরীক্ষায় স্বভাবতই তারা ভালো করে। তবে তার মানে এই নয় যে, তারা সবাই খুব মেধাবী বা পরবর্তী জীবনে খুব উন্নতি

শক্তিপদ রাজগুরুর
সদ্য প্রকাশিত দুইটি উপন্যাস
ভোরের একটু আলো ৬·৫০
অবরুদ্ধ নগরী
পরাজিত সম্রাট ৭·৫০
মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবিরাজ
এণ্টনী ফিরিঙ্গী ৫·৫০
শান্তি দাসগুপ্তার
নিশিকন্যা ৫·৫০
রমনীমোহন পালের
সেবাসদন ৩·০০
উষা দেবী সরস্বতীর
ধূলির ধরায় ২·৫০
অমলেন্দু ভট্টাচার্যের
রক্তরাগ ৪·৫০
প্রকৃতিরঞ্জন দাসের
বসন্ত বাতাসে ২·৫০
শক্তিপদ রাজগুরুর
পথ বয়ে যায় ৩·৭৫
মন মানে না ৩·০০
অবাক পৃথিবী ৩·৫০
প্রভাত দেব সরকারের
আকাশ প্রদীপ ৩·৫০
চলন্তিকা প্রকাশক
১১২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

র। পিছনের বেঞ্চের ছাত্ররা হয় মেধাবী বুদ্ধিমান। চলতি কথায় বলা চলে : ড়ি মেরে পাশ করে সে। পিছনেই বসুক র সামনেই কিছুদিনের মধ্যেই নির্বিশেষে কল ছাত্রের মনেই তাদের অধ্যাপকদের পর্কে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। তাদের ই ধারণা বা মতামতের ওপরই কলেজের নাম গড়ে ওঠে।

'প্রক্সি লীগ'—অনুপস্থিত বন্ধুদের য়ে প্রক্সি দেওয়াতেই এক শ্রেণীর ছাত্রের ানন্দ। এদের কয়েকজনের এক-একটা দল াকে। দলের একজন না এলে আর-একজন ার হয়ে প্রক্সি দেয়। সৎ ছেলেরা অবশ্য াদের এই কাজ সমর্থন তো করেই না' ধরং নন্দা করে এই প্রক্সি-প্রথা দূর করতে লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যধ্যতামূলক উপ-স্থিতির কড়াকড়ি হ্রাস। অসুখ নেই বিসুখ নই শতকরা বেশ একটা উঁচু হারে ছাত্রদের াসে হাজিরা দিতেই হয়। হাজিরার এই ঁচু হার হ্রাস করে এবং অসুখ-বিসুখ বা বশেষ পরিস্থিতিতে অনুপস্থিত ছাত্রদের থা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে এ-্যাপারে ছাত্রদের সৎ হতে দেওয়ার সুযোগ দওয়া যেতে পারে।

প্রশংসনীয় সখ-চর্চার অভাব—ক্লাস হয়ে গলে ছাত্রদের কেউ-কেউ কলেজ-লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করে, কেউ-কেউ বা হোস্টেলে ফিরে উপন্যাস পড়ে, তাস খেলে বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। কিন্তু পরি-তাপের বিষয় এই যে, অবসর সময়ে কোনো প্রশংসনীয় সখের চর্চা করে—এমন ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য। হয়তো খেলাধুলোর প্রতি কিছু ছেলের ঝোঁক আছে, দু'-চারজন ফোটো তুলতেও বেরোয়, কিন্তু অধিকাংশ ছেলের কি ছবি আঁকা, কি বিভিন্ন আমলের স্ট্যাম্প বা মুদ্রা সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজে কোনো আগ্রহ নেই। ভারতীয় সংগীত আমরা সকলে বুঝি এবং শুনতেও ভালো-বাসি। কিন্তু ভাস্কর্য-চিত্রকলার প্রকৃত আগ্রহ আছে কচিৎ এমন ছেলের দেখা মেলে। তবে একটা আশার কথা এই যে, ইতিহাস, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে ছেলেদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশই দানা বেঁধে উঠছে। হাত-খরচের পয়সা বাঁচিয়ে অনেকে অবসর সময়ে এ-সবের চর্চা করে।

কিছুদিনের মধ্যেই হোস্টেলে ছাত্রদের কাছে প্রায় বাড়ির মতোই ভালো লেগে যায়।

টিফিন বা বৈকালিক জলখাবার—সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ ছাত্ররা বৈকালিক জল-খাবার খায়। তাতে থাকে সেঁকা রুটি-মাখন, সামান্য তরকারি বা একটা-দুটো মিষ্টি, কখনো-সখনো বা মাংস অথবা ডিম। ছাত্র-দের বন্ধুবান্ধব সাধারণত বিকেলেই বেড়াতে আসে। জলখাবারের সময় কেউ এসে পড়লে তাকে না-খাইয়ে ছাড়ত না। খাওয়া-দাওয়ানোর ব্যাপারে বাঙালী ছাত্ররা খুবই দরাজ।

বৈকালিক শরীরচর্চা—জলখাবার খেয়ে কেউ-কেউ বেড়াতে বেরোয়। কেউ-কেউ বা ব্যায়াম করতে যায়। বিশেষ কোনো আলো-চনার মগ্ন না থাকলে কোনো ছাত্রই এমনকি 'বইয়ের পোকা' বলে যাদের অভিহিত করা হয়, তারাও এ-সময় ঘরে বসে থাকে না। হোস্টেলের বেশির ভাগ ছেলেই বিকেলে ময়দানে বা ইডেন গার্ডেনে চলে যায়। প্রকৃতই যাদের খেলোয়াড় হবার আকাঙ্ক্ষা, তারা কলেজের মাঠে গিয়ে আসন্ন কোনো প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হতে থাকে। ইডেন হিন্দু-হোস্টেল এবং শিবপুর ইঞ্জি-নীয়ারিং কলেজ-হোস্টেলে সবুজ সতেজ দুর্বায় ঢাকা চমৎকার মাঠ রয়েছে। সেখান-কার ছাত্রদের বেড়াবার জন্য বাইরে বেরুতে হয় না। ওই মাঠেই হাত-পা ছড়িয়ে আয়াস করে বসতে পারে। অন্যান্য হোস্টেলের তুলনায় এখানকার ছাত্রদের জীবন তাই অনেক স্বচ্ছন্দ। বেশির ভাগ হোস্টেলেই কয়েক বর্গগজের এক ফালি ভিজে উঠোন ছাড়া মাঠ বলতে কিছুই নেই।

স্বল্পসংখ্যক হতভাগ্য ছেলে আছে যারা অল্পবয়সেই জীবন সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব নিয়ে বসে আছে। সর্বদাই তারা হাসিঠাট্টা পরিহার করে চলে। তাদের ধারণা, বারান্দায় দু'-চার মিনিট পায়চারি করলে কিংবা দোতলার রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে তন্ময় হয়ে কতকগুলো ধাড়ি ছেলের একটা বলের পিছনে ছোটা বা একটা সাটল-কক নিয়ে কয়েকজনের মরিয়া হয়ে দাপাদাপি করা বা করতে দেখটা ছেলেমি ছাড়া কিছুই নয়। তারা মনে করে, হজমের জন্য হালকা ব্যায়ামই যথেষ্ট। এইসব গম্ভীর ভদ্রলোকেদের ধারণা, ছাত্রজীবনই হল জীবনদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রকৃত সময়। ফুটবল-সীজনে যখন কোনো আকর্ষণীয় খেলা থাকে, দলে দলে ছাত্রেরা যখন খেলা দেখতে যায়, তারাও তখন ঘরে বসে থাকতে পারে না, মাঠের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

ফুটবল ম্যাচ : মোটা বনাম কৃশ—ইডেন হিন্দু-হোস্টেলে স্বচ্ছন্দ মেলামেশা বা আমোদপ্রমোদের সুযোগ-সুবিধা খুবই। তাই অন্য হোস্টেলের ছেলেদের মতো তাদের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট বা ইয়ংম্যান খৃশ্চান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থায় গিয়ে নাম লেখাতে হয় না। এমনিতে রোজ বিকেলেই ইডেন হিন্দু-হোস্টেলে ফুটবল খেলা হয়। একটু হাত-পা নাড়ার ইচ্ছে হলে যে-কেউ পছন্দমাফিক এক দলে নেমে পড়ে। যে-যার ইচ্ছেমতো খেলে চলে। তবে যেদিন আন্তঃকলেজ ফুটবল ম্যাচ বা কৃশ বনাম মোটা, লম্বা বনাম বেঁটে, বিবাহিত বনাম অবিবাহিত, চশমাহীন বনাম চশমাধারী ব্যক্তিদের মধ্যে খেলা হয়, সেদিন ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ফেটে পড়ে।

অধিকাংশ হোস্টেলে যে-জায়গা আছে, তাতে ব্যাডমিন্টন খেলা বা ডাম্ব-বেল-মুগুর দিয়ে ব্যায়ামের কাজটা চলে যায়।

দেখা-সাক্ষাৎ এবং সভা-সমিতি—বিকেল-বেলা ছাত্ররা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যায়। নিজের জেলার বন্ধুদের বাড়িতেই বেশি যায়। এক সেই সময়েই সে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে বা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস সরবৎ পান করে নেয়। বাজে খরচ বলতে এ-ই। কোনো কোনো রবিবারে অনেকে ব্রাহ্মসমাজেও যায়। ভক্তি-ভরে ধর্মালোচনা বা প্রার্থনা শুনতে তারা যায় না, যায় গান শুনতে। ভালো সাহিত্য-সভা হলে সকলেই যায়। তবে সাধারণত তারা বিকেলে একটু বেড়ানোর পর হোস্টেলে ফিরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই অধিকতর ভালোবাসে।

বৈকালিক আলোচনার আসর—ছাত্রাবাসে বিকেলটাই হল সবচেয়ে আনন্দের সময়। ছাত্ররা তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। হাসিঠাট্টা হৈ-হুল্লোড়ে একটা ঘণ্টা একেবারে মাতিয়ে রাখে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সংগীত, সাহিত্য এবং দেশের সামাজিক-সমস্যা থেকে এহেন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা চলে না। আলোচনা কখনো-কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি এল রায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখদের কেন্দ্র করে খুবই জমে ওঠে।

রবি-ভক্ত এবং দ্বিজু-ভক্ত—প্রত্যেক হোস্টেলেই দুটো দলের কথা শোনা যায়। রবি-ভক্ত আর দ্বিজু-ভক্ত। অতীতের হুইগ আর টোরিদের মতো তারাও পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাত। নিরপেক্ষ ছাত্ররা তাদের এই তর্ক উপভোগ করত এবং তর্ক বিবাদে পৌঁছবার আগেই দু' দলকেই শান্ত করে দেয়। বারান্দায় বা ঘরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আলোচনা আরো ভালো জমে। আড্ডায় এমনিতে কোনো নিয়ম-কানুন মানা হয় না। এমন কি ভাষার লাগাম পর্যন্ত থাকে না। বাংলা-ইংরেজী কথ্য ভাষা এবং তারই সঙ্গে মাঝে-মধ্যে সংস্কৃত মিশিয়ে জগাখিচুড়ি এক অদ্ভুত ভাষা তৈরী করে তারা। কিন্তু সেই একই বিষয় নিয়ে হোস্টেলের ডিবেটিং-এ আলোচনা করা কালে তাদের ভাষা হয় সংযত এবং জ্ঞানগর্ভ! আলোচনার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতেও হয় প্রয়াসী।

বিকৃত শব্দ—প্রায় সকল শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই কতগুলি উদ্ভট কথা বা শব্দের প্রচলন আছে। বাংলা ভাষায়ও অনেক বিকৃত শব্দ ঢুকেছে। একই দলের ছাত্ররা আকছার নিজেদের মধ্যে বিকৃত শব্দে কথা বলত। বাঙালী ছাত্ররা কতগুলি বাংলা কথার উদ্ভট ইংরেজি বের করেছিল। একজন ইংরেজ *arguefy, gatheration fatigued* (সংক্ষেপিত শব্দ) প্রভৃতির অর্থ সহজেই বুঝে নেবেন কিন্তু *dove will graze,* বা *body's cloth* অথবা *finish your meal morning morning this night* বললে তাঁরা কী বুঝবেন? *dove will graze* মানে, ডিটের ঘুঘু চড়বে, *body's cloth* মানে গায়ের কাপড় আর আজ রাত্রে সকাল-সকাল খেয়ে নাও বোঝাতে বলত *finish your meal morning morning this night.* ছাত্ররা এমনি নিত্যনতুন কত যে মিশ্র শব্দ তৈরী

করত তার ইয়ত্তা নেই। *Addity* বা *addification*-এর অঙ্কশাস্ত্রের যোগ-করার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করা অর্থে তারা এগুলো হরদম ব্যবহার করে। বাংলা শব্দ 'আড্ডা' থেকে এর উৎপত্তি। 'আড্ডা' মানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করা বা করার স্থান। ইংরেজি pass এবং fail শব্দ দুটোকে অতীতকালে সংস্কৃত ধাতুরূপের মতো ব্যবহার করে। যেমন, pa-pass-a (সে পাশ করেছে), pa-pess atuh, pa-fail-atuh, pa-fail up ইত্যাদি। এমন কি বংলার একান্ত নিজস্ব শব্দ ছাড়া (to give up =হিন্দী ছোড়না) সংস্কৃতের সঙ্গে একই ভাবে মিশিয়ে তারা ব্যবহার করে। যেমন, একজন আইন-ক্লাসের ছাত্র ক্লাস ছেড়ে দেওয়া বোঝাতে বলে— law-class-am Chachhara (আমি ল ক্লাস ছেড়ে দিয়েছি); তাদের কাছে অন্যদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করার নাম Captain (কাপ্তানী করা) কাপ্তেন বানানো বা পাকড়ানো হ'ল to patronise * এবং অনেক 'Captains' হওয়ার থেকে 'patrons' হওয়ার চেষ্টা করে।

ছাত্ররা পরস্পর নানান বিষয় নিয়ে তর্ক করে, আলোচনা করে কিন্তু কেউই তাতে কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। করতে হয় তাই আলোচনা করে। এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। অনেকের মনে কোনো একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাদের অজ্ঞাতসারেই তা হয়। অথবা কোনো মানসিক আঘাতে দীর্ঘদিনের কোনো বদ্ধমূল ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়াতেও তা হতে পারে। আলোচনার সময় ছাত্ররা প্রাণপণে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু পরে তা চালু করার প্রতি তার কোনো উৎসাহই থাকে না। এসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী ছাত্রদের অন্যরা করুণার চক্ষে দেখে। এইসব অত্যুৎসাহীদের আলোচনায় অন্যরা বিরক্ত হয়; আলোচনাকালে তাদের একেবারেই আমল দেয় না। সাধারণ ছাত্রদের কাছে ধারণা শুধুই ধারণা। এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অদলবদল হওয়া ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। যারা জাগতিক দিক উপেক্ষা করে নিজের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে-পড়ে লেগে যায় ছাত্ররা তাদের 'cracked' মাথাখারাপ বা for'y nine বলে ডাকে। কোনো কিছুর সংস্কারের মনোভাব যে তাদের একেবারেই নেই তা নয়। তবে কখনো বাহবা পাওয়ার জন্য তারা তা করে না। খুঁটিনাটি কাজের মাধ্যমেই তা করে। প্রচণ্ড ভাবাবেগ আর বিশৃঙ্খল মন নিয়ে তারা তা করে না।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তারা ছন্নছাড়া। আসলে তা নয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভালো কাজ করার প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। ছাত্রদেরও আছে। সেইজন্যই তারা ভালো কাজ করে এবং করে স্বেচ্ছায়। যদি কেউ তাকে আজেবাজে কাজ করতে পীড়া-পীড়ি করে বা পরামর্শ দেয়, সে বিরক্ত হয়। এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

গল্পগুজব বা আড্ডা জমানো হ'ল ছাত্রা-বাসগুলোর একটি চিরাচরিত এবং সর্বজন-প্রিয় ব্যাপার। সাধারণত সকাল সাড়ে ছয়টা-সাতটা থেকে রাত আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত গল্পগুজব চলে। কিন্তু কখন যে কোন্ আকর্ষণীয় আলোচনার সূত্রপাত হবে তার কোনো ধরাবাঁধা সময় নেই। আড্ডা দেওয়া সেরে ছেলেরা একে একে পড়তে বসে। যাদের কলেজের পড়া-লেখার চাপ কম, আড্ডা থেকে তাদের গা তুলতে তুলতে বেশ রাত হ'য়ে যায়। কখনো যদি নিজেদের কলেজ-টীম কোনো খেলায় জয়লাভ করে আর যদি হোস্টেল-সুপারিনটেনডেণ্ট কড়া ধাতের লোক না হ'ন তা'হলে ছাত্ররা অনেক রাত পর্যন্ত সোচ্চার আলোচনায় মগ্ন থাকে; উৎসব করে।

রাত নয়টা-সাড়ে নয়টায় রোল-কলের পর নৈশ-ভোজন শুরু হয়। সব হোস্টেলেই বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা আলাদা খাবার-ঘর আছে। তবে প্রায় সব হোস্টেলেই এ-ব্যাপারে কোনো রুড়াক্কড়ি বিধি-নিষেধ নেই। রাতে হাতে সময় থাকে অনেক। ছাত্ররা তাই গল্পগুজব ক'রতে ক'রতে ধীরেসুস্থে খেয়ে চলে। খেতে বসে সব ধরনের আলোচনাই চলে। সামান্য কঠিন-তরল খাদ্য থেকে গালগপ্প তাদের কাছে অনেক বেশি উপাদেয়। তবে বর্ষণমুখর সন্ধ্যার আড্ডার মতো নয়। বৃষ্টির এক-টানা বর্ষণের সঙ্গে দমকা হাওয়া বইছে। কাঁচালঙ্কা সরষের তেল মশলা আর ছোলা দিয়ে মাখানো মুড়ি মাঝখানের ঝুড়ি থেকে খেতে খেতে আষাঢ়ে গল্পের আসর চলে, তেমনটি আর কখনো নয়। তার যে কী আকর্ষণ বাঙালিরাই তা ভালো জানে। খাওয়া-দাওয়ার পর এক-দু'ঘণ্টা খুব মনো-যোগ সহকারে পড়াশুনা করে যে-যার শুয়ে পড়ে। পরীক্ষার আগে কিছু ছাত্র মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে পড়াশুনা করে। পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে অনেকে পড়তে পড়তে রাতই কাবার করে দেয়। ছাত্রমহলে তাদের ঘর 'Light House' আলো-ঘর নামে পরিচিত। তবে সাধারণত এক গরমের দিন ছাড়া সকলেই এগারোটা-বারোটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। আবহাওয়া গুমোট থাকলে ইডেন হিন্দু-হোস্টেলে বারান্দায়ও অনেকে শুয়ে থাকে। জ্যোৎস্না-রাতে বেশ রাত অবধি জেগে জেগে প্রাকৃ-তিক শোভাও নিরীক্ষণ করে অনেকে।

সিনেমা এবং থিয়েটার—ছাত্রদের প্রায় সকলেই বিকেলে সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যায়। অন্তত সপ্তাহে একদিন তো যায়-ই। মানসিক বৃত্তিচর্চার একটি প্রধান অঙ্গ চলচ্চিত্র। ছাত্ররা ছায়াছবি দেখে আনন্দ আর শিক্ষা দুই-ই লাভ করে। পৃথিবীর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। লা মিজারেবল্ Les Miserable কুয়ো ভাদিস Quo Vadis এবং দান্তের ইন্‌ফার্নো Inferno প্রভৃতি ছবি দেখে সেই সব অমূল্য সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হ'য়ে ওঠে। সিনেমা ছাড়া আর কোনো উপায়েই তাদের এইসব বই পাঠে আগ্রহী ক'রে তোলা যেত না।

ছাত্ররা নাট্যাভিনয় দেখতেও যেত। বাংলা নাটকেই প্রধানত যেত। ইংরেজরা এক যখন সেক্‌সপীয়ারের কোনো নাটক অভি-নয় ক'রত, তখন বাঙালি ছাত্ররা সেখানেও যেত। থিয়েটারের নামে একদল ছেলে শুচিতার প্রশ্নে নাক সিঁটকায়। অন্য ছাত্ররা তাদের 'পবিত্রতার ধারক' বলে ঠাট্টা করে। বাংলা নাটামঞ্চগুলোর কতগুলো অসুবিধা ছিল। কিন্তু একদিক থেকে এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি থিয়েটারের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। প্রথম অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাংলা থিয়েটারগুলো গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখের মতো অনেক দক্ষ নট ও নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টাদের প্রথম শ্রেণীর আসনে তাঁদের আসন অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। বাংলা থিয়েটারে তাঁদের এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখদের রচিত নাটকও অভিনয় হ'ত। ছাত্ররা সময়ে-সময়ে নাট্যাভিনয় দেখতে যেত। তারা নাটকের নিয়মিত দর্শক ছিল না। সামাজিক নাটক, মিলনাত্মক নাটক বা ব্যঙ্গনাটকে বাঙালি অভিনেতাদের দক্ষতা অনস্বীকার্য। তবে কোনো ঐতিহাসিক বা উচ্চাঙ্গের নাটকের কোনো করুণ বা বীররসাত্মক দৃশ্যে অভি-নেতার মর্মস্পর্শী বা চমকপ্রদ অভিনয় ছাত্রদের মুগ্ধ ক'রত সবচেয়ে বেশি। অভিনেতাদের বীররসাত্মক সংলাপ-গুলো ছাত্রদের অবসর সময়ে হাসির খোরাক জোগাত। তারা ব্যঙ্গ করে সেগুলো আওড়াতও। কোনো খ্যাতনামা লেখকের কোনো নতুন নাটক যখন অভিনয় শুরু হত ছাত্রদের মধ্যে তা নিয়ে জোর আলোচনা চলত। বন্ধুরা যখন দেখে এসে একবাক্যে তার প্রশংসা ক'রত তখন বাকি ছাত্ররা সুযোগ পেলেই দেখে আসত; নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ যাদের হ'ত না তারা অন্তত নাটকটি পড়ে নিতে ভুলত না।

যখন কোনো নাটক খুব জনপ্রিয় হ'ত তখন সকলের মুখে মুখে কতগুলো মুখ-রোচক কথা শোনা যেত এবং প্রত্যেককেই নাটকটি সম্পর্কে নিত্য-নতুন প্রশংসাসূচক শব্দ আরোপ ক'রতে দেখা যেত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে অমৃতলাল বসুর অবিস্মরণীয় ব্যঙ্গাত্মক মিলনাত্মক নাটিকা 'খাস-দখল'-এর অভিনয় চলাকালে দু'টো ইংরেজি শব্দ is—the সকলের মুখে শোনা যেত। অনেক ইংরেজনবিশ ভারতীয়ের অনুকরণে

---

* Patron এবং Patronise শব্দদুটোর আজ ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এ-দুটো বিকৃত শব্দ। শব্দদুটোর আবিষ্কারের গৌরব ইডেন হিন্দু-হোটেলের ছাত্রদের।

হিন্দুরা কথায় কথায় বলে থাকে। উপপাণ্ডব [illegible]

নাটকের একটি চরিত্র বোঝাতে তারা কথাটার ব্যবহার ক'রত। অভিনেতার কোন বিশেষ সংলাপ যা দর্শকদের বিশেষ উদ্দীপনার উদ্রেক করত সেই অভিনেতার উল্লেখ ক'রতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই সংক্ষেপিত শব্দদু'টো ব্যবহার ক'রত।

বেশির ভাগ কলেজেই প্রতি বছর কোনো-না-কোনো নাটক অভিনয় করা একটা বাঁধা রীতি ছিল। হোস্টেলের ছেলেরা কেবল নিজেরাও নাটক ক'রত। অধিকাংশ ছাত্রাবাসেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ না-থাকায় তাদের নাট্যাভিনয় হ'ত ইডেন হিন্দু হোস্টেল বা শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হোস্টেলের চত্বরে। হোস্টেলে বাংলা নাটকই শুধু অভিনীত হ'ত। কলেজে বাংলা ইংরেজি—দুই ধরনের নাটকই অভিনীত হ'ত। সাধারণত ডি এল রায় বা গিরিশচন্দ্র ঘোষের কোনো নাটক অভিনয়ের জন্য বাছাই করা হ'ত। নাটক বাছাইয়ের পর চলত শিল্পী নির্বাচন। ঐতিহাসিক চরিত্রের অভিনয়ে যাদের নাম ছিল, প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি রূপায়ণের জন্য তাদেরই ডাক পড়ে। পছন্দসই চেহারা হলে নতুন দু'চারজনকে বন্ধুরা জোরজার ক'রে অভিনয়ে নামাত। আবার কেউ-কেউ হয়তো একটা নগণ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নেতাদের পিছনে ঘুর্-ঘুর্ করে বেড়াত। মঞ্চে উঠে চেহারা দেখাতে পারলেই এরা খুশি। নগণ্য দূত বা সংলাপহীন জনতার একজনের চরিত্রে অভিনয়ের বিনিময়ে এরা মোটা চাঁদা পর্যন্ত দিত।

ডাক-নাম—সামাজিক সাম্য, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য হ'ল ছাত্রাবাসের আর-একটা উল্লেখযোগ্য দিক। পরিচিতদের ছাত্ররা একটা করে ডাকনাম nickname দিয়ে নেয়। দাদা, মামা, মেজদা, সেজদা, খোকা, পণ্ডিত, শ্বশুর, মোল্লা ধরনের নাম সব। তারা ডাকনামেই বেশি পরিচিত হ'য়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেলে একদল আর একদলকে ইংরেজি Thomas বা Robert কে Tom বা Rob এর মতো নামটা ছোটো ক'রে নিয়ে ডাকে

খাওয়া-পরায় সম্প্রীতি — ছাত্রাবাসে ছেলেরা সরল এবং পরস্পরের প্রতি বেশ অকপট। কারো বাড়ি থেকে কোনো ভালো খাবার এলে বন্ধুরা তার তত্ত্বতোষে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সকলে মিলে কাড়াকাড়ি হৈ-হুল্লোড় করতে করতে তা খেয়ে নেয়। কাউকে হয়তো বন্ধুবান্ধব বা কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে নেমন্তন্নে যেতে হবে। দেখা গেল, ধোপা জামা-কাপড় দিয়ে যায়নি অথবা যা-আছে তা এত আটপৌরে যে এসব পরে সেখানে যাওয়া চলে না; এই সমস্যার সমাধান নিয়ে তাদের একটুও ভাবতে হয় না। স্বচ্ছন্দে একজন আর একজনের ভালো ভালো জামা-কাপড় পরে নিয়ে চলে যায়। কোনো বাধা নেই। মানানসই হলেই হল। বন্ধু ছাড়াও তারা একে অপরের উপদেষ্টা। তাদের এই বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সব ব্যাপারেই। দেখা গেল, দলের কেউ গরীব, খরচ করবার মতো বাড়তি পয়সা তার নেই। সে-ও অনায়াসে অন্যদের সঙ্গে আমোদফূর্তিতে যোগ দিতে পারে, তাতে তার বিন্দুমাত্র বাধা নেই। শুধু মিশুকে এবং মনখোলা লোক হলেই হল।

প্রায়শই দেখা যায়, হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে এমন গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যে, কেউ কারো গোপনতম কথাটিও অন্যের কাছে লুকোয় না। এ-ধরনের নিখাদ বন্ধুত্ব পরস্পরকে প্রীতির এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং ফলে দুইজনের জীবনই গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন স্বভাবের ছেলেদের সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যেকার বিদ্বেষ এবং সামাজিক বৈষম্য দূর হ'য়ে সকলের মধ্যে এক সাধারণ সমঝোতা গড়ে ওঠে। কিন্তু একটা বিষয় দেখে বিস্মিত হতে হয় ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেলেও প্রত্যেকের চরিত্রই স্পষ্টতই অপরের থেকে আলাদা। তখন থেকেই তাদের চরিত্রে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে শুরু করে যা সারাজীবন তার সঙ্গী হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের ছাত্র—এমনকি সবচেয়ে আত্মভোলা অধ্যাপক পর্যন্ত তার অগণিত ছাত্রদের মধ্যে থেকে এই পার্থক্য নির্ণয়ে ভুল করেন না। সাধারণত রোগা এবং পাংশু ছেলেরা পড়াশুনায় মনোযোগী থাকে। একদল ছাত্র আছে যারা সর্বদাই হাসিখুশি' গোষ্ঠী থেকে তাদের আলাদা করে চেনা যায় না। একদল আছে একেবারেই গোবেচারা। তারা না প্রাণবন্ত, না ক্লাসে অধ্যাপকের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারে। ছাত্রমহলে আদর্শস্থানীয় তারাই যারা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে, বুদ্ধিতে এবং সততায় উজ্জ্বল। সে-ধরনের ছেলে কদাচিৎ দেখা যায়। আর একদল দেখা যায় যাদের দেহ প্রাচীন এথেনবাসীর মতো সুগঠিত। তাদের মাথায় কোনো আদর্শ একবার ঢুকিয়ে দেওয়া হলে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাদের তা রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

সুশীল বালক—কলেজে তাকেই সুশীল বালক বলা হয় যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ে লেখা অনুযায়ী যে মনোযোগ দিয়ে পুস্তক পাঠ করে, বিকেলে ঘণ্টাখানেক খেলাধুলো করে, যে সর্বদা জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত, এবং যে ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে, তাকেই বলা হয় সুশীল বালক a good boy শেষের কথাটি অবশ্য বর্ণপরিচয়ে লেখা নেই।

আধুনিক ভালো ছেলে—কিন্তু একালের কোনো ভালো ছেলে যার কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তাকে সুশীল সুবোধ বালক (a good and clever boy) বললে সে তৎক্ষণাৎ কথাটার প্রতিবাদ জানাবে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে আমরা এবং আমাদের ধ্যান-ধারণাও অনেক পালটে গেছে। তবে এখনো কিছু কিছু ছাত্র দেখা যায়, যারা তাদের সেই 'সুশীল সুবোধ বালকে'র সংজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। এইসব বই-পোকাদের খেলাধুলো সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীতি থাকে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে তাদের অনেকে ব্যায়াম শুরু করে বটে তবে তা সর্বদা চালিয়ে যেতে পারে না! কখনোই তারা প্রতিভাধর নয়। যদিও তাদের কেউ কেউ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইতিহাস, অথবা কোনো ভাষার পরীক্ষায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো বিষয়ে আলোচনা তাদের কাছে বিরক্তিকর। পাঠ্যতালিকার বিষয় নিয়েই তারা মগ্ন থাকে এবং তাতেই তারা দক্ষতা প্রদর্শন করে। এসব 'ভালো ছেলে'দের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করলেও কেউ সামান্যতম লাভবান হবে না। তাদের একমাত্র চিন্তা হল ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষাগুলো উত্তীর্ণ হওয়া। তথাকথিত 'খোশমেজাজী বোকাদে'র থেকে ছাত্র এবং মানুষ হিসেবে তারা নিশ্চিত নীচু স্তরের। এইসব 'ভালো ছেলে'র দল পরীক্ষায় শুধু ভালো নম্বর রাখতেই জানে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাদের জ্ঞান নেই। তারা হেসেখেলে জীবনকে উপভোগ করতে জানে না। তারা সর্বদাই নিজেদের যারা পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না, তাদের থেকে অনেক উঁচু মার্গের লোক বলে ভাবে। শেষোক্ত দল পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না সত্যি, কিন্তু হাসতে জানে জীবনকে উপভোগ করতে জানে। 'ভালো ছেলে'দের হামবড়া ভাব নিয়ে অন্যরা সুযোগ পেলেই হাস্যপরিহাস করতে ছাড়ে না। ছাত্ররা কাউকে 'ভালো ছেলে' আখ্যা দিলে সকলেই তার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

রসিকতা—সব ছাত্রাবাসের ছেলেরাই একটা-না-একটা গর্ব করবার মতো রসিকতা তৈরি করত। তাদের সামান্য রসিকতায়ও অন্য দল চটে যেত। কয়েকটি তীক্ষ্ণশব্দে সেই রসিকতার সুনির্দিষ্ট বয়ান তৈরি হত। এগুলো বলে তারা খুব আমোদ পেত। 'খারাপ কথা' ছাড়া পছন্দ করে সেইসব সাধু বা শুচিবাইগ্রস্ত ছেলেরাই এইসব রসিকতাকে ভয় পেত সবচেয়ে বেশি। গাঁজাখোর সর্বদাই নেশাটা বুঁদ হয়ে উপভোগ করবার জন্য নির্জনতা পছন্দ করে। আর মদাপেরা ভালোবাসে হৈ-হুল্লোড়। তাই গাঁজাখোরের মদাপকেই সবচেয়ে ভয় বেশি। তাদের অবস্থাও হয়েছে তেমনি। টিটকারির ঠেলায় সেইসব শুচিবাইগ্রস্ত ছেলেরা শেষপর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যায়। ছদ্ম গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে ফেলে হাসিখুশি হয়ে ওঠে।

ছোটলোক—ব্যঙ্গ সময়ে সময়ে আপত্তিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যঙ্গের সঙ্গে হাস্যরস থাকে বলেই যাদের নিয়ে তা করা হয়, তাদের তা নীরবে সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কোনো আহাম্মুক ব্যঙ্গকে যদি সত্যি বলে ধরে নিয়ে চটে যায়, সবাই তখন আখ্যা দেয় ছোটলোক 'cad' মিথ্যাবাদী, উন্নাসিক, নিম্নপ্রকৃতির ছেলে বা যারা হামবড়া ভাব দেখিয়ে সব ছেলেদের থেকে দূরে দূরে থাকত, তাদের উল্লেখ করতেও এই ইংরেজি শব্দটার ব্যবহার হত। নোংরা জামা-কাপড় পরায় অভ্যস্ত [illegible]

আখ্যা পেত। তবে মিশুকে হলে আখ্যাটা থেকে সে রেহাই পেত।

কবি—কবিরাও ছিল হোস্টেলের গৌরব। ছোটো-বড়ো সকলের কাছেই সে ছিল সম্মানিত। কোনো পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশ হলে তো কথাই ছিল না। সে ছিল হোস্টেলের 'সভাকবি'। হোস্টেলের কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে, কি কোনো চালিয়াৎ বা উন্নাসিক ছেলেকে ক্ষ্যাপাতে কি বন্ধুর বিয়ের উপহার লিখতে তার ডাক পড়ত। সেও অম্লানবদনে ফরমাস অনুযায়ী লিখে দিত কবিতা।

বুদ্ধিমান—প্রত্যেক হোস্টেলেই বেশ কিছুসংখ্যক বিবাহিত ছাত্র আছে। বিবাহিত ও অবিবাহিতের দলে প্রায়ই ঝগড়া লাগত। বিবাহিতরা অবিবাহিতদের হতভাগ্য নাবালক বলে ঠাট্টা করে সহানুভূতি প্রকাশ করে বলত : আহা, বেচারা প্রেম যে কী বস্তু বুঝল না। অবিবাহিতের দল হয় তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য কৃত্রিম হা-হুতাশ করত, নয়ত পালটা জবাব দিত যে, বিবাহিতদের অবস্থা হল গল্পের সেই লেজকাটা শিয়ালের মতো। তারা পত্নীদের কাছ থেকে আসা বহু-প্রতীক্ষিত চিঠিগুলো ব্যঙ্গের ধরণ করে উচ্চস্বরে পড়ে শোনাত। তবে ছাত্রজীবনে বিয়ে করার প্রবণতা ক্রমেই কমে আসছে এবং অর্থনৈতিক কারণই সম্ভবতঃ তার প্রধান কারণ। একদল ছাত্র আছে যারা বলে বেড়ায় : জীবনে সে বিয়েই করবে না। বন্ধুরা তার কথা মোটেই বিশ্বাস করে না। সকলেই জানে, বাপ-মা বিয়ের ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ বালকের মতো তারা ঠিক সুড়সুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসবে।

সত্যিকারের ছাত্র-কবিরা বন্ধুদের সঙ্গে সর্বদা অকপটে মেলামেশা করে এবং আমি তোমাদেরই লোক—এই কথাটা সর্বদাই বোঝাতে চেষ্টা করে। বন্ধুদের কবিতার রসগ্রহণে সাহায্য করে। কিন্তু আর এক ধরনের ছাত্র-কবি আছে যারা পোশাক এবং চলনে-বলনে শিল্পীসুলভ খেয়ালি ভাব ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান। রবীন্দ্রনাথ, শেলী, চণ্ডীদাসের বিকৃত অনুকরণে কবিতা লিখে বন্ধুদের কাছে কেবল আত্মপ্রচার করে বেড়ানো তাদের স্বভাব। ভাবটা এই, তার মতো এমন প্রতিভাধর ব্যক্তি কদাচিৎ জন্মে; কবিতা লেখাটা তার কাছে নস্য। বন্ধুরা অবশ্য তাকে পাত্তা দেয় না। সবাই যে তাকে খুব সমীহ করে সে কিন্তু সর্বদাই তার হাবভাবে তা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী।

খোসমেজাজী ছেলে—একদল ছেলে ছিল, যারা কখনোই বদহজমে ভুগত না। তাদের স্বাস্থ্য প্রাচুর্যে ঝলমল করত। তারা ছিল আশুতোষী, সরল এবং অকপট। বই নিয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকা তাদের অপছন্দ। ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হাসা-পরিহাসের আড্ডায় তারা মুখের কথাটি ফেলতে-না-ফেলতেই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। বন্ধুদের বিপদ-আপদে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে। পরীক্ষায়ও বেশ ভালো নম্বর পেয়েই পাস করে। সব বিষয়েই বেশ দক্ষতার সঙ্গে চমৎকার আলোচনা করে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু তারা বিচার করে। হোস্টেলের জীবনে তারাই হল প্রাণ। বলতে গেলে তাদের জন্যই ছাত্রাবাসগুলো বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তাদের অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনাই হোস্টেলের সব অনুষ্ঠান সার্থক করে তোলে। এরাই রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুদের সেবায় রাতের পর রাত জেগে কাটিয়ে দেয়। বন্যার্তের সাহায্যে এগিয়ে যায়। সর্বকাজেই তাদের আনন্দ। বলা বাহুল্য, খেলোয়াড়রা এই দল থেকেই আসে। তাদের ব্যবহারে হয়তো সভ্যতা-ভব্যতা থাকে না কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাপুরুষোচিত ভীতি তাদের নেই। শরীর সম্পর্কে খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছেলেদের থেকে তারা সবদিক থেকেই ভালো। উন্নাসিকদের তারা ঘৃণা করে।

অতিবিনয়ী—কিছু ছেলে ছিল যারা গত কয়েক বছর ধরেই তথাকথিত ভালো ছেলের সম্ভ্রম পেয়ে আসছে। মিনমিনে স্বভাবের এইসব ছেলেরা নিজেদের গণ্ডীর বাইরে কারো সঙ্গে বড়ো একটা কথা বলত না। দলের কারো সঙ্গে দেখা হলে পরস্পরে ফিসফিস করে কথা বলে। রসিকতার মর্ম বুঝতে পারলে হে-হে করে হাসে। তারা সবচেয়ে ভয় করে জামা-কাপড়ে দুরন্ত উন্নাসিকদের। ছেলের দল তাদেরকে নিজের মতোই মানী বলে ভাবে। কারণ, তাদের পোশাকের চাকচিক্যে ও চটকদার কথায় তাদের সম্ভ্রমও ম্লান হয়ে যেত। ভালো ছেলের দল সর্বতোভাবেই তাদের সম্ভ্রম বজায় রাখবার চেষ্টা করত বলা যায়, ছাত্রসমাজে তারা ছিল 'আদর্শ ছেলের' নমুনা। এরা সকলে বাইরে থেকে কলকাতায় পড়তে আসে। রক্ষে যে, এদের সংখ্যা কম।

অভিজ্ঞ ছাত্র—আর-একদল আছে 'ঘাগু' বা অভিজ্ঞ ছাত্র বলা চলে। তারা বছরের পর বছর অম্লান বদনে পরীক্ষা দিয়ে যায় এবং যথারীতি ফেল করে এবং ফেল করার জন্য তাদের মনে বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা জাগে না। আবার পরবর্তী বৎসরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কয়েক বছর বাদে শেষে হয়তো একদিন পরীক্ষায় পাশ করে। তাদের ধারণা, এতদিন শুধু ভালো করে পড়াশুনো করেনি বলেই তো পাশ করতে পারেনি। এমনিতে তারা ভালো। তাদের পক্ষে আর যাই হোক তথাকথিত 'ভালো ছেলে' হওয়া সম্ভব নয়। 'ভালো ছেলে' হওয়ার প্রতি তাদের কোনো লোভও নেই।

চালিয়াৎ—এমনি আরও অনেক ধরনের ছাত্র আছে। সকলের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শুধু আর এক দলের পরিচয় দিয়েই আমার লেখা শেষ করছি। কথাবার্তায় এরা বিনয়ী এবং অতি-নাটুকে। উন্নাসিক না হলেও উন্নাসিকদের মতো ভাব দেখায়। যা-নয় তাই বলে সকলের সম্ভ্রম-পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণে সর্বদাই এরা ব্যস্ত। তাই এদের নাম হয়েছে চালিয়াৎ বা চালুশ। চালিয়াৎ আর ফুলবাবুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। চালিয়াতরা এমনিতে ছেলে খারাপ নয়, আসলে তারা খুব দুর্বল চিত্তের ছেলে। ফুলবাবুদের জামাইবাবুও বলা হয়। কারণ নতুন জামাই যেমনি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সবচেয়ে ধোপ-দুরস্ত ও ভালো জামা পরে, এরাও সর্বদা তেমনি পোশাক পরে থাকে। এদের মধ্যে যারা রোগা পাতলা এবং ঢ্যাঙ্গা, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'লকলকে পায়রা'। তাদের দৈর্ঘ্যটাই শুধু আছে, প্রস্থ বলতে কিছুই নেই। তারা নিজেদের জামা-কাপড় এবং জুতো নিয়েই মগ্ন। চলতি কথায় তারা নাকি জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তেই সর্বদাই ব্যস্ত। বাউণ্ডেলে (dandy) বা ফুলবাবু fop দের মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্য আছে। প্রথমোক্ত ছেলের দল করণিক, উচ্চপদস্থ দোকান কর্মচারী, ম্যাকানিকস্ বা এমনি নানা পরিবার থেকে আসে। তাদের আচার-ব্যবহার বা সংস্কৃতি তাদের চরিত্রে এমন একটি ঔজ্জ্বল্য এনে দেয় যে, যা ফুলবাবুদের মধ্যে দেখা যায় না। ফুলবাবুরা অদ্ভুত ধরনে চুল ছাঁটে। বুলবুলের ঝুঁটির ধরনের ছাঁটটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। তারা মাথার পিছনটা প্রায় চেঁচেই ফেলে। সামনের চুল ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে কপাল বেয়ে নেমে চলে। তারা নানা ফ্যাশনে চুল আঁচড়ায়। বেশির ভাগ ছেলেই মোষের শিং-এর ধরনে সামনে চুল ফাঁপিয়ে রাখত। আশা করি এই কয়েক ছত্রেই তাদের পরিচয় সম্পূর্ণ। এক নিজেদের সম্পর্কে অহমিকা থাকা ছাড়া ফুলবাবুরা (fop) লোক খারাপ নয়।

সাহিত্য জগতে সাড়া জাগিয়েছে

তৃপ্তি বসু-র

বেগম বৌ

'অমৃত' বলেন—এই নতুন লেখিকা অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। জীবনকে নতুন দিক থেকে দেখার চোখ আছে তাঁর। আর সেই দেখাকে ভাষা দিয়ে রূপায়িত করার অনায়াস পদ্ধতি তাঁর করায়ত্ত।

দাম : তিন টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ডি এম লাইব্রেরী
দাশগুপ্ত এণ্ড কোঃ
ও সকল সম্ভ্রান্ত দোকান।

আশ্চর্য হব না। আমি এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন বালকের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অতিরিক্ত আয়ের একটা সম্ভাবনা সামনে এসে পড়লে অনেক অর্থবান ব্যক্তিও সহজে সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সৌম্যশেখরের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল; সুতরাং পুত্রের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে আয়ের পথটা কিঞ্চিৎ সুগম করে নেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তবে ছেলেকে না জানিয়ে কিছু করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, তাই তিনি আর্যশেখরকে ডেকে পাঠালেন।

—ইয়ে—একটা কথা ভাবছিলাম বাবা।

—কী?

—আমার ত—জানিসই—মানে, আজকাল যা দিন পড়েছে—সেই অনুপাতে ত খুব একটা ইয়ে হচ্ছে না—মোটামুটি চলে যায়। এই আর কি। তা তোর যখন এমন একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে, সবাই বাহবা দিচ্ছে—মানে, এও ত ধর গিয়ে একরকমের একটা ম্যাজিক! তা সেটা যদি আর পাঁচজনকে দেখবার সুযোগ দেওয়া যায়—মানে বেশ ভালো একটা জায়গা-টায়গা দেখে ভালো ব্যবস্থা টাবস্থা.....

বলতে বলতে, এবং সেই সঙ্গে ছেলের ক্ষুব্ধ বিস্মিত ভাব দেখে সৌম্যশেখর নিজেই লজ্জা বোধ করলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামিয়ে তারপর সুর পরিবর্তন করে বললেন, আবিশ্যি তোর যদি আপত্তি থাকে তাহলে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—তামাসা আর প্রতিভা এক জিনিস নয় বাবা।

পিতার ব্যবহারে আর্যশেখরের মনে এক নতুন প্রশ্নের উদয় হল। এমন প্রতিভাবান পুত্রের এমন হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাবা হয় কী করে? পিতা-পুত্রের চরিত্রের এই বৈপরীত্যই কি স্বাভাবিক, না এটা একটা ব্যতিক্রম? আর ব্যতিক্রমই যদি হয় তাহলে তার বৈজ্ঞানিক কারণ কী?

আর্যশেখরের অবসরের অভাব ছিল না, কারণ তার গাণিতিক প্রতিভা প্রকাশ পাবার কিছুদিনের মধ্যেই সৌম্যশেখর তাঁকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই অবসরে আর্যশেখর হেরেডিটি ও প্রজনন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করে দিলেন। অচিরেই তিনি জীনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন। মানুষের শরীরে কয়েকটি পরমাণুর মধ্যে তার নিজের এবং তার ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষ পরম্পরার আকৃতি ও প্রকৃতির নির্দেশ লুকিয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য!

আর্যশেখর আরেকবার বাপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—বাবা, আমাদের বংশলতিকা নেই?

—বংশলতিকা? কেন?

—আছে?

—থাকলেও তা উইয়ে খেয়েছে। কেন, তুই কি জাতিস্মর-টাতিস্মর হলি বলে মনে হচ্ছে?

—না। ভাবছিলাম আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রতিভাবান কেউ ছিলেন কিনা। তোমার আর ঠাকুরদাদার কথা ত জানি। তার আগে।

—সাতপুরুষের মধ্যে কেউ ছিলেন না এ গ্যারান্টি দিতে পারি। তার আগের কথা জানি না।

ঘরে ফিরে এসে আর্যশেখর চিন্তা করতে শুরু করলেন। বাপের দিকে সাতপুরুষের মধ্যে নেই। মাতৃকুলেও তথৈবচ—বরং সেখানে সম্ভাবনা আরো কম। গুণের দিক দিয়ে নীহারিকা দেবী অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মহিলা। তিনি এখনো তাঁকে খোকা বলে সম্বোধন করেন বলে আর্যশেখর পারতপক্ষে তার কাছে ঘেঁষেন না।

হেরেডিটির প্রভাব অনিশ্চিত। পরিবেশ? এনভয়রেনমেণ্ট? তেত্রিশ নম্বর পটুয়াটোলা লেনকে কি সেদিক দিয়ে খুব প্রশস্ত বলা চলে? বোধহয় না। তাহলে?

কিন্তু শুধুমাত্র সাতপুরুষের হিসেব নিয়েই কি সত্যিকার কিছু প্রমাণ হয়? বাবার বাবা তার বাবা তার বাবা করে বংশলতিকা জিনিসটাকে ত টেনে একেবারে সৃষ্টির আদিতে নিয়ে যাওয়া যায়। জীনের প্রভাব কি তখন থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে না? কে জানে আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ কে বা কেমন ছিলেন। এমনও ত হতে পারে তিনি আলতামিরার গুহার দেয়ালে বাইসনের ছবি এঁকেছিলেন। এইসব আদিম গুহাচিত্রকরদের কি জিনিয়াসের পর্যায়ে ফেলা যায় না? অথবা হারাপ্পা-মোহেনজোদারোর মত শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের? অথবা বেদ-উপনিষদের রচয়িতাদের? এঁদের মধ্যে কেউ যদি আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তবু তাঁর মনটা খচখচ করতে লাগল। সৌম্যশেখরের মত কল্পনাবিমুখ বৈষয়িকচিন্তাসর্বস্ব স্থূল ব্যক্তি যে তাঁর জন্মদাতা হতে পারে। এর কোন বৈজ্ঞানিক সমর্থন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ভাবতে ভাবতে সহসা একটি সম্ভাবনা এসে তাঁর মনে দুরন্তের মত আঘাত করল।

তিনি যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকেন? যদি সৌম্যশেখরের ঔরসে তাঁর জন্ম না হয়ে থাকে?

কথাটা মনে হতেই আর্যশেখর বুঝলেন এ-প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তার বাবাই দিতে পারেন, এবং সে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। সত্যান্বেষণের খাতিরে পুত্র পিতাকে এমন প্রশ্ন করবে এটা আর্যশেখরের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হল।

ন'শো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ল-ডাইজেস্টে নিমগ্ন সৌম্যশেখর পুত্রের প্রশ্ন প্রথমবার সঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না।

—যমজ সন্তান? কার কথা বলছিস?

—যমজ নয়, জারজ। আমি জানতে চাই আমি জারজ সন্তান কিনা।

একথায় প্রথমে সৌম্যশেখরের ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হল। তারপর তাতে কম্পনের আভাস দেখা দিল। তারপর সে কম্পন তার সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হল। তারপর তাঁর কম্পমান ডান হাত কাছে আর কিছু না পেয়ে একটি ভারী কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে আর্যশেখরের দিকে নিক্ষেপ করল। আর্যশেখর আর্তনাদ করে রক্তাক্ত মস্তকে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

আরোগ্যলাভের পর বোঝা গেল আর্যশেখরের অলৌকিক গাণিতিক প্রতিভাটি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

আর্যশেখরের যখন ঊনিশ বছর বয়স, তখন একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে একটি শিরীষ গাছের নীচে উপবিষ্ট অবস্থায় বৃক্ষস্থিত কোন পক্ষীর বিষ্ঠা তার বাম স্কন্ধে এসে পড়ায় তিনি সহসা মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন হলেন। যথারীতি তিনি এবিষয় অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ছিল নিউটনের আপেলের ঘটনাটা বুঝি কিংবদন্তী। প্রিন্সিপিয়াতে নিউটনের নিজের লেখায় সে-ঘটনার উল্লেখ দেখে

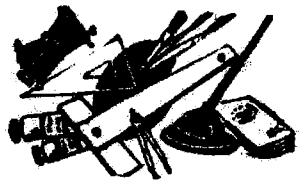

সকল প্রকার আফিস ষ্টেশনারী কাগজ সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

ফোন : অফিস : ২২-৮৫৮৮ (২ লাইন) ২২-৬০৩২, ওয়ার্কসপ : ৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

ধারণার পরিবর্তন হল। তাইকো ব্রাহি, গ্যালিলিও থেকে শুরু করে কোপারনিকাস, কেপলার, লাইবনিৎস-এর রাস্তা দিয়ে ক্রমে আর্যশেখর একেবারে আইনস্টাইনে পৌঁছে গেলেন। আর্যশেখরের বিদ্যায় আইনস্টাইন জীর্ণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু পাঠ্য-অপাঠ্য বোধ্য-দুর্বোধ্য সব রকম পুস্তকই আদ্যোপান্ত পাঠ করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আর্যশেখরের। অবিশ্যি বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর পড়ার আগ্রহের একটা কারণ ছিল এই যে তিনি জানতে চাইছিলেন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে কিনা। আইনস্টাইন পড়ে তিনি এটুকু বুঝলেন যে মাধ্যাকর্ষণ কী তা জানা গেলেও, মাধ্যাকর্ষণ কেন তা এখনো জানা যায়নি। তিনি স্থির করলেন এই কেন-র অন্বেষণই হবে আপাতত তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

সেইদিনই আর্যশেখর স্থির করলেন যে, তিনি যাবতীয় তুচ্ছ ঘটনার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অনেক আবিষ্কারের পশ্চাতেই যে নিউটনের আপেলের মত একটি করে তুচ্ছ ঘটনা রয়েছে, এটা তাঁর জানা ছিল।

দুঃখের বিষয়, প্রায় তিনমাস ধরে সহস্রাধিক তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করেও তিনি তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেলেন না যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক আগেই হয়ে যায়নি। অগত্যা আর্যশেখরকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হল। উপলব্ধির আদিতে ধ্যান, এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর বাড়ির তিন-তলার ছাতে চিলেকোঠায় গিয়ে ধ্যানস্থ হতে মনস্থ করলেন।

প্রথম দিনই—সেদিন ছিল রবিবার, ছাতে উঠে চিলেকোঠার তক্তপোষে বসে চক্ষু মুদ্রিত করার অব্যবহিত পূর্বে জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির ছাতে একটি তুচ্ছ ঘটনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রতিবেশী ফণীন্দ্রনাথ বসাকের সপ্তদশ-বর্ষীয়া কন্যা ডলি বাহু উত্তোলন করে ধৌতবস্ত্র রজ্জুতে আলম্বিত করছে। এই দৃশ্যে মুহূর্তের মধ্যে আর্যশেখরের মন মাধ্যাকর্ষণ-সম্পর্কিত এক আশ্চর্য নূতন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সাতদিনের মধ্যে ফুলস্ক্যাপ কাগজের একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করলেন। বর্তমান সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নয়, তবে তার মূল বক্তব্য ছিল এই—মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবাদেই প্রাণের সৃষ্টি, কারণ প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বগামী, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিম্নগামী। মাধ্যাকর্ষণের মত জীবনবিরোধী শক্তি সত্ত্বেও প্রাণ সৃষ্টি হল কী করে? তার কারণ সূর্য। কিন্তু সূর্যের প্রভাবও চিরস্থায়ী নয়; পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের নৈকট্য ও অবিরাম প্রভাব ক্রমে সূর্যের প্রভাবকে পরাভূত করে। ফলে প্রথমে জরার প্রকোপ, এবং শেষে মৃত্যু এসে প্রাণশক্তিকে গ্রাস করে। শুধু যে জড়পদার্থেই এই দুই প্রভাবের পরস্পর বিরোধ দেখা যায় তা নয়। মানুষের কাজে, চিন্তায়, হৃদয়াবেগে, মানুষে মানুষে সম্পর্কে—সর্বকিছুতেই এটা বর্তমান। মানুষের যত হীনপ্রবৃত্তি, সমাজের যত অনাচার, অবিচার, দুঃখ-দারিদ্র্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ—সবই মাধ্যাকর্ষণ-জনিত। আর যা-কিছু সুন্দর ও সতেজ, যা-কিছু উন্নত, যা-কিছু মঙ্গলকর—সবই সূর্যের প্রভাবে। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই কোনদিন পৃথিবীর কলঙ্ক দূর হবে না। অনেকদিন আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো—কিন্তু সূর্য তা হতে দেয়নি। ধ্বংসের পাশে পাশে সৃষ্টির কাজ চলে এসেছে আবহমানকাল থেকে।

প্রবন্ধটি শেষ করে আর্যশেখর চিলে-কোঠা থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে সূর্যের উদ্দেশে, তারপর প্রতিবেশী ডলির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ঠিক সেই সময় চাকর ভরদ্বাজ এসে বলল তাঁর বাপ তাঁকে নীচে ডাকছেন।

সৌম্যশেখর কদিন থেকেই ছেলে সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। স্ত্রী নীহারিকার মৃত্যু হয়েছে গত বছর। ছেলের একটা হিল্লে দেখে যেতে পারলেন না বলে মৃত্যুশয্যায়ও তিনি আক্ষেপ করেছিলেন।

হাতের কাগজ পাকিয়ে নিয়ে আর্যশেখর বাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তুই কি ছাঁচ্ছিস বলত? সাপ, না ব্যাঙ, না বিচ্ছু?

—সেটা আমার জীনের স্বরূপ বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যাবে না।

—কিসের স্বরূপ?

—জীন।

—তোর ত অর্ধেক কথার মানেই বুঝি না।

—সবাই ত সবকিছু বোঝে না। আমি কি ওকালতির কিছু বুঝি?

—আমার ওকালতির জোরেই যাচ্ছ সেটুকু বোঝ ত? তবে তোমার যা বয়স, তাতে বসে বসে বাপের পয়সায় খাওয়াটায় কোন বাহাদুরি নেই। কাজেই ওসব জীন-ফীন বলতে এসো না আমার কাছে। তুমি ছাতের ঘরে বসে যাই কর না কেন, এটা জেনে রেখো যে আমার চোখে আর পাঁচটা বাউণ্ডুলে বখাটে বেকারের সঙ্গে তোমার কোন প্রভেদ নেই। আর এক বছর সময় দিলাম। তার মধ্যে যা হোক একটা চাকরি দেখে নেবে। ডিগ্রী-ফিগ্রী যখন হল না, তখন বেশি কিছু আশা করি না আমি। তবে স্বাবলম্বী তোমায় হতে হবে। তারপর অন্য কাজ।

—অন্য কী কাজ?

—বংশবৃদ্ধির কথাটাও ত ভাবতে হবে। নাকি তুমি বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছ?

—হ্যাঁ।

—করবে না?

—না।

—কেন সেটা জানতে পারি?

—প্রথমত, আমার প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

সৌম্যশেখরের বিষম লাগল। আর্যশেখর তাঁকে প্রকৃতিস্থ হবার সময় দিলেন।

—দ্বিতীয়ত, আমার জীবনের মধ্যাহ্নে, যখন সূর্যের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, তখন আমার কাজ ও চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে এটা আমি চাই না।

—তুই কি কোন ধর্মেটর্মে দীক্ষা নিয়েছিস নাকি?

—তা বলতে পার।

—কী ধর্ম?

—সেটা আমার ব্যক্তিগত ধর্ম। নামকরণ হয়নি এখনো।

মুহূর্তকালের জন্য সৌম্যশেখরের আশা হয়েছিল যে, তিনি বুঝি পুত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। এখন বুঝলেন সেটা ঠিক না। কিছুক্ষণ তিনি ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বিশেষ করে তার চোখের দিকে। দৃষ্টিতে পাগল হবার কোন লক্ষণ আছে কি? সৌম্যশেখরের প্রপিতামহ দয়ারাম শেষজীবনে উন্মাদ হয়ে এক মহাষ্টমীর দিন উলঙ্গ অবস্থায় গ্রাম-

শুদ্ধ লোকের সামনে পূজামণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্যশেখরকে এ-ঘটনা তিনি কখনো বলেননি।

সৌম্যশেখরের মনে পুত্র সম্বন্ধে একটা স্নিগ্ধ করুণার ভাব জেগে উঠল। হাজার হোক—একমাত্র ছেলে, সবে ধন নীলমণি। যা করছে করুক—বেঁচে থাকলেই হল। আর মাথাটা খারাপ না হলেই হল।

—ঠিক আছে। তুমি এসো'খন।

আর্যশেখর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইংরেজিতে—কারণ, এ-জাতীয় লেখার কদর কোন বাঙালী পাঠক করবে—এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। এবার তিনি সৌম্য-শেখরের পুরোন রেমিংটনের সাহায্যে অপটু হাতে অনেক পরিশ্রমে প্রবন্ধটির চার কপি টাইপ করলেন। এ-কাজটা করতে তাঁর লাগল তিন সপ্তাহ। কপি শেষ হবার পর তিনি অনুভব করলেন, তাঁর হাত-পা কোমর-পিঠ টান ধরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া একটানা ঘরের মধ্যে থেকে থেকে দমও প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।

আর্যশেখর ছাত থেকে নেমে এলেন। গোলদীঘির ধারে একটু হেঁটে আসবেন মনে করে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখলেন, গেরুয়া পাঞ্জাবী পায়জামা পরিহিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-লম্বকেশবিশিষ্ট একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে।

আর্যশেখরকে দেখে যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, মহাবোধি সোসাইটির অবস্থানটা তাঁর জানা আছে কিনা। আর্য-শেখর বললেন, চলো তোমায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ওইদিকেই যাচ্ছি।

যাবার পথে আর্যশেখর যুবকের পরিচয় পেলেন। তার নাম বব গুডম্যান। নিবাস টোলিডো, ওহায়ো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছেন প্রেম ও আলোর সন্ধানে।

আর্যশেখরের ছেলেটিকে ভালো লাগল। সেইদিনই রাত্রে তাকে তাঁর প্রবন্ধটি পড়তে দিলেন। বললেন, তুমিই প্রথম আমার এ-লেখা পড়ছ। তোমার মন্তব্য জানার আগ্রহ রইল।

পরদিন সকালে গুডম্যান ফুলস্ক্যাপের তাড়া ঝোলায় নিয়ে চীনেবাদাম খেতে খেতে এল বললেন—ইট্স গ্রেট, গ্রেট। ইয়া—ইউ গট সামথিং দেয়ার—ইয়া।

আর্যশেখর চাপা গলায় তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর গুডম্যান বললেন, কিন্তু তোমার লেখায় এত পেসিমিজম্ কেন? মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করার কত উপায় ত তোমার দেশেই রয়েছে। তুমি লেভিটেশনের কথা জান না? তোমাদের দেশের যোগী-পুরুষদের কথা তুমি জান না?

গুডম্যান এবার তাঁর ঝোলা থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে আর্যশেখরের হাতে দিলেন। মোড়ক খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে একটি চারচৌকো চিনির ডেলা। অন্তত দেখতে তাকে চিনি বলেই মনে হয়। গুডম্যান বললেন, এটা সুগার-কিউবই বটে, কিন্তু এর মধ্যে এক কণা অ্যাসিড রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করার মত এমন জিনিস আর নেই। তুমি খেয়ে দেখো। নানান প্রতিক্রিয়া হবে—ভয় পেয়ো না। আমার মনে হয় এটা খেলে পর তোমার মন থেকে পেসিমিজম্ দূর হয়ে যাবে।

গুডম্যান প্রদত্ত মোড়কটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে আর্যশেখর সটান চলে গেলেন তিনতলার ছাতে। আশ্বিনের অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ পড়ন্ত রোদে মাদুরে বাবু হয়ে বসে তিনি চিনির ডেলাটি মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করলেন।

কয়েক ঘণ্টা কিছুই হল না। তারপর এক সময়ে আর্যশেখর অনুভব করলেন, তিনি সূর্যের দিকে উত্থিত হচ্ছেন। এক অনির্বচনীয় মাদকতায় তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন হল। নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, ধূলি-ধূম্রধূসর কলকাতা শহরকে তেহেরাণের গালিচার মত বর্ণাঢ্য ও মনোরম দেখাচ্ছে। মাথার উপরের আকাশ সর্পিল গতিবিশিষ্ট অজস্র বিচিত্র বর্ণখণ্ডে সমাকীর্ণ। আর্য-শেখর বুঝলেন সেগুলো ঘুড়ি কিন্তু এমন ঘুড়ি তিনি কখনো দেখেননি। একটি বর্ণ-খণ্ড তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। আর্যশেখর পরম আত্মীয়তাবোধে বাহু সম্প্রসারিত করে সেই বর্ণখণ্ডের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

ডাক্তার বাগচির নির্দেশ মত ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মিহিজাম যাবার আগে আর্যশেখর একজন পেশাদার টাইপিস্টকে দিয়ে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ-সম্পর্কিত প্রবন্ধটির পঞ্চাশটি কপি টাইপ করিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের বাছাই-করা বিজ্ঞানী ও মনীষীদের পাঠালেন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজনের উত্তর মিহিজাম যাবার ঠিক আগের দিন আর্যশেখরের হস্তগত হল। ইংলণ্ডের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত পদার্থবিদ্ প্রফেসর হিউগো কার-মাইকেল প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন—আই ফাউণ্ড ইট মোস্ট ইণ্টারেস্টিং।

মিহিজাম পর্বের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং তার বিবরণও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

১৯শে অক্টোবর—অর্থাৎ মিহিজাম পৌঁছাবার পরের দিন আর্যশেখর ডায়ারিতে লিখলেন—'পাখী পাখী পাখী পাখী। পাখী ইজ পাখী। মোস্ট ইণ্টারেস্টিং। সূর্যের সবচেয়ে কাছে যায় কোন্ প্রাণী? পাখী। ও বার্ড, হাউ ইওর ফ্লাইট ফ্রাউটস্ মাধ্যা-কর্ষণ!'

২রা নভেম্বর চাকর ভরদ্বাজ দেখল, আর্যশেখর কোত্থেকে জানি একটি বাবুইয়ের বাসা নিয়ে এসে বিছানার উপর পা ছড়িয়ে বসে গভীর মনোযোগে বাসার বুনন-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

পরের দিন আর্যশেখর নিজেই খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে নিজে হাতে একটি বাবুইয়ের বাসা তৈরি করতে শুরু করলেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ডায়ারিতে লেখা হল—'ম্যান্স হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেণ্ট ইজ বি টু রাইজ টু দ্য লেভেল অফ বার্ডস।'

১৩ই নভেম্বর বাবুর ফেরার দেরী দেখে ভরদ্বাজ তাঁকে খুঁজতে বেরোল। আধঘণ্টা খোঁজার পর আর্যশেখরকে সে পেলো অজ্ঞান অবস্থায় ধানক্ষেতের পাশে একটি বাবলা গাছের নীচে। গাছে একটি কাঁটার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে আর্য-শেখরের তৈরি বাবুইয়ের বাসা।

স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সানস্ট্রোক।

সৌম্যশেখর কলকাতা থেকে চলে এলেন। তিনদিন ঘোর জ্বরবিকারের পর পিতা ও ভৃত্যের সামনে আর্যশেখরের মৃত্যু হল।

শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার ঠিক আগে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন আর্য-শেখর—মাগো।

পূজায় সর্বপ্রকার পোষাকের বিপুল আয়োজন!
বিজি
২১০/১, বিধান সরণী
(শ্যামবাজার মোড়ের কাছে)
ফোন: ৫৫-৮৩৭৪ কলি-৪

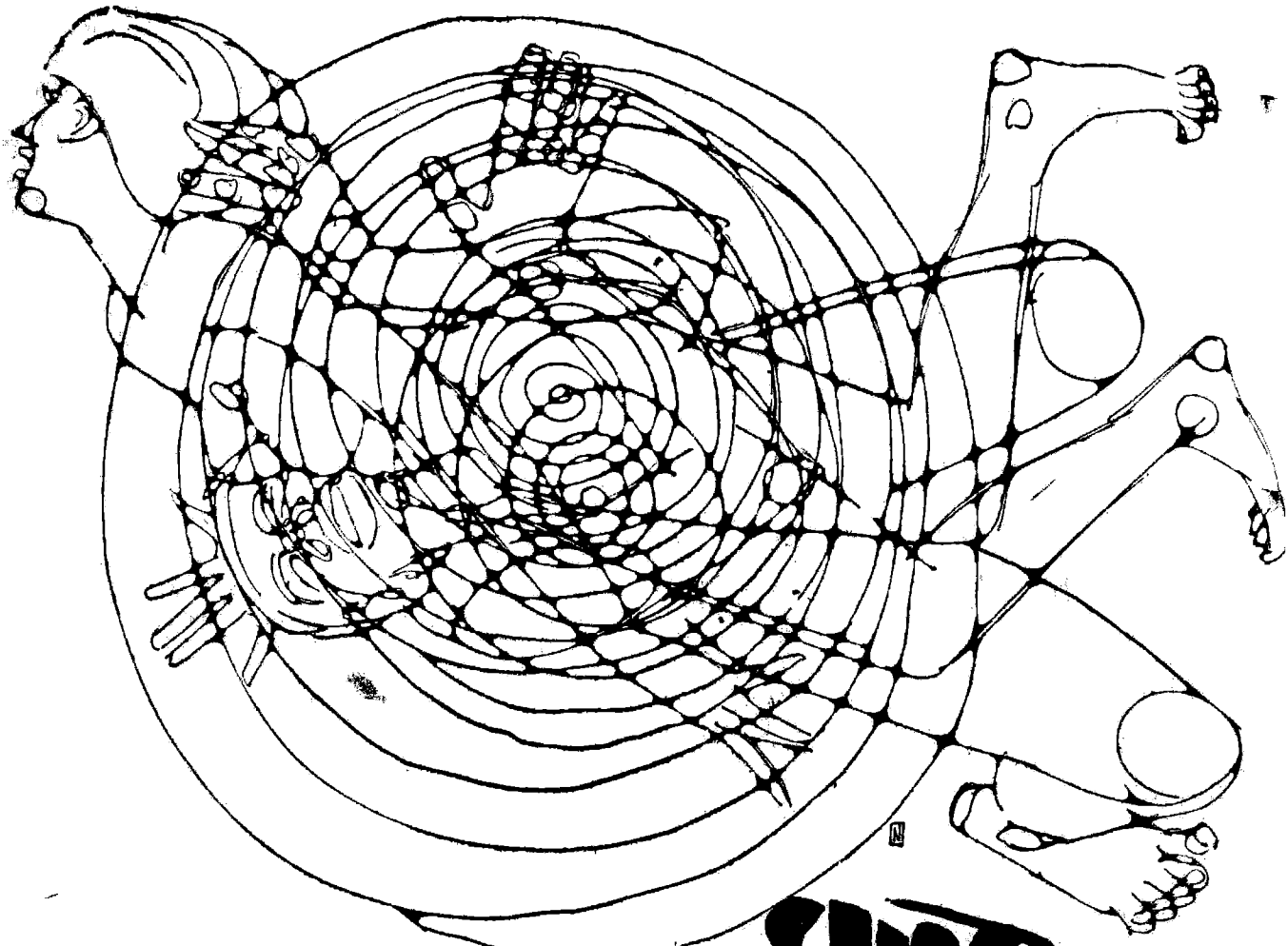

মৃত্যুর আগে

বুদ্ধদেব বসু

খৃষ্টাব্দ উনিশ-শো পঁয়ষট্টিতে, কলকাতার শুকলাল কার্নানি হাসপাতালের এক কামরায়, পঁচাত্তর বছর বয়সে, রোদে আর বৃষ্টিতে মেশা এক ভাদ্রের দিনে, শান্তভাবে ও ধীরে-ধীরে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস ভট্টাচার্য।

বাইরে, কামরার সামনে করিডরে, অথবা কোনো বারান্দায়, কিংবা হাসপাতালের বাগানে ঘুরে-ফিরে অপেক্ষা করছে তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ (সকলেই প্রৌঢ়, সকলেই ক্লান্ত), আর কতিপয় বিবিধ আত্মীয়-বন্ধু, যারা অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছে। বেলা দশটায় এসেছে তারা, এখন প্রায় চারটে; চরম বার্তাটি এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

কামরার ভিতরে দু-জন নার্স, দক্ষ ও শ্বেতবসনা, একটি যুবক ডাক্তার রোগীর শিয়রে উপবিষ্ট, মাঝে-মাঝে একজন বিশারদ এসে দেখে যাচ্ছেন, টেবিলে বিবিধ যন্ত্রপাতি ওষুধ ইঞ্জেকশন সাজানো। এঁরা আরোগ্যের আশা আর রাখেন না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন মৃত্যু যাতে যন্ত্রণাহীন হয়।

আর বৃদ্ধ দেবকীদাস, তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো, হাত দুটি কোমরের উপর ভাঁজ করা, ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, টান হ'য়ে শুয়ে নিশ্বাস নিচ্ছেন নিয়মিত ছন্দে, যেন গভীরভাবে ঘুমন্ত। মৃত্যু বলতে যে-সব ভয়াবহ ছবি আমাদের মনে জাগে তার কোনো চিহ্ন তাঁর মুখে নেই; হাসপাতালের মাসাধিকব্যাপী বিশ্রাম ও শুশ্রূষা তাঁর চেহারায় কোনো হানি ঘটতে দেয়নি। পাংলা শাদা চুলের তলায় তাঁর ডিম্বাকৃতি কপালটি এখনো সুচারু; আর টিকোলো নাক ও পাৎলা ঠোঁট নিয়ে তাঁর গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ্য মুখশ্রী দেখে এখনো ঠিক ধারণা করা যায় না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু তাকে কালিমালিপ্ত ক'রে দেবে।

সুখে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস, গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু স্বপ্নহীনভাবে নয়। বরং বলা যায়, ডাক্তারি মতে তাঁর ঘন্টা বেজে যাবার পরেও তিনি যে এতক্ষণ ধ'রে জীবিত আছেন, তার কারণই স্বপ্নের আকর্ষণ। স্বপ্নে একটি জন্তুকে দেখছেন তিনি, কোনো রোমশ নৈশ জন্তু, অস্পষ্ট, অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে সঞ্চরমাণ, নিঃশব্দে, কিন্তু তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে, স্পর্শময়। কিন্তু 'দেখছেন' কথাটা সংগত নয় এখানে; কেননা জীবিত মানুষের স্বপ্নে যেমন সব কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্যে অনুদিত হ'য়ে যায়, এই মুমূর্ষুরও তা-ই হচ্ছে; তাঁর নিজের আর কৃত্য কিছু

নেই, এখন এক অজ্ঞাত শক্তির তিনি অধীন—এক চিন্তাহীন, চেষ্টাহীন, অধিকৃত অবস্থায় এই শেষ মুহূর্তগুলি মসৃণভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর উপর দিয়ে। বলা বাহুল্য, এটা তাঁর মরণশীলতার শেষ দশা, এর আগে অন্য কয়েকটা পর্যায় তাঁকে পেরোতে হয়েছিলো।

২

অধিকাংশ মানুষের মতো, দেবকীদাসেরও অনেকটা সময় লেগেছিল তাঁর মৃত্যুর সন্নিকটতা বুঝে নিতে ও মেনে নিতে। একদিন হঠাৎ বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উঠলো, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হ'লো হাসপাতালে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁর প্রথম চিন্তা : 'আমি বাড়ি যাবো, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।' তিন বছর আগে পিশাচ-সংহিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, নানা অবান্তর কারণে অর্ধেকের বেশি এগোয়নি। আর তাঁর বহুকালের পরিকল্পিত রোমানি ভাষার শব্দতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ—এতদিনে সেটাতে সবেমাত্র হাত দিতে পেরেছেন। কী সেই নিগূঢ় ঐতিহাসিক যোগ, যার জন্য তথাকথিত জিপ্‌সিদের মুখে—হোক হাঙ্গেরিতে বা স্পেনে বা আয়র্লণ্ডে—এখনো বহু শব্দ শোনা যায় যা অবিকলভাবে আধুনিক বাংলা : এই বিষয়টি তাঁর আলোচ্য। প্রশ্নটি কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এ-মুহূর্তে পৃথিবীতে কেউ তা নিয়ে ভাবছে না—হাইডেলবার্গে ডক্টর শুলৎস ও কলকাতায় তিনি ছাড়া। আর পিশাচ-সংহিতা—সেই মনোমুগ্ধকর বিরল পুঁথি (খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতকের), যাকে বলা যায় মনু-সংহিতার একটি তান্ত্রিক ব্যাখ্যানকৃতি, বর্ণিলভাবে আদিরসাত্মক, যার ব্যাকরণে পাণিনির মুণ্ড চর্বিত ও বক্তব্যে সনাতন ধর্ম ছিন্নিত হয়েছে, সেটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ (লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ফোটোস্টাট কপি পাবার পরে) প্রকাশ করার উচ্চাশা তিনি পোষণ করেছিলেন। এই সব প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করবে তুচ্ছ কোনো শারীরিক বৈকল্য, তা দেবকীদাস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হাসপাতালে প্রথম কয়েকটা দিন এই কারণে বড়ো অশান্ত ছিলো তাঁর মন।

পুত্রকন্যা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেনি, সব প্রাপণীয় চিকিৎসা ও সেবাযত্ন তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁকে সংবাদপত্র ছাড়া আর কোনো পাঠ্যবস্তু দেয়া হচ্ছিলো না, তাই দিনমানব্যাপী অবকাশ ও দৈহিক বিশ্রাম তাঁর মনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আনুষঙ্গিক অন্য দু-একটি দুশ্চিন্তায়, এমনকি অনেক আগেকার ও অনেক আগে ভুলে-যাওয়া এক আক্ষেপে। থেকে-থেকে তাঁর মনে পড়ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরী-জীবন। তাঁকে ডেকে এনেছিলেন স্বয়ং স্যর শিবশঙ্কর (তখন দেবকীদাস সামান্য স্কুল-মাস্টার, মহানির্বাণতন্ত্র বিষয়ে একটি পুস্তিকামাত্র প্রকাশ করেছেন), কিন্তু সেই বিদ্যোৎসাহী উদারচেতা পুরুষের অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লো, আর তারপর পনেরো বৎসরেও দেবকীদাসের পদোন্নতি হ'লো না। তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলো যে, তিনি বিশেষজ্ঞ নন, পল্লবগ্রাহী, তাঁর কৌতূহল বড়ো বেশি ব্যাপক; যিনি 'শূন্যবাদের ভূমিকা' লেখার দু-বছর পরে প্রকাশ করেন কবিয়াল-গানের সংকলন (তাও সব অশ্লীলতা অবর্জিত রেখে), তারপর স্কীট সাহেবের ব্যুৎপত্তিনির্দেশে একুশটি ভুল দেখিয়ে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে সমালোচনা প্রকাশ করেন (আর, একই সময়ে কিছু অশোভনভাবে, বীরবলি বাংলা সমর্থন ক'রে বীরবলি ভাষাতেই 'সবুজপত্রে' একটি প্রবন্ধ) এবং যাঁর স্বরচিত 'এ কম্প্যারেটিভ স্টাডি অব বেঙ্গলি, ওড়িয়া অ্যান্ড অ্যাসামীজ ফোনেটিক্স'-এ অনেক সিদ্ধান্ত অনুমানমাত্র—তাঁকে কী ক'রে আধুনিক অর্থে 'স্কলার' বলা যায়? তিনি যে উৎসাহপ্রবণ, কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে সর্বদা চেষ্টাশীল, এটাই তাঁর অসারতার প্রমাণ ব'লে কথিত হ'লো; কালক্রমে চাকুরিক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম ক'রে গেলেন এমন কেউ-কেউ, যাঁরা ছাত্রজীবনের অবসানের পরে আর ধবল কাগজের ধ্যান-ভঙ্গ করেননি, কিন্তু নিয়মিতভাবে কর্তৃপক্ষকে ভজনা ক'রে গেছেন। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন দেবকীদাস। তুচ্ছ ঘটনা—শত্রুরা অজ্ঞাতসারে তাঁকে উপকৃত করেছিলেন, তাঁকে দিয়েছিলেন স্বকর্মের জন্য অখণ্ড স্বাধীনতা ও সুযোগ—কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে তা যেন একটি তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে দিলো তাঁর মনের মধ্যে।

সঙ্গে-সঙ্গে, হাসপাতালের নিরুদ্ধ কামরায় শুয়ে-শুয়ে, তাঁর মনে পড়ছিলো তাঁর লাইব্রেরি-ঘরটি, বহু বৎসর ধ'রে বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে অর্জিত তাঁর পুস্তকভাণ্ডার। নানা ভাষার ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের অভিধান; সংস্কৃত, পালি, বাংলা, ইংরেজি ও জর্মান পুস্তক; তিব্বতি ও নেপালি পুঁথি; কিছু বটতলা; দেশে-বিদেশে ভাগ্যে খুঁজে-পাওয়া কিছু বিরল বই। সুনিদ্রার পরে এক-একটি রাত্রি ভোর হয়, আর বইগুলির বিচ্ছেদবেদনা তাঁর মনে আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। ওদের নিয়ে, ওদেরই মধ্যে জীবন কেটেছে তাঁর, এবং তা-ই কাটবে ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন· তাহ'লে কেমন ক'রে এটা হ'তে পারছে যে সারাদিনে একবারও তাঁর দেখা হচ্ছে না ওদের সঙ্গে? আর তাছাড়া...অন্য এক প্রশ্ন...কী হবে বইগুলোর, তিনি যখন গত হবেন? এ-যাত্রায় না-হয় সেরে উঠছেন, কিন্তু ঘটনাটি তো অনিবার্য। কতবার ভেবেছেন কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে দানপত্র লিখে রাখবেন, কিন্তু আসক্তি তাঁকে

বৈশিষ্টমূলক
প্রাসঙ্গিক পুস্তক !

যাত্রা গানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
—ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য ১৬.
রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্যপ্রভাব
—ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য ১২.
বৈষ্ণবীয় প্রেম — বিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী ১৫.
সে যুগের কেচ্ছা এ যুগের ইতিহাস
—সুবীর রায় চৌধুরী ৪.০০
অজয় বহে ধীরে—বিনয় মুখোপাধ্যায় ৩.৫০
উপন্যাস
উত্তর বন্যা — নীলমণি ঘোষ ৩.০০
প্রান্তিক — সুধীন গোস্বামী ২.৫০
নক্ষত্রের আলো — সুধীন গোস্বামী ২.৫০
ভার্যাদান — তুলসী দাস ২.৫০
মন্থর ত্যজি যব
—হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য ৩.৫০
কিশোর উপন্যাস :
কাচের পাহাড় ২.৫০
আডালবেট স্টিফটের
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চলন্তিকা
৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

চায়ের আসর জমাতে
ইম্পিরিয়াল
চা
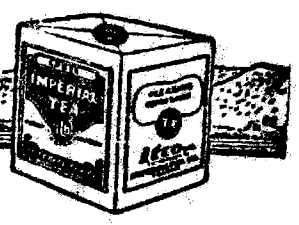

পানে ও আপ্যায়নে
ইউকো প্রাঃ লিঃ
৪নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

বাধা দিয়েছে। এদিকে তাঁর পুত্র আয়কর-বিভাগের অধিকর্তা, জামাতা চক্ষু-চিকিৎসক, নাতিরা শিক্ষা পেয়েছে ডাক্তারিতে বা পদার্থতত্ত্বে বা যন্ত্রবিদ্যায়. নাৎনিদের জন্যও ঐ ধরনের বর খোঁজা হয়েছে এবং হবে; তাঁর কোনো নিকট-আত্মীয়ের পক্ষে ও-সব বই কখনো ব্যবহার্য হবে, এমন সম্ভাবনা আণুবীক্ষণিক। ওরা বিব্রত হবে, আস্ত একটা ঘর-ভর্তি নিষ্প্রয়োজনীয় বইগুলো নিয়ে বিব্রত হবে: হয়তো এমন দিন আসবে যখন খুবই যুক্তি-সঙ্গতভাবে সেগুলোর কোনো 'ব্যবস্থা' করতে চাইবে ওরা; আর তখন তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস বা বৎসর পরে, কোনো অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ী কিনে নেবে তাঁর সমস্ত বই; যাঁরা বহুকাল একসঙ্গে ছিলো এবং যাদের একত্রীকরণের মধ্যে ছিলো তাঁরই রচিত একটি সামঞ্জস্য, তারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়বে. এই চিন্তা যখনই তাঁর মনে জাগে তখনই বৃদ্ধের যেন বুক ভেঙে যায়। এও ছিলো তাঁর এক মনঃকষ্টের কারণ—হাসপাতালে প্রথম দশ-বারো দিন।

কিন্তু এর পরে তাঁর হৃদযন্ত্র আবার একদিন দুরাচারী হ'লো, আর সেই আঘাত থেকে সামলে ওঠার পর তিনি মুমূর্ষুতার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলেন।

৩

'আমি মারা যাচ্ছি' : এই বার্তা এবারে তাঁর মস্তিষ্কে পৌঁছলো, কিন্তু তা থেকে তাঁর মনে কোনো ত্রাস বা যন্ত্রণার সঞ্চার হ'লো না। হয়তো তার কারণ এই যে পূর্বোক্ত 'আমি'টির সঙ্গে তিনি ঠিক মেলাতে পারছিলেন না নিজেকে, তাঁর অতি পরিচিত দেবকীদাস ভট্টাচার্যকে। ঐ 'আমি'র মৃত্যু একটা নির্বস্তুক তথ্য, যা সংবাদপত্রে দেবকীদাসেরও চোখে পড়বে—এমনি মনে হচ্ছিলো তাঁর। কিন্তু, একই সঙ্গে, তাঁর চৈতন্যে সেই দেবকীদাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিলো; এতদিন যিনি ছিলেন পণ্ডিত ও গ্রন্থকার (যাঁর কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে ব'লে দাবি করা যায়) তিনি অকস্মাৎ হয়ে উঠলেন এক বাসনাবিদ্ধ রক্তমাংসের মানুষ। শরীর থেকে মরা চামড়ার মতো তাঁর মন থেকে খসে পড়লো তাঁর কর্মজীবন তৎসংক্রান্ত সব খেদ ও দুশ্চিন্তা। সমুদ্রের মধ্যে লোষ্ট্রের মতো ডুবে গেলো সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়, যেখানে তিনি এক যুগের অতীতে কর্ম করতেন। পিশাচ-সংহিতার অনুবাদ রোমানি ভাষা বিষয়ে তাঁর সন্দর্ভ : এগুলো সমাপ্ত হ'লো না ব'লে এখন আর তিনি পরিতপ্ত নন, শঙ্কাকুল নন তাঁর গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদল বানরকে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দিলে তারা দশ লক্ষ বছরের মধ্যে শেক্সপীয়রের সব নাটক লিখে উঠবে, এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে—আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই রচনা করবে রোমানি ভাষা বিষয়ে ঠিক সেই নিবন্ধ, যা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কারো-না-কারো উদ্যোগে পিশাচ-সংহিতার অনুবাদও প্রকাশিত হবে। তাহলে : কী এসে যায়? আর তাঁর সংগৃহীত বইগুলি বিষয়ে তাঁর মনে একটি নতুন চিন্তার উদয় হলো : তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঐ বইগুলিরও মৃত্যু হবে, কেননা তিনি তাদের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, তা ছিলো তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, বহু বৎসর ধ'রে তা বিবর্তিত হয়েছিলো, সেই সম্বন্ধটি একবার অবসিত হ'লে, আকারে-প্রকারে অস্তিত্ব থাকলেও তাঁর ব্যবহৃত একটি বইও আর থাকবে না. তাঁর পঠিত কোনো-একটি বই অন্য কেউ পড়বে না কোনোদিন। অতএব ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সংবলিত যে-বস্তুগুলিকে তিনি অতি যত্নে রক্ষা করেছিলেন (যা আসলে কোনো পরিবর্তনশীল অন্তঃসারের আধারমাত্র), তা হস্তান্তরিত বা উপেক্ষিত বা বিনষ্ট হ'লে: কী এসে যায়? এই স্বার্থপর চিন্তা তাঁকে সান্ত্বনা দিলো, কিন্তু তা অনুধাবন করতে গিয়ে তিনি ক্লান্তিবোধ করলেন, তাঁর দুর্বল-হ'য়ে-আসা মননশক্তি এক কোমলতর আশ্রয় খুঁজলো। দু-একটি নারীমূর্তি উদিত হ'লো তাঁর স্মরণে।

৪

দেবকীদাসের বয়স যখন তেইশ, পিতা-মাতার নির্দেশে ও আয়োজনে একটি ষোড়শ-বর্ষীয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর যুবক-চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য জেগে ছিলো অন্য একজনের জন্য — ভাটপাড়ায় তাঁদেরই প্রতিবেশিনী এক কিশোরী বিধবা. কিন্তু পিতার মতে বিধবাবিবাহ গর্হিত জেনে সে-দিকে অগ্রসর হ'তে সাহস পাননি, এবং একটি সুন্দিনধা তন্বীকে সহধর্মিণীরূপে পাবার পরে অন্যজনকে সহজেই ভুলেছিলেন। যথাবিহিতভাবে পালন করেছিলেন দাম্পত্যধর্ম; একটি পুত্র ও একটি কন্যার মুখ দেখেছিলেন আর তারপর, বিবাহের মাত্র পাঁচ বছর পরে, তখনকার দিনে অচিকিৎস্য টাইফয়েড রোগে পত্নীর মৃত্যু হ'লো। যদিও তাঁর

বিশ্ববিখ্যাত
জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতির্বার্ণব, সাম্মানিক রত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন), ৮৮-২, বাঁকি আমেদ কিদোয়াই রোড, "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" কলিকাতা-১৩। সময় বৈকাল ৫—৭টা। ফোন : ২৪-৪০৬৫। প্রেসিডেন্ট-দি অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত : ১৯০৭ খৃঃ)।

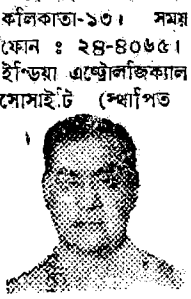

দিব্যদেহধারী এই মহামানবের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের জ্যোতিষ ও তন্ত্র-শাস্ত্রের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর গৌরবদীপ্ত প্রতিভা শুধুমাত্র ভারতে নয়,—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, জাভা, সিঙ্গাপুর) পরিব্যাপ্ত। গুণমুগ্ধ চিন্তাবিদেরা শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

জ্যোতিষ-সম্রাট

প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন।
বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ। ধনদা কবচ—সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য ১১·৪৩, শক্তিশালী বৃহৎ ৪৪.৫৪, বগলামুখী কবচ—প্রবল শত্রুনাশ ও মামলায় জয়লাভ এবং কার্যসিদ্ধি হয়—১৩·৮৮ বৃহৎ : ৫১·১৮। মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়—১৭.২৫, বৃহৎ : ৫১·১৮। সরস্বতী কবচ—বিদ্যোন্নতি ও পরীক্ষায় সুফল ১৪·৩৪, বৃহৎ : ৫৭.৮৭।

যৌবন তখন পূর্ণ, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন; সূক্ষ্ম, সুদূর গবেষণাকর্মে রচনা ক'রে নিলেন তাঁর উদ্যমের জন্য পয়ঃপ্রণালী; মন থেকে সরিয়ে দিলেন নারী-সংক্রান্ত কল্পনা ও অনুধ্যান। এমনি কাটলো একে-একে চোদ্দ বছর, হয়তো তাঁর অবশিষ্ট আয়ুষ্কালেও কোনো ব্যতিক্রম হ'তো না, যদি না দৈবে আবার দেখা হ'য়ে যেতো তাঁর প্রথম যৌবনের প্রতিবেশিনীর সঙ্গে।

অন্য দেশ, অন্য পরিবেশ, অন্য লোকাচার। তিনি এসেছেন লন্ডনে প্রাচ্য-বিদ্যালয়ে এক বৎসরের জন্য আমন্ত্রিত অধ্যাপক হ'য়ে। তীব্র শীত, অরুচিকর খাদ্য, সূর্য অদৃশ্য বা ক্ষীণজ্যোতি, বিরল-বাক লোহিতবর্ণ কর্মতৎপর জনতা। সহ-কর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, অবশিষ্ট সময় বৃটিশ ম্যুজিয়মে নিমজ্জন। কিন্তু সেই তুষারের শবাচ্ছাদ, সেই ধোঁয়া, মেঘ, কুয়াশার আস্তরণ—তারই তলায় প্রচ্ছন্ন ছিলো ইন্দুমতী; তিনি জানতেন না। একদিন, অবশেষে সেই উত্তর-দেশেও যখন গ্রীষ্ম উঁকি দিলো, আর তাঁর দেশে ফেরার তিনমাস মাত্র বাকি, তখন লন্ডনবাসী বাঙালিদের এক প্রীতিসম্মেলনে দেখা হ'য়ে গেলো।

চোখে-চোখে দেখা, দু-একটা প্রাথমিক বাক্যবিনিময়, হঠাৎ যেন বিদ্যুতের উদ্ভাস, কোনো অন্তর্নিহিত অন্তরিক্ষে উজ্জ্বল অক্ষরে আঁকা পরিচয়;—তারপর সব সাধিত হ'লো অতি সহজে, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। গৃহত্যাগিনী হয়েছিলো ইন্দুমতী, কলকাতার একটি ধনীপুত্রের প্ররোচনায় গোপনে তাকে বিয়ে ক'রে চ'লে এসেছিলো লন্ডনে, কিন্তু সে-বিয়ে দু-বছর পরেই ভেঙে যায়, তার বর্তমান ইংরেজ স্বামীর সঙ্গেও তার সম্বন্ধ শিথিল। স্বামী কর্ম করেন কভেন্ট্রির এক কারখানায়, সপ্তাহান্তে স্ত্রী-কন্যার কাছে লন্ডনে আসেন বা আসেন না। এই পূর্ব-ইতিহাস, দেবকীদাসের বংশগত রক্ষণশীলতা যাতে প্রতিহত হ'তে পারতো—তা ছাপিয়ে উঠলো অলঙ্ঘনীয় এক আহ্বান, এক উষ্ণ, সজীব ও যৌবনের স্মৃতিরঞ্জিত উপস্থিতি। ইন্দুমতী যে পরস্ত্রী ও মাতা, দেবকীদাসের পরিবারিক আদর্শ অনুসারে কলঙ্কিনী ও এমনকি ভৈরিণী—এই সব সম্ভবপর দুর্বল দ্বিধাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে বেজে উঠলো তাঁর প্রৌঢ় শোণিতে শঙ্খনাদ; চোদ্দ বছর ধ'রে যে-স্রোত ছিলো অবরুদ্ধ, তা উন্মাদ বেগে শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর দিক থেকে ছিলো ভীরুতা ও সংশয়, কিন্তু তাঁকে হরণ ক'রে নিলো ঐ কান্তিময়ী সাহসিকা—অনায়াসে, কোনো কথা না-ব'লে, শুধু চোখে-চোখে তাকিয়ে, শুধু টেলিফোনে নাম ধ'রে ডেকে একবার। গল-মান শিলার মতো সব রাত্রি, আবর্তময় অপরাহ্ণ, পুনরাবৃত্ত চুম্বনপুঞ্জে অভিক্ষিপ্ত উষাকাল—যেন স্মরণাতীত সময় থেকে এরই জন্য অপেক্ষা ছিলো দু-জনেরই। নায়িকা তাকে হাতে ধ'রে নিয়ে গেলো জীবনের অন্য এক স্তরে; অন্য এক জগৎ উন্মোচিত ক'রে দিলো তাঁর জন্য; দীক্ষা দিলো এমন সব রহস্যে, এতদিন যার অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিলো না। দেবকীদাস আহরণ করলেন এমন কোনো-কোনো জ্ঞান যা পুস্তকে বা পাণ্ডুলিপিতে সঞ্চিত নেই: তিনি অশ্রুপাত করলেন নাট্যশালায়; চিত্রশালায় কোনো নগ্নাকে দেখে প্রতিমার সামনে ভক্তের মতো দাঁড়ালেন, প্রীত হলেন পল্লী-অঞ্চলে কোনো তিনশো বছরের পুরোনো সরাইখানায় রাত্রি কাটিয়ে; স্নিগ্ধ লঘু শ্যাম্পেনমদিরার আস্বাদ নিলেন; আবিষ্কার করলেন ঐ হিমাহত অমিত্র দ্বীপে এক গ্রীষ্মকালীন মনোমুগ্ধ-কর শ্যামলিমা;—এতদিনে ইংলন্ড দেশটা তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লো। এক বিপুল, হৃদয়মন্থনকারী জাগরণ যেন; এই উপহার, ইন্দুমতীর। কিন্তু, যখন দেবকীদাসের মনে হচ্ছে তাঁর জীবন সবে-মাত্র আরম্ভ হ'লো, তখনই একদিন জাহাজ-ঘাটায় জলের ব্যবধান বেড়ে চললো দু-জনের মধ্যে, তিনি বন্দরের ভিড়ে হারিয়ে ফেললেন সেই দোহনীকে; তাঁর মেরু-দন্ড বাঁকিয়ে দিয়ে, স্নায়ুতন্ত্রী ছিন্নভিন্ন ক'রে, স্মৃতি ছাড়া অন্য সব বৃত্তি কেড়ে নিয়ে, অত্যাচারী কান্না নেমে এলো। আ—সেই কষ্ট, সেই দ্বিখণ্ডিত হবার যন্ত্রণা!

দেবকীদাস তাঁর বর্তমান বয়স ভুলে গেলেন; কিংবা হয়তো, প্রাণশক্তি ক্ষীয়মাণ ব'লে, তাঁর কাছে অস্পষ্ট হ'য়ে এলো যৌবন ও বার্ধক্যের ভেদ, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রথাসম্মত বিচ্ছেদরেখা। যেন লন্ডনের সেই দিনগুলিতে প্রত্যাবৃত তিনি—এমনি মনে হ'লো তাঁর—আবার ইন্দুমতীর দ্বারা প্লাবিত: সব সুবাস, সব উচ্ছ্বাস, সব আত্মবিস্মৃতি ও আত্মসমর্পণ নিয়ে আবার সেই রাত্রি, উষা, অপরাহ্ণগুলি। আর তারপর—সেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। ফেরার পথে জাহাজে একুশ দিন—কী কঠিন চেষ্টায় রুদ্ধ রেখেছেন আর্তনাদ, সহ্য করেছেন প্রতি মুহূর্তে সেই অনুপস্থিত উপস্থিতি। তাকে আবৃত ক'রে আছে ইন্দুমতী; তাঁর গালে তার গালের স্পর্শ, কাঁধের উপর তার আদরণীয় কোমল কেশ-ভার, তাঁর প্রতি রোমকূপে তার স্তনাগ্র-চূড়ার শিহরণ; তাঁর কর্ণকুহরে সেই কণ্ঠ-স্বর ছাড়া শব্দ নেই, শুধু সেই হাসি আর দৃষ্টির জন্যই তিনি চক্ষুষ্মান। পুনরায় জাগ্রত হলেন স্মরদেবতা, বৃদ্ধকে কাঁপিয়ে দিয়ে তাঁর ধমনীর মধ্যে; তার বেগ সহ্য করার জন্য তিনি পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধরলেন বিছানার চাদর, দাঁত বসিয়ে দিলেন বালিশে (যেমন করেছিলেন তিরিশ বছর আগে এক ভারতগামী জাহাজের কেবিনে), নিঃশব্দ চীৎকারে উচ্চারণ করলেন একটি নাম আর এক আকস্মিক স্বচ্ছ মুহূর্তে বর্তমানে ফিরে এসে ভাবলেন: 'কিন্তু এই যন্ত্রণাতেই সুখ, এই বেদনাতেই আনন্দ। যে-সব বই পড়েছি তাতে নয়, যে-সব বই লিখেছি তাতে নয়, আমার জীবন যদি কখনো কোনো সার্থকতা পেয়ে থাকে, তা এখানে—এই হৃৎস্পন্দনে, অনুকম্পনে।' কিন্তু এই আবেগের চাপ তাঁর দুর্বল দেহ সহ্য করতে পারলো না; তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেলো, তিনি আবিষ্ট হ'লেন সেই মূর্ছায়, যা থেকে আর জাগরণ নেই। তাঁর মরণাপন্নতার উপান্ত্য দশা উপস্থিত হ'লো। আজ তাঁর শেষ মূর্ছার তৃতীয় দিন।

৫

প্রথম দু-দিন কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন তিনি। অনেক দৃশ্য ভেসে উঠছে অন্ধকারে, মিলিয়ে যাচ্ছে—অসংলগ্ন, অনিশ্চিত, অর্থহীন: কোনো-কোনো মুখ, কোন-কোনো স্থান, রাস্তা, পার্ক, হোটেলের ঘর—কে, কোথায়, কেন, তার স্থিরতা নেই; এক পরিচালকহীন, বিরক্তিকর ঘূর্ণি যেন: আর এই সবের ফাঁকে-ফাঁকে, মধ্য দিয়ে যেন কোনো গোপন রন্ধ্রপথ রচনা করে নিয়ে, এক মূর্তি, বা পরিলেখ বা আভাসমাত্র, যেন তাঁরই জন্য আবির্ভূত, তাঁকে ডাকছে, কোনো দুর্বোধ সাংকেতিক ভাষায় বার্তা পাঠাচ্ছে তাঁরই জন্য। এ-ই কি তাহ'লে মৃত্যু? না কি বহু-বিশ্রুত ভগবান? না কি আমি বহুকাল যাকে ভুলে ছিলাম, যে? যার বিচ্ছেদে বিদীর্ণ হয়েছিলাম, সে? আমাদের সারা জীবনের চেষ্টা কি শুধু তারই কাছে ফিরে যাওয়া—আমরা যার নাম দিয়েছি ভগবান, অথবা মৃত্যু, অথবা...ভালোবাসা। অবশিষ্ট, ক্ষীণতম চৈতন্য দিয়ে তিনি আঁকড়ে ধরলেন এই তিনটি শব্দকে—মর্ত্য-লোকের সঙ্গে শেষ যোগসূত্র তাঁর; আর তাও যখন ছিন্ন হ'লো, তখনই তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর মরণশীলতার ক্ষণস্থায়ী অন্তিম পর্যায়ে।

আজ সকাল থেকে সব অবান্তর দৃশ্য অন্তর্হিত হয়েছে; এখন তাঁর অন্ধকার যেন সুনির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ, তাই আরাম-দায়ক। কোনো রোমান জন্তু, নৈশ, অস্পষ্ট, অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে সঞ্চরমান, নিঃশব্দে, কিন্তু তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে স্পর্শময়। দূর্বার স্পর্শ, শ্যাওলার, কদম্বের, ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা ছোটো-ছোটো চোর-কাঁটায়; আর গন্ধ—এক উষ্ণ, সজীব, উন্মাদক ঘ্রাণ, অন্ধকারে আশা ছড়িয়ে, এক বিপুল, অচিন্ত্য নবজাগরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সারাদিন ধ'রে খেলা চললো তাঁর সঙ্গে ঐ অস্পষ্ট সত্তার; তারপর আহ্নিক আকাশে যখন সূর্য অস্ত যায়, দেবকীদাস সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলেন ঐ কোমল, রোমশ, জন্মান্তরকারী স্পর্শ, প্রতি রোম-কূপে তার শিহরন, তার দংশন, তার প্রভুত্ব—এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হ'য়ে। কিন্তু, সেই জন্তুর নাম ভালোবাসা, না ভগবান, না মৃত্যু, তা বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না; পৃথিবীর সব ভাষা, সব নাম, সব চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিলো সেই অমেয় অনুভূতির মধ্যে। সূর্যাস্তের আগেই ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ব'লে ঘোষণা করলেন।

গ্রন্থত্ব

সুকুমার সেন

'গ্রন্থ', 'পুস্তক' (আকারে ছোট ও ভারে লঘু হলে 'পুস্তিকা') ও 'বই" সমার্থক শব্দ। আরবী থেকে ফারসীর মধ্য দিয়ে আসা 'কেতাব'ও এর মধ্যে ধরতে পারি। তবে এই শব্দটির প্রয়োগ খুব ব্যাপক নয়, এর ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। 'গ্রন্থ' শব্দটি সংস্কৃত এবং প্রাচীন, তবে অবৈদিক। 'পুস্তক', 'পুস্তিকা' সংস্কৃত, কিন্তু অর্বাচীন, প্রাকৃত শব্দে আরোপিত সংস্কৃত রূপ। দুটি শব্দই হরিবংশে প্রথম পাওয়া যায়। 'বই' তদ্ভব শব্দ, তবে আসলে বাংলা কিনা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে শব্দটির প্রয়োগ পেয়েছি বলে মনে হয় না। এ শব্দটির প্রাচীনতর রূপ 'বহি' সেদিন পর্যন্ত চালু ছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' (১৩৫০ সাল)। পুরানো রাজস্থানী—গুজরাটীতে 'বহি' পেয়েছি। হিন্দীতেও আছে। সম্ভবত সেই সূত্রেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শব্দটি বাংলায় ব্যবসাদারদের ব্যবহারে চলিত হয়েছিল। চলিত বাংলায় এখন 'বই'ই প্রায় একমাত্র শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গ্রন্থ' বলতে মহাভারত রামায়ণের মতো গুরুভার ও গুরুগম্ভীর অথবা ভালো ছাপা ও উত্তম বাঁধাই দামি বই মনে হয়। (তুলনা করি রবীন্দ্রনাথ "মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।" সেই সঙ্গে 'কেতাব' শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ্য করি, "অপাঠ্য সব পাঠ্য-কেতাব সামনে আছে খোলা।") আর 'পুস্তক' সাধারণত সেকেলে সমালোচকদের লেখায় আর সেকেলে বিজ্ঞাপনের ভাষায় সমাহিত। 'পুস্তিকা' চলিত আছে, কেন না এর সমার্থক শব্দ আর নেই। পুস্তক-পুস্তিকার প্রাচীনতর এবং তদ্ভব রূপ 'পোথা-পুথি (পুঁথি)' পুরানো হাতে-লেখা পাতার তাড়াতেই নিবদ্ধ। তবে বটতলার প্রকাশকেরা একদা পোথা-পুথি ছাপা হলেও 'পুথি' নামটি বর্জন করতেন না। যেমন, 'চন্দ্রমুখীর পুথি'।

বইয়ের সমার্থক রূপে 'গ্রন্থ' পাণিনির ব্যাকরণ-সূত্রে ব্যবহৃত আছে। তার আগে শব্দটির প্রয়োগ পাইনি। প্রশ্ন হল ব্যুৎপত্তিগত মানে কী? সহজেই মনে আসে, গ্রন্থি ক'রে অর্থাৎ গাঁট দিয়ে লেখা পাতাগুলি গাঁথা হত বলে। দু-তিন শ' বছরের পুরাণো বাংলা পুঁথি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে সেকেলে সযত্নে তালপাতায় (তেরেট পাতায়) এবং কাগজের পাতায়ও লেখা অনেক পুঁথির মাঝখানে দেড়-দু ইঞ্চি চৌকো ফাঁকা অংশ থাকে। সেই অংশের মধ্য দিয়ে মোটা সুতা পাতাগুলিতে গেঁথে রাখত। এ ব্যাখ্যা সহজ ও সঙ্গত হলেও সরাসরি গ্রহণ করতে একটু বাধা আছে। তার কারণ প্রথমত আমরা (অর্থাৎ আমার জ্ঞানে) ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেকার কোন পুঁথিতে এ-ব্যাপার দেখিনি। দ্বিতীয়ত বাংলা দেশের বাইরে—আসাম ও উড়িষ্যা (এবং সম্ভবত দক্ষিণ ভারত) ছাড়া অন্যত্র পুঁথিতে এমন ফাঁক রাখা ও সুতা বাঁধা পুঁথি বেশি দেখা যায়নি। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্যত্র তালপাতার পুঁথির ব্যবহার কম। কাগজের পুঁথির মাঝখানে সুতা দিয়ে বাঁধলে পুথি সহজেই জখম হয়। আমরা জানি না পাণিনির সময়ে কিসের উপর লেখা হত। যদি শক্ত কাঠের ছাল অথবা পাতলা কাঠের তক্তি অথবা তালপাতা বা অনুরূপ বস্তু কাগজের মতো ব্যবহৃত হ'ত তবে সেগুলিকে সংহত রাখবার জন্যে এই গ্রন্থি ব্যবস্থাই উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত ছিল। আর একভাবে 'গ্রন্থ' শব্দের বই-অর্থ আসতে পারে। সে হল শব্দ, পদ ও বাক্য গাঁথা। এই আদিম অর্থ গ্রহণ করলে শব্দটিতে পরবর্তী কালের 'নিবন্ধ' ও 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রাচীন সমার্থক বলে নিতে পারি। পাণিনির সময়ে লিপিপদ্ধতি খুবই প্রচলিত ছিল, সুতরাং দুটি ব্যুৎপত্তির মধ্যে যে-কোনটি অথবা যুগপৎ দুটিই গ্রহণ করতে পারা যায়। বই অর্থে 'গ্রন্থ' এখন কোন ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত নেই। তবে সিংহলীতে আছে, 'গত'। বাংলায় একদা ছিল, তার প্রমাণ 'গাথাঘর' মানে পুস্তক-গৃহ।

'পুস্তিকা' এসেছে 'পুস্তক' থেকে অথবা এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে। অব্যবহিত মূল শব্দ হ'ল 'পুস্ত'। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পুস্ত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রথমে মানে ছিল ঢাকনি, খোল, আবরণ—মাটির কাঠের, চামড়ার, কাপড়ের অথবা অন্য কিছুর, প্রলেপ ও তদুপরি কারুকর্ম, নাচের মুখোস (এবং পুতুল) ইত্যাদি। বাংলা দেশে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উচ্চতর রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'পুস্তপাল' একজন। এঁর কাজ ছিল মহাফেজখানার তদারকি। সুতরাং তখনই 'পুস্ত' শব্দের সঙ্গে 'গ্রন্থ' শব্দের সংযোগ ঘটেছিল। কীভাবে সংযোগ ঘটেছিল তা শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকে বোঝা দুরূহ নয়। পণ্ডিতেরা শব্দটিকে মধ্য পারসীক থেকে আগত বলে ধরে নিয়েছেন। মধ্য পারসীক 'পোস্ত্' শব্দের মানে চামড়া। ওদেশে চামড়ার ও পার্চমেন্টে লেখা হত, কিন্তু আমাদের দেশে তা কদাপি হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। পবিত্র গ্রন্থকর্ম চামড়ায়, অসম্ভব। সুতরাং বিদেশী 'পোস্ত্' থেকে দেশি 'পুস্ত' আসেনি। অনুমান করেছি শব্দটি এসেছে খুব পুরানো বৈদিক শব্দ "পবস্ত" থেকে (ফারসী 'পোস্ত্'ও এই শব্দের ইরাণীয় মূল থেকে উৎপন্ন।) শব্দটির মূল অর্থ ছিল দু-খোলের আবরণ, পরবর্তীকালে মোটা কাপড়। প্রাকৃতে শব্দটি 'পেত্থ' এবং তার থেকে 'পুত্থ' রূপ নিয়েছিল (মধ্য পারসীকে 'পোস্ত্' থেকেও তাই)। এই প্রাকৃত 'পুত্থ' সংস্কৃত রূপ নিয়ে দাঁড়াল 'পুস্ত'। এবং তাতে ক-প্রত্যয় যোগ করে 'পুস্তক'। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার অঞ্চল বিশেষে যে প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে তা অধিকাংশই দলিলপত্র। সেগুলি রাখা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো হত কাঠের পাটার মধ্যে, এখনকার যেমন খাম, তেমনিভাবে। দলিলের বা গ্রন্থের আকার বড় হলে তা হয়ত কাঠের কৌটার মধ্যে রাখা হত, অথবা মোটা কাপড়ে কিংবা সিল্কে। এখনকার দিনে বড় বইয়ের যে শক্ত বাঁধানো মলাট, তখনকার দিনে পুস্ত ছিল যেন তাই। তারপর অর্থ পরিবর্তনের একটি সাধারণ সূত্র—আধার থেকে আধেয়—অনুসারে খোসার নামে শাঁস, আবরণের নামে লিপিবদ্ধ বস্তু সহজেই চলে গিয়েছিল। পুথি (বড় হলে পোথা) মাত্রেই তখন কাঠের পাটায় সুতা দিয়ে জড়ানো থাকত এবং তা আবার শক্ত কাপড়ে মুড়ে রাখা হত। এইভাবেই 'গ্রন্থ' 'পুস্ত' (পুস্তা) পুস্তক নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিল। (গ্রন্থ অর্থে 'পুস্তা' বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় পাওয়া যায়।) পূর্ব ইরাণীয় প্রাচীন ভাষায় সোগদীয়তে 'গ্রন্থ' অর্থে 'পুস্তক' (Pwstk) চলিত ছিল।

'বই' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না। সম্ভব নয়। অত্যন্ত অর্বাচীন প্রাকৃতে এবং পুরানো গুজরাটী-রাজস্থানী ভাষায় শব্দটি পাওয়া গেছে 'বহিয়া', 'বহী' রূপে। মানে হিসাবের খাতা, ডায়ারি। শব্দটি তদ্ভব এবং সংস্কৃত থেকে উপজন্ন বলেই মনে হয়। শব্দটির সম্ভাব্য মূল সংস্কৃতে কী হবে তা অর্থ থেকে প্রতিপন্ন করা যায়। এখন 'বই' বলতে ছাপা পুস্তক বোঝায়। আগে বোঝাত খাতা, হিসাবের বা অন্য কাজের। প্রাচীন 'গ্রন্থ' বই (অর্থাৎ লেখা পাতার সমষ্টি গ্রন্থিবদ্ধ এবং/অথবা পুস্ত-আবদ্ধ) ছাড়াও আর এক ধরণের 'বই' লেখার রীতি ছিল। ভূর্জপত্রের মতো গাছের ছাল (পরে কাগজ) পর পর জোড়া দিয়ে লম্বা করা হ'ত এবং তাতে লেখা হত যেমন এখন কোষ্ঠী বা জন্ম-পত্রিকা লেখা হয়। তারপর তা গুটিয়ে রাখা হত, প্রয়োজন হলে কাঠের, বাঁশের অথবা ধাতুনির্মিত চুঙ্গীতে (এক-রকম 'পুস্ত') রাখা হত। এই ধরণের দীর্ঘ গুটানো লেখা (roll) বাংলা দেশে দু-তিন শতাব্দী আগে 'গড়া' নামে

পরিচিত ছিল। (ঠিক এই অর্থে লাটিনে ছিল (Volumen) যার থেকে এসেছে ইংরেজী volume, অর্থ—লেখা দীর্ঘ পার্চমেন্ট অথবা কাগজ যা গুটিয়ে রাখতে হয়। তেমন বই বই।) টান লেখাযুক্ত "কাগজ" যদি শব্দটির মূল মানে হয় তবে আসলে শব্দটি সংস্কৃত 'বহ' ধাতু থেকে উৎপন্ন *বাহিক *বাহিকা থেকে আসা সম্ভব। আর মূল মানে যদি লেখা 'কাগজ'-এর টুকরো একত্র গাঁথা হয় তবে শব্দটির মূল হতে পারে *বধিক *বধিকা ('বন্ধ' ধাতু থেকে উৎপন্ন, তুলনীয় 'বধক' মানে জলাশয়)। আমার মনে হয় শেষের অর্থই ঠিক কেন না তা হলে খুচরো লেখা—চিঠা, চোথা, চোতা—কাগজের সঙ্গে 'বহি'র অর্থাৎ খাতার বৈপরীত্য বোঝা যায়।

অক্ষর ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে গ্রন্থকর্ম অর্থাৎ বই লেখা আরম্ভ হয়েছিল। কবেকার সে কথা জানি না, তবে পাণিনির সময়ে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে) গ্রন্থ-কর্ম খুবই চলত। গ্রন্থ শব্দটি পাণিনির ব্যাকরণের একটি সূত্রেই পাওয়া যায়। সে সূত্রে বলা হয়েছে যে, যে বিষয়ে বই লেখা হয়েছে তা যদি গ্রন্থনাম হয় তবে তাতে উপযুক্ত প্রত্যয় করতে হবে। এ-সূত্রে প্রত্যয়টি নির্দেশ করা হয়নি, তবে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা প্রত্যয়টিকে '—অ ('অণ্') বলে গ্রহণ করেছেন। পরের সূত্রটিতে পাণিনি বলেছেন গ্রন্থনাম যদি দ্বন্দ্বসমাস হয় তবে—'ঈয়' ('ছ') প্রত্যয় যোগ হবে এবং শিশুক্রন্দ, যমসভা, ইন্দ্রজনন এই তিন বিষয়ের গ্রন্থনামেও -'ঈয়' প্রত্যয় হবে। পাণিনির সূত্রে সেকালের বিলুপ্ত লৌকিক কাহিনী বইয়ের নাম পাই—শিশুক্রন্দীয় (=ছেলে-কাঁদা ; ছেলে ভোলানো ছড়া?), যমসভীয়ম্, ইন্দ্রজননীয়ম্ (=ইন্দ্রের জন্ম-কথা)। অনেক পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন দ্বন্দ্বসমাস গ্রন্থনামে এই প্রত্যয় দেখা যায়,—কিরাতার্জুনীয়, বিক্রমোর্বশীয়, কাকোলুকীয়। গ্রন্থনামে প্রত্যয়ের ব্যবহার যেন আবশ্যিক ছিল,—এইরকম ধারণা হয় গ্রন্থকর্ম সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র দুটির প্রথমটি থেকে। কিন্তু পাণিনির প্রথম ব্যাখ্যাতা বার্তিককার কাত্যায়ন তা অনেকটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি সূত্রটিতে সংশোধন করে বলেছেন, গ্রন্থবিষয় ঘটিত নামে প্রত্যয় যোগ হয় তবে আখ্যায়িকা (অর্থাৎ গল্পকাহিনী) হ'লে সে প্রত্যয়ের লোপ হয়, অর্থাৎ প্রত্যয় যোগ হয় না। এই বার্তিক সূত্রের উদাহরণ যুগিয়েছেন মহাভাষ্যের পতঞ্জলি,—বাসব-দত্তা, সুমনোত্তরা। পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে এর উদাহরণ প্রচুর,—'রঘুবংশ', অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, কাদ-ম্বরী, বাসবদত্তা ইত্যাদি।

তাহলে পাণিনি যে '—অ ('অণ্') প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন সে সম্বন্ধে কী হল? পাণিনি বাস্তব-ব্যাকরণ লিখে-ছিলেন, আদর্শ ব্যাকরণ নয়। আর তাঁর সময়ের গ্রন্থনাম সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন চিন্তারও কারণ নেই। আসল কথা পাণিনি ব্যাকরণ লিখেছিলেন প্রধানত শিষ্টদের জন্যে তাই বৈদিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত ঐতিহ্যগত গ্রন্থ তাঁর প্রথম ও প্রধান সূত্রটির লক্ষ্য ছিল। অতএব তাঁর প্রথম সূত্রের উদাহরণ দিতে পারি পরবর্তীকালের কোন কোন পুরাণ গ্রন্থের নাম,—ভাগবত (ভগবৎ-সম্বন্ধীয়), আগ্নেয় (অগ্নি-সম্বন্ধীয়), শৈব (শিব-সম্বন্ধীয়), বৈষ্ণব (বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়)।

সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থনাম প্রায় সর্বত্রই বিষয় অথবা নায়ক অথবা নায়িকা অথবা নায়ক-নায়িকা অনুসারে। সাহিত্য-গ্রন্থে ব্যতিক্রম পাই দৈবাৎ। যেমন পঞ্চতন্ত্র (পূর্ণ নাম পঞ্চ-তন্ত্রাখ্যান), অর্থাৎ পাঁচটি তাঁতবোনা (foxed) গল্পের সংকলন। পর-বর্তীকালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃত সাহিত্যে সংখ্যা শব্দ আগে অথবা পরে দিয়ে গ্রন্থনাম আরও কিছু আছে—দশকুমারচরিত, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, বাষট্টিশলাকাপুরুষ-চরিত্র, গাথাসপ্তশতী, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শৃঙ্গারশতক ইত্যাদি।

গ্রন্থনামে বৈচিত্র্য ও লালিত্য আমদানি করেছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা। অশ্বঘোষের বয়-কনিষ্ঠ সমসাময়িক কুমার-লাতের 'কল্পনামন্ডিতিকা' (অর্থাৎ কবি-কল্পনা-মন্ডিত পুস্তিকা) মহাযানতন্ত্রের বই, অজ্ঞাতনামা লেখকের (বা লেখকদের) 'ললিতবিস্তর' বুদ্ধজীবনী, 'দিব্যাবদান' (অর্থাৎ অমর্ত্য-কীর্তি-গাথা) বোধিসত্ত্বের জাতক কাহিনী ইত্যাদি। তার পরে গ্রন্থ-নামে নূতনত্ব দেখিয়েছিলেন কোন কোন অ-সাহিত্য গ্রন্থকর্তা। যেমন জ্যোতিষজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যক' (অর্থাৎ চিনির খাজা), গ্রহসঙ্গতিগণনার নিয়মাবলী (রচনা-কাল সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ), শ্রীহর্ষের 'খন্ডনখণ্ডখাদ্য' (অর্থাৎ অন্যমত খন্ডন-রূপ চিনির খাজা), বেদান্তমত স্থাপনের নিবন্ধ, উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি' (আনুমানিক দশম শতাব্দীতে লেখা) ন্যায়শাস্ত্রের একটি প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রথম খ্রীষ্টীয় সহস্রাব্দীর শেষ থেকে সংগ্রহ-গ্রন্থের সংখ্যা বাড়ছে দেখা যায়। নানা বিষয়ের সংকলন—গল্প, গাঁথা, শব্দ-পদ, জ্ঞাতব্য বিদ্যা ও তথ্য, ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিধি ইত্যাদি। কতকগুলি সংকলনের নাম শেষে আছে 'কল্পদ্রুম', 'কল্পলতা' অথবা কল্পতরু (মিথিলায়)। যেমন, ধাতুপাঠের বই 'কবিকল্পদ্রুম' বৌদ্ধ অবদানগ্রন্থ 'বোধি-সত্ত্বাবদানকল্পলতা', স্মৃতির বই 'কৃত্য-কল্পতরু'। কল্পবৃক্ষের সমার্থক পারি-জাত পাই একটি স্মৃতি ও ব্যবহার সংকলনে— 'মদনপারিজাত' (প্রথম অংশে রাজা মদনপালের নাম)। গুজরাট-মহা-রাষ্ট্র অঞ্চলে 'চিন্তামণি' ফেশান ছিল। যেমন, বিশ্বকোষ গ্রন্থ 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' (অর্থাৎ যা খুঁজবে তাই পাবে) নামান্তর 'মানসোল্লাস' হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি', জৈন আখ্যানের বই 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'। স্বর্গের কল্পবৃক্ষে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়, মর্ত্যে আছে সমুদ্র যা সব কিছু রত্নের (এবং বিষেরও?) আধার। তাই কল্পবৃক্ষের বদলে সাগর (ও তৎপর্যায়) শব্দ গ্রন্থনামে অল্পস্বল্প চলিত হল। এমন খুব প্রসিদ্ধ গ্রন্থনাম—'কথাসরিৎসাগর' (অর্থাৎ সব গল্পনদী যেখানে মিশিয়াছে সেই বই)। সম্পূর্ণতা-জ্ঞাপক 'সর্বস্ব' প্রথম পাই বাংলাদেশে সংকলিত দুটি গ্রন্থে, সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' আর হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংকলিত সাহিত্য ও অ-সাহিত্য গ্রন্থের নামের শেষে 'রত্নকোশ' (অর্থাৎ রত্নভাণ্ডার) পাই। যেমন, বিদ্যা-করের 'সুভাষিত-রত্নকোশ' (কবিতা সংকলন), সাগরনন্দীর 'নাটক লক্ষণরত্নকোশ'। 'কর্ণা-

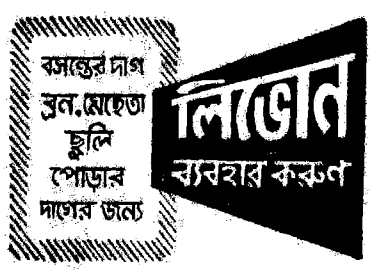

মৃত'ও প্রথম পাই বাংলাদেশের কবিতা সংকলনে—শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত'। টীকা ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নামের শেষে 'চান্দ্রিকা' অথবা 'কৌমুদী' (অর্থাৎ জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ আলোক, বিতণ্ডার রৌদ্র নয়) প্রায়ই দেখা যায়। যেমন, রায়মুকুটের 'পদচান্দ্রিকা', ভট্টোজী দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য ও নাটক গ্রন্থে প্রায়ই বিভিন্ন সর্গের ও অঙ্কের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হত। এ নাম বিষয়-অনুযায়ী। এই গ্রন্থাংশের নাম দেওয়ার রীতির সবচেয়ে পুরাণো এবং ভালো নিদর্শন পাই পতঞ্জলির গ্রন্থে। তিনি তাঁর মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকের নাম দিয়েছিলেন 'পশ্পশা' (অর্থাৎ যা দৃষ্টিকে সাহায্য করে, এখনকার দিনের চশমা, দূরবীক্ষণ ও অনু-বীক্ষণের মতো)। চমৎকার নামটি। মহা-ভাষ্যের আর কোন আহ্নিকের নাম নেই। সুতরাং মনে হয় প্রথম আহ্নিক অংশ যেন স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে কল্পিত হয়েছিল।

বৈষ্ণব গ্রন্থের কথা বাদ দিলে পুরাণো বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থনামের বালাই নেই বলা যায়। 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' সংযুক্ত—এই হল রচনানির্দেশ। ঠিক নামও বলতে পারি না কেননা দেবতার কোন একটি নির্দিষ্ট নাম গৃহীত হয় না, কবির ইচ্ছা মতো ও ছন্দের প্রয়োজন মতো—'চণ্ডীমঙ্গল', 'অভয়া-মঙ্গল', 'অম্বিকামঙ্গল' ইত্যাদি একই কবির একই গ্রন্থের নাম। বৈষ্ণব লেখকেরা সত্য-কার গ্রন্থনামের প্রচলন করেছিলেন। যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী', 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'গীত-কল্পতরু' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে ছাপা বইয়ের চলন শুরু হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দ থেকে। প্রথমে অনেক-দিন ধরে সংস্কৃত রীতি অনুসারে গ্রন্থনাম-করণ হত। যেমন 'প্রতাপাদিত্যচরিত্র' 'লিপিমালা', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইত্যাদি। নতুন নামকরণের এক রীতির সূত্রপাত করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মেয়েলি ভাষা ও ছড়া থেকে নেওয়া। 'একই কি বলে সভ্যতা?'—পুরাপুরি বাক্য। এমন নামের অনুকরণের ছড়াছড়ি হয়েছিল সেকালের প্রহসনে, বেশি করে বটতলার বইয়ে। তারপর নতুনত্ব আনলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামকরণে। এখানে নামটি বিষয় নয়, বিষয়ের সঙ্গে ক্ষীণভাবে সংযুক্ত একটি ঘটনার উপকরণ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থনামে একটু অভিনবত্ব দেখালেন দ্বন্দ্ব সমাসের বদলে সংযোজক 'ও' ব্যবহার করে—'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। এই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

প্রবোধকুমার সান্যাল

হাওয়াবদল

পায়ের সঙ্গে মন হাঁটে,—ভ্রমণ সেখানে সার্থক। হাঁটতে হাঁটতে দেখা, থমকিয়ে দাঁড়ানো, আবার হাঁটা,—সেটির নাম পরিব্রজ্যা। পথের দুই পারে দেখতে-দেখতে যাওয়া,—তার থেকে 'দর্শনের' উৎপত্তি। এই পরিব্রজ্যা পৃথিবীর সব দেশে এবং সর্বকালে সমাদৃত। হাঁটতে-হাঁটতে কি দেখলুম, সেইটি বড় নয়। কিন্তু মন আমার কি-কি বিষয়ে কাজ করে গেল, সেইটি আসল কথা।

হাঁটাপথ চিরকালই রয়ে গেছে সব দেশে। কিন্তু সময় ও শ্রম বাঁচাবার জন্য স্থলপথে এল গরুর গাড়ি, জলপথে নৌকা। অতঃপর আধুনিক কালে একে একে এল ঘোড়া, সাইকেল, মোটর, ট্রেন এবং বিমান। মানব সভ্যতার দ্রুতগতির সঙ্গে যানবাহনের গতিও হল দ্রুততর। এখন কেউ ঘোড়ায় চড়ে দিল্লী যায় না, নৌকাযোগে কাশী-কাঞ্চি রওনা হয় না। এখন কলকাতা থেকে কাশ্মীর বিমানযোগে সাড়ে তিন ঘন্টা, তিব্বতের রাজধানী লাসায় পেঁছতে লাগে ঘন্টা দেড়েক। গতি যত দ্রুত, দেখা তত্ই কম। বিমানের সঙ্গে ভ্রমণের কোনও যোগ নেই।

রেলগাড়ির ভিতরে বসেই কথাগুলি তোলাপাড়া করছিলাম।

দূর দেশ বললে এখন আর দূরত্ব বোঝায় না। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীই এখন ছোট। হাতে একটা সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, —মাসখানেকের মধ্যে সাতটি মহাদেশ ঘুরে এসো বিমানে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কী দেখলে সমস্ত পৃথিবীতে? তোমাকে বলতে হবে, দেখেছি কয়েকখানা ছবি মাত্র, বাকি সময়টা উষ্ণীন পাখির পেটের মধ্যে বাস করেছি! নিচের দিকে হিজিবিজি ছাড়া আর কিছু ছিল না! ওতে না আছে ভ্রমণ, না কাহিনী।

যাচ্ছিলুম ছুটতে ছুটতে, অর্থাৎ ট্রেনে। নামতে হল কানপুরে। সিনেমাচিত্রে রিপিট সীন নাকি প্রিয়। দেখলুম সেই আগেকার চামড়া আর চিনি ব্যবসায়ী কানপুর বিগত বিশ্বযুদ্ধের থেকে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। প্রশস্ত রাজপথ আর প্রাসাদ-গোষ্ঠীর চূড়া দেখলে অবাক লাগে। পথে-ঘাটে টাকার স্রোত. হাওয়ায় উড়ছে সস্তা নোটের গোছা! সামগ্রীসম্ভার আর ব্যবসা-বাণিজ্য থৈ থৈ করছে কানপুরে। নগরের সীমানায় যুগলীলাল কমলাপৎ যে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেছেন, তার শ্বেতপাথর-গুলির এক-একটি টুকরোর দাম একত্র করলে কত লক্ষ টাকা হয়,—মন্দির পরিক্রমা করতে গিয়ে সেই হিসাবই মনে আসে। এর জন্য কত শত একর জমি-জায়গা দখল করতে হয়েছে, তাও মনে বিস্ময় আনে। ইদানীং ধনপতিদের সগৌরব অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে তাদের মন্দিরনির্মাণে, অর্থাৎ আত্মগরিমায়। ঠিক এমনি মন্দির দেখছিলুম সেদিন আগ্রার এক জনবহুল পল্লীতে। ছিপিতলার গলিপথ ছাড়িয়ে ধুলো ধোঁয়া নোংরা বস্তির ভিতর দিয়ে পুরনো পল্লীর ঘিঞ্জির পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়ালে সেও এক কোন্ স্বামীজির নামের মন্দির। শ্বেতপাথরের নক্সা ও ছিলাকাটা চলছে নাকি আজ বিশ বছর ধরে। ভাস্কর্যের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য এ মন্দির-টিতে সুপ্রকট। কিন্তু এত লক্ষ টাকা এত দিন ধরে খরচ হচ্ছে কোন্ কারণে তার জবাব নেই। ওর মধ্যে যেটুকু জনকল্যাণের আদর্শ, সেটুকু হল— কতকগুলি মিস্ত্রী, মজুর ও ভাস্কর শিল্পী কায়েমী উপার্জনের পথ পেয়েছে। মন্দিরের কাজ শেষ হলে এটি নাকি তাজমহলকেও টেক্কা দেবে। বুঝতে পারা যাচ্ছে টাকার গরমে অন্ধতা আসে। গেলুম একবারটি ফতেপুর সিক্রিতে। একবার যেন আর ভাল লাগল না। এখন ওর নিচের দিকে বাজার বসেছে। বস্তি দেখা যাচ্ছে এখানে-ওখানে। মহলের পর মহল দেখলুম, কিন্তু সেই মামুলী। বরং সেলিম চিস্তির কবর-মন্দিরটি ভাল লাগল। ওখান থেকে ফিরে এসে ঘুরছিলুম আগ্রার এখানে-ওখানে। পুরনো আগ্রা তেমনি ইতর তেমনি নোংরা। কিন্তু নগর স্ফীতিলাভ করেছে নানা দিকে। আগ্রা সিটি বা আগ্রা ফোর্ট— অসহ্য। কতকটা সুশ্রী ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চল। সর্বাপেক্ষা নিরিবিলি রাজা-কি-মণ্ডি। এই নিরিবিলি অঞ্চলে টুরিস্ট লজের আশে-পাশে কয়েকটি মাঝারি হোটেল আজকাল দেখা যাচ্ছে, যেখানে দৈনিক খরচের তবু একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই দশটার মধ্যে সাম্প্রতিক কালের গোবর্ধন হোটেল সবচেয়ে বড় এবং খ্যাত।

আজকাল মাঝারি হোটেলের ধরণ পালটিয়ে গেছে। পশ্চিমে এই ধরণের হোটেলগুলি পশ্চিমবঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে পুজোর আগে থেকে। কলকাতার আপিসপাড়ায় যখন পুজোর বোনাস পাবার আন্দোলন দেখা দেয়, পশ্চিমের হোটেল-গুলো খুশী মনে তখন ঘরদোর সাজায়। রেলওয়ে খুশী। মোটর বাস কোম্পানী খুশী। নানা শহরে চায়ের দোকানে, খাবারের দোকানে রেডিয়ো বসে যায়, পান-সিগারেটের দোকানে ঘষা আয়নাগুলো ঝাড়ামোছা চলতে থাকে। কলকাতায় লাল-ঝাণ্ডার আন্দোলন, আপিসবাবুদের মিছিল, পেন-ডাউন বা স্টে-ইন স্ট্রাইক, — এতে পশ্চিমা শহরে আনন্দের জোয়ার আসে! রেল, মোটরবাস, ট্যাক্সি, সাইকেল রিকসা, টাঙ্গা, এক্কা, স্কুটার, ভটভটি, এমন কি কাশীর ঘাটের মাল্লারা সবাই আহ্লাদে আট-খানা, কেননা বাংগলি বা 'ডান-চি-বাবুলোক' পুজোয় বোনাস পাচ্ছে! শুধু দিল্লীতে একটু বেগতিক। ওখানকার কালিবাড়ি ভরে যায় একটুতেই। এখানে-ওখানে জায়গা নেই তা নয়, কিন্তু ব্যয়বহুল। চেনা মহলে যদি কেউ আতিথ্য পায় ভাল, নৈলে ছেসে বেড়ানো। পর্যটক বাঙালীর পক্ষে দিল্লী খুবই অসুবিধাজনক। দিল্লীতে একবার গিয়ে পৌঁছলে বোনাসের টাকা ওখানেই রেখে আসতে হয়।

বরং দেখলুম গোয়ালিয়র ওরই মধ্যে একটু নিরিবিলি। এদিকটা সম্প্রতি কুখ্যাতি লাভ করেছে চম্বলের ডাকাতদের জন্য। গোয়ালিয়রে যে কোনও আড্ডায় গিয়ে বসো, তারা বলবে এই শহরে সর্বত্রই ডাকাতদের এজেন্টরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যাই হোক, পুরনো সেই গোয়ালিয়র এখন আর নেই। হাঁটতে হাঁটতে এখানে পায়ের সুতো এককালে ছিঁড়ে যেতো। তখনকার দিনে সব দেখেশুনে বেড়াতে অন্তত এক সপ্তাহ লেগে যেতো। এখন একদিনই যথেষ্ট। সকাল থেকে মধ্যাহ্নভোজের আগে পর্যন্ত মানমন্দির দুর্গ, সূর্যকুণ্ড, সাসবাহু বিষ্ণুমন্দির, নিচের দিকে ঝাঁসীর রাণীর নতুন প্রস্তরমূর্তি, তানসেন ও ঘাউস মহম্মদের সমাধি, মোতিমহল, জয়বিলাস প্রাসাদ,—মোটর ভাড়া করলে সব একদিনে! খুঁটিয়ে দেখলে দুদিন। তলিয়ে দেখলে দিন তিনেক। তবু বলব গোয়ালিয়রের জল-হাওয়া তেমনি মনোরম—যেমন আগে ছিল। সর্বাপেক্ষা স্বস্তিদায়ক, ওখানে আজও সাইকেল রিসকা ঢোকে নি।

আগেই বলেছি ট্রেনে চড়ে ছুটছিলুম। ভারতের কোনও অঞ্চল এখন আর পর্যটকের কাছে 'অনাবিষ্কৃত' নেই। আগে যে সকল পথে ডাকাত এবং হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল, এখন মোটরবাসের তাড়নায় তারা ছিটকিয়ে সরে গেছে অন্যত্র। যেমন হাজারিবাগ রোড থেকে রাঁচি। এককালে এই সুন্দর

পথটিতে দিনের বেলাতেও বাঘভায়ার দেখা মিলত, এখন ডি-ভি-সি'র কল্যাণে সেখানে যেমন বনজঙ্গল কাটা পড়েছে, তেমনি মানুষের সরগরমও বেড়ে গেছে। এখন মধ্যরাত্রেও সে-পথে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ। তবে যদি কেউ বাঘের পেটে যেতেই চায়, তাহলে তার পক্ষে রামগড় থেকে মাইল কুড়ি এগিয়ে রাজরোপ্পায় ছিন্নমস্তা মন্দিরের চত্বরে রাত্রের দিকে বসে থাকলেই চলবে। ও অঞ্চলটা হল দামোদরের উৎপত্তিস্থল। যাকে বলে, ক্যাচমেন্ট এরিয়া।

ছুটতে ছুটতেই এসে পৌঁছলুম পিপারিয়ার ছোট স্টেশনে। সেখানে থেকে মোটরবাসে ৩৪ মাইল পাঁচমারি। গাড়ি উঠে এল গিরিখাদের ধার দিয়ে-দিয়ে পাহাড়ের ওপর। আন্দাজ সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে একটি ছোট্ট পার্বত্য শহর। এটি সৈন্যাবাস। কিন্তু শীতের দিনে একখানা প্রাসাদোপম হোটেল বাড়ি বা সরকারি বাংলো—এ বাজারেও—২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা মাসিক ভাড়া। তিনখানা ভালো ঘর, রান্না-ভাঁড়ার, কলতলা উঠোন, স্নানাগার,—সব মিলিয়ে ১৬ টাকায় রামরাজত্ব! কিন্তু এটা শীতের দিনে! গরমকালে ওই ১৬ টাকা ১৬০ টাকায় পরিণত হয়। এ শহরটি উদার, উন্মুক্ত ও জনবিরল। মাঠের ওপারে পাণ্ডব গুহা। একদিকে পাহাড় উঠেছে, তার নাম ধূপগড়। ধূপগড়ের শিখরে আছে একটি ডাকবাংলো,—সেখানে দাঁড়ালে মধ্যভারতের দিগন্ত বিস্তার চোখে পড়ে। এখানে জল-হাওয়া যে পরিমাণ ভালো, ঠিক সেই পরিমাণেই ডিম, মাখন, পাউরুটি ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য। কারণ ওগুলো যায় সৈন্যাবাসে। অন্যান্য ভোজ্যসামগ্রী এবং হোটেল চার্জ শীতের দিনে অপেক্ষাকৃত কম এ বাজারে। পাঁচমারিতে তবু জনবিরলতার জন্যই বার বার যেতে ইচ্ছা করে। ওরা বলে সন্ধ্যার পর থেকে পাঁচমারিতে বাঘ ও বাইসনের উৎপাত বাড়ে এবং গিরিখাদ ও অরণ্যভূমির আশে-পাশে হাঁটতে গেলে গা ছমছম করে।

আবার প্রাণের টানে ছুটে গেলুম খান্ডোয়া থেকে ইন্দোরে। স্টেশন থেকে ৮০ মাইল মোটরবাস। সানাবাদ আর বারোয়া হয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের ধার দিয়ে ময়দান পেরিয়ে। এ যেন আরেকবার সেই নতুন সেই সুপ্রাচীন মধ্যভারত, কিন্তু হেমন্তের সূর্যালোকে ঝলমল করছে সেই চিরদিনের নতুন! মধ্যভারতের ইতিহাস, কাহিনী, রাজোয়ারা, পুরাকীর্তি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আজও বাঙালীর কাছে যথেষ্ট পরিচিত হয়নি। যাই হোক, আবার অনেকদিন পর সেই মালোয়া উপত্যকা। এই উপত্যকাকে কেউ বলে, নর্মদা উপত্যকা। এই উপত্যকাটি মধ্যভারতে যেন মণিপ্রভার মতো ঝলমল করছে। সমুদ্রসমতা থেকে এই উপত্যকাটি কমবেশি দু' হাজার ফুট উঁচু। গ্রীষ্ম ও শীত এখানে মাত্রা রেখে চলে। এই ইন্দোরেই একদা রাজা শিবাজী সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফাঁদ কেটে পালিয়ে আশ্রয় নেন্। তখন ইন্দোর শুধু গ্রাম। অতঃপর রাণী অহল্যাবাইয়ের অভ্যুত্থান ঘটে, এবং তিনিই সৃষ্টি করেন আধুনিক ইন্দোর। শুধু ইন্দোর নয়, নর্মদার তীরে 'মাহেশ্বর' জনপদও তাঁর সৃষ্টি! এই জনপদের অপর নাম 'মাহিষমতী'। খান্ডোয়া থেকে ইন্দোরের পথে বেঁকে যাওয়া যায় 'ওঙ্কার' মান্ধতায়। ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি বিরাজমান। রাণী অহল্যা সমগ্র মহেশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এইজন্যই ইতিহাসে পাঁচটি কন্যা অদ্যাবধি নিত্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁদের নাম রাণী অহল্যা, রাণী ভবানী, রাণী লক্ষ্মীবাই, রাণী দুর্গাবতী ও সুলতানা রেজিয়া। এঁদের নাম এখনও ছড়িয়ে রয়েছে পূর্ব ও মধ্যভারতে।

ঘুরে ঘুরে সেই দেখছিলুম শেঠ হুকুমচাঁদের মন্দির রাংগামহল ও শিসমহল,—ওর ভিতরের কারুকলার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ। একে একে আবার দেখে যাচ্ছি মালোয়া হাউস, সুখনিবাস, অহল্যাবাইর মন্দির, শিববিলাস আর হাওয়ামহল। এই মালোয়া উপত্যকায় চম্বলের ব-দ্বীপে একে একে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কালিদাস, অশ্বঘোষ, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট। এটি বিক্রমাদিত্যের দেশ। সবশেষে ছুটলুম সেই বিশাল সরোবরের দিকে—সেই পিপলিয়া পালা ও শিরপুর অঞ্চলে। উপত্যকার উপরে এত বড় হ্রদ একটু বিচিত্র। এ যেন এক আরণ্যসমাকীর্ণ এক টুকরো সমুদ্র, যেন মালোয়ার মহাকাব্য। আজমেরের অন্নসায়র উদয়পুরের সেই দীঘি, কলকাতার লেক্, ময়মনসিংহের থেকে একটু দূরে মরুলোকের সেই আনন্দসায়র—এ যেন তাদের চেয়েও সুন্দর! রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সেই শিবমন্দিরের কোলে অর্থাৎ—ঝাঁসীর কথা বলছি—সেই সরোবর কি এর চেয়েও মনোরম? তাহলেও বলব পুরনো ঝাঁসির নোংরা পল্লীর মধ্যে একটি পুণ্যসরোবর যেন আত্মগোপন করে রয়েছে।

না, চলো এবার উজ্জয়িনী, ইন্দোর থেকে ৫৩ মাইল ৩৫। দেখে আসি শীতের দিনে স্তিমিত ক্ষীপ্রা, যার অপভ্রংশ শিপ্রা।—'উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে কাননঘেরা বাড়ি।' সেই বিজনতা কই? এ একেবারে জনবহুল আধুনিক নগর। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে জনাকীর্ণ চতুর্দিক। সেই পুরনো 'গ্র্যান্ড হোটেলেই' উঠলুম। চেয়ে চেয়ে দেখছি চারদিকে নতুন কালের হুজুগ। আগে ছিল উজ্জয়িনীর প্রধান আকর্ষণ দুটি—মহাকালের মন্দির আর রাজা জয়সিংহের মানমন্দির। তারা এখন গিয়েছে চোখের আড়ালে, ওদেরকে এখন খুঁজে বার করতে হয়। মহাকালের সেই মন্দির এখন হয়ে উঠেছে আধুনিক। ছুটে একেবারে চলে গেলুম দেওয়াস রোডে আমার পুরনো কবিবন্ধু শিউমঙ্গল সিং সুমনের কাছে। সে তখন মাধব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। বর্তমানে সে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। কিন্তু সে তেমনি কাব্যোন্মাদ, তেমনি, সরল প্রাণবন্ত। 'সুমন'—এই নামে সে লেখে। তার সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল নেপালে, কাঠমাণ্ডুতে—সে তখন ভারতীয় দূতাবাসের কাল্চারল্ সেক্রেটারি। সুমন ছিল নেহরুর খুব প্রিয়পাত্র। সুমনের উদ্যোগে এখানে 'কালিদাস' নামক পত্রিকা ও 'কালিদাস সমারোহ' নামক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

মহাকালের মন্দির থেকে ফিরে সিদ্ধেশ্বরী কালিয়দহ প্রাসাদ, গড়কালিকা গোপাল দ্বারকাধীশ, ভর্তৃহরি গুম্ফা সোখনবাবা এবং অবশেষে শিপ্রার তটে সেই মসজিদে—যেখানে প্রসিদ্ধ পীর মওলানা গিয়াসুদ্দিন তপস্যায় ব'সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। উজ্জয়িনী হ'ল মধ্যভারতের কাশী। সম্রাট অশোক এখানে বৌদ্ধধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এখান থেকে বেরোলে আবার সেই সুন্দর পার্বত্য অঞ্চলের নিচে মস্ত সেই সরোবর। দূরের থেকে যার পাশ দিয়ে দেখা যায় নবমহল। 'উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে কাননঘেরা বাড়ি'-র ক্ষুধাটা অতৃপ্তই থেকে গেল।

বেশ লাগছিল আবার ইন্দোর থেকে 'ধার'—ময়দানের পর ময়দান। দূরে দূরে পাহাড়। এ অঞ্চলে সমান্তরালে গিয়েছে দুই পাহাড়ের শ্রেণী। একটি সাতপুরা, অন্যটি বিন্ধ্যাগিরি। বিন্ধ্যাগিরির মধ্যেই কাছাকাছি নদীর তটে 'বাঘ' নামক কয়েকটি বৌদ্ধগুহালোকে অজন্তার মতো স্থাপত্য ও দেওয়ালচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ছিল ৫ম শতাব্দির বৌদ্ধবিহার। মোহাদ স্টেশন দিয়ে 'বাঘ' যাওয়া সোজা পথ। ইন্দোর থেকে ধার জনপদ ৭০ মাইল মোটরবাস। বাসস্টেশন থেকে মাইল খানেকের মধ্যে ছোট একটি টিলাপাহাড়ের শীর্ষে প্রাচীন কালিকাদেবীর মন্দির, কিন্তু ওই টিলার চারিদিক বেষ্টন করে রয়েছে রক্তকমলের সমারোহ নিয়ে মস্ত সরোবর—সে যেন এক অপরূপ মায়াকাননের সৃষ্টি করেছে।

মান্ডু এই কাছেই, আর মাত্র ২২ মাইল। কিন্তু মান্ডুতে ঢুকতে গেলে পাহাড়ের ফাটলে তোরণ পেরোতে হয়। এটি পাহাড়ঘেরা দুর্গনগরী—প্রবেশপথের সংখ্যা হ'ল চারটি। সমগ্র নগরটি বনময়, এবং ছোট দু' চারটি দোকান-পসারির এলাকা ছাড়িয়ে গেলে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। একটু আধটু আশ্রয় বা যাত্রীশালা এখনে যে পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু সে না থাকারই সামিল। আসলে মান্ডু-দুর্গেই প্রবেশ করতে হ'ল তার প্রাকারের ভিতর দিয়ে। সেই দুর্গের দোতলায় একটি ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় হ'ল, ঠিক সময়টিতে অর্ডার দিতে পারলে নিচের তলাকার খানসামারা উপাদেয় ভোজনের ব্যবস্থা করে। ব্যস, আর কিছু চাইনে। রাত্রির অন্ধকারে সেই জনশূন্য দুর্গের দোতলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে একটি কক্ষে প'ড়ে থাকা! বাইরে সুদীর্ঘলম্বিত খোলা ছাদ। সামনে বিশাল এক সরোবর, দূরে দূরে পাহাড়,—ঘন অরণ্য-সমাকীর্ণ মান্ডু,—বাঘ-ভালুক-সাপ-হরিণ ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু আমি এসেছি ঐতিহাসিক সেই পাঠান আমলের রাজাবাহাদুর ও রূপবতী কাহিনী শুনতে সুতরাং বিশ্রাম নেবো মান্ডুতে।

চারিদিকে প্রাচীনের ভগ্নাবশেষ কিন্তু সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত। গল্প শুনতে শুনতে

ফিরে যাচ্ছিলুম ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দিতে —যখন ছিল পাঠান আর খিলিজিরা। তারা নির্মাণ করেছে এক প্রশস্ত জুমা মসজিদ এবং রেখে গেছে তারা অগণিত সংখ্যক সমাধি-মন্দির, যেমন দিল্লীর ময়দানগুলোয় —তাদের সকল কীর্তির অবসান। হোসেন শাহ, দিল-ওয়ার খাঁ, মামুদ শাহ, দরিয়া খাঁ, মহম্মদ খিলিজি—আরও অনেক-অনেক। মহাকবি বলেছেন, 'রক্তমাখা অস্ত্র হাতে রক্ত অশ্বে শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি' দুর্গের বাইরে চারিদিকের জনশূন্য গ্রামাঞ্চল। ওদেরই মধ্যে রয়েছে এক একটি রক্তশতদল-ঘেরা সরোবর, যাদের নাম রেবাকুন্ড আর তাদেরই আশেপাশে রয়েছে সেই আবহমানকালের বংশপরম্পরাগত দু'চার জন চাষী। ওরা শুধু চিরদিন বীজ বুনে যায়, পাকাধান কেটে চলে।

অরণ্যসমাকীর্ণ প্রচ্ছন্ন ছায়ার নিচে নীল-কণ্ঠের মন্দির, পাশে একটি কুন্ড। পূজারীরা রয়েছেন আশেপাশে। এ মন্দির ৪৫০ বছর আগেকার। সম্রাট আকবর এসেছিলেন এ মন্দিরে বালাজি বাজীরাওকে সঙ্গে নিয়ে। মন্দিরের প্রবেশপথে তাঁদের সেই আগমনবার্তা আরবি হরফে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। কুন্ডের ভিতরে নীলকণ্ঠের লিঙ্গটি রয়েছে। মন্দিরের পরিবেশটি মনে করিয়ে দিচ্ছিল পাঁচমারির জটাশংকরের মন্দির। সেও অরণ্য সমাকীর্ণ এক পার্বত্য গুহাপথ—বহু নিচে সেই শিবলিঙ্গ স্থাপনা। গা ছমছম করে সেই অন্ধকারে।

উত্তর থেকে দক্ষিণভারতের মধ্যে এই পার্বত্য প্রাচীন দুর্গনগরী এককালে প্রহ-রীর কাজ করেছে, এ ছিল মস্ত ঘাঁটি পাঠান, মোগল, খিলিজি, তোগলক, সৈয়দ,— কে আসা যাওয়া করেনি এই পথ দিয়ে?

১৬শ শতাব্দির মাঝামাঝি মালোয়ার গভর্ণর সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মালিক বেয়াজিদ রাজা হন এবং তাঁর নাম-করণ করা হয় সুলতান বাজ বাহাদুর। শাসন-কর্তা হিসাবে এই তরুণ মিষ্টপ্রকৃতির যুবক বোধ হয় অপদার্থ ছিল। কেননা এ ছোকরা ভালবাসতো রেবাকুন্ডের প্রস্ফুটিত রক্ত-কমলের শোভা, মালোয়া সংগীতের মধুর মূর্ছনা, কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও নৃত্য-গীত। এর ওপর ছিল সে আবার রোমান্টিক। এর ফলে যা হয়। ওই গ্রামেরই এক সুন্দরী গৃহস্থ কন্যা গাগরী নিয়ে আসত রেবাকুন্ডে জল ভরতে। গান গেয়ে যেতো আপন মনে, এবং লোকনৃত্যে মেয়েটা ছিল সুপটু। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল মেয়েটির নাম রূপমতী। টনক ন'ড়ে গেল বাজ বাহাদুরের গানে ও কাব্যে উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময় হতে লাগল। অতঃপর এই ঐতিহাসিক প্রণয়-কাহিনীটি ক্রমে মধুরতর হয়ে হয়ে ওঠে, এবং বাজবাহাদুর রূপমতীকে বিবাহ করে। রূপমতীর নামে বিরাট এক মহল নির্মিত হয়। নাসিরুদ্দিনের পুরনো প্রাসাদের পাশে। নর্মদা উপত্যকার অপর নাম 'নিমা' সমতল,—এটি সমুদ্রসমতা থেকে ১২০০ ফুট উঁচু। শ্রীমতী রূপমতী তাঁর মহলের পূর্ব গবাক্ষে দেখতেন সুদূরবর্তী রূপালী সর্পের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে নর্মদা, সোনার সূর্য ঝলমল করছে মালোয়ার দিগন্ত জোড়া উর্বর উপ-ত্যকায়। অদ্যাবধি মালোয়ার লোকসংগীতে বাজবাহাদুর ও রূপমতীর নিঃস্বার্থ ও একাগ্র ভালোবাসার কাহিনীটি গীত হয়ে থাকে। অতঃপর এক সময়ে বাজ বাহাদুর সংগ্রামে লিপ্ত হন রাণী দুর্গাবতীর বিপক্ষে এবং এই 'অপদার্থ' যোদ্ধা সেই যুদ্ধে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হন। সুতরাং ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি নৃত্যগীত কাব্য-সাহিত্যে ও তার সঙ্গে সুন্দরী রূপ-মতীর সাহচর্য নিয়ে একান্তে থাকেন। এর পর আবার আসে মালোয়ার ইতিহাসে রাজ-নীতিক বিপর্যয়। আকবরের সেনাপতি মালোয়া আক্রমণ করেন, বাজবাহাদুর যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নিরুদ্দেশ হন এবং তাঁর সাধ্বী স্ত্রী রূপমতী শত্রুর হাতে পড়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করে তাঁদের চিরকালীন প্রণয় কাহিনীটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে যান।

বাকিটুকু শুধু দেখে বেড়ানো। যেটাকে ডাকবাংলো বলা হচ্ছে সেইটির নামই জাহাজ মহল, অদূরে বাঁ দিকে হিন্দোলা মহল। এগুলি সুলতানদের বাসস্থান ছিল। এর পর চম্পা বাওড়ি, মুঞ্জ হুদ, কাপুর হুদ,— এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থাপত্য।

দিন দুই পরে তল্পিতল্প গুটিয়ে নেমে চললুম, এই পর্বত প্রাকার বেষ্টিত মুণ্ড থেকে। না, আর দক্ষিণে আপাতত নয়। এবার পূর্বোত্তর পথ। ইন্দোর থেকে দেওয়াস হয়ে যাওয়া ভূপালে, কিন্তু মোটর-বাস একটু যেন ক্লান্তিকর। সুতরাং রেল-গাড়িই লাগছে ভাল। অতএব আবার ইন্দোর উজ্জয়িনীর পথ ধরেই এসে পৌঁছলুম ভূপালে। অবাক কান্ড! সেই পুরনো ভূপাল যেন হারিয়ে গেছে। পুরনো শহরের সেই কদর্য নোংরা সহসা চোখে পড়ছে না, নবাবী আমলের সেই ভয়াবহ দারিদ্র্য যেন অনেকটা গা-ঢাকা দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় অট্টালিকা, ব্যবসা-বিপণিতে ছেয়ে গেছে পথঘাট, বড় বড় মাড়োয়ারির গদি, হোটেলের পর হোটেল। সিনেমার বাজনা বাজছে, বোম্বাই গান চলছে রেডিয়োয়। যানবাহনে ছেয়ে গেছে ভূপাল শহর। না, এবার যেন আর ভাল লাগছে না, একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এক দৌড়ে দেখে এলুম সেই বিশাল সুন্দর হ্রদ, দক্ষিণে পাহাড়ের প্রাকার, নবাবের প্রাসাদ এবং বিভিন্ন অট্টালিকা। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। ফিরে এসে উঠলুম ঝাঁসীর গাড়িতে।

পথ কম নয়। বারো ঘন্টারও বেশি লাগল। ঝাঁসী এখন অনেক বড়। ঝাঁসীর ছাউনি অঞ্চল সুন্দর ও প্রশস্ত। ঝাঁসীতে যে দুর্ধর্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীটি আছে, সেটি ভারতপ্রসিদ্ধ। এটিকে বলা যেতে পারে রঙের গোলাম! এই রেজিমেন্টকে ঠিক সময় ব্যবহার করলে বাজিমাৎ। এ ছাড়া আর কি? সেই ত লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গটি। আর আছে লক্ষ্মীবাঈয়ের শ্বশুরবাড়িটার ভগ্নাবশেষ। এ ছাড়া যেটি আকর্ষণীয়,— সেই মনোরম সরোবর আর মন্দির—সরু গলির ভিতর দিয়ে পথ—তার কথা আগেই বলেছি। ওখানেই দেখা হয়ে গেল 'রাষ্ট্রকবি' মৈথিলীশরণ গুপ্তর সঙ্গে। অধুনা তিনি পরলোকগত। এ ছাড়া আরেকবার আলাপ করে এলুম প্রাক্তন হেড মাস্টার প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি বাঙালী-মহলের নিত্য অতিথিসেবক। ওখানেই শেষ, আর কিছু নেই ঝাঁসীতে। সুতরাং সিপ্রিবাজার থেকে যোগেনবাগ হয়ে ফিরে চললুম সোজা স্টেশনে।

আর নয়, এবার উত্তরে। হিজিবিজি রেলপথ। এ যেন একটু করে ছুঁয়ে যাওয়া, একটুখানি বিশ্রাম, তারপর আবার দৌড়। দ্রুতগতির মধ্যে অবকাশ নেই, মন দিয়ে দেখা হচ্ছে না, গ্রহণ করার সময় পাওয়া যাচ্ছে না,—এ যেন ছবি দেখতে-দেখতে চলে যাওয়া! পথে পথে নতুন দেশের হাওয়া, নতুন ধরণের খাওয়া। হাওয়াবদলের সঙ্গে খাওয়াও বদল। মন যেন অমৃতের আস্বাদ পেতে চায় এখানে-ওখানে। পাহাড়ের একটি রেখা, অরণ্যের একটি বাঁক, অজানা দীঘির কোলে একটি শতদল, গ্রামের কোল ঘেঁষে একটি সুদূরে রহস্যপথ।

জয়পুরে এসে নামলুম। জহুরী-বাজারের সেই পরিচিত 'কৈলাশ হোটেলে' অনেকদিন পরে এসে উঠলুম। কিন্তু খালি

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ

আমাদের বিশেষ পরিচিত নামগুলির মধ্যে

শাড়ী— রিমঝিম, নতুন বৌ, জেসমিন, প্রেমজ্যোতি, সুমপালা, গায়ত্রী, হেমলতা, দেশবাসিনী, বঙ্গবাসিনী, গ্রামিকা ও তাঁতিকা।

ধুতি— গোল্ড ডলার, ব্রেসলেট, শান্তিপুরী, সম্রাট ও ঢাকাই।

রেজিস্টার্ড অফিস ও মিলস্
সোদপুর, ২৪ পরগণা
ফোন : বি কে পি ১৩৬

সিটি অফিস :
১১নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিঃ—১
ফোন : ৩৪-৩৯৫৩

নেই কোনও ঘর। সুতরাং ওখান থেকে মাইলখানেক এগিয়ে টুরিস্ট হোটেলে ঢুকে জায়গা নিলুম। জয়পুরের জনতা যেন উপচিয়ে পড়ছে। বাজার ছেয়ে গেছে সর্বত্র। নতুন নতুন কলোনি বসেছে। সিন্ধি কলোনির ওদিকে মস্ত নতুন সম্ভ্রান্ত পল্লী বসে গেছে। সোজা গিয়ে দাঁড়ালুম রাণী লক্ষ্মীকুমারী চুন্দাবতের বাড়িতে। তিনি বিশিষ্ট রাজস্থানী লেখিকা এবং বিধানসভার কংগ্রেসী এম এল এ। দেখা হয়ে গেল অনেককাল পরে। তিনি রাণা প্রতাপের বংশের মেয়ে,—বিশিষ্ট সমাজসেবিকা এবং নেত্রীস্থানীয়া। তাঁর সাহিত্য রাজস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁকে বললুম, আমি এবার উড়ো মেঘ, ভাসতে ভাসতে চলেছি! কোথাও দাঁড়াচ্ছিনে। আরেকবার দেখে যাব শুধু আম্বের দুর্গ, গলতার সেই কুণ্ড। বড় জোর যাদুঘরের সেই মমি! কোর্ট কাছারি দেখতে আসিনি,—কি দেখতে এলুম তাও ঠিক জানিনে। এলুম বেড়িয়ে যেতে। হয়ত আরেকবার দেখে যেতে পারি যশোরেশ্বরী কালিকে। তারপর মেঘ আবার ভেসেই চলে যাবে! হয়ত খুঁজতে এসেছিলুম দেশকালের নতুন এক ব্যাখ্যা, নতুন এক সামগ্রিক ব্যঞ্জনা। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হোক, সমাজ জীবন সমৃদ্ধ হোক, রাজপ্রশাসন আরও কিছু সুশ্রী হোক। রাণী লক্ষ্মীকুমারী ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সহাস্যে স্বাগত অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্ভাষণ—দুটিই জানাতে বাধ্য হলেন। হাসিমুখে তাঁর ওখান থেকে বিদায় নিলুম।

ডাঃ গিরিজা সেনের দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর ছেলে গৌতম এসে দাঁড়াল। এও ডাক্তার। অমায়িক ভদ্র, সুদর্শন এক যুবা। মন খুশী হয়ে উঠল গৌতমকে দেখে। গল্পে-গল্পে কাটল দিন দুই।

এরপর নতুন রুক্ষ ধূলিধূসর পথ। জয়পুর থেকে পিলানি। কমবেশি দেড়শ মাইল। রেলগাড়ি দিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু নাইবা গেলুম। মোটরবাসু ছাড়ল বেলা এগারোটায়। এবার রাজস্থানের উত্তর-পূর্ব পথ। ছোট ছোট জনপদ পথের দুধারে, ছোট ছোট চাষের কাজ এমাঠে ওমাঠে। কিন্তু অন্তহীন বালিয়াড়ি আর কাঁকরের ভিড়। নদী নেই, জলাশয় দেখছিনে, হরিৎশোভা হারিয়ে গেছে,—আছে শুধু জলের জন্য মানুষের সংগ্রাম। বালু আর কাঁকরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দয়াহীনা প্রকৃতির রুক্ষতার বিপক্ষে সংগ্রাম। পূর্ব রাজস্থান হরিৎবর্ণ, উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থান মরুভূমি। যোধপুর, বিকানের, পোকারন, লাঠি, যশলমের, বারমের, ফালোদি, কিষেণগড়, রামগড়,—এসব এলাকা মরুভূমি। এরা চেয়ে থাকে আকাশের দিকে সারা বছর। বৃষ্টি কোথাও ৩ ইঞ্চি, কোথাও বা ৫ ইঞ্চি। সেই জল শুষে নেয় বালু। আনন্দের কথা, রাজস্থান ক্যানাল সিস্টেম একালে কিছু উন্নতির আশ্বাস এনেছে। অতঃপর একে একে পেরিয়ে চললুম রিংগাস, সিকার, নওয়লগড়, ঝুনঝুন ও চিরাওয়া। পিলানির বাসস্ট্যান্ডে এসে যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা। আশে পাশে ছোট্ট বস্তি-বাজার। এ যেন সেই মধ্যযুগীয় একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—ছিটকিয়ে এসে পড়েছে আধুনিক কালে।

পিলানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে যখন এখানকার সর্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত এস ডি পান্ডেকে খুঁজে বার করলুম, তখন সন্ধ্যা একপ্রকার উত্তীর্ণ। সুদর্শন ও খর্বকায় এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি খরপদে তাঁর বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এখানকার গেস্ট হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়ে আছে, এবং তাঁর নিযুক্ত দুজন কর্মচারী আমাদেরকে নিয়ে এঁদের অতিথিশালার একটি ঘরে তুললেন। বলে রাখা ভালো, গৃহিণী সঙ্গে ছিলেন এ যাত্রায়। ঘরটি আসবাবপত্র ও বৈভবে ঝলমল করছিল ইউরোপীয় হোটেলের মতো।

অতএব ঝোলাঝুলি নামিয়ে এখানে বসে গেলুম।

কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গাল ভূভাগে একদা 'শান্তিনিকেতন' গড়ে উঠেছিল, এবং তার পিছনে ছিল মহাকবির অসাধ্য সাধনের ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে সগৌরবে। পিলানিতে অসাধ্য সাধনের অপেক্ষা দেশকর্ম ও জাতির প্রয়োজনের প্রতি সচেতন দৃষ্টি অধিকতর প্রকট। পিলানি হল পরলোকগত রাজা বলদেওদাস বিড়লার পিতৃভূমি। স্পষ্টত, তাঁরা এখানকার পুরনো জমিদার। চারিদিকের বিস্তীর্ণ এবং অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে এই মরুময় গ্রামটিতে উল্লেখযোগ্য যে কয়খানি পুরনো কালের মাড়োয়ারি প্যাটার্নের ছবি আঁকা, ছিলাকাটা, জাফরি বসানো ও পাথর বাঁধানো 'কোঠি' দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশই বিড়লা গোষ্ঠির। ওদের নাম বিড়লা-হাভেলি। কিন্তু আমার চোখে প্রথম বিস্ময়ের কারণ হ'ল এই, রাজস্থানের বিশাল মরুভূমির থেকে কথায়-কথায় যেখানে দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকারকরা বালুর ঝড় ওঠে, সেখানে এমন বিস্তীর্ণ বনময় আরণ্যশোভা কেমন করে সৃষ্টি হ'ল! এটির নাম রাখা হয়েছে 'পিলানি বিদ্যাবিহার'। এর পিছনে যে গল্পটি আছে সেটি মনোজ্ঞ। স্বর্গত শিউনারায়ণ বিড়লা বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুটি বালক পৌত্রের লেখাপড়ার সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়েন। সেই সমস্যারই মীমাংসাকল্পে তিনি পিলানিতে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিনকার সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বনস্পতিতে পরিণত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। ওই দুটি কচি বালকের নাম ছিল ঘনশ্যাম দাস ও রামেশ্বর দাস। ইতিহাস অনেকটা যেন একই। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ছিলেন স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কমবেশি এক হাজার একর বালুভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যাবিহার। ১৯২৯ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে কেবল একটির পর একটি বিদ্যালয়ের গঠন ও নির্মাণ এবং অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা চলতে থাকে। ওই বছরেই এটি বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের আওতায় আসে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য এক ব্যক্তিকে এখানকার কলেজের অধ্যক্ষরূপে পাঠিয়ে দেন। ইনিই আমাদের বর্তমান অতিথিসেবক শ্রীযুক্ত পান্ডে। ইনি এখানকার কুলপতি, এবং সমগ্র বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারী। পিলানি বিদ্যাবিহার সেই ট্রাস্টের একটি অংশ মাত্র। কিন্তু মিঃ পান্ডের প্রতিভা, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির গুণে এই প্রতিষ্ঠান বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটির পর একটি স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, কারিগরী বিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, বিভিন্ন শিল্প, চারু ও ললিত-কলা কেন্দ্র, নৃত্য ও সঙ্গীত বিদ্যা, ওষধি গবেষণা, কৃষিবিদ্যা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, যন্ত্রবিদ্যা, গার্হস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞান, এমন কি বিমানচালনা বিদ্যাশিক্ষার জন্য গ্লাইডার বিমানের ঘাঁটি পর্যন্ত নির্মিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওখানে ছাত্রপল্লী ও

ছাত্রীপল্লী সম্পূর্ণ পৃথক। এ-ছাড়া লাইব্রেরী, ক্যানটিন, রন্ধনবিদ্যার জন্য বিভিন্ন উপকরণ, প্রত্যেকটির জন্য একেকটি অট্টালিকা। প্রত্যেক শিক্ষক ও অধ্যাপকের জন্য ছোট ছোট বাগানবাড়ি, এবং প্রত্যেকটি ছাত্রাবাস একেকটি বিলাসভবনের মতো। এখানকার কেন্দ্রীয় পাঠাগার, যাদুঘর, ভোজনালয় ও ললিতকলা কেন্দ্র দর্শনীয় স্থান বটে। বিজ্ঞান ও টেকনোলাজির যাবতীয় বিভাগ এখানে সর্বদা কর্মতৎপর। যন্ত্র ও বিদ্যুতের সমন্বয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান অবদান যে টেলিভিশন্ যন্ত্র,—ভারতের মধ্যে বোধকরি একমাত্র এই পিলানীর বিজ্ঞানশালায় সেগুলি নিখুঁতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে ঘুরে-ঘুরে দেখলে যেন এক নবীনতর ভারতের জন্ম-পরিচয় মনে আসে।

হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, তা'রা সুশ্রী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও হাস্যমুখ। হুজুগ, রাজনীতি, অসন্তোষ বা দলাদলি—এসবের চিহ্নও নেই। ক্যাম্পাসের চারিদিকে গোপালন ও চাষের ক্ষেত, শাকসব্জির খামার, বস্ত্র ও কুটিরশিল্পের কেন্দ্র, যানবাহনের সুযোগ সুবিধে, হাসপাতাল, ডেয়ারি ফার্ম, সিনেমা ও প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব, একটির পর একটি কমন্ রুম, বহু খেলার মাঠ, সাঁতারের জন্য জলাশয়, জিমনাস্টিক এনক্লোজার, ব্যায়ামাগার, ফুলবাগান তৈরির শিক্ষা,—এ যেন চারিদিকে ছয়লাপ হয়ে রয়েছে। একদা মহাত্মাজি পিলানির সম্বন্ধে 'হারিজন' পত্রিকায় লেখেন, "বিভিন্ন বিদ্যাবিষয় একত্র ক'রে এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেভাবে শিক্ষাদানে সাফল্য অর্জন করেছেন, ভারতের অন্য কোথাও এটি দুর্লভ।' শান্তিনিকেতনের' আচার্য স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় পিলানি দেখে বলেছিলেন, "এটি প্রকৃতই তীর্থস্থান। পুরাণের কাহিনীতে মহাসমুদ্রে ফুটে উঠেছে শতদল, কিন্তু এখানে এই পিলানিতে বালুরাশির ভিতর থেকে অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আরেক শতদল।"

ঋজু দীর্ঘ বৃক্ষবনচ্ছায়াময় একেকটি প্রশস্ত চিক্কণ পথ দূর-দূরান্তে চলে গেছে। নিস্তব্ধ নিঃঝুম চারিধার,—জন-কলরব কোথাও নেই। ময়ূরের দল নির্ভয়ে চলাফেরা করছে। গাছে-গাছে টিয়া, চন্দনা, কোকিল, মনুয়া, ডাহুক, দোয়েল—এদের বিচিত্র কল-কণ্ঠের কাকলী শোনা যাচ্ছে। এই বন-বীথির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'লে পাওয়া যায় শিবগঙ্গা। এটি একটি কৃত্রিম অর্ধচন্দ্রাকার জলাশয় প্রায় দুই ফার্লং দীর্ঘ—এই জলাশয়ের ওপারে একটি বৃহৎ শ্বেত-মর্মর নির্মিত শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জলাশয়ের উপরে সুন্দর একটি সাঁকো; ওপারে ছবির মতো মনোরম একটি সার্কিট হাউস। রাজস্থানীরা চিরকালই জল, জলের ফোয়ারা, জলাশয়, জলক্রীড়া—এদের প্রতি অনুরক্ত। রাজস্থানে জল নেই বলেই ওরা জলছত্রের সাহায্যে জল পান করানোকে পুণ্যকর্ম মনে করে।

পিলানির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর সুবৃহৎ সরস্বতী মন্দির। এ ধরণের সুদৃশ্য শিল্প-কলাসমন্বিত সুশ্রী মন্দির বোধহয় ভারতে অন্য কোথাও নেই। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র একক সরস্বতীর মূর্তি নিয়ে কোনও বৃহৎ মন্দির বোধহয় ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য আরেকটি আছে—সেটি হ'ল মূল শারদাপীঠ, বর্তমানে পাক-অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরে গণেশঘাটি পর্বতের নিম্নতলে অতি প্রাচীন এক মন্দিরে। তবে মূর্তি সেখানে অদৃশ্য অনেককাল থেকে। এই সরস্বতী-শারদার নাম থেকেই কাশ্মীরের কথাভাষার নাম হয় 'শার্দি বোলি।' প্রাচীন শারদাপীঠের পথ এককালে বড় দুস্তর ও দুঃসাধ্য ছিল। এর বিশদ বর্ণনা আছে 'উত্তর মিহালয় চরিত' গ্রন্থে। সে যাই হোক, আচার্য বিনোবা ভাবে পিলানি ভ্রমণে এসে এই সরস্বতী মন্দিরের নতুন নামকরণ করেন, 'শারদা পীঠ।'

সরস্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই শ্বেতশুভ্র সুন্দর ও সুদৃশ্য মন্দির সর্বাধুনিক কালের ভাবনা নিয়ে নির্মিত। নির্মাণকালের প্রারম্ভে এই কথাটি বলা হয়,

> "They wanted the place to be a real Home of Bliss, where the afflicted soul, irrespective of caste and creed, could find solace and solution of inner conflicts".

এই মন্দিরের জ্যামিতিক কোন্ (angle) এমনভাবেই ধরা হয়েছে যাতে ভিতরকার দেবী মূর্তির দুটি চক্ষু প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যা-বিহারের টাওয়ার ক্লকটির দিকে নিত্য জাগ্রত থাকে। যেমন তাজমহলের প্রবেশ তোরণের মধ্যবিন্দু থেকে মমতাজের সমাধি-আধারের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত সরল-সমান রেখাটি ধরা রয়েছে। বীণাহস্তে এই শ্বেতকায়া ভগবতী ভারতী একটি শতদল পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা। উচ্চতায় ৫ ফুট। এই মূর্তি নির্মাণ করেন জনৈক শ্রেষ্ঠ বাঙালী ভাস্কর। ভিতরে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতি ব্যক্তির অবাধ প্রবেশপথ সর্বদাই খোলা। পূজা-অর্চনার মধ্যে গোঁড়া হিন্দুর পরিচয় নেই। আছে আরতি ও মধুর-সঙ্গীত। বোধহয় এরই আকর্ষণে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি সকলেই শান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে নিঃশব্দে এখানে সমবেত হন।

মন্দিরের বাইরের চেহারাটা খাজুরাহোর সেই জগৎপ্রসিদ্ধ কন্দর্পনারায়ণের মন্দিরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে প্রায় ৪৫০টি দেব-দেবীর মূর্তিসহ অগণিত সংখ্যক পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্যাবলী। কিন্তু যেটি সম্পূর্ণ মৌলিক পরিকল্পনা, এবং আমার পক্ষে যেটি সম্পূর্ণ অভাবনীয় ছিল, সেটি হ'ল গৌতম বুদ্ধের কাল থেকে বিংশ শতাব্দির মধ্যকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ বিগত আড়াই হাজার বছরের মধ্যে একটির পর একটি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল ভাবনায়ক, রাজনীতিক, দেশ ও সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞানী, ধর্মপ্রচারক জাতিপ্রেমিক, মানবতাবাদী, মহৎ শিল্পী, সঙ্গীত-শাস্ত্রী, শ্রেষ্ঠ কলাবিদ প্রভৃতির এক-একটি মূর্তি উৎকীর্ণ। যেমন ধরা যাক্ গৌতম বুদ্ধ, খৃষ্ট, সক্রেটিস, আরিস্টটল, চাণক্য,—এদের থেকে আরম্ভ ক'রে সম্রাট অশোক, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, শেরশাহ, তানসেন, আকবর, অব্রাহাম লিঙ্কন, কার্ল মার্কস্, লেনিন, আচার্য জগদীশ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র, নেহরু,—এবং কে নেই? আমার তালিকা অসমাপ্ত রয়ে যাচ্ছে আমি জানি। কেননা আচার্য শঙ্কর, মহাবীর, রামানুজ, কবির, গুরুগোবিন্দ সিং, তৈলঙ্গ স্বামী, মৈনুদ্দিন চিস্তি—কেউই বাদ পড়েননি!

চারিদিকে বনময় শোভা, পুষ্পবীথিকা, ও বৃহৎ পুষ্পোদ্যানের মাঝখানে এই শ্বেতকায় রাজহংসের ন্যায় সু-উচ্চ মন্দিরটি যখন প্রদক্ষিণ করছিলুম, তখন শুক্লা-ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নায় এটিকে বড় রহস্যছায়াময় মনে হচ্ছিল।

বিড়লা হাভেলির অট্টালিকার কোনও এক কক্ষে ঘনশ্যাম দাসের জন্মস্থান,—এটি এক সঙ্কীর্ণ গলিপথে অবস্থিত। কিন্তু এই গলিপথ এখন ভারতের সকল পথের সঙ্গে মিলে পৃথিবীর কয়েকটি মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই অট্টালিকার ভিতর মহলে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। নিচের তলাটা দানছত্র। এখান থেকে লেপ, কম্বল, ধুতি, সাড়ি, যব, গম, ইত্যাদি অকৃপণভাবে বিতরণ করা হয়। এর জন্য একটি দপ্তর খোলা আছে। দোতলায় প্রায় প্রত্যেকটি কক্ষে বিড়লা বংশের রাজকীয় সাজসজ্জা, বৈভব এবং কীর্তি-কাহিনীর একটি একটি যাদুঘর সযত্ন-রক্ষিত।

এই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক রূপরাজ্য থেকে বিদায় নেবার আগে মহৎ কর্মবীর মিঃ এস ডি পাণ্ডে হাসিমুখে ছোট্ট একটি গল্প বললেন। কিছুকাল আগে এই বিদ্যা-বিহারের ভিতরে যখন মোটরট্রাকের সাহায্যে মালপত্র আনাগোনা করছিল, সেই সময় জনৈক ছাত্র ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে। ঘন্টা-তিনেক ধ'রে সম্ভাব্য সকলপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাঁচানো যায়নি। অতঃপর ছাত্রমহল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেক গবেষণাগার ও পাঠাগার ইত্যাদি ধ্বংস করার জন্য সর্বত্র আক্রমণ চালায়। যখন তা'রা চতুর্দিকে আগুন জ্বালাতে আরম্ভ করে, সেই সঙ্কটকালে পুলিশের সাহায্য নেওয়া হবে কিনা—এই নির্দেশ নেবার জন্য মিঃ জি ডি বিড়লাকে জানানো হয়। বিড়লা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, কদাচ নয়! ক্যাম্পাসের মধ্যে পুলিশের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ! ছেলেরা যদি স্থির করে বিদ্যা-বিহার ধ্বংস করা বা পুড়িয়ে ছারখার করা যুক্তিসঙ্গত, তবে তাদের বাধা দেবেন না! আপনারা নিষ্ক্রিয় ভাবে দর্শক হিসাবে শুধু দাঁড়িয়ে দেখুন! এ প্রতিষ্ঠান তাদেরই, তারাই এর মূল অভিভাবক!

খবরটি পাবামাত্রই ছাত্রমহল শান্ত হয়ে গিয়েছিল!

পিলানি থেকে চিরাওয়া রেলস্টেশন মাত্র দশ মাইল, কিন্তু এই পথটি বালুময়—সেজন্য পথটি নির্মাণ করেছেন পিলানির

কর্তৃপক্ষ। ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনপতি শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া চিরাওয়া গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন।

না, আগে দিল্লী নয়। উত্তর-পথ ধরা থাক্, চলো আবার দক্ষিণে! মন্দ কি, 'যে'সকেল দিয়েই না হয় কটক' যাব সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে নামলুম আজমের স্টেশনে! সোজা স্টেশনের দোতলায় উঠে যে রেস্ট-রুমটি দখল করলুম, সেটির ভাড়া এই কিছুকাল আগেও ছিল ২৪ ঘন্টার জন্য তিন টাকা। এখন ঠিক ডবল। রেল-ভাড়া ডবল, কুলি ডবল, ভোজ্যসামগ্রী ডবল, যান-বাহন ডবল, এমনকি ঘুষ পর্যন্ত ডবল, —কিন্তু উপার্জন ডবল হয়নি, খাওয়ার পরিমাণও ডবল বাড়েনি!

আরাবল্লির পাহাড়ঘেরা আজমের, সুতরাং নবেম্বরের শেষদিকে গায়ে একটু কাঁটা দেয়। বারান্দার সামনেই সেই টাওয়ার ক্লকটা আজও বেশ টাইম দিচ্ছে। নিচের দিকে বাজার বসেছে প্রচুর। হোটেলের পর হোটেল,—ডাকাতের পর ডাকাত! আগ্রা এককালে যেমন ডালমোট আর শামোসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, আজমের তেমনি কচুরির জন্য!

সকালের দিকে মোটরবাসে গেলুম পুষ্কর। এককালে প্রবাদ ছিল 'পুষ্কর দুষ্কর।' এখন সেকথা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মাত্র ৭ মাইল, সামান্য পাহাড়ি পথ, —চিক্কণ ও মসৃণ। প্রায় সমস্ত পথেরই দুদিকে নতুন নতুন জন-বসতি ব'সে গেছে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত জন্মসংখ্যা ছিল বেশ হিসাবের মধ্যে, এবং মৃত্যুসংখ্যা মোটামুটি ভালই ছিল! এখন জন্ম বেশি, মৃত্যু কম! ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল,—মানুষকে মরতে দেওয়া হচ্ছে না। ঠাকুমা-ঠাকুরদাদারা আধুনিকের রগড় দেখবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল বাঁচতে চাইছে। এদিকে কোমর বেঁধে জন্ম দিচ্ছে, কিন্তু ওদিকে 'বলহরি হরি বোল্' আর তেমন শোনা যাচ্ছে না! আগে তবু ভাত খেয়ে পেট ফুলে মরতো! এখন ভাত নেই—কুচপরোয়া নেই! গম গমই সই! আজমেরের এই পাহাড়ে এককালে জন-বিরলতার জন্য তীর্থযাত্রীরা ভয় পেতো। এখন গিজগিজ করছে চারদিকে জনসমা-গম। পিলপিলিয়ে মানুষ বেরোচ্ছে চার-দিকে। এককালে টাঙ্গায় চড়ে সন্ধ্যার আগে পুষ্করে পেঁছতে না পারলে দুর্গানাম জপতো। পথের চড়াইতে ঘোড়া বেঁকে বসলে কান্নার রোল উঠতো। তখন অন্ধ-কারের যুগ, ইলেকট্রিক আলো হয়নি। তখন ছিল 'পুষ্কর দুষ্কর'। সেখানে তিরাত্রি বাস ক'রে না এলে পান্ডাদের হাতে রেহাই ছিলো না। এখন বিপরীত। এখন ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়া, পুষ্করের হ্রদে স্নান, সাবিত্রী পাহাড়ে আরোহণ, গায়ত্রী ও ব্রহ্ম-মন্দির দর্শন, খাবার দোকানে খাঁটি ঘিয়ের পুরি খাওয়া, এবং ফিরে এসে লাঞ্চে ব'সে যাওয়া! তীর্থ-দর্শনের অপর নাম অবকাশরঞ্জন। তবু আজও ওরই মধ্যে ভাবান্তর ঘটে সাবিত্রীর পাহাড়ে ওঠবার কালে। আজও তার চতুর্দিকে দিগন্ত-জোড়া মরুপ্রান্তর। উপর থেকে দেখা যায় দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে পশ্চিম রাজস্থান সূর্যের খরতাপে। এই সঙ্গে মনে পড়ছে, মরুভূমির আরেকটি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় আবু পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে 'সানসেট পয়েন্ট' থেকে। যেন অনন্ত বালু-সমুদ্রের তলায় দিনান্তের রক্তিম সূর্য রক্ত-কমলের মতো ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

আর কী আছে আজমেরে? সেই অনু-সায়র আর দরগ-ই-শরিফ. আছে বটে দ্রষ্টব্য দু'-তিনটি সুদৃশ্য মন্দির। তারপর রইল যা, সে' ত বাজার আর সিভিল লাইন, অভিজাত সমাজের পল্লী,—আর একালের 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'রা! আর কিছু নেই এখানে।

প্রত্যেকটি প্রদেশে, নগরে, জনপদে, তীর্থস্থানে—আগে ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। পদে-পদে পথে-পথে ছিল বিস্ময় এবং রোমাঞ্চ। আজ সব একাকার। অমন যে নোংরা পুরনো বৃন্দাবন, সে-ও মস্ত বাজার বসিয়ে দিচ্ছে মথুরার দেখা-দেখি। জয়পুর-আজমের কেবল নামেই তফাৎ—বাজার একই। কানপুর বোম্বাই—শুধু নামেই তফাৎ। দিল্লীর কনট্ প্লেসে যা পাই, কলকাতার মুর্গিহাটায় তা'র চেয়েও বেশি পাই। কেন্টনগরের পুতুল আগ্রায় বিক্রি হচ্ছে! প্রত্যেক অঞ্চল আপন-আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। আরাবল্লির গর্ভলোকে এমন যে নাথদ্বার, সেই কোন-ঠেসা মাড়োয়ারি তীর্থেও গিয়ে দেখি, আসামের এণ্ডি চাদর বিক্রি হচ্ছে! মোট-কথা, যতদূর গিয়েছে রেলপথ আর মোটর-বাস্, ততদূর পর্যন্তই গিয়েছে সর্বাধুনিক কাল! সুতরাং সঙ্গে একটি সুটকেস, একখানা কম্বল আর একজোড়া কেডস্—ব্যস, ভারত-পরিক্রমায় আর কিছু লাগে না!

হরিয়ানার ভিতর দিয়ে একদিন ভোরে এসে পেঁছলুম রেওয়াড়ি। দিল্লীর আর বাকি নেই। দিল্লী, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো! কদম কদম বাঢ়ায়ে যা! দিল্লী যার, ভারত তা'র!

সেই নতুন দিল্লী! আগে ছিল মরু-লোক—কাঁকরে, পাথরে, বালুতে, সংখ্যাতীত সমাধি-স্তূপে এবং যান-বাহনের অভাবে নতুন দিল্লী ছিল আরাবল্লির শিরা-উপ-শিরার মধ্যে তলিয়ে। সেখানে এককালে পশুরাজ ব্রিটিশ সিংহ তা'র ল্যাজের ঝাপটায় ধুলো ওড়াতো। একালের নতুন-দিল্লী বৃক্ষচ্ছায়াবৃতা! কাননে-কুসুমে উপ-বনে উদ্যানে—সে যেন শান্তশ্রী। প্রবল শীতে, প্রখর গ্রীষ্মে, প্রচণ্ড বর্ষায়—নতুন দিল্লীর সুন্দর ও সুঠাম দেহের উপর কেবল পোষাক পরিবর্তন ঘটে মাত্র!

ওখানে তল্পিতল্পা এলিয়ে আপাতত আমরা বিশ্রাম নিতে বসে গেলুম।—

পুঁজি

আশাপূর্ণা দেবী

'বাড়িটা তো আমারই বাবার, তাতার বুঝি তার একটা ঘরে একটু অধিকার নেই?'

ন' বছরের মেয়েটা তার কাটা চুল উড়িয়ে, ফ্রিল ফ্রক দুলিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে আড়চোখে আগুন জেবলে এই চরমতম কটু প্রশ্নটি করে বসে, মার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে।

সোমা স্থির হয়ে যায়।

সোমা পাথর হয়ে যায়।

সোমার কথা বলতে দেরী হয়।

ন' বছরের মিন্টুর মুখ দিয়েই সত্যি এই কথাটা বেরোলো এটা বুঝতে তার সময় লাগে।

তারপর সোমা রূঢ় কর্কশ গলায় বলে, 'কী বললি?'

মিন্টু এমন কিছু নম্র শান্ত ধীর মেয়ে নয়, মিন্টু অবাধ্য, মিন্টু উদ্ধত। মিন্টুর বেড়াতে যাওয়ার সময় জামা পছন্দ না হলে ওই ভাবেই ঘাড় বাঁকিয়ে তেড়ে ওঠে, 'আমার ইচ্ছে মতন একটাও জামা তুমি পরতে দেবে না আমায়?'

কিন্তু সে আলাদা।

চোখে এমন আগুন জ্বলে না তখন, আর সোমা যখন কড়া গলায় বলে, 'না দেবো না। এক্ষুনি থেকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে তোমায় দেবো না আমি। আমার যা ইচ্ছে পরাব—

তখন জলভরা চোখে, লাল লাল মুখে পরেও নেয় মায়ের নির্দেশিতটি।

তারপর অবশ্য নালিশ চলে অন্তরালে।

সুপ্রিয় হতাশ গলায় স্ত্রীকে বলে, 'আচ্ছা, তুচ্ছ জিনিস নিয়েই বা এতো লাঠালাঠি করো কেন তুমি? যেটা ইচ্ছে হয়েছে পরুক না। ক্ষতি কি?'

'ক্ষতিটা যে কি তোমায় বোঝাতে পারবো না—' সোমা স্বামীর সঙ্গেও রূঢ় গলায় কথা বলে, 'ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে আমাকেই। এখন থেকে এতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে শেষকালে কোথায় পৌঁছবে তোমার ধারণা আছে?'

সুপ্রিয় প্রসঙ্গটা হালকা করতে চায়। বলে, 'সে তোমার জামাই ব্যাটা বুঝবে।'

মনে মনে বলে 'যেমন আমি বুঝছি।'

কিন্তু সোমা মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষার

মিন্টুর ওই বাঁচানোর সাধনাটাই তাকে আরো ভীত করে তুললো। অতএব বিধাতা প্রদত্ত ওই যে একটি মাত্র অস্ত্র তারই সদ্ব্যবহার শুরু করে দিল।

মিউ মিউ মিউ।

মৃতকল্প বড়ালছানার ওই মিউ মিউ ধ্বনি যে কী অসহনীয় বিরক্তিকর, সেটা আর কে না জানে, কাজেই সোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া মিন্টুর কোলে ওকে দেখে সোমার সর্বশরীর ঝিম-ঝিম করে আসছিল।

তার ওপর মিন্টুর ওই জেদ।

সোমা আগুন ঝরা চোখে বললো, 'তুই ওকে বাঁচাবি? আর তোকে কে বাঁচাবে শুনি? যম?...আমি বলে দিচ্ছি আমার বাড়িতে ওই নোংরা কুৎসিত রোগের ডিপোটাকে রাখা চলবে না। ফেলো ফেলো—।'

মাংসের তলা ধরা গন্ধে ছুটে চলে যাচ্ছিল সোমা। কিন্তু যাওয়া হল না।

ন' বছরের মেয়েটা তার কাটা চুল উড়িয়ে, ফ্রিল ফ্রক দুলিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে, আর চোখে আগুন জেলে পৃথিবীর সেই চরমতম কূট প্রশ্নটি করে বসলো।

অধিকারের প্রশ্ন।

'বাড়িটা তো আমারই বাবার, আমার বুঝি তার একটা ঘরে একটু অধিকার নেই?'

সোমার কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগলো।

সোমার উত্তর দিতে সময় লাগলো।

তারপর সোমা বুড়ে কর্কশ গলায় বলে উঠলো 'কী বললি?'

মিন্টু অবশ্য আর কিছু বললো না।

মিন্টু তবু দাঁড়িয়ে রইল সেই বুনো ঘোড়ার মত।

ওদিকে নতুন ফরমুলার মাংস ততক্ষণে পাড়াসুদ্ধ সকলকে জানান দিচ্ছে তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে, তাকে দেখা হচ্ছে না।

ছুটির সকালে সুপ্রিয় আড্ডায় বেরিয়েছিল।

যখন ফিরলো তখনও বেড়ালছানাটা সেই একটানা সুরে চালিয়ে যাচ্ছে।

ও বাড়ি ঢুকতেই সোমা লাল টকটকে মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এ লালের কারণ শুধু মেয়ের অপরিসীম ঔদ্ধত্যই নয়, মাংসও।

অনেক যত্নে অনেক আহ্লাদে রাঁধতে বসেছিল, পুড়ে অখাদ্য হয়ে গেল। ছুটির সকালটা কী দিয়ে খেতে দেবে সুপ্রিয়কে!

মিন্টুর কথা ভাবতে পারছে না, মিন্টুর নাম মুখে আনতে পারছে না। সোমার মনে হচ্ছে—তার মনের জগতে 'মিন্টু' নামের যে ভূখণ্ডটুকু ছিল, সেটা যেন সহস্র সাপে ভরে গেছে। কিলবিল করছে সেই সাপগুলো।

মিন্টু নষ্ট হয়ে গেছে।

মিন্টুর আর আদায় নেই।

কিন্তু সুপ্রিয় এ কী বললো?

সোমা বুঝি দুঃস্বপ্নেও এতোটা আশঙ্কা করেনি।

সুপ্রিয় হা হা করে হেসে উঠে বললো, 'বলেছে এই কথা মিন্টু? বড় হয়ে ও নির্ঘাৎ সাইয়ার হবে।'

হ্যাঁ, এই রকম অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর কথাটাই বললো সুপ্রিয়। যখন শুনলো মিন্টু বলেছে, 'বাড়ীটা তো আমারই বাবার। সে বাড়িতে আমার একটু অধিকার নেই?'

'হাসছো তুমি?'

রগটা টিপে ধরে বসে পড়ে সোমা।

'তা হাসির কথায় হাসবো না?'

'এটা তা'হলে তোমার কাছে হাসির কথা হলো? ন' বছরের মেয়ে এক্ষুনি তার বাপের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মায়ের সঙ্গে লড়তে এলো এটা হাস্যকর?'

'মেয়েটা ন' বছরের বলেই হাস্যকর।' সুপ্রিয় বলে, 'ছত্রিশ বছরের হলে ভীতিকর হতো।'

'তুমি যদি ওই বেড়ালবাচ্ছাকে দূর না করো তো আমি আর এ বাড়িতে জল গ্রহণ করছি না।'

বেলা বারোটা।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।

সুপ্রিয় ওই রোদটা ভেঙে এসেছে, এখনো স্নানাহার হয়নি, সুপ্রিয়রও মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। সুপ্রিয় দুঃসাহসে ভর করে বলে ফেলে, 'চমৎকার। চিরটাদিন তিলকে তাল করে করেই গে'লে! মেয়েটা তোমার নিজের না সতীনের?'

সোমা রক্তবর্ণ চোখ মেলে বলে, 'সতীনের থেকেও বেশী! মেয়েটা তোমার! তোমার একার। তাই তুমি তাকে বুঝতে দিয়েছ চিরটাকাল। তাই শিখিয়ে এসেছো। তাই আজ তোমার মেয়ে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। আমাকে তার বাপের বিষয়ের ভাগ দেখাতে এসেছে। বেশ তোমরা বাপ মেয়ে থেকো সুখে, আমি আর কিচ্ছুটি বলবো না। তবে এও বলে দিচ্ছি ওই মেয়ে বেড়ালছানা বুকে করে—তোমার মেয়ে যদি ডিপথিরিয়া হয়, যদি মরে, আমি তাকিয়েও দেখবো না।'

সুপ্রিয় এবার গম্ভীর হয়।

সুপ্রিয়র মুখও লাল হয়ে ওঠে।

সুপ্রিয় সেই মিউ মিউ ধ্বনি অনুসরণ করে ড্রইংরুমে এসে দেখে মিন্টু নিজের একটা জামা পেতে একটা ঘেয়ো বেড়াল-বাচ্চাকে শুইয়ে তার একান্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও একখানা বিস্কিট খাওয়াবার চেষ্টা করছে।

মিন্টুর হাতে একমাত্র ওই আহার্যটুকুই আছে। প্রথমেই এনে ঘনশ্যামকে বলেছিল, 'এই একটু দুধ এনে একে খাইয়ে দে তো—'

কিন্তু ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের গলায় বলেছিল, 'আমার দ্বারা হবে না। ওটার গায়ে হাত দিলে আমার ব্যামো হবে।'

'ঠিক আছে, যা।' ক্রুদ্ধ মিন্টু বলেছিল, 'আমি বিস্কিট খাওয়াচ্ছি—'

তদবধি এই দীর্ঘ সময় ধরে ওই একখানা বিস্কিট নিয়ে আপ্রাণ সাধনা চলছে তার।

'একটু খা না রে। দেখবি খুব ভালো লাগবে। কখনো তো খাসনি, জানিস না কেমন খেতে। একটুখানি খা রে! আচ্ছা তুই এতো বোকা কেন রে? না খেলে মানুষ মরে যায় তাও জানিস না? এই দেখনা আমি কম খাই বলেই তাই এত রোগা। তবু তো আমার মা আছে। জোর করে করে খাওয়ায়। আর ভেবে দেখ তোর মাও নেই। কে তোকে খাওয়াবে? একটুকরো খেলেই এখুনি তোর গায়ে জোর আসবে, তখন বুঝবি।'

যে মেয়ে মার সঙ্গে বাবার বাড়ির অধিকার তুলে ঝগড়া করতে পারে, সেই মেয়েই যে এ হেন ছেলেমানুষী করতে পারে, এটা অবিশ্বাস্য, তবু সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটাই ঘটছে।

আর এটাই হয়তো সত্যকার মিন্টু।

চোখে আগুন ঝরানো মিন্টুটা শুধু তার মার কার্বন কপি।

শিশুর মত এমন অনুকরণপ্রিয় আর কে আছে?

সুপ্রিয় ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো।

সুপ্রিয় তার মেয়ের মৃদু অনুনয় শুনতে পেলো, 'একটুখানি খা না রে বাবা, এতক্ষণ সাধছি। না খেলে বাঁচবি না, সে জ্ঞানও নেই তোর?'

সুপ্রিয় হয়তো মেয়েকে তিরস্কারই করতে এসেছিল। সুপ্রিয় হয়তো বেড়াল-ছানাটাকে দূর করবে বলেই স্থির করেছিল, কিন্তু সুপ্রিয় ওই করুণ অনুনয়ের ভঙ্গীতে কেমন বিচলিত হয়ে গেল।

বললো, 'তুই কি বোকা রে মিন্টু, বেড়ালবাচ্চা কখনো বিস্কিট খায়?'

মিন্টু বাবার গলা পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলো। বলে উঠলো 'বাবা তুমি এসেছ? এতো দেরী করলে কেন? আমি তখন থেকে শুধু তোমার কথাই ভাবছি।

দীপ্তিকুমার শীল রচিত হাসির নাটক
উত্তম পুরুষ পূর্ণাঙ্গ
মধুরেণ সমাপয়েৎ পূর্ণাঙ্গ
এ্যামেচার • শেষ সংবাদ
দিলীপ বসাক রচিত রহস্য নাটক
আগন্তুক • রাত যখন সাতটা
নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর **বিপ্লব**
ঝড় জলের রাতে রবীন দেবের
প্রত্যেক নাটকের দাম ২ টাকা
পুষ্প এন্ড কোং
১৯বি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫

এত হাঁপাচ্ছ কেন, বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, যেন, অনেকটা দৌড়েছি বা ভারী কোন মালপত্র তোলাপাড়া করেছি। অথচ সত্যি তা করি নি। খুব খানিকটা পরিশ্রম করলে যেরকম লাগে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়া, হাঁপ লাগা, সেরকম লাগছে। নিশ্চয়ই ব্লাডপ্রেসার হয় নি। আমার মত বয়সে যে কারুর ব্লাডপ্রেসার হয় না, তা নয়। বিপ্লবের তো হাইপ্রেসার।

এই আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব! তার মানে কী। ইংরেজীতে যাকে রেভ্যুলিউশন বলে, বিপ্লব শব্দের মানে তা-ই তো। এটা নাম হয় কী করে বুঝতে পারি না। একটা ছেলের—মানে মানুষের নাম, আর ইনভেরিয়েবল বাঙালীর নাম। আজকাল তো চারদিকেই বিপ্লবের ছড়াছড়ি। বিপ্লব মুখার্জি, বিপ্লব গুহ, বিপ্লব সেন, আশে-পাশে, চেনা-অচেনা প্রচুর বিপ্লব। 'এ বিপলাও বাবু, আপকা কিতাব লে যাইয়ে।' এরকম উচ্চারণও আমি, অবাঙালী পিওনের মুখে এক-দিন শুনতে পেয়েছি। আমার কানে, 'বিপলাও' শব্দটা এমন খট করে ঠেকেছিল যে, পিওনটা ঠাট্টা করছে কী না ভেবে, তার

সমরেশ বসু

পাতক

(উপন্যাস)

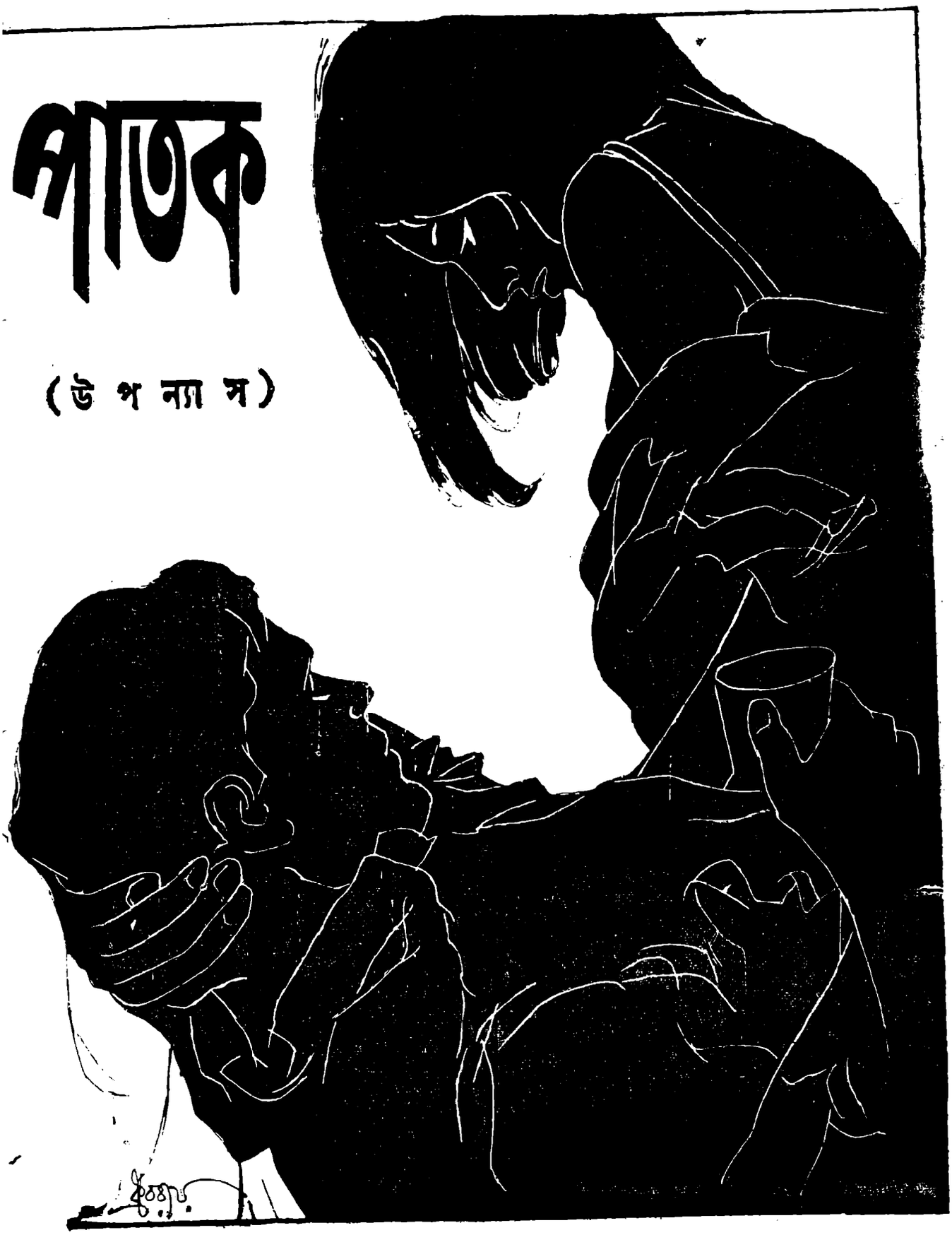

মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। না, ঠাট্টা করে নি, আর বিপ্লবের কানে যে কথাটা একেবারেই ঠেকে নি. সেটা ওর মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। বিপ্লবী বললে, তবু একরকম শোনায়, তাও নাম হয় না। অনেক নামেরই হয় তো মানে হয় না বা নাম হয় না, যেমন 'মিলন'। মিলনও ঘটে, বিপ্লবও ঘটে। শব্দগুলো শুনতে ভাল লাগে বলেই বোধহয় রাখে। কিংবা অন্য আরও কিছুও হতে পারে। হতে পারে নয়, তা-ই, আর সেজন্যেই এরকম নাম শুনলে আমার মাথায় পোকা বিজবিজ করে ওঠে। বিপ্লবকে, আমার বন্ধু বিপ্লব মজুমদারকে প্রথম আলাপের দিনই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, এ নামের মানে কী?'

বিপ্লব বলেছিল, 'কী জানি, নাম একটা রেখেছে, রাখতে হয়, তা-ই।'

ওর মুখ দেখে, আমার কেমন মনে হয়েছিল, যতটা 'কিছু নয়' ভাবের মুখ করে বলছে, ব্যাপারটা ঠিক তা না। বিপ্লব আবিশ্যি খুব গম্ভীর ছেলে, ভাবটা সব সময়েই একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, মোটা লেন্সের চশমায় চোখ দুটো সব সময়েই যেন অন্য কিছু দেখছে, এরকম একটা ভাব। ও আবার সব সময়েই প্রায় রাজনীতি নিয়ে থাকে তো। সে হিসাবে ও বিপ্লবীও বটে। আমাদের নেতা, আমাদের ছাত্রদের কিংবা আমার মত, যে নিজেকে ছাত্র ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না, অথচ নিয়মিত পড়াশোনা করা বা রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করা কোনটাই ঠিক মত হয়ে ওঠে না। বিপ্লব বলতে পারে খুব ভাল। অ্যাজিটেশন না, বেশ যুক্তি দিয়ে, ভেবে-চিন্তে বলতে পারে। ও খুব ভাবে, পড়াশুনো করে। কপালের ওপর চুল পড়ে থাকে, গোঁফ-দাড়ি প্রায়ই কামানো হয় না, ভুরু দুটো কুঁচকে থাকে, আর এমনিতে কথা কম বলে। কিন্তু ও যে ভাবে, নাম রাখতে হয়, তাই রেখেছে, বলেছিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ঠিক তা মনে হয় নি। আমার যেন মনে হয়েছিল, খুব সাধারণভাবে, অনেক বেশী একটা অসাধারণ কিছু বলছে। তাই আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু এটা তো একটা নামই হয় না।'

ও আমার দিকে না তাকিয়ে ঘাড়টা নেড়ে, একটা তাচ্ছিল্যের ভাবে নিচের ঠোঁটটা উল্টে দিয়েছিল। যেন ব্যাপারটা সেখানেই নিষ্পত্তি করে দিতে চেয়েছিল। আর সত্যিই তো, ব্যাপারটা তো খুবই সাধারণ। এ নিয়ে এত বলাবলিরই বা কী আছে। কিন্তু আমার মধ্যে কেমন একটা খুঁপসের ভাব আছে। কাউকে জব্দ করার সুযোগ পেলে যদি বুঝতে পারি কারুর কোন বিষয়ে একটা দুর্বলতা আছে, তাহলে তার ওপরে মাছির মত ভ্যান ভ্যান করি। তাড়া-খাওয়া মাছির মত, বারে বারেই ঘুরে ফিরে, সেই একটা জিনিসের ওপরে এসে বসা। মাছটাকে ঠিক জেদী মনে হয় না বা ক্ষুধার্ত। বরং যেন মনে হয়, মজা পাচ্ছে মজা পেয়ে ভ্যান ভ্যান করছে। হয় তো এভাবেই আমাকে কোনদিন বিশ্ব-মাখা মিষ্টির মধ্যে পড়ে মরতে হবে। কেন যে এরকম একটা ভাব আসে, বুঝতে পারি না। আমার যেন মনে হয়েছিল, বিপ্লব প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। একথা মনে হওয়াতেই, আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম 'তোর কখনো মনে হয় নি, এটা কোন নাম হতে পারে না।'

'না।'

'কেন?'

'একটা নাম, জন্মের পর থেকে শুনে আসছি, এর আবার কী মানে হবে।'

'বড় হয়ে মনে হয় নি?'

'অত ভেবে দেখি নি।'

'কে রেখেছিল নামটা?'

'শুনেছি বাবা রেখেছিল। ছাড় দেখি বাজে কথা, একটা সিগারেট দে।'

আবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। ভিতরে ভিতরে ওর বোধহয় রাগও হচ্ছিল। ওকে আমি একটা সিগারেটে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভিতরে সেই খুঁপস, একটা মজা পাচ্ছিলাম যেন ওর এড়িয়ে যাওয়া দেখে। এই মজা পাওয়ার সঙ্গে, কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমার দাঁতগুলো অনেক দিন মাজা হয় নি। জিভে ছ্যাতলা পড়ে আছে। যে কারণে, একটা বিশ্রী ভাব লাগছিল। এই সব ব্যাপারগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না। দাঁত জিভ সব তো পরিষ্কারই ছিল। আবার বলেছিলাম, 'নামটা বদলে ফ্যাল।'

বিপ্লব জোরে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'কী যে ফাজলামি করিস।'

আমার কাছ থেকে উঠে চলে গিয়েছিল। গেলে কী হবে, তারপর থেকে আমি প্রায়ই ভ্যান্ ভ্যান্ করতাম। ওর সঙ্গে কথা বললেই, একবার করে নামের বিষয়টা তুলতাম। ও বলতো, 'কত লোকের যে বিপ্লব নাম রয়েছে!'

'তাদের সবাইকে নিয়েই বলছি।'

অনেক দিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ইয়ার্কি-ফাজলামি হিসাবেই ধরা হচ্ছিল। তার পরে একদিন বিপ্লব রেগে গিয়ে, আমার সার্টের কলার চেপে ধরেছিল, 'রাসকেল হোয়াট ডু ইউ থিংক? ইয়ার্কি? রোজ রোজ এক কথা, কিছু বলি না বলে, না?'

সেদিন ও আমাকে একটা ঘুষি মারতোই। নেহাৎ অন্যান্য বন্ধুরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, তা-ই। আমার মধ্যে কিন্তু তখনো সেই মজার ভাবটা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটা তিক্ত ঝাঁজ ছিল। ভিতরে ভিতরে, আমারও কেমন একটা রাগ হচ্ছিল। হয় তো বিপ্লবের সঙ্গে মারামারি করতে আমার লজ্জা করতো, তাও আবার ওরকম একটা ব্যাপার নিয়ে। ওর সঙ্গে মারামারির কথা আমি কোনদিন ভাবি নি। লেগে গেলে কী হত, তা বলতে পারি না। তারপরে বন্ধুরা যখন কারণটা শুনেছিল, তখন ওরা যেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারে নি। এরকম একটা বিষয় নিয়ে যে, হাওয়া এত গরম হয়ে উঠতে পারে, কেউ ভাবে নি। এই ব্যাপার! সত্যি বলতে কি সবাই-ই প্রায় হেসে উঠেছিল যে-হাসি বিপ্লবকে আরও ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'না না, হোয়াট ইজ দিস্। দেখা হলে, কথা হলেই, এক কথা। এটা সিম্পলি পেছনে লাগা। আই ওন্ট টলারেট দীজ থিংস্।'

ওর মত সীরিয়াস ধরনের ছেলে, এমনভাবে ইংরেজী বাঙলায় মিশিয়ে চিৎকার করছিল, তাতে ওকে আমার আরও অসহায় মনে হচ্ছিল। ও যে এত বুদ্ধিমান, এত বোঝে, জানে, যে কারণে সবাই ওকে বিশেষ—কী বলা যায়, সমীহই করে—রেস্পেকট্, তখন তা মনে হচ্ছিল না। বন্ধুরা ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেয় নি, ফাজলামি মনে করে হেসে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল। কেউ কেউ আমাকে গালাগাল দিয়েছিল, দু-একজন মনে মনে, সত্যি সত্যি রেগে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আর কোনদিন বলব না।'

একজন বন্ধু আমার দিকে চেয়ে, হেসে বলেছিল, 'তুই সত্যি খচ্চর, ভিট্-ভিটে খচ্চর।'

ভিটভিটে-টা কী, তা জানি না, মিটমিটে জানি। কথাটা সেদিন নতুন শিখেছিলাম। যাই হোক, বিপ্লব আর আমার সঙ্গে সেদিন কথা বলে নি। আমিই যেচে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারপর কয়েক দিন বাদেই ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের নাম বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সরকারি অফিসের ইউ ডি সি। ইউ ডি সি, একে ইংরেজী তায় সংক্ষিপ্ত শব্দের আদ্য অক্ষরে শুনলে মনে হয়, একটা দারুণ কিছু ব্যাপার। আপার ডিভিশন ক্লার্ক আসলে। একতলা সেকেলে পুরনো ভাড়াটে বাড়ি। যে অঞ্চলের বাড়ি, সেদিকে ভাড়াও কম। চোখের সামনেই দেখেছিলাম, প্রায় গোটা-সাতেক ছেলেমেয়ে। বীরেন্দ্রনাথের সন্তানবৃন্দ। কোন্

দেবীর কৃপায় যেন আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে হয়? আহা, মনে করতে পারছি না কিছুতেই। কী যেন নামটা দুর্গা না চণ্ডী, লক্ষ্মী না সরস্বতী—না না, ওসব নয়। যাক গে, একটা কিছু হবেই, সেই দেবীর কী অসীম কৃপা বিপ্লবের বাবা মায়ের ওপর। সাতের পরেও আনাচে কানাচে আরও ছিল কিনা, জানি না। থাকলে আরও কৃপা বলতে হবে।

একটা ঘরে গিয়ে বসেছিলাম। বিপ্লবের বাবা সেই ঘরে এসেছিলেন। একটা জ্বালজেলে ধুতি, কোঁচা দিয়ে পরা, ভিতরে আন্ডার ওয়্যার ছিল না, ফলে একটি প্রৌঢ়—হ্যাঁ বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন নিশ্চয়ই হবে, 'তাহার নিম্নের ইত্যাদিসমূহ দৃষ্ট হইল', এই রকম বলতে ইচ্ছা করে। আহা, এই যৌবনের আর সেদিন নাই, ইহার আবরু রক্ষা করিয়া কী হইবে। মনে মনে এরকম একটা ভাবও আসে। আমি বিপ্লবের বাবাকে প্রণাম করেছিলাম। পা বাড়িয়ে প্রণাম নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপরে, 'বসো বসো। বেশ বেশ।...তুমিও বুঝি বিপ্লবদের সঙ্গে রাজনীতি কর? বেশ বেশ, এ তো করতেই হবে। তোমরাই তো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।'...দু-এক কথার পরেই, বীরেন্দ্রনাথ এসব কথা বলেছিলেন। দেখেছিলাম ভদ্রলোকের কয়েক দিনের দাড়ি না কাটা মুখে রীতিমত বিক্ষোভের ছাপ। চোখ দুটোও যেন জ্বলজ্বল করছিল। বিপ্লব ওর বাবাকে কী বলেছিল আমার সম্বন্ধে কে জানে, কিম্বা বিপ্লবের সঙ্গে দেখে হয় তো ধরেই নিয়েছিলেন, আমিও ওঁর ছেলের দলের ছেলে। যত কথা বলেছিলেন, সবই ছিল উপদেশ এবং উপদেশগুলোর সব কথাই বর্তমান যুবকদের কর্তব্য বিষয়ে। কেন এত উপদেশ-টুপদেশ দিচ্ছিলেন জানি না, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ লোক নয়। আবার তার মধ্যেই হাই তুলে, মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে, 'জয় মা তারা' বলেছিলেন এবং পেটে দুবার হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ বেশ, তোমরা বসো, পেটটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, একবার পাইখানায় যেতে হবে।'

বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর আমার বলতে ইচ্ছা করছিল, 'বেশ বেশ আপনার সব খোলসা হোক।'...সত্যি, আমি যেন ভদ্রলোককে ঠিক স্বাভাবিক মনে করতে পারছিলাম না। আশঙ্কা, বহু লোককেই ওরকম কথা বলতে শুনেছি বিশেষ করে যারা বাবা-টাবা হয়ে গিয়েছে যারা উপদেশ নির্দেশ ছাড়া কথাই বলতে পারে না। কেন এই করবে সেই করবে এই করা উচিত, সেই করা উচিত কেন একথাগুলো এরা বলে বুঝতে পারি না। বলতেই হবে, তাই না? যেন এভাবে কথা বলবার, এদের একটা বিশেষ অধিকার আছে। বলতে পেরে খুব খুশি। ওদের যে কে উপদেশ দেয়, তার কথা শুনে মেনে চলে কে জানে। ওদের কথা শুনেই বা কে চলছে, তাও তো জানি না। যেন, একজন বলে যাচ্ছে, আর একজন শুনে যাচ্ছে, ফল কী হবে, ভাববার দরকার নেই। বলা আর শোনা তো। বলুন বলুন, বলে যান, এদিকে ঢোকাচ্ছি আর বের করছি।

অথচ বিপ্লব নিজেই আমাকে বলেছিল, বাড়িতে ওর বাবা, ওর ওপরে খড়্গহস্ত হয়ে আছেন ও নিজে টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারছে না বলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন, ওর মাকে খাওয়া বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন। এসব ব্যাপারে, বিপ্লব মিথ্যে কথা বলবার ছেলে নয়। সেদিন কিন্তু ওর বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল ওর বাবা একটা বীরেন্দ্র যোদ্ধা। আর সেদিন, আমার আর একটা কথা মনে হয়েছিল। বিপ্লব নাম যে কেন রাখা হয়েছিল সেটা যেন আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ওর বাবার মনের মধ্যে এত বিপ্লব ঠাসা যে করতে পারি না পারি, ছেলের নামই বিপ্লব রেখে দেব। মানে এটা একটা ইচ্ছা, একটা সাধ, একটা দেশাত্মবোধ, একটা—একটা ভয়ংকর ব্যাপার বিপ্লব, কী দারুণ শোনায়! নিকুচি করেছে অর্থ আর মানের, এই নামই চালাতে হবে। যেন একটা মন্ত্রের মত বেদবাক্যকে গর্জে ওঠা, তোর নাগাল পাই না পাই, তোর ইয়ের নাগাল পাব। কিন্তু পিতৃদেব, সে গুড়ে বালি, এলম্বিধ ব্যাঘ্রের জন্য, মার্জার বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াই মাটি চাপা দিয়া দেয়। আপনার ইচ্ছাও সেইরূপ, বীরেন্দ্রনাথদের বিপ্লব এরকম মাটি চাপাই পড়ে।

কিন্তু এসব কথা আমি বিপ্লবকে কোনদিন বলিনি। বললে নির্ঘাৎ হাতাহাতি হয়ে যেত। কী দরকারই বা আমার। নেহাত বন্ধু, ডাকাডাকি করে কথা বলতে হয় আর বলতে গেলেই কানে খট খট করে বাজে। এরকম কত নাম আছে, কত কথা আছে, কত ব্যাপার আছে, যা অর্থহীন, অস্বাভাবিক, উদ্ভট কিন্তু মানুষের অভ্যাসের মধ্যে মিশে গিয়ে, সব যেন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। বরং অস্বাভাবিক বলতে গেলে সবাই আমাকেই গালাগাল দেবে, নয়তো বুদ্ধু বলবে। লোকেরা যখন মানছে, তুমিও মান, এইরকম আর কি। তার ওপরে যদি—কী বলে ওটা—দেশপ্রেমের ফোয়ারায় কিছু বুড়বুড়ি কাটে, তাহলে তো কথাই নেই। যেমন আমার বাবার এক বড়লোক পার্টনারের নাম শুনেছিলাম, গান্ধীকুমার গাংগুলি। বোঝাই যাচ্ছে, ব্যবসায়ীটি গান্ধীজীর অসহযোগের যুগে, আঁতুড়-ঘর আলোকিত করেছিলেন। নিশ্চয় বিপ্লবের বাবার মতই মনের ভাব থেকে, এরকম নাম রাখা হয়েছিল। কিন্তু বাবা গান্ধীকুমার গাংগুলি, কে জানিত, তুমি একজনের পদবীকে নাম করিয়া ভবিষ্যতে একজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ী হইবে।

যাক গে এসব কথা, তবে এখনো বিপ্লবকে নাম ধরে ডাকলে, ওর চোখের কোণে একটু সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে, ঠাট্টা করছি কী না সেটা দেখে নেয়। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, বিপ্লবের এই বয়সেই ব্লাডপ্রেসার হয়েছে। আমার কি হয়েছে নাকি। একবার বিপ্লবের খুব কষ্ট দেখেছিলাম, যেন ও কিছুতেই নিশ্বাস নিতে পারছিল না। আমারও সেইরকম হচ্ছে। যেন বুকের ভেতরে, নিশ্বাস নেবার মত আর একটু জায়গা নেই। খুব হাঁপিয়ে পড়লে যেরকম হয়, তার চেয়ে খারাপ এ অবস্থাটা। অথচ কেন, আমি বুঝতে পারছি না। মিনিট দশ-পনেরো আগের কথা আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। মনে করতে পারছি না বা মনে করতে চাইছি না, জানি না। হয় তো মনে করতে চাইছি না কিছুতেই, এত জোর দিয়ে চাইছি না, সেই জন্যই হয়তো মনে করতে পারছি না। কিংবা হাঁ ব্যাপারটা এইরকম মনে হচ্ছে, যেন একটা ঝলকের মত চোখের সামনে দিয়ে কী একটা চলে গেল, কিছুই বোঝা গেল না। কী একটা ঘটে গেল কিছুই দেখা গেল না। সেইরকমই মনে হচ্ছে। যেন আমার ভাবনা চিন্তা-গুলো সব কালো আর মোটা পর্দা জড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। আমার চোখের অবস্থাও যেন সেইরকম আমি ভাল করে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপরে, বোদটা এত চড়া, যেন আমি একটা গরগর গর্জনও শুনতে পাচ্ছি।

আশ্চর্য ব্যাপার, নিজেকেই ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপ না করে পারছি না। একি পদ্য লেখা নাকি, রোদের গর্জন শুনছি। কিন্তু আমার সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমি কোনদিকে যেন তাকাতে পারছি না। সানগ্লাসটাও সঙ্গে নেই। সেটা যে কোথায় আছে, তাও মনে পড়ছে না। চোখ খুলে তাকাতে পারছি না মনে হচ্ছে যেন চোখ ফেটে রক্ত পড়বে এমন একটা ভাব। রাস্তায় কি একটা ট্যাক্সিও নেই লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে এতবড় একটা রাস্তা ঠিক যেন মরুভূমির মত লাগছে। মরুভূমিই। এমনিতেই কলকাতার এসব পাড়া একটু নিরিবিলি। সমস্ত বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। দোকানপাট প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও এখন বন্ধ কে-ই বা বিক্রী করবে কে-ই বা কিনবে। রাস্তা ফুটপাত সমস্তই ফাঁকা, হলদে খোঁচা খোঁচা ধারালো দাঁতের মত রোদ যেন কামড়ে ধরে আছে। কিম্বা হয়তো লোকজন চলাফেরা করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু একটা ট্যাক্সির শব্দ নেই, শব্দ হলেও তো শুনতে পেতাম। প্রাইভেট

গাড়ির শব্দও নেই। কাছেই একটা গাছ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, ওখানে দু'একজন আছে, বোধহয় বাস-স্ট্যান্ড। না, ওখানে আমি যাব না, ওসব লোকের কাছাকাছি আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। আমি বাসেও চড়ব না। তার চেয়ে, হাঁটতে হাঁটতে দেখি, একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কী না।

কিন্তু এত টায়ার্ড লাগছে কেন। হাঁপানি হয়ে গেল না তো আমার। এখন তো দেখছি, আমার দাঁতের মাড়িও যেন ব্যথা করছে। মাড়িতে আবার ঠান্ডা লাগল কখন। জিভ দিয়ে, মাড়ি চেটে চেটে দেখলাম, না ফোলে নি। অথচ দাঁতের গোড়াগুলো যেন ব্যথা করছে। আমার দাঁত খুব খারাপ নয়, কিন্তু এখন কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছি। অপরের মুখ থেকে এক-এক সময় যেমন পাই, বমি উঠে আসার মত দুর্গন্ধ, অনেকটা সেইরকমের। যে কারণে আমার মনে হয়, একটা যক্ষ্মা রুগী মেয়েকেও ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমো খেতে পারি, তার সামনে বসে কথা বলতে পারি, কিন্তু একটা পাইয়োরিয়া রুগীকে তা পারব না। যক্ষ্মার থেকেও পাইয়োরিয়া আমার খারাপ লাগে। রত্না, ঠিদিবের বোনটা, ওহ্, সে একটা সময় গিয়েছে মেয়েটার সঙ্গে। প্রথম প্রথম যখন প্রেম হয়েছিল, মুখের দিকে তাকিয়ে মরেই যেতাম। সত্যিই, মুখটা এত সুন্দর, বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, ঠোঁট দুটোও এমনিতেই রঙ না মেখে টকটকে লাল দেখাত, দেখতে দেখতে মরেই যেতাম। ভাবতাম, ওই মুখ দু-হাতে ধরে যেদিন চুমো খাব সেদিন জীবন সার্থক। কল্পনায়, কতই খেতাম, খেতাম খেতাম, খেতেই থাকতাম আর ভাবতাম, যেদিন খাব, খাব খাব খেতেই থাকব। তখনো রত্না কাছাকাছি এসে কথা বললে, একটা হাল্কা দুর্গন্ধ পেতাম, কিন্তু বিশ্বাসই করতে পারতাম না, ওর কোথাও থেকে সেই দুর্গন্ধটা আসছে। তারপরে যেদিন সময় আর সুযোগ এসেছিল, ওদের বাড়িতেই, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে, প্রথম মুখ দিয়েই, ওয়াক্! এখনো ভাবলে গা ঘুলোয়। আমি একটা শব্দ করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম ও বলেছিল, 'কী হল।' 'তুমি আজ দাঁত মাজনি?' 'মেজেছি তো?' 'কখনো না, দেখি আবার?' বলে আমি আবার নাকটা ওর মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওয়াক্! সে যেন তাজা চেহারার বেশ্যার শরীরে চোরাই সিফিলিসের ঘা দেখার মত। দেখিনি অবিশ্যি কোনদিন, শুনেছি। ওসব জায়গায় দু'একবার যা গিয়েছি, সাবধান না হয়ে যাইনি। জানি, চোখে কিছুই দেখা যাবে না, গন্ধেও কিছু মালুম দেবে না। রত্নার সঙ্গে সেখানেই, সেইদিন সন্ধ্যায় ছাদেই ইতি হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি নয়, সন্ধ্যাসন্ধিতেই প্রেম মাথায় উঠে গিয়েছিল। শুধু ঘৃণা হয়নি, প্রচন্ড রাগও হয়েছিল মেয়েটার ওপর। মনে হয়েছিল, আমাকে ঠকিয়েছে শুয়োরের বাচ্ছিটা। আরো অনেক সব মারাত্মক গালাগাল দিয়েছিলাম মনে মনে। বলেছিলাম, 'দাঁতগুলো সব তুলে ফেলে, নকল দাঁত লাগিয়ে নিও। তোমার মাড়ি ভরতি ঘা আর পুঁজ।' রত্না আমার ওপর খুব চটেছিল, প্রথমটা যেন জানে না নিজের দাঁতের দশা, এরকম একটা ভাব করেছিল, তারপরে ভীষণ চটে গিয়ে 'অভদ্র ছোটলোক, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে জান না, মিশতে জান না,' এমনি সব কথা বলেছিল। তা বলুক গিয়ে, ওরকম ঠোঁটের সামনে এসে চুমো ফিরে গেলে, আমিও গালাগাল দিতাম। কোন কোন বাড়িতে বা অফিসে বা দোকানে গেলেও, আমি এরকমই একটা দুর্গন্ধ পাই। অনেক সময়, টেলিফোনের রিসিভারের সামনে মুখ নিয়ে কথা বলতে গেলেও যেন গন্ধটা পাই, আর তখন ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়ে কথা বলি।

সেই গন্ধটাই যেন আমি আমার মুখে পাচ্ছি এখন। রত্নাকে যেমন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেরকম নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, দাঁত মেজেছিলাম তো আমি? মেজেছিলাম বলেই তো মনে পড়ে। কিংবা, এটা হয়তো দাঁতের গন্ধ নয়, টনসিলের। আমার আবার টনসিল আছে। সেটা যখন ব্যথা হয়, ফোলে তারপরে ফাটে তখন পুঁজের মতই কিছু বেরোয়, দুর্গন্ধটা এইরকমই। টনসিলের জন্যই এরকম হচ্ছে নাকি। কয়েকবার ঢোক গিললাম, জিভটাকে টাকরায় ঠেকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম। টনসিল পেকেছে বলে মনে হল না। কী জানি, দাঁতের গোড়াগুলোতে এত ব্যথা কেন, আর এরকম দুর্গন্ধই বা পাচ্ছি কেন কে জানে। জিভটাও তো মোটা ছ্যাতলা পড়া ভাব লাগছে।

কী হল শরীরটার মধ্যে। আমি কি অসুস্থ নাকি। কিন্তু কই, জ্বরজারি কিছু তো হয়নি। অথচ দেখছি, হাতের ডানা দুটোতে ব্যথা ব্যথা করছে। আঙুলগুলো যেন সোজা করতে পারব না, গাঁটে গাঁটে এরকম একটা ব্যথা লাগছে। টনটনে ব্যথা। আঙুলগুলোকে মুঠি পাকিয়ে খুলতে লাগলাম, যদি একটু আরাম হয়। কিন্তু না, একটুও আরাম হচ্ছে না। একই রকম ব্যথা। কেন, আমি কি দু'হাত দিয়ে কারুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেছি নাকি। পাঞ্জা কষলে এরকম হতে পারে। একবার আমার হয়েছিল। তবে, সেটা এক হাতে হয়েছিল। ফ্রি-স্টাইল পাঞ্জা, টেবিল বা কোন কিছুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে, পিছনে হাত দিয়ে নয়, সামনাসামনি, হাতে হাত দিয়ে, আঙুলের ফাঁকে আঙুল গলিয়ে, পাঞ্জাটা মুচড়ে দেওয়া। হয়েছিল রঞ্জনের সঙ্গে। ও আমার থেকেও রোগা-পটকা। আমি বলেছিলাম, দু' কাপ কফি বাজী। ও বলেছিল, 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। এক বোতল বীয়র?' ওর একটু বেশী বাড়াবাড়ি বরাবরই। স্কুল-ফাইনাল পাশ করবার আগেই বীয়র খেতে আরম্ভ করেছিল। এখন তো দেশী চোলাই আর গাঁজা পর্যন্ত উঠেছে। ওর বাবা দিল্লীতে একটা মস্ত বড় চাকরি করে। বছরে প্রায় তিন চার মাস, খেপে খেপে, ফরেনে যায়। সেন্ট্রালের মিনিস্টারদের সঙ্গে প্রায়ই ছবিটবি বেরোয়। রঞ্জন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে, চোখ মেরে বলে, 'হেল্লো ড্যাড্, ডুয়িং ওয়েল?'

বলবার সময় ওর ঠোঁট বেঁকে যায়, একটা বিদ্রূপ আর ঘৃণার ভাব, তারপরে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'চালিয়ে যাও বাবা।' আমাদের বলে, 'লোকটা খুব শাদা ঘোড়ায় চাপে।' এটা একটা খুব চলতি কথা, শাদা ঘোড়ায় চাপা মানে, শ্বেতাঙ্গিনী সঙ্গ। আর রঞ্জনের মা, কলকাতায়, চুলে বয়েজ-কাট দিয়ে, স্লীভলেস পেটকাটা জামা গায়ে দিয়ে, রঙ-চঙে শাড়ি পরে, বেশ কাটাচ্ছে। আমার নিয়মিত যাতায়াত নেই ওদের বাড়িতে। কয়েকবার হঠাৎ গিয়েছি, তখনই দেখেছি ওর মাকে। বেশ কেমন একটা পুতুল পুতুল চেহারা, যেমন রঙ করা পুতুল হয়, ফোলানো ফোলানো লাল লাল ঠোঁট, আঁকা চোখ ভুরু। আস্তে আস্তে চোখের পাতা তুলে চায়, ঠোঁটের কোণে টিপে টিপে হাসে, সবাইকে হাত ধরে কাছে টেনে বসায়—মানে রঞ্জনের বন্ধুদের। মা তো! কিন্তু সবাই, রঞ্জনের অনেক বন্ধুরাই জানে, ওর মা আমাদের বয়সী ছেলে ছাড়া কারুর সঙ্গে মেশে না। যেমন মিহির, মিহিরের সঙ্গে ওর মার খুব বন্ধুত্ব। রঞ্জনের মায়ের সঙ্গে মিহিরের কাহিনী, মিহির আমাকে নিজেই বলেছে। তাতেই অনুমান করতে পেরেছি. সামনে যেরকম থাকে ওর মা, আধ-বোজা চোখে ঢুলুঢলু তাকানো, ঠোঁটের কোণ টিপে মিটি মিটি হাসি, ওটা সবটাই, অনেকটা মাকড়ির শিকারের মত। মাকড়ি যেমন মাকড়সাটাকে আস্তে আস্তে ধরে, জড়ায়, তারপরে ধীরে ধীরে দাড়া দিয়ে চেপে ধরে গিলতে থাকে, প্রথম ভাবটা আসলে সেইরকম। 'এস।' 'বস।' 'কী খাবে?' 'যেও'খনি, তাড়া কিসের?' ওরকম কথা বলে, আর আস্তে বড় বড় চোখের পাতা, একটু একটু করে অনেকটা খুলতে থাকে। চিড়িয়াখানায় কুমীরের চোখই ওরকম দেখেছি। ড্রিংকসও অফার করে রঞ্জনের মা। কিন্তু তারপরে, বন্ধ ঘরে, চেহারা আলাদা। নীতিশই ভাল বলে। রঞ্জনের মায়ের আর এক প্রেমিক—প্রেমিক! ইচ্ছে করছে, এখুনি বমি করে ফেলি। নীতিশ বলে, 'সত্যি, এত যত্ন করে!'

কথাটা শুনে, আমার কানের মধ্যে কেমন ঝা-ঝা করছিল, অপিচ এ কর্ণ কোন বাক্যেই ঝা-ঝা করিবার নহে, তবু করেছিল। কেন, তা আমি জানি না। অনেক খারাপ কথা, লোকে যাকে খারাপ বলে, কারণ লোকেদের নাকি সত্যি খারাপ বোধ আছে, যে কারণে লোকেরা যা বলছে, যা করছে, সবই ভাল, সেরকম খারাপ অনেক কথাতেই, আমার কিছু যায় আসে না। আসলে, সবাই তো খুব ভাল ভাল কথাই বলছে, ভাল ভাল ভাল ভাল, আর আমার যেন অনেকটা সেই, টাকা মাটি মাটি টাকা, সব একাকার হয়ে গিয়েছে, মানে সব টাকা হয়ে গিয়েছে। টাকা তো খারাপ, যে কারণে বলে, অর্থই অনর্থ, টাকাকে যেন মাটি জ্ঞান করি, সবাই

তো তাই ভাল কথায় মাটি ছাটি করছে, আর টাকাটা কোন লকারে রাখছে যাছা-ধনেরা, সেটা তাদের ভলপেটের ঘুনসির চাবিটি ছাড়া, কোন ঠাকুর জানতে পারছে না।

কিন্তু একথা যাক, আমি নীতিশের কথা শুনতে পারিনি, বা নিজের থেকে শুনতেও চাইনি. আমার কোথায় একটা গোলমাল হয়ে যায়, যে কারণে, বন্ধুরা আমাকে টিটকারি দেয়। দিতেই পারে, যেহেতু কত কথাই তো আমরা বলাবলি করি, মেয়েদের শরীরের তলা-ওপর নিয়ে বিশদ আলোচনা, অভিজ্ঞতা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই, তবু আমি শুনতে চাইনি। আমার ভাল লাগে না, কী হয়, তা আমি বোঝাতে পারি না। সেটা যে একটা খারাপ লাগা কিছু, যেমন অনেক কিছুই খারাপ লাগে, তা না। তার চেয়ে অন্যরকম কিছু একটা হয় আমার মধ্যে—সেটা কোনরকম ঘৃণা বা ভয় কী না, বুঝতে পারি না। রঞ্জনের মায়ের সঙ্গে, মিহিরের কাহিনীও আমি শুনতে চাইনি। শুনতে চাইনি, ভাল লাগে নি, তথাপি, মিহিরের বেলায় আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, খাপছাড়াভাবে শোনবার একটা ইচ্ছাও হয়েছিল। আমি আমার, এ ধরনের মনোভাবের কোন অর্থ বুঝি না, এই না না করে জোরে ঘণ্টা বাজছে, অথচ কোথায় যেন হ্যাঁ হ্যাঁ করে টিক টিক করে চলছে। এরকম কথা শুনলে, আমার কোন বন্ধুই বিশ্বাস করবে না, ঘা তা খিস্তি করে উঠবে, ঘুঘু বা শালা বা খচ্চড় ইত্যাদি কোন গালাগালই না, আর বেশি কিছু বলবে, আর সত্যি বলতে কি এরকম মনের অবস্থায়, আমার নিজেকেই ন্যাকা বা উল্লুক বলতে ইচ্ছা করে। মিহিরের কথা শোনবার সময় আমার সেই রকমই হয়েছিল। আর ওর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, মাঝ বয়সী পুরুষেরা যেমন ছোট ছেলেদের ধরে নিজের কাজ—কাজ! এইরূপ কর্মকে যদি কাজ বলে, তবে অন্যান্য কর্মকে কী বলিতে হইবে—বরং নিজের হ্যামস্যানিটি মিটিয়ে নেয়—রঞ্জনের মাও যেন সেই রকমের। অনেকটা হোমোদের মত, হোমোসেক্সুয়াল যাদের বলে, রঞ্জনের মায়ের ব্যাপারটা সেই রকম আমার মনে হয়েছিল। একটি ছোকরাকে বেশ খাইয়ে দাইয়ে, আদর আপ্যায়ন করে, বেশ কৌশল করিয়া আপন অঙ্গ সেবায় প্ররোচিত ও রত করিয়া থাকে। এরকম ক্ষেত্রে, ঘতই মাথায় বয়েজকাট চুল থাকুক, রং-টং মাখা থাকুক, বগলের এ বয়সে যে রকম ভাঁজ পড়ে আর অস্বাভাবিক রংয়ের থ্যাতলানো মাংসের মত মনে হয়, এবং তার অঙ্গের বহু স্থলেই ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এই রূপ দেখিয়ে আর হেসে, ছেলের বয়সী ছেলেদের চোখে নেশা ধরানো যায় না। অবিশ্যি যদি কোন ছেলে নেহাত হাভাতে না হয়, মেয়ে তা সে যেমন হোক হলেই হল বা যে সব ছেলে—আমাদের বন্ধু অনাথের মত ছেলে যদি হয়, ছিপছিপে ফরসা পবিত্র মুখ অনাথ, মোটা কাঁচের চশমা চোখে, ফাঁপানো চুলগুলোও সিঁথি কাটা সুন্দর, কথা বলে মিনমিন করে, ভাব-সাব বেশ গম্ভীর, উহু ও একটা টেরর! আমাদের কোন বন্ধুই একটু বেশী গা ঘেঁষাঘেষি করে ওর সঙ্গে বসতে পারে না। ওর সঙ্গে এক বিছানায় রাত্রিবাস, সে তো ভয়ংকর ব্যাপার। অনাথের সে আর এক রূপ, সত্যি অনাথ, কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধরে, রীতিমত একটা ঘটনা করে ছেড়ে দেবে। এসব নিশ্চয়ই খুব ছেলেবেলা থেকে হোমোরুড়োদের শিকার হয়ে হয়ে এখন শিকার হওয়াতেই অনাথের সুখ। সেই রকম কোন ছেলে যদি, রঞ্জনের মায়ের বয়সী মহিলা না হলে প্রেমের—প্রেম! তার নেশা না ধরে, তাদের কথা আলাদা। তাদের কাছে তরুণী তন্বী যৌবন যুবতী, ও সব কোন ব্যাপারই নয়। আমাদের এক আত্মীয়ের কথা জানি, এখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ—তাঁর মাসীর বয়স পঞ্চাশ ঘাটের কাছাকাছি নিশ্চয়—কিন্তু বোন পো-টি চিরদিন মাসী-মার ঘাট আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলেন অথচ যাকে বলে সত্যি সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েও দেওয়া হয়েছিল, অপিচ সেই বয়রাম ঘুচিবার নহে, তাই সেই শিক্ষিতা সুন্দরীকে অন্যত্র নিজের ব্যবস্থা দেখতে হয়েছে। তা তিনি দেখতে গিয়ে, কিন্তু—

যাক গে, মিহির অবিশ্যি আমাকে বলেছিল, ও স্রেফ টাকার জন্যে রঞ্জনের মায়ের প্রেমিক হয়ে আছে। প্রায়ই নাকি বেশ কিছু টাকা পেটানো যাচ্ছে—টাকা—সেই জন্যেই কী জানি, আমি ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারি না, কিন্তু রঞ্জনের মা আমাকে, মনে মনে, কেমন যেন ডিসটার্ব করে। আমার ভাল লাগে নি এসব কথা শুনতে যদিও নীতিশের কথা বাদ, ও অনেকটা সত্যিকারের হাভাতের মতই, মিহিরের কথা শোনবার একটা কী রকম কৌতূহল ছিল আমার, অনিচ্ছায়, তবুও এবং আমার ভাল না লাগা ব মনে মনে যে এক ধরনের অস্বস্তি—তার চেয়ে বেশী, একটা অশান্তি, এ সবের মধ্যেই, সেই কৌতূহলের ব্যাপারটার কোন যোগাযোগ ছিল নাকি। জানি না। তবে এ বিষয়ে রঞ্জনের মনের কথাটা জানবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোনদিনই আমি জিজ্ঞেস করতে পারি নি, যদি চ রঞ্জনের দিকে তাকালে, একটা জিজ্ঞাসা বোধহয় আমার চোখে ফুটে ওঠে। আমার সেই চোখের দিকে, রঞ্জন কি আমার জিজ্ঞাসাটা পড়তে পারে। কেন না, আমার সেই চোখের দিকে তাকালেই, রঞ্জনের চোখের পাতা দুটো কেমন কুঁচকে যায়, আর রাগে ঘৃণায় যেমন চোখ জ্বলে ওঠে, সেই রকম জ্বলে ওঠে। তাতে, বরাবরই মনে হয়েছে, ওর সঙ্গে আমার কোথায় একটা ভিতরে ভিতরে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে। যে যুদ্ধের কী পরিণাম, জানি না। যেদিন ওর সঙ্গে আমার ফ্লিপটাইল পাঞ্জা হয়েছিল, চলতি কথায় ওটাকে হাতা লড়া বলে, সেদিন আসলে কথায় কথায় এমনি একটা বাজী হয়েছিল। হাতে হাত দিয়ে, ওর চোখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ সেই জিজ্ঞাসাটা যেন আমার চোখে জেগে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
দু'টি অনবদ্য প্রেম-উপখ্যানের আশ্চর্য গ্রন্থন
ধূসর দিগন্ত ৬·৫০
শিবরাম চক্রবর্তীর
মার্কটোয়েনের হাকলবেরি ফিন-এর জাতের কিশোর উপন্যাস
পথ থেকে হারিয়ে ২·৫০
অজাতশত্রুর
অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ও বিশ্বজনীন কল্পনাবোধে উজ্জ্বল বই
সোনালি রুপোলি মাছ ৪·০০
বীরু চট্টোপাধ্যায়ের
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা রুদ্ধশ্বাস গুপ্তচর কাহিনী
ফিয়র্ড দেশের মেয়ে ৪·৫০
প্যাপিরাস। ৯ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

উঠেছিল। রঞ্জনের চোখেও, রাগ আর ঘৃণা জ্বলে উঠেছিল। আমি শক্ত হবার জন্যে ঠোঁটে ঠোঁট টিপেছিলাম, আর রঞ্জন মুখটা ভয়ংকর করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হাসছিস?' আমি পাঞ্জার মধ্যেই অবাক হয়েছিলাম, বলেছিলাম, 'না তো।' ও আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি, কিন্তু হাসির কথা জিজ্ঞেস করেছিল কেন। আমার কি ঠোঁটটা বাঁকা দেখাচ্ছিল। দেখাতেও পারে অসম্ভব না. তবে আমার হাতটা যেন ও মড়মড় করে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চাইছিল। রোগা রোগা শরীরে, সেই কী বলে, ওর যেন দধিচীর হাড়। উহ, ইমপসিবল্। রঞ্জনের চোখে রাগ আর ঘৃণা, ও আমার ঠিক চোখের তারায় তারায় তাকিয়েছিল, ওর সাঁড়াশীর মত হাত থেকে যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা, কলকল করে নেমে এসে, আমার হাতটাকে অবশ করে দিচ্ছিল। আমি প্রাণপণ করে, দাঁতে দাঁত চেপে, প্রায় চোখ বুজে হাত সোজা রাখবার চেষ্টা করছিলাম। ওর মত আমার রাগ হয় নি, ও যেন একটা ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবার মত শেষ পর্যন্ত আমার হাতটাকে বেঁকিয়ে, কনুই শুদ্ধ মুচড়ে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তবু আমি কোন শব্দ করি নি। যে সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারাই বলে উঠেছিল, 'রঞ্জন ছেড়ে দে, ও হেরে গেছে।' তথাপি যেন রঞ্জনের ছাড়বার ইচ্ছা ছিল না, ও আমার হেরে যাওয়া যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে কেমন একটা সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। আমার মুখটা যে তখন কী বিশ্রী দেখতে হয়েছিল, তা আমিই জানি। রঞ্জন ঝটকা দিয়ে, এক টানে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল, ভেবেছিল ও হাত নরম করলেই যদি আমি আবার শক্ত করে চেপে ধরি। রঞ্জন ওর হাতটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়েছিল বা মাসেজ করেছিল, লেগেছিল তো ঠিকই, আর যেন গরগর করে বলেছিল, 'চল্ বীয়র খাওয়াবি।' অনাথ তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এসে, হাতটা ধরতে চাইছিল, মাসেজ করে দেবে বলে, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল 'ভাগ্ শালা বানচোত্।' শুনে সবাই হেসে উঠেছিল, আর অনাথ ওর সেই পবিত্র মুখটি নিয়েই, মোটা কাঁচের আড়ালে, যেন অনেকটা স্নেহশীল মায়ের মত আমার দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল 'দিস্ ইজ্ সিম্পলি বুর্জোয়া এনটারটেনমেন্ট। এ ধরনের বাজী...।' ওর কথা শেষ হবার আগেই, নীতিশ বলেছিল, 'লাও, অনাথিনী আবার কোথা থেকে বুর্জোয়া এনটারটেনমেন্ট নিয়ে এল।' বিপ্লব বলেছিল, 'একদিক অবিশ্যি ভেবে দেখতে গেলে...।' আমি আর ওদের কথায় কান দিই নি 'আসছি' বলে বাথরুমে চলে গিয়াছিলাম, আর হাত দুটো বগলে চেপে আস্তে আস্তে চাপ দিয়েছিলাম, যন্ত্রণায় আমার প্রায় কান্না পাচ্ছিল। তার পর রঞ্জনকে বীয়র খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, আমিও খেয়েছিলাম, অনাথ নীতিশ বিপ্লবও ছিল। রাত্রে, ঘরে ফিরে, আয়নার দিকে তাকিয়ে, রঞ্জনের মুখটা মনে করে, মনে মনে ফুঁসে উঠেছিলাম, 'শুয়োরের বাচ্ছা।' কিন্তু তারপরেই ভুরু কুঁচকে নিজের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলাম, 'তুই তো একটা কুত্তার বাচ্ছা।' ...অবিশ্যি, এই পাঞ্জা লড়ার জন্যে, রঞ্জনের সঙ্গে যে চোখে চোখে চেয়ে, ভিতরে ভিতরে একটা যেন ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল বলে আমার ধারণা, তার কোন নিষ্পত্তি হয়নি।

কিন্তু এখন—এখন আমার হাতটা, আঙুলগুলো ঠিক সেই রকম ব্যথা করছে কেন। যেন আঙুলগুলো কিছুতেই সোজা করতে পারছি না, বগলে চেপে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে, সোজা করে নেব নাকি। অসম্ভব। শীতের দিনের মত, বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে, বগলে হাতের তালু চাপা, এই দারুণ গরমে, পারব না। বুকটাই জ্বলে যাবে।

কিন্তু কেন, এত ব্যথা কিসের। হাতে দাঁতে সারা গায়ে। এত ব্যথা, অথচ কুস্তি তো লড়ি নি। তার সঙ্গে, নিশ্বাসের কষ্ট, যেন ফুসফুসে হাওয়া নেওয়া যাচ্ছে না। এমন কি, পাঁজরার কাছে আর তলপেটেও যেন ব্যথা করছে। সকাল থেকে কোন ব্যথাই ছিল না। এটা কি হঠাৎ হল। কখন থেকে হল, কিছুই মনে পড়ছে না। এখন এই যে সময়টা, রাস্তায়, এই ভয়ংকর গরগর করা জ্বলন্ত রোদে, এই মুহূর্তটা ছাড়া, আমার যেন পিছনে কিছুই নেই। আমি যেন শুধু মাত্র এই মুহূর্তেই আছি, এর পরের মুহূর্তের কথাও আমি কিছুই জানি না, বুঝতে পারছি না, একটা ট্যাকসি পাওয়ার কথা ছাড়া। পিছনের যা কিছু চিন্তা, সবই যেন বহু দিনের পুরনো, যেমন লোকে বলে, আগের জন্মের কথা, সেই রকম মনে হচ্ছে। দেখো বাবা, আবার জাতিস্মর না হয়ে যাই, এ দেশে আবার ওটা বড্ড হয়। কিন্তু আমি যেন এই মুহূর্তেই পৃথিবীতে, কলকাতার এই রাস্তাটায় এসে পড়লাম। এখন একটা ট্যাকসি, তা যতক্ষণ না আসছে, তখন এই দারুণ রোদে, পীচ টগবগানো রাস্তা বা গরম তাওয়ার মত ফুটপাতে আমি শুধু এই ব্যথাটাই বোধ করছি, এবং চোখে শুধু রোদ দেখছি, যে-রোদ আমার চোখে, আমার জামার ভিতর দিয়ে চামড়ায় ঢুকে জ্বলিয়ে দিচ্ছে।

কী আসছে একটা গোঁ গোঁ করে, ট্যাকসি। না, গোঁ গোঁ করে, শুয়োরের গোঁয়ের মত একটা লরি, তলতলে বুড়ো শরীরের চামড়ার মত পীচের রাস্তা দিয়ে একটা চ্যাটচ্যাট শব্দ করে চলে গেল। একটা ট্যাকসি, তা না হলে, আমাকে বোধ হয়—আচ্ছা, কোথা থেকে এলাম এখন। পাটা তুলতে পারলে, নিজের মুখেই একটা লাথি মারতাম। আমি ঠিক কিছুই মনে করতে পারছি না কেন। মুখে সেই দুর্গন্ধটা লাগছে। আমি গোটা মুখটাকে চুষে, গলার কাছ থেকে সব তুলে নিয়ে, ফুটপাতের ওপরে ফেললাম, আর আমার ঝাপসা চোখেই যেন মনে হল, থুথুতে খানিকটা রক্তও রয়েছে। পাইয়োরিয়া! থাইসিসের কথা আমার মনে আসে না। কেন না, থাইসিসের রক্তে থুথুতে ওরকম দুর্গন্ধ আছে কী না, আমার জানা নেই। পাইয়োরিয়াতে আছে জানি, আর রত্নার অভিশাপে—হ্যাঁ ও আমাকে নিশ্চয় মনে মনে অনেক অভিশাপ দিয়েছে, এবং অন্য সময় বিশ্বাস করি বা না করি, এ ক্ষেত্রে আমার মনে হবে, সেই পাইয়োরিয়াওয়ালীটার অভিশাপেই আমারও হয়েছে। পাইয়োরিয়া থাকলে দাঁত দিয়ে অনেক সময়েই রক্ত বেরোয়, আর সেই রক্তটাই পচে বোধ হয় পুঁজ হয়। কিন্তু, আমি তো এরকম রক্ত পড়তে দেখিনি দাঁত দিয়ে। মাঝে মধ্যে একেবারেই যে পড়ে না, তা নয়, খুব কম।

আবার থুথু ফেললাম, কপালে হাত রেখে চোখ ঢাকা দিয়ে ভাল করে দেখতে চাইলাম, হ্যাঁ রক্ত খানিকটা আছে। আবার আর এক জায়গায় ফেললাম, তেমন টের পাওয়া গেল না, গলাটাকে কাঠ করে দিয়ে, চুষে চুষে আবার ফেললাম, আবার একটু দেখা গেল, তারপরে এক ফোঁটা থুথুও আর মুখে নেই, এখন যে ফেলে দেখব, বরং এই দারুণ জঘন্য রোদে, গলাটা কাঠ হয়ে গিয়ে, কষ্ট হতে লাগল। ভয় পেলাম, যদি তৃষ্ণা লাগে, তা হলে, এই যে রাস্তা, দরজা জানালা বন্ধ বাড়ি, সব মিলিয়ে একটা ফার্নেস, এখানে কোথাও এক ফোঁটা জল পাব না। তার চেয়ে

একটা ট্যাকসি যদি—এ পথে কি ট্যাকসি নেই। বারণ আছে নাকি।

আমি ডান দিকের ভুরুর কাছে হাত দিলাম। কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল যেন, ওখানে কী রকম টনটনে ব্যথা করছে। মাঝে মাঝে আবার দপ দপ করে উঠছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার অর্ধেকটা মাথা ধরেছে, ব্যথাটা তারই। কিন্তু ব্যথাটা, ডান ভুরুর কোণ থেকে কোথাও নড়ছে না দেখে, হাত দিলাম। আর ঠিক মনে হল, বেশ একটা গোলগাল আবের মত লাগছে। আমার আবার ভুরুর ওপরে আব হল কবে। নাকি ফোঁড়া হয়েছে। আঙুল দিয়ে টিপতেই, আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এল, 'আক্!'

সত্যি, অসহ্য যন্ত্রণা। এ নিশ্চয় আব নয়, টিউমার জাতীয় যাকে বলে, যেগুলো অনেক সময় ক্যান্সারও হতে পারে। সে সব কিছুই নয়, বেশ বুঝতে পারছি, আমার কোনরকম আঘাত লেগেছে, তাই ফুলে উঠেছে। এটা আবার কখন হল, কিছুই মনে করতে পারছি না। মুরদাবাদ আমাকে, মুরদাবাদ শালা। কিন্তু সত্যি, কখন কোথায় লাগল, আমার মনেই পড়ছে না। আমাকে—। মুরদাবাদ! আমাকে—। মুরদাবাদ! ঠিক শ্লোগানের মত বলতে ইচ্ছা করছে আমার। হাত দিয়ে তো মনে হচ্ছে, এত ব্যথা যে, সদ্য সদ্যই লেগেছে, তাই ফুলে উঠেছে, জায়গাটা গরমও সেই রকম। কোথায় ঠুকে গেল, এই রাস্তার কোন পোস্টেই নাকি। মনে পড়ছে না। এখন তো ড্রিংকও করিনি—মদিরা পান যাহাকে বলে, তবে এ কিসের খোয়ারি ভাঙতে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

আমাকে ধরে কেউ মারধোর করেনি তো। কিসের শব্দ হল। আর ঠুন ঠুন ঠুন, একটা রিকশাওয়ালা। রিকশাওয়ালাটা মাথায় মুখে এমন করে গামছা বেঁধেছে, খালি ওর চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। বোধহয় গামছাটা ভেজানো, আর সেই চোখ দিয়ে আমার দিকে দু একবার দেখল। ভাড়া নেবার কোন ইচ্ছাই ওর নেই, সেটা বোঝা গেল, আসলে আমার দিকে তাকাবার উদ্দেশ্যে বোধহয় এই যে, পাছে আমি ওকে ডেকে ফেলি। এই ফাঁকা খালি রাস্তার ভয়ংকর রোদে, ওকে যেন মোটেই হাঁপিয়ে পড়া মনে হচ্ছে না, বরং গামছা দিয়ে মাথা মুখ ঢাকা, শুধু চোখ দুটো বের করে রাখায় ওকে কেমন নিষ্ঠুর, আর মুখোশ আঁটা শয়তানের মত দেখাচ্ছে। অথবা, ও যেন কেমন একটা রাগী আর সন্দেহের চোখে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখে গেল। এই সময়ে, ফুটপাতের ধারে, আমার দু তিন হাত দূরেই একটা কাক, কা কা করে ডেকে উঠল। বোধহয় কিছু একটা খাচ্ছিল, মরা ইঁদুর বা পচা কিছু। আমাকে দেখে, আমার দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল, ওড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে, ডাকতেই লাগল। ওই রিকশাওয়ালাটার মুখ, কালচে কালচে রিকশটা, কাকের ডেকে ওঠা, সব মিলিয়ে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হল। এরকম বেপরোয়া ভাব কেন রিকশাওয়ালাটার। আমি কিছুতেই রিকশায় উঠতাম না। অথচ এমন একটা ভাব যেন, ডাকলেও থামতো না। আসলে ও যেন রিকশাওয়ালাই নয়, রিকশওয়ালার ছদ্মবেশ মাত্র। তাতে আমার কী, ও যে-ই হোক। হ্যাঁ, ঠিকই, তবু একটা অস্বস্তি হল আমার। একটা ট্যাকসি, কোথাও কি—।

কপালটা সত্যি ব্যথা করছে! সত্যি আমাকে কেউ ধরে মারে নি তো। কিছুই মনে করতে পারছি না। এরকম ভাবে, ভুরু ফুলে যাওয়া মার একবারই আমাকে পুলিশ মেরেছিল কয়েক বছর আগে। অমন বেধড়ক মার আমাকে কেউ কখনো মারেনি, অবিশ্যি আমাকে একলা নয়, আরো কয়েকজন আমার সঙ্গে ছিল, একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে, যখন প্রথম উসকানিটা পুলিশের দিক থেকেই এসেছিল, কারণ, টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়েছিল ওরা। এস্‌প্লানেডের কাছাকাছি আসতেই, প্রথম কয়েকটা শব্দ হয়েছিল, আশেপাশের বড় বড় বাড়িগুলোর দেওয়ালে শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আর কে যেন আমাদের কাছাকাছি জায়গা থেকে চিৎকার করে উঠেছিল। 'ওরা ফায়ার করছে।' তখন আমি এতটা বুঝতাম না, কোনটা রাইফেলের শব্দ, কোনটা টিয়ার গ্যাসের

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে। যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল কারখানায় • সেন-র‍্যালের তৈরী

SEC-30 BENG

দূরের পথে ফটো ঃ অভিজিৎ দাশগুপ্ত

শব্দ, এখন যেমন বুঝি, এবং যদি চ প্রকান্ড বড় মিছিলটা সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমরা বেশ জোরের সঙ্গেই শ্লোগান দিচ্ছিলাম বা কখনো কখনো দিচ্ছিলাম না. দু চারটে অন্যান্য কথাও বলছিলাম, কিংবা অন্যান্য ছেলেদের কথাও কানে ঢুকছিল, 'মাইরি বলছি, দু পীস পাঁউরুটি ছাড়া কিছু খাই নি।'..... বা, 'দে না একটা সিগারেট, এটা নিয়ে তিনটে তোর পাওয়ানা হবে, পরে ফিরিয়ে দেব।...' আমিও সিগারেট খাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে, যেটা অনেকের অপছন্দ, মিছিলে সিগারেট খাওয়া—বিশেষ ছাত্র মিছিলে, বিপ্লবের তো খুবই অপছন্দ, যদি চ এর কোন অর্থ খুঁজে পাই না। যেন ভাবটা হচ্ছে, আমরা ছাত্র, আমরা তরুণ, আমাদের সকলের সামনে সিগারেট খেতে নেই, একটা ইয়ে—মানে ভব্যতা বলে কথা আছে তো। বাপের বয়সী কত লোকেরা রাস্তার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আহা, ইহাকে বলে প্রচলিত মূল্যবোধ! সে মূল্যবোধের মুণ্ডু উঁহারা আমরা সকলেই চিবাইতেছি, পথে ঘাটে সর্বত্র, হোটেলে রেস্তোরায়, সিনেমায়, অন্যান্য জায়গার কথা আর না-ই বললাম, তখন মিছিলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আমরা বড় সুবোধ বালক, থিগালেত্ খেতে থিকিনি। মুখে দুধের গন্ধ, যেন আমরা যা, আমরা আর তা নই, এখন আমরা মিছিলে সামিল হয়েছি। কেন, এটা নিশ্চয়ই কোনরকম অভিনয়ের ব্যাপার নয়, স্বাভাবিকভাবে আমরা যেরকম চলি ফিরি, সেরকম ভাবেই চললে ক্ষতি কী, তাতে আসল ব্যাপারটা নষ্ট হবার কিছু নেই। আবশ্যি, ওসব কথা কেউ-ই মানে না, যারা সিগারেট খায়, আর সিগারেটের নেশা ধরলে, খায় ঠিকই। হয় তো, ছাতা হাতে একজন পিতৃ-প্রতিম দর্শক তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে, আমাদের মনে মনে গালাগাল দেয়, 'বজ্জাত বখাটে ছেলের দল, লেখাপড়ার নামে নেই, চলেছেন এখন পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে, আর বাপের পয়সার ছেরাদ্দ! এর নাম আন্দোলন, সিগারেট টানতে টানতে চলেছেন.....।' সিগারেট খেতে না দেখলে হয়তো পিতৃপ্রতিমের, আহা, পিতার মতন, ব্যক্তিটির এত কথা মনে হত না। অনেকটা বিপ্লবের বাবার মতই বলতে হবে, এত যে 'বেশ বেশ, তোমরাই তো...' ছোটান, তিনি দেখলেও এরকম কথাই ভাবতেন। হয় উপদেশ না হয় নিষেধ, কিন্তু পিতৃপ্রতিম, আমরা আপনার ছেলে তো নই, নিজের ছেলে হলে না হয় একটা কথা ছিল, আসলে, আপনার নিজের ছেলেটির কথাই মনে পড়ছে, এবং সমস্ত তরুণবৃন্দ আপনার সন্তানবৎ, অতএব সেই অনুভূতিবশত একটি গভীর দায়িত্ববোধের যাতনায় আপনার চিত্ত ব্যথিত হইতেছে, মরিয়া যাই! ইহাই কি আপনার বিশ্বাস। সেই ব্যাথার চেহারাই বুঝি গোটা সমাজে আপনারা ফুটিয়ে তুলেছেন, আর আমরা সেই সমাজেরই ছেলেরা, সমাজের চেহারা দেখে, প্রকৃতই চমৎকৃত বোধ করিতেছি।...

যাই হোক, শ্লোগান ছাড়া, আমরা মাঝে মাঝে অন্যান্য কথাও বলছিলাম, সিগারেট খাচ্ছিলাম। একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে, আমরা ময়দানে যাচ্ছিলাম, এবং আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, আমরা যাবই, যদি চ, একটা সন্দেহ, সকলের মধ্যেই কম বেশী ছিল, পুলিশ আমাদের বাধা দিতে পারে, আর দিলে, সে বাধা আমরা মানবো না। কোন ভয়, আমাদের—আমার, মনে ছিল না, বেশ তরতরিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি যে কেন যাচ্ছিলাম, সেটা আমি যেন ঠিক জানতাম না। বন্ধুদের ভাষায় বলতে হয়, এ আবার আমার সেই, 'ফেরেব্-বাজী', আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বিপ্লবের মত কি আমার মনে কোন বিশ্বাস ছিল, যে সব নীতি বা তত্ত্বের কথা ওরা বলে, কিংবা রুদ্র যে সব কথা বলে— ও আবার বিপ্লবেরও বড় নেতা, রুদ্রনারায়ণ, আমার তো ওকে কেমন চালাক আর চালবাজ বলে মনে হয়, ও আবার বিপ্লবের মত ঠিক গম্ভীরভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে ভারী ভারী কথা বলে না, ও অনেকটা—কী বলব যেন একটা বিশেষ রোল্ অভিনয় করছে। হয় তো আমরা সবাই তাই করছি, এক এক সময় আমার তাই মনে হয়, কিন্তু সেটা জেনে শুনে করছি বলে মনে হয় না। নিজের ব্যবহারে, কথাবার্তায়, আচরণে, নিজেরই এক এক সময় এমন অদ্ভুত লাগে, তখন এই কথা মনে হয়। রুদ্র তা না, ও যেন একটা

রোমাঞ্চকর উপন্যাসের রোমান্টিক নায়কের মত, কপালের ওপর ঝাপানো চুল, তার ছায়া পড়ে চোখের ওপরে, জ্বলজ্বলে খুশি চতুর বেড়ালের মত, খুশি আর চতুর অন্য কোন জীব আমি দেখি নি, হয় তো তাদের মতও হতে পারে, সেইরকম খুশি জ্বল-জ্বলে চোখের ওপরে ছায়া। আর ফর্সা মুখটা সত্যি বেশ চোখা চোখা, রোখাবোখা ভাব- তো এমনিতেই আছে। দারুণ কথা বলতে পারে, ভীষণ তাড়াতাড়ি, কিন্তু প্রত্যেকটা কথার মধ্যেই যেন, কখনো চড়া, কখনো নরম সুর, ঝলকে ওঠে রাগে, আবার কষ্টে কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব, আর এমন সব কথা বলে, যেগুলো খুব ভাবনা চিন্তা না থাকলে বলা যায় না, যাকে বলে প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞান-সম্পন্ন, সেইরকম ছেলেই ওকে বলতে হয় বোধহয়, আর খুব পড়াশুনো আছে বলে মনে হয়। ওকে বোধ হয়, আমি ঈর্ষা করি না, এখন মনে হয় করতাম, কারণ ওর মত ছেলেকে ঈর্ষা করবার অনেক কারণ থাকতে পারে আমার মত ছেলের। রুদ্রর কোন গুণই—চেহারায় জ্ঞানে, আমার ছিল না, সেজন্যে ওকে মনে মনে ঈর্ষা করাটা আমার পক্ষে কোন আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। যে কারণে ওকে চালাক, চালবাজ ভাবতাম, কিন্তু এখন আর সে মনটা আমার নেই, আমার মনের মধ্যে এখন ও একটা গোলমাল লাগিয়ে দিয়েছে, যে কারণে আমি ঠিক করেছি, ওর সঙ্গে আমি একটা বোঝাপড়া করব, এবং আজ এখন সেই কথাটা আরো বেশী করে আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝা-পড়ার দরকার।

আমি সেই কয়েক বছর আগের কথাই বলছি, সেই মিছিলের সময়ের কথা, ওরা যেমন কতগুলো বিশ্বাসের কথা বলতো, সব কিছুর পিছনেই একটা কজ্—গ্রেট কজ্, পেট্রেয়টিক, রেভ্যালুশনারি, শিক্ষাক্ষেত্রের বিষয় পেরিয়ে, অন্য কোন রাজনৈতিক কারণের প্রতিবাদেও, আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, লড়ব, সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওদের মত ওরকম ভেবে যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তা নয়। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে তো কোন লাভ নেই, আমার কাছে ব্যাপারগুলো কোন দিনই ওভাবে আসে নি, আমার ভাবনা চিন্তাগুলো ঠিক ওরকম ছিল না বা নেইও। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে, আমি ছাড়ি না। যে কোন কারণেই হোক, ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি রাজী, কেন না, বেশ বুঝতে পারি, আমার ভিতরে একটা রাগের আগ্নেয়গিরি যেন রয়েছে, একটা ঘৃণার—কী বলব, প্রকাণ্ড সমুদ্রের মত ঘৃণা যেন আমার মধ্যে রয়েছে, আমার মনে হয়, না, ছাড়ব কেন, ঝাঁপিয়ে পড়ব, ভেংগেচুরে মেরে তছনছ করে দেব। তা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি, এরকম মনে হয় আমার, তা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি। একমাত্র এটাই তো করার থাকে শেষপর্যন্ত, এবং এক এক সময় মনে হয়; যারা নিজেদের মনে করে, তারা শিক্ষাক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ—শাসক, হ্যাঁ ভাইস চ্যান্সেলরদের 'ইউনিভার্সিটির উপযুক্ত শাসক' বলে উল্লেখ করতে দেখেছি আমি খবরের কাগজে, এইসব শাসক, রাষ্ট্রের শাসক, পরিবারের শাসক—পিতৃদেব বা আর কেউ, এক এক সময় মনে হয়, সবাই মিলে আমাকে যেন এদিকেই ঠেলে দেয়। আমি বিপ্লবদের মত অতশত বুঝি না। যেমন বিপ্লব ভাবে, ও নেতৃত্ব করছে, ও একটা কারণের জন্য লড়ছে, ও একটা খুব সিগনি-ফিকেন্ট ফিগার—একজন বিশিষ্ট ছেলে, আমি একটা উল্লুক, সেরকম কখনোই ঠিক ভাবতে পারি না। আমি কে, কিসেতেই বা আছি, আমাকে দিয়ে কার কী-ই বা প্রয়োজন। আমাকে না হলেও, সব কিছুই চলে যাবে, হয়ে যাবে, চলে যাচ্ছে এবং হয়েও যাচ্ছে। আমাকে কোন কিছুতেই কারুর দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু চলছে, চলেও যাবে। অথচ, কখনো আর, বাণীগুলো বিশ্বাস করলে মনে হবে, আমাকে ছাড়া চলবে না। এই যেমন বলে না, 'তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি, শুনলে এমন হাসি পায়, মনে হয় যে বলছে, তার জিভটা জিভ-ছোলা দিয়ে ছুলে দিয়ে আসি, তাতে যদি আসল কথাটা বেরোয়। ওরা যখন এ রকম করে বলে, তখন বোধহয় নিজেদের মুখ-গুলো দেখতে পায় না। এদের উচিত, যখনই

কিছু বলবে, এদের সামনে একটা আয়না রেখে দেওয়া। আমরা ভবিষ্যৎ, ওরা বর্তমানের যা কিছু, সব নিজেরা তাগড়ে নেব, এটা যে ওদের নিজেদের চাল চলনে যাকে বলে জীবনধারণে, সবকিছুতে ফুটে উঠছে সব সময়ে, সবখানে, এ বোধগুলো পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের মানুষ করার জন্য, কাপড় গুটিয়ে লেগেছে, যেভাবে পারে, ওদের নিজেদের মত, ওদের ভাবনার ছাঁচে আমাদের মানুষ করে ছাড়বে। আহা, হে পিতৃ পিতামহকুল, আপনারা সকল কিছুর ধারক এবং বাহক, আপনারা কর্তা, নেতা, আপনারা আমাদিগকে শাসন করিবেন, আমরা এখন শুধু শাসিত হইব। আপনারা কৃষ্টি শিল্প সাহিত্য কাব্য সকল কিছুর সমঝদার বিবেচক, উহাতে আমরা কেহ কিছু নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আপনাদিগের জ্ঞান তুলনারহিত, আপনারা যেভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে হুকুম করিবেন, বাধ্য করিবেন, আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে হইবে। অহো, কী অসীম কৃপা। ঈশ্বরানুভূতি আপনাদের হৃদয়গত, অতএব বাণী বিতরণ এবং আমরা আপনাদের সম্মুখে নিতান্ত অজ্ঞান পাপাত্মা ছাড়া কিছুই নহি। আপনারা নৈবেদ্যের মত কোপরি কলাটি—কলাটি অবিশ্যিই ঊর্ধ্বমুখী দন্ডায়মান, নিম্নের কুচো নৈবেদ্যরা আপনাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর নৈবেদ্যের থালার বাহিরে, মৃত্তিকায় যে সব অগণিত পিঁপড়া সকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছি। কিন্তু আপনাদের সকল কেচ্ছা কাহিনী আপনারা কিছুতেই গোপন রাখিতে পারিতেছেন না। সংবাদপত্রে পড়িতেছি, কখনো কখনো, সমাজের অভ্যন্তরে, তাজা রক্তের ভিতর দিয়া সিফিলিসের রক্তের মত আপনাদের চেহারাগুলি রক্তবর্ণ চাকা চাকা হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আপনারা কেহই অপরিচিত নহেন, আপনাদের হাতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, দল-বল এবং অর্থ-বল তাই আপনাদের অর্থ পিপাসা লালসা নহে, গুণীর গুণমুগ্ধ। হর্মতলে আপনাদের রমণীরমণ, মদ্যপান করিয়া রাত্রি, তাহা ঋষিদিগের সোমরস পানতুল্য, ফেরেববাজী দুর্নীতিমানের মহৎ কীর্তি। অদ্য দ্বিপ্রহরে যিনি, তাবত অধিবাসীদের জন্য নির্দেশ পালনের বিজ্ঞাপনটি সাঙ্গ করিয়া গেলেন রাত্রিশেষে সুরম্য হোটেলের বেয়ারাগণ তাহার বমনলাঞ্ছিত শরীরটি কোলা ব্যাঙ-এর মত পাঁজাকোলা করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। আহা, প্রথম রাত্রে যাহার—মধ্যে ইনি—দ্বারা মস্তভাবে প্রহার করিয়াছিলেন এই গতরে আর তাহা সম্ভব কী না জানি না, সেই মুখখানি আগামীকল্য আর স্মরণ করিতে পারিবেন না।

অহো অহো, চালাইয়া যান চালাইয়া যান। আমাদের জন্য নিষেধের প্রাচীর তুলিতে থাকুন, —পাপের ভয় দেখাইতে থাকুন, ভবিষ্যতের আশার আলো জ্বালিতে থাকুন, আর নিজেদের সবকিছু সামলাইতে থাকুন, তাহা হইলেই বৈতারিণী পার হইয়া যাইবেন। হুররা, হুররা—হুইস্ হুইস্—ইহা হিড়িক নহে, আপনাদিগকে সাধুবাদ জানাইতেছি, চালাইয়া যান, আমাদের সত্য বৈ মিথ্যা বলিতে নিষেধ করুন, সবাইকে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ হইতে বলুন—এ রকম লক্ষ লক্ষ হইলে সামলাইতে পারিবেন তো? সে কথা আসে কোথা হইতে, বলিয়া যাইতে হইবে, অতএব চালাইয়া যান, রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে বলুন, ঔর সিনেমা থিয়েটার ছোড়কে, গার্লফ্রেন্ড কো সাথ মিল না জুলনা ঘুমনা ছোড়কে, ঘর যাকে, গ্লাকো পাস খানা খাকে, বহিনকো সাথ আঁখমিচোলি খেলকে, টাট্টি পিসাব বাগেরা ফিরকে-হুসিয়ার, ঔর কিছু নহি, খাবার হো যায়ে গা, কিতাব লেকে পড়নে বৈঠ যাও, আয়াসা নির্দেশ দিজিয়ে।...জয়হিন্দ বন্দেমাতরম!

কিন্তু থাক গে, আমি এত বড় বড় কথা বলতে চাই না, বড় বড় মানুষের কথা তো বড় বড়ই হয়। তাই মনের মধ্যে কথাগুলো পর্যন্ত কেমন বড় বড় ভাবে আসে। এক এক সময়, যে কোন বড় ভাবের কথা হলেই, আমার মনে সাধুভাষা জেগে ওঠে, এমন কি যার নাম রাষ্ট্রভাষা, তাও, কিন্তু আমি যে কথা হলেই, আমার মনে সাধুভাষা জেগে ওঠে। এমন কি যার নাম রাষ্ট্রভাষা, তাও, কিন্তু আমি যে কথা ভাবছিলাম, আমি কে, কিসেতেই বা আছি, যাদের যা করবার, তারা তা করে যাচ্ছে, আমাকে কোন দরকারই নেই, যেন আমি কেউ নই, যে কারণে, এভাবে আমার বলতে ইচ্ছা করে, 'হেল্প' 'হ্যাণ্ড' 'ধুর স্সলা।' এ দেশে কী হচ্ছে আর কী না হচ্ছে, তাতে আমি একটা অচেনা—যাকে বলে অজ্ঞাত প্রাণী ছাড়া কিছুই না, অথচ আমি রয়েছি, পুরোপুরিই রয়েছি, এ কথাটা নিজে কখনোই ভুলতে পারি না। কেউ মনে না করতে পারে, শুধু কথার কথা ছাড়া, যে, আমার কোন রোল্—ভূমিকা কোথাও আছে, যে-কোন বিষয়েই, কিন্তু আমার নিজেকে সব সময়ে সবখানে বিঁধিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। অথচ তা পারি না, কেন না, ঝকঝকে নৈবেদ্যের থালার নিচে, সেই পিঁপড়ের মত তুচ্ছতা সব সময়েই যেন আমার পিছনে এঁকে রাখা হয়েছে, আমি নিজেও এ কথাটা ভুলতে পারি না। জানি না, আমার মনে হয়, বিপ্লবদের মনেও কোথাও এরকম একটা ভাবনা যেন কাজ করে চলেছে, ওর নাম থেকে তো সেটা আরো বেশী করে মনে হয়। ওর বাবাও বোধহয় এরকম ভাবে, নিকুচি করেছে মানে থাক বা না থাক্...। তবু এ কথাও ঠিক, বিপ্লব নিজেকে অন্যরকম ভাবে, মিহিরও তাই, যা-ই করুক রঞ্জনের মায়ের সঙ্গে বা আর অন্য কিছু, খুব সাহসী ছেলে, আর ভীষণ সীরিয়স্ও বটে, কিন্তু আমি নিজেকে ঠিক সেরকম ভাবতে পারি না, যে কারণে আমি একটা তুচ্ছ—ইন্সিগনিফিকেন্ট, এরকম একটা চিন্তা, যা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না, অথচ আমার ভিতরে সেটা ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। আমার অজান্তেই, সেটা আমাকেই বিঁধিয়ে রাখে, আর ঠিক এই জন্যেই কী না জানি না, একটা দাঁতে দাঁত পেষা রাগ, একটা ঘৃণা যেন আমার মধ্যে থৈ থৈ করছে, এবং যে কোন সময়েই, ভারী গম্ভীর বুলডগ মার্কা ভদ্রলোক দেখলেই, ঠোঁটের কোণে আলগা করে সিগারেট ধরে, বাঁ হাতে কাটি জ্বালিয়ে, ভক্ করে ধোঁয়া ছাড়, আহ্ বুলডগের মুখখানি দেখিয়া তখন একমাত্র বাথরুমে যাইতে ইচ্ছা করে, যেন এইমাত্র পৃথিবীর, আপন সন্তানাদিগের রসাতল গমন প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্রোধে আত্মহারা হইয়া স্বরিতে গমন করিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার বাবার কাছেই বা আমি কে। পুত্র! ঠিক আছে, সম্ভবত সে বিষয়ে আপাতত কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ওঁর কিসেতে আছি, উনিই বা আমার কিসেতে আছেন। উনি আমাকে খাওয়ান, পরান, বেশ ভাল ভাবেই—কেন না বড়লোক বলতে যা বোঝায়, পিতা তাহাই, কী জঘন্য রকমের টাকা করেছেন ভদ্রলোক, আর কী—কী বীভৎস রকমের ব্যস্ত-ভয়ংকর রকমের উদ্বিগ্ন-নার্ভাস টেনশন—সবই টাকার জন্য যেন এই গেল, এই গেল ভাব, যেন কেউ থাবা দিয়ে নিয়ে নেবে, মাঝ পথে ছিনিয়ে নেবে, আমি তো যেন বরাবর এই রকমই দেখে এলাম। একটা মস্তবড় চাকরি করেন, সকাল থেকে রাত্রি অবধি, ক্ষমতা প্রচুর, হয় তো বিস্তর ক্যাশ আমদানির ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু ওঁর জীবন, কাজ, কোন কিছুর সঙ্গেই আমার কোন যোগাযোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী থাকতেও নেই, আমি যাহাই করি, তোমাকে দেখিতে হইবে না, তুমি তোমার কর্ম করিয়া যাও—এইরকম ভাব। এবং তিনি আমার প্রতি কর্তব্যে কোথাও একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই, যতটা ভালভাবে সম্ভব হস্টেলে রেখে, খাইয়ে পরিয়ে, অনেক খরচ-খরচা করে, যাকে বলে মানুষ করবার চেষ্টা করছেন। আমার আরো পাঁচটা ভাই থাকলে তাদেরও করতেন, দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, খুব ভাল বিয়ে দিয়েছেন, প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, দিদিও গুটি চারেক প্রেম, একটা বিয়েন বসিয়ে, বিস্তর মালপত্র নগদ টাকাসহ একটি থলথলে গেজেটেড অফিসারের সাত পাক ঘুরে খুশি হয়ে বিদায় নিয়েছে। দিদি মানে, আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়, বাবার মত দেখতে —বাবা তো দেখতে বেশ সুপুরুষ—মানে সুন্দর। এককালে বেশ ভালই ছিলেন দেখতে, সেই চেহারাটা আমার এখনো মনে আছে, এখন যেমন বাবার মুখটা আমার মনেই পড়ে না, ভদ্রলোক দেখতে যে কেমন, সেটা প্রায় অস্পষ্ট আপসা হয়ে গিয়েছে আমার কাছে, কেবল একটা ফর্সা কপালে কতগুলো রেখা, যে রেখাগুলোতে কেবল যেন দুশ্চিন্তা আঁকা, আর দুটো চোখ, সে-চোখে একটা হন্যে ভাব, একটা ভয়—যেন একটা উদ্বেগ, তাতে একটা লোকের সুন্দর মুখ যে কী রকম বদলে যেতে পারে, বাবা তার প্রমাণ। হয় তো ওঁর চাকরি বা দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি কোন কিছুতে একটা ভীষণ গোলমাল আছে। কিংবা জানি না, এ বয়সে কোথাও প্রেম করে মরেছেন কী না—তবে যতদূর মনে হয়, চাকরির ব্যাপারেই একটা কিছু গোলমাল, বা সেটা গোলমালই নয়, চাকরিটাই এই রকম, যার পিছনে সর্বস্ব

দিয়ে তিনি কী হারাইতে ছিলেন, তিনি জানিতেন না, কিন্তু আমি যেন একটু একটু জানতাম, অথবা সে হারানোটা ওঁর কাছে কিছুই না, ওটা কোন হারানোই নয়, তার বদলে উনি যা পাচ্ছিলেন, পাচ্ছেন, সেটাই হয় তো অনেক বড়। এ-কথাগুলো ভেবে, মাঝে মাঝে বাবার ওপর রাগ হত এক সময়ে, কিন্তু কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে, ওঁর স্ত্রী বা কন্যা বা পুত্রের বিষয়ে, উনি যা ভাল বুঝবেন করবেন, আর স্ত্রীকন্যা পুত্রেরা নিজের নিজের মত চলুক।

আমি সে কথাই ভাবি, ওঁর কাছেও আমি এক 'ছেলে' মাত্র, যাকে খরচ করে, খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হচ্ছে, আর আমি খেয়ে পরে, ন্যাকা-পড়া যা করছি সে তো আমি জানিই, মানুষও কেমন হচ্ছি, তাও—কী বলে ওটাকে—হ্যাঁ আমার 'অন্তর্যামী'-ই জানেন। এ-ছাড়া আর আমি ওঁর কিসেতে আছি। কিছুতেই নেই, উনিও তা চান না বা ভাবেন না, আমি একটা তুচ্ছ ছেলে মাত্র, যার সঙ্গে ওঁর একটা কর্তব্যের সম্পর্ক মাত্র, ওঁর কোন সুখ-দুঃখের ভাগ আমাকে কখনো কিছু দেন নি, 'খোকা দেখ, এ বিষয়টা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে, কী করা যায়' এ-রকম কিছু কোন-দিন বলেন নি, আমার তো বলবার কিছুই নেই, থাকতেও পারে না, একমাত্র টাকা-পয়সা বা কোন রকম সুবিধা অসুবিধা, তার জন্য ওঁকে কিছু বলবার দরকার হয় না। উনি একজন ভদ্রলোক, নিজের ব্যাপার নিয়ে জড়িয়ে আছেন, ঘটনাচক্রে আমি ওঁর ছেলে—কথাটা যেন কেমন শোনাচ্ছে, কিন্তু এটা তো একটা ঘটনাই, হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে, একটা ঘটনা, আমাকে উনি এই ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন। কত সহজ, যেন টপ্ করে একটি ফুচকা মুখে ফেলে দিলেন, অথবা একটি ঢেকুর তুললেন, বমন বা উদ্গার জাতীয় ব্যাপারই তো সেটা। হে মহারাজ, অপরাধী জানিল না, কী বা তার অপরাধ, কী কারণে ধরাধামে আবির্ভাব তার, পিতা আনয়ন করিলেন, এখন কেহ কাহারো নহি, কর্তব্যের একটি সেতু ব্যতিরেকে। হ্যাঁ জানি, হয় তো অনেক কিছু টাকা-পয়সা সম্পত্তি তিনি আমার জন্যে রেখে যাবেন এবং সেটা ভোগ করবার সময়ে বাবার কথা যে সন্তানেরা কত ভাবে, তা আমার মত খারাপ ছাড়া, ভাল ছেলেদের বেলায়ও তো দেখছি। সুতরাং সেটা কোন কথা নয়, আসলে আমি ওঁর কিছুতেই নেই, মূলে আমি কোন একটা ফ্যাক্টার নই। তারপরে, দিদি অর্পিতার—সুন্দর নাম, চরিত্রের সঙ্গেও খুব মিল, একটা তলতলে তরল পদার্থের মত, অর্পণ করেই আছে—অর্পিতা—সমর্পিতা নাম রাখলে কেমন হত। এখনো আমি ভুলতে পারি না সুশীলদার কথা, সামান্য কেরানী বটে, বাবার অফিসের অধস্তন কর্মচারী, তার সঙ্গে কে তোকে প্রেম করতে বলেছিল, কে তোকে হৃদয় সমর্পণ করে, পেরেম করে ওর মাথাটা খেতে বলেছিল। লোকটাকে চাকরি ছাড়তে হল, এমনই অপরাধ যে, শেষ পর্যন্ত কলকাতা পর্যন্ত ছেড়ে যেতে হল, আঁ এত বড় সাহস, সে অর্পিতার প্রেমিক হয়েছে। তাও পাণিপ্রার্থনা করিবার সাহস করে নাই, নিতান্ত অর্পিতার হামসানি মেটাতেই লোকটিকে প্রেমিক হতে হয়েছিল মনে মনে হয় তো একটু আশাও করেছিল নিশ্চয়ই অর্পিতাই সে আশা দিয়েছিল, আমি তো নিজের চোখেই সব দেখেছি। তারপরে নীল-কান্তবাবু, অধ্যাপক মানুষ, দিদিটি আমার তাকেও জব্জিয়েছে—কিন্তু একজন মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে কখনো অর্পিতার বিয়ে হতে পারে, অ্যারিস্টোক্রাসি, গ্র্যাঞ্জার বলে একটা কথা আছে। সত্যি, আমারই দিদি, কত রূপেই দেখলাম ওকে, শেষ পর্যন্ত একটা মার খেয়েছিল সেই টমেটম মার্কা রমেনের কাছে, ফিল্মের হিরো হবার স্বপ্ন দেখত সে গাড়লটা, সারাদিন সেজেও থাকত সেই রকম। তার কাছে দিদিটি আমার একেবারে চিত্তির। ছোট্ ছোট্ তাড়াতাড়ি নার্সিং-হোমে, জল্‌দি জল্‌দি ইভাকুয়েট কর, না খসালে উপায় নেই। বেচারি সুশীলদা, বেচারি মাস্টারমশাই, রমেনকেও বেচারিই বলতে হবে, কারণ তারপরেও অর্পিতা আবার একজনের কাছে অর্পণ করেছিল, কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারেনি, গেজেটেড অফিসারটি এসে পড়েছিল। গেজেটেড অফিসার। আহ্, যে ভাবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল অর্পিতাকে, একটি সুন্দরী কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিয়া, বর চলিল বীরদর্পে। সঙ্গে প্রচুর খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, ফ্রিজ, সোনার তো কথাই নেই। পুরুষরা বোধহয় কিছু বুঝতে পারে না, ওই যে কী সব সতীত্ব টতীত্ব বলে, সেটা কি শরীরের মধ্যে শরীর দিয়ে বোঝা যায়। যায় না নিশ্চয়ই। আমি তো কোনদিন বুঝতে পারি নি। বেশ্যার সঙ্গেও যেরকম মনে হয়েছে, রীনাকে বা অদিতিকে বা বেবীকে বা লতিকাকে বা লতিকার দিদি মল্লিকা—যার বয়স আমার থেকে কম করে সাত-আট বছর বেশী, কাউকেই তো আমি আলাদা করে কিছু বুঝতে পারিনি। একমাত্র রত্নার সঙ্গেই কিছু হয়ে ওঠেনি, দাঁতের গোল-মালে সব পয়মাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেশ্যা ছাড়া, আর সকলেই তো আমার কাছে সতীই ছিল, মানে, আর কাহারো সঙ্গে এই সকল ললনারা শয়ন রমণ কিছু করে নাই, যা করেছে তা নিতান্তই অঙ্গ সেবা, এবং শুধু আমার সঙ্গেই যা করবার করেছে। ছেলেদের কি বোঝা যায় নাকি, মেয়েরা কি বুঝতে পারে, ছেলেরা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মিশলে। মিশলে! তার মানে কী, মিললে বোধহয়। আমার মনে হয়, এসব কিছুই বোঝা যায় না। আচ্ছা, যদি এমন কোন ওষুধ আবিষ্কার করা হয়, যেটা ব্যব-হার করলে, কেউ আগে কোথাও কিছু করেছে কি না জানাজানি হয়ে যাবে, তা হলে কেমন হত। কিছুই হত না, এমনিতেই ছাড়াছাড়ি খেয়োখেয়ি, তার ওপরে মারদাঙ্গা লেগে যেত। দোহাই বাবা, কোন বৈজ্ঞানিক যেন সমাজের এমন অকল্যাণ না করে। কী দরকার বাবা, বেশ তো নিজেদের মধ্যে সবই জানাজানি আছে, মনে মনে সবাই সব কিছু বোঝে, আমাকে ওরা বোঝে, আমিও ওদের বুঝি, পান্‌সি ভাসিয়া যাউক, সতীত্ব দেহের ভিতরে বিরাজ করিতে থাকুক।

সেই কথাই ভাবছি, দিদির সঙ্গে আমার কিছু নেই, একটা 'ভাই' মাত্র, আমার কিছুতে ও নেই, আমিও ওর কিছুতে নেই, এমন কখনো মনে হয় না, আমি ওর কাছে কিছু, যাতে আমি মনে করতে পারি, আমাকে ওর দরকার এই ভেবে আমি নিজেকে তবু তুচ্ছের বেশী কিছু মনে করতে পারলাম। আর আমার মা—আহ্, কী অসহ্য রোদ—আর আমার মা—আহ্, পেভমেন্টটা যেন জ্বলছে, শাদা সিমেন্ট করা পেভমেন্ট, পীচের রাস্তা, সবকিছু জ্বলছে কাঁপছে, আর এখন কেমন একটা ড্রাগনের আগুন ঝরানো নিশ্বাসের মত এক একটা দমক হাওয়া আসছে। মায়ের কথা আমি মনে করতে পারছি না, আমার সারা গায়ে একটা ব্যথা, হাঁটুর ডানায়, বুকে, তলপেটের কাছে, হাতের আঙুলগুলোতে, যে কারণে, এখনো আমি আঙুলগুলোকে সোজা করতে পারছি না, আর মাড়িতে দাঁতে ব্যথা, দাঁতের গোড়ায়, আর সেই দুর্গন্ধটা, আমি চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, গলাটা শুকনো, একটা ট্যাক্সি—আচ্ছা ট্যাক্সিওয়ালাদের কি আজ স্ট্রাইক আছে, মনে করতে পারছি না, এমন কিছু তো শুনিনি। কাছে পিঠে, কোথাও একটা মানুষ নেই, কাকটাকে ছাড়িয়ে এসেছি, বাসের স্টপটা ছাড়িয়ে এসেছি, সেই রিকশওয়ালাটাকে—যাকে আমার

কথামির সাগর

গল্প বলার আসর

- গল্প গান, আঁকা, লেখা, অভিনয়ে শিশুমনের ইচ্ছাপূরণ—
- বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা এই আসরে গল্প বলে থাকেন।
- সাত থেকে সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা ছ' টাকা।

প্রঃ কেন্দ্র :

১৮।১এ, জামির লেন। কলিকাতা-১৯
ফোন—৪৭-৬৪৫১

- শনিবার বিকাল ৫—৬টা পর্যন্ত এবং রবিবার সকাল ৮—১০টা পর্যন্ত অফিসে সদস্য হবার আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদক দিব্য বসু
(রেজিস্টার্ড)

ছদ্মবেশী অন্য কেউ বলে মনে হয়েছে, তাকেও আর এখন দেখতে পাচ্ছি না। আমার এখন এ রাস্তাটাকে ভয় করছে। সত্যি সত্যি আমি পৃথিবীর কোন জীবিতদের এলাকার মধ্যেই আছি তো। রাস্তার ওপরে সব বাড়িগুলোর প্রত্যেকটি দরজা জানালা বন্ধ, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। হ্যাঁ, আর আমার মা—তাকে আমি মনে করতে পারি না এখন, তবে বাবা দিদির মত, মার কাছেও আমি কিছু না। সেই একটা 'ছেলে' যায় পরে পড়ে, তার জন্যে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই, আমাকে দিয়ে তার কোন দরকার নেই। মার নিজেরও বোধ হয় মনে নেই, কবে আমাকে একদিন জন্ম দিয়েছিল, কবে আমাকে একদিন কোলে করে আদর করেছিল, কেন না, সে রকম ছোট থাকলে, সব বাচ্চারাই যেমন মায়ের কোলে চেপে, আদর খেতে খেতে খুশি হয়ে হাসে, আর কেমন একটা, কী বলব—গর্বিত, হ্যাঁ গর্বিতভাব ফুটে ওঠে, যেন সে একটা কিছু, আমি আর এখন সেরকম মনে করতে পারি না। একটা ফরেন লিপস্টিক, একটা শাড়ি, একটা জামা—যে সব আমায় মায়ের চলতে ফিরতে সব সময়ে কাছে কাছে গায়ে গায়ে আছে, তার যা কদর, আমার তাও নেই, কেন না, আমি মাকে সাজাই না, সুন্দর করি না বা আমি মিস্টার লাহিড়ি, কিংবা নিরঞ্জন দেব, যারা মায়ের পুরুষ বন্ধু, তাদের কারুর মতই 'বিশেষ' কেউ না। মা! বললেই লোকে কী রকম গদগদ হয়ে ওঠে, অথচ মায়ের নির্যাতনও কম দেখিনি। আমাদের জুনিয়র প্রফেসর ছিলেন ভূজঙ্গবাবু। তাঁর মা এমন কি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, ছেলে তাঁকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আমি শুনেছি, আমার ঠাকুরমাকে, আমার মা, বরাবর কাশীতে রেখে দিয়েছিল, কোনদিন কলকাতায় আসতে দেয়নি এবং ঠাকুরমা কাশীতেই মরেছিল, অথচ ঠাকুরমা কলকাতায় আসার জন্য চিরদিন কান্নাকাটি করেছে, আসতে পারেনি, কারণ মা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, ঠাকুরমা যে বাড়িতে থাকবে, সে বাড়িতে মা থাকবে না। জানি না, এর মধ্যে কী গোলমাল ছিল, কেন ঠাকুরমাকে মরা পর্যন্ত কাশীতেই, যাকে বলে 'নির্বাসন' দেওয়া হয়েছিল বা ভূজঙ্গবাবু কেন তাঁর মাকে পদাঘাতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। মা মা বলে লোকে এত গদগদ হয়, অথচ মা কালী ছাড়া বাছাধনদের ভয়ভক্তি কোন মায়ের ওপর আছে বলে তো বিশেষ দেখতে পাই না। মাকে ভক্তি না করি বা না ভালবাসি, কিন্তু যাবা, আমরা এমন মানুষ যে, 'মা' শুনলেই লোম খাড়া হয়ে ওঠে, মা মাগো। বলহরি হরি বোল্!...

মাকে আমি মনে করতে পারছি না এখন, শুধু এই একটা কথা খেয়াল আছে, বিয়াল্লিশ বছরের এক নারী, মুখে তার নানা কারুকাজ, চক্ষে অঞ্জন, ওষ্ঠে রঞ্জন ইত্যাদি, কিন্তু সেই একই কথা, মা তার নিজেকে নিয়ে থাকে, আমাকে দিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই, হ্যাঁ 'ছেলে' একজন, যদি চ নিজেকে বিশেষ কিছু ভাবতে পারি, সেরকম কিছু নই, আর মাও আমার কাছে তা-ই। তা-ই কী। আমি ঠিক জানি না বা বুঝি না, মোটের ওপর—।

আমি তুচ্ছ, আমি, কী বলব, একটা ইনসিগনিফিকান্ট ছেলে, কোন কিছুতেই আমি নেই। কোন মেয়ের কাছেও না, আমি অনেকের প্রেমিক, আমার পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করি, প্রেমিক। প্যান্টের বোতাম খুললে আর নারীর অন্তর্বাস সকল উন্মোচন করিলেই, প্রেমিক প্রেমিকা হওয়া যায় নাকি। তা হলে আমি প্রেমিক, আর ওরা আমার প্রেমিকা। আহা, লহ হালুয়া লহ হালুয়া—আচ্ছা হালুয়া জিনিষটা কী, আর লে হালুয়া মানেই বা কী। সুজি রান্নাই যদি হালুয়া হয়, তার আবার নেওয়া নেয়ির কী আছে। যাক গে, কিছু মেয়ের সঙ্গে আমি শুয়েছি। শুয়েছি! শয়ন করিয়াছি, আহা কী শ্রুতিমধুর। এক কথাতেই বেবাক ফাঁস, তারপরে আর যা বল, তা-ই বল, কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি জানি, ওরা সব জাত প্রেমিকা, যেমন বলে, জাত গায়ক, জাত সাহিত্যিক, গান সাহিত্য ছাড়া তারা থাকতে পারে না, জাত প্রেমিকাও তেমনি। যেমন আমি একজন জাত প্রেমিক। প্রেম প্রেম প্রেম ছাড়া কি থাকা যায়। এ চলে যায় তো, ও আসুক, ও যায় তো সে আসুক, আসতে থাকুক, যেতে থাকুক, লে লে বাবু ছে' আনা। কিন্তু আমার জন্যে কোন মেয়ে মরেও না বাঁচেও না, চাঁদের মত অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ কেউ কারুরই তুলতে পারে না, কোন মেয়ের জন্য, আমি নিজেক কখনো এমন ভাবতে পারি না, আমাকে না দেখতে পেলে ও থাকতে পারে না, আমি যখন ওর কাছে নেই, তখন ও আমার কথা ভাবে, আমি উহার দয়িত। দয়িত—অহো কী অপূর্ব, শ্রীকান্তবাবুর কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি যখন আমাদের সংস্কৃত কাব্য পড়ান, তখন প্রেমের কথা কেমন টেনে টেনে, মধু রোস্সবরে বলেন, যেন দারুণ দ্বিপ্রহরে বরফের কুচি ছড়ানো 'ব্রাডি মেরির' পাত্তরে ঠোঁট ডুবিয়ে চুক চুক করে গলা ভেজানোর আরামের মত, যেন উনি নিজেই সেই প্রেমের মধ্যে ডুবে যান, ভদ্রলোক ইচ্ছা করলে ভাল পাঠকতাও করতে পারতেন, ও'র সেই পড়ানোর ভঙ্গিতে আমার মনে পড়ছে, 'হে স্বামিন্ হে আমার পরম দয়িত'—এমনটি আমি কোন মেয়ের ব্যাপারেই নিজেকে ভাবতে পারি নি, আর এর পাল্টা ওদের কাউকেই আমি ভাবতে পারি না, কেন না, প্রেজেনটেশন, এয়ার-কনডিশনড হোটেল রেঁস্তোরায় খাওয়া, সিনেমা দেখা, লুকিয়ে ক্যাবারেতে যাওয়া—বাড়ি থেকে লুকিয়ে ক্যাবারেতে যাওয়া আর কটা মেয়ের পক্ষেই বা সম্ভব, কন্যা তো এদিকে অক্ষতযোনি থাকিয়া যাইতেছে, অহো, থাকিয়া যাউক ঈশ্বর করুন, এসব ব্যাপারগুলো আমার একচেটিয়া নয়, আরো সকলেরই আছে এবং আমার থেকে আমার অনেক বন্ধুরা, অনেক ছেলেরা, অনেক বেশী মাত্রায় পুরুষ, রোমান্টিক, আমি সেই তুলনায় একটি জিরাফের বলদ। অথচ এই তেইশ বছর বয়সে, আমার অন্তরের মধ্যে যাতনা উপস্থিত হইয়া বারে বারে অনুরণিত হইতে থাকে, কেন ভালবাসিতে পারিলাম না, আমার বড় ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করে, কেহ যদি আমাকে প্রকৃতই ভালবাসিত, যাহার জন্য সব কিছু তুচ্ছ ভাবিতে পারিতাম, জীবনে মরণে যাহাকে লইয়া বিশ্বসংসারের সকল কিছুকে জয় করিয়া লইয়াছি ভাবিতে পারিতাম, গলদ-ঘর্ম হইয়া তাহার জন্য জগতসংসারের এপার ওপার করিতে পারিতাম। হায়, তবে নিজেকে লইয়া গৌরব বোধ করিতে পারিতাম। হায়, রবীন্দ্রনাথের সেইসব প্রেম পবিত্র হৃদয় নায়িকাদের কাহারো সঙ্গে আমার কেন সাক্ষাত ঘটে না, শরৎচন্দ্রের বৌদি দিদিরা কেহ আমাকে কেন একবার দেখা দেয় না, সীতা সাবিত্রীর দেশের সন্তান হইয়া, এমন অন্ধ হইয়া রহিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের কথা বাদই দিলাম, ভ্রমর কুন্দনন্দিনী রজনী কোথায় মিলিবে, যদি রূপান্তরে আদর্শ হিন্দু হোটেলের সেই পাচিকাকেও পাইতাম, বা চরিত্রহীনের মেসের ঝি সাবিত্রী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়িকাদিগকে বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না, উহারা থাকুক, তারাশঙ্করের চিত্তের শক্তিতে শক্তিরূপিণী কোন নায়িকাকেও যদি পাইতাম, তবে তাহাদের পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতাম, কিন্তু তার বদলে আমি দেখছি, ছাপা ভয়েলের ঢেউ রীনার উরুতে আর দাবনায়, আমি ওর দুই উরুতের মাঝখানে মরে আছি, আমি দেখছি, বেবীর সারা গায়ে কাপড়চোপড় নেই, ও আমাকে এক মিনিটের টুইস্ট দেখাচ্ছে, আমি সেই আদিম বেশে ক্ষিপ্ত শরীরে—কী বলব, অনেকটা জাদুকরের দ্বারা সম্মোহিতের মত দুলছি, লতিকার নিচে আমার হাত, ও লাল মুখে, জবজবে ঠোঁটে রোস্টেড মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছে.....।

আমি কারুর কোন কিছুতেই নেই, আমি সব কিছুতেই একটা তুচ্ছ ব্যাপার, আমি বিপ্লবদের মত ভাবতে পারি না, কিন্তু ওদের কাছে আমি কিছু। হ্যাঁ, ওর চোখের আগুন, আমার ভিতরের রাগকে এমনভাবে উস্কে তোলে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকি আমি, ঘৃণা উথলে উথলে উঠতে থাকে, যেখানে যেভাবে হোক, আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজী, ভেঙে তছনছ করে দিতে চাই। শাসক—তারা যে কোন বিষয়ের হোক, আমি সব সময়ে তাদের সঙ্গে লড়ে যেতে রাজী আছি, কেবল নিষেধের বিজ্ঞাপন লটকানো, এগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাই, আমার চারপাশে যা কিছু আছে, যা কিছু চলছে, তার কোনটাই আমার সহ্য হয় না, আর এ সবের যারা অভিভাবক করে, তাদের চোখ মেরে একটা সিগারেট অফার করতে পারি, কিন্তু তখন যেন আমার কোন গার্লফ্রেন্ড বগলদাবায় থাকে।...হ্যাঁ, ব্যাথাটা, সেই কথা, আমরা তখন সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, মেয়েরা সামনের দিকে

ছিল, তার মধ্যে কেউ কেউ পেছিয়ে এসেছিল, পালাবার জন্য নয়, ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। স্লোগান, গল্প সিগারেট খাওয়া, অবিশ্যি দেওয়ালে সিনেমার বড় বড় পোস্টারগুলোর ন্যাংটা ছবিগুলোর দিকে চোখ পড়ছিল ঠিকই, আমার পাশ থেকে কে যেন বলেছিল, 'আজ ইভিনিং শো-টা মারতে হবে, বাম্বাই বাঁচিয়ে রেখেছে'. 'কেন ব্রিজিতের খেটা চলছে, কাগজে পিকাসোর আঁকা সেই অদ্ভুত ছবিটাও বেরিয়েছে—ব্রিজিত...।' অন্যদিকে এবং সামনে পিছনে, চারদিকের বাড়িগুলো কাঁপিয়ে বাজছিল, 'মানবো না, মানবো না।'...'ডকটর করের লেকচার ছিল' 'অথেন্ট হয়েছে, দুবার তো গান্ধু মেরেছ বাবা' 'স্বৈরাচারীর স্বৈরাচার—নিপাত যাক নিপাত যাক।' মনে হয়েছিল, আমরা খুব স্বাভাবিক রয়েছি, হাসছি, কথা বলছি, যাকে বলে নির্ভয় আর আমাদের মুখগুলো বোধহয় জ্বলছিল, আর এসপ্লানেড-ধর্মতলার মোড়ের ডাইনে বাঁক নেবার পরেই, আমাদের থেমে যেতে হয়েছিল। স্লোগান চলছিল, ঠাসাঠাসি লাগছিল, দুম্ করে শব্দ হয়েছিল। 'গুলি! গুলি ছুঁড়ছে ওরা।' আমার তখন মনে হয়েছিল, নদীতে যখন বান আসে, কোনদিন চোখে দেখি নি, আমার মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা বোধহয় এইরকমই যে, নদীটা দু পাশ ছাপিয়ে সব ভাসিয়ে দিচ্ছে, না, ভাসিয়ে দেবার জন্য ফুলছে, ফেঁপে উঠছে, এইবার ভেসে ছড়িয়ে যাবে, আমাদের অবস্থা যেন অনেকটা সেইরকম হয়ে উঠেছিল। কারা যেন চিৎকার করেছিল, 'গুলি না, টিয়ার গ্যাসিং করছে।' বিপ্লবকে ছুটোছুটি করতে দেখেছিলাম, রুদ্রকেও—কিন্তু ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে, ওকে আমি ছাড়ব না, তবে, তখন রুদ্র ঠিক আজকের রুদ্র ছিল না, আজকের নাটুকে রুদ্র, শয়তান সানাফাশীট্—ওরা চিৎকার—করছিল, 'কেউ নড়বে না।' আবার শব্দ হয়েছিল পর পর কয়েকবার, অনেকেই মনে করেছিল, ফায়ারিং হচ্ছে, গুলি চলছে, জল জল চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তারপরে হঠাৎ কোথায় একটা প্রচণ্ড জোরে শব্দ হয়েছিল, 'বোম্ বোম্' কারা যেন বলেছিল, হঠাৎ বানের মত সবাই ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল, একটা গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল, লাঠি হাতে পুলিশ নেমে পড়েছিল আমাদের চারদিকে, ওহ্, আচ্ছা, আমাদের মারতে নেমেছে ওরা।

আবার টিয়ার গ্যাস সেল্ ফেটেছিল, জানি না, কোথা থেকে আরো দুটো বমের আওয়াজ হয়েছিল, আমার সঙ্গে একটা দল ময়দানের দিকে ছুটছিল, চোখ জ্বালা করছিল, ইউরিনালটার কাছে যেতে পারলে, চোখে জল দেওয়া যেত। হঠাৎ আমার ডানদিকে দেখেছিলাম, একটা ট্রাম ছুটছে, ওর সারা গায়ে আগুন—আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। কী আশ্চর্য, সে আগুন দেখতে আমার এত ভাল লেগেছিল, গন্ উইথ্ দ্য উইন্ড-এর আগুনের দৃশ্য কোন্ ছার, আমি অমন আশ্চর্য, চলন্ত ছুটন্ত দাউ দাউ আগুন, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, হেই, পিকাসো কোথায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কোথায়, ব্রিজিতের দুই ডালে পা দেওয়া ফাঁকের মাঝখানে যে আগুন জ্বলছে, ট্রাম জ্বলা আগুনের তুলনা তার সঙ্গে চলত না, হেই, চিত্তপ্রসাদ, কর্মকার, আর্টিস্ট্স্ হাউস আর আর্ট গ্যালারির স্বীয় অংকিত চিত্রের প্রদর্শক শিল্পীরা, কোথায় কোথায়, কলিকাতার নীল আকাশের পটে এমন আশ্চর্য চলমান আগুনের দৃশ্য তোমরা দেখিলে না, হা নন্দলাল বসু, হা যামিনী রায়, এমন বিশাল আকাশ ব্যাপিয়া চলন্ত আগুনের শিখা আপনাদের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়া গেল! কিন্তু কোথায় ছুটে চলেছিল সেই চলন্ত ট্রাম গাড়ি, ড্রাইভারের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তখনো সেই গাড়িটাকে সে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, অথবা, গাড়িটা চলন্ত অবস্থাতেই ড্রাইভার নেমে পড়েছিল; বুঝতে পারছিলাম না, গাড়িটা এগিয়ে চলেছিল, যেন গলে গলে পড়ছিল, টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছিল, যেন টুকরো টুকরো আগুনের গোলা খসে পড়ছিল, তার পাশে পাশে একটা পুলিশের গাড়ি চলছিল, ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে কোনদিক থেকে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি আসছিল, আমার চোখে পড়ছিল না, নিশ্চয় ট্রামের আগুন নেভাবার জন্যই আসছিল। আমার ইচ্ছা করছিল, ওই আগুনে গিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমি জানি, বিপ্লব বা কানাই—হ্যাঁ কানাইয়ের মত ছেলে আমি দেখি নি, কোন বন্ধুকে যদি শ্রদ্ধা করে থাকি জীবনে, কোন মানুষকে যদি মনের ভিতর থেকে শ্রদ্ধা করে থাকি, সে ছল কানাই, ও শুধু আমাদের অনেকের থেকে লেখাপড়াতেই ভাল নয়, ও কোন কথাই অকারণ আবেগে বা উত্তেজনায় বলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুদ্রর সঙ্গে ওর মতভেদ হয়। আর কানাই এত সাদামাটা, ওর কোন ঝলক নেই, ওর গলার স্বরে কোনরকম মেকি সুর নেই রুদ্রর মত, আমি জানি ও অনেক বেশী জানে এবং বোঝে, কিন্তু রুদ্রর মত নাটক করে না—রুদ্র, ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া করতে হবে—সব বিষয়েই কানাই অনেক ঠাণ্ডা শান্ত—ঠাণ্ডা শান্ত অথচ যেন—কী বলে ওটাকে, অঙ্গারের মত গনগনে আগুন, আমি বুঝতে পারছিলাম বিপ্লব আর কানাই ওরা দাঁতে দাঁত পিষে, রাগে অবাক হয়ে, সেই ট্রাম গাড়ির আগুন জ্বলা দেখছিল, আর বলাবলি করছিল, 'সর্বনাশ হয়ে গেল, পিছন থেকে কে ছুরি মারল, কে ট্রাম গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল, কারা, কোন শুয়োরেরা?'...

কিন্তু যারাই দিক, তারা যেন আমার আত্মার আত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল, তারা ভুল করেছিল কিংবা তারা সত্যি সত্যি বিশ্বাসঘাতকের দল, তারা যারাই হোক, সেই আগুন দেখে, ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। তারা শুধু ট্রামটা জ্বালিয়েছিল কেন, তারা কেন চারদিকে, সমস্ত বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয় নি, জ্বলুক, জ্বলুক, পুড়ুক, ধ্বংস হোক, সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে যাক, সমস্ত বর্তমানটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক, তারপরে পুণ্য পবিত্র ভাগীরথীতে কত জল আছে দেখা যাইবে, যদি তাহাতেও সব ছাই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার না করা যায়, তাহা হইলে, বঙ্গোপসাগরের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে। জ্বলুক জ্বলুক, আমার নিজেকে সত্যিই সেই পোকার মত মনে হচ্ছিল, আগুন দেখলেই যাদের পাখা কাঁপে, তেমনি করে সেই আগুনে আমার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। পুলিশ ততক্ষণে আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করেছিল, ওরা আমাদের বন্ধুদের লাঠি দিয়ে মারতে আরম্ভ করেছিল, যাকে বলে আর্ত চিৎকার, তাই শোনা যাচ্ছিল, আর সে সময়েই কে যেন আমার কাছ থেকেই বলে উঠেছিল, 'নবীনা নবীনা।' 'কই কই, কোথায়?' 'উই যে, ওই বিল্ডিংএর চারতলা থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখছে।' 'খচ্চরী একটা, ওর ঘাড়ের ওপর হাত দিয়ে ওই লোকটা কে?' 'চেনা যাচ্ছে না।'...

নবীনা, ফিল্মের নাম করা রোমান্টিক হিরোইন, আড়াই টাকা দিয়ে ওকে পর্দায় দেখতে যাই আমরা। ও তখন আমাদের দেখছিল, আশ্চর্য, ও কী ভাবছিল, কে জানে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সরস্বতী—আহ্, সরস্বতী সত্যিই রূপে সরস্বতী, গুণে অন্য পেরকারের গুণধরী, কিন্তু তখন ওকে দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ও হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমার হাত চেপে ধরেছিল, ওর মুখটা শাদা হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁটে ঠোঁট টিপেছিল, অথচ কোন মারের আঘাত ওর গায়ে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কোনরকমে আমাকে বলেছিল, 'এই শোন, প্লীজ, আমাকে বাঁচাও ভাই, আমি মরে যাচ্ছি, আমার এখুনি নার্সিং হোমে যাওয়া দরকার।'

বলতে বলতে, সরস্বতী আমার হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছিল, যেন টলে পড়ে যাবে, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করে ওকে সেই সময়ে আমি নার্সিং হোমে পাঠাব, বা কেনই বা ও নার্সিং হোমে যেতে চাইছিল। তারপরে ওর টুকরো টুকরো কথার থেকে যা বুঝতে পেরেছিলাম, তা হল, সেদিন ভোর ছ'টাতেই নার্সিং হোমের ডাক্তার ওর ভিতরে ওষুধ দিয়ে প্লাগ পরিয়ে দিয়েছিল, সারাদিন রেস্টের পরে, বিকেল চারটে নাগাদ ক্যুরেট করার কথা, কিন্তু ও হস্টেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল, ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, একটু ব্যথা মাত্র রয়েছে, আস্তে আস্তে হেঁটে মিছিলের সঙ্গে যেতে পারবে, তারপরে চৌরঙ্গির কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নার্সিং হোমে চলে যাবে। অবস্থা যে ওরকম হয়ে উঠবে, ও নাকি ভাবতে পারে নি, তখন ওর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম, সরস্বতীর সেই প্রেমের ঠাকুরটি কে, যে দান করেছে, অথচ পাত্তা নেই। ও অবিশ্যি তখন আমাদের সিনিয়র গ্রুপের মেয়ে, উত্তরবঙ্গের কোনখান থেকে পড়তে এসেছিল, এখন তো কোন্ যদুবংশীর গলিতে নাকি থাকে, যেমন ভুঁদকি মোটা হয়েছে, তেমনি একটা ভোঁদকা মোটা স্বামীর সঙ্গে গদর্ গদর্ করে ঘুরে বেড়ায়, চারভাজ ওয়ালা ঘাড়ে গলায় আবার মোটা সোনার হার—শালা

ওয়াক্, ফর্সা রঙের মাথায় ঝাড়ু, ওই কি রূপে সরস্বতী।

যাক গে, তখন ও সেরকম ছিল না, আর আমি ব্যাপারটা একেবারে বুঝতে পারছিলাম না, তাও নয়, ক্যারেট করা কী, আগেই জানতাম এবং যে কাজটা আগের দিন রাত্রে হবার কথা ছিল, সেটা সেইদিন ভোরবেলাই করিয়েছিল সরস্বতী, আর চারটের সময় অপারেশন টেবিলে যাবার কথা ছিল, অথচ তখন আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছা থাকলেও, পারি নি, কার দান ওর কুমারী গর্ভে তখন মৃতপ্রায় হইয়া, যন্ত্রণায়, জরায়ুর অন্ধকারে ছটফট করিতেছিল, ছুঁড়ির কি মাথা খারাপ গা, ওমন করে কেউ বেরোয়, তবু আমি চারদিকে তাকাচ্ছিলাম, যদি একটা ট্যাকসি বা প্রাইভেট গাড়ি কাছে পিঠে দেখা যায়। অসম্ভব। তখন পুলিশ আর আমরা আর পুলিশের গাড়ি ছাড়া, রাস্তায় কিছুই নেই, আর একজন বাঙালী সার্জেন্ট আমার কয়েক হাত দূরেই, লাঠি দিয়ে কাদের মারছিল, আর তার মধ্যেই চিৎকার করছিল, 'লোফারস্, তোদের মুখে বড় বড় কথা, মেয়েদের এগিয়ে দিস্ তোরা।'...

বোধহয় ওদের মতে, অন্তত ওরকম ক্ষেত্রে, লেডীজ ফার্স্ট নয়, জেনানা আপ্ পহ্লে, আর সব বিষয়েই—সত্যি? সত্যি, কখন কখন, কোন কোন সময় লেডীজ ফার্স্ট, সেই-সেই-সেই সময়েও, যখন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা নামক পুণ্য বাণীটিকে ভাষার সঙ্গে ক্রিয়ার দ্বারা ফলবতী করিয়া তোলা হয়, অহো, লেডীজ ফার্স্ট—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা আর আমার ঘাড়ের ওপর প্লাগবদ্ধ সরস্বতী—কে নামটি তোমার রেখেছিল, সব মিলিয়ে কী বিচিত্র এবং আসলে, আমার কয়েক হাত দূরে তখন পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের হাতাহাতি ধস্তাধস্তি হচ্ছিল, যদি চ, ওদের হাতে লাঠি ছিল, ঢাল ছিল, আর আমরা, ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার, পরস্পর বচসা আর গালাগাল পাল্টা গালাগাল চলছিল, আমি বলেছিলাম, কিন্তু সরস্বতী, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না, তুমি বেরুলে কেন?'

'বুঝতে পারি নি।' অর্থহীন কথা, কিছুই বুঝতে পারেনি সরস্বতী, যখন গর্ভধারণ কারণ ক্রিয়া করিয়াছিল, তৎকালেও বুঝিতে পারে নাই, কী গ্রহণ করিতেছে, কেবল অঙ্গাভ্যন্তরের পেশীসমূহের তরঙ্গায়িত সুখানুভূতিতেই মরিয়া যাইতেছিল, ই বিটিকে কী বইলব বল দিকিনি, এবং চারদিকে তাকাতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম, প্রায় মনুমেন্ট বরাবর, লাইনের ওপর জ্বলন্ত ট্রামটা দাঁড়িয়ে পুড়েছে, সেখানে দুটো ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি, আসলে ড্রাইভার ওখানেই গাড়িটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল বা সেইরকম নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেখানেই জল ছিল, আর ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি থেকে, পাইপ জুড়ে, গাড়িটার আগুনে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, অথচ সেই প্রলয় আগুন কিছুতেই নেভাতে পারছিল না, দুটো পাইপেও আগুনের সবদিকগুলো নাগাল পাচ্ছিল না। দুটো ক্যারেজ-এর ছাদই খসে ভেঙে পড়েছিল আর ঠিক সে সময়েই, পুলিশের দলটা আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল সবাই ছুটোছুটি করলেও, সরস্বতীর জন্যে আমি পারছিলাম না, তবু ওকে টেনে নিয়ে সরে আসবার সময়েই, কীভাবে একটা ধাক্কা লেগে সরস্বতী পড়ে গিয়েছিল, আর আমার মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুষি, যাহ্, দাঁতগুলো বুঝি সব ঝরেই পড়ে গেল বলে আমার মনে হয়েছিল, আর মিহির আমার পায়ের কাছে ছিটকে পড়েছিল, ওর পরনে প্যান্ট ছিল না, টেরিকট্-এর সার্টটার বোতাম খোলা, তবু ভাগ্য ভাল, ও নেহাত বাইক পরে ছিল না, একটা আঁট ইজের মত পরা ছিল ভিতরে, তা নইলে—সেই সময়ে, বয়েজ কাট চুল ঠোঁটে লিপস্টিক, হাত কাটা জামা, কুমীরের মত চোখ শিকারী মহিলাটির কথা আমার মনে পড়েছিল, আর আমার সামনে একটা ইউনিফর্ম পরা মূর্তি দেখেই, দাঁতে দাঁত পিষে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম—নিষেধ নিষেধ আর মার, কেন। কিন্তু তার আগেই —ঠিক এখানে, এখন যেখানে ভুরুর ওপরে ফুলে আছে, ব্যথা করছে, ঠিক এখানেই ঠাস করে একটা লাঠি এসে পড়েছিল, চোখ আগের থেকেই জ্বালা করছিল, আমি যেন

'বলডেক্স' মাথার সাথে সাথে চুলের যত্নও নেওয়া দরকার। প্রতিদিন চুল ভালো করে আঁচড়াবেন, না শুকিয়ে কখনও বাঁধবেন না আর কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করে চুলের ক্ষতি করবেন না।
বেষ্ট কেমিক্যাল করপোরেশন
১৮এ, মোহনবাগান রো • কলিকাতা-৪
ফোন: ৫৫-৯৫৬৭

চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম মুখ থুবড়ে, তবু দাপাদাপি করছিলাম ওঠবার জন্যে, কিন্তু একটা লাঠি আমার পেটে খোঁচা দিয়ে চেপে রাখা হয়েছিল, যাতে না উঠতে পারি, এবং সেই অবস্থাতেই উপরোউপরি ঘাড়ে পিঠে কয়েক ঘা পড়েছিল, আর রাষ্ট্রভাষা শুনতে পেয়েছিল, 'স্‌সালা চুত্তিয়া কামিনা কাঁহিকা।'

সেই মুহূর্তেই, হঠাৎ একবার চোখে পড়েছিল, সরস্বতীর গোলাপি রঙের শাড়িটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, যাক্‌ ওকে আর অপারেশন টেবিলে যেত হল না, এই কথা আমার মনে হয়েছিল। কিংবা আসলে হয়তো অবস্থা আরো খারাপের দিকেই যাবে, কেন না, কতদিনের ব্যাপার সেটা আমার জানা ছিল না, এবং ও যে বমি করে ফেলেছিল, সেটাও আমি দেখতে পেয়েছিলাম। কোথা থেকে একটা গাড়ি ছুটে এসেছিল, একজন সার্জেন্ট আঙুল দিয়ে সরস্বতীকে দেখিয়েছিল, দুজন লোক সরস্বতীকে সেই গাড়িটাতে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার পাশে, শোয়ানো অবস্থাতেই কাকে যেন পুলিশ মারছিল, কিন্তু আমার মত কাতর অবস্থা তার ছিল না, সে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছিল, কার এত সাহস, ফিন স্‌সালা থুকতা, তোর—' একেবারে নির্যাস আর মোক্ষম একটি রাষ্ট্রভাষা শুনেছিলাম। কোন মাতার সন্তানকে এমন কথা বলা হচ্ছিল, দেখবার জন্যে মুখটা ফেরাতে যেতেই, যাহ্‌, নিয়নটা বোধহয় নেভাতে ভুলে গিয়েছিল দেখেছিলাম, হিন্দি ছবির নায়ক নায়িকার নাম, নিভন্ত জ্বলছে জ্বলছে নিভছে, আর নায়কটি জানু পেতে দুই উরুতর মাঝখান, অহো কী দুঃখের দৃশ্য যাতনায় কাতর হইয়া নায়িকার কোথায় মুখ রাখিয়াছে দেখ, আর নায়িকাটি ব্যাকুল হইয়া এমন ঝোঁকটা দিয়াছে যে স্তনযুগল খসিয়া পড়িবার দাখিল হইয়াছে, নেহাত আইন বাঁচাইবার জন্য। চুচুকবৃন্ত দুইটি আবৃত রাখিয়া, বাকি সমগ্র স্তন দর্শাইতেছে। মনে হইতেছিল, 'বাছা যা' এইরূপ কথা শুনা যাইবে।

যদিচ আমি বুঝতে পারছিলাম না, এস্‌প্ল্যানেডের কোন বাড়ির দেওয়াল ওটা, কোন বাড়িটাকেই চিনতে পারছিলাম না, চোখের ওপর, মুখের ওপর রোদ, ভুরুটা যেন চোখের ওপর এসে পড়েছিল। চোখ থেকে জল পড়ছিল। তবু থেকে থেকে সবই চোখে পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে সিনেমার ট্রিক শটের মত বড় বড় বাড়িগুলো যেন দুলছিল, ঠিক যেমন একটা দুলতে থাকা আয়নার মধ্য দিয়ে দেখা যায়, সেরকম দেখাচ্ছিল। কিন্তু কে তবু না থেমে থুথু দিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে আমার মাথার দিকে, তাই দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল, আমি মাথাটাকে যতটা সম্ভব উলটে দেখেছিলাম আর তৎক্ষণাৎ আমার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠেছিল, কানাই! কানাইকে ওরা মারছিল, আর কানাই থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছিল, কানাই! আমি ঘসটে ঘসটে কানাইয়ের দিকে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নড়তেই এক ঘা এসে কাঁধে পড়েছিল, পেটে খোঁচা লেগেছিল, কানাই! বিপ্লবের নামটা ছাড়া, ওকে আমার ভাল লাগে, কিন্তু কানাইকে আমি রেস্‌পেকট্‌ করি, ওকে ভালবাসবার সাহস আমার হয় না, ভালবাসবার কথা ভাবতে পারি না, কিন্তু ও সত্যি একটা সিগনিফিকেন্ট মানুষ। আমি দেখেছি ওর বাবা ওর সঙ্গে কী রকম করে কথা বলেন, 'তুই কি এখন কফি হাউসে যাবি?' 'হ্যাঁ, তুমি যাবে?' 'না না, আমি আবার ওখানে কী যাব, পালক বদলাতে হবে তো।' 'ওটা তোমার ভুল, জান ওখানে বয়স্ক লোকেরাও আসেন।' 'তা হোক, তাঁরা আমার মত একজন প্রেসের কম্‌পোজিটার নয়।' 'তার জন্য বুঝি তুমি ছোট হয়ে গেলে। চল না, আজ তো আবার তোমার ওভারটাইম আছে, এক কাপ কফি খেয়ে যাবে।' 'থাক্‌। শোন্‌ তোর মায়ের ওষুধটা।' 'আমি নিয়ে যাব।' 'তোর আবার টুইশানি রয়েছে।' 'তারপরে নিয়ে যাব। আর শোন বাবা, তোমাদের প্রেসের ম্যানেজারকে বলো, আমাদের ম্যাগাজিনটা কিন্তু পনর তারিখের মধ্যে ছাপিয়ে শেষ করে দিতে হবে।' 'বলব। তোর লেখাটা পড়লাম, আমিই কম্পোজ করছি ওটা সত্যি ভাল লিখেছিস। কী যেন নাম দিয়েছিস লেখাটার—।' 'যৌবনের দায়িত্ব।' 'হ্যাঁ, যৌবনের দায়িত্ব। তোদের তো কাল আবার কী সব আছে শুনছিলাম।' 'হ্যাঁ, ময়দানে র‍্যালি।' হরিশ্চন্দ্র বাবুর—কানাইয়ের বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র, ছেলের নাম কানাই, আশ্চর্য, যেন খুবই একটা সরল সাধারণ ব্যাপার, যাকে বলে অ্যামিবিসাস—নামের সৌন্দর্যে বা ধ্বনিতে, সে রকম কিছুই না, সরল সহজ ব্যাপার। হরিশ্চন্দ্রবাবুর চোখে দেখেছিলাম কেমন একটা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, খালি এইটুকু উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম, 'দেখিস আবার—।' আর আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম দেখিস আবার, একটা দুর্ঘটনা কিছু ঘটে না যেন, তোর বেঁচে থাকাতে আমার অনেক আশা...। কানাই, কত প্রয়োজনীয়, কত ভালবাসার ছেলে, আর এমন কি, কীভাবে ওর বাবা, একজন সামান্য কম্‌পোজিটর, ওর লেখায় প্রশংসা করেছিল, তার মানে, ছেলেকে উনি মনে মনে শ্রদ্ধাও করেন, কানাইয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে উঠেছিল, অথচ বাবার প্রশংসায় একটা লজ্জা লজ্জা ভাব। তার মানে ওর বাবাকে ও মোটেই ছোট মনে করে না, তা হলে মুখের ভাব ওরকম করতো না, ওর বাবার গলাটাও কী রকম মোটা অথচ খুব আস্তে আস্তে কথা বলেছিলেন, যেন বিনীত একটা ভাব, বন্ধুর মত, বড় বড় বক্তৃতাবাজ বাবাদের মত না, অথচ কী রকম দরিদ্র, যেটা আমার বিপ্লবের মাকে দেখে মনে হয়েছিল বিপ্লবের মাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল খুব সহজ গরীব আটপৌরে মা। 'হ্যাঁ দিদি আপনার কর্তা...।' এরকম কথা বলা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করা মধ্যবিত্ত গিন্নিদের মত না, যাদের দেখলেই আমার মনে হয়, ওরা দুগাছা সোনার চুড়ি বাড়াবার জন্য যে কোনরকম অন্যায় করতে পারে, সে রকম না আর ওসব দিলালি গল্প করার সময়ও বিপ্লবের মায়ের নেই, কেন না, 'বেশ বেশ এই তো চাই' বাবাটির যৌবনের হুমড়ি খাওয়া সামলাতে সামলাতে আর সবাইকে দু বেলা রেঁধে খাইয়াতেই তাঁর সময় চলে যায়।

যাই হোক, কানাই, কানাইকে ওরা মারছিল ও থুথু দিচ্ছিল, যাকে আমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল বলে মনে হয়, গরীব, কিন্তু মধ্যবিত্ত রুদ্র বা আমাদের মতই একদিক থেকে বলতে হবে, কিন্তু রুদ্র বা আমাদের মত নয়। বিপ্লবদের মত নয়, আমাদের সকলের মধ্যে ওর একটা ইন্ডিভিউজুয়ালিটি আছে, আমরা কেউ কোনদিনই যে কাজ করতে পারব না, ও তা করতে পারবে। এইরকম আমার একটা বিশ্বাস। তারপরে এক সময়ে আমার চুলের মুঠি ধরে হ্যাচকা টান মেরে তুলেছিল, তখন দুম্‌ দুম্‌ শব্দগুলো দূর দূর থেকে আসছিল। ছেলেদের ভিড় অনেক হালকা হয়ে গিয়েছিল। পোড়া ট্রামটা থেকে ধোঁয়া উঠছিল তখনো, কালো পোড়া কাঠের মত দেখাচ্ছিল সেটাকে, যাক্‌ রক্ষা করতে পারেনি ছেলেরা আর পুলিশেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, ময়দানের দিকে এক দল ঘোড়সওয়ারও দৌড়ুচ্ছিল, ভাগ্যিস্‌ সেদিন কোন সেরকম বিশেষ খেলা ছিল না, তা হলে, পুলিশের সঙ্গে মারামারিটা অন্য কারণে সেখানেই হয়ে যেত বা ছাত্র মিছিলের ডাকই হয় তো দেওয়া হত না, ময়দানের দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকতো, কারণ যাকে বলে বিশেষভাবে প্রতীক্ষিত কোন নতুন মুভি বা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-এর মত ক্লাবের খেলা বা ক্রিকেটের মরশুমে, বিশেষ বিশেষ খেলার দিনগুলো বড় গোলমেলে, তবে আমার কাছে সেই একই কথা, নিষেধ মানেই অমান্য। যেখানেই হোক ইউনিভার্সিটিতে, খেলার ময়দানে, যেখানেই হোক। তারপরে অনেকের সঙ্গে, আমাকেও একটা কালো রঙের জালে ঘেরা গাড়িতে ওরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, লক্‌-আপ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেখানে ঢুকেই মিহির ইজেরটা খুলে দেওয়ালে প্রস্রাব করেছিল, আর আমি পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে দেওয়ালে লিখেছিলাম, 'এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ, অমান্য করিলে পায়রায় সোপর্দ হইতে হইবে।'

সন্ধ্যাবেলা একজন ইনস্পেকটর এসে আমার নাম ধরে ডেকেছিল, তার আগেই অবিশ্যি আমার নাম ধাম লিখে নিয়েছিল, মিহির ওর নাম বলেছিল, ওদের কলেজের প্রিন্সিপালের নাম, আগে জানলে, আমিও সেরকম একটা কিছু বলতাম। হাজতের দরজা খুলে, একজন সেপাই এসে আমার হাত ধরেছিল, আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম, তার জন্যে সেপাইটা আমার গায়ে থাপ্পড় মারবার আগেই, ইনস্পেকটর থামিয়ে দিয়েছিল এবং আমাকে অফিসে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসতে দিয়েছিল। সমস্ত আসবাব পত্র, ফাইল, দেওয়াল, সবখানেই যেন নিষেধের গন্ধ, নিষেধ নিষেধ নিষেধ, কী জন্য আমাকে একলা অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি, আবার ফিরে যাব জানতাম, কিন্তু আমার সামনে একজন অফিসার এসে বসে-

শারদোৎসবে আমাদের শুভেচ্ছা...

৺মহাপূজার এই আনন্দময় মুহূর্তে আপনারা সকলে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই সঙ্গে এও আমরা জানাচ্ছি যে জাতির সেবায় আমরা নিজেদের উৎসর্গীকৃত রাখব যাতে আমাদের দেশ আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান: এস. সি. ত্রিখা

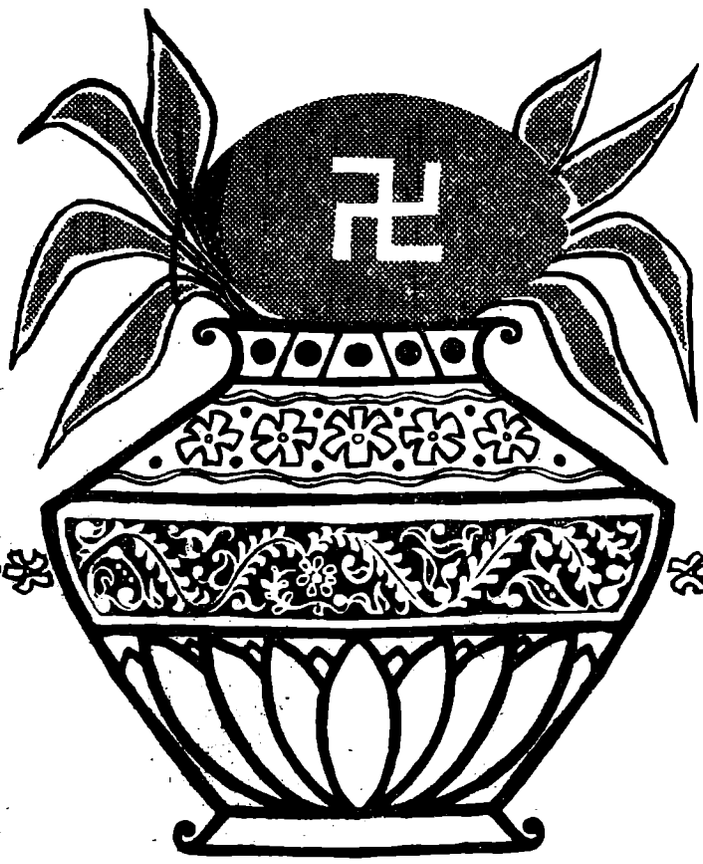

PR-PNB-6821-B

ছিল, বাবার নামটা বলে জিজ্ঞেস করেছিল, ওটা আমারই বাবার নাম কী না। আমি বলেছিলাম, 'নামটা তো আগেই আমি বলেছি।'

অফিসার বলেছিল, 'তা জানি, এরকম লোকের ছেলে হয়ে তুমি এসব করতে এসেছ? ছি ছি ছি, তোমার ইনজুরি তে দেখছি মন্দ না, তুমি বাড়ি চলে যাও, সেখানে ডাক্তার ডেকে দেখালেই হবে। তোমার বাবার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে।'

প্রথমটা আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, মিহিরদের কাছে আর ফিরে যেতে পারব না ভেবে, তারপরেই মনে হয়েছিল, কেন, ওদের কথাতেই আমি চলে যাব কেন, আর বাবার ওপরে এমন রাগ হয়েছিল যেন ওঁর ইচ্ছেতে আমি বেরিয়েছিলাম, আবার ওঁর ইচ্ছেতেই আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তার মানে ওরা সবাই বলে মিলে বলতে চায়, আমরা যা বলছি, তাই কর। তাই করবে। যা বারণ করব, তা করবে না।' যেন আমি একটা কিছু না, একটা তুচ্ছ কিছু, যা করবার বলবার নির্দেশ দেবার, সব ওরাই করবে। আমি বলেছিলাম, 'এখন আমি বাড়ি যেতে চাই না।'

'কোথায় যেতে চাও।'

'যেখানে ছিলাম, ওদের সকলের কাছে।'

অফিসারের মুখটা শক্ত দেখাচ্ছিল, তবু আমার দিকে না তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে এমনভাবে হেসেছিল, যেন হাসিটা অফিসারের নয়, গোফের। বলেছিল, 'তুমি ইচ্ছে করলেই ঢুকতে পার না, বেরুতেও পার না। ডেঁপোমি না করে বাড়ি যাও।'

তখনো কয়েক বছরের ছোট ছিলাম এখন হলে, কী করতাম বলতে পারি না। রাগে ঘৃণায় আমি কথা বলতে পারছিলাম না, কিন্তু আমি একভাবেই বসেছিলাম, আর অফিসারটা আবার ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'কী হল, বসে রইলে কেন, বাড়ি যাও। বল তো কেউ গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।'

'দরকার নেই।'

'তবে যাও, বাড়ি গিয়ে বাবাকে একটা ফোন করতে বলবে যে, তুমি বাড়ি পৌঁছেছ।'

রাগে ঘৃণায় অনিচ্ছায় আর হতাশায় আমাকে উঠে আসতে হয়েছিল, আমি একেবারে একা ছিলাম, বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে কী করতাম আমি জানি না, মনে মনে যা তা গালাগাল দিতে দিতে এসেছিলাম আর বাবার মুখটা মনে হতেই, মনে মনে বলে উঠেছিলাম, 'ভারী একেবারে বাবাগিরি দেখাচ্ছেন, আমি একেবারে ধন্য হয়ে গেলাম, বুদ্ধু!' কিন্তু আশ্চর্য তখনই আমার হাসিও পেয়ে গিয়েছিল 'বুদ্ধু' কথাটা বলে, আমি যেন বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম, হঠাৎ 'বুদ্ধু' শুনে কী রকম হয়ে গিয়েছে, ভদ্রলোক একেবারে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, প্রকৃতই পুত্র এবম্বিধ সম্বোধন করিয়াছে কী না, এবং সেটা ভাবতে পেরে, কথঞ্চিৎ শান্তি বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু বাড়ি আমি যাইনি, হস্টেলে ফিরে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলার দিকে তখন অনেক ছেলেরাই হস্টেলে ছিল না, অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছিল, যারা হয়নি, তারা মাঠে ময়দানে কাফে রেস্তোরাঁতে নিশ্চয় জমায়েত বসে নানারকম আলোচনা করছিল, আর যারা এসবের মধ্যে থাকে না, তারাও অনেকেই বেড়াতে ঘুরতে বেরিয়ে গিয়েছিল, যে যার নিজের সন্ধানে—কিসের সন্ধানে? তাহা হইলে বলিতে হয়, বুঝহ রসিক জন, যে জান সন্ধান, যেমন পরেশটা দাঙুরায় যেত, ওর মাসতুতো বোনের সঙ্গে প্রেম করতে আপন মাসতুতো বোন, প্রকৃত ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেম এবং ওরা আবার চিঠি লেখালেখি করত 'প্রিয়তম' 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করে। অহো প্রেমের কী বিচিত্র গতি, অবিশ্যি কী-ই বা যায় আসে, দুটো ছেলে আর মেয়ে—ভো,—বেশ করতো। নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল, না জুটলে মাসতুতো বোনই ভাল, তবু প্রেম তো হচ্ছিল। প্রেম! হ, পরেশ, বুজ্‌চি বুজ্‌চি। আর কিছু ছেলে ছিল, তারা জানতো যেন, পৃথিবীটা বই খাতা পরীক্ষা দিয়ে ঠাসা, পড়ছে তো পড়ছেই। ওদিকে চোখের কোণে কালি। সব থেকে বেশী ক্লাশ নেওয়া লেকচারারের মত মুখখানি, মধ্যপ্রান্তে ক্লান্ত বিষন্ন বলদ যেন। কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, কাহাকেও নালিশ জানাইবার নাই, দানা জুটাইতে হইলে, এইরূপ করিয়া যাইতে হইবে, মুখের ভাবগুলো ওদের সেইরকম, কিন্তু আমার মনে হয়, আসলে ওরা অন্য কিছু করতো, আপন অপসমূহকে ঈদৃশ ভালবাসিত, সমুদয় দিবস সন্ধ্যায় রাত্রে। সেই ভালবাসার খোয়ারিতেই, চোখের কোণে কালি পড়িত। ওই ধরনের সব ছেলেই হয়তো সেরকম ছিল না, তবে সত্য নামে ছেলেটা যে ছিল, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই, ওকে আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম, সে কী বিশ্রী ভঙ্গি, আর ঘর ছেড়ে বেরুতো না প্রশান্ত আর রাজীব, হস্টেলের সবাই জানতো, অমন প্রেমের জুটি আর হয় না। ওরা এক বছরের সিনিয়র জুনিয়র ছিল, ওদের কথা নিয়ে কত হাসাহাসি হত, ওদের ওসবে কিছুই মনে হত না। প্রশান্ত রাজীব প্রমত্ত তরণীর ন্যায় ছুটিতেছিল। গোলমাল হত তখন, যখন কোন কারণে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেত, মান অভিমানের পালা চলিত, ওহো, সে কি মর্মান্তিক শুষ্ক বিষন্ন মুখ দুইজনের।

হস্টেলে ফিরে আমি সেই রকম কয়েকজনকে দেখেছিলাম—দেখিনি, জানতাম ওরা আছে, ওরা কোন কিছুতেই নেই। ওরা ঘরেতে বইয়েতে পড়াতে বিছানাতে আছে, একমাত্র একজন ছাড়া, ভোলানাথ। ওযে সত্যিই ছাত্র, কিছুতেই মনে হত না, বেশ দাড়ি-গোঁফ কামানো মোটাসোটা মানুষ, বুলডগ বুলডগ, বোকা বোকা ভাবের হাসি মুখ, যেন কত ভার-ভারিক্কী বয়স্ক মানুষ, খুব সুন্দর করে গোঁফ কামাতো, কালো পাড়ের তাঁতের ধুতি অদ্ভুতভাবে কোঁচাত—যা আমি আমার সারা জীবনে পারব না, কারণ ধুতি পরতেই জানি না, কোন অকেশনে বছরে এক-আধবার পরতে হলে, কেউ না কেউ পরিয়ে দেয়। সেই কোঁচা লুটিয়ে, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এমনভাবে বেরুত, ঠিক যেন আমাদের বাড়ির পাশের, কোথাকার গোয়ালপাড়ার দত্তবাবু। যিনি আটতলা বাড়ি করেছেন গোয়ালপাড়া থেকে এসে, তিনিই বেরোলেন। আমি ভোলানাথের ঘরে গিয়ে দেখেছিলাম, ও ওর সেই বিখ্যাত ঢাকা দেওয়া চিনেমাটির গেলাসটি টেবিলে রেখে, কাপড় কুঁচোচ্ছে। ওটা ওর প্রতি দিনের ব্যাপার, চিনেমাটির গেলাসে, যাতে না দেখা যায়, হুইস্কি খায়, ঢাকা দেওয়া থাকে বলে গন্ধও বেরোয় না। তারপরে সন্ধ্যেটি হলে, পাটভাঙা ওইরকম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে উত্তর কলিকাতায় গমন করে, ফিরিয়া আইসে ঠিক সময় মত। একেবারে সুবোধ বালকটি, ওকে নিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কোন দিন ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। অবিশ্যি ও ব্যাপারে একলা ভোলানাথ নয়, চিনেমাটির গেলাস সকলের না থাক, কয়েকজনের প্রায়ই চলতো।

ভোলানাথ আমাকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিল, বলেছিল, 'একি, তোমাকে তো বেদম মেরেছে দেখছি, মুখ-চুখ ফুলে গেছে, শীগ্‌গির? একটু টেনে নাও, আরাম হবে।'

'আরাম হবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ব্যথা অনেক কমে যাবে। ব্র্যান্ডি থাকলে, তাই দিয়ে তোমার মুখ ধুইয়ে দিতাম, ইস্, তোমার বাঁ-চোখটা তো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, দেখাই যাচ্ছে না।'

তার আগে যে আমি কোন দিন খাইনি তা নয়, তবে ভোলানাথের সঙ্গে কোন দিনই খাইনি, ও আমাকে একটা গেলাসে খানিকটা ঢেলে দিয়েছিল, দেবনাথবাবুকে আমি জানালা দিয়ে ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমাদের হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ফিজিক্স পড়াতেন—উনি পায়চারি করছিলেন নীচে, ওঁর আবার হস্টেলে দু'তিনটে ছেলে স্পাই ছিল। সেই খচ্চর কটিকে—আমরা ওদের খচ্চর ছাড়া কখনো কিছু বলতাম না, অলক বলত 'পায়াস খচ্চর' কারণ ওদের আবার একটু ধর্মভাব ছিল, ধার্মিক ভাবের ছেলে, যে কারণে সুপার ওদের পছন্দ করতেন। কারণ উনি নিজেও ধার্মিক মানুষ, ভোজনাদি বিষয়ে বিশেষ নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি এবং সেই জন্যই, সুপার হিসাবে ওঁর নিয়োগই সর্বার্থে মান্য জ্ঞান করা হইয়া থাকে, কেন না, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ওঁর অন্তরের নৈতিক বল অতি প্রবল, পবিত্র ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন, অতএব ছাত্র আবাসে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিরই, সদাজাগ্রত প্রহরীর ন্যায় থাকা উচিত। সুপারের বয়স বেশী নয়, কিন্তু চোয়াল চিবিয়ে চিবিয়ে, কালো মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে, মোটা শাদা প্যান্টের ওপর, ওদিকে কোমর ছাড়ানো, এদিকে কনুই ছাড়ানো হাওয়াই শার্ট গায় দিয়ে থাকতেন, আর সকলের দিকেই এমন চোখের কোণ দিয়ে তাকাতেন, যেন, জান, হাল

ছাড়িয়ে খেয়ে ফেলতে পারি তোমাদের।' কিছু দিন ছুটি লইয়া তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন, অন্তরের পবিত্রতার দ্বারা দশ মাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই ঈশ্বর সদৃশ একটি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, কী রূপে এতাদৃশ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, ফিজিক্স পড়াইতেন তো। আমরা তাঁহার স্ত্রীকেও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের মন বা দেহজগতে, কাষ্ঠ-পুত্তলিকা কৃশ কৃষ্ণমূর্তি সাড়া জাগাইতে পারেন নাই। আমি নিচে ও'র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হুইস্কি খেয়েছিলাম, তারপরে নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রথমটা যেন নিজেকে চিনতেই পারিনি, যদিচ সেটা আমারই মুখ, কিন্তু সে মুখটার মালিকও যেন আমি নই, নিষেধওয়ালারা সেটাকেও যা খুশি তাই করতে পারে। ঘৃণার কথা আমার একবারও মনে হয়নি তখন, রাগে আর ঘৃণায় আমার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, এমন বিচ্ছিরি রাগ আর ঘৃণা, সত্যি দাঁতে দাঁত চেপেছিলাম, আমার চোখে জল এসে পড়েছিল, আমি আমার খালি ঘরে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে, মুখ গুঁজে পড়ে, বেড-কভারটাকে খামচে ধরে, ফুঁপিয়ে উঠেছিলাম, দাঁত দিয়ে বেড-কভারটাকে কামড়ে ধরেছিলাম। আর আমার চোখের সামনে গোটা কলকাতাটা যেন ভাসছিল। তারপরে হঠাৎ-ই আমি থেমে গিয়েছিলাম, এবং যেন নিজের মনেই অবাক হয়ে ভাবছিলাম, 'এ আবার কী হচ্ছে, ছি।'

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আর নিজের কাছে, নিজেরাই যেন কেমন লজ্জা করেছিল, আমি হেসে উঠেছিলাম, আবার বলেছিলাম, 'শু-র রাস্কেল, উল্লুক, এসব কী। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে, জামা-প্যান্ট খুলে ফেলেছিলাম, প্রচুর ধুলো লেগেছিল, দেয়ালের মাঝারি আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, কোমরে দোলা দিয়ে সামনেটা এ'গিয়ে দিয়েছিলাম। শিশুরা যে প্রকার রাগবশতঃ আপন অঙ্গ দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ আমি নিজেকে দেখিয়েছিলাম, বলেছিলাম, 'হু দা হেল্ উ আর, চল চান করতে।'

স্নান করতে গিয়ে গায়ে জল পড়তেই গাটা এমন শিউরে উঠে শিরশিরিয়ে উঠেছিল, যেন জ্বরোগায়ে জল লাগার মত। অবশ্য তো ভোলানাথের জিনিস একটু পেটে পড়েছিল। মুখে হাত দেবার উপায় ছিল না, এত ব্যথা হয়েছিল, ভুরুর কাছে ফোলা জায়গাটা একটা মাংস ফাটা ভাব হয়ে গিয়েছিল, অথচ দু-এক ফোঁটা ছাড়া রক্ত পড়েনি। আমি হাতে সাবান ঘষে, আস্তে মুখে দিয়েছিলাম। চান করার পরে আমার যেন সত্যি শীত করছিল। তাড়াতাড়ি ধোয়া জামাপ্যান্ট পরেছিলাম, আর তখনই ঘরের দরজায় ঠক-ঠক করে শব্দ হয়েছিল, দরজা খুলে দিয়ে দেখেছিলাম, ভোলানাথ নাগরবাবুটি সেজে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। বলেছিল, 'সুপার শালা দাঁড়িয়ে আছে, কী করে যাই, আমাকে এ-বেশে দেখলেই চটে যায়।'

আমি বলেছিলাম, 'মাথা নিচু করে চলে যাও।'

'সেও কয়েক দিন যেতে গিয়ে আটকে পড়েছি, খালি বলে, 'ইট ইজ এ শেম ফর উ, বরযাত্রী তো যাচ্ছ না, এরকম পোশাক পরতে তোমার লজ্জা করে না? আর কখনো যখন তখন এরূপ পোশাক পরো না।' বল তো কী মুশকিল, আমাকে ওর মত ঢলঢলে জামা পাতলুন পরতে হবে। আমি তো আবার কথা বলতে পারি না। আজ্ঞে, আচ্ছা করে কোন রকমে কেটে পড়ি। তুমি একটু চল না আমার সঙ্গে, গেট-অবধি চল, তোমার সঙ্গে স্মার্টলি কথা বলতে বলতে চলে যাব।' আমার হাসি পেয়েছিল ভোলানাথের কথা শুনে, আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম, আর সত্যি ও এমন এলোমেলো বকবক করতে করতে—আসলে নার্ভাস, বুঝতে পেরেছিলাম, বেরিয়ে এসেছিল, আর গেটের কাছে গিয়ে আমাকে বলেছিল, 'যাবে আমার সঙ্গে?' তখন আমার কোথাও যাবার ছিল না, বাড়ির কথা যতবারই আমার মনে পড়ছিল, ততবারই আমার ঘাড় বেঁকে উঠেছিল, দাঁতে-দাঁত চেপেছিলাম, অকথ্য কতকগুলো গালাগাল মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম, বাবার মুখটা আমার মনে পড়ছিল, উনি আমাকে উদ্ধার করার জন্য হাজত থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে তখন কী করব, কী ইচ্ছা করছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হয় তো ঘরে শুয়ে থাকতাম বা কারুর সন্ধানে যেতাম, সন্ধানে! কিসের সন্ধানে বাছা, কিন্তু কাউকেই হয় তো কোথাও পেতাম না, আর মুখটা এমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল, কপালটা ফোলা, ঠোঁটের কোণটা ফাটা, তখন বেবীর কথা আমার মনে পড়েছিল কয়েকবার। ওর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করছিল, তখন ওর সঙ্গে আমার নতুন প্রেম হচ্ছে, হয় তো ও একটু দুঃখ করতো আমার চেহারা দেখে। ওদের বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু খুব সন্দেহ ছিল, ওকে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে গিয়ে পাব কী না। ওদের বাড়ীটাও দূরে, হয় তো কোথাও বেরিয়ে গিয়েছে, যেমন গিয়ে থাকে, তখন হয় তো, কোন রেস্তোরাঁয় কোন ছেলের সঙ্গে বসে প্রেম করছিল, প্রেম তো করিতেই হইবে,—তারপরে আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে পড়াশোনা আছে, অতএব—কিন্তু ভোলানাথের সঙ্গে কোথায় যেতে বলেছিল ও, উত্তরে? মনে হতেই আমি মনে মনে রাজী হয়ে গিয়েছিলাম, হাজত থেকে বেরিয়ে আসবার পরে, আমার যেন সবই ভীষণ ফাঁকা লাগছিল, পড়তে বসার কথা চিন্তাই করতে পারছিলাম না, পরের দিন কলেজে নিশ্চয়ই ধর্মঘট হবে, অনুমান করেছিলাম, কেন না, নির্যাতনের প্রতিবাদ হবেই। হস্টেলের ঘরে একলা থাকতে ভাল লাগছিল না, বেবীর কাছে যাবার ইচ্ছা থাকলেও ভরসা পাচ্ছিলাম না! এবং ভিতরে ভিতরে একটা রাগ আর ঘৃণা যেন, খুব একটা তীব্র ব্যথা যেমন—যাকে বলে সারা শরীরটাকে আচ্ছন্ন রাখে, সেই রকম করে রেখেছিল, আর মুখটা খুব শক্ত হয়ে উঠেছিল আমার, বলেছিলাম, 'কোন দিন যাই নি।'

ভোলানাথ বলেছিল, 'না হয় আজ যাবে। আমি আবার তোমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে, কফি খেতে খেতে গল্প করতে পারি না। কী আছে বাবা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একটা কথাই তো...।' আমি আবার তখন 'ঠিক অতটা —যাকে বলে 'মোহমুগ্ধ' তা হয়ে উঠিনি, যদি চ, প্রেম সম্পর্কে, ছেলেবেলা থেকেই আমার তেমন কোন ধারণা জন্মায় নি, আমার দিদি অর্পিতা-ই তার খেল্ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং...না, সে মুখটার কথা আমি ভাবতে চাই নি, আর এখন আমার মনেই পড়ছে না, মোটের ওপর, আমার প্রেম-চিন্তার চন্দ্রে তখন হইতেই রাহুর ছায়া পড়িয়াছিল, তত্রাচ কবিতা পাঠ করিয়া সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া, এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া, সিনেমা থিয়েটার দেখিয়া, কী রূপ একটা বিশ্বাস ছিল, হয় তো আমি তাহাদের মত কিছু আবিষ্কার করিতে পারিব, কারণ বেবীর জন্য তখন বুকের মধ্যে কেমন একরকম টনটন করিত, তাহাকে দেখতে ইচ্ছা করিলে, দেখিতে না পাইলে, সহসা বক্ষভেদি দীর্ঘশ্বাস ঝরিত, ডাকিয়া না পাইলে, মন মুষড়াইয়া পড়িত, নিজেকে বড় হতভাগ্য বলিয়া বোধ হইত, মনে হইত, কাঁদিয়া ফেলিব।

কিন্তু আমি ভোলানাথকে সে কথা বলি নি, কেন না, ভোলানাথের সঙ্গে আমার কোন কথা মিলবে, বা ওর ভাবনার সঙ্গে আমার মিল থাকবে, তা সম্ভব ছিল না, কারণ, ভোলানাথকে আমি ভাবতাম, একটা অন্য জগতের মানুষ। তবে সেই সন্ধ্যায়, ঠোঁট ফোলা কপাল ফোলা, ভিতরে, একটা দাঁতে-দাঁত পেষা ভাব, নিঃসঙ্গ আর—আর যাকে বলে একটা অন্ধের মত অবস্থা, যেমন এখন মনে হচ্ছে, আমার ভাবনা চিন্তা ইত্যাদিগুলোতে যেমন কেউ কালো মোটা পর্দায় ঢাকা দিয়ে রেখেছে, সেইরকম অবস্থা, আমি বলেছিলাম, 'চল যাই।' আমরা বাইরে আসতে রাস্তার ওপরে, কে যেন বক্তৃতা করছিল, গলা যথেষ্ট জোরে চড়িয়ে মাইক ছাড়া, রাগত স্বরে, আজকের ছাত্র ও যুবক নির্যাতনের কথা বলছিল এবং যা ভেবেছিলাম, তা-ই, পরের দিন সমস্ত শিক্ষায়তনকে একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হচ্ছিল। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখছিলাম, আমার অচেনা ছেলে একজন বলছে, আমি তাকে চিনি না, আর তখনই ভোলানাথ বলেছিল, 'দেখো ভাই, কাউকে যেন বলো না আজকের কথা, তা হলে আমার ওপর সবাই চটে যাবে, বিশেষ করে অলক বা বিজন, ওদের আমি খুব ভয় পাই, জান তো, আমি বাবা ইউনিয়নের চাঁদা দিয়ে খালাস। আর তোমাদের ওই রুদ্ধ, ও শালা লেখাপড়া করে না বটে, বোধহয়, পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রজীবনই কাটিয়ে যাবে ঠিক করেছে, এদিক তো কোন গুণে ঘাট নেই, কিন্তু ও আমার

ওপর কেন যেন বড্ড চটা। সুপারের মত, ও-ও চায় না, আমি এরকম জামা-কাপড় পরি, আরে বাবা, তোমাদের মত ড্রেন পাইপ যদি আমার পরতে ইচ্ছে না করে। আর সত্যি, ওতে আমার ভারি অস্বস্তি হয়, মনে হয় কুচকিতে হাজা হয়েছে'—এ পর্যন্ত শুনতে শুনতেই আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গিয়েছিল, ওকে আমাদের পলেটিক্স এর প্রফেসর হারাণ চৌধুরীর মত লাগছিল, যে-হারাণবাবু একজন অতি উৎকৃষ্ট নীতি-বাদী মানুষ এবং জুয়োলজির সুরেশবাবুর সম্পর্কে যিনি আমাদের কাছে পর্যন্ত বলে ফেলতেন, 'দেখ, সুরেশবাবুর কথা তোমাদের কী বলব, ও'র স্ত্রী আমাদের বাড়ির মেড সার্ভেন্টটাকে পর্যন্ত ভাগিয়ে নিয়ে গেলেন, তার জন্য উনি একটা কথা তো বলেনই নি, উপরন্তু আমি বলেছি বলে, আমার ওপর তেড়িয়ান হয়ে এলেন। আর উনি এমন অশ্লীল—বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় 'শালা' পর্যন্ত বলেন।'...কী আশ্চর্য, সুসুরেসবাবু সালা পর্যন্ত বলেন! অবিশ্যি উনি আমাদের কয়েকজনকেই এসব কথা বলতেন, সবাইকে নয়। বলতেন একটু হাসতে হাসতে, একটা নিরীহ ভাব নিয়ে, আসল উদ্দেশ্য সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের চটিয়ে তোলবার জন্য, অহিংস মানুষ তো।

ভোলানাথের সেরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কথার ভাবগুলো যেন সেই-রকম, এবং আমাকে হেসে উঠতে দেখে, ও বলেছিল, 'সত্যি মাইরি বলছি, আমার তো শালা উরতের মাংসে ব্যথা ধরে যায়, পরেছি তো দুএকবার, কী করে যে তোমরা পর। সে যাকগে, রুদ্র শালা কেন আমাকে বলবে, তুই কি সুপার? বয়স তো হয়ে গেল সাতাশ আটাশ, এখনো সতর আঠারোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চালিয়ে যাচ্ছে—ও যদি জানে, তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছ, বলা যায় না ভাই, দালালটালাল বলে বসবে কি কী বলবে—ও হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারে, ওর কথা শুনে তোমরাই হয়তো আমাকে পেঁদিয়ে আটা উড়িয়ে দেবে।'

ভোলানাথ অবিশ্যি কথাগুলো একেবারে মিথ্যে বলেনি, রুদ্র সেইরকমেরই, ও ইচ্ছা করলে, কোন ছেলের পিছনে লেগে, তার লাইফ হেল করে দিতে পারে। বিপ্লব বা অলক—কানাইয়ের কথা আমি বাদই দিচ্ছি, কেননা, ওর নামটা আমি এক নিঃশ্বাসে ওদের সঙ্গে উচ্চারণ করতে চাই না, ও একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনালিটি, ওর কথা বাদ, আমি বিপ্লব অলকদের কথা বলছি, ওদের সেরকম প্যাচ জানা নেই, খানিকটা সোজা-সুজি, কিন্তু রুদ্রর জাত আলাদা। নিজেদের মধ্যে ফ্র্যাকশনালিজম করতে ওস্তাদ, হিংসুটে, ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বিদ্রূপ করতে পারে সবাইকে, কাকে রাখবে, কাকে এলি-মিনেট করবে, এসব চিন্তা সব সময়ে ওঁর মাথায় ঘোরে, আর এসব করে শুধু নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য, তবু ছেলেরা ওকে মেনে নিয়েছে, ও সবাইকে বশে আনতে পারে, রাখতে পারে—যদি এটাকে গুণ বলতে হয়, তা হলে তা-ই, কিন্তু সমস্তটাই ওর ভঙ্গি, কথার চাতুরি—যে কারণে ও অ্যাজি-টেশনটা ভাল জানে, ছেলেরা—আমিও, ওর কথা শুনলে ভুলে যাই, ওকে না মেনে পারি না, যদি চ, 'বিশ্বাসঘাতক, তোর দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।' আগে আমি বুঝতাম না, আগে রুদ্র রুদ্র করে মরে যেতাম—এটা ঠিক যে ও আমাদের থেকে বয়সে বেশ কিছু বড়, কিন্তু এখনো ছাত্র, যে কারণে ভোলানাথ বলেছিল ও পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র থাকবে, তা হলেও আগে ওর সবকিছুই ভাল লাগত, হয়তো এখনো লাগত, যদি না আমার কাছে ও ধরা পড়ে যেত, ও কী, ও কে, ও কী করে যাচ্ছে। ও নিজেও জানে না, কী ভাবে আমার কাছে ধরা পড়েছে, বন্ধুদের বললে, ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না, কারণ আমি দু-একজনকে বলতে চেষ্টা করে-ছিলাম, তারা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে এবং মিহির বলেছে, 'যদি সেরকমভাবে কিছু প্রমাণ না করতে পারিস, তবে রুদ্র তোর লাইফ হেল্ করে দেবে।'

সেটা আমি নিজেও জানি, আমি বিপ্লব নই, কানাই নই, অলক বিজন নই, কেন না ওদের মতবাদ রাজনীতি ইত্যাদি আছে, ছাত্রজীবন থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও, ওদের সেসব থাকবে, অতএব রুদ্র ওদের কোনদিনই কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আমার পিছনে ও লেগে থাকবে, আমার ক্ষতি করবে। অবিশ্যি কী ক্ষতিই বা ও আমার করতে পারে, তাও জানি না, আসলে আমি বোধহয় ওকে ভয় করি, সন্দীপকে যেমন ভয় হয় না, কেননা রবিঠাকুর সন্দীপের চরিত্রের কথা যেভাবে লিখেছেন, সেটা শুধু ফাঁকি আর লোভ, তার ওপর রাগ আর ঘৃণা হতে পারে, কিন্তু তাকে ভয় হয় না, কারণ সন্দীপ এনিমি অব দ্য এজেন্ট ছিল না, সন্দীপ স্পাই ছিল না, কিন্তু রুদ্র প্রেসরি পেক্ মার্কা ভঙ্গি করে, আর বোম্বাই হিরোর চালে, বিপ্লবের থেকেও বড় বৈপ্ল-বিক বুলি, রুদ্র একটা টিক-টিকি মাত্র, বাস্টার্ড। পরে সর-স্বতীর মুখে আমি শুনেছিলাম, তাহার জরায়ুমধ্যস্থিত ভ্রূণটি রুদ্রর পাল ছিল, এবং সরস্বতী নিজে সেদিন মিছিলে আসতে চায় নি, রুদ্রর রেভ্যালশনারি ভ্যানিটিতে নাকি আঘাত লাগতো, 'তুমি আস্তে আস্তে একটু যেতে পারবে না?' তাই গিয়েছিল এবং সরস্বতী স্বীকার করে-ছিল এই জন্য যে, রুদ্র তখন ওর কাছ থেকে

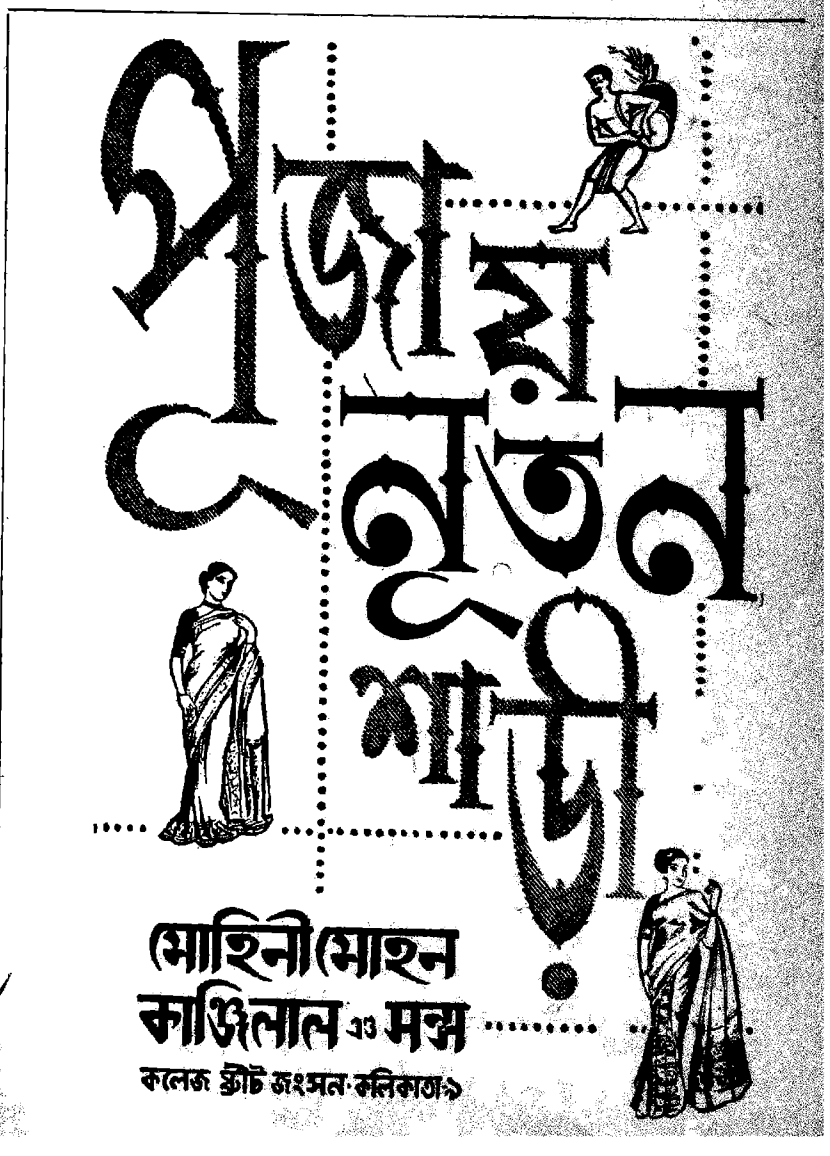

গেছে গিয়েছিল, কিন্তু আমি ভাবি, এমন অদ্ভুত আবদারই বা কেন করেছিল রুদ্র, লক্ষ্মী কি সরস্বতী না গেলে, ওর, যাকে বলে, নেতৃত্বের অভিমানে লাগতো, না কি আর অন্য কোন কারণ ছিল, যদি চ, আমি এটা ভাবতেই পারি না, সরস্বতীর এমন কোন দায়িত্ব ওকে নিতে হবে, সেই ভয়ে, ছেলে শুলে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কারণ অ্যাবরশনের ব্যবস্থা সরস্বতী নিজেই করেছিল, এমনকি নার্সিং হোমের খরচটাও ও নিজে দিয়েছিল, অবিশ্যি, পুলিশ ওকে ওর কথা মত অ্যামবুলেন্সে করে নার্সিং হোমেই পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেদিন ও আসলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নি, এবং ডাক্তার ওকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু এই কারণে রুদ্রকে আমি খুব একটা দোষ দিই না, অন্তত সরস্বতীর কনসেপ্‌শন হয়ে যাবার জন্য, মেয়েদের পেট তো এমনি হয় না, যদি চ, কন্যাসকলরা এইরূপ বলিতে অভ্যস্ত, 'অমুকে আমার পেট করেছে' বা ওদের কথার ভঙ্গিই এরকম, ওকে অমুকে মানে অমুক ছেলে কিছু করেছে, যেমন ছেলেরা বলে, আমি ওকে কিছু করেছি। ওরা করে না, ওদের করে, আমরা করি, এটা বোধহয় একটা—চিরায়ত কথার ভঙ্গি, কিন্তু এর দ্বারা সন্দীপ বিমলার কথা আমি বলতে চাই না, হঠাৎ মনে এল, তাই ভাবলাম, আসলে সন্দীপকে যদি বা একটু আধটু চিনতে পারি, বিমলাকে চিনি না, বুঝি না, নিখিলেশ নামক ব্যক্তিরা কোথায় থাকে, আমার জানা নেই, আমি ভাবছি, রুদ্র কি এযুগের সন্দীপ, অথবা সন্দীপও একটা কল্পনার চরিত্র ছদ্মবেশ পরানো, আমি জানি না, রুদ্র হইল বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্বনাশ, সুচিক্কণ রজ্জুবৎ নিরীহ দর্শন, কিন্তু বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায় দংশন করিয়া যাইতেছে। পুলিশে ঘিরে রাখা, আমাদের শিক্ষায়তনে, যেদিন আমরা আটকে ছিলাম, সেদিন আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম, দক্ষিণের তিনতলা থেকে রুদ্র, রাস্তার ওপর পুলিশের গাড়িতে, ছোট কী একটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেটা কী। তারপরেই একটা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে, কয়েকজনকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে বলেছিল বিশেষ একটা জায়গা দিয়ে, যদি চ, পাঁচিল টপকাবার একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু সব কজনই ধরা পড়েছিল, সাঁ করে সেখানে পুলিশের গাড়ি এসে পড়েছিল এবং প্রত্যেককে মারধোর করা হয়েছিল, এবং হঠাৎ কোথা হইতে বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল পুলিশের গাড়ির কাছাকাছি, কেহ বলিতে পারে না এবং পুলিশ নেকড়ের ন্যায় প্রবেশ করিয়া আমাদের সবাইকে পিটাইতে পিটাইতে বাহির করিয়াছিল। রুদ্র রহস্যময় নহে, স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ন্যায়, প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব না, কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব না, ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। রুদ্রকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী ছুঁড়ে ফেলেছিলে' ও এমন আশ্চর্য হয়ে, অবাক একটা হাসি হেসেছিল, যার মধ্যে বিস্ময় ঝলকে উঠেছিল, বলেছিল, 'ডিমিং? তুইমুন টিয়ার চাপিয়েছিলে নাকি? আমি দেখতে গিয়েছিলাম ওদের পজিশনটা।' বটে। শ্রীহরির রেস্তোরাঁয়, যেখানে আমরা নিয়মিত বসি, সেখানে প্রায়ই রুদ্রর ফোন কল্ আসে, একদিন রুদ্র ছিল না, আমি—আমার মধ্যে যে একটা ঘুঘু আছে—জানি না, ঘুঘুরা টিকটিকি খায় কী না, কিন্তু ফোনটা বেজে উঠতে, কাউন্টার থেকে যখন রিসিভারটা তুলে, কানে শুনে, ম্যানেজার বলেছিল, 'রুদ্রবাবু' তৎক্ষণাৎ আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ঘুঘুটা জেগে উঠেছিল, আমি রিসিভারটা নিয়ে, যথাসম্ভব রুদ্রর বিশেষ ভঙ্গিতেই বলেছিলাম, 'হুম্—হ্যালো—রুদ্র বলছি—' ওপার থেকে, খসখসে গলা ভেসে এসেছিল, 'আচ্ছা, আমি 'ইউ' বলছি, সতর তারিখে, কনসুলেটে যে মিছিলটা যাবে, তার অ্যাডভান্স রিপোর্টটা ইমিডিয়েটলি পাওয়া দরকার.....।' শুনতে শুনতে আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল, আমার যেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, কে লোকটা, কে কে, কিন্তু আমি আসল ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছিলাম, তখনো শুনছিলাম, 'ডিচেল্, রুটস্, লীডারস্...হ্যালো...' আমি রুদ্রর মত কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, গলার স্বর নকল করতে পারছিলাম না, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ওপার থেকে, কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বেজে যাবার পরে একটা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন কেবল শোনা গিয়েছিল, 'হু আর ইউ?' তারপরেই কট্ করে লাইন কেটে দিয়েছিল, রিসিভার রেখে আমি সরে এসেছিলাম, এবং একটু পরেই মিহির এসেছিল, ওকে আমি সব কথা বলেছিলাম, মিহির প্রথমত ব্যাপারটাকে আমার মত করে নিতে চায় নি, ভাবতেও পারে নি, ভেবেছিল, আমাদেরই কেউ চেনা-শোনা কিছু বলেছে, তারপরে আমাকে বলেছিল, 'যদি সেরকম ভাবে কিছু প্রমাণ না করতে পারিস, তবে রুদ্র তোর লাইফ হেল্ করে দেবে।'.....

আমিই ওর লাইফ হেল্ করব। আজ এখন আমার ভিতরটা কেমন হয়ে আছে, চারদিকে পর্দা ঢাকা দেওয়া অন্ধকারের মত, কিছুই মনে করতে পারছি না, কিন্তু আজ এখন, সেই ঘেরা অন্ধকারের মধ্যে, আটকা পড়া ফড়িং-এর মত, পাখা ফরফরিয়ে এই চিন্তাটি আমার মধ্যে ঘুরছে। কিন্তু ভোলানাথ যখন রুদ্রর নামে ওরকম বলেছিল, তখন আমি বিশ্বাস করি নি, ভেবেছিলাম, ভোলানাথটা ওইরকম, নিজে একটা উল্লুক, কিছুই বোঝে না, বাজে বকবক করে, এবং আমি বলেছিলাম, ওর সঙ্গে যাবার কথা কাউকেই গল্প করব না, যদি চ আমাকে নর্থে নিয়ে যাওয়াটা ওর কাছে আসলে কোন অন্যায় ছিল না, ওর ভয় ছিল, জানতে পারলে, রুদ্র ওর পিছনে লাগবে। আমি ওর সঙ্গে নর্থে গিয়েছিলাম, এবং সেই প্রথম, এবং গিয়ে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত আমি কোন কৌতূহল বোধ করিনি, তখনো আমার মুখটা শক্ত হয়েছিল, ভিতরে রাগ আর ঘৃণা উথলে উঠছিল, পল্লীতে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম, গৃহের দরজায় জানালায়, নানাবেশে স্ত্রীলোকসকল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কলিকাতা নগরের কী বিচিত্র রূপ, তখন পুরাতন দিনের সংবাদপত্রের একটি পত্রের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল, পত্রলেখকের নাম শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, তিনি পত্রদ্বারা মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কলিকাতাতে বারাঙ্গনাগণ সর্বত্র ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে—থাকিবেই, কারণ আপনাপন গৃহের সন্নিকটেই বাবুগণ তাহাদের উপপত্নীদের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতেন, এবং সেইসব উপপত্নীদিগকে কেন্দ্র করিয়া দেহব্যবসায়িনী অন্যান্য নারীগণ আসিয়া জুটিত, স্বভাবতই সেইসব গৃহে নানা ব্যক্তির আগমন ঘটিত, তাহাই পল্লীতে পল্লীতে বেশ্যালয় সৃষ্টি করিয়াছিল—অতএব, পত্রলেখক সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইতেছেন, কলিকাতাতে যে প্রকার বারাঙ্গনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গৃহস্থের পল্লীসমূহে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য পল্লীর পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, অনুরোধ, বারাঙ্গনাদের একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা হউক।

ভোলানাথের সঙ্গে যেখানে গিয়েছিলাম—নর্থ, সোনাগাছি নয় কেন জানি না, তখন সেই পত্রের কথা মনে পড়েছিল, ভেবেছিলাম, এই তাহা হইলে সেই সমগ্র কলিকাতার শুচিতা রক্ষার জন্য, নির্দিষ্ট অশুচি অপবিত্র স্থান! নিবারণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে যতই ঢুকছিলাম, ততই আমার ভিতরের ঘৃণা আর রাগের বদলে, একটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাব, মনের মধ্যে নেমে আসছিল। চারদিকে, গোলমাল, ভিড়, দোকানে দোকানে আলো, রেডিওতে চিৎকার, নিরুপায় রবীন্দ্রসংগীত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় বেতারে বাজছিল, এবং সত্যই কি, পল্লীতে যেসব ব্যক্তিরা আগমন করিতেছিল, নানাবেশে, নানা ভঙ্গিতে, শকটে বা পদব্রজে, এবং যেসকল স্ত্রীলোকেরা নানা বেশে সজ্জিত হইয়া, জানালায় বা বাটির অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে দর্শাইতেছিল, তাহাদের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য? আমি বিস্মিত হইতেছিলাম, কৌতূহল বোধ করিতেছিলাম, অহো কলিকাতা কলিকাতা, তুমি আমাদিগের কলিকাতা। উহা নিষিদ্ধ পল্লী—আগমন কর, কাতারে কাতারে আইস, কিন্তু জানিবে ইহা নিষিদ্ধ পল্লী, নিষেধ নিষেধ—হ্যাঁ আমার ভিতরে কেমন যেন একটা নিষেধের ছায়া পড়েছিল। একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব মনের মধ্যে, আমার কপাল ফোলা, ঠোঁট ফোলা। কিন্তু রাগ আর ঘৃণার বদলে, আমার ভিতরে একটা অন্যরকম ভাব লাগছিল, ভোলানাথের সঙ্গে আমি একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম, দোতলায় উঠে ভোলানাথ একটা ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল, 'একটি মেয়ে—তাকে মেয়ে বলা যায় কী না, আমি জানি না 'মেয়েমানুষ' এই কথা আমার মনে হয়েছিল, একটা মেয়েমানুষ, শরীরে চেহারায় পোষাকে, একরকমের মেয়েমানুষ, যার সবকিছুই মেয়েদের মতই অথচ যেন

মেয়েদের মত নয়, কিংবা আমার নিজের সেইরকম মনে হয়েছিল, কিন্তু যাহাকে, কামভাব বলিয়া থাকে, তাহার কিছু-মাত্র আমার মধ্যে উদয় হয় নাই, বরং আমার মনের অন্ধকারে, একটা বিতৃষ্ণা বোধ হইতেছিল। মেয়েমানুষটি একটা মোটা গদীর বিছানায় বসেছিল, ভোলানাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'এস। ইটি আবার কে?' ভোলানাথ আমাকে ডেকে গদীর ওপর বসেছিল, আমি তার কাছেই বসেছিলাম, ভোলানাথ বলেছিল, 'আমার বন্ধু।' মেয়েমানুষটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এর কপালে মুখে কী হয়েছে, মারামারি করে এসেছে নাকি কোথাও।' বলতে বলতে দরজা বন্ধ করে, ভোলানাথের কোল ঘেঁষে বসেছিল, বেশ ভাল চেনা পরিচয় নিশ্চয় ছিল নইলে আর অমন করে কথা বলবে কেন, বসবে কেন, ভোলানাথ বলেছিল, 'না পুলিশে মেরেছে, ও ছিল তো সেখানে।' 'ও মা, তাই নাকি, ইস্! হ্যাঁ শুনলাম, গুলি চলেছে নাকি?' আমাকেই জিজ্ঞেস করেছিল, আর আমি যেন অদ্ভুত কিছু দেখছি, সেইভাবে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'না।' কেন জানি না, সে সময়ে মায়ের কথা আমার মনে পড়েছিল, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীটির কথাও মনে পড়েছিল, বেবীর কথা মনে পড়ছিল, সেদিনের অন্য সব ঘটনার কথা একেবারে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম, ভোলানাথ মেয়ে-মানুষটির কোমরের কাছে হাত দিয়ে, আমার সামনেই তাকে ওর কাছে টেনেছিল, আর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একে চলবে?' পরিষ্কার কথা, কিন্তু তখন এমন অদ্ভুত শুনিয়েছিল কথাটা আমার কানে, প্রায় যেন বুঝতেই পারি নি, অহো, এখন নিজেকে বলতে ইচ্ছা করে, মা কি হইয়া-ছেন, তখন কী ছিল, এখন ভোলানাথকে আমিই শেখাতে পারি, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অ্যাঁ?'

মেয়েমানুষটি আমার দিকে চেয়ে, কেমন চোখে ঝিলিক দিয়ে তাকাচ্ছিল, হাসছিল, আর ভোলানাথ আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একে ইচ্ছে হয়?' আমি তাড়া-তাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'না না ঠিক আছে।' শুনে ওরা দুজনেই হেসে উঠেছিল, আর ভোলানাথ বলেছিল, 'বাহ্, ঠিক আছে আবার কী, একজন কাউকে চাই তো, আচ্ছা ঠিক আছে, গায়ত্রী—' গায়ত্রী! অহো কী পবিত্র নাম, 'এর জন্য কাউকে দেখ তো।' মেয়েমানুষটি—যার নাম গায়ত্রী, সে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি ভোলানাথকে বলেছিলাম, 'থাক না, আর একদিন আসব, মানে—' গায়ত্রী একটি মেয়েকে নিয়ে ঢুকেছিল। জিন্ স্ল্যাক পরা, ঘাড়ের দুপাশে দুটো বিনুনি দোলানো, বয়স বোঝার মত নজর আমার এই পাপচক্ষে ছিল না গায়ত্রীর থেকে বয়সটা কিছু কম মনে হয়েছিল, যদি চ বারাঙ্গনাটি আমাদিগের উচ্চকোটি সমাজের আলোকপ্রাপ্তা তরুণীর মত সাজিয়াছিল এবং নিজেকে বালিকাবৎ রূপে উপস্থিত করিতে চাহিতেছিল, তত্রাচ তাহার বক্ষস্থলের বিশালত্ব, সম্মুখে তীরের মত তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, একটি খোঁচা লাগিলেই পৈতৃক প্রাণটি গত হইয়া যাইবে। অবিশ্যি অমন বুক রাস্তাঘাটে, আমাদের চার পাশে, কলেজে রেস্তোরাঁয়, সব জায়গাতেই দেখতাম, সম্ভবত পোষাকের জন্যই, অমন মারাত্মক দেখেছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে হবে, তার চোখ মুখ খুব খারাপ ছিল না, সব মিলিয়ে, চেনাশোনা অনেক মেয়েদের থেকে ভাল, যদি চ, আমার মনের অন্ধকারে কীরকম একটা—একটা যেন অলৌকিক ভাব জাগছিল—যেমন অনেক সময়, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকলে যেরকম হয়, সেটা যে কীরকম একটা ভাব, শুধু ভয় নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু, যা আমি বলতে পারি না, তবু আমার শরীরে মধ্যে দপদপ করে উঠছিল। আমার শরীরের নিচে, একটা জায়গাতে যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার চাংড়া জ্বলছিল, আর তার উত্তাপে আমার সমস্ত শরীরের রঙ বদলে যাচ্ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু যেন বুঝতে পারছিলাম। এবং বেবীর সামনে আমার ঠিক সেইরকম হয়নি, সেখানে যেরকম হয়েছিল। ভোলানাথ আমাকে জিন্ স্ল্যাকের সঙ্গে তার ঘরে যেতে বলেছিল, আর সেও হেসে, যেন সিনেমার নায়িকাটি, বলেছিল, 'আসুন।'

পৃথিবীতে ইহা হইতে সহজ আর কী আছে, চলিয়া আসুন, চলিয়া আসুন, পথিক, কেবল তো চলিয়া যাওয়া লইয়া কথা, পথ তো পড়িয়া রহিয়াছে। এবং ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকমই, আমি ভোলানাথের দিকে একবার দেখে, তার সঙ্গে গিয়েছিলাম, সে এমনভাবে বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল যেন কল্যাণী ডেয়ারির সৌরাটি বকনা—মানে যাকে বলে, না বিয়নো গাভী—বকনা গাই কথাটা আমাকে নীতিশ শিখিয়েছিল, আর সেটা কোন কোন মেয়েকে দেখিয়েই ও বলতো, 'বালিকাটি বকনা ভগবতীর মত পাছা দুলিয়ে যাচ্ছে—ওকে আজ খাব' নীতিশটা সত্যি পারভার্ট, ও শুধু খায়, খাদ্য খাদক সম্পর্ক ছাড়া কিছু মানতে চায় না, এবং খাওয়া মানে, কন্যাটিকে স্মরণ করিয়া, কামচরিতার্থ করিয়া থাকে, মেয়েদের সম্পর্কে ওর কোন বাছাবাছির বালাই নেই, ও অনেকটা ষাঁড়ের মতই, দ্য বিগ বুল্, বকনা সম্পর্কে সেইজন্যই বোধহয় দুর্বলতা একটু বেশী এবং বকনা ঠিক বাছুর বিয়নো গাভীর মত ধীরে চলে না, একটু তাড়াতাড়ি, যে কারণে তার নিতম্বের দোল একটু বেশী অথচ বিশাল নিতম্বিনী। জিন্ স্ল্যাক-এর চলাটা দেখে আমার সেই-রকমই মনে হয়েছিল, সে তার ঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করেছিল, প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোথায় মারামারি করেছ, এই কথা জিজ্ঞেস করেছিল, যেন মারামারি করা ছাড়া আর কিছু ওরা চিন্তা করতে পারে না, এবং আমিই একই কথা বলে-ছিলাম, ও আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, সামনে থেকে মুখটা দেখেছিল, দু একটা কথা কী বলেছিল, আমি ঠিক যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না, আমার ভিতরে অন্ধকারটা যত ভারী আর জমাট হয়ে উঠছিল, কোমরের নিচে জ্বলন্ত কয়লার চাংড়াটা যেন তত গনগনিয়ে উঠছিল, আমার মস্তিষ্কে আর কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছিল না, জানি না, তখন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল, যদিও বড় আয়না ছিল সামনে, কথা বলতে পারছিলাম না, সে সময়ে ছেলেদের কি সুন্দর দেখায়, লতিকা তা-ই বলে, যে, ছেলেরা যখন উত্তে-জিত হয়ে একটা মেয়ের সামনে দাঁড়ায়, তখন তাদের শিশুদের মত বোকা আর মিষ্টি লাগে, তখন তাকে নিয়ে মেয়েদের খেলতে ইচ্ছা করে, আদর করতে ইচ্ছা করে, এবং হয়তো ব্যাপারটা তাই, কিন্তু আমার নিজের মনে হয়, তখন সে অন্ধের মত, একটা কিছু খুঁজে বেড়ায়, সেইজন্যই বোধহয় শুক্রদেব—দেবতাটি—তবে কী না, লোকটি অসুরের দেবতা, হতেই হবে, কারণ এক চোখ কানা, একটা চোখ দিয়ে সে, একটা জিনিষই দেখতে পায়, এবং এক বগা একদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়, নিজেকে আমার তেমনি মনে হয়েছিল। জিন্ স্ল্যাক আমার কাঁধে হাত দিয়েছিল, আমার হাত ধরে, তারও গায়ত্রীর মত গদীটার ওপর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর গুনগুন করে কী একটা গান করছিল, চোখে ঝিলিক হানছিল, যেমন সিনেমা টিনেমায় দেখানো হয়, বোধহয় ওরকম করতে হয়। আমার সেইরকম ধারণা হয়েছিল, যদি চ আমার নিজের থেকে ওর গায়ে হাত দেবার তেমন ইচ্ছা হচ্ছিল না, চুমো খাবার কথা তো মনেই হয়নি। ও ওর সেই বুক, যেন বড় একটা কাঁচের মুখ ফাঁক করলে, সোজা দুটো খোঁচা দেখা যায়, সেইরকম বুক দিয়ে আমার গা ছুঁয়েছিল, অন্ধকার অন্ধকার, বেবীকে কি আমি ভালবাসি না, একথা একবার মনে হয়েছিল, অন্ধকার অন্ধকার, কিন্তু একটা প্রকান্ড আগুনের উত্তাপে আমি যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম, গদীর ওপর দাঁড়িয়ে, ও ওর গোটা শরীরটা দিয়ে আমার শরীরে চাপ দিয়েছিল, এবং কীভাবে কোথায় হাত দিয়ে বোতাম খুলেছিল জানি না, দেখে-ছিলাম ওর গায়ের থেকে জিন অ্যান্ড স্ল্যাক খুলে পড়েছিল, শুধু ব্রেসিয়ার বুকে আঁটা। ঘাড়ের দুপাশে দুটো বিনুনি, বুকে ব্রেসি-য়ার, একটা উলঙ্গ মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমি দেখছিলাম, আর তখনো ও সেই গানের কলি গুনগুন করছিল, কেন, আমি তা বুঝতে পারছিলাম না, আমাকে খুশি করার জন্য, না ওর নিজের মনের খুশিতে—খুশি! খুশি কি হয় ওরা, আমি জানি না, কিংবা ওটা হয়তো ওর নার্ভাস-নেস—প্রথম যখন সমাজের শুচিতা রক্ষার্থে এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তখন থেকেই হয়তো এই গুনগুনানির শুরু, যেন ওর কিছুই হয়নি, কিন্তু আমার কাছে সেটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল না যে, মন থেকে গান করছে, একটা যন্ত্রের ভিতর থেকে যেন শব্দটা অন-বরত বেরিয়ে আসছিল, এবং ও পিছনে হাত দিয়ে ব্রেসিয়ারটা খুলেছিল, যা দেখলেই মনে হয়, সব মেয়ে একরকমভাবেই এটা খোলে, সব মেয়েই একরকম, আর ওর বড় বড় বুক দুটো—বুক আবার দুটো হয় কেমন করে, বলিতে হয় স্তনদ্বয়, চেস্ট ব্রেস্ট তো আর এক নয়, তবু আমরা বুকই বলি, রবিটা—আমাদের বন্ধু, ঢাকায় ওদের বাড়ি ছিল, ও কিছুতেই এদেশের কথা বলতে পারে না, ও বলে, 'দুধ দুইটা' অর্থাৎ স্তন-জোড়া, ব্রেসিয়ারটা খুলতেই, যেন ঠাস করে দুটো থলথলে পিন্ড পড়ে গিয়েছিল, তবে যতটা ভাবা গিয়েছিল, ততটা নয়, বৃন্ত দুইটি আমার চ্যুতমুকুল বলিয়া মনে হয় নাই, বরং কেমন যেন মাঝারি আকারের রুদ্রাক্ষের মত দেখাচ্ছিল, রঙও যেন সেই-রকম, আমার হাত দিতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু তখন আবার বেবীর কথা আমার মনে হয়েছিল, কারণ বেবী ছাড়া তখন পর্যন্ত আর কোন মেয়ের বুকে আমি হাত দিইনি, অন্ধকার এত ভারী আর জমাট মনে হয়ে-ছিল, আমি আর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি-লাম না, তখন অন্ধকারের বোধটাই হারিয়ে গিয়েছিল, আর আমি শুধুমাত্র এক চাংড়া জ্বলন্ত কয়লাতে পরিণত হয়েছিলাম, আর কোন অস্তিত্বই আমার ছিল না, এবং ও সেই জ্বলন্ত চাংড়াটাকে খুঁচিয়ে আরো যেন উস্কে দিয়েছিল, বলেছিল, 'কী হল খোকা-বাবুর, এস' বলে গদীর ওপরে চিত হয়ে শুয়ে, একটা হাঁটু ভেঙে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, তেমনিই ঝিলিক হানছিল, গুনগুন করছিল, যেন বড় সুখে ওরকম করছিল, কিন্তু সুখ কি ওর সত্যি ছিল, তারপরে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'কী হল, ভোলানাথের বন্ধুকে কি পাত-লুনও খুলে দিতে হবে' বলে সত্যি সত্যি খুলে দিয়েছিল, আর ঠিক সে সময়েই বাইরের থেকে দরজায় ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হয়েছিল, আমি তাড়াতাড়ি প্যান্টটা পরতে যাচ্ছিলাম, ও বলেছিল, 'থাক পরতে হবে না।' দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে?' বাইরের থেকে শোনা গিয়েছিল, আমি গায়ত্রী, দরজাটা একটু ফাঁক কর, একটা জিনিস দেব।' ও বলেছিল 'দাঁড়া।' বাঁ পাশে সুইচ্ ছিল, সেটা অফ করে দিয়ে, দরজাটা সামান্য ফাঁক করেছিল, গায়ত্রী কী একটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'ভোলাবাবু বন্ধুকে এটা দিয়েছে।' তারপরে দরজা বন্ধ করে, ও আবার আলো জ্বেলেছিল, আমার কাছে তখন আলো অন্ধকার সমান, কিন্তু ও কেমন সহজভাবে, দুটো বিনুনি দুলিয়ে, একেবারে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করছিল, বাতি নেভা-বার কোন দরকারই মনে করছিল না, ছোট একটা প্যাকেট খুলে, আমার দিকে নীপল্-লেস কন্ এগিয়ে দিয়েছিল, তার আগে আমি ও জিনিস কখনো ব্যবহার করিনি, এবং আমাকে হাত ধরে টেনে ও আবার শুয়েছিল, আর বলতে গেলে, ওর দুই উরু আর জংঘার মাঝখানে, জ্বলন্ত চাংড়াটাকে গ্রাস করছিল। ইহাকে বলে, রতিলীলারূপ সমর সময় উপস্থিত হইল। তখন 'ভূজলতাতে আবদ্ধ হইয়া, স্তনভারে নিপীড়িত নখাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও নিতম্বতাড়নে বিষম আহত' এই-রূপ এক সংগ্রামের সময়ে, আমার কপালে যেখানে পুলিশের লাঠি পড়েছিল, সেখানে ঠুকে যাওয়ায় ভীষণ ব্যথা করে উঠছিল।...

কেমন করে যে ভুরুর এখানটা ফুলে উঠেছে, কখন কোথায় কীভাবে লাগল, কিছুই মনে করতে পারছি না। রোদটা কি, সত্যি, সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে গরগর করছে, অথচ আমার ঘাম হচ্ছে না, যেন তেল-তেলে আঠা আঠা ভাবের কিছু মুখে হাতে জমে উঠছে, আর হাতে, ডানায়, আঙুল-গুলো অসম্ভব ব্যথা, তলপেটের কাছেও যেন ব্যথা করছে, কিন্তু আমি তো কোনরকম বেগ বোধ করছি না বা কয়েকদিনের মধ্যে আমিব্যাসিসের তাড়না ভোগ করিনি, ওটাই তো আমাকে ভোগায় এবং ডাক্তার বলে দিয়েছে, এটা জীবনে কখনো সারে না, বাড়ে কমে মাত্র, অতএব, মাঝে মাঝে তাড়না করবেই, কিন্তু এখন আমার কী হয়েছে। মুখের সেই দুর্গন্ধটা যাচ্ছে না, থুথু আর নেই ফেলবার মত, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, আর রোদ—এই রোদটা নিশ্চয় আমার দিকে বড় বড় রক্তচোখে তাকিয়ে আছে, আমাকে খেতে চায় বোধহয়, তাই এরকম গরম হাওয়া ছাড়ছে এবং আশ্চর্য, কোথা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ—জেস্মিন নাকি অন্য কিছু, বুঝতে পারছি না, মাঝে মাঝে আমার নাকে এসে লাগছে। এই আগুনের মধ্যে, এই ভয়ঙ্কর দুপুরে, যেখানে একটা গাছপালা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে এই ফুল ফুল গন্ধ

কোথা থেকে আসছে। আমার চারপাশে কি কোন অলৌকিক কিছু ঘটছে, কারণ এইরকম জ্বলন্ত দুপুরে, কাছেপিঠে একটা লোক নেই, নিঝুম, দরজা জানালা বন্ধ শহরটা যেন থম্‌থম্‌ করছে, আর ডাইনোসরের মত অতিকায় একটা কিছু যেন নিঃশব্দে আকাশ-সমান উঁচু হয়ে, চুপিচুপি আমার দিকে আসছে, বহু যুগ আগের একটা কলকাতা শহর, সূর্যের এত নিকটে চলে গিয়েছে যে, কলকাতাবাসীরা সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কালো মত কী একটা এসে আমার সামনে দাঁড়াল—দাঁড়াল না, আস্তে আস্তে চলছে, আর একটা শব্দ হতেই বুঝতে পারলাম, ট্যাকসি, আমি হাত তুলতেই, আমাকে খানিকটা ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল।

আমি যেন জীবন পেলাম, এইভাবে ছুটে গিয়ে, গাড়িটার হাতল ধরলাম, রঙ ওঠা, লোহা বেরিয়ে পড়া, জঙধরা পুরনো ঝরঝরে গাড়িটা, তেতে আগুন হয়ে আছে। আমি হাতলটা টিপে খোলবার চেষ্টা করলাম, খুলতে পারলাম না, ভিতর থেকে লক করা রয়েছে বোধহয়, আমি ড্রাইভারের দিকে তাকালাম, আর আমার যেন মনটা কেমন চমকে উঠল, এও কি, ট্যাকসি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে অন্য কেউ, সেই রিকশাওয়ালাটার মত। লোকটা মোটা, কালো, কালো সান্‌গ্লাস চোখে লাগানো, কালো রঙেরই একটা জামা, এবং জামার বুক খোলা, সেখানে কালো কোকড়ানো ঘন লোম। আমি ওর চোখের দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যেন ওর দৃষ্টি আমার টেরিকটের জামা ভেদ করে গায়ে বিঁধছে। লোকটা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না, ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল, আমি ভিতরে ঢুকতে গেলাম, কিন্তু ভাঙা পুরনো গাড়িটার দরজায় একটা খোঁচা মত কী বেরিয়েছিল, তাতে আমার প্যান্টের পকেটের কাছে একটু ছিঁড়ে গেল। লোকটা মিটার ডাউন করল, অথচ আমি কোনরকম টিঙ্‌ শব্দ পেলাম না, পুরনো ঝরঝরে গদীর গর্তে, আমি যেন কোন অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেলাম আর চমকে উঠলাম, সাপের মত একটা কিছু দেখে, আসলে সেটা গাড়ির ভিতরে বডির লাইনিং-এর খসে পড়া রবারটা ঝুলছে। গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল, অথচ সে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না, দৃষ্টি তার সামনের দিকে। যেন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ওর যেখানে ইচ্ছা, আমাকে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমি কোথায় যাব, তা কিছুই ভাবি নি। আমার এখন কোন ঠান্ডা অন্ধকার ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে, না, কোন এয়ারকনডিসনড সিনেমা বা বারে বা রেস্তোরাঁয় নয়, নিরিবিলি কোথাও, যেখানে কেবল আমি আর রীনা বা বেবী বা লতিকা এরকম কেউ থাকবে, যে-ই হোক, একজন কেউ না থাকলে, আমি একলা থাকতে পারব না, আমি কিছুতেই যেন এখন একলা থাকতে পারছি না, কাউকে, কোন মেয়েকেই আমার কাছে পেতে ইচ্ছা করছে, দরকার হলে নর্থে যেতেও রাজী। কিন্তু ওদের কাউকে কি এখন আমি বাড়িতে পাব। লতিকার কথা আলাদা—।

'কোথায় যেতে হবে?'

আমি এমন চমকে উঠেছিলাম, ঠিক যেন ম্যাকবেথের ভূমিকায় জনৈক পারচিত অভিনেতার গলার মত শুনিয়েছিল স্বরটা। রাস্তাটা সামনে বন্ধ, ডাইনে আর বাঁয়ে চলে গিয়েছে, তাই বোধহয় জিজ্ঞেস করেনি আগে। আমি বললাম 'ডাইনে'।

কিন্তু ডাইনে গিয়েই বা আমি কোথায় যাব। ওদের কাউকে কি আমি বাড়িতে পাব এখন। অবিশ্যি বেবী বা রীনাদের সঙ্গে, ওদের বাড়িতে বসে আড্ডা দেবার বা গল্প করার কোন প্রশ্নই নেই—মানে সেভাবে নেই, যাতে নিজেদের ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারি। এমনি বসে কথাবার্তা বলা যেতে পারে, তাবলে, যাহাকে বলিয়া থাকে হাসসানি. একটু অধরসুধা পানাপান, কামকলস স্তনযুগে ও বুকে একটু নখরাঘাত, আর দেহে নিতান্ত চঞ্চলা বোধ হইলে, চাঞ্চল্যজনিত ক্রিয়ার দ্বারা অচঞ্চল হওয়া, সেসব বাড়িতে বসে হয় না, যে কারণে হোটেলের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। টী অ্যান্ড বাথ্‌ হচ্ছে, হোটেলে কাটানোর পক্ষে সব থেকে ভাল উপায়। যাহোক, ঠান্ডা ঘর পাওয়া যায় কয়েক ঘন্টার জন্য। টাকাটা বেশী লাগে, তার জন্য আর কী করা যাবে। তবে চৌরঙ্গী পাড়ায় তো বাড়ির অভাব নেই, যেখানে হোটেলের নামে আসলে অন্য ব্যাপারটাই বেশী চলে, বান্ধবীদের লইয়া সেখানে যাইলেই, ঘর পাওয়া যাইবে। বান্ধবী না থাকিলে, বান্ধবী পাওয়া যাইবে, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক যাহা কিছু প্রয়োজন, অটপৌরে ভাষায় বলিতে গেলে, মাল এবং চাট, তাহাও মিলিবে, কলিকাতার ন্যায় বন্দর আর ভারতবর্ষে কোথায় পাইবে, এইখানে সব মিলিবে। মহামানবের সাগরতীরে, এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে নাকো খুঁজে। এও সেই কথার মত, 'আসুন' চলিয়া আসুন, পথিক পথ পড়িয়া রহিয়াছে, চলিয়া যাওয়া লইয়া কথা, কলিকাতা ছাড়া এমন আমন্ত্রণ আর কোথাও পাইবেন না। হ্যাভ উ সীন্‌ দ্য পোর্ট? মাগীটার গতরে পোকা ধরে গেল, তবু যৈবন মরে না, কলিকাতা ইহার নাম। আমরা ভারতবাসীরা হইতে পারি বয়স্ক, কিন্তু শিশু। পোকা পড়িলেও জানিবে, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি লইয়া আমরা বিশেষভাবে গর্বিত। দেখ, হাজার বছর হইয়া গেল, আমরা কোন যুদ্ধ করি নাই, মুঘল, পাঠান, হুন, উহারা যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে. তাদের সঙ্গে আরো অন্য বিদেশীরা লড়িয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, আমরা বয়স্ক দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু সিংহ পদবী যদি কোথাও পাইতে হয়, এদেশেই পাইবে, মিঃ অমুক লায়ন লায়নোভস্কি কোথাও পাইবে না। দু একটা বিদ্রোহ হয়তো করিয়াছি, তাহা ঠান্ডা হইতে বেশী সময় লাগে নাই এবং ফল যা হইয়াছে, তাহাই বর্তমান ভারতবর্ষের রূপ বলিয়া দিতেছে, আর বিপ্লব? বিপ্লব আমরা কোনদিনই করি নাই, ইচ্ছা আছে করিব, তবে সন্তানগণের নাম তো রাখিতেছি। আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা, যাহারা ভারতবর্ষের সকল গৌরব মাথায় করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা থাকিতে বিপ্লব না হইয়া পারে না, আমরাই তো সব, অতএব এই মধ্যবিত্তের স্বর্গ ভারতবর্ষ, তাহার শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা, অ্যান অনড্যামেজড্‌ পোর্ট—আনড্যামেজড্‌! অক্ষত যোনির মত বুঝি। সেই জন্যই যত অক্ষত যোনিদের সঙ্গে লইয়া, টী অ্যান্ড বাথ সারা যায়, অন্য পেরকারের ব্যবস্থাও আছে, চলিয়া আসুন, সব পাইবেন।

কিন্তু রীনা বেবীকে কোথায় পাব এখন, বাড়িতে যাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, কারণ, আমার সঙ্গে আবার সাতাকারের প্রেম করে তো, তাই আগে থেকে জানাশোনা না থাকলে, হঠাৎ দেখা পাওয়া মুশকিল, কেন না, মিথ্যে প্রেমগুলো তাহলে করবে কবে বা কখন। এখন একমাত্র লতিকাকেই বাড়িতে পাওয়া সম্ভব—ওদের অনেকটা হাফ গেরস্থ বলা যায়। লতিকার সঙ্গে লতিকার ঘরে, দরজা বন্ধ করে থাকলেও, ওদের বাড়িতে কেউ কিছু মনে করে না, এবং এই লতিকাও এক বছরের জন্য কলেজে পড়তে গিয়েছিল একদা। এখন লতিকার অনেক খদ্দের, এদিকে ওদিকে একটু নাটক-টাটক করে বেড়ায়, অ্যামবিশন আছে অনেক, আর যাহা না করিলে নহে, তাহাই করে, পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে একটু আদানপ্রদান করিয়া থাকে, না করিলে চলিবেই বা কেন। ব্যাপারটা এমন সহজ করে নিয়েছে লতিকা, যেন এমন কিছু নয়। ওর কাছে, প্রায়ই শুনে মজার মজার গল্প শোনা যায়। ভাল ভাল মানুষদের গল্প, সজ্জন ভদ্রলোক, কেলাবে আপিসে যারা নাটক করে, এবং যাদের সঙ্গে লতিকাও নাটক করে, তাদের প্রেম নিবেদনের মজার মজার কাহিনী, রিয়াল স্টোরি। অবিশ্যি জানি, লতিকা আবার যেমন বলে, ঘটনাগুলো হয়তো তেমনই নয়, ও নিজেকে একটু বেশী বাঁচিয়ে বলে—বাঁচিয়ে নয়, ওটাকে সাজিয়ে বলা চলে, কারণ, লোকগুলো বোকার মত ওর রূপে মজে, এবং ও তাদের কিছুই দেয় না, এটা বোধহয় সত্যি নয়। এটাও ওর হাফ গেরস্থ চরিত্রের মধ্যে পড়ে। তবে এটা ঠিক, লতিকা যেভাবে দৈহিক সুখ দান করিয়া থাকে, তাহা কোন বান্ধবীর নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কারণ তাহার আচরণের মধ্যে একটি ঘরসহকারে সমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু, না, লতিকা বা রীনা বা অন্য কেউ নয়, বেবী—বেবীকে পেতে ইচ্ছা করছে, বেবী, কেন জানি না, কোন মেয়ের কথা মনে হলেই—মানে, সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করলেই, বেবীর কথাই আগে মনে হয়, বেবী আগে, সকলের আগে বলে নয়, আমার জীবনে, মেয়ে বলতে বেবী প্রথম। সেইজন্যই কি যে কোন অবস্থাতেই আগে বেবীর কথা মনে হয়...।

'এবার কোনদিকে?'

আবার সেই গলা, কিন্তু লোকটার মুখ আমার দিকে ফেরানো নয়। লোকটার

জিজ্ঞেস করার সুরের মধ্যে, যেন একটা অনুসন্ধানের ভাব, 'কোথায় তুমি যেতে চাও, সেটাই আমি দেখছি, তারপরে তোমাকে আমি দেখব' এরকম একটা চাপা শাসানোর ভাব আছে যেন, এবং বাইরে রোদটা সেরকম থাকলেও, সবুজ মাঠ আর গাছপালার সীমানার মধ্যে এসে পড়ায়, মনে হচ্ছে, সেই গরগরানে সিংহটা কোথাও সরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। বাঁদিকে রেস-কোর্স-এর মাঠ, ডানদিকে হাসপাতাল। যদি বেবীর কাছে যেতে হয়, তবে আর সোজা যাওয়া চলে না। আমি বললাম, 'ডানদিকে।'

গাড়িটা ঝকর-ঝকর করে ডানদিকে বেঁকে চলতে আরম্ভ করল এবং এই প্রথম আমার নজরে পড়ল, লোকটার গায়ের জামাটা ঠিক কালো নয়, ময়লা, এত ময়লা যে, তাতেই কালো দেখাচ্ছে বা এত রোদে ছিলাম তখন, আমি ঠিক রঙ চিনতে পারছিলাম না, এবং রঙ, জনৈক পণ্ডিত-ব্যক্তির মতে, বোধ ইকনোগ্রাফি সম্পর্কে যিনি পণ্ডিত, সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে একটা কথা আমি শুনেছিলাম, তিনি নাকি লোকের ফটো দেখে, ডায়গোনসিস করেন। রঙ-ই হচ্ছে প্রধান, ফটোটার মধ্যে সাতটা রঙ নাকি ফুটে ওঠার কথা, যার সব ডিটেল আমি জানি না। মোটের ওপর তাঁর স্পেশেল্টের ফটোটা এমনভাবে কোথাও রাখেন, যাতে তার ভিতরে সাতটা রঙ ফুটে উঠতে পারে, যার থেকে বলা যায়, মানুষের শরীরে মূলে সাতটা রঙ-ই আসলে আছে এবং ফটোর মধ্যে যদি কোন একটা বা একটার বেশী রঙ না ফুটে ওঠে, তাহলে সেই রঙের ডিফিসিয়েন্সিটাই ওষুধ দিয়ে সারান, আর যদি ফটোটায় একটা রঙও না ফুটে ওঠে, তাহলে সেটা একজন মৃতের ফটো বলে মনে করা হবে। আশ্চর্য, আমি জানি না এরকম কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি হতে পারে কিনা, কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল শুনে, এবং আমি এমন কল্পনা করেছিলাম, আমার ফটোটা পাঠিয়ে দেখা গেল, কোন রঙ নেই, তার মানে আমি মৃত, আর সেটা হয়তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম। অবিশ্যি, এখন কথাটা ভাবতে আমার সেরকম কিছু একটা গা শিউরনো ভাব লাগছে না, কেন না, এখন আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ, এগুলোর বাইরে, কেবল বর্তমানে, এই মুহূর্তেই আছি, এই মুহূর্তে, যখন জীবনমরণ বোধের ভয় বা দুঃখ, আমার মনে কোন—কী বলব, কোন 'তরঙ্গ' তুলছে না। আর এই কারণেই বোধহয় আমি এখন রঙ-কানা হয়ে গিয়েছি। লোকটার জামাটা দেখছি, কালো নয়, বা তার গায়ের রঙটাও সেরকম কালো নয়, তখন যেরকম দেখেছিলাম এবং এখন তার চোখে আর সানগ্লাসটা নেই। যদিচ তার গলার স্বরের কোন পরিবর্তন হয়নি...

কিন্তু বেবীকে এখন পাব কী না, জানি না, অথচ এখন—এখন বলে নয়, যে-কোন মুহূর্তেই, এবং এখন বিশেষ করে, বেবীকেই আমার পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পাই না। বেবীকে পাই না। বেবীকে ভুলিতেও পারি না। ভুলিব মনে করি, ভুলিতে পারি না। ভাবিলে নিজেকে কেমন অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়, কে অভিশাপ দিল, কেন দিল, তাহা বুঝিতে পারি না, বেবীকে পাই না। এখন আর বুক টনটন করে না, করিলেও সে-অনুভূতি নাই, তাহা আমার মস্তিষ্কে যাইয়া যেন আঘাত করে না, একদা দুঃসহ বোধ হইত, দেখিতে ইচ্ছা করিলে, না দেখিতে পাইলে, বুকের মধ্যে ব্যথা করিয়া উঠিত, মনে হইত, কোথাও পলাইয়া গিয়া, একলা একলা, দুই দণ্ড কাঁদিয়া আসি। রবীন্দ্রনাথের যাহা ঈশ্বরে অর্পিত, আমি তাহা বেবীকে অর্পণ করিতাম, তাহার উদ্দেশ্যে, আমার মনের মধ্যে নিঃশব্দে গুনগুন করিত, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।' গানের এই কলি মনে হইলে, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে, আমার চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিত, 'কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।' গান গাহিতে পারি না, কিন্তু আমি যেন আমার ভিতরে, আশ্চর্য-সুন্দর একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতাম, করুণ সুর, গভীর। স্নিগ্ধ সেই স্বর, চোখের জল দিয়া ভিজানো। শুনিতাম, 'ক্ষণিক আলোকে, আঁখির পলকে, তোমায় যবে পাই দেখিতে, হারাই হারাই সদা ভয়

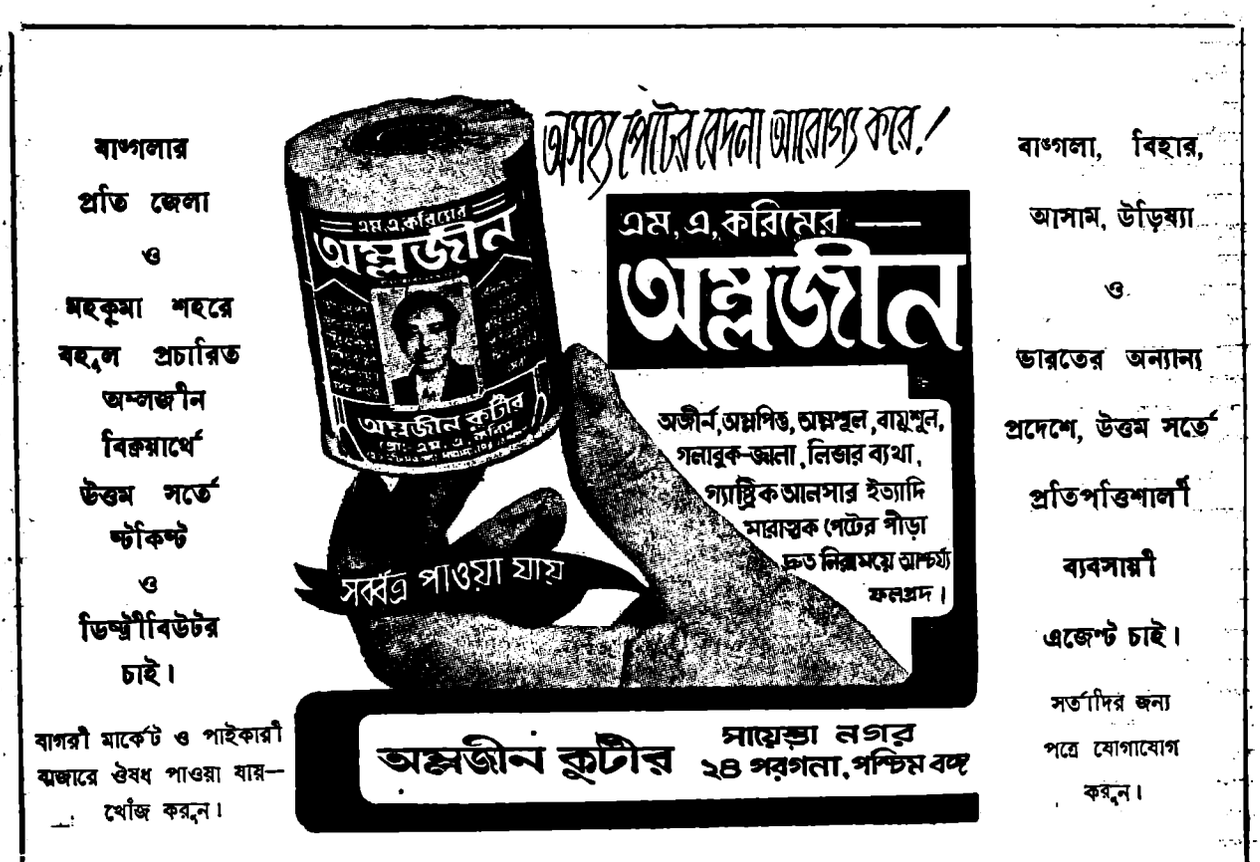

হয়, হাসাইয়া ফিরি চকিতে।'... ঈশ্বর কী, তাহা কোনদিন জানি নাই, বেবীকে, অতএব ঈশ্বরের আসনে বসাইয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না, বেবী শুধু বেবী।

কেন, বেবী আমার জীবনে প্রথম এসেছিল বলে কি, এইরকম মনে হত, প্রথম আসা মানে, ছেলেরা মেয়ে বলতে যা বোঝে, প্রেম প্রেম, ওহ্ প্রেম, বলছি তো ওর সঙ্গে আমার প্রথম হয়েছিল বলে কি এমন হত। কে জানে! যদি তাই হয়, তবে প্রথম দেখা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে হলেই হত। এই দেখাদেখির কারবারি দেবতাটিকে, আমি জানি না, যদি কেউ থেকে থাকে, তবে তাকেই বলি, তুমি তো বাবা পার্ক স্ট্রীটের শুঁড়িখানার সেই বুড়ো মাতালটি নও, এমন একটি কারবার তুমি কেন করলে, তুমি তো জানতে, মানে এটাই যখন তোমার কারবার, তুমি তো জানতে বেবীর হৃদয় এবং অঙ্গসমূহ বহু না হইলে ভরে না, সে হইল সর্বজনীন পূজার দেবী, অথচ বেশ্যা নহে, মনে রাখিতে হইবে, সে ভুজঙ্গভূষণের কন্যা, বাৎসরিক আশী হাজার টাকার কন্ট্রাক্টের চাকরি, নিজেদের চারিতল অট্টালিকা, মোটরযান এবং পিতার বন্ধুদেরও বেবী গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে, 'হেলো আঙ্কল্, হোয়াট ডু ইউ ফেবার, হুইস্কি, জীন অর বীয়র।' ও লতিকা নয়, রীনাও নয়। রীনাও নিতান্ত মধ্যবিত্ত, কিন্তু নিজের পরিবেশটাকে ওর পছন্দ নয়। ওর বাবার পাঁচশো টাকা মাসিক আয়ের মধ্যে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ও বেবী হতে চায়, অথচ বেবীর বাবা ওকে জন্ম দেয়নি, ওকে চেনা যায়, বেবীকে আমি চিনি না। চিনি না! সত্যি? বেবীর হৃদয় আর অঙ্গসমূহ যদি বহুতে ভরে, আমারটা কী? আমি যখন অন্য মেয়ের কাছে যাই, আমি যখন একটি রবারের আবরণী নিয়ে নর্থে যাই, সেটা কি, একটি একনিষ্ঠ হৃদয় আর একজনের জন্য একটি অঙ্গ। আমি একটি ধোয়া তুলসী পাতা। কেবল কুকুরের মূত্রের কিছু গন্ধ আছে, পদাঘাত, পদাঘাত তোর পশ্চাদ্দেশে।

কিন্তু বেবীর সঙ্গে তবু আমি নিজেকে মেলাতে পারি না। এই সমাজের সঙ্গে যেমন পারি না, রাষ্ট্রনীতিনীতি, কোন-কিছুর সঙ্গেই যেমন মেলাতে পারি না, তেমনি পারি না। কারণ, আমি জানি, আমি একটা তুচ্ছ ছেলে, আমার তুচ্ছতাকে ওরা সবাই পায়ে মাড়িয়ে চলেছে। অনেক ভেবে দেখেছি, এটা আমার কোন কমপ্লেক্স কী না, কিন্তু কলকাতার চেহারাটা কি শুধু কমপ্লেক্স-এর আয়না! তবু, আমি বেবীর সঙ্গে লড়তে পারি না, রাগে আর ঘৃণায় যখন আর সবখানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙে তছনছ করে দিতে ইচ্ছা করে, সেরকম পারি না। বরং লতিকার কাছে ছুটে গিয়ে, ওকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে হেসে, অপমানকর কথা বলি, 'তুমি সোনা-গাছিতে গিয়ে বসলেই তো পার,' বা লতিকা, আমার ইচ্ছা করে, তুমি নেকেড হয়ে শুয়ে আছ, তোমাকে একটা অ্যালসেসিয়ান, বাঁচকে যেরকম করে সেই রকম করছে।' কিংবা, এমন সব ব্যবহার করি, যাতে কোন কোন সময় ওর চোখে জল এসে পড়ে। অস্বাভাবিকভাবে হয় তো একটা কিছু করতে বলি, কিংবা ওর শরীরের ওপর পীড়ন করি। রীনাকেও অনেক সময় ওরকম করি, আর তখন আমার ভিতরে সেই একটা রাগ আর ঘৃণা পাক খেতে থাকে, অথচ আমি মিটিমিটি হাসি, আর 'বাঁচ' 'শুয়োরি' 'হোর' মনে মনে এই সব বলি। এবং বুঝতে পারি না লতিকা রীনাকেই গালাগালগুলো দিই কী না, বা পীড়নগুলো সত্যি সত্যি ওদেরই করি কী না, কারণ, মেয়ে মানে তো বেবী। যার সঙ্গেই শুই, চোখের সামনে, তার মুখ দেখলেও, মুখটা যেন বেবীর মত হয়ে ওঠে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ আর প্রত্যঙ্গ, ভিতরে আর বাইরে, বুকে ঠোঁটে বা যোনিদেশে সমস্ত অনুভূতির মধ্যে যেন বেবীই জেগে থাকে অথচ সত্যি সত্যি যখন বেবীর কাছে যেতে পাই বেবীকে পাই, তখন আমি ওরকম করি না। ঠিক যেমন করে, প্রথম দিন পুলিশের হাতে ভীষণ মার খেয়ে, বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—সেই একরকমের তাড়িয়ে দেওয়া বলেই আমি মনে করি, সেই সন্ধ্যায় একলা ঘরে, যেভাবে ভীষণ রাগে আর ঘৃণায়, বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম, ঠিক সেইরকম একটা কান্নার ভাব আমার ভিতরে জাগে, সদিচ্ছ সত্যি কাঁদি না।

বেবী—বেবী-ওকে কি এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে। এখন আমার আর কারুর কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না। বেবী—হেবীর কাছে যেতে ইচ্ছা করছে। এবার আমাকেই আগে বলতে হল। 'বাঁয়ে যাব। সামনে গিয়ে, বাঁয়ে।'

লোকটা কোন কথা বলল না। যেন শুনতেই পায়নি, এবং এখন আমি দেখছি লোকটাকে যতটা মোটা ভেবেছিলাম তা নয়। সে বাঁয়ে বেঁকিয়ে নিল গাড়িটাকে। আর আমি বেবীদের বাড়িটা দেখতে পেলাম। বেবীদের বাড়ীর সামনে গাড়িটাকে দাঁড়াতে বললাম, লোকটা না তাকিয়েই গাড়িটাকে দাঁড় করাল, আর কুকুর চাপা পড়ার সময় যেরকম ডেকে ওঠে, সেরকম একটা শব্দ করল, আমি বললাম, 'এক মিনিট দাঁড়াতে হবে।'

কোন জবাব না দিয়ে, লোকটা একটা ময়লা ঝাড়ন তুলে, তার মুখটা মুছতে লাগল। আমি নেমে গিয়ে, কলিং বেল-এর বোতামে আঙুল টিপতে গিয়েও, একবার থমকালাম। কেমন যেন একটু লজ্জা করল, এমন ঘোর দুপুরে কারুর বাড়িতে কলিং বেল বাজাতে খারাপ লাগে কিন্তু আমি একবার না দেখে পারব না, যদি—যদি বেবী থাকে,' একবার তবু সঙ্গে যেতে বলতে পারব। বেল টিপলাম, আমার গায়ে রোদ লাগছে, মাথার ওপরে কোন ছাতার নেই, গোটা রাস্তাটা রোদে পুড়ছে। প্রায় এক মিনিট উঁহু, একটা মিনিট যে কী জঘন্য লাগতে পারে, এই দারুণ রোদে, মুখটা বাঁ দিকে ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকালাম, যাতে রোদ না লাগে। দরজাটা খুলল, সুখন যার নাম, সে-ই খুলল। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম, কারণ, বেবী না থাকলে সে বলে দেবে, অথবা দরজাটা খুলে সরে দাঁড়াবে। একটা মুহূর্ত, যেন থাকে, যেন থাকে, ঘড়ির টিক-টিক শব্দের মত, অথবা বলা যায়, টাইম বমের শব্দহীন টিক-টিক করার মতই বাজতে লাগল, আর সুখন দরজাটা খুলে, সরে দাঁড়াল, বলল, 'দেখে আসছি, বেবী জী, আছে কী না, আপনি বসুন।'

সুখন বাঙলা ভালই বলতে পারে, এবং ওর কথা শুনে মনে হল, ও জানে, বেবী জী আছে ঠিকই, তা নইলে প্রথমই বলত, 'বেবী জী তো ঘরে নাই,' সুতরাং বেবীর মা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার কিছু থাকে না। বিশেষ অকেশন ছাড়া, ওর বাবাকে তো বলতে গেলে, বাড়িতে কোনদিন দেখিইনি আসলে সুখন গিয়ে বেবীকে আমার নাম করে জিজ্ঞেস করবে, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কী না, এবং সম্মতি পেলে, বসতে বলবে, বা ঘরে যেতে বলবে। ট্যাক্সিটা বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, কখনো। আমার বসতে ইচ্ছা করল না, দালানের সুইচটা অন করে, একটা প্রকাণ্ড জাপানী এমব্রয়ডারির ছবির সামনে দাঁড়ালাম—নীল আর সবুজ, আমার রোদে জ্বলে যাওয়া চোখ-দুটোকে যেন জুড়িয়ে দিল। নিবিড় বন, সবুজ গাছপালা, নীল হ্রদ আর মাথার ওপরে নীল আকাশ, ইচ্ছা করল, যেন ছবিটার মধ্যে ঢুকে পড়ি ওই যে—কী বলে, 'জলাশয়ে গিয়ে ডুব দিই গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ি। ওখানে যাই ওই নীলে আর সবুজে, কিন্তু আমার সঙ্গে যেন বেবী থাকে, তপোবন নয়, তপোবন চাহি না, বন চাহি, কোন পুণ্য সলিল চাহি না, টলটল মিষ্টি জল, চাহি, সেখানে আমি আর বেবী...।

'কী ব্যাপার।'

মুখ ফিরিয়ে দেখি পর্দাটা গায়ের কাছে সরিয়ে বেবী এসে দাঁড়িয়েছে যেন অন্য এক বেবী। সাজগোজ নেই, চোখ দেখে মনে হল, ঘুমোচ্ছিল বা শুয়েছিল কিংবা, জানি না, ঘরে কেউ নেই-তো ওর সঙ্গে, মানে কারুর সঙ্গে শুয়েছিল না তো। কিন্তু বাড়িতে কি তা সম্ভব। আমি ফিরে দাঁড়াতে, পর্দাটা ছাড়িয়ে, ও এক পা এগিয়ে এল। ঘাড় থেকে ইঞ্চি-দুয়েক নামানো চুল খোলা, খোলাই তো থাকে, বাঁধা-বাঁধতেই যত, নিজেকে অগোছালো করলে, অগোছালো দেখাবার সম্ভাবনা, এক ইঞ্চি পরিমাণ হাতার জামা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জামার ভিতরে কিছু নেই। যাহাকে অন্তর্বাস বলিয়া থাকে, সাদা পাতলা একটা কাপড়, আঁচলটা হাতেই ধরা, পাট খোলা—এখন তো শুধু পেটি পেটকোট, বাইরে যাবার সময়ে, নাভির নিচে নেমে যায় শাড়ির বাঁধন, আর একটু যদি আমার,

তাহলে ক্যাবারের নাচুনির মত দেখাতে পারে, তার পরেও যদি নামায়, ওহ্, থাক, বড় উন্মাদনা বোধ করিতেছি, বেবীর সেই অপরূপ সুন্দর বস্তিদেশ আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে, বস্তিদেশের নিম্নে, তাহার সেই বিরল-কেশ যৌন-অঙ্গ, লতিকা আমাকে শিখিয়েছে, গ্রামীণ মেয়েদের একটা কোড্ নিজেদের মধ্যে চালু আছে, তাকে বলে, 'আস্‌কে' অর্থাৎ আস্‌কে পিঠের বিপরীত দিকের অংশের মত সুডৌল, আরো হয়তো কিছু। কিন্তু আমি কোন-দিন সে পিঠে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না, কেবল রবি বলে, 'হ-হ জানি, চিতই পিঠা।'...বেবীর কাপড়-চোপড় প্রায় জাগোছাল, কোঁচকানো, নরম রেশমি চুল-গুলো মুখের আশেপাশে ছড়ানো, আর নিচে ওর শায়ার ফ্রিল দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, 'ঘুমোচ্ছিলে নাকি।'

'ঘুমোচ্ছিলাম, একটু আগেই জেগেছি, তুমি—।'

'তোমার কোন এনগেজমেন্ট আছে এ-বেলা, মানে বিকেলের দিকে।'

'কেন।'

ওর ভুরু একটু কোঁচকাল, ঠোঁটের কোণ টিপল। ওর মুখটা কেমন, ঠিক কী বলে বোঝানো যায়, জানি না। চোখ দুটো বড়ই, কিন্তু লতিকার মত নয়, লতিকার চোখ বড্ড বড়, অত বড় ভাল লাগে না, বেবীর চোখদুটো আসলে টানা, নাকটা খুব চোখা বোঁচা কিছু না, অথচ, কী বলব, যেন একটা টিকলো ভাব সব মিলিয়ে, বলিতে দ্বিধা নাই, একটি পবিত্রতার ছাপ রহিয়াছে, ইহাতে পবিত্রতাকে নিরুপায় বলিব কীনা জানি না কিংবা আমি হয়তো বেবীকে পবিত্র দেখিয়া থাকি যদিচ বন্ধুরা সবাই বলে, বেবী নিম্‌ফো-ম্যানিয়াক তবু একথা মানতেই হবে যে সব মুখ দেখলে, কন্যাটিকে সুশ্রী সুন্দরী এবং স্নিগ্ধা বলিয়া সকলে বিবেচনা করে, বেবীকে দেখিতে সেইরূপ। এখন ওর চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রঙ নেই, অলংকারের কোন চিহ্ন নেই, এমনকি, ওর কাপড়ের পাড় পর্যন্ত কালো যেন সেবিকার মত। ওর। 'কেন' জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই, ঠোঁটের কোণ টিপে একটু হাসি, অথচ ভুরুর কোঁচকানিতে, একটা—একটা অনু-সন্ধিৎসা, আমাকে যেন এখনো কোন ভরসা দিচ্ছে না। আমি বললাম, 'তা হলে চল না, কোথাও একটু যাই।' বলতে বলতে আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম, ওর হাতটা ধরতে গেলাম, ও চোখের ইসারা করে পিছনে দেখাল, তাতে কার অস্তিত্ব প্রমাণ করল, আমি বুঝতে পারলাম না। হাতটা সরিয়ে নিয়ে এলাম। ও জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'যেখানেই হোক, কোথাও, আমার কিছুই ভাল লাগছে না।'

বেবী আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'তোমাকে যেন কেমন লাগছে।'

আমি বললাম, 'চল না, চান করতে আর চা খেতে যাই।'

ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, চোখের পাতা একটু কোঁচকালো, যা একেই হয়তো, চোখের পাতার নিবিড়তা বলে। আবার বললাম, 'ট্যাক্‌সিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

ও অবাক হয়ে বলল, 'কেন, ওটাকে ছেড়ে দাও।'

'যাবে না?'

'না, তুমি এস।'

'কোথায়, বাড়িতে? বাড়িতে ভাল লাগে না, মানে, বেব্—।'

'তুমি ট্যাক্‌সিটা বিদায় করে এস না আগে, আমি বেরুলেও তো তৈরী হতে হবে। চান করতে যেতে হবে বলে, এ-বেশে তো আর যেতে পারি না।'

আমি বাইরের দরজার মোটা পর্দাটা সরিয়ে, ব্যাক পকেট থেকে টাকা বের করে দিলাম। লোকটা আমার দিকে একবারও তাকাল না, যেন আমি ওর কাছে, একটা কিছুই নই, মিটারটা দেখে, ভাড়া কেটে বাঁ হাতে পয়সাটা দিয়ে, একটা বিশ্রী শব্দ করে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত সেই ছদ্ম-বেশী ভাবটাই ও আমার মনে রেখে গেল। কে লোকটা, যেন আমার ওপর ওর একটা নির্বিকার ভাব, অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে-ছিল, না তাকিয়েও। আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, বেবী তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার মত, তার মধ্যে বেবীকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ও আমাকে আবার বলল, 'তোমাকে কেমন যেন লাগছে, তোমার কী হয়েছে।'

বললাম, 'জানি না, আমার গায়ে হাতে কেমন ব্যথা করছে, দাঁতের গোড়ায় ব্যথা করছে, আর একটা কেমন বিচ্ছিরি ভাব লাগছে, ঠিক বোঝাতে পারি না, বেব্, তুমি আমার সঙ্গে কোথাও চল।'

ও অন্য কথা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথা থেকে এলে?'

'আমি—আমি আলিপুর থেকে এলাম।'

'বাড়ি থেকে বল।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা-ই।'

ও আমার গলার কাছে হাত দিল, 'জ্বর নাকি? খুব খারাপ বাপু, বড্ড ছোঁয়াচে।' যদি বেবীর হয়, তা-ই, লোকে তো কথায়ই বলে, রোগের সঙ্গে পরীত করা চলে না, এটা তো একটা সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মনের কথা। তারপরে আবার নিজেই বলল, 'না, জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে না, তবে একটু গরম আছে। এস, ভেতরে এস।'

'ভেতরে? ভেতরে না, বেব্। চল আমরা অন্য কোথাও যাই। তোমাকে, তোমাকে—।'

আমি ওর বগলের নিচে, জামার অনেকখানি কাটা জায়গায় হাত দিয়ে টান দিলাম, ও ঘাড় ফিরিয়ে, ভুরু কুঁচকে আমাকে একটু শাসনের ভঙ্গি করল, তারপরে যেন এমন কিছু কথা নয়, এমনি একটা সুরে বলল, 'বাড়িতে কেউ নেই।'

শুনে আমার বুকের কাছটা এমন চলকে উঠল, কী যে চলকে ওঠে, তা জানি না, রক্তই হবে বোধহয়, বুকটা ধক্‌ধক্ করতে লাগল। বললাম 'কেউ নেই মানে?'

'মা নেই, ভাই নেই।'

ওর দিদির তো বিয়েই হয়ে গিয়েছে, বাবার তো কোন প্রশ্নই নেই। আমি আর কথা বলতে পারলাম না, ওর মুখের দিকেই চেয়ে রইলাম, ও আবার বলল, 'মার ফিরতে রাত হবে।'

হউক হউক, ফিরিবারই বা প্রয়োজন কী। কোথায় গিয়েছে, সে কথা আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না, বেবী ডাকল, 'এস।'

ঘরটার ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকলেই, ওপরে ওঠার সিঁড়ি। রবার স্লিপার পায়ে দিয়ে, মোজাইকের সিঁড়ি দিয়ে বেবী উঠতে লাগল, বেবীর কোমরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল, আমি ওর একটা স্টেপ নিচে। ওর কোমরে হাত দিলাম, ও পিছন ফিরে ভুরু কোঁচকাল, তার মানে, সুখন বা আর কেউ দোতলায় আছে। আমি হাতটা সরিয়ে নিয়ে এলাম, আর শাড়িতে শায়াতে যেন ফিস্ ফিস্ আয় আয় শব্দের মত শব্দ হতে লাগল, আমি—হ্যাঁ একটা পোষা কুকুরের মতই ওর পিছু পিছু উঠতে লাগলাম, এখন খাবার সময় হয়েছে। কুকুরের খাবার সময় হলে যেমন ছোটে, তেমনি। দোতলায় সুখন দাঁড়িয়েছিল, আমরা তেতলায় উঠলাম। নিঝুম বাড়ি, দরজা জানালাগুলো সব বন্ধ, বাড়িটা যেন একটা উঁচু সমাধি মন্দিরের মত উঠেছে। চারতলাতে বেবী থাকে। তিনতলাতেই, বেবী আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু চাই নাকি?'

জিজ্ঞাসার ইঙ্গিতটা জানা, তাই বললাম,

'ঠাণ্ডা বীয়র খেতে ইচ্ছে করছে।'

বেবী বলল, 'তা হলে তুমি ওপরে যাও, আমি যাচ্ছি।'

বেবীকে যেন আজ, এখন অন্যরকম লাগছে। সাজের ঘটা নেই, অলস অলস ভাব, কেমন যেন ঘরোয়া—আহ্, হঠাৎ কেমন করে উঠছে মনটা, বাইরে নয়, বাড়িতে, বেবীর নিজের ঘরে, আর বেবী কেমন আলগা আলগা ঘরোয়া পোষাকে রয়েছে। এ যেন চক্ষের সম্মুখে কোন এক অপরিচিত কালের ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে, এক দূর কালের, যাহা পশ্চাতে ফেলিয়া আসি নাই, সম্মুখে যাইতেও পারিব না, কেবল দূর হইতে দেখিব। অস্পষ্ট, ঝাপসা একটি ছবি, তাহার বুকে, গাছের নিবিড় ছায়ায় কাহারা ঘুরিয়া ফিরিতেছে, পুকুরের জল টলমল করিতেছে, জলে আকাশ গাছ-পালার প্রতিবিম্ব, অথচ কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পারিতেছি না।

আমি বেবীর ঘর চিনি। দরজাটা খোলা, পর্দাটা ফেলা। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, আর প্রায় আমার পিছনে পিছনেই বেবী এল। ওর হাতে, ফ্রিজের ঠাণ্ডায় ঝাপসা একটা বীয়রের বোতল, আর দুটো কাঁচের গেলাস। ঘরে আসবাব-পত্র সেরকম নেই। একটা আয়না লাগানো বড় লোহার আলমারি, একটা সিঙ্গল খাট এমরয়ডারির ফুল তোলা বেড কভার ডানলোপিলোর গদীর ওপর। গোল একটা

টেবিল, এক কোণে, ঢাকনার কাপড়টা ডোরাকাটা। পিতলের ফুলদানি, গন্ধহীন, রঙবেরঙের কিছু ফুল। আর এক পাশে, বেঁটে কাঁচ লাগানো ছোট একটা বইয়ের র‍্যাক, তাতে কিছু বই। বেবী এখনো শিক্ষায়তনের ছাত্রী। সেই জন্যে পড়াশোনাটা একেবারে একতলায়, এখানে কেবল শয়ন। মোজাইক মেঝের ওপরে, কটন গালিচা।

গোল টেবিলের ওপর বীয়রের বোতল গেলাস রেখে, বেবী ওর খাটের মাথার কাছ থেকে, ছোট ড্রয়ার টেনে, একটা স্টেইনলেস স্টীলের ওপনার বের করল, যে ওপনারটার অবয়ব হল একটি ন্যুড-এর, বুক আর গলার ফাঁকে আটকে বোতলের মুখ খোলা যায়। ও যখন বীয়রের বোতল খুলছে, আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর কোমরের ওপরে খোলা জায়গায় হাত দিলাম। ও কিছু বলল না, কিন্তু একটু ফেনা গড়িয়ে পড়ল, আর পটু হাতে একটা গেলাস পুরো করে, আর একটাতে অল্প করে ঢালল। তারপরে আমার দিকে ফিরে যখন বীয়রের গেলাসটা তুলে দিতে গেল, তখনই আমার গলার দিকে চেয়ে বলে উঠল 'তোমার গলার পাশে লাল মত ওটা কী। একি, তোমার ভুরুর কাছে এমন ফুলে উঠল কী করে?' কী করে? কী করে, আমি তো কিছুই জানি না, বললাম, 'হ্যাঁ, হাত দিয়ে দেখেছি, কী ভাবে লেগে গেছে।'

'মানে?'

ও আমার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাল, বলল, 'তুমি কি ড্রিংক করে কোথাও আউট হয়ে গেছলে?'

'না তো। আমি তো কিছু খাই নি।'

বেবী আমার আরো কাছে এল, বলল, 'দেখি তো, এ কি, তোমার গলার কাছে যেন রক্ত লেগে আছে দু ফোঁটা।'

রক্ত? ঠিক এই মুহূর্তেই আমি যেন শুনতে পেলাম একটা গলা, অনেক দূরে থেকে, চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্‌ গলা, 'কেন মারছিস খোকা।'...মনে হতেই আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা, মস্তিষ্কের সমস্ত দরজাগুলো ঢাকা মোটা কালো পর্দা যেন দুলে উঠল, কেঁপে উঠল, যেমন হঠাৎ দমকা বাতাসে পর্দায় ধাক্কা লাগে, আর স্লাপ্‌ স্লাপ্‌ শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ যেন পেলাম। কোথা থেকে এল কথা কয়টি কে বলল। কিছুই মনে করতে পারছি না, অন্ধকার, সেই অন্ধকারই আমার ভিতরে জমাট বেঁধে আছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এবং হঠাৎ আমি বেবীর গলা শুনতে পেলাম, 'কী হয়েছে তোমার, কী ভাবছ, এরকম ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছ কেন?'

আমি বললাম, 'না, মানে, কী জানি, দাও, বীয়র দাও।

কিন্তু বীয়রের গেলাসটা ও টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিল, আর কাপড়ের কোণ দিয়ে, আমার গলাটা ঘষে দিল, আর এই ঘরে, ঘরোয়া পোষাকে, বেবী ওর আঁচল তুলে, আমার গলাটা ঘষছে, আমার যেন অন্যরকম লাগছে সব, আর ব্রেসিয়ার না পরা ওর বুক আমার গায়ে ঠেকছে, অন্য সময় হলে, যে ছোঁয়ার জন্য, অনেক চেষ্টা করতে হত, অবিশ্যি একটা সময় আসেই, যখন আর চেষ্টা করতে হয় না, আমার হাতের ওপর ও অনায়াসে সব ভরে দেয়, তখন নখাঘাতে মর্দিত হইবার জন্য, তাহার কামকলসযুগল আপনা হইতেই যেন উন্মুখ হইয়া উঠে। ও আমার গলার পাশটা মুছে, চোখের কাছে নিয়ে দেখে বলল, 'রক্তই তো।'

রক্ত? আবার সেই মুহূর্তেই, সেই-রকম ফিস্‌ফিস্‌ চুপি চুপি গলা শুনতে পেলাম, 'খোকা, কেন মারছিস আমাকে।' তৎক্ষণাৎ আর একবার আমার মনের এবং মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার ওপরে ঢাকা দেওয়া মোটা কালো পর্দাগুলো যেন দমকা বাতাসে দুলে উঠল, কেঁপে উঠল, আর বাতাসের ঝাপটার শব্দ হল, কিন্তু তারপরেই আবার নিথর হয়ে গেল। কার গলায় কথাগুলো বেজে উঠল, কোথা থেকে আসছে, কিছুই বুঝতে পারছি না, মনে করতে পারছি না।

আবার বেবীর গলা আমি শুনতে পেলাম, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমার কথাও শুনতে পাচ্ছ না, আমি যে তোমাকে ডাকছি। কী হয়েছে তোমার?'

আমি বললাম, 'কিছু হয় নি তো।'

বেবী যেন একটু বিরক্ত হল, অথচ ওর চোখে একটা সন্দেহের জিজ্ঞাসাও রয়েছে, আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওখানে গিয়েছিল নাকি?'

'কোথায়?'

'সে কি, তুমি জান না, পুলিশের সঙ্গে তো আজ আবার লেগেছে। ঘন্টাখানেক আগে জয়া আমাকে ফোন করেছিল।'

আমার মনে পড়ে গেল, আজ যেন কী একটা অকেশন ছিল, রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের। আজকাল আমার সব সময়ে সব অকেশনগুলো মনে থাকে না, যদি চ আমি সব ক্ষেত্রেই থাকি, অংশগ্রহণ করি, কেন না, আমি জানি, কোনরকম নিষেধ বা শাসনের বিরুদ্ধেই লড়বার জন্য ডাকা হয়েছে। আমি কানাই নই, হয় তো বিপ্লবও নই, কিন্তু বর্তমানের যা কিছু, সব কিছু ভাঙবার জন্য আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জয়া কী বলেছে?'

বেবী বলল, 'রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত যেতে পারে নি, তার আগেই পুলিশ বাধা দিয়েছে, ওরা সব পেছিয়ে এসে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ ওদের ঘিরে রেখেছে, যে কোন মুহূর্তেই একটা গোলমাল লাগতে পারে।'

তার মানে, শিক্ষায়তনের মধ্যে ছেলেরা ঢুকে পড়েছে, আর পুলিশ ঘিরে রয়েছে, পুরনো ছবি, কিন্তু রুদ্র কোথায়। আমি বীয়রের গেলাসটা তুলে নিলাম। বেবী আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওখানে গেছলে?'

'না।'

'তবে তোমার কপালে লাগল কেমন করে, গলার পাশে রক্তই বা লাগল কী করে।'

আমি বললাম, 'জানি না।'

বেবী অবাক হয়ে একটু সময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে বলল, মিথ্যে কথা বলছ, আমাকে বলতে চাও না, তা-ই।'

আমি মুখটা বাড়িয়ে নিয়ে গেলাম ওর গলার কাছে, ওর গলার চিকচিকে চামড়ায় একটু ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্য। কিন্তু গলার কাছে এগিয়ে, আমি ওর গলার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ও সরে গেল, আর বলল, 'তোমাকে খুব নোঙরা লাগছে, বাথরুম থেকে ঘুরে এস না।'

বোধহয় আমার মুখের সেই দুর্গন্ধটা ও পাচ্ছে, রক্তের কথা আমার মনে পড়ল, তাই তাড়াতাড়ি মুখে বীয়র নিয়ে কুলকুচো করে গিলে ফেললাম। বেবী বলল, 'এটা আবার কী হল।'

'মুখে গন্ধ পাচ্ছিলে তো।'

'না না, তোমার গোটা গাটাই তো ঘামে আর ধুলোয় নোঙরা মনে হচ্ছে।'

তবু আমি মুখটা নামিয়ে নিয়ে গেলাম ওর বুকের কাছে। এই বক্ষ মুকুলিকা নহে, তথাপি আমার কাছে মুকুলিকা সদৃশ, আমি তাহার কলিকা বলতে ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিলাম, ও তখন গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল, তাই শব্দ করল, 'উমু, আহ্!'

আমি সমস্ত বীয়রটা এক চুমুকে খেয়ে ফেললাম। আয়নার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। বেবী ওর গেলাসটা নামিয়ে রাখল, আমি ওর কোমরের কাছে দু হাত দিয়ে ধরে, কাছে টেনে নিয়ে এলাম, চুমো খেলাম ওর ঠোঁটে। ওর বাধা দেবার ইচ্ছা হল যেন, কিন্তু বীয়রের তেতো স্বাদটুকু সব ওর ঠোঁট থেকে মুছে নিতে দিল। তারপরে আমার বুকে ঠেলা দিয়ে একটু সরিয়ে দিল আমাকে, বলল, 'তোমার জামাকাপড়গুলো পর্যন্ত ময়লা।'

বলেই কিন্তু ও একটা গান গুনগুনিয়ে উঠল, আর আমি যেন কেমন অলসতা বোধ করলাম। আমি বোতাম খুলে, জামাটা টেনে তুলে, খুলে ফেললাম। বেবী আমার গেঞ্জি পরা গায়ের দিকে তাকাল। আমি ওর এ্যাটাচড্ বাথরুমে গেলাম। গায়ের থেকে সব কিছু খুলে সাওয়ারটা খুলে দিলাম। উহ্, উহ্, কী সাংঘাতিক গরম জল, তাড়াতাড়ি সরে এলাম, খানিকক্ষণ জলটা পড়ল, হাত দিলাম, একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, আবার মাথা পেতে দিলাম। সাবান মাখতে ইচ্ছা হল না, যদি চ, স্নানের সব রকম সামগ্রীই রয়েছে, পেস্টশাম্পু থেকে, প্রকাণ্ড তোয়ালেটা পর্যন্ত। ছোট তোয়ালেতে গা মাথা মুছে, বড় তোয়ালেটা জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। প্যান্ট বাইক গেঞ্জি ভেতরেই পড়ে রইল, আমি এসে দেখলাম, ও বিছানায় বসে পা দুলিয়ে, ছোট ছোট চুমুকে, সেই বীয়রটুকুই খাচ্ছে। আমার পরনের তোয়ালেটা একেবারে শুকনো, তাই সোজা ওর বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়লাম, ও বলে উঠল, 'ও কি অসভ্যতা, প্যান্ট পরলে না?'

আমি হাত বাড়িয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ওগুলো ময়লা। এদিকে এস না।'

'আহ্, আমার বীয়র পড়ে যাবে।'

'একটা চুমুকে খেয়ে ফেল।'

ও তা করল না, খাটের মাথার কাছে, গ্লাসদানিতে গ্লাসটা রাখল। আমি ওকে টেনে আমার বুকের কাছে নিয়ে এলাম, জানি ও রাগ করবে, তবু। কিন্তু ও আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাকে আমার নরমাল লাগছে না, কী হয়েছে বলবে না?'

আমি ওকে আমার বুকের তলায় টেনে নিয়ে, ওর মুখোমুখি হয়ে বললাম, 'কিছু হয় নি।'

তবু ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আমার যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, আমি চোখ নামালাম, আর ওর বুকের দিকে আমার চোখ পড়ল। কিন্তু আমি যেন অলস, আমি যেন কেমন ভাঙাচোরা, আমার মনটা দপদপ করছে, অথচ শরীরে তার কোন আঁচ লাগছে না। আমি ওর জামাটা নিচের দিকে সরালাম, বাড়িতে বিশ্রামের জন্য ওর এই জামাটাও ঢলঢলে, সরাতে, স্তনান্তরের মধ্যবর্তী প্রদেশ হইতে দুইটি বর্তুলাকার শৃঙ্গ জাগিয়া উঠিল, ও আমার মাথায় হাত দিল, আমি ওর দিকে তাকালাম, ওর এই চাউনি আমার পরিচিত। কিন্তু তবু ওকে যেন আজ আমার অন্যরকম লাগছে। আমি ওর দুই ঠোঁট আমার মধ্যে নিলাম, ও বাধা দিল না, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, আমি ওর গালের দিকে তাকালাম, আর জামাটা বুক থেকে সবটুকু নামিয়ে দিলাম, ও একটা হাত আমার পিঠের ওপর রাখল, কিন্তু আমি—আমার শরীরটা যেন শব, এই মুহূর্তে একবার শিক্ষায়তনের কথা আমার মনে হল, আমি মুখ তুলে নিয়ে এলাম, কিন্তু ও আমার নিচের ঠোঁটে একটু চুমো খেয়ে দিল, আমি উঠে ওর পায়ের দিকে গেলাম, ও বলল নিচু গলায়, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস।'

আমি দরজাটা বন্ধ করলাম, ফিরে এলাম ওর কাছে, আমি উহার বস্ত্রসমূহ সকল হরণ করিলাম, কিন্তু আমি—আমি কি সেই মানুষ না, যে বেবীর নামে মরা জাগে, অথচ আমি যেন শব, আমার শরীরে যেন রক্ত নেই, রক্তবাহী শিরা নেই, সবই চুপচাপ, নিথর থাকে বলে, মৃত্যুপুরীর মত হয়ে আছে। আমি নিশ্বাস নিতে গেলাম, সেই-সেই, বুকে নিশ্বাস নেবার যেন জায়গা নেই, সেইরকমই হচ্ছে, আমার সারা গায়ে ব্যথা, হাতে, আঙুলে, তলপেটে, দাঁতের গোড়ায়, আমার মুখে দুর্গন্ধ, বিস্বাদ, আমি আমার নিচে বেবীর নরম হাতটা অনুভব করলাম। বেবী জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'জানি না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ, বোধহয় কিন্তু—।'

'আশ্চর্য, এমন কখনো দেখি নি।'

বেবীর গালের রঙ বদলে গিয়েছে, চোখের রঙ বদলে গিয়েছে, আমার মনে হল, ওর সমস্ত শরীরের রঙ বদলে গিয়েছে, ও যেন বরফের মত গলছে, আর আমার যেন মনে হল, একটা মরা নেংটি ইঁদুরকে ও সমস্ত শরীর দিয়ে, হাত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে, কিন্তু মরা ইঁদুরটার বাসি রক্ত ছাড়া আর কিছুই বোধহয় ওর গায়ে লাগছে না, আমি ওর বুকের ওপর মাথাটা পেতে দিয়ে চোখ বুজে রইলাম, আমি এখানো হাঁপাচ্ছি।

কতক্ষণ পরে, আমি জানি না, শরীরটা ঘসটাতে ঘসটাতে, যেন কোন আহত নির্জীব পশুর মত আমি নেমে এলাম, বাথরুমে গেলাম, প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলাম, আর বেবী যেন হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছে, রঙটা যেমন ঝলকে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ-ই নিভে গিয়েছে, ও যেমন ছিল, তেমনি আমার কাছে আবার উঠে এল, আমার কাঁধে হাত দিল, আহ্, আমি কখনো ওকে এমন দেখেছি বলে মনে হয়

না, যা দেখেছি, এই চোখ ছিল না, ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

মনে হল, আমার চোখে জল এসে পড়বে, কেন না, সমস্তই অর্থহীন মনে হচ্ছে, অথচ ওর এই সমস্ত খোলা শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না, আমি কিছু না বলে, কেবল ঘাড় নাড়লাম, আমার কিছু হয় নি। জামাটা গায়ে দিলাম, কিন্তু গোঁজার কথা মনে এল না। ওকে সেইভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে, আমি চলে গেলাম বাইরে। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অলৌকিক, আমি নিজেকেই বুঝতে পারছি না। বেবীও কেমন যেন অবাক হয়ে রইল, ওর কথা যোগাল না মুখে, কেবল বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে আমি ওর চোখে যেন একটা ভয়ের ছায়া দেখলাম, ও কি শিউরে উঠল, আমি বুঝতে পারলাম না।

শিক্ষায়তনের দূর থেকেই, পুলিশকে আমি ছুটোছুটি করতে দেখলাম, মাথায় হেলমেট আর হাতে লাঠি নিয়ে। রাস্তার একটা জায়গাতে লোক ভিড় করে আছে, মাঝখানটা ফাঁকা, আমি অন্য রাস্তা ধরলাম। আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে। জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটো জ্বলেই উঠল! এখনো টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে, ইঁট ছোঁড়াছুড়ি চলছে উভয় পক্ষে। তখনই আমার দৃষ্টি চলে গেল রাস্তার ওপরে, ইঁট, থান ইঁট কোথায়। এদিকে নেই, আমি আবার রাস্তা বদলালাম, আর সেই সময়েই কে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল। দেখলাম রঞ্জন ওর টু ডোরস্ গাড়িটা নিয়ে রাস্তার এক পাশে, আমাকে ডাকছে। ও গাড়ির বাইরে, গাড়িটার কাঁচ তোলা, বন্ধ, বলল, 'ভেতরে ঢুকতে হবে। কিন্তু পুলিশের ওই গাড়িটা থেকে আমাদের দেখতে পাবে।'

'গাড়িটা তোর, ওরা জানে কী?'

'না।'

'তবে, গাড়িটার ছাদে উঠে, ওই গাছের ডালটা ধরতে পারবি না? তাহলে তো আমরা টপকে ভেতরে চলে যেতে পারব।'

'সেটা আমিও ভেবেছি, কিন্তু একবার ফসকে গেলে, পড়ে যাব, ধরে তখন ঠ্যাঙাবে। জানিস, ওরা কানাই বিজন অলককে অ্যারেস্ট করেছে রাস্তা থেকে। অলককে কোমরের কাছে এমন মেরেছে, ও চিৎকার করে উঠেছিল।'

শাসন! আমার দাঁতে দাঁত চেপে বসল বললাম, 'চল টপকাই, ফসকাবে না। একবার উঠতে পারলে পাঁচিলটা পেয়ে যাব, ভেতরে জাম্প করব।'

বলে আমি প্রায় দেড়শো হাত দূরে পুলিশের গাড়িটার দিকে তাকালাম। গাড়ি থেকে আমাদের দিকে চোখ রেখেছে, তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না, আমরা কারা।

রঞ্জন বলল, 'পারবি?'

'পারব।'

আমি লাফ দিয়ে গাড়টার মাথায় উঠলাম, গাছের ডালটা ধরতে না ধরতেই, রঞ্জনও উঠে পড়ল, তখন ছুটে আসা বুটের শব্দ আমাদের কানে ঢুকেছে, আমি ডালটা ধরে ঝুলছি, পরের ডালটা একটু দূরে, সেটাতে পা রাখতে না পারলে হবে না, বুটের শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে, আমি আর রঞ্জন অন্য ডালটা পেয়ে গেলাম, এবং রঞ্জন আমার থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল, আর দুটো সেপাই, গাড়ির ছাদের ওপরে যখন লাঠি চালাল, তখন আমরা তাদের নাগালের বাইরে। ইতিমধ্যে, আর একটা সেপাই ছুটে এসে, আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল, এবং রাষ্ট্রীয় ভাষায় গালি দিতে লাগল, একটা ইঁট এসে আমার পাঁজরে লাগল। পাঁচিলে উঠেই দেখলাম, কেউ যেন তিন-চারটে আধলা ইঁট আমাদের জন্যই, চওড়া পাঁচিলের ওপর রেখে দিয়েছিল, আমি ওদের লক্ষ্য করে, আধলা ইঁট ছুঁড়ে মারলাম একটা, চিৎকার করে বললাম, 'হারামি।'

'চুতিয়া!' প্রতি উত্তর এল, এবং একটা কাঁধে গিয়ে রঞ্জনের ইঁট পড়েছিল, সে রঞ্জনের মাকে গালাগাল দিল, আমার বোনকে—মানে অর্পিতাকে, এবং আমাদের আধলা ইঁট আবার আমাদের গায়েই ফিরে এল। সেটা কারুরই গায়ে লাগল না, আবার আমরা ইঁট ছুড়লাম, তখন আরো কয়েকজন সেপাই, এদিকে দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল, আমরা ভিতর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পড়তেই, এক দল জয়ধ্বনি করে উঠল আমাদের নামে, আর শিক্ষায়তনের অন্য দিকে তখন শ্লোগান চলছে। আমি সেই দিকে যাবার জন্য, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম, রঞ্জনটা অন্য দিকে কোথায় চলে গেল। আমার পাঁজরের কাছে ব্যথা করছে, পাথরের ঢিলটা বেশ জোরেই লেগেছে, আমি একটু দাঁড়ালাম, সেখান থেকে, নিচের দিকে তাকালাম। এ সিঁড়িটা নির্জন, সেকেলে, পুরনো, শ্যাওলা-ধরা

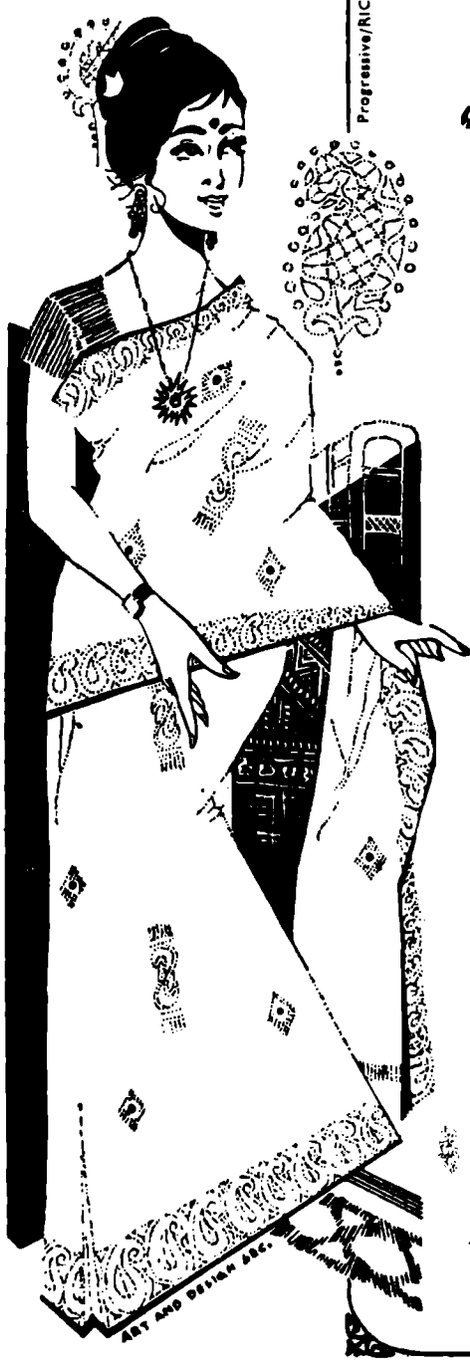

আর আই সি-র তাঁতের শাড়ী

পূজার দিনগুলি সুন্দর···সার্থক ক'রে তুলুক !

নক্‌শা ও রঙের বৈচিত্র্যে অনুপম সুতী ও সিল্কের শাড়ী, ধুতি, গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি প্রভৃতি।

এ'ছাড়া পাবেন **জুতো ও স্যাণ্ডেল**

আধুনিক নক্‌শা, পরিপাটি ফিটিং টেকসই

আপনার কাছাকাছি **আর আই সি-র** দোকান থেকে কিনুন।

★ ৩৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ★ ২৫, স্কী স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ★ ২৩, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯ ★ বনহুগলী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, কলিকাতা-৩৫ ★ বেহালা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, কলিকাতা-৩৪ ★ স্টেশন রোড, হরড়া, ২৪-পরগণা ★ নিউটন মার্কেট ও বেনাচিটি, দুর্গাপুর ★ অমলাদাই মার্কেট, চিত্তরঞ্জন ★ বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি ★ ন্যাশনাল হাইওয়ে, মালদা।

আর আই সি-র তাঁতবস্ত্র আমাদের নিম্নলিখিত এজেণ্টদের কাছেও পাবেন—

ইষ্ট বেঙ্গল ফ্রেণ্ডস সোসাইটি, ১১০-১১২, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ • **কমলালয় ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ১০৬/এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • **ষ্ট্রেণ্ডার্স অ্যাসেম্বলী,** ১৬১/১, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১৯ **শ্রীকৃষ্ণ ষ্টোর্স,** ১০৪, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ **সমবায়িকা,** ১৩, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ • **সমবায়িকা,** ১৩৯/সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪।

আর আই সি-র জুতা ও স্যাণ্ডেল আমাদের নিম্নলিখিত এজেণ্টদের কাছেও পাবেন—

ইষ্ট বেঙ্গল ফ্রেণ্ডস সোসাইটি, ১০৮-বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ • **কমলালয় ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ,** ১০৬/এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • **জনতা ফুটওয়ার,** ৭৯/৩/৫, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ • **নিউ আলেয়া স্যু ষ্টোর্স** • ১৮৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ **বাবুল স্যু কোং,** পি-৮৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ **রঞ্জন স্যুজ,** ৫৪৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৩৪ **রেন্‌বো ফুটওয়ার,** ২১০/১এ, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-২৯।

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(ভারত সরকারের সংস্থা)

২৫, স্কী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

ঠাণ্ডা, কোনকারণেই প্রায় আর ব্যবহার করা হয় না। কয়েক ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে, পাঁজরার কাছে হাত বোলাতে লাগলাম, দেখলাম, নিচে দুর্বাঘাসের ওপর রোদ পড়েছে, বেলা শেষের রোদ, ঘাসগুলো চিকচিক করছে আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে লাল মাটি—লাল মাটি আর কলকাতায় কোথা থেকে আসবে, কোন সময়ে ওখানে বোধহয় শুরকি ফেলা হয়েছিল, তাই দেখা যাচ্ছে। পিছনের এই পোড়োটায়, একটা কী গাছ রয়েছে দেওয়াল ঘেঁষে, বেঁটে ঝাড়ালো গাছ, কতগুলো চড়ুই তার ঝোপের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করছে, ডাকাডাকি করছে। বেবীর কথা আমার মনে পড়ল, ওকে যেন দেখতে পেলাম, ঘরের মধ্যে, খালি গায়ে, একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওর চোখে একটা ভয়ের ছায়া। বেবী আজ একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল যেন, আজ—আজই সেই দিন, বেবী একেবারে অন্যরকম, আর ওর কী বলব—ওর—ওর প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত একটা মরা নেংটি ইঁদুরের কাছে...।

আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠতে লাগলাম, তিন বাঁকের পরে, এখানকার বারান্দায় কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু বারান্দার শেষেই, কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে একদিক থেকে আর একদিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম, এবং হঠাৎ আমার পিছনে শব্দ হতেই, তাকিয়ে দেখলাম, পিছনের ডান দিকের একটা সরু দালান, যেটা রাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়েছে, পুরনো ঘরের কোল দিয়ে, যেখানে অনেকগুলো পুরনো বেঞ্চি আর টেবিল চেয়ারের ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে রুদ্র এগিয়ে আসছে। কোথায় গিয়েছিল ও। আমি ওর দিকে তাকালাম, ও একটু হাসল মাত্র, ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হেসে, কোন কথা না বলে, আমার সামনে দিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেল। কোথায় গিয়েছিল ও। টিকটিকি, বাস্টার্ড, ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে, ওকে আমি ছাড়ব না। কানাই বিজন অলককে ধরিয়ে দিয়ে এসে, এখানে নির্জনে একলা ঘুরছে, মতলব সিদ্ধ হচ্ছে, এবং সেনাপতির ন্যায় লড়াই করিতেছে। আমি এগিয়ে গেলাম, সামনের বারান্দায়, ঘরে, রাস্তার দিকের জানালায়, সর্বত্র একটা ভাঙাচোরা অবস্থা। সবখানে ইঁটের টুকরো ছড়ানো, এখানে উভয় পক্ষে লড়াই চলছে, সমস্ত জায়গায় টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, সকলের চোখ লাল। সকলেই চোখ মুছছে, ভেজা রুমাল দিয়ে, শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে। দু-তিনজনকে দেখলাম, কপালে ফেটি বাঁধা, মাথা ফেটে গিয়েছে। মিহিরকে দেখলাম, তিন-চারটে বড় বড় ইঁটের টুকরো নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, আমি ওর সঙ্গে গেলাম। সামনের ঘরে গিয়ে, ভিড় ঠেলে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে যেতেই, দম্ করে শব্দ হল, টিয়ার গ্যাসের সেল এসে ভিতরে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সেটা তুলে নিয়ে, আবার জানালা দিয়ে, পুলিশের দিকে ছুঁড়ে দিল, 'নিপাত যা।' নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের মধ্যে একটা ঘরে বৈঠক বসেছে, তার পাশের ঘরেই, কয়েকজন অসহায় ব্যক্তি, শিক্ষায়তনের অধ্যাপকবৃন্দ, কাতর হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ আটক করে নাই, তাঁহারা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে, আটক হইয়া পড়িয়াছেন।

আমি আবার মিহিরের কাছে ফিরে গেলাম, ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিপ্লব কোথায়, ওকে দেখছি না তো।'

মিহির ঘরের মেঝে থেকে ইঁটের টুকরো কুড়োচ্ছিল, আমিও কুড়োতে লাগলাম, মিহির বলল, 'বিপ্লবটা এসে পৌঁছুতে পারল না, ও আজ ইন্টারভিউ দিতে গেছে।'

'কিসের ইন্টারভিউ?'

'চাকরির, ক্যালকাটা পুলিশ সার্জেন্টের পোস্টে কয়েকজন...।'

কথাটা ঠিক শুনেছি কী না, বুঝতে পারলাম না, বিপ্লব ক্যালকাটা পুলিশে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছে। মিহির যেন নির্বিকার, ইঁট কুড়োতে কুড়োতে বলল, 'ওকে দিচ্ছে সার্জেন্টের চাকরি! পুলিশ রিপোর্টেই কেঁচে যাবে।'

'আর যদি হয়ে যায়?'

'তবে বেঁচে যাবে, ওর বাবা তো মরে মর, অতগুলো ভাইবোন...।'

কথা শেষ না করেই, জানালা দিয়ে ইঁট ছুঁড়ল ও। আমিও ওর সঙ্গে ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু পুলিশ অনেকটা নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে, যত জোরেই ছুঁড়ি, ওদের গায়ে লাগছে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ, ঢালের আড়াল দিয়ে, এগিয়ে এসে ইঁট ছুঁড়ে দিয়ে আবার পেছিয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা তখন চিৎকার করে উঠছে, 'ধর ধর, শালাকে ধর!'...বিপ্লবের কথা তার মধ্যেই দুই-একবার মনে পড়তে লাগল, যাও বৎস, জীবনে অনেক খেলা খেলিয়াছ, এইবার সেই খেলা সাঙ্গ করিয়া, প্রকৃত জীবন-সংগ্রামে গিয়া অবতীর্ণ হও।...এই সময়ে, মাইকে গলা শোনা গেল, 'আমরা ছাত্রদের অনুরোধ করছি, আপনারা বেরিয়ে আসুন, শান্তিপূর্ণভাবে সকলেই বাড়ি ফিরে যান। শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষ পুলিশকে অনুমতি দিয়েছেন, পনের মিনিটের মধ্যে যদি আপনারা এখান থেকে না চলে যান, তবে আমরা ভেতরে ঢুকে, শিক্ষায়তন খালি করব।'

ছেলেরা ভীষণ জোরে ধিক্কার দিয়ে চিৎকার করে উঠল, শিক্ষায়তনের শাসকদের নামে গালাগাল দিতে লাগল, শ্লোগান উঠতে লাগল এবং নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষায়তন ত্যাগ না করা সাব্যস্ত হল। একদল আগে থেকেই নিচে ছিল, আরো অনেকের সঙ্গে আমিও গেলাম, দরজার সামনে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। অনেক টেবিল চেয়ার দরজার সামনে জড়ো করা হয়েছিল, নতুন করে আরো আনা হল। ইতিমধ্যে, বাতি জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। ঠিক পনের মিনিট পরে, আর একবার মাইকে একই কথা জানানো হল, যাকে বলে, আবেদন করা হল, এবং পাঁচ মিনিট পরেই, গেটের ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল, আবার কয়েক দফা টিয়ার গ্যাসিং। বড় বড় বাঁশ দিয়ে চেয়ার টেবিল খুঁচিয়ে দিচ্ছিল ওরা, একটা স্টীলের পাত দিয়ে ঘেরা ট্রাক দরজার কাছে ঠেলে এল, তার হেড-লাইটটা আমাদের ওপর পড়তেই, হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো লাঠিবৃষ্টি হতে লাগল, আমাদের পিঠে, কে যেন চিৎকার করে বলল, 'পুলিশকে কে অন্য দরজা খুলে দিয়েছে।' 'পুলিশ পাঁচিল টপকাচ্ছে।'...তারপরে দেখতে দেখতে মনে হল, চারদিকে পুলিশ, চারদিকে লাঠির মার, চিৎকার আর আর্তনাদ। কারুর জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলছে, কারুর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমি দেখলাম, আমরা সকলেই, দরজার দিকে একটা লাইন হয়ে গিয়েছি, কী করে এমন একটা ফর্ম আমাদের নিয়ে এল, বোঝা গেল না, আর ধাক্কা দিয়ে, মেরে একে একে বের করে দিতে লাগল, আমি যখন বাইরে, তখন আমার পশ্চাদ্দেশে একটি সবুট পদাঘাতের আঘাত বাজিতেছে।...

বাইরে এসেও, পেডমেন্টের ওপরে, আশেপাশে পুলিশ, পুলিশের গাড়ির ছোটাছুটি, কাছাকাছি কোথাও কয়েকটা দুম দুম করে শব্দ হল। মনে হল, ব্ল্যাকার ফাটছে।

'এই দাঁড়া।'

তাকিয়ে দেখলাম, মিহির। আমি আর মিহির খানিকটা গিয়ে দাঁড়ালাম। ও বলল, 'এখন কী করা যায়।'

'আজ রাত্রে কি আর কিছু হবে?'

'মনে হয় না। চল্ কোথাও গিয়ে একটু বসি, আমার মুখে একটা ঘুষি লেগেছে।'

আমরা দুজনে হাঁটতে লাগলাম, প্রায় এসপ্লানেডের কাছে এসে, আমরা একটা বার-এ ঢুকলাম, দু বোতল বীয়র চাইলাম। একটু পরেই, নীতিশের সঙ্গে রুদ্র সেখানে এল। রুদ্র—রুদ্র—'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল' এই কথাটা আমার মনে এল। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম, জানি না, বেশী-ক্ষণ নয়, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে একটা কথাই এমন পাক খাচ্ছিল, আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না. 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল'...চারজনে ক' বোতল বীয়র খাওয়া হল, আমার খেয়াল নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই ময়দানের দিকে গেলাম। একে একে মিহির আর নীতিশ চলে গেল, রুদ্র তখনো আমার সঙ্গে, আমার দাঁতে দাঁত চেপে বসল, আমরা তখন মাঠে, একটা অন্ধকার-মত জায়গা দিয়ে চলেছি, আমার পিছনে একটা প্রচণ্ড গোঁ গোঁ গর্জন, এগিয়ে আসছে খুব জোরে, আমি রুদ্রর দিকে ফিরে তাকালাম। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, কী হয়েছে?'

গর্জনটা একটা প্রচণ্ড বেগে, আমার সামনে আসতেই, রুদ্রকে আমি জোরে ধাক্কা দিলাম, একটা ঝলকে দেখলাম, ও ট্রামের নিচে চলে গিয়েছে আর ট্রামটা থামতে থামতেও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আমার কানে রুদ্রর একটা অস্ফুট শব্দ বাজছে, আমি তখন নানা রাস্তায়, অন্ধকারে অন্ধকারে ছুটছি, আর আমার নাকে কেমন দুর্গন্ধ লাগল, মরা টিকটিকির গন্ধ, তার গায়ে পোকা থিক্‌থিক্ করছে, প্রাণপণে পৃথিবীর...।

হস্টেলের গেটে এসে দাঁড়াতেই দরোয়ান আমাকে একটা চিঠি দিল, তাতে লেখা ছিল, 'তোমার মাকে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। বিকেল থেকে কোথাও তোমার সন্ধান পাচ্ছি না, সংবাদ পেয়েই বাড়ি চলে এস,—বাবা।' আহ্, সেই কথাটা আবার আমি শুনতে পেলাম, 'কেন আমাকে মারছিস খোকা!'...গেটের কাছ থেকে এসে, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠলাম, বললাম, 'আলিপুর।'

হ্যাঁ, এখন আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠছে, দুপুরে আমি বাড়ি গেলাম, দেখলাম, বাইরের দরজাটা ঠেলতেই তা খুলে গেল। কেন, দরজা খোলা কেন। চাকরটা বোধহয় বাইরে গিয়েছে। আমি ওপরে উঠলাম। বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে শেষের ঘরে গেলাম, দেখলাম এক নারী শুয়ে, বিস্রস্ত, এলোমেলো, অডি-কলন, অন্য কোন সেন্ট-এর গন্ধ আর তার সঙ্গে সিগারেটের হালকা গন্ধ। দেখলাম, নারী আমার মা। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল, নিজেকে গোছাবার জন্য, জামা কাপড় ঠিক করল, বড় সুখী মুখ বড় সুন্দর এখন কেমন অলস, ঘুম ঘুম ভাব, লিপস্টিক উঠে যাওয়া ঠোঁটে হাসি ছোঁয়ানো—স্বামী তার অন্য এক নেশায় অন্যখানে রয়েছে—আমার সামনে, যেন আমারই পরিচিতা বান্ধবীদের আর এক মূর্তি। কিন্তু খাটের উঁচু রেলিং-এ কেন আলস্যে মাথা রাখিলে, তোমার নরম চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ওখানে কেন মাথা রাখিলে, ঠোঁটের কোণে হাসিয়া কী দেখিতেছ, ওখানে কেন মাথা রাখিলে—যূপকাষ্ঠে—হ্যাঁ, যূপকাষ্ঠে মাথা রাখিলে। আমি এগিয়ে গেলাম, মা তাকাল। আমি দু হাতে মাথাটা ঘাড়ের কাছে চেপে ধরলাম 'ও কি রে'...চুলগুলো রেলিং-এর বাইরে এলিয়ে পড়ল, 'ওহ্ খোকা—খোকা কেন আমাকে মারছিস'...না ফিরিয়া দেখিব না, চাহিব না মুখের দিকে, মাতৃবক্ষের ঋণ শুধিবার নহে, সহস্র অমৃতধারায় বহিতেছে—কিন্তু আমি কোথায় অবগাহন করিলাম, জানি না, আমার অবগাহন হয় নাই, ঋণ লইয়া আমি ফিরিব, যাহারা মিটাইতেছে, মিটাইয়া যাউক, আমি ফিরিয়া চাহিব না, দেখিব না, জননী, বাহিরে বড় রৌদ্র, চলিলাম। বেরিয়ে এলাম, নিচে এসে দেখলাম, বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, কাছে পিঠে কেউ নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম, একটা ট্যাক্সি...।

ন'টা বাজবার আগেই বাড়ি পৌঁছুলাম, দরজার কাছে একজন পুলিশ, আমাকে নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করল, বলে আমি বাড়িতে ঢুকলাম। দিদি জামাইবাবু আর ওদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। আমাকে দেখেই দিদি কেঁদে উঠল, 'কে এমন সর্বনাশ করলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কোথায়, শুনলাম, তিনি মায়ের ঘরে একলা বসে আছেন, আমি এলেই সেখানে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন, আমি ওপরে গেলাম, দেখলাম বাবা ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন, খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন,

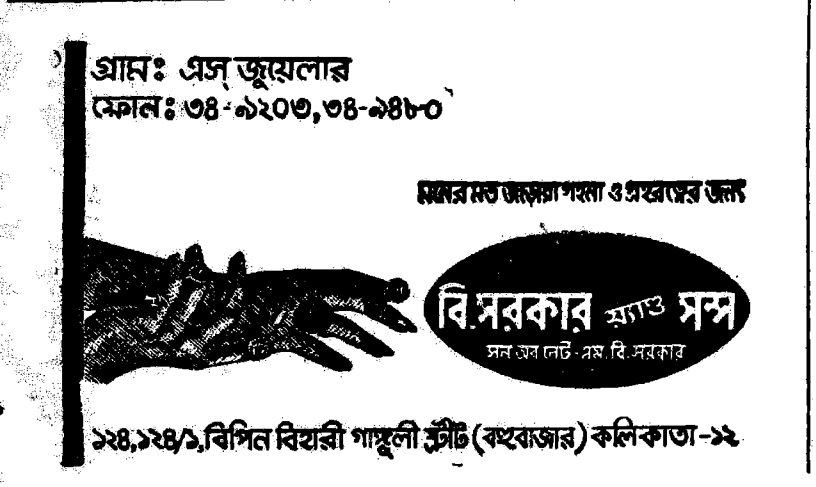

তারপরে মাথা নেড়ে কেবল বলে উঠলেন, 'তুমি, তুমি-ই!'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা আমার কাছে উঠে এলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তুমি না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'পারলাম না। অনেকদিন চেষ্টা করেছি, আর পারলাম না।'

'কেন, তোমার কি অধিকার ছিল?'

'তা জানি না। অধিকার কার কিসে, আমি জানি না।'

'বীস্ট!'

'তুমি বলছ আমাকে?'

'হোয়াট?'

বাবা এক পা সরে গেলেন। তারপরে নিচু স্বরে গর্জে উঠলেন 'উ আর্টার্ড ইট?'

বাবা আমাকে মারতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ পিতা, তাঁহার এত ক্রোধ ছিল জানিতাম না, কিন্তু এত ক্রোধ কেন, এত মারিতেছেন কেন, সকল দোষ দায়িত্ব তিনি তাঁহার পুত্রের কাঁধেই চাপাইলেন? তারপরে হাঁপিয়ে উঠলেন, আমাকে বললেন, 'গেট আউট—আউট!'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে, একবার মায়ের খাটের দিকে তাকালাম, বাইরে এসে, দেখলাম, দিদি জামাইবাবু চাকর ঠাকুর ঝি সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-সময়েই ঘোষণা হল, পুলিশ কুকুর নিয়ে এসেছে। বাবা বেরিয়ে এলেন, আমাদের সবাইকে নিয়ে নিচে গেলেন একটা আলাদা ঘরে। ঘরের দরজাটা টেনে দেওয়া হল, ঠাকুর চাকরের জন্যই বোধহয় কুকুরের ব্যবস্থা, কিংবা কাছাকাছি থেকে কোন লোক যদি বাড়ি ঢুকে থাকে।

কয়েকটা পায়ের শব্দ ওপরে উঠে গেল। বাবা বললেন, 'কুকুরটাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল, সব শুঁকে বেরিয়ে আসবে।'

একটু পরেই, আমাদের দরজায় নখের আঁচড় শোনা গেল, আর দরজাটা খুলে গেল, আমি দেখলাম, কালো নেকড়ের মত একটা কুকুর, তার লাল টকটকে জিভটা বেরিয়ে আছে, কিন্তু—না: ডগ নয়, একটা বীচ্। কুকুরটার গলার চেইন খোলা, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, সকলের দিকে তাকাল, ঠাকুর চাকর ঝি ভয়ে প্রায় কাঁপছে, কুকুরটা মুখ নিচু করে শুঁকতে শুঁকতে বাবার কাছে গেল, একবার থমকাল, আর সেখান থেকেই আমার দিকে তাকাল। তাকাতেই, তার চোখের চাউনি বদলে গেল, গরগর করে চাপা গর্জন করে উঠল, আর একটা বড় ছায়া ফেলে, একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, আমার হাতটা আলগা করে কামড়ে ধরল, যাতে দাঁত না বসে।

পুলিশের লোকেরা, বাড়ির সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। কেবল বাবা ছাড়া। বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইন্সপেক্টর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে, আপনার ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর মুখে এত কাটাকুটি ফোলা কেন?'

আমি বললাম, 'মারামারি করেছি।'

'কোথায়?'

'পুলিশের সঙ্গে।'

একজন কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মিঃ ধর, জিমিকে আর একবার ছেড়ে দেখবেন?'

মিঃ ধর বললেন, 'কোন দরকার আছে কী?'

ইন্সপেক্টর আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আজ বাড়ি এসেছিলে?'

বললাম, 'এসেছিলাম।'

'কখন?'

'দুপুরে।'

'তোমাকে কেউ দেখতে পায়নি?'

'না।'

ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালেন। বাবার মুখ অন্যদিকে ফেরানো। দিদি জামাইবাবু আর সকলে আমার দিকে, ভয়ের চোখে তাকাল। ইন্সপেক্টর এসে আমার হাত ধরে বলল, 'তোমাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'চলুন।'

সমস্ত ব্যাপারটাই এত সহজে হচ্ছিল, আর এত চুপচাপ সবাই, যে, পুলিশের লোকেরা, এমনকি বীচ্টাও যেন অবাক হল। আমি কারুর দিকে না তাকিয়ে, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম, ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আমার কানে বাজল। বাবাকে দেখলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে এলেন। পুলিশের গাড়িতে ওঠবার আগে, বাবা ডাকলেন, 'খোকা।'

তাকিয়ে দেখলাম, বাবার চোখে জল। একটা গালাগাল প্রায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। রাস্তার ওপরে, পাশের বাড়িগুলোতে তখন অনেক লোকের ভিড়, এমন নহে যে দেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেছে।

গাড়ি ছাড়িল, শব্দ হইল, আমি দেখিলাম, চলন্ত ট্রামের নিচে রুদ্র দলা পাকাইয়া গেল। বহু ঋণ করিতে হইল, জীবন ব্যাপিয়া কেবল ঋণ করিয়াছি। জননী, তুমিই প্রথম ঋণশোধের কারণ হইলে, ঋণশোধ শুরু হইল। আজ হইতে ঋণশোধ শুরু হইল। কানাই বিজন অলকরাও এখন জেলে, উহারাও ঋণশোধ করিতেছে, উহারা আমার ঋণশোধ করিতেছে, রুদ্রর ঋণশোধ করিতেছে, সমরের ঋণও। আমার সমুখে যেন সীমাহীন সমুদ্র জাগিয়া উঠিতেছে, ফেনিলোচ্ছল, তরঙ্গসংকুল, আকাশে নক্ষত্ররাজি, বিশ্ব-সংসারের সেই অন্ধকারের মধ্যে, তিক্ত লবণাক্ত জলরাশি দুলিতেছে, হাসিতেছে, যেন অন্ধকার দুলিয়া দুলিয়া সুন্দর হইয়া উঠিতেছে, অন্ধকার আপনার রূপে, আপনি পুষ্পের মত ফুটিতেছে। ছলছল কলকল করিয়া বহিয়া যাইতেছে আজ কত তারিখ? কী জানি। কত তারিখ আসিবে যাইবে, ইহার শেষ নাই। ইতি বলিয়া কিছু নাই।

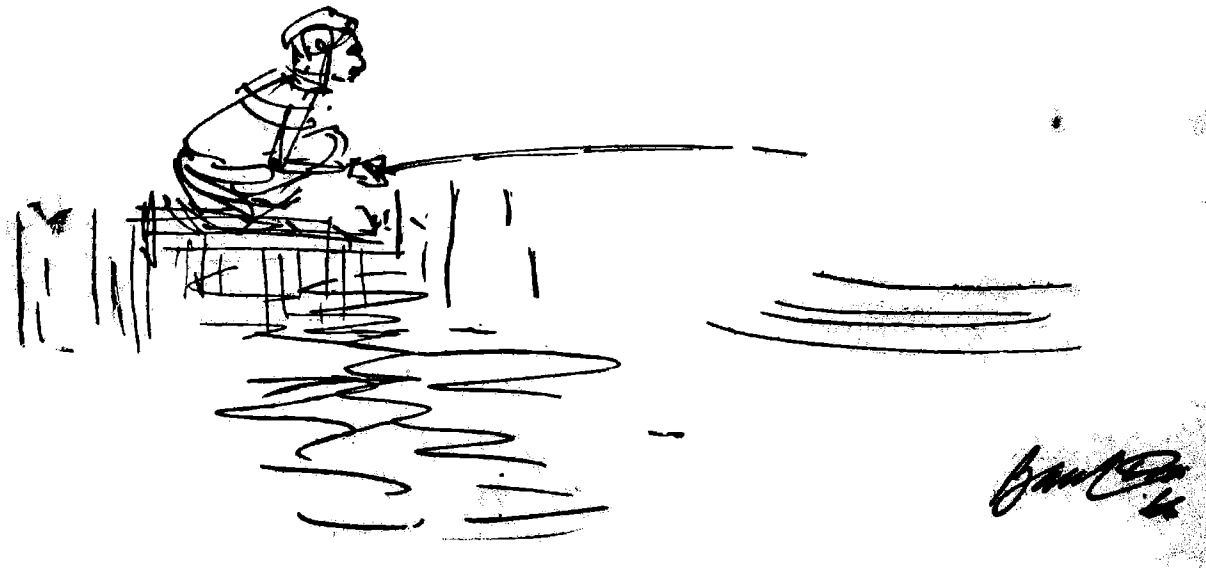

অভিনয় কলা

শীলেখা বসু

মা-র ভাজা গরম গরম সিঙ্গাড়াগুলো নানাবিধ সাড়াশব্দ সহযোগে খেতে খেতে চাঁদুকাকা আমাদের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বললেন, "মেয়েরা—? আরে ছ্যাঃ! মেয়েদের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ কোনোদিন হয়নি, কোনোদিন হবে না।—।—বুঝলি?"

কিছুদিন হলো আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। রেজাল্ট দেখে পর্যন্ত যৎ-পরোনাস্তি বিমর্ষ হয়ে আছি। কাল আবার ডক্টর মালহোত্রা বলে গেলেন যে, সবচেয়ে ওঁচা নম্বর তোলা হিস্ট্রী পেপারটায় নাকি মিসেস মালহোত্রা নম্বর বসিয়েছিলেন। শুনে অবধি নারী-জাতির বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে একটা যাচ্ছেতাই মনোভাব আপনি-আপনিই গড়ে উঠছিলো, এমন সময় চাঁদুকার এই বাণী। ম্রিয়মাণভাবে বললুম, "যা বলেছো চাঁদুকা, খুব খাঁটি কথা বলেছো। একটুও ওরিজিন্যালিটি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে না। এই দেখ না হিস্ট্রী পেপারটায়..."

রমি, আমার ভাইঝি, একেবারে গম্‌গমিয়ে উঠলো "আরে রাখো তোমার হিস্ট্রী পেপার! খুব তো আমাকে এসে বলেছিলে যে ভারী নতুন ধরণের আর খুব ওরিজিন্যাল খুঁটিনাটি ঢুকিয়ে দিয়েছো। এগ্‌জামিনার বস্তাপচা খাতা দেখতে দেখতে তোমার খাতাটা পড়ে নাকি একেবারে থমকে যাবে—মরুভূমির

মধ্যে ওয়েসিস-টোয়েসিস কত কি বোঝালে।...আমি তো খবর পেলুম যে বস্তাপচা খাতা দেখতে দেখতে মিসেস মালহোত্রা নাকি এমনিতেই ক্ষেপে ছিলেন, সেই অবস্থায় তোমারটা হাতে পড়তেই নাকি একেবারে ফায়ার। হিস্ট্রী পেপারে এমন ফ্যানট্যাস্টিক 'ফ্যান্টম' নাকি উনি জন্মে দেখেন নি। তাই তো রোল নম্বর ধরে উনি তোমাকে খুঁজে বের করেছেন। শীগ্‌গিরই নাকি আমাদের বাড়ী একদিন আসবেন।"

"কেন শুনি?" ব্যাজার মুখে বলি, "কি করতে আসবেন?"

"তোমাকে দেখতে।—সে যাকগে, চাঁদুকা' মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণা-গুলো তো খুব মনে থাকে দেখি, এঁদিকে কাকিমা বলেন, তোমার নাকি স্মরণশক্তি খারাপ।"

চাঁদুকা' একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "তোর কাকিমা মেয়েমানুষ বই তো নয়। সে আর কি বুঝবে। স্মরণ শক্তি খারাপ হওয়াটা হলো জিনিয়াসের লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে তারা চিন্তা করে বলে বাজে জিনিষ মাথায় রাখে না। এই দেখ্ না সক্রেটিস্, অ্যারিস্টটল...সক্কলের সাধারণ মেমারি খারাপ ছিলো, তাই নিয়ে তাঁদের স্ত্রীরা চেঁচামেচিও করতেন। অথচ ভেবে দেখ্, কি এক-একটা মেন্টাল জায়ান্ট।"

"তাদের কার যেন বৌ খুব দজ্জাল ছিলো না?" আমি সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি।

চাঁদুকা' মধুর হেসে বললেন, "সেও একটা জিনিয়াসের লক্ষণ।—বৌ দজ্জাল হওয়া। দেখিস্ না তোর কাকিমাকে?"

আর একটা সিঙ্গাড়া মুখে পুরে চাঁদুকা' বললেন, "শোন রমি, মনু-মান্ধাতারা লোক খারাপ ছিলেন না রে। তোদের শুনতে ভালো লাগবে না জানি কিন্তু মেয়েরা অতি নিকৃষ্ট প্রাণী, তাদের কখনো অন্নজল কখনো চড়-চাপড়ে পালন করতে হয়। অন্যান্য গৃহপালিত জীবের মত মেয়েদেরও কিছু কিছু সার্থকতা আছে বটে কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ্ বৃহৎ বৃহৎ সব কাজেই মেয়েদের কন্‌ট্রিবিউশান জিরো বললেই হয়।"

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে শুনে একটু মুষড়ে পড়লুম। ইত্যবসরে রমি বিরক্তভাবে বললো, "এ তোমার অন্যায় কথা চাঁদুকা', আগেকার যুগে মেয়েদের সুযোগ-সুবিধে কি ছিলো? এখন সুযোগ পাচ্ছে বলে করছে না মেয়েরা বড় বড় কাজ? কিন্তু মেয়েদের বাধা কত?" বলতে বলতে রমি উদাস হয়ে গেল।

রমির উদাস হওয়ার কারণ আছে। ও বেচারার খেলাধুলোয় সাংঘাতিক উৎসাহ। ক্রিকেট, হকি, টেনিস রীতিমত চর্চা করতে ভালোবাসে। ওর জীবনের আদর্শ হলো মেয়েদের এমন একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা যেখানে শেলাই-বোনার নামগন্ধ থাকবে না, কেবল শিকার থেকে মাউন্টেনিয়ারিং অবধি যাবতীয় 'পুরুষালী' স্পোর্টস্ অনুশীলন করানো হবে। এদিকে ওর মা'র মানে আমার বৌদির, আদর্শ আবার অন্যরকমের। তাঁর 'ইচ্ছে বছর পনেরো বয়স হলেই শাড়ী পরে, পাউডার মেখে, হাতে শেলাইটি নিয়ে মেয়েরা ছবিটি হয়ে বসে থাকবে। বিয়ের কথাবার্তা হলে সলজ্জ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার আড়ালে কান খাড়া করে শুনবে। বয়ঃসন্ধিকালের ওই রকম একটা মধুর বিনম্র ছবি তাঁর মনের মধ্যে আঁকা আছে। এদিকে রমির জীবনদর্শন খুব সোজাসুজি ধরণের, 'সলজ্জ', 'সস্মিত' 'কটাক্ষ'; 'স্ত্রীড়' এসব কথা বোধ হয় ওর অভিধানেই নেই! তাই মা-মেয়ের সংঘাতটা বেশ নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রমি মাঝে মাঝেই দার্শনিক হয়ে যায়, উদাস গলায় বলে, "আদর্শের সংঘাত আর কোথায় নেই?"

এখনো উদাস গলায় বললো, "এই যে আমি, ফুটবল খেলতে দিলেও বোধহয় ভালোই খেলবো। দেবে মা খেলতে? মেয়েদের বাধা কত! পুরুষরা বাধা দেয় আবার মেয়েরাও মেয়েদের উন্নতির পথে কি কম বাধার সৃষ্টি করে!"

আমি আপোষের সুরে বলি, "বেশ তো, পড়াশুনো করতে তো কেউ বাধা দেয় নি। ভালো করে পড়ু যাতে রেজাল্ট ভালো হয়।"

"সে তুমি ভেবো না পিসী," রমি আমাকে আশ্বস্ত করে, "তুমি যা রেজাল্ট করেছো তারপর আমি যা-ই করি না কেন বেশ ভালোই মনে হবে। তবে কি না আমার অ্যাপিটিটিউডটা যে অন্য লাইনে।"

চাঁদুকা' ইত্যবসরে প্লেটটা খালি করে রমিকে বললেন, "আরো কটা সিঙ্গাড়া নিয়ে আয় দিকি।"

"আমি না বাবা!" রমি গুটিয়ে যায়, "ভেতরে ঠাকুমার সঙ্গে মা রয়েছে, আমাকে দেখলেই এক্ষুনি কাজে লাগিয়ে দেবে। পিসী তুমি যাও। রেজাল্ট দেখে অবধি তোমার মন খারাপ, তাই তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।"

আর এক প্লেট সিঙ্গাড়া টেনে নিয়ে বেশ হৃষ্ট কণ্ঠে চাঁদুকা' বললেন, "যা বলছিলুম তাই শোন্। মেয়েরা কেন উন্নতি করতে পারে না জানিস্? কারণ তাদের মানসিক প্রসারতা নেই, হৃদয়বৃত্তির গভীরতা নেই, বুদ্ধিবৃত্তির কথা তো না বলাই ভালো।"

রমি ফশ্ করে বলে উঠলো "যাই বলো চাঁদুকা' মেয়েদের চরিত্রে বাপু ত্যাগ ধৈর্য ক্ষমা এ সব গুণ খুব আছে।"

"তা একটু-আধটু আছে বটে—!"

"একটু আধটু নয়, বেশ বিলক্ষণ। এই যে তোমাকে এতোগুলো সিঙ্গাড়া মা-ঠাকুমা পাঠিয়ে দিলো, কে জানে ওদের জন্যে একটাও রইলো কি না। এটা ত্যাগ নয়? তাছাড়া দেখ, আমরা দুজন সেই থেকে হাঁ করে বসে আছি আর তুমি, গব্‌গবিয়ে খাচ্ছো, একটাও অফার করলে না। ধৈর্য ধরে সে-সব সহ্য করছি আর তোমাকে ক্ষমা করছি। এগুলো মহৎ গুণ নয়?"

চাঁদুকা' অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "নে-না, নে-না কাঁটা নিবি। খাবি, তা বললেই হয়। খোঁটা দিস্ কেন বল্ দিকি?"

রমি একটা বড় গোছের সিঙ্গাড়া ম্যানেজ করে বললো, "তাছাড়া, মেয়েরা খুব সরলও হয় বাপু, খুব ফ্র্যাঙ্ক—

তোমাদের মত প্যাঁচানো নয়। এই দেখ না কেন সেই যে সত্যজিৎ রায়ের একটা বই রিলীজ করলো, খুব আধুনিক ধরণের বই, ভীষণ রকম অ্যাবস্ট্রাক্ট। কাগজে কাগজে কেমন যেন চাপা চাপা ধরণের রিভিয়ু বেরুলো, না-রাম না-গঙ্গা—নো কমিটমেন্ট গোছের খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট রিভিয়ু। সেই সময়ে ফিল্মটা সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে তুমিও মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে অনেক কিছু আবোল-তাবোল বকলে। যা বকলে তাতে করে তুমি যে ফিল্মটার কতদূর কি বুঝেছো তা আমরা সবাই বুঝতে পারলুম, কিন্তু কিছু বললুম না, না-রে পিসী?"

চাঁদুকা'র জ্বলন্ত দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে আমি সায় দিলুম।

"অথচ" রমি বললো, 'কাকীমা কিন্তু অমন নয়। উনি এসেই আমাদের বললেন, 'কি যে ব্যাপারটা হলো তার ছাই মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝলুম না। এর চেয়ে 'হান্টারওয়ালী' দেখতে গেলেই হতো।—তাই বললেন, না পিসী?"

আমি আবার সায় দিলুম। চাঁদুকা' কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, রমি বললো, "শোনো না, তারপর সেই ফিল্মটা তো এদেশে প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল পেল, ও-দেশে সিলভার কি সব পেল, তখন কাগজে কাগজে 'আমাদের গৌরব' 'আলোড়নকারী ছবি-টবি' বলে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তখন তুমি একদিন জবলজবলে মুখে এসে ফিল্মটার কত প্রশংসাই করলে। এমন সব বস্তু থেকে এমন সব সিম্বল্ বের করতে লাগলে যা শুনলে স্বয়ং সত্যজিৎবাবু স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।"

'চাঁদুকা' আবার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন —কিন্তু রমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "তখনো কিন্তু কাকিমা বলেছিলেন, 'ও তোরা যাই বল্ বাপু, নাচ নেই, গান নেই, কান্নাকাটি নেই—প্রাণটা যেন ভরাট হয় না' বলে 'ভোলীভালী নয়নেবালী' দেখতে গেলেন।—কি সাহস, কি দৃঢ়তা, কি সরলতা, না-রে পিসী?"

চাঁদুকাকা এতক্ষণে চান্স পেয়ে বললেন, "রাখ্ তোর সরলতা, সরলতা তো বোকামিরই নামান্তর? যা বলছি তা মন দিয়ে শোন দিকি। আমি বল্‌ছিলুম যে যদিও মেয়েরা অতি নিকৃষ্ট প্রাণী তবু চাষাটি কলার মধ্যে মাত্র একটা কলায় তাদের স্থান পুরুষের অনেক ওপরে। বল্ তো সেটা কি?"

"রাঙ্গা মানুষ করা কি?" আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করি।

চাঁদুকা' প্যাঁচার মত মুখ করে বললেন, 'শিশুপালন আবার একটা কলা নাকি? কে জানে? তবে আজকাল মডার্ন বাপেদের যেমন ছেলে ঘাড়ে করে ঘুরতে দেখি তাতে তো মনে হয় ও ব্যাপারেও পুরুষরা মেয়েদের টেক্কা দিয়েছে। আমি বলছিলুম অভিনয়ের কথা।

"বুঝলি, প্রতিটি মেয়ে একেবারে জন্ম-অভিনেত্রী। অভিমন্যুর যুদ্ধবিদ্যের মত তারা অভিনয়বিদ্যেটা শিখে নিয়েই পৃথিবীতে পদার্পণ করে। ওই দুটো তিনটে বছর যা গড়িমসি করে কাটে, তারপরেই The world is a stage.....

"মেয়েরা সারাক্ষণই অভিনয় করে যায় এই জন্যেই তাদের অস্তিত্বটা এত বিপজ্জনক। তোদের কাকীমা যখন বলে 'না-না, আমার আর শাড়ী চাই না,' তখন সে বাধাটা অগ্রাহ্য করাই নিয়ম। অথচ যখন সে বলে 'খবরদার যদি পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়েছ' তখন সে বারণ অগ্রাহ্য করলে আর রক্ষে নেই। বারোমাস তিরিশ দিন এই পাজ্‌ল্ সল্‌ভ্ করতে করতে ঘর করা যায়? বল্ দিকি? আর ভুল করেছো কি গেছ, তক্ষুনি গিন্নীর প্রচন্ড রাগ হয়ে যাবে—সে টেম্পারেচার নামায় কার সাধ্যি।"

"রাগ নয় চাঁদুকা' অনুরাগ, অনুরাগ।" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি "কাকীমা তোমাকে ভীষণ রকম ভালবাসেন বলেই তোমার ওপর সর্বদা ভীষণ রকম চটে থাকেন। মানে তোমার ওপর ও'র দাবীটা একটু বেশী তো —অর্থাৎ কিনা রাগটা ঠিক রাগ নয়, অভিমান বা অনুরাগ যা বলো।"

চাঁদুকা' খুশি হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কিন্তু মন্দ বলিস নি। মেয়েমানুষ হলে কি হয় কখনো-সখনো বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলে ফেলিস দেখি। ম্যাথামেটিক্সে তো প্রায় পাশ করেই যেতিস্ নেহাৎ...সে যাক্, একটা গল্প বলি শোন্—রাগ আর অনুরাগেরই ব্যাপার।"

শেষ সিঙ্গাড়াখানি তুলে নিয়ে বেশ জুৎ করে বসে চাঁদুকা' আরম্ভ করলেন।

"অনেকদিন আগে আমরা যখন বালীগঞ্জে থাকতুম তখন আমাদের সামনের একটি ছিম্‌ছাম দোতলা বাড়ীর একতলায় ব্যারিস্টার অলক মুখার্জি থাকতো। ফিট্-ফাট কেতাদুরস্ত ব্যারিস্টার, দিব্যি পশার, দিব্যি চেহারা—কেবল যা একটু 'চরিত্তির দোষ' ছিলো। তা তার জন্যেও সে বেচারিকে দোষ দিতে পারবি নে—মেয়েরা যেভাবে তাকে ঘিরে কূজনগুঞ্জন করতো তাতে অনেক শুকদেব শর্মারও চরিত্র ঠিক রাখা মুস্কিল ছিলো। সে যে কতরকম স্ট্র্যাটেজি, কতরকম কলাবিদ্যা তা তোরা কি বুঝবি।...অলক মুখার্জি সাঁতার কাটতে গেলে তরুণীরা ডুবে যায়, অলককেই তাদের উদ্ধার করতে হয়। অলক মুখার্জি নাচতে গেলে তরুণীদের পা মচ্‌কে যায়, অলককেই সেবাশুশ্রূষা করতে হয়। অলক পিকনিকে গেলে তরুণীদের গাড়ী অচল হয়ে যায়, অলককেই বাধ্য হয়ে তাদের লিফট্ দিতে হয়, এমনি অসংখ্য.....কত আর বলবো। অলক যে এদিকে এন্তার মদ খায়, ছ-মাস অন্তর গাড়ী পাল্টাবার মত ছদিন অন্তর বান্ধবী বদলায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো বলে মনে হতো না। বোধহয় সবাই ভাবতো একবার কোনোমতে মিসেস অলক মুখার্জি হতে পারলে মিস্টার অলক মুখার্জিকে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে, নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ এদিক-ওদিক তাকানো, নট্ কিচ্ছু। আর অলক ছেলেটা এদিকে বেশ ভালোই ছিলো, খুব সরল, খুব দরাজ-দিল্ ...একটা অপোগন্ড ভাই ছিলো, সে রোজগার পাতি কিছু করতো না, দাদার হোটেলেই থাকতো। লোকে চান্স পেলেই দুই ভাইকে তুলনা করে তাকে ধিক্কার দিতো। কিন্তু অলক কখনো তাকে কিছু বলতো না। যতই হোক্ বাপ-মা মরা ছোট ভাইটা। যা ইচ্ছে তাই করুক—এইরকম মনের ভাবটা। ভাইটা অবিশ্যি অলককে খুব মান্য করতো, মাথাটা নীচু করেই থাকতো, কথাবার্তা বিশেষ বলতো না।

"এই তো গেল অলক মুখার্জির কথা, এবারে স্বরূপা মিত্রের কথা শোন্। অলক যখন বিলেতে তখন তার মা দোতলায় এক ঘর ভাড়াটে বসিয়েছিলেন, তা অলক ফিরে এসেও আর তাদের নড়ায় নি। সেই দোতলা আলো করে থাকতো স্বরূপা মিত্র। যেমন বিদুষী, তেমনি রূপসী। গায়ের রংখানা কি! ফ্যাকফেকে শাদা হয় একরকম—মোটেই সেরকম নয়। কিরকম জানিস? এই যেমন—যেমন ধর তোর যদি জন্ডিস হয় আর তুই শাদা কোনো জিনিষ দেখিস্ তাহলে কেমন যেন শাদার মধ্যে হল্‌দে ছাপ ফুটে ওঠে না? অনেকটা সেইরকম। চুলই বা কি! দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদিন চুল শুকোচ্ছিল, অলক তার চাকরকে বললো "ওদের বারণ করে দিস্ তো যেন সামনের বারান্দায় কাপড় না ঝোলান।"

"মাত্রা ছাড়িও না চাঁদুকা'," রমি ধমকে ওঠে। "নায়িকার রূপবর্ণনা করতে হলেই তোমাদের আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। তাছাড়া একপিঠ তেলমাখা লম্বা লম্বা চুল, সে তো এক সাংঘাতিক নাইসেন্স!"

রমির ঝাঁকড়া রুখু-রুখু চুলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাঁদুকা' বললেন "আচ্ছা বেশ বাপু সংক্ষেপে বলছি। মোটকথা স্বরূপা মিত্র একটা ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলো। আর বিদুষীই কি কম? কোন্

একটা কলেজে লেকচারার ছিলো। তাই বলে ভাবিস্ নি যেন যে লেকচার দিতে দিতে গলা ভেঙে গেছলো। স্বরূপা মিত্রের গলার স্বরটিও ছিলো মধুর, আর কি আস্তে আস্তেই কথা বলতো, ক্লাশের মেয়েরা কিছু শুনতেই পেত না, তারা বোধহয় প্রোফেসারের রূপেই মুগ্ধ ছিলো।"

রমি ঠোঁট উল্টে বললো, "নিশ্চয়ই, পড়া তৈরী থাকতো না।"

"হতে পারে, তবে অন্য সময়েও সেই একই গলায় বাতচিৎ করতো। কেমন যেন একটা আবছা আবেশমাখা গলা—। কেমন জানিস? এই ধর তোর খুব জ্বর হলে পাশ থেকে কথা বললেও যেমন মনে হয় দূর-দূরান্তর থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে...।"

"আঃ চাঁদুকা," রমি ফের ধমকে ওঠে। "তোমার দেখছি একটা রোগের অবসেশান দাঁড়িয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, শোন্ তারপর। স্বরূপা মিত্রকে যে দেখতো সেই প্রেমে পড়ে যেত, কিন্তু কাছে এগুতে সাহস করতো না। স্বরূপার কেমন যেন একটা আইসব্যাগের মত ঠান্ডা শীতল ভাব ছিলো, একটি দৃষ্টিতে হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রী টেম্পারেচারকে নামিয়ে নাইন্টি থ্রী করে দিত। কথা বলতো কম, হাসতো আরো কম, কেমন যেন একটা মহিমা ফুটে বেরুতো তার সর্বাংগ দিয়ে।

"এহেন স্বরূপা মিত্রকে দেখতে দেখতে অলক মুখার্জিও যে তার প্রেমে পড়ে যাবে সে আর বিচিত্র কি। তাছাড়া চতুর্দিকের ছলাকলার মধ্যে স্বরূপার শীতল ভাবটা বোধহয় তার ভীষণ ভালো লাগতো।—ওঃ বলিনি বুঝি? স্বরূপা অলককে রীতিমত তাচ্ছিল্য দেখাতো। গায়ে পড়ে কথা বলা দূরে থাক্, অলক কথা বললে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যেত। অলকের নতুন কেনা গাড়ীটা ঘিরে যখন অন্য তরুণীরা কল্‌কল্ করতো তখন স্বরূপা কেমন যেন একটা অনুকম্পার দৃষ্টি হেনে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। আর অলকের টেম্পারেচার সংগে সংগে—বুঝলি তো?"

"নাইন্টি থ্রী", আমি বলি।

"ঠিক। যাই হোক, অলক বেচারা কিন্তু স্বরূপার মন পাবার জন্যে কম চেষ্টা করেনি। তক্কে তক্কে থেকেছে যদি কখনো স্বরূপার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়...কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, স্বরূপা নাচতেও যায় না, সাঁতারও কাটে না, পিক্‌নিকে যদি বা যায় তবে অলকের সংগে কদাচ না। শেষে ভেবে ভেবে অলক ঠিক করলো তারই এবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পালা এসেছে। সুতরাং অলক অসুস্থ হয়ে পড়লো, বন্ধু-বান্ধবদের সব বারণ করে দিল যেন কেউ তাকে দেখতে না আসে। তারপর অলকের চাকর বার বার দোতলায় উঠে বার্লি, থার্মোমিটার, হট্-ব্যাগ, আইসব্যাগ ইত্যাদি চাইতে লাগলো। স্বরূপার বাবা রোজ খোঁজ নিয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু স্বরূপার ছায়াটিও দেখতে পাওয়া গেল না। শেষে মরীয়া হয়ে অলক একদিন সোজাসুজি স্বরূপার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলো।

"ভদ্রলোক প্রস্তাব শুনে একটু চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখ বাবা, মেয়ে বড় হয়েছে, তুমি একবার তার সংগেই কথা বলে দেখ। আমি বরং তাকে একবার নীচে আসতে বলবো।" এই অবধি শুনে অলক আনন্দে মূর্ছা যায় আর কি। তক্ষুনি নিউ মার্কেট থেকে দামী দামী ফুলের তোড়া কিনে আনালো। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘরে ফুল সাজিয়ে নীল একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে পকেটে একটা হীরের আংটি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কিন্তু—স্বরূপা এলো না।"

"এলো না?" আমি আর রমি দুজনেই অলকের বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি।

"এলো না মানে সেদিন এলো না। তার পরের পরের দিন সকালে, যখন ফুলটুল সব শুকিয়ে গেছে, আর অলক নারীজাতির নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ভাইকে ডেকে বলছে, 'ফুলগুলো দূর করে ফেলে দে, আর এক্ষুনি আমার টিকিট কেটে দে, আমি দেশান্তরে যাবো,' তখন দরজায় ধীর মৃদু একটা করাঘাত শোনা গেল। স্বরূপা মিত্র বললে, 'আসতে পারি?'

অলকের ভাই চট্‌পট্ শুকনো ফুল-গুলো আবার ফুলদানীতে গুঁজে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অলক আবার বিছানায় নেতিয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করে বললো, 'এসো স্বরূপা।'

"তারপর কত রকমারী ভাষায় অলক প্রোপোজ করলো তা আর নাইবা শুনলি। বৌমা আবার রমি পেকে যাচ্ছে বলে সর্বদা চিন্তিত হয়ে থাকে। মোটকথা অলক যত-খানি আবেগ ঢেলে দিতে পারে তা গলার স্বরে ঢাললো। হাত-টাত ধরার তো জো নেই, তাহলে স্বরূপা মিত্র আবার আইস-ব্যাগী দৃষ্টি হানবে।

"সব শুনেটুনে স্বরূপা বললো, 'দেখুন অলকবাবু, আমার জীবনের কয়েকটা প্রিন্সিপল্ আছে। আপনি যেরকম জীবন-যাপন করেন তা আমার আদর্শের সংগে মেলে না। অতএব বিয়ে হলে আমরা কেউ সুখী হব না।"

রমি উদাস হয়ে গিয়ে বললো, "সর্বত্রই আদর্শের সংঘাত।"

"অলক তো অনুনয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো। 'স্বরূপা, তুমি আমায় একটিবার চান্স দিয়ে দেখ। আমি মদ আর ছোঁবো না, কোনো মহিলার দিকে তাকাবো না, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে দেব, শুধু তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমাকে সাহস দাও। দেখ মা নেই, আমাকে কন্‌ট্রোল করার কেউ নেই। ঘর সংসারের কি বিশৃংখল অবস্থা! তুমি এসে সব হাতে তুলে নাও।'

"স্বরূপা একটু হাসলো, তারপর উঠে ফুলদানীর মরা ফুলগুলো তুলে ফেলে দিয়ে বললো, 'বিশৃংখল অবস্থাই বটে।' তারপর স্বরূপা কুশানগুলো ঠিক করলো, করে ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'আচ্ছা আমি আজ যাই, আর একদিন আসবো।'

"অলকের ঘর থেকে বেরিয়ে স্বরূপা সারা একতলাটা ঘুরে ঘুরে দেখলো। প্রচুর

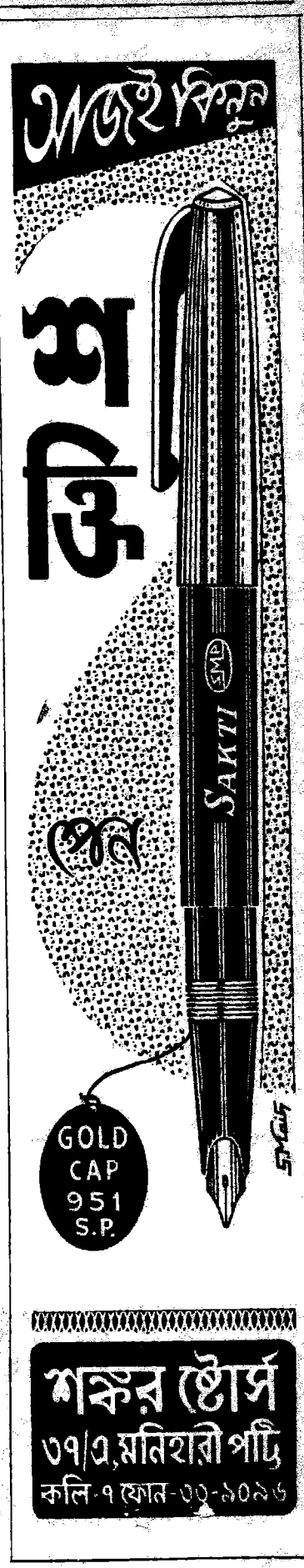

দামী দামী আসবাবপত্র, খাবার-দাবার সব ছড়ানো চারিদিকে। কি অপচয়, কি বিশৃঙ্খলতা...। স্বরূপা যখন দোতলায় গেল তখন তার চোখ দুটো চকচক করছে। চিরসঙ্গিনী নারীসত্তা উচ্ছৃঙ্খল অলকের মধ্যে বোধহয় একটি দুরন্ত শিশুকে খুঁজে পেল।"

"এতো ডিটেলস্ তুমি জানলে কি করে?" রমি চ্যালেঞ্জ করলো।

"আঃ, শুনে যা-না বাপু। ওটুকু বস্তার 'প্রিভিলেজ', কেবল 'ফুললো আর মরলো' শুনলে কি তুই সন্তুষ্ট হবি? তারপর আরো কদিন স্বরূপা এলো, বেয়ারা বাবুর্চিকে অলক আর তার ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়া সুখ-সুবিধে সম্বন্ধে নির্দেশ দিলে! এটা-ওটা করলো। তাই দেখে অলকের ইম্পারেচার আশায় আশায় হাণ্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রির দিকে এগুতে লাগলো।

"কিন্তু স্বরূপার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছিল তা তার মা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একদিন ইশারায় বললেন, 'খুকু, অত ভাবছিস্ কেন মা? মনস্থির করে ফেল্।' স্বরূপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কাজটা ভালো হবে কিনা বুঝতে পারছি না মা।'

"অবশেষে একদিন স্বরূপা আবার অলকের ঘরে দর্শন দিল। একটু অতর্কিত দর্শন, অলক শশব্যস্তে মদের বোতল লুকোতে গিয়েও সফল হল না। তখন একটু করুণ হেসে অলক বললো, 'স্বরূপা, আমি বড় দুর্বলচিত্ত, তুমি আমাকে গ্রহণ না করলে আমি মোহমুক্ত হতে পারবো না।'

"স্বরূপার মুখ ততক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে, সে বললে, 'কোনদিনই আপনি মোহমুক্ত হতে পারবেন না। অর্থ জিনিষটাই সব অনর্থের মূল অলকবাবু। আপনার প্রচুর অর্থই আপনার চারিত্রিক ত্রুটির কারণ। সে যাই হোক, আমি আপনাকে শুধু এইটুকু বলে যাই যে আপনার আমার মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি, আমি তাই আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলুম না।'

"একে তো এতোগুলো শক্ত শক্ত কথা, তার ওপর স্বরূপার চোখে সেই ফ্রীজিং পয়েন্ট দৃষ্টি, আবার তারও ওপরে স্বরূপার মুখের 'না' শুনে অলক একেবারে বসে পড়লো। অনেক অনুনয়-বিনয় করলো কিন্তু স্বরূপা হেললো না দুললো না, কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় চলে গেল। দরজার আড়াল থেকে অলকের ভাই করুণ নেত্রে দাদার অবস্থা দেখতে লাগলো।

"অনেকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে থেকে অলক উঠে দাঁড়ালো। তারপর সুট বুট-টাই এঁটে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল, যাবার আগে ভাইকে বলে গেল, 'আমার টিকিট রিজার্ভ করে ফেল, আমি দিল্লী-বম্বে যেখানে হোক কিছুদিনের জন্য বেরুতে চাই—জানাই।'

"এর কদিন পরে স্বরূপা একটা মস্ত মোটা রেজিস্ট্রি করা খাম পেল, সেই সঙ্গে অলকের একটি চিঠি। চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে স্বরূপার মুখে কতরকম ভাব খেলা করে গেল, সে সৌন্দর্য যদি দেখতিস্! সে রূপ—আচ্ছা থাক্, চিঠির বয়ানটা শোন্—

"স্বরূপা,

তুমি ঠিকই বলেছো। অর্থই সব অনর্থের মূল। আমার মত দুর্বলচিত্ত পুরুষের হাতে অর্থ থাকাটা বোধহয় সঙ্গত নয়। তাই আমার যাবতীয় যা-কিছু সে সবই তোমার নামে গিফ্‌ট্ করে দিলুম। আমি এখন রিক্ত, নিঃস্ব, হতভাগ্য। কিন্তু এই রিক্ততাই পরম বিত্তে ভরে উঠবে যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ভাগ্যবানের প্রতি তুমি বিমুখ হয়েছো। দেখি ভাগ্যহীনের প্রতি কেমন করে বিমুখ হয়ে থাকতে পারো। আমি এই ঠিকানায় রয়েছি—অনির্দিষ্ট কালের জন্যে থাকবো। যতদিন না তুমি আমাকে ডেকে পাঠাবে ততদিন আমি কলকাতায় ফিরবো না।

"স্বরূপা, যদিও তুমি আমার প্রতি কঠিন হয়েছো তবু এই কঠিনতার অন্তরালে আমি তোমার মঙ্গল স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। রাগের অন্তরালে যে অনুরাগের দীপ্তি বিরাজ করে এ তথ্যটা কিন্তু আমার অজানা নয়। ইতি

তোমারই অলক।

"চিঠিটা পড়তে পড়তে স্বরূপার মুখে বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠলো। সে যে কি অপরূপ শোভা....."

রমি বাধা দিয়ে বললো, 'চাঁদুকা' তোমার ওই স্মরণশক্তিতে এই চিঠিটার বয়ান মুখস্ত করলে কি করে?'

চাঁদুকা' মুচকি হেসে বললেন, "এটা জিনিয়াসের লক্ষণ বুঝলি?'

আমি বললুম, "জিনিয়াস না হাতী, এটাও বস্তার 'প্রিভিলেজ'। যাইহোক তারপর কি হলো চাঁদুকা'?"

"বলছি, কিন্তু দেখ্ না আর একটা অঙ্কটা সিঙ্গাড়া আছে কিনা মানে তোদের সকলের ভাগটা রেখে—।"

সবে চেঁচিয়ে বৌদিকে চাঁদুকা'র ইচ্ছেটা জানিয়েছি, আর রমি সবে বলেছে "কি খেতেই পারো চাঁদুকা", এমন সময় পর্দা ঠেলে স্বয়ং বৌদির আবির্ভাব।

"চাঁদুকা', মা বলছেন আপনাকে আর সিঙ্গাড়া দেওয়া হবে না। ভাজা জিনিষ খাওয়া আপনার বারণ, কাকিমা শুনলে অনর্থ করবেন।" এই অবধি বলে বৌদি রমিকে তাক্ করলেন, "এখনও চান করিসনি কেন?"

"এই যাচ্ছি," রমি মিনমিন করে বললো। "হাত-পায়ের ছিরি হয়েছে দেখ না।" বলে বৌদি আবার রমিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, "চুলে তেল্ দিস্‌নি কেন?"

"বাঃ কাল তো নিজেই আধবোতল তেল মাথায় ঢেলে দিলে।"

"হুঁ। অত চেঁচাচ্ছিলি কেন, আস্তে কথা বলতে বলেছি না?"

"আমি চেঁচাচ্ছিলুম?" রমি আকাশ থেকে পড়ে, "আমি তো এই ফিরলুম।"

বৌদির পরের প্রশ্নটা হবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি? তার আগেই আমি বললুম, "মা বোধহয় তোমাকে ডাকছেন, বৌদি।"

বৌদি আরেকবার রমির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বেরিয়ে গেলেন।

"বাব্বাঃ!" রমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, তারপর তাড়া দিয়ে বললো, "গল্প শেষ করো চাঁদুকা'। দেখ, অলকের পক্ষে রাগের আড়ালে অনুরাগের থিওরীটা জানা কিছু আশ্চর্য নয়, বম্বে ফিল্মে প্রায়ই এই রকম ফর্মুলা থাকে।"

চাঁদুকা' শূন্য প্লেটটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা অবিশ্যি থাকে। যাক্—তারপর শোন্। এর কিছুদিন পরে অলক মুখার্জিও একটা চিঠি পেল, সে চিঠিটার বয়ান শোন্।

"অলকবাবু,

আপনার দানপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পেলুম। অনেক ধন্যবাদ জানবেন। এই দানপত্রই আমার বিবাহের সমস্ত বাধা নির্মূল করে দিল। এখন আর আমার বিবাহে কোনো আপত্তি নেই। আপনি আর অনির্দিষ্টকালের জন্যে দিল্লীতে পড়ে থাকবেন কেন? বিবাহ-রাত্রে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রার্থনীয়। (আহা কি রসবোধ স্বরূপার, অলক ভাবলো, এটা এতদিন জানতুম না তো।) আপনি ঠিকই বলেছেন, ভাগ্যবানের প্রতি বিমুখ হলেও ভাগ্যহীনের প্রতি প্রসন্ন না হয়ে পারলুম না। যাকে এতদিন দাদা প্রতিপালন করেছেন এবং এখন থেকে যে স্ত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত হবে সে ভাগ্যহীন ছাড়া কি? আপনার সব অনুমানই নির্ভুল হয়েছে শুধু একটা ছাড়া—সেটা হলো বিয়ে আমি আপনাকে করছি না, করছি আপনার ভাইকে?"

"অ্যাঁ!" আমরা সমস্বরে বলি।

"হ্যাঁ, তারপর চিঠির শেষে স্বরূপা লিখলো :—"দানপত্রটা যাচাই করে দেখেছি ওটা খাঁটি, তাই এখন আর বলতে আপত্তি নেই যে রাগের আড়ালে অনুরাগ থাকে এ তথ্যটা আপনি জানেন ভেবেই আমি গোড়া থেকে এগিয়েছিলুম। আপনার প্রতি আমার রাগ বা অনুরাগ কোনোটাই নেই, সবটাই ছিলো অভিনয়। ইতি—স্বরূপা মিত্র"

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে রমি বললো, "তারপর?"

"তারপর আর কি, বিয়েটা হয়ে গেল, অবিশ্যি বেশী ধুমধাম হলো না, কারণ স্বরূপা হিসেবী মেয়ে, প্রতিবেশীদের ডেকে ভূতযজ্ঞি করাতে রাজী হলো না। আমরা আড়ালে একটু নিন্দে মন্দ করেছিলুম কিন্তু সামনাসামনি কিছু বলতে সাহস হলো না, কারণ স্বরূপার চোখে চোখ পড়তেই টেম্পারেচার.....।"

রমি বাধা দিয়ে বললো, "কিন্তু অলক মুখার্জি? তার কি হলো?"

"ও অলক? তার আর কি হবে," চাঁদুকা'র কণ্ঠস্বরও করুণ হয়ে এলো। "সে কিছুদিন পরে কলকাতায় ফিরেছিল, পুরোনো বান্ধবীদের কাছেও গেছলো কিন্তু তাদের তখন ভিন্নমূর্তি। তারা স্পষ্টই বললো, "যা কিছু ছিলো, সব তো গেছে, তাছাড়া তোমার বুদ্ধির খ্যাতি যেভাবে কলকাতায় রটেছে তাতে এখানে তোমাকে কেউ রীফ দেবে বলে মনে হয় না। দেখ বেয়ে চেয়ে হাতে কিছু জমলে আবার দেখা করো, আমরা এখন ব্যস্ত আছি।"—এইসব শুনে অলক হরিদ্বারেই গেল না অন্য কোথাও গেল তা ঠিক বলতে পারি না।"

আমরা সমবেতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। চাঁদুকা' দার্শনিকভাবে বলে চললেন, "বললাম না তোদের, নারী অতি নিকৃষ্ট জীব, মাথায় তাদের তুলেছো কি মরেছো। অন্যান্য জীবজন্তুর যে সব অস্ত্র আছে—যেমন দাঁত, শিঙ, নোখ। সেগুলো তো চোখে পড়ে, কিন্তু মেয়েদের অভিনয় অস্ত্রটা যেন অদৃশ্য বর্ম, অদৃশ্য হাতিয়ার। পুরুষ সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না থাকলে...।"

"বলি তোমার আক্কেলটা কি!" আমাদের সকলকে সচকিত করে বিপুলদেহী চাঁদুকাকীমা প্রবেশ করলেন। রমি, আমি, চাঁদুকা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

"পই পই করে বলে দিলুম যে এক ঘন্টার মধ্যে আমাকে নিয়ে আসবে, সে কথা কানেই যায়নি বুঝি? আমার কথাগুলো গ্রাহ্যিই হয় না। ভেবেছো কি তুমি?"

রমি আস্তে আস্তে বললো, "চাঁদুকা'র মেমারি ভালো হবে কি করে কাকিমা? উনি যে একজন জিনিয়াস!"

"কে জিনিয়াস? তোর চাঁদুকা?"

"হ্যাঁ, কারণ তুমি খুব সজাগ কিনা, জিনিয়াসদের বোধ খুব সজাগ হয়, এইসব কথাই উনি এতক্ষণ ধরে বলছিলেন।"

"বটে!"

"আরও বলছিলেন যে তুমি কখন কি বলো তা বোঝা যায় না। তোমার সরলতাটা বোকামী আর অসরলতাটা অভিনয়ের ছলাকলা। এইসব বোঝাচ্ছিলেন বলেই তো ওঁর সময়ের হুঁশ ছিলো না।"

এরপর দেখলুম কাকীমার চোখ রক্তবর্ণ হয়েছে। তিনি কোমরে কাপড় জড়াচ্ছেন আর চাঁদুকা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কইমাছের মত খাবি খাচ্ছেন। গৃহপালিত জীবটা যে কে তা ঠিকমত ঠাহর হচ্ছিল না বলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলুম, এমন সময় রমি কানে কানে বললো, "পিসী পালিয়ে এসো। কাকীমা নিজেই এবার—হান্টারওয়ালীর ভূমিকার নামবেন, ওঁর একটু ফ্রী স্টেজ দরকার!"

আমি পশ্চাদপসরণ করলুম কিন্তু একটা চিন্তা জেগে রইলো—কাকীমার এখনকার প্রচন্ড অনুরাগের তোড়টা চাঁদুকা সামলাতে পারবেন তো?

ভারতীয় নৃত্য

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

ঐতিহ্যের দেশ ভারত। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিষয়ে রয়েছে ভারতের গৌরবময় উত্তরাধিকার। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন ধারায় ভারতের ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে আজও অব্যাহত। নৃত্যের জন্ম মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বললেই হয়। নৃত্যের ইতিহাস বলতে ভারত আত্মার ইতিহাস। নৃত্যে পাওয়া যায় অনন্তের চেতনা। নৃত্য বলতে বোঝায় ছন্দ ও শব্দের যৌথ রূপের প্রকাশ, যা সৃষ্টি করে অপার্থিব ভাবের কাব্য। ভারতীয় নৃত্যকে ধর্ম ও দর্শন থেকে আলাদা করা যায় না। ধর্ম, দর্শন ও শিল্প একটি চেতনা থেকে উদ্ভূত এবং এর মধ্যে একটি থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ বা মোক্ষ-লাভের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা। বেদ, উপনিষদের অস্তিত্বের মত নৃত্য ও সংগীতের অস্তিত্বও এই সুখলাভের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

নৃত্যের প্রথম রূপ আমরা ভারত-বাসীরা পাই স্বয়ং শিবের কাছ থেকে। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন মহাজাগতিক নৃত্য। তিনি দেখিয়েছেন যে আত্মা ও দেহের সম্পূর্ণ একাত্মতাই হল শ্রেষ্ঠ যোগ এবং এই একাত্মতা নৃত্যের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। তাই নৃত্যকে বলা হয় যোগ-এর আর এক রূপ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নৃত্য করেন এবং তাঁকে ঘিরে গোপিনীরা রাসনৃত্যে মেতে ওঠেন। এই নৃত্যের ছন্দে পরমাত্মা জীবদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেন—যে জীবরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নৃত্যের ছন্দে প্রতিটি গোপিনী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেন। এই জীবরা জানতেন জীবনের মহা উৎস, যার থেকে তাঁদের জন্ম। এই হল ভারতীয় নৃত্যের জন্ম ইতিহাস এবং মহাঋষি ভরত এই ইতিহাসের জন্মদাতা। শিব বা নট-রাজের নৃত্যকলাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা

কত্থক নৃত্য পরিবেশন করছেন
দময়ন্তী যোশী

এবং মানুষের দ্বারা তার অনুশীলন করান ঋষির পক্ষেই সম্ভব।

ভারতীয় নৃত্য ঐতিহ্যের এই হল পটভূমিকা। ভরতের নাট্যশাস্ত্র এ বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নাট্য, সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, অভিনয়, স্থাপত্য এবং শিল্প ও সৌন্দর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুসমঞ্জস মতবাদ পাওয়া যায়। মানুষের যা সৃষ্টিক্ষমতা তা দেব আরাধনায় বা পূজার্চনায় প্রথম কাজে লাগান হত। দেবদেবীর মন্দিরে নৃত্য ও গীত পরিবেশনের আয়োজন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এবং তা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে ও প্রাচীন ইতিহাসে নৃত্যশিল্পের বিকাশের ধারা বিস্তৃতভাবে জানা যায়।

এক সময় সারা ভারতবর্ষে সর্বোৎকৃষ্ট (ক্লাসিক্যাল) নৃত্যের একটি ধারাই প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে এই ধারায় ভারতের এক একটি অংশের ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসারী রূপান্তর ঘটে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গের নৃত্য-শিল্পের মূল ধারা চারটি—ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক।

ভরত নাট্যম—ভরত নাট্যমের উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে। এই নৃত্যের

ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করছেন
ইন্দ্রাণী রহমান

মণিপুরী নৃত্য

বৈশিষ্ট্য তার লাস্যময়তায়। সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে কোমল এই নৃত্যকলা। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী হলেও, দক্ষিণ ভারতে নাকি এই নৃত্যকলার প্রচলন আরও প্রাচীন। ভরত নাট্যমে নৃত্য ও সঙ্গীত অবিচ্ছেদ্য। সুন্দর কমনীয় দেহের ভাবব্যঞ্জক ছন্দে খাঁটি নৃত্যকলা ও অভিনয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ ভরত নাট্যমে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অনেকের মতে এই নৃত্যকলার নাম 'ভারত নাট্যম' (ভরত নাট্যম নয়); কারণ, ভাব, রাগ ও তাল—এই তিনটি কথার প্রথম শব্দগুলি নিয়ে এই নৃত্যকলার নামকরণ হয়েছে। ভরত নাট্যম নৃত্যানুষ্ঠানটি ছ'টি ভাগে বিভক্ত—(১) 'আলারিপু' অর্থাৎ 'শুদ্ধ নৃত্য তান্ডবম্', (২) 'জতীম' অর্থাৎ 'তান্ডবলাস্যম্' (৩) 'যতীশ্বরম্' (অনেকটা আলারিপুর মতই), (৪) 'বর্ণম্' অর্থাৎ 'লাস্য তান্ডবম্', (৫) 'পদম্' অর্থাৎ 'লাস্যম্' এবং (৬) 'তিলানা'—'তান্ডব লাস্যম্'ও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত। এই নৃত্যানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা বা পূজা দিয়ে আরম্ভ হয়, সে অনুষ্ঠানটি ঈশ্বরের আশীর্বাদমন্ডিত। প্রধানতঃ উপরোক্ত ছটি ভাগ ছাড়াও প্রাচীন মহাকাব্য কাহিনীর অংশ বিশেষ নিয়ে ভরত নাট্যম নৃত্যনাট্য হিসাবেও পরিবেশিত হয়, যথা সীতা কল্যাণম্, রুকিণী কল্যাণম্, কুট্টালা কুরভুঞ্জি, সরবেন্দ্র বৃপাল কুরভুঞ্জি ইত্যাদি।

আলারিপু অংশে ঘাড়, কাঁধ, হাত ও চোখের বিভিন্ন প্রকার সঞ্চালন দেখান হয়, অবশ্য নৃত্যছন্দের সুষমা বজায় রেখে।

দামের দিক থেকে
সত্যিই লোভনীয়

বম্বে সেফ

স্টীল আলমারি

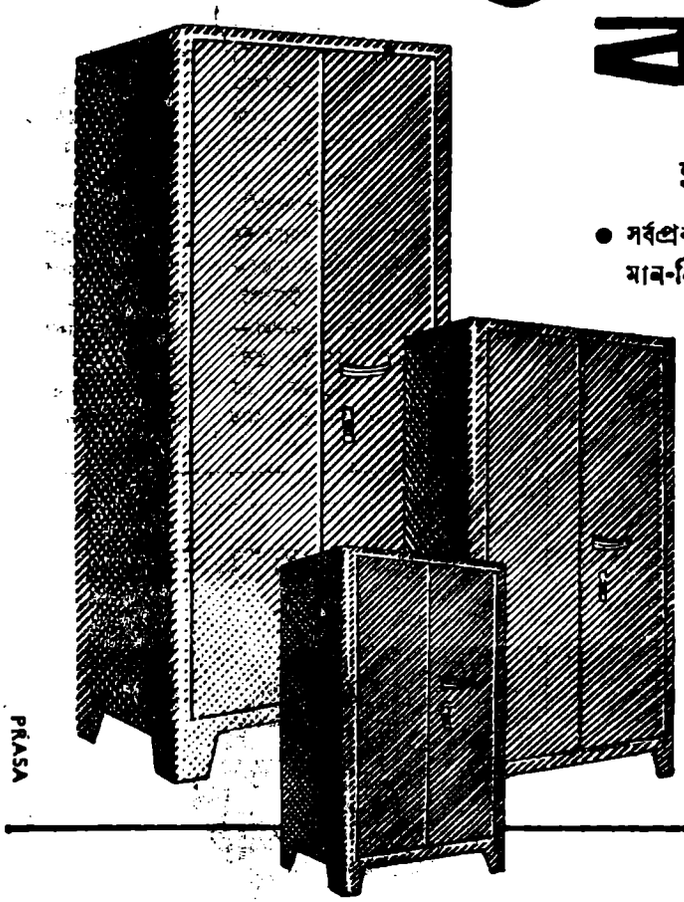

- সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম কারিগরী-নৈপুণ্য ও মান-নিয়ন্ত্রক প্রথা দ্বারা প্রস্তুত
- চুল্লীতে-সেঁকা অতি-উজ্জ্বল মন-মাতানো ফিনিশ
- বিশেষ ধরণের দুই চাবির তালার দ্বারা সুরক্ষিত
- যে কোনও বাসগৃহ বা অফিসের উপযোগী করে তৈরী
- বিভিন্ন মাপে ও কয়েকটি রঙে পাওয়া যায়
- অবিলম্বে ডেলিভারী, তুলনা-মূলক সস্তা দাম, বিক্রয়োত্তর সার্ভিস — আমাদের বৈশিষ্ট্য

PRASA

বম্বে সেফ এ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিমিটেড

গ্রাম: 'বম্বেসেফ'
ফোন: ২২-১১৮১, ২২-৮৭১৬

৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড • কলিকাতা-১

শো-রুম :-
১১/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলিকাতা-১২ • ফোন: ২২-২৭৬৫, ২২-৩৩৮৮

ক্তীশ্বরম্-এ কিছু সঙ্গীত যুক্ত হয়। যতী অর্থে সময়ের পরিমাপ—তিন, চার পাঁচ, সাত এবং নয় মাত্রায় হয়। তালে তালে পায়ের কাজেও জোর দেওয়া হয়। 'শব্দম্' হল নৃত্য ও অভিনয়ের সংমিশ্রণ। এই নৃত্যাংশের মূল ভাবটি হল শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে কল্পনা করে একটি কুমারী মেয়ের স্বর্গীয় প্রেমের অভিনয়। 'বর্ণম্' ভরত নাট্যম নৃত্যানুষ্ঠানের শেষ অংশ। এই অংশে নৃত্য ও অভিনয়ের যুক্তভাবে পূর্ণ প্রকাশ। এই অংশের মাধুর্য এই যে এতে শিল্পীর পদযুগল সময়ের তালে তালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত ও চোখের সাহায্যে অভিনয়ের সঙ্গেও সামঞ্জস্য বজায় রেখে নৃত্য করতে হয়।

কথাকলি নৃত্য—দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে, বর্তমান কেরালা রাজ্যে কথাকলি নৃত্যের জন্ম। কথাকলি নৃত্যের সঠিক জন্ম-সময় নিয়ে নৃত্য বিষয়ে গবেষকরা একমত নন। কিন্তু তা হলেও যা জানা যায় তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তি পনের শতকে। কথাকলি নৃত্য অভিনয় প্রধান। এর বিষয়বস্তু হল রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ অবলম্বন করে এবং এর চরিত্রগুলিও তাই সত্ত্ব, রজঃ এবং তম ভাব প্রভাবিত পৌরাণিক চরিত্র। কথাকলি নৃত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, কারণ এতে অভিনয়কলা এবং নৃত্যকলা দুই বিষয়েই সমান অধিকার থাকা দরকার। নাচের সঙ্গে সঙ্গে কেবল মুখভঙ্গি ও মুদ্রার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টি বা বিশেষ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেই ভাবপ্রকাশের সময় শিল্পীকে থাকতে হয় সচেতন, যাতে নাচের ভঙ্গিমার এবং আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে ভাবপ্রকাশের সামঞ্জস্য থাকে। মুখে ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তভঙ্গিমা বা মুদ্রাও একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। যে বর্ণনা নেপথ্যে দেওয়া হয় বা যে গান গাওয়া হয়, তার ভাবগুলি শিল্পীকে নৃত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। নৃত্য ও অভিনয়ের মধ্যে মুদ্রাগুলি ছন্দ সুষম সেতুর কাজ করে। কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীতে দুজন এবং যন্ত্রসংগীতে তিনচারজন সুদক্ষ শিল্পী সাধারণত অংশ গ্রহণ করেন। কথাকলি নাচের একটি বিশেষত্ব এই যে, এর নৃত্যছন্দ, অঙ্গভঙ্গি, মুখে ভাবপ্রকাশ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, সাজপোষাক, প্রসাধনের বাহুল্য সব কিছু মিলিয়ে একটি যুক্ত আবেদন সৃষ্ট হয়। কোন কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে তাতে এর বিভিন্ন অংশগুলিকে সমান সাফলের সঙ্গে পরিচালিত করতে হয়।

মণিপুরী নৃত্য—ভারতীয় নৃত্য ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম ঐশ্বর্যশালী ঐতিহ্য হল মণিপুরী নৃত্যের। মণিপুরী নৃত্যে যে অপূর্ব ছন্দ ফুটে ওঠে, যে সুন্দর কাব্যের বিকাশ হয়, সঙ্গীতে যে অননুকরণীয় ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, তা এক কথায় অতুলনীয়। অন্যান্য নৃত্যের মত মণিপুরী নৃত্যের রসও উপলব্ধির বস্তু। এর সাবলীলতা ও অনৈসর্গিক সুষমার প্রকাশ ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত। মণিপুরীদের বিখ্যাত 'লাইহারাওবা' নৃত্যটি রচিত হচ্ছে শিব ও পার্বতীর রাসলীলা উপলক্ষ্য করে। তিনটি স্তরে বিভক্ত এই নৃত্যাভিনয়টি একটি মহাকাব্য বিশেষ। এ ছাড়া রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাও মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যেই বোধহয় এদের ধর্মের মানবিক দিকটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। মণিপুরী নৃত্যে মোটামুটি দুটি ধারা— (১) ধ্রুপদী ও (২) লৌকিক। সামাজিক ক্রিয়াকান্ড হলেই এরা নৃত্যানুষ্ঠান করে—এগুলি লৌকিক নৃত্যের ধারানুসারী। বসন্তকালে মণিপুরীদের একটি প্রধান উৎসব হয়—'থাবাল চোংবা' বা বসন্তোৎসব। মণিপুরী গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা নৃত্যও লৌকিক ধারায় রচিত। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে প্রধান হল—'রাস'। এই রাস আবার বিভিন্ন রকমের—(ক) মহারাস, (খ) বসন্তরাস (গ) কুঞ্জরাস, (ঘ) বাসকসজ্জা ও (ঙ) জন্মাষ্টমী। তারপর, 'অধিবাস' নৃত্যানুষ্ঠান—সাতদিন ধরে অবিরাম এই নৃত্য চলে। 'মন্দিরা নৃত্য'ও মণিপুরী নৃত্যের আর একটি বৈশিষ্টপূর্ণ ধারা। আর আছে 'চোন্দ মাদল'—মৃদঙ্গের তালে তালে এই নৃত্য হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা—এই তিনের চরম সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় মণিপুরী নৃত্যে। তান্ডব এবং লাস্য—পৌরুষ এবং কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মণিপুরী নৃত্যে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কীর্তন সঙ্গীতের অপূর্ব মাধুরী।

ভরত নাট্যম বা কথাকলি নৃত্যে জোর দেওয়া হয় মুখভঙ্গিমার ও মুদ্রার ওপর। আর মণিপুরী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এতে ব্যাকরণের চেয়ে কান্ত, মৃক্ততার চেয়ে পেলবতা বেশী করে ফুটে ওঠে।

কত্থক নৃত্য—কত্থক নৃত্যকে বলা হয় কাব্যাভিনয়। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে এই নাচের বিশেষ প্রচলন। কত্থক নৃত্যে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব আছে। বিশেষ করে রাজা-বাদশা ও সভাসদের মনোরঞ্জনের জন্য কত্থক নৃত্যানুষ্ঠান হত। কিন্তু আদিতে রামায়ণ ও মহাভারত-এর বিশেষ অংশকে অবলম্বন করেই কত্থক নৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। কত্থক নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই নৃত্যের শিল্পীর উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি এবং চোখ ও মুখের ভাবপ্রকাশের দ্বারা একটি বিষয়কে নৃত্যে রূপায়িত করতে হয়। অন্যান্য নৃত্যের মত কত্থক নৃত্যও যথেষ্ট অনুশীলন ও পরিশ্রম দ্বারা আয়ত্ত সাপেক্ষ। ভারতীয় অন্যান্য নৃত্যের মধ্যে কত্থক নৃত্যে পায়ের কাজ অর্থাৎ তবলার বোলের সঙ্গে পায়ে বাঁধা ঘুমুর গুচ্ছের কাজ সব থেকে বেশী।

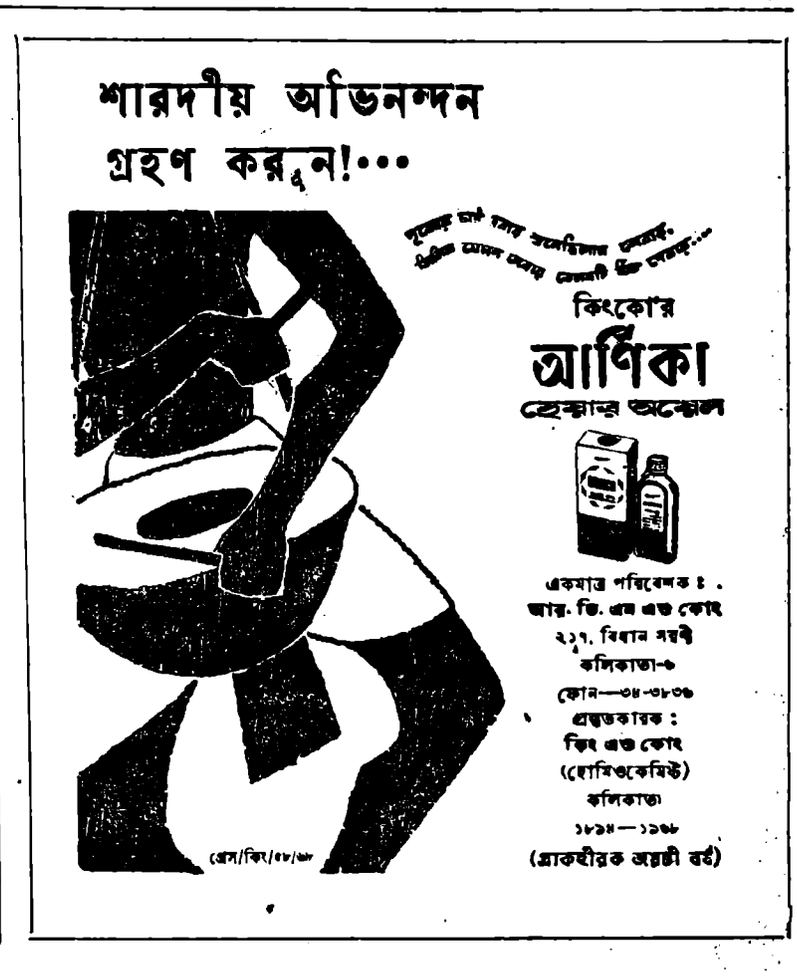

রামশংকরবাবু যখন বিশ বছর আগে সস্তায় এই জমিটুকু কিনেছিলেন, তখন জানতেনও না—একদিন এইটেই এমন বড়-লোকদের পাড়া হয়ে দাঁড়াবে। জানলে ভুলেও এমন কাজ করতেন না।

পেনসন নিয়ে যখন কষ্টে-সৃষ্টি ছোট্ট একটু একতলা এখানে গড়ে তুললেন, তখন তাঁর দুধারে দুই জাহাজের মতো বাড়ী। দুজন বাঘা উকিলের। প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জি—এ্যাডভোকেট। ভবানন্দ মুখার্জি—এ্যাডভোকেট। দুজনের বাড়ীতেই মক্কেলের ভীড়, বড় বড় মোটরের আনা-গোনা, গাঁক-গাঁক করে বিলিতি কুকুরের ডাক।

বিপত্নীক রামশংকর তাঁর বিধবা বোন আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাসা বাঁধলেন এখানে। মেয়েটি তাঁর বেশী বয়সের সন্তান— বছর কুড়ি হলো। সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছে। বেশ ভালো কীর্তন গায়। আর রামশংকর কীর্তন ভালোবাসেন, তাঁর বিধবা বোন আবার কোন গোঁসাইজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, তার তো কীর্তন শুনলেই চোখ দিয়ে জল আসে।

দিন পনেরো নির্বিবাদে কাটলো। তার-পর এক ভোরে রামশংকর যখন বেড়াবার জন্য পার্কের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তখন চুরুট মুখে, ওভারকোট গায়ে এক ভদ্র-লোক তাঁর পথ আটকালো।

ঃ আপনি রামশংকর ব্যানার্জি?

ঃ আজ্ঞে।

ঃ পি-টু সিকসটিন আপনার বাড়ীর নম্বর?

ঃ আজ্ঞে!

গাল থেকে চুরুট বের করে ভদ্রলোক বললেন ঃ আই-সী! তা একটা কথা বলতে পারি আপনাকে?

কথার ভংগিতে রামশংকর নার্ভাস হচ্ছিলেন। বললেনঃ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, বলুন।

ঃ আমি প্রতাপ চ্যাটার্জি, আপনার ডানদিকের বাড়ীতে থাকি। আপনার বাড়ীতে সন্ধ্যের পর কে কীর্তন গায় বলুন তো?

ঃ আমার মেয়ে।

ঃ তা ভালো! প্রতাপ চাটার্জি বাঁকা চোখে তাকালেনঃ কীর্তন বোধহয় ভালোই। কিন্তু আজ এ নেবার, এটা আপনার জানা উচিত যে যখন একজন বিজি ল-ইয়ার ব্রীফ নিয়ে বসে, তখন কানের কাছে ও-সব মড়া-কান্না শোনানো খুব অন্যায়। একটু অপমান বোধ করলেন রামশংকর।

ঃ আমার বাড়ীতে আমার মেয়ে কীর্তন গাইবে, তাতে অন্যায়টা কোথায় মশাই?

ঃ কী ন্যায় কী অন্যায়—সে ল-ইয়ার হিসাবে আমি ভালোই জানি। কীর্তন যদি বন্ধ না করেন, আমি লীগ্যাল স্টেপ নেব। এই বলে জুতো মচমচিয়ে, চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। রাম-শংকর বললেনঃ যাঃ, বাবাঃ!

(২)

তবু বাড়ীতে কীর্তন বন্ধ করে দিলেন তিনি। বোন গজ-গজ করতে লাগলেন; মেয়ে অপমানে মাথা নিচু করে রইলো।

বোন বললেঃ কেন গান গাইবে না? আমরা চোর নাকি?

রামশংকর বললেন, যাক না কটা দিন। ওরা বড়লোক—কী হবে ওদের চটিয়ে?

দিন কয়েক বাদে, ভোরে পার্কে বেড়াচ্ছেন, আর একজন সামনে দাঁড়ালেন। এ'র গায়ে সাদা শাল, মাথায় সার্জের ক্যাপ, হাতে ওয়াকিং স্টিক।

ঃ নমস্কার, আপনি তো রামশংকর ব্যানার্জি?

ঃ নমস্কার! আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ আপনার বাঁদিকের বাড়ী আমার। আমি ভবানন্দ মুখার্জি। রামশংকর চোখ কুঁচকে তাকালেন। ইনি আবার কী বলতে চান?

ঃ আগে আপনার বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেশ কেত্তন শুনতে পেতুম।

সর্বনাশ! এ'রও সেই রোগ নাকি? লাল কাপড় দেখলে ষাঁড় ক্ষেপে যায়—রামশংকর জানতেন। কিন্তু কীর্তন শুনলে যে উকিল ক্ষেপে ওঠেন তা তো স্বপ্নেও জানা ছিল না!

রামশংকর তাড়াতাড়ি বললেন, আজ্ঞে আমার মেয়ে গাইত। তাকে আমি গাইতে বারণ করে দিয়েছি।

ঃ সে-কি? কেন বারণ করলেন—? কীর্তনের মত জিনিষ আছে মশাই? আধুনিক-ফাধুনিক— রাবিশ-রাবিশ। ভদ্র-লোক বলে চললেনঃ বড় ভালো গায় মশাই আপনার মেয়ে। কাজ করতে করতে শুনি, মন একেবারে ভরে ওঠে। ভারি শান্তি পাচ্ছিলুম। গান বন্ধ করলেন কেন?

ঃ আজ্ঞে মিস্টার চ্যাটার্জির অসুবিধা হচ্ছিল।

ঃ চ্যাটার্জির অসুবিধা হয়?—দপ করে ভবানন্দের চোখ জ্বলে উঠলো ঃ ইঃ—একেবারে বিলাত থেকে সাহেব এসেছেন! হোক অসুবিধা। আপনার মেয়ে নিজের বাড়ীতে বসে গান গাইবে, কার কী বলবার আছে তাতে? কে না কে কী বললো আর তাতেই গান বন্ধ করে দিলেন আপনি?

ঃ আজ্ঞে উনি বললেন, লিগ্যাল স্টেপ নেবেন।

ঃ বটে! —হিংস্রভাবে ভবানন্দ বললেনঃ আইন আমিও জানি। এরপর ও যদি কিছু বলে আপনি আমাকে জানাবেন। গান থামাবেন না মশাই কিছুতেই। কীর্তন বড় ভালো জিনিষ।

(৩)

একেই বলে বিটুইন সিলা অ্যান্ড ক্যারিবডিস্।

গান চললো। প্রতাপ চাটুজ্জে কেস করলেন না—কিন্তু প্রতিশোধটা এলো অন্যদিক থেকে।

মেয়ের বিয়ে প্রায় ঠিকই করে ফেলে-ছিলেন রামশংকর। ছেলেটি ব্যাংকের চাকুরে, দেনা-পাওনার কথা পাকা—হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! একটা চিঠি পেলেন রামশংকর ছেলের বাপের কাছ থেকে।

"মহাশয়! আপনার প্রতিবেশী অ্যাড-ভোকেট প্রতাপ চাটুজ্জে সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই হন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, আপনার কন্যা নাকি দিন-রাত বিকট গলায় কীর্তন গাহিয়া থাকে। আমাদের গৃহস্থের সংসার—অত কীর্তন চলিবে না। আমার ছেলের আমি অন্য পাত্রীর সন্ধান করিতেছি,—আপনিও আপনার কন্যার জন্য অন্য পাত্র দেখুন।"

ভবানন্দ তখন কোর্টে যাওয়ার জন্য গাড়ীতে উঠছেন। হাউ-মাউ করে হাজির হলেন রামশঙ্কর।

ঃ দেখলেন স্যার, আপনার কথায় কী সর্বনাশ হলো আমার?

গাড়ীর দরজা বন্ধ করে নেমে দাঁড়ালেন ভবানন্দ।

ঃ কী হলো মশাই আবার?

ঃ সেই কীর্তন গাইতে বললেন না আপনি আমার মেয়েকে? এখন দেখুন, কী করেছেন প্রতাপবাবু।

চিঠিটা হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে কটমট করে তাকালেন ভবানন্দ বাবুঃ বটে!

ঃ এখন কী করবো বলুন তো।

ঃ কী আবার করবেন? —সিংহনাদে ভবানন্দবাবু বললেনঃ মেয়ের বিয়ে দেবেন। এই মাসেই বিয়ে হবে। আপনি পাঁজি দেখে বিয়ের দিন স্থির করুন। আমি কোর্ট থেকে আসি, তারপর কথা হবে।

ঃ দিন ঠিক করবো! —রামশঙ্কর খাবি খেলেন ঃ পাত্রের কোনো খোঁজ নেই—দিন স্থির করে কী হবে? পাত্র কোথা পাব?

ঃ আমার ছেলে মশাই—আমার ছেলে। ফার্স্টক্লাস এনজিনিয়ার, রাউরকেল্লায় আছে। বুঝে?

ঃ আজ্ঞে—আজ্ঞে! —তিনটে খাবি খেলেন রামশঙ্কর।

ঃ যদি চলে, তবে দিন ঠিক করুন। এক পয়সা লাগবে না। আমার ছেলে খুব ভালো মশাই—যেমন সুপুরুষ, তেমনি সচ্চরিত্র। নিজের বলে বলছি না। দেখলেই বুঝবেন। যদি আপত্তি না থাকে তবে দিন ঠিক করুন। আমার একটা জরুরী কেস আছে—আমি চল্লাম।

ভোঁ করে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

(৪)

বিয়ে হয়ে গেল। আর বৌভাতে সব থেকে জমলো বৌমার কীর্তন। খুব তারিফ করলেন প্রতাপবাবু। বললেন, খাসা গ্যান। ইণ্ডিয়ান সং। একেবারে ভারতের প্রাণের জিনিষ!

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন রামশঙ্কর।

সাদাসিদে মানুষ—সব খবর জানতেন না। জানতেন না, কিছুদিন আগেও দুজনে এক কেসে এ ওর বিরুদ্ধে ছিলেন। এখন একটা বিরাট মামলায় প্রতাপ চাটুজ্জে আর ভবানন্দ মুখুজ্জে এক পক্ষেই লড়ছেন। লাখ লাখ টাকার মামলা!

টাকা প্রতি

১০ পয়সা

বিশেষ

পূজা রিবেট

॥ সুতী তাঁতবস্ত্রের উপর ॥

• ২৯শে সেপ্টেম্বর '৬৮ পর্যন্ত আমাদের এম্পোরিয়াম শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন সমেত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

হ্যাণ্ডলুম শাড়ি

তা ছাড়া নতুন বাহারের নানা ডিজাইনের

সার্ট ও সুটের কাপড় • টাই • ধুতি • লুঙ্গি • স্টোল

বিছানার চাদর • পর্দার কাপড় • তোয়ালে • কম্বল ইত্যাদি

॥ ভারতের সকল প্রদেশের তাঁত বস্ত্রসম্ভার ॥

শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা

PRO/HH – 35

হাঁসুলী

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবিন্দপদ কুণ্ডু লেনের বস্তি থেকে এল ওরা বাগমারির এই ফ্লাটে। ফ্লাট মানে একখানা ঘর, ছোট একটু-খানি করিডর, বাথ, রান্নাঘর, শ্রমিকদের জন্যে। ভাড়া খুব কম।

তবু যা হোক, কোঠাবাড়ি, ইলেকট্রিক বাতি! বৌটা খুশীতে হেসে কুটোকুটি।

বর বৌ আর পাঁচ-ছ বছরের একটা মেয়ে। বৌটা বেশ গোলগাল। সুখী-সুখী চেহারা। চোখদুটো বড় বড়, দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ। ছুঁচোল। লোকটা রোগা, চোয়াড়ে গাল, দেখলেই মনে হয়, আজন্ম হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। লোকটারও চোখদুটো একটু বড় বড়। সামান্য লালচে।

বিজয়া আমায় বললো,—নেশাভাঙ করে নাকি কে জানে! দেখলে মনে হয়, নেশা করে।

বললুম,—তা করুক, তাতে তোর কি?

—না, মানে নেশাখোর মানুষ দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে।

বিজয়া বরাবরই ভীষণ ভীতু। খুব ভালোমানুষ ধরনের মেয়ে। প্রবীরও ভালো-মানুষ। ওদের দুজনের মিল খুব। দেখে আনন্দ হয়।

বোনকে সুখী দেখলে কার না আনন্দ হয়! মাস কয়েক হোল এখানে আছি। একটা বাসার খোঁজে আছি। বাসা পেলে বর্ধমান থেকে ওদের নিয়ে আসব।

আমার অপিসের ডিউটিটা অন্যরকম। বেরোই সকালে। বেলা বারোটায় ফিরি, আবার সাড়ে তিনটে চারটেয় বেরোই, ফিরি রাত নটায়। প্রবীর নটায় বেরোয় ছটায় ফেরে। তারপর আর কোথাও বেরোয় না।

বিজয়া ইদানীং লোটনকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। পাশের ফ্ল্যাটে যে বৌটি নতুন ওর নাম লোটন। বরের নাম মিহির, মেয়েটার নাম চিংড়ি।

সেদিন পৌনে তিনটে নাগাদ বিজয়া আমার বিছানার কাছে এসে হাজির:—দাদা, ও দাদা:

খেয়ে দেয়ে একটু শুয়ে বিশ্রাম করা আমার অভ্যেস। চোখ রগড়ে উঠে পড়ি।

—কি হোল রে?

—ছি, ছি, রাম, রাম, কি দেখলুম গো!

—কি দেখলি?

বিজয়ার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ভেতরে একটা উত্তেজনা চাপছে মনে হোল।

—সে তোমায় আমি বলতে পারব না। ছি, ছি, কি ঘেন্না!

বিরক্ত হয়ে বললাম,—বলতে পারবি না তো, ডাকলি কেন? কি হয়েছে বল।

—ওই যে গো পাশের ঘরের লোটন বৌদি—।

হাঁফ ছাড়ল বিজয়া,—আমি তো কিছু জানি না। হঠাৎ ওদের ঘরে ঢুকে পড়েছি। ভাবলুম যাই ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। গিয়ে যা দেখলুম—।

—কি দেখলি?

—ওরা আগে যে বস্তিতে থাকত, সেখানকার একটা ছেলে মাঝে মাঝে ওদের ঘরে আসে। ছেলেটার বয়েস খুব অল্প, আঠারো উনিশ হবে। তখন তো আর এত জানতুম না। আজ হঠাৎ গিয়ে পড়ি দেখি ছেলেটা এসেছে।

—তা কি হয়েছে!

—সে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ছেলেটা লোটনকে জড়িয়ে ধরে—মাগো, কি ঘেন্না!

ব্যাপারটা আন্দাজ করা গেল।

গম্ভীর হয়ে একটু সময় বসে থেকে বললুম,—তোকে একটা কথা বলি বিজয়া।

বিজয়া লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

বললুম,—ওদের ঘরে আর কখনো যেও না তুমি। আর এ সব কথা নিয়ে প্রবীরের সঙ্গে কোন আলোচনা কোর না। তার ফল ভাল হবে না।

বিজয়া বললে,—শুধু তাই নয়। আমি চমকে বেরিয়ে আসতেই লোটন এসে পেছন থেকে আমার হাত চেপে ধরল। ওর হাতে বেশ জোর আছে। আমার কব্জি এখনো ব্যথা করছে। আমাকে শাসালো।

—কি শাসালো?

—বললে, এ কথা যদি কেউ জানে, তবে বুঝব তুমি বলেছ, তার ফল ভাল হবে না। আমার কাউকে বলবার কি দরকার বলো? তবে হ্যাঁ, এও বলি, দরজাটা খিল দিয়ে যা খুশী করুক না, দরজা খুলে রেখেছিস কেন?

—যাক গে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর আলোচনা কোর না, একটু চা কর দিকি। চা খেয়ে বেরোব আমি।

বিজয়া চা করতে গেল।

স্তম্ভিত বসেছিলাম। ভাবছিলাম, এর নাম ব্যভিচার। ব্যভিচারে মানুষ কত বেপরোয়া হয়। বৌটার সাহস সাংঘাতিক। মিহির লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। নিতান্ত গোবেচারা ভাল মানুষ। বরং একটু স্লৈণ বলা যায়।

বৌটার বেশ সুখী-সুখী তেল চুকচুকে দেহখানা। ঘুম-ঘুম ফোলা ফোলা চোখ। ওই চোখের মায়া আর নরম নরম দেহটা নিয়ে কত অক্লেশে অনায়াসে ও মিহিরকে ঠকাচ্ছে। মিহির ঠকছে। হয়তো বা মিহির ঠকতেই চায়।

দিন কয়েক আগে রোববার বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমায় বলছিল মিহির, —একটা ইলেকট্রিক ইস্তিরি কি রকম দাম পড়বে দাদা।

বললুম,—ঠিক জানি না। কেন বলুন তো?

—একটা কিনতে হবে। ওর ভীষণ শখ। আমাকে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। এ মাসে মাইনে পেয়েই একটা কিনে আনব। এটা ওর বহুদিনের শখ। তা শখ আমি না মেটালে আর মেটাবে কে বলুন?

—তা তো বটেই!

কে জানে, এ মাসে মাইনে পেয়ে ইলেকট্রিক ইস্তিরি কিনে আনবে কিনা। আর আজকের ঘটনা পরে কোনদিন টের পেলে বৌকে ইস্তিরি করে দেবে কিনা।

তা বোধহয় পারবে না। জানলেও কিছু বলতে পারবে না। চোখে দেখলে কিছু করতে পারবে না। হয়তো বা নিজেই মরবে। নয়তো মরার মত চোখ নিয়ে সব কিছু দেখবে আর জ্বলবে। কিছু করবার শক্তি মিহিরের নেই। ধীরে ধীরে ওর সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছে বৌটি। ওকে একটা দুর্বল পোকামাকড়ের চেয়ে বেশী কিছু মনে করে না বৌটি।

কি ভয়ংকর অসহায় অবস্থা!

সব চেয়ে মজা এই, ওর অসহায় অবস্থার কথাটা ও নিজেও ভাল করে জানে না।

চা নিয়ে এল বিজয়া।

—ভাবতেও ভয় লাগে দাদা।

—কি ভয় লাগে রে?

—মিহিরবাবু যদি কোনদিন জানতে পারে, কি হবে?

মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, কিছুই হবে না।

তবু বিজয়ার মনে এ ভয়টা থাকা প্রয়োজন। তাই ওকে আরও একটু বেশী ভয় দেখাবার জন্যে বললাম,—কি আর হবে, একটা খুনোখুনী হয়ে যাবে হয়তো। সেই জন্যেই এ সব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়াই ভাল। ও ঘরে আর যেও না।

বিজয়া একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—খেপেছ, আর আমি যাই!

আর কোন কথা বললাম না। চা খেয়ে কাজে বেরোলাম।

ঘটনাটা কিন্তু এতই আকর্ষণীয় যে ভুলতে পারছিলাম না। কদিন ধরেই মিহিরের বৌয়ের কথাটা মনে ঘোরা-ফেরা করছিল। সংসারে কাউকে বিশ্বাস নেই। মিহিরের কাজে চলে যাবার ফাঁকে বৌটা দিব্যি ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। মিহির হয়তো কোনদিন জানতেও পারবে না। শুধু মিহির কেন, এমন অনেকেই হয়তো জানতে পারে না। সংসারে এমন অনেক মিহির আছে, যারা শুধু টাকা রোজগার করে যায়, বৌকে সুখী করবার জন্যে আর সেই টাকা বৌ হয়তো খরচ করে তার কোন গোপন প্রেমিকার জন্যে। দুধ, মাখন খেয়ে, পাউডার, স্নো মেখে গোপন প্রেমিকাকে সুখী করে। স্বামী বেচারা কোনদিন এ সংবাদ জানতে পারে না।

কেন এমন হয়? এ কি প্রেম?

না, এর নাম প্রেম নয়, কোন কোন মেয়েমানুষ একটি পুরুষ নিয়ে সুখী হতে পারে না, আবার কোন কোন পুরুষও একটি মেয়ে নিয়ে সুখী হতে পারে না। তারা সুখ খোঁজে, সুখের জন্যে সব করতে পারে। সংসারে সবাই নিজের সুখ চায়, তাতে কে ঠকল আর কার কি হোল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

সেদিন বিজয়া বলল,—জানো দাদা, লোটনবৌদি একটা ইলেকট্রিক ইস্তিরি কিনেছে, দেখাতে এসেছিল। বেশ বড় ঝকঝকে সুন্দর ইস্তিরিটা।

হেসে বললুম,—তোর কি একটা ইস্তিরি দরকার।

—আমার কি হবে, আমি বাড়িতে অত কাচাকাচি করতে পারি না। দেখছ তো সব ধোপার বাড়ি যায়। বলেই হাসতে লাগল বিজয়া, বলল,—কে জানে, ওই ইস্তিরি দিয়ে সেই ছেলেটার প্যান্ট-জামা ইস্তিরি করে দেয় কিনা! ছেলেটাকে তো রোজ বিকেলে জলখাবার খাওয়ায়। দুটো করে ডিম, কলা, পাউরুটি।

গম্ভীর হয়ে বলি,—ও সব কথা থাক।

ঠিকই ভেবেছিলাম তাহলে। মিহিরের রক্ত জল-করা পয়সায় ছেলেটা ডিম কলা খেয়ে গায়ের জোর বাড়াচ্ছে। মিহির বেচারা সন্ধ্যে বেলা ফিরে রুটি আর আলুছেঁচকি খায়। বিজয়া ছেলেমানুষ, তাই অবাক হচ্ছে। আমি অবাক হইনি। শুধু তাই নয়, আমার নিশ্চিত ধারণা ছেলেটা বৌটার কাছ থেকে টাকাও নেয়।

দিন পনেরো পরে বিজয়া একদিন বললে আমায়,—দাদা, ওদের ঘরে মাঝে মাঝে আমাকে যেতে হবে।

—কেন রে?

সংস্থান। ফটো ঃ অরুণ সেনগুপ্ত

—চিংড়ি মেয়েটার খুব অসুখ। এমনিতেই তো মেয়েটা ভীষণ রোগা। তার ওপর যা অসুখ বাঁচলে হয়। মেয়েটা আবার আমাকে খুব ভালবাসে কিনা, এক-আধবার মেয়েটাকে দেখতে যাওয়া উচিত।

বলি,—বেশ যেও, কিন্তু বেশীক্ষণ থেকো না।

দিন সাতেক পরে বিজয়া জানাল,—মেয়েটার অবস্থা খারাপ। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম, সেই ছেলেটা কিন্তু আর আসে না। ছেলেটাকে দেখবার জন্যে চিংড়ি খুব অস্থির। কিন্তু ছেলেটা নাকি একদিনও চিংড়িকে দেখতে আসেনি।

তা আর আসবে কেন? বিজয়া বোকা, বিজয়ার বোঝা উচিত ছিল, ছেলেটা আসে ফুর্তি করতে, বিপদে আপদে সেবা করতে সাহায্য করতে নয়। তাছাড়া ফুর্তির সময় এটা নয়, বুঝেই সে আসা বন্ধ করেছে।

বিজয়া আক্ষেপ করল,—এমন বিপদে একবার অন্ততঃ দেখতে আসা উচিত ছিল।

কোন কথা বললাম না।

—তোদের ভালবাসার মুখে আগুন!—বলে গায়ের ঝাল মেটাল বিজয়া।

দিন তিনেকের ভেতরে মেয়েটা মারা গেল।

আহা, একটা মাত্র মেয়ে! সবাই দুঃখিত হোল। আমাদের শ্মশানেও যেতে হোল। মিহিরকে সান্ত্বনা দিতে হোল। বিজয়া একটু কাঁদল। মেয়েটা বড় ভাল ছিল গো। আমায় বড় ভালবাসত।

মৃত্যু যত করুণই হোক,—শোকের বেদনার জেরটা খুব বেশীদিন থাকে না। সময়ে মানুষ ধীরে ধীরে শূন্য স্থানটা পূর্ণ করে নেয়। কাজে কথায় শোক সামলে নেয়।

এরা হয়তো অত সহজে সামলাতে পারবে না। একটা মাত্র মেয়ে। দুটো-তিনটে হলে এতটা লাগত না। মিহির এখন একটু রাত করে বাড়ি ফেরে। সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে তার নাকি ভাল লাগে না। ভাল না লাগারই কথা। বৌটা ঘর থেকে প্রায় বেরোয় না বললেই হয়। ঘরে বসে কাঁদে, না কি করে কে জানে! বিজয়া মাঝে মাঝে যায়।

সময় কাটে।

পনেরো দিন কি কুড়ি দিন পরে ঠিক মনে নেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

বেলা আড়াইটে নাগাদ বিজয়া এসে ডাকল,—দাদা, শিগ্গির ওঠ, ও দাদা, দাদা!

খেয়ে দেয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম, উঠে বসলাম।

বিজয়া পাশের ঘরের দিকে আঙুল তুলে বললে,—ওই শোন।

শুনলাম, একটা আর্ত চিৎকার, ওরে বাবারে, গেছিরে! মরে গেলুম।

চৌকি থেকে নেমে বারান্দায় বেরিয়ে ভাল করে কান পাততে বুঝলাম, মিহিরদের ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে। একটা পুরুষ মানুষের চাপা আর্ত আওয়াজ।

ছুটে দোরে ধাক্কা দিতেই দোরটা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম, কোনদিন ভুলব না।

দেখলাম, একটা কালো কুচকুচে তাগড়া ছেলে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে রয়েছে আর বৌটা ইলেকট্রিক ইস্তিরিটা হাতে নিয়ে তার তলপেটের নীচে চেপে ধরছে।

ইস্তিরির প্লাগটা লাগান রয়েছে।

বৌটা বীভৎস গলায় ফিস ফিস করছে,—তুই বাপ হয়ে একবার দেখতে এলি না—তোর ছেলেপুলে যাতে আর না হয়, তেমনি করে দোব।

ইস্তিরিটা এত জোরে চেপে ধরেছে যে ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না।

এগিয়ে গিয়ে বৌটার হাত থেকে জোর করে ইস্তিরিটা কেড়ে নিয়ে মেজেয় ফেলে দিলাম।

তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটার তলপেটের নীচে পুড়ে ছালচামড়া উঠে গেছে।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে কোমরে কাপড় জড়িয়ে জামাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে পালাল।

এমন বীভৎস ভয়ঙ্কর কান্ড আমি কখনো কল্পনা করতেও পারিনি।

বৌটা এবার উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বেরিয়ে এসে দোরটা ভেজিয়ে দিলাম।

না, বৌটা আবার কিছু করে না বসে, আবার দরজা খুলে ইস্তিরির প্লাগ তুলে ইস্তিরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘামছিলাম।

বিজয়াকে বললাম,—এক গেলাস জল দে বিজয়া।

জল দিয়ে, বিজয়া পাশের ঘরে চলে গেল।

চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম।

ব্যাপারটা বুঝতে বেশী দেরী হোল না। ওই ছেলেটাই যে চিংড়ির আসল বাবা এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ছেলেটার বয়েস আঠারো-উনিশ নয় তা হলে, ছাব্বিশ সাতাশ নিশ্চয় হবে।

এতদিন ধরে যা করেছে বৌটা সন্তানের জন্যেই করেছে, আর একটু আগে যেভাবে উন্মত্ত হিংস্র হয়ে উঠেছিল, তাও সন্তানের জন্যেই।

সন্তানের জন্যে কি মেয়েমানুষ সব করতে পারে?

বোধহয় পারে।

নর ও বানর

মনোজ বসু

হিংসায় জ্বলে-পুড়ে আমরা বানরের নামে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করি। আসলে বানর অনেক ভাল নরের চেয়ে। বুদ্ধি-বিবেচনা অনেক বেশি।

রজতের ডিউটি। অফিস পালিয়েছে রজত। এবং সোনালি সুদূর বরানগর থেকে এসেছে। বেলা এগারোটা। গার্ডেনরীচে গঙ্গার ধারে দু'জনা। ওপার যাবে—বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

রূপসী মেয়ে সোনালি। বয়স মেয়েরা বলে না—প্রশ্ন নিরর্থক, বেয়াদপিও বটে। বাইশ-চব্বিশ হবে—আবার কি! ছিল এয়ার-হোস্টেস, আকাশে আকাশে উড়ত। রজত চিরকেলে হাবাগবা ভালমানুষ। মূকং করোতি বাচালং—ঈশ্বর নাকি বাচাল বানান। প্রেমও বানায়, রজতকে দেখে বলছি।

স্লেন থেকে দমদমে নেমে রজত বলেছিল, তোমায় নিয়ে স্লেনে চলাচল বিপজ্জনক। ঘন ঘন ককপিটে গিয়ে ঢোক, ভয়ে গা কাঁপছিল আমার—

মিষ্টি হেসে সোনালি বলল, কেন—কেন?

পাইলটের হয়তো বা মাথা ঘুরে গেল। ঐ মুখ দেখে মাথা ঘুরবে না, নিরেট মাথা এমনধারা কার? মাথা ঘুরে গিয়ে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসল। স্লেন-ক্রাশ—ভূঁয়ে পড়ে সবশুদ্ধ চুরমার। আমি তো গেলামই, তুমি নিজেও কিন্তু বাদ যেতে না।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সোনালি। হাসলে মানিক ঝরে, সে বড় মিথ্যা নয়। ঝরে পড়েছে মানিক নিশ্চিত, গড়িয়ে হয়তো সোফার নিচে গেছে। ভাগ্যবান ঝাড়ুদারে পেয়ে যাবে। রজতের ফুরসত নেই। সোনালির মুখোমুখি বসে, কোন পাষণ্ডের বলুন, ভিন্ন কাজের ফুরসত থাকে। আশ্চর্য একখানা মুখ, অপরূপ চোখদুটো। অদৃশ্য রজ্জুর মতো টেনে ধরে—সাধ্য কি এদিক-সেদিক তাকাবেন এবং ফাঁকমতো পাকসাট মেরে বেরুবেন।

রজত বলল, ভূঁয়ে থাকবে তুমি, ভূঁয়ের উপর ঝিলিক হেনে বেড়াবে। আকাশের চাকরি ছেড়ে দাও।

চাকরি ছেড়ে খাবো কি? ঘরও তো নেই। এয়ারওয়েজ কোম্পানি হোটেলে কয়েকটা ঘর নিয়ে রেখেছে, একঘণ্টা দু-ঘণ্টা কিম্বা একটা বেলা থাকতে পারি বড়জোর।

প্রগলভকণ্ঠে সোনালি বলে, ঘর নেবে তুমি? তাহলে না হয় ভেবে দেখব।

রজত বলে, এতবড় ভাগ্য হবে, ভাবতেই পারিনে সোনা—

অর্থাৎ গদগদ অবস্থা। স্লেনের চাকরি ছেড়ে দিল সোনালি। রজতের অফিসে চেষ্টা হচ্ছে, ধরাধরি চলছে খুব, সোনালি নিজেও ক'দিন দেখা দিয়ে এসেছে। হয়ে যাবে মনে হয়। রজতের কিন্তু ঘোর আপত্তি : না, চাকরি করতে হবে না আর তোমায়। আমার একার খাটনিতেই যা-হোক করে কুলিয়ে যাবে। ভোগবিলাসে সুখ নেই, ভালবাসাই আসল।

আজকের প্রস্তাব, গঙ্গার ঘাটে সোনালি অপেক্ষা করবে। রজত এলে পারাপারের ব্যবস্থা। প্রেমচর্চার পক্ষে বোটানিক্যাল গার্ডেনের জুড়ি নেই—অনেক দেখে এবং বিস্তর শুনে রজতের এই পাকা সিদ্ধান্ত।

সোনালি বলল, অ্যাটাচিকেস নিয়ে বেরিয়েছ যে?

পাশপোর্ট আমার। এই দেখিয়ে অফিস পালালাম। এস্টিমেট নিয়ে গজাননরাম চুপচাপ আছে—অর্ডার কেন আসছে না খোঁজ নিয়ে দেখি, আমড়াগাছি করে আসি গজাননকে। এইসব ধাপ্পা দিয়েই তো বেরিয়ে পড়লাম।

যত তাড়াতাড়ি এখন এপার ছাড়া যায়। অফিসের কেউ দেখে ফেলতে পারে। নৌকোয় পার হবে। কতক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করল, মিলছে না। কলকাতার স্ট্যান্ডগুলোয় ট্যাক্সি দুর্লভ, ঘাটে নৌকোও ঠিক তেমনি। মনের বিরক্তিতে অনিবার্যভাবে তখনই বানর-নরের তুলনা এসে গেল—বানরের বিবেচনা নাকি অনেক বেশি নরের চেয়ে।

সোনালির মৃদু ভর্ৎসনা : না-ই হলাম পার। এ-পারে পার্ক-ময়দান নেই বুঝি?

আছে বই কি! দক্ষিণ প্রান্তে ঢাকুরিয়া লেক। অতিশয় বনেদি জায়গা, সন্দেহ কি! দিদিমা-ঠাকুরমারা যৌবনে ঐখানে প্রেম করতেন। এবং আজকের নাতনির দল তাঁদেরই চরণাচিহ্নিত স্থানে বিচরণ করে বেড়ায়। উত্তর প্রান্তেও আছে—একটা ধরনে দক্ষিণেশ্বর। বাগানটা হালফিল নেহাৎ মন্দ জমেনি—বিশ-পঁচিশ জোড়া যখন তখন ঘুরছে, দেখতে পাবেন। তবে ঐ ঘোরাঘুরিই সার—ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হবে, কিন্তু কেমন আছ—ভাল আছি'-র অধিক কিছু হবার উপায় নাই। অহোরাত্রি লাইপজিগের বিশ্বমেলা জমে থাকে, রসালাপ তার মধ্যে কী করে সম্ভব হয় বলুন।

উত্তরে দক্ষিণে বিস্তর ঢুঁড়ে নিকুঞ্জ হয়তো জুটিয়ে ফেলল একটা। লতাগুল্মে ঢাকা চারিদিক সবুজ রঙের বেঞ্চি রয়েছে মাঝখানে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে থোপা থোপা পাটল ফুল। কাছাকাছি জলাশয় (দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা হোক, অথবা ঢাকুরিয়ার লেক), সুশীতল বাতাস বইছে সে বাবদে। পাখিও গান ধরেছে (টাঁ-টাঁ আওয়াজ—হাঁড়িচাঁচা সম্ভবত। হোক গে। কুহু-ডাকা কোকিল এবং পিউ-পিউ-ডাকা পাপিয়া খাঁচায় ভরে কে দু-পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!) মুখের একেবারে কাছে মুখ এনে গলা খাঁকারি দিয়েছে সবে রজত, বাছা বাছা কয়েকটি জবান ছাড়বে। অন্তরাল হতে মুখ বাড়ালেন অমনি বিরাশি বছুরে বৃদ্ধ নৃসিংহ পাকড়াশী (লেকে বিচরণশীল সবাই পাকড়াশীমশায়কে জানে)। অথবা কামারের হাপরের মতন শ্বাস টানতে টানতে বেঞ্চির প্রান্তে কামাখ্যা ভঞ্জ ধপ করে বসে পড়লেন (কামাখ্যানারায়ণ বারোমেসে হাঁপানি রোগী এবং ভক্ত মানুষ, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী-কালী সকাশে নিয়ত গাতাবাঁধা)।

চোখে পলকমাত্র নেই, অক্ষিগোলক উল্লাসের তোড়ে বাইরে ছিটকে পড়বার গতিক (যে-লোক সোনালির সামনাসামনি হবে, তারই এই দুর্দশা—দু-চক্ষু টেনে ধরে রূপে)। অতঃপর সম্বিত হল, বৃদ্ধ বয়সে ভবপারে যাবার মুখে ড্যাবড্যাব করে রমণী দেখা সাতিশয় দৃষ্টিকটু। চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, ঘড়ি আছে নাকি? কটা বাজল?

বারোটা—

বেজার মুখে রজত জবাব দিল। ঘড়িতে দুটো-তিনটে যা-ই বাজুক, তাদের উভয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন বৃদ্ধ। হুবহু এই জিনিস না হলেও ব্যাঘাত কোন একটা ঘটবেই। মানুষ যেন মুকিয়ে থাকে। বিস্তর দেখেশুনে তিতবিরক্ত হয়েই না রজত কলকাতার ভরসা ছেড়েছে। প্রেম পিঠটান দিয়েছে শহরের চতুঃসীমা থেকে। গঙ্গাপারে তাই ছুটোছুটি।

প্রেমচর্চা বাবদে সকলের সেরা শিবপুরের সরকারী বাগান। নেই কি সেখানে? দূর্বাঘাস, উলুঘাস, পুষ্পবন বেণুবন, বনস্পতির ছায়—নির্ভাবনায় যত্রতত্র এলিয়ে দিনগে দেহযুগল। এলাহি জায়গাজমি—কেবা কার খোঁজ রাখে! (রসিক পাঠক যদি জোড়ে বন্ধ হয়ে থাকেন, ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়—গিয়ে পরখ করে আসুন না।) জলে পা ডুবিয়ে বসবেন তো সরাসরি চলে যান নদী-কিনারে—কিঞ্চিৎ হুঁশ রাখবেন, বেসামাল হয়ে গঙ্গাগর্ভে গড়িয়ে না পড়েন। আর জেটির উপরে বসলেন তো আপনাদেরই পদতলে মা-গঙ্গা। বুঝুন। বসে বসে জলশোভা সন্দর্শন করুনগে এবার। ছলছল ঢেউয়ের উপর দাঁড় টেনে হেলেদুলে নৌকো চলেছে, দেখুন দৃষ্টিভরে। স্টীমারের ধোঁয়া দেখুন, বাঁশি শুনুন। মাল-বোঝাই গাধাবোট চলেছে স্টীমারের পিছন ধরে—

মার্কেটিং-এর সময় অবিকল এই জিনিস—রজত গাধাবোটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিউ মার্কেটের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো সোনালি চষে বেড়ায় যেন। এক-একটা দোকানে গিয়ে ঢুকছে—পিছনে হতভাগা শ্রীমান চরণ রজত। সোনালির কাজ জিনিস পছন্দ ও দরদাম করা—রজত ততক্ষণ নিষ্কর্মা। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চলন্ত পাখা দেখছে, অথবা দেয়ালের ক্যালেন্ডারে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ছবি থেকে কয় গুণে অদ্যকার তিথি বের করছে। সচকিত ও উৎকর্ণ সহসা—সোনালির পছন্দ ও দরদাম সারা, রজতের কাজ এইবারে। মনিব্যাগ খুলে দাম চুকিয়ে দেওয়া এবং জিনিসগুলো আগের কেনাকাটার সঙ্গে একত্র বেঁধে ঘাড়ে তুলে নেওয়া। এ-দোকানে হয়ে গেল তো সোনালি চলল গটমট করে পরবর্তী দোকানের দিকে। মালের বোঝা ঘাড়ে করে গাধাবোটরূপী রজতও পিছন ধরে চলেছে। গঙ্গায় ভেসে-যাওয়া গাধাবোটদের কতখানি সুখ, মর্মে মর্মে অস্থিতে অস্থিতে রজত জানে।

যা-ই হোক, ওপার পৌঁছুতে পারলে তবেই না নিশ্চিন্তে গঙ্গা দেখা অথবা ঘাসে শোওয়া! সেই পারে যাবার কী উপায়? ভিড়ের খেয়া-নৌকোয় নয়, স্টিমার-মোটর-লঞ্চে তো নয়ই, আলাদা ডিঙিনৌকো চাই—দু'জনে বেশ একলাটি। স্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে যাওয়া—জীবনেও যা ঘটতে যাচ্ছে। ভাসমান তখন অবশ্য গঙ্গার উপরে নয়, সংসার-স্রোতে। এবং ডিঙিনৌকোতেও নয়—ডিঙিরই মতন ছিমছাম এক কুঠুরির বাসা-বাড়িতে। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে। সস্তাগণ্ডার ফ্লাটবাড়িও ছিল—কিন্তু হরেক লোকের আনাগোনার ভিতর চাকের মৌমাছি হতে নারাজ তারা।

সোনালি বলল, ডিঙি না পাওয়া যায় ট্যাক্সি নিয়ে নাও। কী করা যাবে!

ট্যাক্সিই বা কোথা?

এদিক-ওদিক চেয়ে হতাশায় হাত ঘুরিয়ে দিল রজত।

ট্যাক্সি না মিলবার কী? এখানে না হোক, বড়-রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালে আলবৎ মিলে যাবে। ডিঙিনৌকোর মতো ট্যাক্সিতেও নিরিবিলি—গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসার কিছুমাত্র বাধা নেই। কিন্তু ভাড়া গুণতে হার্টফেল হবে। হিসাব ধরুন। গার্ডেনরীচ থেকে চললেন তো সোজা উত্তরে। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন। প্রায় যখন হরিদ্বার ধরো-ধরো—তারই যৎসামান্য আগে হাওড়ার পুল পেরিয়ে দক্ষিণ মুখো উজান ছুটলেন। কেপ-কমোরিন তাক করেছেন এবারে। অতদূর অবশ্য যেতে হল না, তৎপূর্বেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে গেলেন। মিটারের অঙ্ক তাকিয়ে দেখেই তো ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়বেন। ঈশ্বর করুন, ধকল কাটিয়ে উঠে বসতে পারেন যেন আবার।

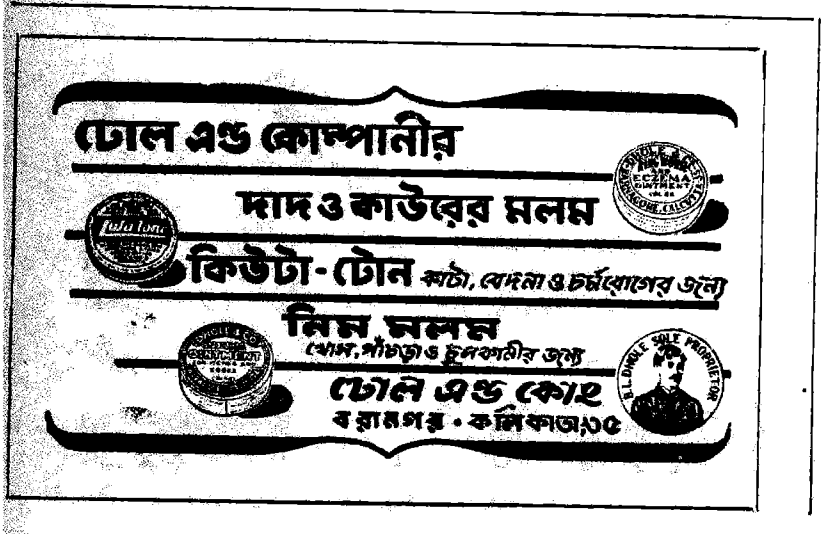

অতএব ট্যাক্সি নয়, ডিঙিও মিলছে না, বরানগর থেকে সোনালির ছুটোছুটি করে আসা এবং রজতের অফিস পালানো বিলকুল বিফলে যাওয়ার গতিক। হেন অবস্থায় মেজাজ হারিয়ে তিক্ত কণ্ঠে রজত বলল, দেখ, নরের চেয়ে বানরের ঢের ঢের বেশি বিবেচনা।

ঘনপক্ষ্ম চোখদুটিতে ঝিলিক হেনে মিষ্টি হেসে সোনালি বলে, সে কেমন?

হনুমান গন্ধমাদন এনেছিল লক্ষ্মণের চিকিচ্ছের জন্য। কাজ হয়ে গেলে আগের জায়গায় পর্বত আবার বসিয়ে দিয়ে এলো। আর ভগীরথের কাজ-কারবার দেখ। গুষ্ঠি তো বাঁচাল শিবের মাথার গঙ্গা নিয়ে এসে। কাজ অন্তে জটায় আবার গুঁজে রেখে আসবে—কিন্তু ফুর্তি-ফার্তিতে তখন আর ফেরত দেবার কথা মনে নেই। বানরে নরে এইখানে তফাৎ। গঙ্গা মর্ত্যভূমিতে পড়ে রইলেন। মাঝখানে গঙ্গা থেকেই তো আজ যত ঝামেলা।

'আসছি'—বলে কথাবার্তার মাঝে সোনালি উঠে পড়ল। গাছের আড়ালে গেল। রূপসী যুবতী মেয়ে—ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদল করে সুখ পায় (শক্ত রোগের বেলা ডাক্তারেও ঘন ঘন ওষুধ বদল করে—এই লাল মিকশ্চার, এই সবুজ মিকশ্চার, এই পাউডার, এই প্লোবিউল ইত্যাদি)। গড়ে আধঘণ্টা অন্তর ভ্যানিটিব্যাগ সহ অন্তরালে যেতে হয় এই বাবদে। এবং রূপের নব্বুই পার্সেন্ট যেহেতু মুখে, মুখমণ্ডলের তদ্বিরই সদা-সর্বদা। ওষ্ঠদুটিতে ছিল রক্তগোলাপের রং অন্তরালের রিপকর্মের পর স্বর্ণচাঁপার কলি হয়ে ফেরত এলো। ছিল মেঘের মতন পিঠ-জোড়া এলানো চুল, কয়েকটা মিনিটের ভিতর চুলের বোঝা ময়দানের মনুমেন্ট হয়ে আকাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। ভানুমতীর খেল আর কাকে বলবেন।

রজত মুগ্ধকণ্ঠে বলল, কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত তোমার মুখে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সোনা। হয়ে যাক বিয়ে—তাই করব। চাকরি করা আমারও পোষাবে না।

হেসে উঠে সোনালি বলে, তারপর?

দমে না রজত। বলল উপোস করব। সুখ ভোজনে নয়, ভালবাসায়।

আচমকা সোনালি প্রশ্ন করল, পেটমোটা কেন তোমার অ্যাটাচিকেসের?

বাদাম-ভাজা এনেছি, চকোলেট-টফিও আছে। তা মোটে বাগানেই তো যাওয়া যাচ্ছে না—

ফোঁস করে রজত নিশ্বাস ফেলে : কত রকম ইচ্ছে ছিল! ভেবেছিলাম, গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসব। গল্প চলবে, এগুলোও চলবে সঙ্গে—

গাছ, গাছ—। বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে সোনালি উঠে দাঁড়াল। ঘাড় লম্বা করে ইতি-উতি তাকাচ্ছে। বলে, উই তো গাছ একটা। বটগাছ—তলাটাও বাঁধানো দেখছি। চলো বসিগে। ঘাটে এর মধ্যে ডিঙিও এসে পড়তে পারে।

রজত সত্যি কথা বলে তবে। এ-পারে কোথাও এক কাঠা ভুঁই নেই, নিরিবিলি যেখানটায় কথা বলা চলে। মানুষ সব যেন পণ করে বসেছে, শহর কলকাতায় প্রেম হতে দেবে না। গঙ্গাকূলে বটের ছায়ায় রজত গড়িয়ে পড়ল সোনালির কোলে মাথা দিয়ে। মুখ নিচু করে গুনগুনিয়ে সোনালিও কী বলছে। সবে একটু জমে উঠেছে নরমূর্তির উদর সঙ্গে সঙ্গে। সেই নৃসিংহ পাকড়াশী কিম্বা কামাখ্যানারায়ণ ভঞ্জ জাতীয়। চেহারা বা সাজ-পোশাকে নয়, বয়সের দিক দিয়ে। আশির ধাক্কা—তার নিচে কদাপি নয়।

তড়াক করে উঠে বসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রজত বলল, কি চাই?

দেখলাম যে বাবুমশায় মাটিতে পড়ে গেলেন। পড়ি-কি-মরি ছুটেছি।

বুড়োমানুষ, নিশ্বাস ঘন হয়েছে ছুটোছুটি করে। কৌতুকে পেয়ে বসল সোনালিকে। বলে, কী ভাবলে তুমি?

অসুখ-বিসুখ করেছে হঠাৎ। ডাক্তার-বদ্যি যদি ডেকে দিতে হয়।

ঘোরতর পরোপকারী মানুষ, সন্দেহ কী! সোনালির মুখে হাসি দেখে বৃদ্ধ জোর দিয়ে বলল, হয়েছিল তাই যে সেবার। বোদরার মেজোবাবু আবাদ দেখতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বাঁধের উপর। আর উঠলেন না, বাঁধ থেকেই গঙ্গাযাত্রা।

সোনালি হাসতে হাসতে বলে, না-গো, এ ব্যাধিতে ডাক্তার ডাকতে হয় না। ডাক্তারিতে এর চিকিচ্ছে নেই।

বৃদ্ধ উদ্বেগ ভরে বলে, ভাল কবিরাজও কাছাকাছি একজন আছেন।

ডাক্তারি-কবিরাজি কোন চিকিচ্ছেয় কোনদিন সারবে না। নিজের কাজে চলে যাও তুমি।

চলে যাবে কি, আরও দেখি চার বাচ্চা পিলপিল করে পাশে এসে দাঁড়াল। নিতান্ত বাচ্চা বলেই ছুটোছুটিতে পারেনি—পিছিয়ে পড়েছিল।

সোনালি বাচ্চাগুলোর পরিচয় নিচ্ছে : ছেলে বুঝি তোমার?

ভারতীয় ইস্পাত

এবং

মেঘনা বিড়ি

মেঘনা বিড়ি

সকল ইস্পাত নগরবাসীর প্রিয়

ধূমপানে আমেজপূর্ণ
স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়!

আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

মেঘনা বিড়ি

মেসার্স-গণেশ চন্দ্র সাহা দ্বারা তৈরী

ডিগাহ, রাউরকেল্লা, জামশেদপুর, বোকারো ষ্টীল সিটি, দুর্গাপুর, বার্নপুর, জয়পুর, জগদলপুর, রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় টিটিলাগড়, সম্বলপুর, রেংগালী, ঝাড়সুগুড়া, বড়জামদা, চক্রধরপুর, রাঁচী, আওরংগাবাদ, শিলচর, আগরতলা।

১৯নং আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

UNIVERSAL

বৃদ্ধ বলে, ছেলে কোথা দিদিমণি—মুখ। পুরোপুরি এক গন্ডা মুখ। তেতো টক নোলতা, খাল যা-কিছু যত খুশি দেবেন, মুখগুলো টপ-টপ ধরে ধরে নেবে। কোঁৎ করে গিলে তক্ষুণি আবার মুখের হাঁ। দিন আবার, দিন-রাত্তির ধরে দিয়ে যান—মুখের ফলের খোলা-বন্ধ কামাই নেই।

স্নেহান্নতেও তাই বটে বাচ্চা চতুষ্টয়। মুখ ছাড়া বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে কি নেই, ধরা যায় না। শুকনো, হাড্ডি-সার। মুখ নামক ফলটা যথাযথ বসানোর প্রয়োজনেই যেন চামড়ার ঢাকা হাড়ের ফ্রেম এক-একটা।

বৃদ্ধ বলে, বন্ধ-মুখ কী আর দেখবেন দিদিমণি! চালিয়ে দেখুন না একটুকু। যা-হাক কিছু ছুঁড়ে দিন—দেখবেন মজা।

পেট-মোটা অ্যাটাচিকেস আগেই খোলা হয়েছে। হাত ঢুকিয়ে দিল সোনালি। কত জিনিস মাগো! কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, টফি, চকোলেট, বিস্কুট—এমনকি খবরের কাগজে পরিপাটি করে জড়ানো আমিষ ও নিরামিষ স্যান্ডউইচ।

সোনালি বলে, এত এনেছ কেন, কে খাবে?

সমস্ত দিনের রসদ—

সকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রজত বলে, প্লান ছিল রাত অবধি থাকব। সমস্ত বরবাদ। অফিস পালানোই সার। তুমিও অপুরে থেকে মিছামিছি এলে।

রাত কেন, হপ্তাভোর থাকলেও এত রসদ ফুরাতো না—

একমুঠো বাদাম নিয়ে সোনালি বাচ্চাদের দিকে এগিয়ে ধরল।

উঁ-হু-হু—করে উঠল বৃদ্ধ। হাতে-হাতে কেন দেবেন দিদিমণি। ছুঁড়ে দিন, মুখে ধরে নেবে। নইলে আর মজাটা কী?

দিল ছুঁড়ে শূন্যের দিকে। দেখে-শুনে গোড়ায়—ধীরে সুস্থে। বাপে জা হতে দেবে না। তাড়াচ্ছে : থেমে থেমে কেন দিদিমণি? জলদি করুন, মোটে তিষ্ঠাতে দেবেন না। করেই দেখুন না—ভুঁয়ে পড়তে দেবে না ওরা—সে পাত্রই নয়। ছেলে না বলে মুখ বলছি কেন আর তবে?

সত্যি তাই। হাঁ করে লাফিয়ে লাফিয়ে ধরে নিচ্ছে। দেখতে খুব মজা। হরিদ্বারে মহদার গুলি ফেলে গঙ্গার মাছ দেখে যেমন। ম্যাজিক দেখার মজা পাওয়া যায়।

রোষ চেপে গেল সোনালির। ক্রমাগত ছুঁড়ছে। রজত ছটফট করছে : যত-কিছু এনেছে, উজাড় করে দিল যে—এক কণিকাও নিজেদের জন্য রাখবে না? রূপসী সাপিনীকে অথচ মানাও করতে পারে না। আগুন-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বুড়ো এবং বাচ্চাগুলোর দিকে। পারলে ভস্ম করে ফেলত।

অবশেষে বলেই ফেলল, এক-এক ফোঁটা বাচ্চা প্যাকেট প্যাকেট পাচার করে দিচ্ছে—এত মাল কোন ভাণ্ডারে নিয়ে রাখছে? কত জায়গা থাকতে পারে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ওদের ওই চারখানা উদরে?

হাসিতে ডগমগ হয়ে সোনালি বলে, জানো না বুঝি! আপাদ-মস্তক ওদের উদর। পাশ-বালিশের খোল—হাড়-মাংস মজ্জা-রক্ত কিছুই নেই। স্রেফ ফাঁপা ভিতরটা। ঠিক বলছি, সন্দেহ হলে টিপে দেখতে পারো।

একটা হাতে কত আর পারবে। সোনালি এবার সব্যসাচী হয়ে দু-হাতে ছুঁড়ছে। সাধ্য কি হারাবে ওদের। চার-চারখানা মুখ হাঁ হয়ে আছে চতুর্দিকে। কার দিকে ছুঁড়বে, আগে-ভাগে কোন নিশানা নেই। একের পানে ঝোঁক দিয়ে ছুঁড়ল হয়তো বিপরীত দিকে। এ-কর্মে সুনিশ্চিত বহুদর্শী—কেমন যেন বুঝতে পারে, লম্ফ দিয়ে এসে ধরে।

বাপেরও দেখি চোখ বড়-বড় হচ্ছে। শুকনো এতটুকু মুখ বিস্ফারিত হয়ে দুনো তে-দুনো হয়ে উঠল ক্রমশ। পরনের জীর্ণ বস্ত্র এঁটে সেঁটে নিচ্ছে। অর্থাৎ নির্বিকার দর্শক মাত্র হয়ে থাকছে না আর—রণাঙ্গনে নিজেও নেমে পড়বে। বাচ্চাদের বলে, অঢেল খেলি তো বাপু। ফটাস করে পেট ফেঁসে যাবে এবার, মজা টের পাবি। সরে দাঁড়া তোরা, আমায় কিছু ধরতে দে। বুড়ো-মানুষ—ঝাঁপাঝাঁপিতে পাল্লা দিয়ে পারব কেন? তোরাই সব নিয়ে নিবি, আমি ফক্কা।

এত কাকুতি-মিনতি, ছেলেগুলো কানে নেয় না। শাস্ত্রবাক্য আওড়াচ্ছে বৃদ্ধ : পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম—ওরে হারামজাদারা, পিতার কথায় রামচন্দ্র রাজত্ব ছেড়ে বনে চলে গেলেন,—আর কুপুত্র পাষণ্ড তোরা, দুটো চিনাবাদামের লোভ ছাড়তে পারিস নে?

সোনালিরও মুখ আর ঐ বাপ-বেটাদেরও মুখ! রজত ভাবছে : এক মুখ জগৎ-বিমোহন, রাক্ষুসে অন্য মুখগুলোর দিকে তাকাতেও ঘৃণায় গা শিরশির করে।

চিনাবাদামের লোভ ছাড়তে বলছে পিতা—কিন্তু চিনাবাদাম নয়, সোনালি স্যান্ডউইচের প্যাকেট খুলল। বাদাম ছোঁড়া বন্ধ কিছুক্ষণ। ক্ষুধার্ত বুড়ো-মানুষের সঙ্গে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলবে না, কাগজে করে কয়েকটা স্যান্ডউইচ দিয়ে দেবে। সেই কাগজ ছিঁড়তে গিয়ে নজরে পড়ল বেবুনের ছবি—

চিড়িয়াখানায় সদ্য নিয়ে এসেছে। কালো-বেবুন, অতিশয় দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। সেলিব্রিস থেকে বহুকষ্টে সংগ্রহ করা। কাগজে সবিস্তার বর্ণনা আছে। সোনালি এক বান্ধবীর সঙ্গে আছে, সে-ও এসে দেখে গিয়েছে কদিন আগে। জাত্যাংশে বানরই, কুকুরে-বানরে মিশাল বীভৎস চেহারা।

সোনালি বলে, ওপারে গেলাম না যখন, চিড়িয়াখানা তো কাছেই—কালো-বেবুন দেখে আসি চলো। তারপরে না-হয় সিনেমায় গিয়ে বসা যাবে।

* * *

রাগী মেজাজ বেবুনের—রেলিং-এর ঘেরের মধ্যে রেখেছে। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। ফলপাকড় খায়। আম দিয়ে গেছে কে-একজন, দিব্যি কেমন মানুষের মতন খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে। সোনালি স্যান্ডউইচ ছুঁড়ে দিল। কী অপরাধ করেছে খোদায় মালুম—ফ্যাচ করে খিঁচিয়ে উঠল জানোয়ার। মুখের ভ্যাংচানিই শুধু নয়, আধেক-খাওয়া আম ছুঁড়ে মারল। বুলেটের মতন বিষম জোরে এসে লেগেছে, দু-হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে সোনালি বসে পড়ল সেখানে। রজত হতভম্ব, বাস্তসমস্ত মানুষজন আহা-রে ওহো-রে করছে। দুটো মেয়ে ধরে তুলে কলের কাছে নিয়ে গেল! সোনালি চোখ-মুখ চেপে ধরে আছে দু-হাতে।

হাত সরান, কী হয়েছে দেখতে দিন না। আমের আঠি চোখের উপরে গিয়ে লেগেছে। জলের ঝাপটা দিয়ে দিই, সেরে যাবে।

এমনি দেবে না তো জোর করে হাত সরিয়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। আরে সর্বনাশ, মুখ-জোড়া শ্বেতি, দুই ওষ্ঠ দুধের মতন সাদা—

[পুরো বছর লেগে থেকেও রজত ঘুণাক্ষরে টের পায়নি—বানরে লহমার মধ্যে বুঝে নিয়ে ভেজাল মাল ধরিয়ে দিল।]

কী সর্বনাশ, কুন্দপ্রভ দাঁতের ছড়াও বিলকুল বাঁধানো। দাঁতের প্লেট টুকরো টুকরো হয়ে সোনালির মুঠোর মধ্যে। দাঁত গিয়ে এখন তোবড়ানো গাল, মধুস্যন্দী কণ্ঠ একেবারে অবোধ্য।

[একালের বানরও জ্ঞানবুদ্ধিতে এক-তিল কম যায় না পৌরাণিক বাপ-ঠাকুরদার চেয়ে। ডারউইনের মতে বানর থেকে নর। ওহো, কী অধঃপতন!]

মুখ যেমন জলের ঝাপটায় ধুয়ে দিয়েছে, কালো চুলে সাবান রগড়ালে মস্তকও রজতগিরিনিভ হবে হয়তো। না-ও হতে পারে—খুব সম্ভব, পরচুলো। চুল ধরে টান দিলে টাক বেরিয়ে পড়বে।

ঘড়ি দেখল, তিনটে। রজতের দৃঢ়-সংকল্প, এখনই এই মুহূর্তে যাবে চলে এয়ারওয়েজ-অফিসে। এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা। তাঁরই সাহায্য নিয়ে—দশটাকা বিশটাকা পান খাওয়াতে হয়, সে-ও ভী আচ্ছা!—সোনালির সঠিক বয়স বের করে ফেলবে অফিসের রেকর্ড থেকে। এমন হতে পারে, নামও খাঁটি নয়। ঘষে-মেজে রুজ-ক্রীম মাখিয়ে সেকেলে শৈবলিনী, সুবাসিনী থেকে সোনালি দেবীতে দাঁড় করিয়েছে।

বনফুল

সৈনিক সেন

আমি আমার পার্টির কাজেই গিয়েছিলাম সেই শহরে। স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ট্রেন থেকে নামতেই ঝিম-ঝিম ক'রে বৃষ্টি শুরু হল একটু। মফস্বল জায়গা। ফুলবেড়িয়ার বাগানে আমার ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও কুলি পেলাম না। সঙ্গে আর কিছু ছিল না। আমার বিছানা-পত্র নিয়ে আমার চাকরটা আগের ট্রেনে চলে' এসেছিল। স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলাম। চেনা লোক বেরিয়ে পড়ল। স্টেশনমাস্টার অন্য কেউ নয়, হারান, আমার বন্ধু একজন।

"কি ব্যাপার, তুই হঠাৎ এখানে!"

'পার্টির কাজে এসেছি। একটু ক্যানভাস করতে হবে। ফুলবেড়িয়ার বাগান-বাড়িতে আমার জন্য জায়গা ঠিক হয়েছে। কিন্তু এই ট্রাংকটা নিয়ে যাই কি ক'রে বল তো। এখানে তো রিক্‌শা ঘোড়ার গাড়ি ট্যাক্সি কিছু নেই। কোনও কুলিও যেতে চাইছে না।—"

"না এখানে স্টেশনে গাড়ি-টাড়ি বিশেষ থাকে না এত রাত্রে। কুলিও এত রাত্রে যেতে চাইবে না কেউ অতদূরে।"

"কিন্তু ট্রাংকটা আজ রাত্রে নিয়ে যেতেই হবে। ওতে অনেক দরকারি কাগজ-পত্র আছে—"

"বেশ, রেখে যাও আমার কাছে। আমি একটু পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পয়েন্টসম্যান রামু আসবে একটু পরে। গাড়িটা 'পাস' করে দিয়ে সে দিয়ে আসবে তোমার ট্রাংকটা। মজুরি বেশী চাইবে। কত দেবে তুমি?"

"যা বলবে"

'দু-টাকা দিও। মাইলখানেক যেতে হবে তো এত রাত্রে—'

"বেশ তাই দেব। টাকা দুটো তুমিই রাখ—" তাকে দুটো টাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টির মধ্যেই। পরদিন সভায় কি বক্তৃতা দেব, তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলাম। টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, পথ চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না কিন্তু ভিজে গেলাম বেশ। আশা ছিল আমার চাকর হরু নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। গিয়ে এক কাপ গরম চা অন্তত পাব।

ফুলবেড়িয়ার রাস্তা আমার অচেনা নয়। আগে দু-একবার এসেছি। টর্চ জেবলে জেবলে পথ হাঁটতে হচ্ছিল অবশ্য, কারণ পাড়া-গাঁ জায়গা, রাস্তায় কোনও আলো ছিল না। স্টেশন থেকে বেরিয়েই ব্যাঙের ডাক শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে ঝিল্লী-ধ্বনি। রাস্তার দু-ধারে অন্ধকার মাঠ। মাঠের ওপারে অন্ধকার আরও পুঞ্জীভূত, সম্ভবত ওগুলো ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে গোঙানি কান্নার মতো শব্দ শুনতে পেলাম একটা। দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। দেখতে পেলাম স্তূপীকৃত কালো কি যেন একটা এগিয়ে আসছে আমার

দিকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি পেল নিজের অজ্ঞতায়। একটা মোষেরগাড়ি, প্রচুর বোঝা নিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে।

"ফুলবেড়িয়া এখান থেকে কতদূর বলতে পার—"

গাড়ি থেকে কোন জবাব এল না। গাড়োয়ান ঘুমুচ্ছে না-কি? গাড়ির পিছন দিক থেকে লম্বা লম্বা কি যেন ঝুলছে। বাঁশ না-কি?

যাই হোক এগিয়ে চললাম। ফুলবেড়িয়ার রাস্তা আমার অচেনা নয়। ফুলবেড়িয়াতে একবার পুলিশ ফায়ারিং হয়েছিল। আমিও ছিলাম সেই বিদ্রোহী জনতার মধ্যে। ভাগ্য ভালো ছিল প্রাণে মরিনি।

শিস্ দিতে দিতে পথ চলছিলাম। হঠাৎ একটা কুকুর এসে হাজির হল। প্রকাণ্ড কালো কুকুর। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা...। একপাল কুকুর এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল আমাকে ঘিরে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল তারা আমাকে এগোতে দেবে না। রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলাম। দু-চারটে ঢিল খেয়ে তারা সরল একটু। আমি পথ পেয়ে আবার অগ্রসর হলাম। কুকুরগুলো কিন্তু ঘেউ ঘেউ ক'রে পিছনে পিছনে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ তারা অন্তর্ধান করল। তার পরই সেই গোঙানি শব্দটা শুরু হ'ল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই মোষের গাড়িটাই আবার আমার দিকে আসছে। দ্রুতপদে চলতে শুরু করলাম।

ফুলবেড়িয়ায় একটা বাগানবাড়ি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা আছে। অনায়াসে সেখানে মীটিং হতে পারে। তাই আমাদের পার্টি থেকে ঘরটা ভাড়া নেওয়া হ'য়েছিল। একমাত্র অসুবিধা স্টেশন থেকে দূর। দ্রুতপদে চলছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মোষের গাড়িটা ঠিক আমার পিছু পিছু আসছে। চাকা থেকে যে শব্দ হচ্ছে তাই যেন বহু মানবের মর্মন্তুদ ক্রন্দন। আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'ল ওটা মোষের গাড়ি তো? ছুটতে লাগলাম।

ফুলবেড়িয়ার বাগানবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলাম, তখন ঝড় উঠল একটা। প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের বেগে পড়ে গেলাম মাটিতে। আবার উঠলাম। আবার এগোতে চেষ্টা করলাম। আবার ফেলে দিলে আমাকে। ঝড় নয়, যেন একটা দৈত্য কিছুতেই এগোতে দেবে না আমাকে। কিন্তু আমি—সৈনিক সেন—দমবার ছেলে নই। হার মানিনি কারো কাছে। আমি এগোবই। মাথা হেঁট ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। ঝড় আমার পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ আবার থেমে গেল। কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আমি একটা গাছের ডাল পেলাম। ঝড়েই উড়িয়ে এনেছিল সেটা সম্ভবত। সেটা সংগ্রহ করে নিলাম।

...ফুলবেড়িয়ায় বাগানবাড়িতে পৌঁছে দেখি বাড়িটাকে ঘিরে অসংখ্য কুকুর ডাকছে। সব কালো কুকুর। তাদের সম্মিলিত চীৎকারের একটি অর্থই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্ধকারে—"দূর হ'য়ে যাও, দূর হ'য়ে যাও, দূর হ'য়ে যাও"। হাতে গাছের ডালটা ছিল। সেইটে আস্ফালন করে এগিয়ে গেলাম। সামনে যে কুকুরটা ছিল মারলাম ডালটা দিয়ে। মেরেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ডালটা যেন হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কুকুর নয়, কুকুরের ছায়া-মূর্তি। শন্-শন্ শব্দ হল মাথার উপর। উপরের দিকে চেয়ে দেখি অসংখ্য বাদুড় ঘুরপাক খাচ্ছে।

"হরু, হরু, হরু—"

চারদিকে কবাট বন্ধ করে হরু বসেছিল। আমার ডাক শুনে কবাট খুলে বেরিয়ে এল সে। দেখলাম ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। মুখে রাম নাম, হাতে টিফিন কেরিয়ার।

"এ ভুতুড়ে বাড়ি বাবু। চলুন এখান থেকে পালাই। এসে আপনার বিছানা ক'রে রেখেছিলাম। সব তছনছ করে দিয়েছে। বালিশ ছিঁড়ে একাক্কার করেছে। বাসন-কোসন ভেঙে চুরমার করেছে। এই টিফিন কেরিয়ারে দু'পীস টোস্ট আর দুটো ডিম সিদ্ধ আছে। সেইটে হাতে ক'রে আমি ক্রমাগত রাম-নাম করে যাচ্ছি। তাই আমাকে ছুঁতে পারেনি ওরা—"উঃ বাবারে—" সঙ্গে সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারটা পড়ে গেল মাটিতে।

"আমার হাতে লাথি মেরেছে। রাম-রাম রাম-রাম। আপনি রাম নাম করতে করতে খেয়ে নিন এগুলো বাবু—"

আমি কিন্তু সে অবসর পেলাম না। কে যেন আমার নাকের উপর ঘুঁসি মারলে একটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম আমি। নাক দিয়ে রক্ত কিন্তু পড়ল না।

তারপরই খোনাসুরে কে যেন বলে উঠল—"ফি'রে যাঁন। আঁপানার ইঁলেকশন মীটিং পঁণ্ড ক'রে দেব আঁমরা—" আমি সৈনিক সেন, দমবার ছেলে নই। উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক এই সময়ে স্টেশন থেকে রামু এসে হাজির হল আমার ট্রাংকটা নিয়ে। ট্রাংকের উপর আমার নাম লেখা ছিল। শুধু নাম নয় আমি যে পার্টির লোক সে পার্টির নামটাও লেখা ছিল ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার নামের পাশে। ট্রাংক রেখে চলে গেল কুলিটা।

গোঙানি শব্দটা আবার শোনা গেল। বেরিয়ে দেখলাম সেই মোষের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। ট্রাংক থেকে টর্চ বার করে এগিয়ে গেলাম। টর্চ ফেলে দেখলাম বিরাটকায় মহিষ দুটো ঘাড় তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে। তাদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখগুলো জ্বলছে। গাড়িতে মড়া বোঝাই করা রয়েছে। পাগুলো ঝুলছে পিছন দিকে। হঠাৎ আমার পুলিস-ফায়ারিং-য়ের কথাটা মনে পড়ল।

ঠিক এর পরই যা ঘটল তা অপ্রত্যাশিত।

কে যেন আমার কানের কাছে খোনাসুরে প্রশ্ন করলে, "আপনি কি আঁমাদের পার্টির লোঁক? আমরা জানতাম আপনি—"

"হ্যাঁ ঠিকই জানতেন। কিন্তু সম্প্রতি আমি দল ত্যাগ করে' আপনাদের পার্টিতেই যোগ দিয়েছি—"

"তাই নাকি। আমরা তোঁ খঁবরের কাঁগজ পঁড়তে পাঁই না"—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য খোনাকণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"সৈঁনিক সেঁন জিঁন্দাবাদ। সৈনিক সেন জিঁন্দাবাদ"। এরপর ছবিটাই বদলে গেল।

অন্তর্ধান করল মহিষের গাড়ি, অবলুপ্ত হয়ে গেল কুকুর আর বাদুড়ের দল। হরুর দুই গন্ডে চুম্বনও করে' গেল কে যেন এসে।

তারপর যা হল তা আরও চমকপ্রদ।

খাবার টেবিলে কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেল দামী একটা টেবিল ক্লথ। আর তার উপর সাজিয়ে দিয়ে গেল চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—সব রকম। পরিতৃপ্ত সহকারে আহার সমাধা করলাম। তারপর ঘুমুলাম দুগ্ধফেননিভ শয্যায়। যাদুমন্ত্রবলে সব যেন হ'য়ে গেল।

দিদির সঙ্গে

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা কখনো ঠাকুর দেখতে বেরোয় না, তার ভালোই লাগে না। অন্য সময় রাত দশটার আগে বাড়ীই ফেরে না, অফিস থেকে কোথায় যেন ছেলে পড়াতে যায়, কী সব কাজের ধান্দায় ঘোরে। কিন্তু পুজোর সময় —এই যে চারদিকে এত আলো, এত মাইকের গান, রাস্তায় এত ভিড়—এর ভেতর সে আর নড়তেই চায় না ঘর থেকে। পুরোনো শাড়ির পাড় দিয়ে মা যে ঈজি-চেয়ারের কাপড়টা মধ্যে মধ্যে সেলাই করে দেয়—সেই চেয়ারটায় বাবা চুপ করে বসে থাকে, ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়, তারপর একটা একটা বিড়ি খায় আর ভাবে।

বাসায় বসে থাকলেই বাবা ভালো। খোকা ছোট হলেও বুঝতে পারে বাবার এত ভাবনা কেন। বাবার মাইনে কম; তাই ছেলে পড়ায়— লোককে ইন্‌শিয়োর করাতে ছোটে। তবু বাবার কষ্ট যায় না—মাস শেষ হয়ে এলে—রেশন আনা, বাজার করা নিয়ে মা-র সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হয় তার।

বাবা ভাবে আর মা চটেই থাকে। সারা-দিনই চটে থাকে মা। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে চটে যায়— রুটি করতে করতে মা-র রাগ হয়। আর সবচাইতে তার রাগ বেশি হয় দিদিকে দেখলে।

'এলেন পাড়া বেড়িয়ে অকর্মা লক্ষ্মী-ছাড়া মেয়ে! সংসারের কুটোটি ভেঙে যদি-

খোকা জানে, এ সব মা-র মিছিমিছি রাগ। বাড়ীর সব কাজ দিদি করে। সকাল থেকে সকলের জামাকাপড় কাচতে বসে, বাটনা বাটে, ঠিকে-ঝি তো প্রায়ই কামাই দেয়—তখন বাসন-টাসন দিদিকেই মাজতে হয় সমস্ত। বাবার যদি কাজ থাকে, খোকার অসুখ করে, তাহলে দিদিই যায় লাইনে দাঁড়িয়ে দুধ আনতে। আর পাড়াও সে বেড়ায় না—কেবল এক-আধদিন রাস্তার ওপরে বীথিমাসিদের বাড়ীতে যায় কখনো-সখনো।

তবু মা দিদিকে বকে। দাঁতে দাঁতে ঘষে গালাগাল করে। দিদি প্রায়ই গোঁজ হয়ে থাকে, কখনো কাঁদে, কখনো বা আড়ালে গিয়ে—খুব রাগ হলে—জিভ বের করে মা-কে ভ্যাংচায়। এক খোকা ছাড়া সে-ভ্যাংচানি মা-বাবা কেউ দেখতে পায় না।

খোকা জানে, দিদির ওপর মা-র এত রাগ কেন। দিদি কালো, দিদি দেখতে

খারাপ—কবে ছেলেবেলায় বসন্ত হয়েছিল, গালে-কপালে তার কটা শুকনো শুকনো দাগ। সেইজন্যে, অনেক বড়ো হয়ে গেলেও, এখনো দিদির বিয়ে হয়নি। কারা কারা কবার দেখেও গেছে, কিন্তু কারুরই পছন্দ হয়নি দিদিকে।

বাবা যখন একা বসে বসে ভাবে—খোকার মনে হয়, তখন বাবা দিদির কথাও ভাবে। মা দিদিকে বা-তা বলে, ঘরে যেতে বলে, দিদি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—আর বাবা যেন দিদির দিকে কেমন করে তাকায়। বাবার চোখ কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে, চশমাটা খুলে বার বার কোঁচার খুঁট দিয়ে মোছে—খোকা টের পায় কোথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বাবার, খুব বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে। তখন দিদির জন্যে নয়—বাবার জন্যেই খোকার কষ্ট হতে থাকে।

বাবা ভাবে, মা বকে, দিদি দেওয়ালে পিঠ রেখে পেছনের মুচিদের বস্তির ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন খোকা মেজেয় পা ছড়িয়ে বসে কয়েকটা কাচের মার্বেল নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়া-চাড়া করে। কিছু ভালো লাগে না তার, কিচ্ছু না।

তবে পুজোর সময় মা-র বকুনিটা বন্ধ থাকে। কত আলো চারদিকে, কত মাইক—কত গান। রাস্তায় কী ভিড়—কী ভিড়! ছোট ছোট ছেলেরা ভলান্টিয়ার হয়ে—ব্যাজ পরে—পুজোর সামনে দড়ি পাহারা দেয়, বলে, 'মেয়েরা এইদিকে—এইদিকে।' পুজোর চিঠিতে তাদের নাম ছাপা থাকে : 'স্বেচ্ছা-সেবক—বিল্টু, স্বপন, বুড়ো, অভিজিৎ, পার্থ।' খোকা ভলান্টিয়ার হয় না—মা হতে দেয় না।

তবু পুজোর ক'দিন মা বকে না; দিদি খোকাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঠাকুর দেখতে যায়, মা কেবল বলে, 'বেশি দেরী করিসনি কিন্তু।' সন্ধ্যে হলে মা রাঁধতে যায়—বাবা আলো নিবিয়ে, সেই পাড় দিয়ে সেলাই-করা ইজি চেয়ারটায় বসে—একটার পর একটা বিড়ি খায় আর ভাবে।

বাবা কখনো ঠাকুর দেখে না, তার ভালোই লাগে না। মা কেবল একদিন যায়—সেই নবমীর রাত্রে। তা-ও আশপাশের দু-তিনখানা ঠাকুর দেখলেই মা-র হাঁফ ধরে।

'আর পারিনে বাপু। এবার বাড়ী চল্।'

'একটু ওদিকে চল না মা। অনেক ভালো ভালো ঠাকুর আছে ওধারে।'

'ভালো আর কী হবে, সবই তো এক; চল্-চল্—রান্নাবান্না আছে না?'

না—মা-র সঙ্গে ঠাকুর দেখে সুখ নেই। দিদি তবু একটু এদিক-ওদিক যায়, তবু বেশি দূর যেতে সাহস পায় না—মা বলে, 'অত বড়ো মেয়ে, সাত রাজ্যি টহল দিতে বেরিয়ো না আবার।' যদিও পুজোর দিন-গুলোতে মা বকে না, তবু দিদি ভয় পায়—ভয় পেতে পেতে দিদির ওইটেই অভ্যেস হয়ে গেছে।

তবু আজকে—পুজোর এই প্রথম সন্ধ্যেটায়—যখন বাবা ঘরের আলো নেবাল আর মা উনুনে দাল বসাতে গেল, তখন দিদিকে একটু অন্যরকম মনে হল খোকার। বাবা এবার পুজোয় দিদিকে যে-রঙিন শাড়ীটা কিনে দিয়েছে (প্রত্যেক বছর বাবা পুজোর কাপড়-জামা কেনার জন্যে অফিস থেকে কী যেন বোনাস পায়), সেটা বেশ পছন্দ হয়েছে দিদির, আর পরে তাকে ভালোই লাগছিল। দিদি আয়নাটির সামনে দাঁড়িয়ে মাইকে শোনা একটা গান গুনগুন করছিল আর মুখের শুকনো দাগগুলোর ওপর একটু একটু স্নো ঘষছিল—সেই স্নোর গন্ধটাও বেশ মিষ্টি লাগছিল খোকার।

'দিদি, আমাকে একটু স্নো দিবি?'

'যাঃ, ছেলেদের এ-সব মাখতে নেই।'

'ওদের টুটুনের মা তো মাখিয়ে দেয়। দে না একটু।'

আঙুলের ডগায় একটু স্নো নিয়ে আলতোভাবে ছুঁইয়ে দিলে খোকার গালে। খোকা মাখতে চেষ্টা করল। আর তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল দিদি।

'বাঃ, কী মাখাই হল! সব তো গিয়ে উঠেছে নাকের ডগায়। আয় আমার কাছে—ঠিক করে দিই।'

বেশ করে মাখিয়ে দিলে দিদি। চিরুনি দিয়ে চুলটাও একটু ঠিক করে দিলে। তার-পর আদর করে একটা চুমু খেলো খোকার কপালে।

'ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে, খোকা।'

'তোকেও খুব ভালো দেখাচ্ছে দিদি।'

'দূর, আমি তো একটা কালো পেত্নী।'—একটু ভারী হল দিদির স্বর।

'মোটেই না'—খোকা প্রতিবাদ করল : 'ও তো মা রাগ করে বলে।'

'না—রে, আমি সত্যিই দেখতে খুব খারাপ।'

'কক্ষণো না।'—আরো জোরালো প্রতি-বাদ করল খোকা।

একটু হাসল দিদি, জবাব দিল না। তারপর হাতের মুঠোয় একটা ছোট্ট রুমাল আর ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়ে বললে, 'চল্।'

বেরুবার মুখে মা ডাক দিলেন বরাবরের মতো।

'একেবারে হিল্লি-দিল্লি দিগ্বিজয় করতে যেয়ো না—একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'না মা, দেরী হবে না।'

গলি পেরিয়ে যে-রাস্তা তা-ও লেন। পাড়ার পুজো তার মুখে।

সেখানে যাওয়ার আকর্ষণ ছিল না। সে তো দেখে দেখে পুরোনো হয়ে গেছে। ভাই-বোন সেটা ছাড়িয়ে গেল। আশপাশের পুজো—তাও দেখা। এক ঠাকুর দেখতে দু'বার আর ভালো লাগে?

খোকা বললে, 'কোথায় যাবি দিদি?'

'আর একটু এগিয়ে যাই।'

'কলেজ স্কোয়ারে যাবি?'

দিদি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সে যে অনেক দূর।'

'চল্ না দিদি—' মিনতি ঝরে পড়ল খোকার গলায়।

'দেরী হয়ে যাবে, মা বকবে।'

'মা বকবে না—পুজোর দিনে বকে না।'

ভয় আর লোভের মাঝখানটায় দিদির মন দুলছে—বুঝতে পারল খোকা। একটু ভেবে দিদি ফিসফিস করে বললে, 'চল্—রিক্‌শ করে যাই।'

খোকা অবাক হল : 'রিক্‌শ? পয়সা লাগবে না?'

'পয়সা আমার কাছে আছে।'

'পয়সা কোথায় পেলি দিদি?'—খুশিতে চনমন করে উঠল খোকা : 'মা দিয়েছে?'

'হুঁ, মা দেবে!'—দিদি একটু ঠোঁট বাঁকালো : 'সেই যে ট্যাকসি করে পিসিমারা এসেছিল মনে নেই? আমাকে দুটো, আর তোকে একটা টাকা দিয়েছিল?'

সে তো সেই কবে—প্রায় বছর ঘুরতে চলল। আবার অবাক হল খোকা। তার টাকাটা তো সেদিনই খরচ হয়ে গেছে একটা পিস্তল, একটা চশমা আর লেবেনচুস কিনে। পিস্তলটা হারিয়ে গেছে, চশমাটা ভেঙে গেছে—লেবেনচুস কবে হজম হয়ে গেছে। আর দিদি এখনো টাকাদুটো জমিয়ে রেখেছে! আশ্চর্য!

খোকার লোভ হল।

বেনারসী সিল্ক ও তাঁত বস্ত্রের কেন্দ্রে
২২৪ মহাত্মা গান্ধী রোডে আমাদের ঔষধ বিভাগ
ফোন : ৩৩-৬১৮৭
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
• বড়বাজার •• কলিকাতা-৭ •• ফোন: ৩৩-৯০৭৪ •

'আমাকে তাহলে দুটো বেলুন কিনে দিবি, দিদি?'

'দেব এখন। ফেরবার সময়।'

একটা বুড়োমতন রিক্‌শওলাকে ডাকল দিদি।

'এই রিক্‌শ—কলেজ স্কোয়ার যাবে?'

'বারো আনা লাগবে দিদিমণি।'

'বা-রে, ছ'আনায় তো যায়।'

'এখুন পুজো কা টাইম আছে দিদি-মণি।'—বুড়ো হাসল: 'হামারা ভি কুছু বক্‌শিস মিল না চাহিয়ে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আট আনা দেব।'

বুড়ো ভালো মানুষ। বললে, 'আইয়ে।'

ভিড়—ভিড়—ভিড়। মানুষ, রিক্‌শ, মোটর। মাইকের শব্দ ছাপিয়ে এখন দিকে দিকে উঠছে ঢাকের আওয়াজ, এখানে-ওখানে আরতি শুরু হয়েছে। যে-সব জায়গায় পুজোর মণ্ডপ, এত আলোর ভেতরেও যেখানে অনেক বেশি আলো থমকে আছে—সেখানে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে। ধূপের গন্ধে ভরে গেছে বাতাসটা।

ভিড় ঠেলে রিক্‌শ চলছে কি চলছে না। তবু খুশিতে ছলছল করছে খোকার মন।

'রিক্‌শ চড়ে যেতে খুব ভালো লাগছে—না দিদি?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে।'

'টুটুনুদের মতো আমাদের একটা মোটর থাকলে বেশ হত—না-রে? আমরা কত দূরে দূরে ঘুরে কত ঠাকুর দেখতে পেতুম।'

খোকার বোকামোতে দিদির হাসি পেল। কিন্তু আজকে—এই রিকশ চেপে—দুটো টাকা খরচ করতে পারার আনন্দে—খোকাকে তার কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না।

দিদি বললে, 'দূর, এই ভিড়ের মধ্যে কি মোটর চড়তে ভালো লাগে? দ্যাখ্ না—কত গাড়ী সব দাঁড়িয়ে গেছে। তাছাড়া মোটরের ভেতরে বন্ধ বিচ্ছিরি। রিক্‌শ চেপে কেমন মজা করে আমরা যাচ্ছি।'

খোকা আপত্তি করল না। দিদি তাকে রিক্‌শয় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এই কি কম কথা? রাস্তার আলোয় এখন কী-যে সুন্দর দেখাচ্ছিল দিদিকে—আর চমৎকার ঝিল-মিল করছিল তার শাড়ীটা। আবার গুন-গুন করে গান গাইছিল দিদি—খুব আস্তে আস্তে, যাতে আশ-পাশের লোকে শুনতে না পায়। খোকা বুঝতে পারছিল মনটা ভীষণ খুশি হয়ে আছে দিদির।

গান থামিয়ে দিদি বললে, 'খোকা?

'উঁ?'

'তুই বড়ো হয়ে অনেক বড়ো চাকরি করবি তো?'

খোকা বেশ আশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল: 'করবই তো।'

'টুটুনের বাবার চেয়েও বড়ো চাকরি?'

'টুটুনের বাবার চেয়েও।'

'তখন তুই একটা মোটরগাড়ী কিনবি না খোকা?'

'হুঁ কিনব।'

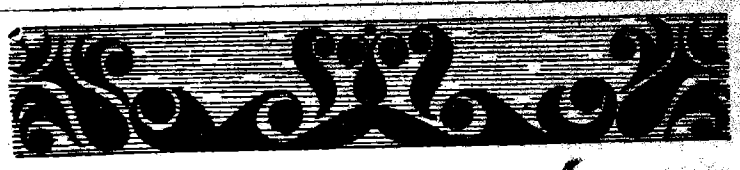

টাকা প্রতি ১০ পয়সা বিশেষ রিবেট

॥ সুতীর তাঁতবস্ত্রের উপর ॥

● ২৯শে সেপ্টেম্বর '৬৮ পর্যন্ত প্রতিদিন আমাদের সকল বিক্রয়কেন্দ্র শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন সমেত সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বাংলার অতুলনীয় তাঁতবস্ত্র

তন্তুজ কিনে খুশি হবেন।

বাংলার সকল সুখ্যাত তাঁতকেন্দ্রে প্রস্তুত

ধুতি ০ লুঙ্গী
সার্টের কাপড়
শাড়ি
বেডকভার
ইত্যাদি

॥ সকলের রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী তন্তুজ পাবেন ॥

আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন

কলিকাতা: ২৩,গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্ক (শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত) ৪০, বাগবাজার স্ট্রীট ০ ২০৩/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ০ ১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ০ ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ০ ৯১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড ০ ৮০ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ০ ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড ০ ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট ০ ১২৮, হাজরা রোড ০ পি-৫৪৯, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর। ২৪ পরগনা: কলোনী ক্রেশিং, বারাসত ডায়মণ্ড হারবার। হুগলী: জি. টি. রোড, শিরীষতলা, শ্রীরামপুর রাজবলহাট, হুগলী ● ২০৯, শিবপুর রোড, হাওড়া। নদীয়া: সুভাগড়, শান্তিপুর। বর্ধমান: ৪৯/১, জি, টি, রোড (টাউন হল) বর্ধমান ৩৬২, জি,টি,রোড, আসানসোল। বাঁকুড়া: ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন বিল্ডিং, মাচানতলা, বাঁকুড়া। মেদিনীপুর: শিবরাজার মেদিনীপুর ০ এন, টি, ই ১৬৫, গোলবাজার, খড়্গপুর। পশ্চিম দিনাজপুর: ষ্টেশন রোড, রায়গঞ্জ। জলপাইগুড়ি: মার্চেণ্ট স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি।

॥ সুতাও পাওয়া যায়:

সেণ্ট্রাল সেল ডিপো:

তন্তুজ

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন: ৩৫-০৬৪৬

Progressive/SH- 2/67

'আর তাতে করে আমাকে অনেক দূরে বেড়াতে নিয়ে যাবি তো?'

'হুঁ'—রোজ নিয়ে যাব?'

দিদি বললে, 'ছাই! তখন দিদির কথা মনেই থাকবে না। আমাকে মোটরে চড়ালে তোর বউ তখন রাগ করবে।'

'যাঃ!'—খোকন জানে, ছোট ছেলেদের বউয়ের কথা বলতে নেই।

'কিন্তু তুই তো আর আমার মতো কালো বিচ্ছিরি নয়। তুই পুরুষ মানুষ। তোর ঠিক বিয়ে হয়ে যাবে, বউ আসবে—দেখিস।'

'ধ্যাৎ।'

খোকা লজ্জা পেলো। দিদি চুপ করে রইল আবার।

'খোকা!'

'আঁ?'

'তুই চাকরি করলে আমাকে একটা ভালো শাড়ী কিনে দিবি?'

'অনেক শাড়ী কিনে দেব দিদি। বাক্স ভর্তি করে।'

'হুঁ'—তোর বউ দিতে দিলে তো। সব নিজে নিয়ে নেবে।'

খোকা ভারী অস্বস্তি বোধ করল। ঘুরে ঘুরে একই কথা বলছে দিদি। আর যখন বলছে, তখন দিদির গলা কেমন অন্য-রকম হয়ে যাচ্ছে। একেবারে ভালোই লাগছে না খোকার।

'ধ্যাৎ—বিয়ে আমি করবই না।'

দিদি খিলখিল করে হেসে উঠেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

ভীড়—মানুষ আলো-রিকশা-মোটর-ভীড়, ভীড়। বুড়ো রিকশওলা একটু একটু করে এগোচ্ছে তারই ভেতর দিয়ে। বাতাসে আরো ঘন হয়ে উঠেছে ধূপের গন্ধ। বাচ্চাদের হাতে বেলুন উড়ছে, ভেঁপু বাজাচ্ছে কেউ। বেলুন কেনবার কথাটা আর একবার দিদিকে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হল খোকার—কিন্তু দিদির দিকে তাকিয়ে এখন যেন বলতে সাহস হচ্ছে না আর।

'খোকা!'

'আঁ?'

'আমি চাকরি করলে বেশ হত না-রে?'

'বেশ হত, দিদি। ওবাড়ীর কীর্থি-মাসীও তো চাকরি করে।'

'কীর্থিমাসি তো বি-এ পাশ। সেই-জন্যে চাকরি পেয়েছে।'

'তুই কেন বি-এ পাশ করলি না দিদি?'

দিদি খোকার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তারপর বললে, 'আমার যে লেখা-পড়ায় একদম মাথা নেই রে। ক্লাস ফাইভে দু-বার ফেল করলুম, তখন মা বললে, খুব হয়েছে, আর দরকার নেই।'

'মা সব সময় গোলমাল করে—না দিদি?'

দিদি কিন্তু সায় দিল না। খোকার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'না-রে, মার কোনো দোষ নেই। সত্যিই লেখাপড়া আমার হত না।'

'হলে কিন্তু তুই চাকরি করতে পারতিস। আর চাকরি করলে অনেক শাড়ী কিনতে পারতিস।'

'আর টুটুনের বাবার মতো চাকরি হলে একটা মোটরও কেনা যেত—না?' দিদি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। কিন্তু খোকা এবার লজ্জা পেল না—কী একটা বুঝল অথচ বুঝল না—বিমর্ষ মনে চুপ করে রইল কেবল। দিদির সেই খুশিটা কখন যেন বেসুরো হয়ে গেছে।

'দিদিমণি, কলেজ স্কোয়ার—' জানান দিয়ে রিকশ থামালো বুড়ো। ওরা নামলে দিদি হাতের ছোট ব্যাগটা থেকে একটাকার একটা নোট বের করে দিলে, ভাঙানি নিলে। তারপর বললে, 'আয় খোকা।'

ভীড়-ভীড়-ভীড়। কত লোক, কী আলো, কত বড়ো প্যান্ডাল এগোনো যায় না—এত মানুষ চারদিকে।

'আমার হাত ধরে থাক খোকা, শক্ত করে।'

প্যান্ডাল তখন ঢাকের বাজনায় উতরোল। ধুনোর ধোঁয়ায় যেন মেঘ তৈরী হয়ে গেছে। তারই ভেতরে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে ধুনুচির আগুনের ফুলকি। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, অন্তত দু-জন আরতির নাচ নাচছে ওখানে।

কিন্তু এগিয়ে যেতে যেতেও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। প্রথমটায় গোলমালে খেয়াল করেনি, এবার স্পষ্ট কানে এল কে যেন দিদির নাম ধরে ডাকছে। 'রেবা—এই রেবা।'

দিদি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'এই যে রেবা, কেমন আছিস?'

হাসিখুশি একটি মেয়ে। কী ঝলমলে শাড়ী পরনে, গায়ে কী সব চকচকে গয়না, আর কী সুন্দর—কী সুন্দর দেখতে! টুটুনের মেজদির চাইতেও দেখতে ভালো।

মেয়েটি আরো সামনে এগিয়ে এল।

'কি রে চিনতে পারছিস না?'

'ইলা!'

ইলা হাসল। বললে, 'যাক, মনে পড়েছে তা হলে! সেই স্কুলে একসঙ্গে পড়তুম—বারো বছর হয়ে গেল, না-রে?'

দিদিও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু ইলার সামনে কী যে কুৎসিত দেখালো দিদির হাসিটা! হঠাৎ খোকার মনে হল, দিদি সত্যিই দেখতে খারাপ—খুব খারাপ।

দিদি কেমন বোকার মতো বললে, 'তা অনেকদিন হয়ে গেল বইকি। ভালো আছিস ইলা?'

'ভালো আর আছি কোথায় ভাই? এম-এ পড়তে পড়তে পায়ে শেকল পড়ল—সেও তো দু বছর হয়ে গেল। এই যে আমার কর্তাটি।'

লম্বা-চওড়া চেহারার এক ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত তুলে নমস্কার করল দিদিকে। দিদি যেন থতমত খেলো একটু। মুখটা ঘুরিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে।

'আচ্ছা ভাই, আসি আজকে। অনেক দূরে যেতে হবে আমাদের।'

ইলা হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদি সময় দিল না। খোকার হাত ধরে সোজা হাঁটতে লাগল উল্টো দিকে: 'চল্ খোকা, দেরী হয়ে যাবে আমাদের। মা বকবে।'

চমকে খোকা বললে, 'বা-রে, ঠাকুর দেখাই হল না যে।'

'হবে আর একদিন।'

দিদির গলায় স্বরে একটা কিছু ছিল, খোকা কথা বলতে পারল না। ভীড় ঠেলে, তাকে টানতে টানতে এখান থেকে যেন পালিয়ে চলল দিদি।

তাদের পাড়া অন্ধকার। ইলেকট্রিক খারাপ হয়ে গেছে।

আশে-পাশে ঢাকের শব্দ, হাওয়ায় ধুনোর গন্ধ, যেদিকে তাকাও আকাশ অনেকটা পর্যন্ত আলো হয়ে তারাগুলোর দিকে উজ্জ্বলে উঠেছে। এখানে অন্ধকার। বাড়ীর জানলায় জানলায় কোথাও কোথাও এক-আধটা মোমবাতির আভা কাঁপছে—কোথাও লন্ঠনের লালচে আভাস। তাতে পথটা আরো অন্ধকার—আরো অচেনা ঠেকছে। খোকার হঠাৎ মনে হল, যেন এই রাস্তায় তারা ছাড়া আর কেউ নেই—ওই পুজো, ওই আলো, ওই সব আরতি থেকে অনেক দূরে কোথায় একটা কালো রাত্রির মধ্যে তাদের ঠেলে দিয়েছে কেউ।

বেলুন আর কেনা হয়নি, সেকথা সে বলতেই পারেনি দিদিকে। এখন তার হাত দিদির মুঠোর ভেতরে। মুঠো কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে, খোকার লাগছিল।

চলতে চলতে, শকনো খসখসে গলায় দিদি বললে, 'অন্য পাড়ায় পুজো না দেখতে যাওয়াই ভালো— না-রে খোকা?'

খোকা জবাব দিল না। জবাব খুঁজে পেল না।

একটু পরে দিদি বিড়বিড় করে বললে, 'এই অন্ধকারটা বেশ ভালো—না খোকা? এর মধ্যে ইচ্ছে করলেই হারিয়ে যাওয়া যায়।'

ভয়ে কান্না এল খোকার। ডাকল: 'দিদি!'

দিদি যেন কেমন করে হাসতে চেষ্টা করল। বললে, 'না-রে না, তুই হারাবি কেন? তুই যে পুরুষ মানুষ।'

'দিদি—দিদি, তুই হারিয়ে যাবি না তো?'—একটা গোঙানির মতো উঠল খোকার গলায়।

দিদি শুধু উত্তরে বললে, 'চল্ খোকা, বাড়ী চল্।'

গৃহপ্রবেশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'এই শাড়িটা আবার কবে কিনলে?' বাঁকা চোখে তীর ছুঁড়ল মন্দিরা।

অদিতি সরল সাজবার চেষ্টা করলঃ 'বা, সেই সেদিন তো কিনলাম।'

'সেদিন আবার কবে?'

কাছাকাছি একটা তারিখের আভাস দিল অদিতি। 'বা, তুইও তো সঙ্গে ছিলি।'

'সেটার পাড় তো এটার চেয়ে অনেক ছোট—'

'কী যে বলিস! তুই-ই তো পছন্দ করে দিলি।'

'আমি পছন্দ করে দিলাম? এই ক্যাটকেটে চওড়া পাড়? কী বিচ্ছিরি ড্যাবডেবে চোখে তাকাচ্ছে পাড়টা! এ তোমাকে মোটেও মানায় না।'

মানায় না? গায়ে একটা লঘু হিল্লোল তুলে আয়নায় নিজেকে দেখল অদিতি। আহত অভিমানের সুরে বললে, 'কেন এ তো বেশ 'সোবার'। জমি তো শাদাই আছে—'

'মোটেই 'সোবার' নয়, ভীষণ লাউড। মোটেই সম্ভ্রান্ত দেখায় না।'

কী রকম দেখায়? খরা-জ্বলা রোদের মত? লকলকে আগুনের মত? না কি বিহ্বল পূর্ণিমার মত? অদিতি জানতে চাইল না। বিরক্ত মুখে বললে, 'এ তোর বাড়াবাড়ি।'

'মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। সব ব্যাপারেই একটা মাত্রাবোধ আছে। যখনকার যেমন। তুমি দিনকে দিন বুড়ো হচ্ছ, না কচি হচ্ছ?' বুড়ো-কথাটা বুঝি একটু কঠিন হল, তাই নরম করবার চেষ্টায় মন্দিরা বললে, 'তোমার বয়স বাড়ছে না কমছে?'

কে জানে কী হচ্ছে আয়নায় বঙ্কিম রেখা ফেলে তাকাল অদিতি। প্রতিবিম্ব কী বলছে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল না। আর কিছুই নয়, শুধু সময় চলে যাচ্ছে। আর সব যেখানকার যা ঠিক থাকে, সময়ই কেবল উড়ে পালায়। তাই অদিতি আপোষের সুরে বললে, 'তুই তাহলে বেছে দে কোনটা পরব।'

'তুমি নিজেই জানো কোনটা সঙ্গত হবে।' মুখ ফেরাল মন্দিরা।

রাগ করে নরুন পাড় ধুতি পরতে পারত কিন্তু তাতে আবার নতুন করে তর্কের ঝামেলায় পড়তে হবে। তার চেয়ে ইণ্ডিপাড় একটা বাবুধুতিই ভালো।

'এই দ্যাখ এবার হয়েছে?'

হয়েছে কি না হয়েছে খুঁটিয়ে দেখতে চাইল না মন্দিরা। অভিভাবকের সুরে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'সিনেমায়। বাড়তি একটা টিকিট ছিল—তুই তো গেলি না। কী, যাবি?'

'না। আমার অন্য কাজ আছে। বলি বাড়তি টিকিটটা কী করবে?'

'দেখি সঙ্গী পাই কিনা, নইলে বেচে দেব।'

'সঙ্গী ঠিক পাবে।' বইয়ের উপর আরো বেশি ঝুঁকে পড়ল মন্দিরা।

'হ্যাঁ, নিচের ফ্ল্যাটের রাধাদি বলেছিল যাবে—'

একটু সাজতে দিতে আপত্তি। রুটিনের বাইরে একা একা বেরুতে দিতে বাধা! ঘড়ির কাঁটার এদিক-ওদিক হলেই প্রশ্ন। দিনকাল সত্যিই কী রকম বদলে যাচ্ছে! এখন বুঝি অদিতিই মেয়ে আর মন্দিরা অভিভাবক।

প্রথমে অদিতি তো একেবারেই শাদা হয়ে গিয়েছিল—শূন্যময় শুভ্রতা—তখনই ঐ সাজবদল দেখে মন্দিরাই তো বেশি অস্থির হয়েছিল—বাপের মৃত্যুতে তত নয় যত মায়ের এই মরুভূমি হয়ে যাওয়ায়।

আশেপাশে আর পাঁচজন আত্মীয়ও সায় দিয়েছিল—আজকাল কে আর অমন উৎকট শাদা হয়ে থাকে, কিন্তু মন্দিরাই বলেছিল অন্তরঙ্গ কথা, বলেছিল, বাবা তো তোমাকে ওসব কিছুই ছাড়তে বলেনি—

চমকে উঠেছিল অদিতি।

বলেছিল, যেমনটি আছ তেমনিই থাকবে। হাত-গলা খালি করতে পারবে না। হ্যাঁ, রঙিন শাড়ি পরতে না চাও ভালো শাদা শাড়ি পরবে, পাড়ে কার্পণ্য হতে দেবে না। প্রফুল্ল মল্লিকাটি হয়ে থাকবে।

শুধু মন্দিরার কান্নাকাটিতেই আপোষে রাজি হয়েছিল অদিতি। ছোট পায়ের শাদা শাড়ি পরেছে, দু হাতে সরু সুগোছি সোনার চুড়ি ও গলায় মুক্তো-হার রেখেছে। সিঁথি অকপট শুভ্র। ঠোঁট অকপট শুষ্ক।

মন্দিরার তখন বয়স কত? স্কুলে-পড়া টিঙটিঙে ফ্রকের মেয়ে। বয়স এগারো-বারো।

আর আজ?

আজ মন্দিরার বয়স পঁচিশ ছোঁর-ছোঁর। মেয়ে-কলেজের লেকচারার। কত দিনেরই বা তার মাস্টারি, এরি মধ্যে গলায় কী শাসনের ঝাঁজ এসেছে। ভঙ্গিতে-প্রকৃতিতে কী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সন্দেহের কাঁটা, কী কুণ্ঠিত রুক্ষতা।

সব ফিরে আসছে। এতকাল চোখে-চোখে রেখেছে মেয়েকে। একটুও বাড়তি বিলাসিতা করতে দেয়নি। ফিরতে কেন দেরি হল, কোথায় গিয়েছিল, সঙ্গে কে কে ছিল তার-তন্ন করে খোঁজ নিয়েছে। জেরায় পরিষ্কার না হলে গোয়েন্দাগিরি করেছে। রেখার বাইরে এতটুকু যেতে দেয়নি। সেই সব সিনেমায় যেতে দিয়েছে যা কিনা বিজ্ঞাপনের ভাষায় মা আর মেয়ে একসঙ্গে বসে দেখতে পারে। কিছু খামের চিঠি পর্যন্ত খুলে পড়েছে। কোন চিঠির মধ্যে কায়দা থাকা সম্ভব সেটা আঁচ করে নিতে দেরি হয়নি। এমন কি ব্যাগ পর্যন্ত হাটকেছে। একটা আস্ত ঘরের নিরালা নিভৃতি পর্যন্ত দেয়নি।

কিন্তু যোগফলটা দেখবে তো! মন্দিরা বি-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে।

মন্দিরা শুধু দীপশিখাই নয়, স্থির বিশুদ্ধ নির্ধূম দীপশিখা।

বি-এর পরেই হাতের মুষ্টি শিথিল করে দিয়েছিল অদিতি। মেয়ের এখন বুদ্ধিশুদ্ধি স্থির হয়েছে, আর টিন-এজার নয়, এখন নিজের চোখেই খানা-খন্দ দেখে চলে যেতে পারবে ঠিক-ঠিক।

দুটো বছর ক্লাশ আর লাইব্রেরি বই আর নোট নিয়ে হন্যে হয়ে উঠেছিল। খুন চেপে গিয়েছিল এম-এতেও ফার্স্ট ক্লাস নিতে হবে। ঠিক নিয়ে নিল। অদিতি শুধু শাসনই করেনি, শুশ্রূষা করেছে।

এখন তো দেখা যাচ্ছে অদিতির শাসনই শুশ্রূষা। তার সমস্ত আদেশই উপদেশ।

সেই মেয়ের কিনা এখন এই প্রতিক্রিয়া!

এম-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরা মেয়ে-কলেজে অধ্যাপিকা হয়েছে। বেশ তো, এখন নিজের ইচ্ছেমত পাত্র বেছে নে না, অদিতি কোনো মতামত দিতে আসবে না, মতামত দিতে চাইলেও বা তুই গ্রাহ্য করবি কেন? তুই রোজগেরে সাবালক মেয়ে, তুই সাগরে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড় না, তোকে কে আটকাবে? কার সঙ্গে তুই মিশিস না মিশিস, কে তোর মনোনয়নের এলাকায়, আমি কি তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই, উঁকিঝুঁকি মারি? এদিকে বলে বেড়াস বিয়ে করবিনে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম একটারও উত্তর পর্যন্ত দিতে দিলিনে, অভদ্রতায় চূড়ান্ত করলি। তোর চলা-বলা দেখে এও তো মনে হয় না তুই প্রাণা-ট্রানা হয়ে গেছিস। তুই তোর ইচ্ছেমত চল না, কে বারণ করছে—আমাকেও চলতে দে।

'আবার বেরুচ্ছ বুঝি?'

কেন, আমার বেরুতে কী দোষ? আমারও তো ইস্কুলের মাস্টারি আছে, তাই নিয়ে অফিস আছে, লেখালেখির ঝামেলা আছে, বোর্ডের মিটিং আছে, আমার বাইরে বেরুনোটা এমন কী বেমানান! আর যদি দেরিও হয় ফিরতে, সেটা কারু কাছে কোনো জবাবদিহির বিষয় হয় না।

'দাঁড়াও তোমার পাউডারটা ঠিক করে দি।' মন্দিরা নিজের আঁচলে অদিতির ঘাড় গলা পালিশ করে দিল।

তার মানে সুন্দর সাজবার ব্যাকুলতায় অদিতি যেন বেশি প্রসাধন করে ফেলেছে। এ বুঝি তার সেই আবেগের অমিত-ব্যয়িতাকে শাসন করা।

তারপর সেদিন তো স্পষ্ট বললে, 'মা তুমি লিপস্টিক মেখেছ?'

'লিপস্টিক?'

'তোমার ঠোঁট লাল দেখছি।'

'লাল? একটা পান খেয়েছিলাম।'

'পান খেয়েছিলে? পান তো আগে খেতে না।'

'আহা, পান খেলে কী দোষ! মুখটা তেতো লাগছিল, সবাই বললে—'

'সবাই বললে!'

হ্যাঁ, কী করবে অদিতি, জগৎনিয়মের কী কৌশলে কে জানে ফের নবীন হবার ডাক এসেছে তার মাঝে। বিশ্বজগতের অন্তরের চিরন্তন সম্পদই তো নবীনতা, হঠাৎ এক সূর্যোদয়ে তার হাতে সেই সম্পদ কে উপহার দিয়ে গেল। ডাক পড়ল বিকাশের উৎসবে। একটা মরাকাঠ হয়ে ছিল সেটার হঠাৎ মুকুল ধরাবার রোমাঞ্চ জাগল, ক্রমে ফুল ফোটাবার শিহরন। দেখল সে ফুরোয়নি। এখনো ফুরোয়নি, অঙ্গার হয়েও সে আলো দিতে পারছে। বলো নিজেকে নতুন করে নারী বলে ভাববার লগ্ন এলে তাকে সে ব্যর্থ করে দেবে? মেঘে ইন্দ্রধনু যদি দেখা দেয় তবে কি তাকে সে মুছি দিয়ে মুছে ফেলবে? অপূর্ব যদি তার দরজায় এসে দাঁড়ায় সে কি তার অভ্যর্থনায় অনির্বচনীয় হবে না?

'তুমি বুঝি রেস্তরাঁয় গিয়েছিলে?'

'কে বললে?'

'ক্যাশমেমো দেখলাম। চিকেন কাট-লেট—'

'ক্যাশমেমো?'

'এই তো।'

তার মানে মায়ের ব্যাগও ঘাঁটছে মন্দিরা।

'ও এই? হ্যাঁ, স্কুলের শিক্ষিকারা মিলে গিয়েছিলেন রেস্তোঁরায়।'

'আর তুমি খাওনি? তুমি খাওনি?'

'খেলে কী হয়?'

আগে মায়ের চেহারায় কেমন একটা শান্ত মহিমা ছিল—কী সৌম্য স্তব্ধ শ্রী! এখন কেমন যেন একটা চটুলতার দ্যুতি খেলা করছে সর্বাঙ্গে। এ মাকে একেবারে মানায় না। মায়ের যে এত বড় মেয়ে, বাইরে এ পরিচয় দিতে অস্বস্তি বোধ করে—দেখায় যেন দিদি আর ছোট বোন।

কিন্তু দেহ যদি অকস্মাৎ শ্রীতে লতায়িত হয়ে উঠতে চায় অদিতি কী করবে? তার সাধ্য নেই গাম্ভীর্যের পাথর চাপা দিয়ে এ প্রাণনির্ঝরধারাকে ঠেকিয়ে রাখে।

'তুমি ঐ আধবুড়ো লোকটাকে যে কী বলে প্রশ্রয় দাও ভেবে পাইনে।'

'আধবুড়ো তুই কাকে বলছিস?'

'আমার ভুল হয়েছে সে একজন ছোকরা।'

'কার কথা বলছিস নাম বলবি তো?'

'আহা, বুঝতে পাচ্ছ না—'

'মিস্টার ভাদুড়ির কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ, যার ছেলে সমীরণেরই বয়স প্রায় সাতাশ—'

'তা আমিও তো আধবুড়িই, আমার মেয়েও তো এই পঁচিশে পা দিল—তা যাই হোক, ভদ্রলোক সম্পর্কে মানা করে কথা কইবি তো?'

'ও তোমার কাছে কেন আসে?'

'সমীরণ তোর কাছে আসে না?'

'সে তো মাঝে মাঝে নেহাৎ গল্প করতে আসে।'

'অনাদিবাবুও তেমনি গল্প করতে আসেন।'

'শুধু গল্প?'

'হ্যাঁ, বলতে বাধা কী, একটু সেবা পেতে আসেন। বিপত্নীক একা মানুষ—'

'তুমি এমনি করে বাবার নাম ডোবাবে?'

'আমি আর কদিন!' অদিতি আর্ত অথচ রুষ্ট কণ্ঠে বললে, 'শিগগিরই মরে যাব। তুই তোর বাপের নাম উজ্জ্বল করিস। সমীরণ তো বেশ কৃতী ছেলে—'

'মা, তুমি একথা বলছ?'

সমীরণ যখন প্রথম বেল টেপে তখন মন্দিরাই দরজা খুলে দেয়।

একেবারে সরাসরি নিক্ষেপ। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

মন্দিরা সতর্ক হয়ে এক পাশে সরে গিয়ে বললে, 'আমার মা বাড়ি নেই।'

'না থাকুন, তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। আমি তো আপনার মার কাছে আসিনি, আপনার কাছে এসেছি।'

'না। মা আসুন মার কাছে আসবেন।'

'আপনার মার কাছে আমার বাবা এসে গেছেন।'

'আপনার বাবা?'

'মিস্টার অনাদি ভাদুড়ি। আমরা ওপরের ফ্ল্যাটে আছি।'

'জানি।'

তারপর ওকে ভিতরের বসবার ঘরে না নিয়ে আসার মানে হয় না।

'এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসায় আপনি বোধহয় বিব্রত হচ্ছেন, কিন্তু দেখুন, এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয়নি বলে আমাদের আলাপ হবে না এ নেহাৎ সেকেলে ব্যবস্থা। যাকে সিঁড়িতে প্রায়ই দেখি, দেখি রাস্তায়, বাসস্টপে—'

'আমার চোখে পড়েনি তো!'

'চোখে পড়েছে নিশ্চয় কিন্তু তাকিয়ে দেখেননি। কিন্তু এ সব অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে আমরা প্রতিবেশী, আমাদের আলাপ হওয়া দরকার।'

'কত প্রতিবেশী তো বিদেশের থেকেও দূরে থাকে।'

'তাদের কথা ছেড়ে দিন। আমি সে দলে নই। অবশ্যি আপনি যদি সে দলের হন তো বলুন আমি উঠে চলে যাব।'

তবু কেন কে জানে সমীরণকে চলে যেতে বলতে পারেনি মন্দিরা। বরং ভেবেছে এক কাপ চা করে খাওয়ানো যায় কিনা। ছেলেটার চার পাশে এমন একটা ঝটঝটে পরিচ্ছন্নতা আছে যে কিছুতেই আপাত্ত করা যায় না—ঘন মেঘ দূরের কথা, একটু ছায়ারও আভাস আনে না বাক্যালাপে। ওঠবার আগে হাসিমুখে বললে, 'আমার কথা সবই তো আপনাকে বললাম, মানে, কোথায় কী কাজ করি, কত মাইনে, আমার কী সব খেয়াল-অভ্যেস!'

ছেলেটা যেন চাকরিতে ইনটারভিউ দিতে এসেছে। কিন্তু চাকরিটা কী?

তারপর আরো দেখা হয়েছে, দেখা হলে একটু কোন না হাসতে হয়েছে মন্দিরাকে। বিরক্তও হয়েছে মাঝে মাঝে যখন সিঁড়িতে আটকেছে, সংকুচিত হয়ে বাধা দিতে চায়নি, কিংবা যখন লিফট দিতে চেয়েছে গাড়িতে। সেদিন কলেজ থেকে ফেরবার সময় ভরা বৃষ্টিতে তো গাড়ি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল।

পরদিনই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সমীরণ।

'এর কোনো মানে হয় না বৃষ্টির কলকাতায় গাড়ি রিফিউজ করে দেওয়া। গাড়ি তো আমি নিজে চালাচ্ছিলাম পিছনে কেউ ছিল না, আপনাকে তো আর আমার পাশে বসতে হত না—'

'মোটেই সে জন্য নয়, আমার সঙ্গে আরো মেয়ে ছিল—'

"আমার ইচ্ছে করছিল আপনাকে জোর করে তুলে নিই গাড়িতে।'

'আপনার কী সাহস!'

'শরীরের সাহসে যে কুলোবে না তা আমি জানি, তাই একটা সম্পর্কের সাহস আনা যায় কিনা। যখন আর আপনার 'না' করবার মত সাহস থাকবে না।'

'তার মানে?'

'তার মানে আই অফার মিসেলফ্ য়্যাজ এ ক্যানডিডেট ফর দ্য পোস্ট অব—'

এমনভাবে বলল যে মন্দিরা না হেসে পারল না।

'দেখুন সরাসরি প্রস্তাবটাই সবচেয়ে সাধু। প্রেম-ট্রেম করার মত অত ঘুরপথে যাবার আমার ধৈর্য নেই। চাকায় তেল দিয়ে সময় না কাটিয়ে একেবারে রশি ধরে টান মারাই ভালো।'

'কী বলতে চান আপনি?'

'মানে দ্রুতই বলে ফেলি। স্পষ্ট সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই সুখের। মানে, আপনাকে আমার খুব পছন্দ। দেখতে-শুনতে আমাকেও আপনার নর্ম্যালি পছন্দ করা উচিত। দেখতে-শুনতে মানে আমার তার্‌পা আমার চাকরি মাইনে প্রসপেকটস, আমার বাবা—'

'আপনার বাবা?'

'সেটাও নিশ্চয় একটা ক্যোয়ালিফিকেশন। আজকাল বাড়ি আর গাড়িই তো মেয়েদের প্রধান আকর্ষণ। আমার বাবার গাড়ি তো আছেই আর বাড়ি আছে দিল্লীতে, আরেকটা হচ্ছে কলকাতায়। অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিস, রিটায়ার করতে আরো পাঁচ-ছ বছর বাকি। আর আমিই বাবার একমাত্র উত্তরাধিকারী—'

'তাতে হল কী?'

'কিছু হল না?'

'না। এই আপনার দ্রুত বলে ফেলা?'

'আশানুরূপ দ্রুত হচ্ছে না, না? মানে,

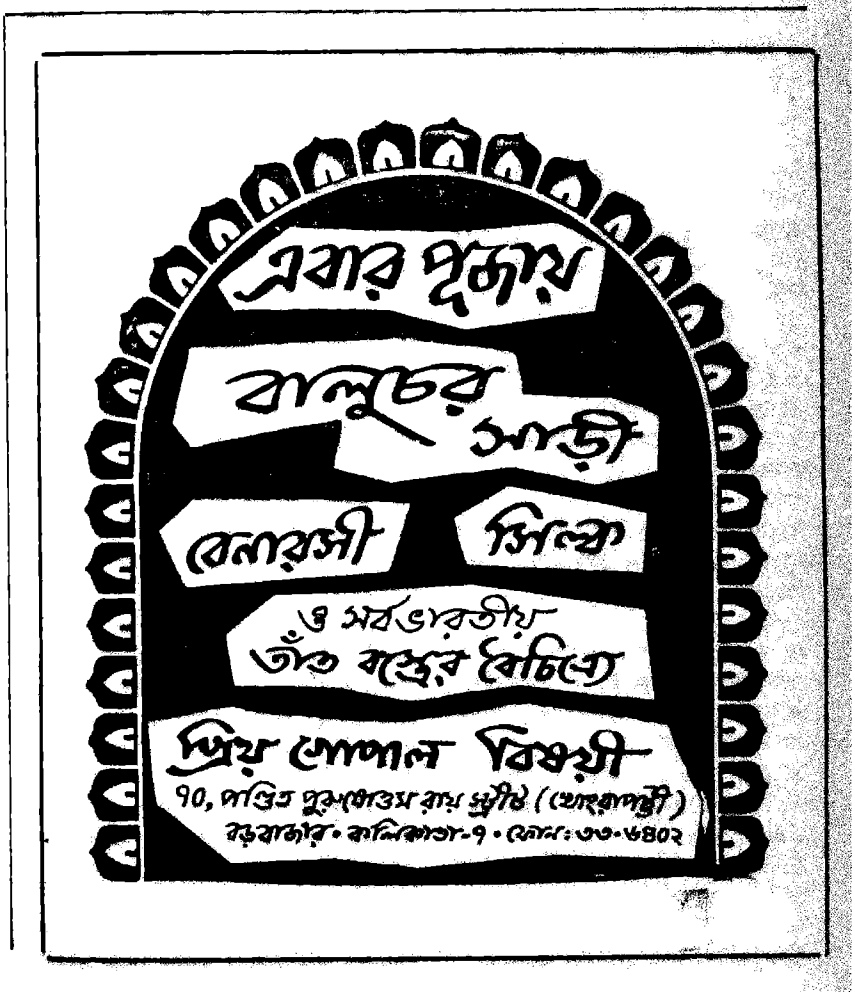

এক কথায় আপনার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করতে চাই।'

'প্রস্তাব যখন তখন মায়ের কাছে গিয়ে করুন।'

'বা, আমি তো আপনার মাকে—আই মিন— সে যে করবার করুক—'

'কী বলতে চান আপনি?' মন্দিরা সহসা ফোঁস করে উঠল।

'বলতে চাই আপনার মার কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করলেও শেষ পর্যন্ত আপনার মতামতই কার্যকর হবে। তাই আপনার মতটাই আগে যাচাই করে নিচ্ছি।'

'আমার মত নেই।'

'বাস, চুকে গেল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ওদিকে আর ঝঞ্ঝাট রইল না। কিন্তু কেন যে আপনার মত নেই—'

'আপনি একটা ছোকরা অফিসর, বয়সে বালক—'

'ছি ছি ছি, আমি ছোকরা? আমি একটা ফার্মের একজিকিউটিভ অফিসর, বারো শ টাকা মাইনে, আমাকে আর ছোকরা বলা চলে? তাছাড়া আমি আপনার চেয়ে বড়, তবে বালক হলাম কোন হিসেবে?'

'মোট কথা, আপনাকে দেখলে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয় না, করুণা হয়।'

'বেশ, এবার থেকে তবে করুণা করে আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'এই প্রত্যাখ্যানের পরেও আবার আপনি আসবেন নাকি?'

'কেন আসবনা? এটা তো প্রেম নয় যে ভেঙ্গে দেবার পর ক্ষোভ থাকবে। এটা তো সম্বন্ধের প্রস্তাব। এমনি কত প্রস্তাব হয়, আবার ভাঙে। তাতে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হবে কেন?'

'আমাদের আবার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি?'

'মানে এই প্রতিবেশিতার সম্পর্ক। দুটো মানুষ একই সময়ে একই পৃথিবীতে বেঁচে আছি এটা একটা মহৎ সম্পর্ক নয়?'

'আচ্ছা তবে এস।'

অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল সমীরণ।

কিন্তু সেদিন যা কান্ড করে বসল তা আরো অদ্ভুত। যা যুক্তি দেখাতে চাইল তা আরো বিকট।

অনাদিনাথের প্রবেশ সমীরণেরও আগে। এবং আরো সদর্পে। সে বেল টিপল না, কড়া নাড়ল।

'কে?'

'আমি ল্যান্ড য়্যাকুইজেশনের অনাদিনাথ ভাদুড়ি। তেতলার লেফট-উইং ফ্ল্যাটের নতুন ভাড়াটে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।'

না খুলে দিয়ে পারল না অদিতি। লোকটা পরিচ্ছন্ন সকাল, স্বর সম্ভ্রান্ত, ভঙ্গিমা সৌহার্দময়।

'নমস্কার।'

অদিতি দেখল দীর্ঘকায় সবল পুরুষ, চোখে সাহিত্য উজ্জ্বলে। আর অনাদি দেখল বকেলের আলো পড়া মঞ্জরিত বল্লরী।

মানচিত্রটা মুহূর্তে হদিস করে নিল অনাদি। বললে, 'বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই?'

'না, আমি আর আমার মেয়ে।' মন্দিরাকে ডাকল অদিতি।

'আমরাও আমি আর আমার ছেলে। স্ত্রী আজ দশ বছর গত। আপনার?'

'মন্দিরার বাবা মারা গেছেন বছর পনেরো হবে।'

মন্দিরা শুদ্ধ করে দিল: 'চোদ্দ বছর তিনমাস।' দেয়ালে টাঙ্গানো বাবার ছবির দিকে চোখ তুলল।

তারপর বাপ-মাদের যেমন অভ্যেস, যার যার ছেলে-মেয়ের প্রশংসা করতে লাগল। অনাদি সমীরণের, অদিতি মন্দিরার। তারপর এমন ভাব করল যেন এই সফলতা তাদেরই গুণের অর্জন।

কিন্তু কথায় কথায় যেটা আসল কথা হয়ে দেখা দিল সেটা হল জমি। শহরতলির অঞ্চলে বিরাট একটা মাঠ ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে বিক্রি করা হচ্ছে। ভাগ আর বিলি সমস্ত অনাদির কর্তৃত্বে। অদিতি দেবী যদি ইচ্ছে করেন তবে একটা পাঁচ কাঠার কর্নার প্লট তাঁকে দেওয়া যেতে পারে।

অদিতি লাফিয়ে পড়ল। জমি! তার কত দিনের স্বপ্ন, একটি ছোট সুন্দর বাড়ি হবে, তার স্থায়ী স্বাধীন আশ্রয়। হঠাৎ চাকরির মধ্যদিনে স্বামী মারা গেল—কত টাকা আর রেখে যেতে পেরেছে। তবু যা কুড়িয়ে-কাচিয়ে পেয়েছে রেখে দিয়েছে ব্যাঙ্কে। স্বামী-স্ত্রীর নামে যে জয়েন্ট একাউন্ট খোলা ছিল সেই একাউন্টে। পারতপক্ষে সে টাকায় হাত দেয়নি। মেয়ের বিয়ে আছে, শেষ জীবনের আশ্রয় একটি গৃহনির্মাণ আছে। কিন্তু কোথায় কে মুরুব্বি যে জমির হদিস দেবে, বাড়ি তৈরির ঝামেলা পোয়াবে?

'কাঠা কত করে?'

'শস্তায় করে দিতে পারব।'

'তাহলে তো দারুণ সুখের হবে। কিন্তু আমার যা কপাল, শেষপর্যন্ত হলে হয়।'

'হবে না কী! আমি আছি আর হবে না?' সর্বনিয়ন্তা ভাগ্যের সুরে কথা বলল অনাদি।

আরো অনেক গল্পসল্প করে উঠে যাবার সময় অনাদি বললে, একদিন আমার আফিসে যাবেন, স্কিমের প্ল্যানটা দেখে আসবেন।'

বাড়িতে বসে দেখা যায় কিনা এমনি একটা প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল অদিতি কিন্তু বলতে বাধল। কী এমন আত্মীয়তা আছে এ দাবি করবে। প্রথম আলাপেই যে ভালো একটা খবর নিয়ে এসেছে এই তো আশাতীত।

কিন্তু মন্দিরা কিছুতেই অনুকূল হয় না। ওসব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

'তুই বলতে চাস ভদ্রলোক আমাকে ঠকাবে? যা বলছে তা সত্য নয়?'

'না, তা বলছি না। ভদ্রলোক সত্যিসত্যি গণ্যমান্য নির্ভরযোগ্য। অনেক পরসা অনেক প্রভাব, কিন্তু আমি বলছি জমি-টমির মধ্যে না ঢোকাই ভালো।'

'তোর কী! তুই তো বিয়ে করে পরের ঘরে চলে যাবি, আমার কী হবে, আমি থাকব কোথায়?'

'আমি বিয়ে করব না।'

'বিয়ে করব না মুখে বলা সোজা কিন্তু কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে কখন কী করতে হয় কেউ বলতে পারে না।'

'তুমি দেখে নিয়ো।'

'আমি দেখে নিয়েছি! বিয়ে যদি না করিস তবে তো মায়ে-ঝিয়ের আরো বেশি আশ্রয় দরকার।'

'তাই বলে ও গ্রামের মধ্যে কে থাকতে যাবে?'

'আহা, আগে দেখি না। পছন্দ না হয় না করে দেব। আর কিনলেই সেখানে বাড়ি করে থাকতে হবে এমন কী কথা আছে? পরে বেশি দরে বেচেও দিতে পারি।'

'তুমি এতও ভাবতে পার।'

'না ভাবলে চলবে কেন? মানুষের যা ভাবনা সবই অনাগতের ভাবনা। তবু আমাদের ভার লাঘব করবার জন্যে ভগবান ভাদুড়িকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

সেই থেকে সেই সব পরামর্শ নিয়ে ঘনিষ্ঠতা। আফিসে-ইস্কুলে যাওয়া-আসা। মোটরে ঘোরাঘুরি। থেকে থেকে নির্জনতার দীর্ঘশ্বাস।

'চলুন একদিন জমি দেখে আসবেন। বাস-স্টপের চেয়ে চার-পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। রাস্তাঘাট তৈরি, ইলেকট্রিকও কতক রাস্তায় এসে গেছে, অনেকে বাড়িও তুলছে—অল্প কয়েকটা প্লটই বাকি ছিল। দৈবানুগ্রহে মিলে গেছে আপনার জন্যে—' অদিতির দিকে তাকাল অনাদি।

'চলুন দেখে আসি।'

দূরে বই-নিয়ে-বসা মন্দিরাকেও ডাকল অনাদি: চলো তুমিও চলো।'

'চল না।' প্রতিধ্বনি করল অদিতি।

'না।'

'এ মেয়ে একেবারে সৃষ্টির ধার। কোনোকিছুতেই রস নেই রুচি নেই ফূর্তি নেই। খালি বই আর বই। মেয়ে নিজেও যেন বই, রুক্ষ ফ্যাকাসে রং-চটা—'

কিন্তু অদিতির জীবনে নতুন ঠিকানা থেকে নতুন ডাক এসে পৌঁচেছে। তার মধ্যে যে এত অবান্ত অন্ধ আনন্দ ছিল এ সে জানত না কোনোদিন। যেন ছায়াবৃত অরণ্য সহসা মর্মরমুখর হয়ে উঠেছে, বিনা প্রতিধ্বনিতে এ শিহরনকে সে ফিরিয়ে দেবে না। ভেবেছিল তার সমস্ত ফুল ঝরে গিয়েছে, সে যে নতুন ফুলকে ফোটাবার জন্যে, তা কে জানত। মাটির প্রদীপ সমস্ত দিন অবহেলে পড়ে থাকে কিন্তু দিনান্তে সে প্রাণ পায়। অদিতির দিনের অন্ত হয়নি, তার অবিষ্কারের অনেক জগৎ এখনো অনধিগত। নিজের রহস্যে নিজেই সে এখনো রঙিন।

'জমিটা কিনবেই ঠিক করলে?' জিজ্ঞেস করল মন্দিরা।

'পনেরো হাজারে পাঁচ কাঠা। এ ছেড়ে

ছাড়ে? তাছাড়া ভাদুড়ির জমির গায়ে। কত বড় আশ্রয়।'

'টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুললে?'

'নইলে কোথায় পাব? সবই তো ব্যাঙ্কে।'

'বাবার টাকার অর্ধেক কিন্তু আমার।'

'অর্ধেক কেন, পুরোই তো তোর। আমার আর কে আছে? সব তো তুইই পাবি।'

'দলিল কার নামে হবে?'

'ভাদুড়ি বললে আমার নামে হলেই হাঙ্গামা কম।'

অদিতি আজকাল মিস্টার ভাদুড়ি বলে না, শুধু-ভাদুড়ি বলে।

প্ল্যান-হাতে বাড়ি ঢুকে অদিতি দেখল বাইরের ঘরের টেবিলের উপর দুটো খালি চায়ের কাপ পড়ে আছে। ঝি এসে কাজে লেগেছে বটে কিন্তু প্রথমেই কাপ দুটো সরায়নি।

'কে এসেছিল রে? চা খেয়ে গেল। সমীরণ?'

'তাকে চা খেতে দেবে না আরো কিছু? এসেছিল তোমার ভাদুড়ি।' পাশের ঘর থেকে বললে মন্দিরা।

'কেন? সে এসেছিল কেন?'

'এসেছিল টাকা চাইতে। বললে প্ল্যান স্যাংশন করাতে আরো নাকি টাকা লাগবে।'

'টাকা লাগবে। কই আমাকে তো কিছু বলেনি।'

অদিতি গম্ভীর হল। টাকা লাগবে তো মেয়ের কাছে বলা কেন? মেয়ে তো সম্পত্তি সম্পর্কে উদাসীন। মেয়ে তো জমিটাও একবার দেখল না, প্ল্যানে চোখ বুলোলো না। টাকা তো অদিতির। মেয়েকে এর মধ্যে টানা কেন?

অদিতি আফিসে গিয়ে ধরল ভাদুড়িকে। আরো টাকা লাগবে নাকি?

'তোমার খোঁজ করতে গিয়ে মেয়েটার কাছে পড়ে গেলাম। তাই টাকার জন্যে তোমাকে এক্ষুনি দরকার এমনি একটা ধোঁকা সৃষ্টি করতে হল।'

'বললে কিনা প্ল্যান-স্যাংশনের জন্যে আরো টাকার দরকার।'

'তার মানেই তো ধোঁকা। আরো টাকা লাগে তো আমিই ম্যানেজ করতে পারব।' হাসল অনাদি: 'কি, পারব না?'

অদিতিও হাসল।

কিন্তু শূন্য দুটো চায়ের পেয়ালা কেন? স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অদিতি—মেয়ে তাহলে সম্মানিত অতিথিকে সংবর্ধনা করতে শিখেছে।

দেখতে দেখতে নতুন বাড়ি উঠল অদিতির। সুশ্রী একতলা বাড়ি সামনে বাগান। একেবারে স্বপ্নে দেখা স্বপ্নে আঁকা, ছবির চেয়েও অপরূপ।

'আমি থাকব না ওখানে। হস্টেলে চলে যাব।'

'তা যাস, কিন্তু একবার দেখে আসতে দোষ কী।'

মন্দিরার ইচ্ছে হল বলে, ও তো বাড়ি নয়, ও কুঞ্জ—ওখানে কে যায়? কিন্তু অত কঠিন কথা মুখে আনতে পারল না। বিশেষত এখনো কোনো স্পর্শসহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। আগে মায়ের গৃহপ্রবেশ হোক। গতিবিধি লক্ষ্য করা যাক, দেখা যাক পরিস্থিতি।

তাই কাটাবার মত করে বললে, 'যাওয়া যাবে একদিন। ব্যস্ত কী।'

কিন্তু সমীরণ যা হঠাৎ কাণ্ড করে বসল ব্যস্ত না হয়ে উপায়ান্তর রইল না।

হঠাৎ পিছন থেকে এসে মন্দিরার গলা জড়িয়ে ধরল। বললে, 'আর তোমার ভাবনা নেই। উত্তরাধিকার সূত্রেই তোমার আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে। কিংবা আমার তোমাকে।'

'কী অসভ্য!' এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করল মন্দিরা। 'কী বলতে চাও?'

'বিয়ের কথাটা নতুন করে পাড়তে চাই।'

'কথা ছিল না ও কথা আর তুলবে না?'

'কী করবো, কথাটা আইনে তুলেছে।'

'আইনে তুলেছে! মানে?'

'উত্তরাধিকার আইন। ল অব সাকসেসন। আমার বাবার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি, তোমার মায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী তুমি।'

'তাতে কী হল?'

'আমার বাবা আর তোমার মার বিয়ে হচ্ছে। সেই উত্তরাধিকার সূত্রে আমার আর তোমারও বিয়ে হবে।'

'ও'দের বিয়ে হচ্ছে?' দুচোখে মন্দিরা অন্ধকার দেখল।

'হ্যাঁ, নোটিশ পড়ে গেছে। ওদের যখন হচ্ছে তখন আইনের বলে আমাদেরও হবে। তোমার মা যখন আমার বাবার, তুমিও তখন আমার। এ তো সোজা আইন, সিম্পল রাইট অব ইনহেরিট্যান্স।'

'মূর্খ।' মন্দিরা ধিক্কার দিয়ে উঠল: 'তোমার বাবা যদি আমার মাকে বিয়ে করেন তবে আমাদের সম্পর্কটা কী হয়? আমরা ভাই-বোন হয়ে যাই না?'

'ওসব বাজে কথা। ফিকশন! ইতিহাসের কোনো ধারায় রক্তের সম্পর্ক নেই, হুট করে আমরা ভাই-বোন হয়ে গেলাম? যত সব আজগুবি ট্র্যাশ!'

'আইনের বই খুলে দেখ বিয়ে হয় কিনা।'

'তবে এক কাজ করি এস না। ওদের আগেই আমরা বিয়ে করে ফেলি। এখন তো আর আমরা ভাই-বোন নই, কেউ নই, জাস্ট একটা ছেলে আর মেয়ে—এখন আমাদের বিয়ে করতে তো বাধা নেই, চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়ি—রেজিস্ট্রারকে হাত করতে কতক্ষণ?'

'আমাদের বিয়েতে যদি ওরা নিরস্ত না হয়, যদি আমাদের পরেও ওরা বিয়ে করে, ওদের বিয়ের ফলে আমরা আবার সেই ভাই-বোন হয়ে যাব।'

'য়্যাবসার্ড। ওরা যা খুশি করুক গে, মরুক গে, এস আমরা আমাদের পথ দেখি।'

'তুমি তোমার নিজের পথ দেখলেই আমি খুশি হব।'

'কিন্তু তুমি এই সোজা ল-পয়েন্টটা বুঝবে না এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আমি একজন উকিল নিয়ে আসব।'

'খবরদার! তোমার সঙ্গে কী কথা ছিল? কথা ছিল না তুমি বিয়ে নিয়ে কথা তুলবে না?'

'কিন্তু এমন একটা ল-পয়েন্ট পেলে ছেড়ে দিই কী করে? আচ্ছা, এখন যাই, পরে আবার আসব।'

সমীরণ চলে যেতেই সবলে দরজা বন্ধ করে দিল মন্দিরা।

দেয়ালে যেখানে বাবার ছবি টাঙানো তার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে। সে কান্না সে নিয়ে গেল বিছানায়, অন্ধকারে। এ সংসারে বাবার আবার মৃত্যু হবে এ শূন্যতা সে বইবে কী করে!

দু দিন ধরে আস্তে-আস্তে জিনিসপত্র সরে যাচ্ছে নতুন বাড়িতে, দেয়ালের ছবিগুলিও চলে গেল, গৃহপ্রবেশের দিন সকালে পুজোর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে শেষ চলে গেল অদিতি।

মন্দিরা ভাবছে বাবার ছবিটা নতুন বাড়ির কোন ঘরে না জানি টাঙানো হবে?

মন্দিরার কোনো জিনিসই যায় নি। তার জিনিসই বা কী—একটা সুটকেসে শাড়িজামা আরেকটা ট্রাঙ্কে বই। সে তার কলেজের হোস্টেলে সাময়িকভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, পরে কোথাও মিতু হবে।

সে কিছুতেই মায়ের বাড়িতে থাকবে না।

মা যেমন জেদী মেয়েও তেমনি জেদী। মা যেমন হঠকারী মেয়েও তেমনি হঠকারী।

অনাদিনাথ বললে, 'একেবারে মায়ের মেয়ে।' পরে আশ্বাস দিল অদিতিকে: 'সকালে পুজোয় আসে নি, না আসুক। বিকেলে তো ফাংশান, আমি ঠিক নিয়ে আসব।'

বিকেলেও এল না। সন্ধ্যায়ও না। তখন অদিতিই চিন্তিত হয়ে পুরনো বাড়িতে ফিরল। নিচে সিঁড়ির মুখে রাস্তায় সমীরণ দাঁড়িয়ে।

'তোমার বাবা কোথায়?'

'প্লেনে কানপুর চলে গিয়েছেন।'

'মন্দিরা?'

'তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। না, বলতে ভুল হল, মন্দিরাই বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ভেগেছে।'

'এ কী অন্যায় কথা!' প্রায় ছাইয়ে-কাঁদো মুখে দ্রুত পায়ে উপরে উঠতে লাগল অদিতি।

'প্রচণ্ড অন্যায়।' সমীরণও সঙ্গ নিল। বললে, 'দু দুটো প্রকাণ্ড চড় মেরে গেল মন্দিরা—একটা আমার গালে আরেকটা আপনার গালে। বয়েসটা যে ফিকশন এ পর্যন্ত সে মেনেছে কিন্তু রিলেশানশিপটাও যে ফিকশন এটা মানবার মতো এখনো সে প্রোগ্রেসিভ হয় নি।'

অদিতি শূন্য ঘরে শূন্য টেবিলের উপর একটা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেল। তাতে পেন্সিল দিয়ে লেখা—'যে কেউই এটা কুড়িয়ে পাও, জেনো, এছাড়া সব দিক রক্ষা করার আর পথ ছিল না। যদি পারো, আশীর্বাদ কোরো।'

মর্যাদার প্রশ্ন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিসেস চাকলাদারকে অবশ্য খুব দোষ দেওয়াও যায় না। এসব তো মেয়ের বাবারই দেখার কথা। অন্তত তাঁর সেই রকম ধারণা। এ তো সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার। এটাও কি তাঁকে দেখতে হবে? তাহলে পুরুষের, হেড অফ দ্য ফ্যামিলির,—বাড়ির কর্তার, সর্বোপরি সন্তানের পিতার দায়িত্বটা কি? শুধু টাকা রোজগার করে আনা? সেটাও তো আজকাল মেয়েরা করছে। এই তো মিসেস চাকলাদারই করছেন। হ্যাঁ, হয়তো মিঃ চাকলাদারের মতো ষোলশ' টাকা আনতে পারছেন না মাসে মাসে—তবু আনছেন তো! আর এমনই বা কম কি! সব মিলিয়ে মাসিক ছশো টাকা তো আনেনই।

সৌরভ চাকলাদারের তরফেও অবশ্য বলবার কিছু আছে। একটা আধা-বিলাতী ফার্মের কলকাতা শাখার তিনি একজিকিউটিভ হেড—অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তা। অবশ্য খাস ইংরেজসাহেব একজন আছেন, তাঁর নীচে একজন পাঞ্জাবী সাহেব মিঃ সুদ এবং মারোয়ারী ডিরেকটার শ্রীচুড়িয়ার অর্বাচীন ভাগ্নে মিঃ ঢনঢনিয়াও আছেন—এঁরা পদবীতে সকলেই তাঁর ওপর। কিন্তু কাজ তো ওঁদের দিয়ে কিছু হয় না। ওঁরা শুধু আপিসের শোভা, ঘর-জোড়া করার মানুষ। যেমন আজকালকার ড্রয়িং-রুমে খান-দুই করে আধুনিক কিম্ভূতকিমাকার ছবি রাখতেই হয়—নইলে বাড়িওয়ালার সুরুচির পরিচয় দেওয়া যায় না—তেমনি আপিসেও এমনি দু-চারজন কর্মহীন কর্তা না রাখলে চলে না। কাজের মানুষ বলতে যে মিঃ চাকলাদার একমাত্র, তা বোর্ডের সকলেই জানেন, ডিরেকটাররা কেউ কলকাতায় এলে তাই আলাপ-আলোচনা যা-কিছু মিঃ চাকলাদারের সঙ্গেই করেন।

এত বড় আপিসের যত কিছু দায়িত্ব তাই সৌরভ চাকলাদারকেই বহন করতে হয়—একা। একটা পরামর্শ করবেন কারও সঙ্গে, সে লোকও নেই। আর বর্তমানকালে একটা বড় আপিস চালানো যে কতখানি কঠিন —তা কাজের লোকমাত্রেই জানেন। অন্তত—যারা এই শহরে কাজ-কারবার করে খায় তারা—সকলেই স্বীকার করবে। আপিস বলতে তো শুধু মিশন রোর ওপরে সাড়ে সাতশো বর্গফুটের এই ঘরটুকুই নয়—সেই সঙ্গে দমদমের কারখানাও ধরতে হবে। আর সেই তো আসল। বোম্বের কারখানা থেকে দশ আনা কাজ হয়ে আসে—বাকী ছ'আনা সারা হয় এইখানেই। এইখান থেকেই 'ইম্পার্ণ রিজিয়নে' মাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা। সে সব তাঁর ওপর—সমস্ত দেখাশোনার ভার। ফলে 'লেবার'দের যত কিছু লাঞ্ছনা ও ফৈজৎও তাঁকে সইতে হয়। আর সে তো বলতে গেলে নিত্য বরাদ্দ হয়ে উঠেছে। এই তো সেদিনই দল বেঁধে এসে আপিসে হানা দিয়ে কী কাণ্ডটাই না করে গেল। চেয়ার-টেবিল ফাইল সব তছনছ করে, টেলিফোনের রিসীভারগুলো আছড়ে ভেঙে ও'দের মানে ওপরওলাদের গালমন্দ দিয়েও শান্তি হল না—একজন এসে মিঃ চাকলাদারের টাই ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে—'সমঝোতা'র জন্যে। আপিসের স্বার্থে সে অপমানও মুখ বুজে সইতে হল, এদের দিয়েই কাজ করাতে হবে, মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। এদের পেছনে বড় বড় লোকরাই আছেন—এদের তাতালে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি। তা সে যাই হোক—সব ঝড়টা তো তাঁকেই সইতে হল—কৈ, সাহেবকে কি মিঃ সুদকে তো কেউ একটা কথাও বলল না। প্যারেলাল ছোকরা অবিশ্যি দূর থেকে ওদের আসতে দেখেই পালিয়েছিল—পাছে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে তার 'ম্যাচ' দেখাটা না হয়। কিন্তু সে থাকলেও তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না—লেবাররা সবাই বুঝে নিয়েছে যে, আসল চাবিকাঠি মিঃ চাকলাদারের হাতে, মালিক তিনিই। ওরা সব ঘরসাজানো ফার্নিচার ছাড়া কিছু নয়।

তা ধরুন, সকাল আটটায় সামান্য ব্রেক-ফাস্ট করেই বেরোতে হয় মিঃ চাকলাদারকে —প্রত্যহই। ফিরতে যার নাম সেই রাত আটটা। সকলের আগে আফিসে যেতে হয় তাঁকে—সকলে চলে আসার পরও এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা থাকতে হয়। নইলে কাজ গুছনো যায় না। এমনিতেই তো বাবুরা বড় একটা কলম ধরেন না—তার ওপর তিনি যদি ফাইলপত্র সেরে না রাখেন তো তাঁদের বলবারও খুব সুবিধা হয়। কলম না ধরবার অজুহাত পেয়ে বেঁচে যান তাঁরা। তাছাড়া, মিঃ চাকলাদারের একটা রোগও আছে এ ব্যাপারে, তা তিনি সরলভাবেই স্বীকার করেন। কোন কাজেই কারও ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন না। বহুবার ঠকে ও ঠেকেই এটা হয়েছে অবশ্য—কোন ফাইলই নিজে একবার না দেখে ছাড়তে ভরসা পান না তিনি! আসবার চিঠি বা কাগজপত্র, তাঁর সেক্রেটারীই অনায়াসে 'ডীল' করতে পারেন—সেগুলোও তিনি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে তবে ছাড়েন। দায়িত্ব যাকে বহন করতে হয় ষোল আনা— তার এসব বাতিক জন্মাতে বাধ্য।

এই তো তাঁর জীবন।

'ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন' যাকে বলে—

কদাচিত কোনদিন হয়ত একটু আগেই কাজ সারা হয়ে যায়, অবসর মেলে নিজের দিকে তাকাবার। কিম্বা রবিবারগুলোয়—তাও সব রবিবার নয়, হয়ত বিকেলের দিকে ছুটি পান—কিন্তু সেই দুর্লভ অবসর-গুলোতে স্বভাবতই একটু ক্লাবে যেতে ইচ্ছে হয়। মানুষের সামাজিক জীবন বলে একটা কথা আছে তো, শুধুই তো সে আর পয়সা রোজগার করা যন্ত্র নয়। আর সে যে শুধু নির্ভেজাল আমোদ-প্রমোদ করতেই যান সেখানে তাও তো নয়। এখনও অনেক সাহেব-সুবো আসেন ক্লাবে, আসেন বড় বড় সাহেব-ঘেঁষা লোকরা—তাঁরা যে দয়া করে মিঃ চাকলাদারকে তাঁদের সমপর্যায়ের লোক মনে করে মেশেন—সেই তো একটা মহা-সৌভাগ্য। আর তার ফলে কিছু-কিছু কাজও হয় বৈকি! ক্লাবে না যাতায়াত থাকলে সেসব লোকের দেখাই পেতেন না—কাজ বাগানো তো দূরের কথা!

তবু, তিনি মেয়ের প্রতি কোন কর্তব্যটা না করেছেন। মেয়ে যে তাঁর লা মার্টিনিয়ারে ঢুকতে পেরেছিল—তার বাইরেও ভাল ভাল জায়গায় ভর্তি হয় নাচে-গানে পেন্টিংএ; ডিবেটিংএ খেলাধুলোয় চারিদিক দিয়ে এমন একমপ্লিশড হয়ে উঠেছে—সে কি প্রধানত মিঃ চাকলাদারের প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রচেষ্টারই ফল নয়? হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীই সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, ভর্তি করানো, আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি বাস্তব তথ্যের দিকগুলো তাঁকেই দেখতে হয়েছে সত্য কথা—এসবের 'আইডিয়া'ও প্রধানত তাঁর, রবিবারগুলো যে এমনভাবে মিউজিক লেসন-এ ডান্সিং লেসন-এ ও ভাষা শিক্ষায় 'ইউটিলাইজ' করা সম্ভব—তা হয়ত মিঃ চাকলাদারের মাথায় যেত না। কিন্তু কল্পনা ও কাজ তো আর এক নয়। খোঁজখবর করা, ভাল জায়গাগুলো খুঁজে বার করা, চিঠি-চাপাটি করা, বড় বড় লোকদের ধরে সুপারিশপত্র আদায় করা, এগুলো কি তাঁকে করতে হয় নি? মিসেস চাকলাদারও অবশ্য একটা মেয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কিন্তু সে নিতান্তই এক দেশী এবং প্রাইভেট কলেজ—তাঁর দ্বারা এত সুপারিশ সংগ্রহ করা, এতটা 'প্রভাব বিস্তার করা' সম্ভব হত না।

অবশ্য তাঁরা দুজনেই যে খুব ব্যস্ত মানুষ, তা তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেন। সুতরাং এ ব্যাপারেও পরস্পরকে খুব একটা দোষারোপ করতে চান না তাঁরা। মিসেস চাকলাদার বরং স্বামীর থেকেও ব্যস্ত থাকেন সর্বদা। তাঁর সামাজিক জীবন আবার তাঁর স্বামীর ঠিক বিপরীত। মিঃ চাকলা-দারের দায়িত্ব শুধু তাঁর আপিসের—স্ত্রীকে বহু লোকের দায়িত্ব বহন করতে হয়—বহুবিচিত্রও। আমোদ আহ্লাদ করার কথা ভাবতেই পারেন না তিনি। বাজে ফুর্তিতে নষ্ট করার মতো তাঁর এক লহমাও সময় নেই। সংসার ও চাকরির বাইরেও একটা জীবন আছে তাঁর। তিনটে-চারটে সমিতির তিনি কর্ম-পরিষদ বা পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য—কোথাও বা জয়েন্ট সেক্রেটারী, কোথাও বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এছাড়া কলেজেও নানান ধরনের কাজ করতে হয় তাঁকে। শুধু পড়ানো বা শুধু ভর্তি প্রভৃতি আপিসের কাজ নয় (সেটাও কম নয় অবশ্য, প্রিন্সিপ্যাল দুটি দুরূহ ভারই তাঁর ওপর চাপিয়ে রেখেছেন, মেয়ে ভর্তির সময় এক-একদিন মাথা খারাপ হবার দাখিল হয়—তেমনি ঝঞ্ঝাট রুটিন ঠিক করা! ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন কী খাটুনি!), মেয়েদের ইউনিয়ন গড়ে তোলা—চালানো, কলেজ-ম্যাগাজিনের সম্পাদনা—এর বেশির ভাগ কাজই তো তাঁর মাথায়। এছাড়া খাতা দেখা কলেজের-বিশ্ববিদ্যালয়ের —তাতেও সময় বড় কম যায় না। আবার সম্প্রতি অধ্যাপিকা-দের একটা ছোটখাটো ইউনিয়ন হয়েছে—তিনি তারও প্রেসিডেন্ট। ফলে তাঁর দিন শুরু হয় স্বামীর ঢের আগে থেকেই, ভোর পাঁচটায়—শেষ হয় কোন দিন রাত এগারো-টায়, কোনদিন বা বারোটায়।

তবু সংসারের দায়িত্ব একেবারে যে ঝি-চাকরদের ওপরই এলিয়ে দিয়ে রেখেছেন তাও তো নয়। মিঃ চাকলাদার যে এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন—এতদিন পেরেছেন—তার জন্যে অনেকখানি কৃত-জ্ঞতাই তিনি দাবি করতে পারেন। এদিকে যেমন বাইরের কাজ—বৃহত্তর মহিলাসমাজের সেবা করে গেছেন, নিজের চাকরি বজায় দিয়ে গেছেন—তার আনুষঙ্গিক হাজারো ঝঞ্ঝাট বহন করেছেন—তেমনি সংসারের দিকেও কড়া নজর রেখেছেন। দাসী-চাকর-দের প্রয়োজন মতো ধমকানো, রান্নার নির্দেশ দেওয়া, বাজারের হিসেব নেওয়া এবং লোকজন অতিথি-অভ্যাগত এলে কীভাবে চলতে হবে, কীভাবে বলতে হবে—পাখী-পড়ানোর মতো করে শিক্ষা দেওয়া—কোন্‌টা না করেছেন?

এছাড়া, মেয়েকেও দেখতে হয়েছে তাঁকেই। হ্যাঁ, মানছেন তিনি যে, ব্যক্তিগত-ভাবে খুব একটা দেখাশুনো করার সময় পান নি। তবু দৃষ্টি রেখেছেন এটা তো ঠিক। মেয়ের সমস্ত সময়টা যদি অমন নিরন্ধ্র কর্মসূচীতে ভরিয়ে না দিতেন—তাহলে তারও কি ঐ তাঁর ভাইঝি মুকুলের অবস্থা হত না। কতদিন তিনি বলেছেন ভাই আর ভাজকে যে, অমনভাবে ঝিয়ের হাতে মেয়ের চরিত্র গড়ে উঠতে দিও না। তাছাড়া আর কি বলবেন ও ব্যবস্থাকে! ভাই না হয় ব্যস্ত মানুষ, দেশী ফার্মে চাকরি করে—সরকারী আপিসের মতো সবটাই ফাঁকি দিলে চলে না, তার ওপর অত বড় নামকরা স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারী সে—কিন্তু বৌদি তো একেবারেই বেকার। সকালটা রেডিও শুনে, কাগজ পড়ে এবং হাই তুলে কাটে, দুপুরটা কাটে ঘুমিয়ে—

তারপর বিকেল হলেই বেরিয়ে পড়েন, এ-পাড়া-ওপাড়া, এর বাড়ি ওর বাড়ি করে ঘুরে বেড়ান, কম পক্ষে সপ্তাহে চার দিন সিনেমা দেখেন—এই তাঁর বাঁধা প্রোগ্রাম। ফলে রাত দশটার আগে কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারেন না, ফেরেন না আরও ইচ্ছে করেই কারণ দাদার আরও রাত হয়—কিন্তু তার ফলে মেয়েটির যে সর্বনাশ হচ্ছিল তা কেউই লক্ষ্য করে নি, মিসেস চাকলাদার ছাড়া। মেয়ে যখন ইস্কুল-কলেজ থেকে বাড়ি ফিরত তখনই তার মা বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন যখন তখন মেয়ের শুতে যাবার সময়—সেই বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সঙ্গ বা সাহচর্য বলতে যা পেত, তা কতক-গুলি ঝিয়ের। গ্রাম্য অশিক্ষিত দাসী কতক-গুলি। ওদের একটি—কিন্তু খালি বাড়ির সুযোগে পাড়ার একাধিক ঠিকে-ঝিয়ের আড্ডা ছিল ওদের বাড়িতে। তাদের সঙ্গে গল্প না করলেও তাদের গল্পগুজব কানে যেতে কোন বাধা ছিল না—মেয়ে যে একেবারে মুখ বুজে থাকবে—তাও কিছু সম্ভব নয়, আর কথা কইতে গেলে ওদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া উপায় কি? আসত মাঝে-মাঝে হয়ত এক-আধজন বন্ধু—কিন্তু সে আর কতটুকু। ফল যা হবার তাই হল। অমন পদ্মফুলের মতো সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—বাবা যখন ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকা করছে—পাড়ার একটি 'লোফার' ছোকরা, পাশের বাড়ির বাচ্চুদের প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে রেজেস্ট্রি-বিয়ে করে বসে রইল। ছিটেবাঁশের এক জীর্ণ বাড়ি ভরসা, ছটা ভাইবোন, কাজ না কর্ম না—একটা পাসও করে নি, বাবা গানের টিউশানী করে সংসার চালায়, তাও তার শিক্ষা ফিল্মের গানে সীমাবদ্ধ—এই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ও'র দাদাকেই পরোক্ষে সেই মেয়ে-জামাই পুষতে হচ্ছে এখন। কী করবেন, নিজের মেয়ে—একমাত্র সন্তান, ফেলে তো দিতে পারেন না! সে জামাই আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না—তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা হওয়া ছাড়া।

তাই বলে—এই দেখে যে তিনি সতর্ক হয়েছেন, তা নয়। এ ঘটনা তো বলতে গেলে সেদিনের। তিনি এর পাঁচ বছর আগে থেকেই মেয়ের কর্মব্যস্ততার ছক বেঁধে দিয়েছেন। তিনি নিজে শিক্ষার জগতে আছেন, বহু মেয়েই দেখেছেন, দেখছেনও। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' এ-কথার সত্যতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তিনি যদি এই দুর্ঘটনার পরিচয় না দিতেন তাহলে আজ আর এই মেয়ে নিয়ে এত গর্ব করতে হত না মিঃ চাকলাদারকে। ঐ মুকুলের অবস্থাই হত এরও।

কিন্তু তার আগে ঘটনাটা খুলে বলাই ভাল।

শোভনা চাকলাদার সব দিক দিয়েই আধুনিক, কেবল একটি দিক ছাড়া। মেয়েদের বেশী দিন অবিবাহিত রাখা পছন্দ করেন না তিনি। তাঁর কথা হল 'টোয়েন্টি জ দ্য লিমিট'! কুড়ির বেশী কিছুতে না। মেয়েদের কুড়ি—ছেলেদের পঁচিশ, বড় জোর ছাব্বিশ। অবশ্য তিনি বলেন এইটেই বেশী আধুনিক—এই মনোভাব। যাদের আদর্শে আমরা জীবনযাত্রার কাঠামো তৈরী করছি আজকাল—যাদের নকলে চোঙা ট্রাউজার, ছুঁচলো জুতো বা উল্কি আঁকা জামা গায়ে দিচ্ছি—তাদের দেশে নাকি বিয়ের গড়বয়স দাঁড়িয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে সতেরো, মেয়েদের পনেরো। আরও আগে নাকি বিয়ে করছে ছেলেরা। ইউরোপেও নাকি এ হাওয়া চালু হয়ে গেছে, কেবল বিলেতেই এখন ততটা নামে নি, তবে খুব দেরি আছে বলেও মনে হয় না।

যাই হোক—মেয়ে বি-এসসি পরীক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মিসেস চাকলাদার। ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের জবাবেই এই সম্বন্ধ আসে। ও'রা পুরো নাম দেন নি—ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষ থেকে ফোনই করেছিল একজন কে মিঃ ঘোষ, এস ঘোষ বলে পরিচয় দিয়েছিল। বলেছিল তার এক বন্ধু আছে তার জন্যেই ফোন করছে সে, মেয়ের আইডিয়াল পাত্র, যেমনটি ও'রা চান' পাত্রের বাবা নেই, এক ছেলে, সুতরাং দাদা বা অভিভাবকের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আত্মীয় যাঁরা আছেন—পাত্র তাঁদের আত্মীয় বলে রেকগনাইজ করতে চায় না। তারা কেউই দুর্দিনের বান্ধব নয়, সুসময়ের ভাগীদার, প্যারাসাইটে। সুতরাং ছেলে নিজেই বরকর্তা। সে নিজে গিয়ে কথাবার্তা বলতে চায়। না—তেমনি এও আশা করে না যে, ও'রা এসে দেখা করবেন। যদি পাত্র সম্বন্ধে আপত্তি না থাকে— কোন মাঝামাঝি জায়গায় মীট করতে পারে। যাকিছু তার তরফে বলবার অবশ্য সে-ই বলবে। সিনেমার, কিম্বা সম্প্রতি য়্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর হলে যে প্রদর্শনী হচ্ছে সেখানে—অথবা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রাউন্ডসে—যেখানে খুশি।

কী করে ছেলে? তার উত্তরে ওপার থেকে জবাব এসেছিল, 'ওখান থেকে ফিরে এসে বছর দুই হল কোর্টে বেরোচ্ছে। এখনই বেশ ভাল উপার্জন দাঁড়িয়ে গেছে, বছরে পনেরো থেকে ষোল হাজার 'রাফলি'! অতি প্রিয়দর্শন ছেলে, যথার্থ স্মার্ট। স্বভাব-চরিত্রও যতদূর সম্ভব ভাল, গুড়ি-গুড়ি ধরনের ভাল ছেলে নয় অবশ্য, তবে কোথাও কোন দাগ নেই। তবে সেসব কথা এখন অবান্তর, সে রেফারেন্স বিস্তর দেওয়া যেতে পারবে, আগে তো প্রাথমিক কাজটা হোক, চাক্ষুষ পরিচয়টা।

অর্থাৎ ছেলে ব্যারিস্টারী পাস করে 'বার'-এ যোগ দিয়েছে। যা বলল ঐ ঘোষ, তার এই অর্থই দাঁড়ায়। খুশী হয়েছিলেন মিঃ চাকলাদার। ইঞ্জিনীয়ার পাত্র চেয়ে সবাই পাগল—কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে, এরপর ওদের অন্ন হবে না। ছেলে যদি যথার্থ ট্যালেন্টেড হয়—তার 'সাইন' করার সবচেয়ে ভাল ক্ষেত্র হচ্ছে 'বার'। তারপরে ডাক্তারী লাইন। ডাক্তারীতে নাম করলে অবশ্য পয়সা ঢের—কিন্তু খাটুনিটাও অমানুষিক। তার চেয়ে 'বার'ই ভাল। আর, চেষ্টা করলে মিঃ চাকলাদারই তো তাকে মাসে হাজার টাকার কেস দিতে পারবেন। 'বারে'র দৌলতে তাঁর প্রভাব যা ইন-ফ্লুয়েন্সের সীমা তো কম বিস্তৃত নয়।

ও'রা দেখা করতে আগ্রহী শুনে পাত্রের তরফ থেকে সাহেব-পাড়ার এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় চায়ের নিমন্ত্রণ এসেছিল। তাতে আরও ইমপ্রেস্‌ড হয়েছিলেন ও'রা। ছেলেকে দেখে ততোধিক। স্মার্ট, এলিগ্যান্ট, কালচার্ড কথাবার্তা চমৎকার, ইংরেজীতে জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা নেই—তবে যেটুকু বলে শুদ্ধ উচ্চারণ। পোশাক দামী এবং রুচিসম্মত। চায়ের বিল মিসেস চাকলাদারেরই দেবার কথা, অসীম —ছেলেটির নাম অসীম মজুমদার, কিছুতেই দিতে দিল না। শুধু তাই নয়, শোভনা চাকলাদার লক্ষ্য করলেন—পুরো দশ টাকাই টিপ্‌স্ দিল সে বয়দের।

এরপর, 'কতদূর লেখাপড়া শিখেছ' এবং 'কী করো'—এই মামুলী প্রশ্নের কথা মনে ওঠা সম্ভব নয়। ও'রা সেইদিনই সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে। সেটাও 'ম্যাটার অফ ফর্ম' মাত্র। মেয়ে যে পাত্রের পছন্দ হবে, আর মেয়েরও পছন্দ হবে এ পাত্র—তা ও'রা জানতেন। একমাত্র যেটুকু খুঁৎ-খুঁতানি ছিল মিসেস চাকলাদারের—সেটা পাত্রের বয়স সম্বন্ধে। তার বয়স নাকি আটাশ, পাত্র নিজেই স্বীকার করেছে সরল-ভাবে, গতমাসে সাতাশ পূর্ণ হয়েছে তার। মেয়ের মাত্র কুড়ি। উনিশই বলা উচিত, কারণ সে আবার মাত্র এই মাসেই কুড়িতে পড়েছে।

তবে এই একটিমাত্র খুঁৎ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবেন—মিসেস চাকলাদার এত নির্বোধ নন। কথাটা স্বামীকে মনে করিয়েও দেন নি। বরং ছেলেটির সত্যনিষ্ঠাতে মুগ্ধই হয়েছিলেন। সে তিন বছর কমিয়ে বললেও ও'রা ধরতে পারতেন না—এত চমৎকার স্বাস্থ্য।

অতঃপর দেনাপাওনার প্রশ্ন তুলেছিলেন ও'রা। অসীম হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল একেবারে।

'কিচ্ছু না। কিছুই দেবার চেষ্টা করবেন না, প্লীজ। আমার স্ত্রীকে যা দেবার আমিই দেব। ঘর সাজাতে হলে আমিই সাজাব—আপনারা তা নিয়ে বদার করবেন কেন? হোয়াই শুড ইউ বদার? তবে আমার ইচ্ছে—অনাড়ম্বর বিয়ে, আইন মতো—তাও আমি ইনসিস্ট করতে চাই না। আপনাদের মেয়ে—এ বিষয়ে আপনাদেরও একটা বক্তব্য থাকবে, সেইটেই স্বাভাবিক।... কেবল একটা কথা, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, কিন্তু সব কথা প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল বলে আমি মনে করি—তাই স্পষ্টই বলছি, পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ চাই আমার। না না, ডাউরী নয়, আমাকে ভুল বুঝবেন না, এটা আমি ধার নিচ্ছি। সম্প্রতি কিছু টাকা একটা বিজনেসে লগ্নী করেছি—তার শেয়ারগুলো

আমি আপনাদের নামে লিখে দিতে পারি, অফকোর্স যদি মনে করেন যে তার ওয়ার্থ আছে। আমি হয়ত একটু বেশীই ঝুঁকি নিয়েছি। তবে আমার আর কি—এতকাল তো কোন দায়দায়িত্ব ছিল না—আমি আর মা, কিছু টাকা না হয় লোকসান গেলই—এই ভেবেই দিয়েছিলুম।...বিয়েটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে—তা তো ভাবিনি. তাহলে হয়ত এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতুম না। ...আমি তো মনে করি ভাল রিটার্ণই পাব—তবে জানেন তো আমাদের এ দেশে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস চাকলাদার।

এরপর আর কিছু খোঁজখবর করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি ও'রা। সে সময়ও ছিল না ও'দের। দু'জনেরই সহস্রবিধ কাজ বজায় দিয়ে যেটুকু অবসর —তা নিমন্ত্রণ ও বাজারের ফর্দ করতেই কেটে যেত। ছেলে বলেছে, কিছু দিতে হবে না, কোনকিছুরই প্রয়োজন নেই। বেশ জোর দিয়েই বলেছে. নিতান্ত মৌখিক সৌজন্য নয়—কিন্তু সে তো তার, তাদের প্রয়োজনের কথা বলেছে। তার স্ত্রীকে যা দরকার সে দেবে—উপযুক্ত পাত্রেরই কথা। কিন্তু প্রয়োজন যে তাঁদের একটা আছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুই ভিন্নজগতে বিচরণ করেন, সে দুই জগতেরই পরিধি বিস্তৃত, ক্ষেত্র বিশাল—সে জগতে তাঁদের প্রতিষ্ঠা আছে, মর্যাদা আছে।—দেওয়াটা সেইজনোই প্রয়োজন, সেই মাপে হওয়া চাই।

তাঁরা ছেলের জন্যে ছাব্বিশটা স্যুট ও মেয়ের জন্যে একশ' চল্লিশখানা শাড়ি কিনলেন। গহনাও তিন প্রস্থ অন্তত দেবার কথা—দু প্রস্থ সোনার ও এক প্রস্থ জড়োয়া —মেয়ের জন্য তা পারবেন না। ভারী গয়নাতে বিষম আপত্তি তার। জড়োয়াটাই ভাল করে খুঁটিয়ে দিলেন, সোনা মাত্র একপ্রস্থ তাও হালকা। এছাড়া একটা বড় ফ্রীজ, বড় ওয়ার্ডরোব, একটা স্টীলের ও একটা কাঠের আলমারী—দুটোতেই বেলজিয়ান আয়না লাগানো, দুটো বুক-কেস, দুটো খাট (বিছানাশুদ্ধ), দুটো ড্রেসিং টেবল, ডাইনিং টেবল ও চেয়ার,—তার সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট চায়না ডিনার সেট, টি সেট (তার সঙ্গে রুপোর কাটলিস), দুটো আলনা, ড্রয়িংরুম ও লাউঞ্জ সেট—একটি বেতের এমনি কুশন দেওয়া, আর একটা কাঠের ডানলোপিলো কুশন লাগানো, —দুটোই থিয়েটার রোড পার্ক স্ট্রীট এলাকা থেকে কেনা—এছাড়া দেশী মতে দু'প্রস্থ বাসন, থালাবাটি কাঁসার ও স্টেনলেস স্টীলের, তার সঙ্গে কিছু রুপোর বাসন, অতিরিক্ত শাশুড়ির জন্যে পুজোর বাসন কিছু (মিসেস চাকলাদারের বিশ্বাস—এখানে তিনি একেবারে অনন্য, আর কেউ এটা দেবার কথা ভাবতে পারত না)। ছেলের জন্যে রোলটপ রাইটিং টেবল, রেডিও ও টি ভি সেট (শিগ্‌গিরই কলকাতায় টেলিভিশান চালু হবে এই আশায়) ইত্যাদি। রেকর্ড-প্লেয়ার-টেয়ার বিস্তর উপহার পাবে নিশ্চয়—তাই সেদিকে আর গেলেন না—কিন্তু বাকী যা, এগুলো তো দিতেই হবে, এর কম দিয়ে কি করে পারেন তাঁরা—তাঁদের একটা মর্যাদার প্রশ্ন আছে তো।.....

ছেলের সনাতন ধরনের আশীর্বাদ বা পাকা-দেখায় ঘোর আপত্তি। ফুলের মালা পরে বোকা-বোকা মুখে আসনে বসে এক ধার থেকে প্রণাম করা পোশাবে না তার। এঁদেরও সুবিধে হল তাতে—গ্রেট-ইস্টার্ণের একটি নিভৃত ঘরে—রীতিমতো বিলিতি ধরনের বেথ্‌োটাল পার্টি দিলেন তাঁরা। তাতে মিস্টার চাকলাদারের যেমন সাহেব পাঞ্জাবী মারোয়াড়ী অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ করতে বাধা রইল না, তেমনি মিসেস চাকলাদারও অনায়াসে মিসেস ওয়াদিয়া, মিসেস কাপুর, মিসেস থাপার, লেডী ব্যানার্জিকে নিমন্ত্রণ জানাতে পারলেন। বর বিশেষ কাউকে বলে নি. মাত্র তিন-চারটি বন্ধু এসেছিল, তার মধ্যে একজনের মুখটা চেনা-চেনা মনে হল—পরে মনে পড়ল মিঃ চাকলাদারের এ ছোকরাও ব্যারিস্টার—ওঁদের আপিসেরই কি একটা মামলা করেছিল একবার।

বিয়েটা অবশ্য সাড়ম্বরে বাঙালী মতেই হল। না হলে নহবৎ বাজানো যায় না, আলো দিয়ে সাজানো যায় না। অসীম ক'দিনের মধ্যে গড়িয়াহাটে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিল—সেটাও মিঃ চাকলাদার উপযাচক হয়ে প্রীতিভোজের দিন সাজিয়ে দিলেন। বর আনার গাড়িও তিনি পাঠালেন, নইলে অসীম কিছুতে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে আসতে রাজী হবে না—তিনি বুঝেছিলেন। পুরো আড়াইশোটি টাকা পড়ল শুধু গাড়ী সাজাতেই।

এই একটা ত্রুটি রইল, গাড়ি একখানা দেওয়া হল না। অসীম অবশ্য গাড়ি একটা নাকি 'বুক' করে রেখেছে, তবে তা পেতে দেরি হবে। তার মধ্যে হাতে কিছু টাকা এসে গেলে সে একটা পুরানো মার্কিণ গাড়ি কিনে নেবে—কাজ চলার মতো। অবশ্য মিঃ চাকলাদার একটা কথা ভেবে রেখেছেন, কোম্পানী তাঁকে যে স্পেশ্যাল বোনাস দেবে বলে প্রতিশ্রুত—সেটা যদি এর মধ্যে পেয়ে যান তো তিনিই কিনে দেবেন ভাল দেখে একখানা বিলিতি গাড়ি। অমন সোনারচাঁদ জামাই তাঁর—তার গাড়ি নেই, এটা ভাবতেও ভাল লাগছে না। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে একটা মর্যাদারও প্রশ্ন আছে। তাঁর জামাইয়ের গাড়ি নেই—যে শুনবে সেই অবাক হবে।

একেবারে বৌভাতের দিন রাত্রে মিসেস চাকলাদারের মনে পড়েছিল যে, মেয়ের আসল ঠিকানাটা তিনি জানেন না। কী যেন একটা বলেছিল অসীম—কিন্তু তখন লিখে রাখা হয় নি—এখন আর কিছুতে মনে পড়ছে না।

কথাটা অসীমকে বলতে সে খুব একচোট হাসল। বলল, 'বাঃ, এতো মন্দ কথা নয়। মেয়েকে কোথায় পাঠালেন তা-ই খোঁজ করবেন না।...হাউ এভার, সে তো মুখে বলে লাভ নেই, আবারও ভুলে যাবেন, আমি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু ভাড়াটে বিয়েবাড়িতে কাগজ জোগাড় করা খুব সহজ কথা নয়, তাছাড়া তাঁরা দুজনেই বিভিন্ন দলের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেলেন—কথাটা আর মনেও রইল না। অসীম অবশ্য তার তরফের বেশী লোককে বলে নি, তাকে একটা পার্টি দিতেই হবে যখন প্রিন্সেসে—তখন ডবল খরচ করে লাভ কি। তাছাড়া অভ্যাগতদেরও উপহার দেবার প্রশ্ন আছে। যা দেবে একবারই দেবে। নইলে তাদের উপরও জুলুম করা হয়।

একেবারে পরের দিন সকালে মনে পড়ল আবার। তখনও অত ব্যস্ত হবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। অসীম নিজে এখনও ফোন পায় নি, ফোর-সিক্সটি সেভেনে যে কিছুতেই নতুন কমেকশান পাওয়া যাচ্ছে না, তা মিসেস চাকলাদারও জানেন, তবে পাশের বাড়িতে একটা ফোন আছে, তাদের সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে রফা করে নিয়েছে নাকি—দুদিকেই অর্থাৎ ফোন করা ও পাওয়া দুজনেরই সুবিধে আছে।

তাছাড়া, ওবাড়িতে লোক পাঠানো যেতে পারে। আজই কিন্তু ওবাড়ি ছাড়তে পারবে না।

কাজও ছিল বিস্তর। দুজনেরই সেদিনটা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না।

সেকাল একাল-এর শারদ উপহার প্রকাশিত হলো

সুখের বড় কাছে

শৈলেশ ভট্টাচার্য

উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু প্রেমের নানা সমস্যার দিকও আছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক মামুলী ধরনের কাহিনী বিন্যাসে আবদ্ধ থাকেন নি। প্রেমের এমন অন্তরঙ্গ চিত্র, সমস্যার গভীরতম প্রদেশে আলোক নিক্ষেপের এমন উদাহরণ সম্ভবত সংখ্যায় কম। তিন টাকা

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ ॥ ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট কলকাতা—১২

হিসেব ও পেমেন্ট-এর জের যেন মিটতে চাইছে না। তাই আবার যখন মনে পড়ল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। তখনই উঠে গিয়ে ফোন করবেন একবার—ঠিকানাটা পেলে এবং নিজেদের বাড়ি গেছে জানলে ও'দের চলে যাবেন একবার। মেয়ে দেখা ও মেয়ের বাড়ি দেখা দুই কাজ-ই হবে।

প্রথম ধাক্কা খেলেন টেলিফোনেই।

হ্যাঁ—এ নম্বর ঠিকই। কিন্তু অসীম মজুমদার বলে কাউকে তাঁরা তো জানেন না! পাশের বাড়ি? পাশের বাড়িতে এক বিধবা ভদ্রলোকরা থাকেন। অন্য পাশে? না, সেদিকে একটা নার্সারী ইস্কুল আছে।

অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে-ছেন ভদ্রা—অতঃপর যদি একটু রূঢ়ভাবেই রিসীভার রেখে দেন—কিছু বলবার নেই।

সে আবার কি! তাঁদেরই কি তাহলে নম্বরটা লিখতে ভুল হল?

মিসেস চাকলাদার বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে।

আর তখনই মনে পড়ল ও'দের—জেলের নম্বর দেওয়া থাকলেও—তাদের কখনও অফিসে ফোন করার প্রয়োজন হয় নি। প্রয়োজন বুঝে ঠিক সময় মতো সে বা তার বন্ধু ঘোষ নিজেরাই ফোন করেছে আগে।

আর দেরি না করে শোভনা তখনই গড়িয়াহাটার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। চাকর শোভারাম জানেই গিয়েছিল, সে চেনে।

শোভারাম গভীর রাত্রে এসে জানাল জামাইবাবুরা দুপুরের মধ্যেই ও বাড়ি ছেড়ে নিজেদের বাড়ি চলে গেছেন। সকাল আট-টার জাগেই ছাড়বার কথা—কিন্তু মাল সরাতে দুপুর গড়িয়ে গেছে—সেজন্যে গালাগাল নাকি গজগজ করছে। অতিরিক্ত ভাড়া পাওয়া হয় তার, তা বাবু যে কোথায় সরে পড়ল সেই মুহূর্তে'...না, দারোয়ান ও'দের ঠিকানা জানে না। আগাম টাকা দিয়ে তিন দিনের জন্যে বাড়ি ভাড়া করেছে, তাদের অত ঠিকানা জানবার দরকার কি?

তাই তো!

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। সন্দেহ কিছু হলেও, এদের—মানে চাকরদের সামনে তার কণামাত্র প্রকাশ করা চলবে না। এখন এটা একটা বিরাট পারি-বারিক মর্যাদার প্রশ্ন।

শোভারাম তবু ভয়ে ভয়ে একবার বলতে গেল, 'তা জামাইবাবুকে একটা টেলি-ফুন করলে হয় না? নম্বর তো লেখা আছে এখানে?' কিন্তু উত্তরে এমন তুষারকঠিন দৃষ্টিতে চাইলেন মিসেস চাকলাদার যে সে বেচারা পালাতে পথ পেল না। দাসী-চাকর-দের এ ধরনের 'ইমপার্টিনেন্স' সহ্য করতে নেই—এত অন্তরঙ্গতাও করা ঠিক নয়। মনিবের পারিবারিক ব্যাপারে তারা মাথা গলাবে কেন?

তবে—তাঁদের যে বেশ একটু বেকুবি হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। দুজনেই মুখে না বললেও, মনে মনে সেটা অনুভব করতে লাগলেন বিলক্ষণই।

সে রাত্রে কারুরই ঘুম হল না। এখন কি করা উচিত—কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ঠিকানাটা জানা যেতে পারে—সেইটেই মনে পড়ল না কিছুতে। আজই একবার দেখা করা উচিত ছিল। মেয়ের সঙ্গে—ছেলেমানুষ, তখনও তাঁদের ছেড়ে থাকে নি, হয়ত কান্না-কাটিই শুরু করে দিয়েছে। তবু আজকে এক রকম—কালও যদি খোঁজ নিতে না পারেন তো রীতিমতো অন্যায়ই হবে।

অনেক ভেবে মিঃ চাকলাদারের মনে পড়ল সেই ব্যারিস্টারের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মনে পড়ল, তার নামধাম কিছুই মনে নেই। ও'দের য়্যাটর্ণীই এসব ঠিক করেন, কিন্তু তাঁদেরই কি অত মনে পড়া সম্ভব, নাম না দিতে পারলে? ও'দের আপিসে অবশ্য সইকরা ভাউচার থাকা সম্ভব—তবে সে তো বছর দুই আগের কথা, সে ভাউচার খুঁজে বার করাই তো অসম্ভব!

তবু পরের দিন আপিসে গিয়ে যতটা যা করবার সবই করলেন। য়্যাটর্ণী আপিসের হেডক্লার্ক আবার ছুটিতে। কাকে বলবেন এসব—খুব হৈ-চৈ করা ঠিক হবে না, কারণ তাহলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়বে, সেই সঙ্গে ও'দের নির্বুদ্ধিতাও। হাসাহাসি করবে সকলে। মেয়ের বিয়ে দিলেন অথচ জামাইয়ের বাড়ি কোথায় জানেন না—এ কথা শুনলে মরা মানুষও হেসে উঠবে যে!.....

চেষ্টা কিছু কিছু মিসেস চাকলাদারও করেছিলেন—সেখানেও সেই একই ফল, অর্থাৎ কোন ফলই হয় নি। সন্ধ্যার পর দুজনে যখন আবার দুজনের মুখোমুখি হলেন তখন দুজনেরই মুখের চেহারা ভয়া-বহ হয়ে উঠেছে। পরস্পরকে প্রেতাত্মা বলে বোধ হল তাঁদের। একদিনে এত পরিবর্তন মানুষের?

অতঃপর একটিই পথ খোলা আছে—পুলিশে খবর দেওয়া।

কিন্তু সে যে বিষম কেলেঙ্কারী। ঢি-ঢিক্কার পড়ে যাবে সারা শহরে, ও'দের যে সার্কেল সেখানে আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

'কিন্তু' মিসেস চাকলাদার উত্তেজিত-চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'মাধুরীটাও তো একটা স্টেপ নিতে পারত। লেখাপড়া জানা স্মার্ট মেয়ে—তার একবার মনে হল না যে আমাদের একটা খবর দেওয়া দরকার!'

মিঃ চাকলাদার ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কি অবস্থায় আছে তাই বা কে জানে—কী সার্কামস্ট্যান্সের মধ্যে পড়েছে—'

'ননসেন্স! যতই হোক, অতবড় মেয়েকে তো আর দরজায় চাবি দিয়ে কেউ রাখতে পারে না—'

দেখা গেল যে সত্যিই পারে না। মিসেস চাকলাদারের মুখের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে একটা ট্যাক্সি থামবার শব্দ হল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলো মাধুরী,—তার বেশভূষা আলু-থালু, দুই চোখে জলের চিহ্ন, সম্ভবত এক কাপড়ে চলে এসেছে।

'বাবা ট্যাক্সীভাড়াটা দিয়ে দাও। আমি কিছুই আনতে পারি নি—। খুব বিয়ে দিয়েছ তোমরা, একটা চীট চারশ বিশের সঙ্গে!'

এত উদ্বেগের মধ্যেও তাঁদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভোলেন না মিসেস চাকলা-দার, 'ছিঃ! ও শব্দটা তোমার মুখে মানায় না মাধুরী, রকবাজ ছেলেদের পক্ষেই শোভা পায় ওটা। যত বিপদেই পড়ো—তোমার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারের কথা ভোলা উচিত নয়!'

কিন্তু এ বক্তৃতার ফল হল বিপরীত। এরপর ক্রুদ্ধ মাধুরীর মুখ থেকে আরও যেসব ভাষা বের হতে লাগল—তাতে একটা জিনিস মিসেস চাকলাদারের কাছে পরিষ্কার হল, মেয়েকে যতই ব্যস্ত রাখুন তিনি—দাসীচাকরদের প্রভাব থেকে একেবারে সরিয়ে রাখতে পারেন নি।

কিন্তু সে পরের কথা। সে বোঝাপড়া পরে করবেন তিনি। এখন আসল ব্যাপারটা কি—সেইটেই বড় কথা।

সবই বলল মাধুরী। ততক্ষণে মাথাও একটু ঠাণ্ডা হয়েছে তার। অসীম—অসীমও ওর নাম নয়—ওর আসল নাম সুকুমার ঘোষ, ঐ এস ঘোষ ও নিজেই, আগে বড় একটা আপিসে কাজ করত, শেয়ার মার্কেটে লেনদেন করতে গিয়ে কিছু টাকা গোলমাল করে, সেটা ঢাকতে একটা সরকারী পেমেন্টের চেক জাল করে ভাঙিয়ে ধরা পড়ে যায়, দু বছর জেল হয়। 'ওখান' থেকে মানে জেল থেকে বেরিয়ে এখন নাম ভাঁড়িয়ে কোর্টে ঘুরে বেড়ায়—আসলে টাউট ছাড়া কিছু নয়। কাকে সনাক্ত করতে হবে, কে উকীল খুঁজছে, কার রায়ের নকল চাই, ঘুরে ঘুরে এই ধরনের মক্কেল সংগ্রহ করে। সুকুমার বলেছে, 'মিথ্যে আমি একটুও বলি নি। ওখান থেকে ফিরে কোর্টে বেরুচ্ছি—ঠিকই। পনেরো ষোল হাজার রোজগার—টাকা কিনা তা বলিনি। পয়সাই ধরো—তাতে আরও বেশিই হবে।' যাই হোক, রোজগার খুবই কম, কালিঘাটে একটা খোলার বাড়িতে ভাড়া থাকে, তাও এক বছরের ভাড়া বাকী, বাড়িওলা নালিশ করেছে। এই রকম চরম অবস্থায় ওদের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে যায়—তখনই এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনাটা মাথায় আসে। বরাবরই নাকি য়্যাডভেঞ্চারার টাইপ ও, নিজেই স্বীকার করেছে। তবু এঁরা যে এত সহজে এই ফাঁদে পা দেবেন—তা ও একবারও আশা করেনি। দু-একটি পুরনো বন্ধু ওর এখনও আছে, তাদের সাহায্যেই তাদের কাছে ধার করে এইসব আয়োজন করেছে। এই জীবন ও আর যাপন করতে পারছে না—ওর ইচ্ছা ছিল যে জিনিসপত্র যা পাবে তা বেচে আর এই নগদ টাকায় যা বাঁচবে তাই নিয়ে দুমঘাষ দিয়ে বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্থান চলে যাবে, সেখানে গিয়ে মুসলমানী নাম নিয়ে কোন ব্যবসা শুরু করবে। এঁরা যে অনেক জিনিস দেবেন তা সে জানত—যে রকম মর্যাদার

জ্ঞান, কম দিতে পারবে না। খদ্দের ঠিক করেই রেখেছিল। সবশুদ্ধ চার হাজার টাকা গুনে দিয়ে মাল নিয়ে গেছে সে। মাকে হাজার টাকা দিয়ে রেখেছিল আগেই, মা সেটা নিয়ে তাঁর ভাইপোর কাছে কাশীতে চলে যাবেন, পরে আর কিছু কিছু পাকিস্থান থেকে পাঠাবে—এই ভেবে রেখেছিল।

তা সব নাকি ওলট-পালট হয়ে গেছে তার মাধুরীকে দেখেই। রাজত্বের সঙ্গে সে যে যথার্থ রাজকন্যা পাবে তা সে ভাবেনি। রূপে নয়—ওর চেয়ে রূপসী মেয়ে অনেক দেখেছে সে, সব দিক দিয়েই নাকি মাধুরী তার মানসী, মনের মতো মেয়ে। তাই গড়িয়াহাটার বাড়িতেই ওকে ফেলে সরে পড়বার যে পরিকল্পনা ছিল, তা কাজে করা হয়ে ওঠে নি, ওকে নিয়ে নিজেদের সেই সম্পত্তির বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। তার ধারণা ছিল যে, মাধুরীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করে ওরা পাকিস্থান নয়—এই দেশেরই কোন শহরে সরে পড়বে এবং সেখানে গিয়ে নতুন করে আবার জীবন শুরু করবে—ক্লীন অর্থাৎ পরিষ্কার শ্লেটে লেখা শুরু হবে তার ইতিহাস। সুকুমার একরকম তাকে নজরবন্দী করে রেখেছিল। আজ প্রথম ফাঁক পেতেই পালিয়ে এসেছে, এক কাপড়ে চলে আসতে হয়েছে তাই ব্যাগটাও আনতে পারে নি। গহনাপত্র সবই তার কাছে—বলা-বাহুল্য এতক্ষণে সে সবও নিশ্চয় বিক্রী হয়ে গেছে!

এরপর আর দাসীচাকরদের কথা স্মরণ রেখে চাপাগলায় কথা বলা সম্ভব হল না। মিসেস চাকলাদার বোমার মতো ফেটে পড়লেন একেবারে। তাঁর মুখের ভাষাও যে সে সময় সর্বদা রুচিসম্মত রইল তাও না, যথার্থ যখন ক্রুদ্ধ হয় মানুষ তখন আর নিজের 'স্ট্যাটাস' বা সামাজিক মর্যাদার কথা মনে রাখতে পারে না, যে পারে সে মানুষ নয়।

'পুলিশে দেব আমি, কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাব। ওকে জেল খাটিয়ে ছাড়ব। সাংঘাতিক ক্রিমিনাল, ওর ফাঁসি হওয়া উচিত। ওকে আন্দামানে পাঠাব আমি যেমন করে হোক, তার জন্যে কারও পায়ে ধরতে হয় তাও ধরব!'

মিঃ চাকলাদারের কিন্তু এত তর্জন করারও শক্তি ছিল না, তাঁর দুই চোখে জল এসে গিয়েছিল, তিনি বিহ্বলভাবে বসে—রুমালের অভাবে জামার খুঁটেই চোখ মুছতে লাগলেন।

দেখা গেল যার দুর্ভাগ্যে এঁরা এত বিচলিত হয়েছেন সেই মাধুরী এঁদের চেয়ে শক্ত আছে। সেই ধমক দিয়ে উঠল, 'আঃ, কী হচ্ছে মা, এর ওপর পাড়ায় মুখ দেখানো বন্ধ করে কি তুমি আমাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে চাও! যা করবার তা তো করেইছ—এখন সেই বোকামিটাকে শহরময় প্রচার না করলে বুঝি চলছে না!'

'কিন্তু প্রচার তো হবেই খুকী। পুলিশ কেস তো করতে হবে!'

'লাভ তাতে? ওর এক পয়সাও তুমি পাবে না। সে ব্যবস্থা নাকি সে করেই রেখেছে! এ টাকা ওর সেই কটি বন্ধুদের কাছে জমা করে দেবে—এ আগেই ঠিক আছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা সহজ হবে না।'

হঠাৎ মিঃ চাকলাদারের মনে পড়ল কথাটা, 'আচ্ছা ঐ যে তোর পাকা দেখা আর বৌভাতে এসেছিল—নামটা মনে পড়ছে এতক্ষণে, রক্ষিত, শৈলেন রক্ষিত ব্যারিস্টার, তার সঙ্গে কী যোগাযোগ এর?'

'কিছুই না। সে কথাও বলেছে। গরীব মানুষ বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে, শোটা যাতে একেবারে পণ্ড না হয়, তাই ওর হাতে পায়ে ধরে ওকে রাজী করিয়েছিল আসতে। কি নাকি—একটা কেস দিয়েছিল একবার, তাই থেকে জানাশুনা!'

মিসেস চাকলাদার বললেন, 'কিন্তু পুলিশ কেস না করলেও তুমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছ না—এর কি কৈফিয়ৎ দেব? সেও তো পাড়া-ঘরে আত্মীয়মহলে কথা উঠবে!'

'আমি এখানে থাকলে তো! শ্বশুরবাড়ি নেই কে জানবে? আমার বন্ধু সুষমার দিদি ভাগলপুরে একটা মিশনারী ইস্কুলে প্রিন্সিপ্যাল, তাঁর কাছে চলে যাব আমি কালই!' বেশ নিরুত্তেজিতভাবেই বলল মাধুরী, 'তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন, তাঁকে ধরে ঐখানে বা অন্য কোথাও একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিতে পারব আশা করছি।'

'বাঃ, আমার মেয়ে তুমি মাস্টারী করবে, স্বামী-পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনীর জীবন একেবারে ষোলকলা পূর্ণ হয়ে ওঠে বটে!...তাতে আমাদের মর্যাদাটা কোথায় থাকে!'

'তুমি ভুল করছ মা, তোমাদের মর্যাদা নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। এনাফ অফ দ্যাট ননসেন্স! তোমরা যদি ওটা একটু কম করে ভেবে বাস্তব জীবনে নেমে আসতে—তাহলে আর এতটা কেলেঙ্কারী হত না।'

'কিন্তু', মিঃ চাকলাদার বললেন, 'পুলিশে তো জানাতেই হবে, ডিভোর্সের ব্যাপারটা তো শুরু করতে হবে এখনই—'

'কী দরকার! এত তাড়া কি! আমি ওকে কথা দিয়েছি এক বছর সময় দেব ওকে—টু প্রুভ হিমসেলফ ওয়ার্দী!'

'তা—তার মানে!' চিৎকার করে উঠলেন প্রায় মিসেস চাকলাদার, উত্তেজনায় যেন তোংলা হয়ে গেলেন তিনি, 'তুমি কি বলতে চাও এর পরেও তুমি ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে—'

'না না, ভুল করছ, ভালবাসার কথাই উঠছে না। এই কদ্বন্টায় কি ভালবাসব। তবে হ্যাঁ, ভাল লেগেছে, তা স্বীকার করছি। চার্ম যে আছে একটা তা তো অস্বীকার করতে পারো না—নইলে তোমরা আর ভুললে কি করে!...আর আফটার অল, মানুষটা খুব ইন্টারেস্টিং—সে বিষয়েও আশা করি তোমরা আমার সঙ্গে একমত।...দেখাই যাক না, এক বছর তো আর বেশী সময় নয়।...সে আমাকে কথা দিয়েছে, যদি সে ফেল করে, তো নিজে এসে বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র সই করে দিয়ে যাবে।'

মিসেস চাকলাদার বললেন 'বেশ একটু ব্যঙ্গের সুরেই, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করো যে, তার মতো এক নম্বরের জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ জালিয়াৎ মিথ্যুক তোমাকে কথা দিয়েছে বলেই সে কথার ঠিক রাখবে! তাহলে তুমি খুবই সরল বুঝতে হবে।'

'বুদ্ধিমান তো অনেক দেখলুম মা। ঠকতে গেলে সরলভাবে ঠকাই ভাল, তাতে বুদ্ধির অহংকারে এত ঘা লাগে না। আর, এ বিশ্বাস তো নিজের গরজেই রাখা—নইলে আমার ব্যক্তিগত চার্মের ওপর বিশ্বাস হারাতে হয় যে, সেখানে যে আবার মর্যাদার প্রশ্ন ওঠে একটা!'

ফিলসফি অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য বই
"I have perused with pleasure Sri SWARUP GUPTA'S "HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY" and its annexe in Bengali entitled পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস and found it helpful for the Honours Examinees in the subject"
—Prof. P. N. BHATTACHARYYA
HEAD OF PHILOSOPHY DEPTT.
Presidency College, Calcutta.
ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষা একই খণ্ডে
মূল্য ৮.০০
বিজুরি আখর
৭, ফকির চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা—৬
ফোন : ৫৫-১৪৯৪

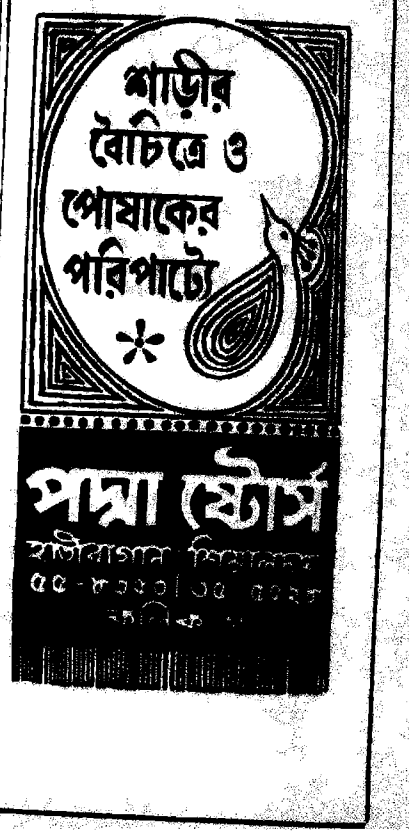

কমল গুহ আমার সহপাঠী ছিল আর প্রতিবেশী ছিল। সেই নরম বয়সে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক-ঘন্টা ওকে আলটাতে না পারলে দিনটাই জলো ঠেকত। উঁচু-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় আমাদের পাঁচজনের থেকে অন্তত ঢের ভালো। তবু ওর জ্ঞান-গম্যি সম্পর্কে আমাদের বরাবরই একটা কৌতুককর সংশয় ছিল।

মিষ্টি পাগলাটে ধরনের ছেলে। ভয়ানক খামখেয়ালী। কিন্তু গোঁ আছে। যা ধরবে, তা করবে। মফস্বল কলেজ ছেড়ে কলকাতায় পড়ার সময়ও ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও ডাক্তারী পাশ করার পর একে একে গুটিপাঁচেক বড় ডাক্তারের সাকরেদি করল বছর-দুই পর্যন্ত। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। শেষে চোখ-কান বুজে বেশ কেতা-দুরস্ত বড় ঘরেই একটা বিয়ে করে বসল। আমরা নেমন্তন্ন খেলাম আর ঈর্ষান্বিত চোখে ওর চকচকে বউটাকে দেখলাম। তারও মাস-তিনেক বাদে গলায় মালা-টালা দিয়ে একদিন ওকে বোম্বাইয়ের ট্রেনে তুলে দিলাম। সেখান থেকে বিলেত যাবে। ও নিজেই এক ফাঁকে বলেছিল, সেখান থেকে আরো গোটাকয়েক চটকদার ছাপ-ছোপ নিয়ে আসতে পারলে একসঙ্গে তিন কাজ হবে। নিজের হিল্লে হবে, বউয়ের মান-মর্যাদা বাড়বে, আর, শ্বশুরের টাকার সদ্গতি হবে।

তারপর দীর্ঘ দুটো যুগ কেটে গেছে। গঙ্গায় অনেক রকমের ঘোলা জল বয়ে গেছে। জীবনের ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে আমরা এক-একটা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মহড়া দিয়ে চলেছি। আমাদের ভেতর-বার দুই-ই বদলেছে। দেহের কাঠামোয় বিদায়ী মধ্যাহ্নের ছায়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কমল রওনা হয়ে যাবার বছর-আষ্টেক বাদে এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম বিদেশ থেকে ও মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়ে ফিরেছে। লন্ডনে ছিল, জার্মানীতে ছিল, আমেরিকায়ও নাকি কিছুকাল ছিল।

আমি মন্তব্য করেছিলাম, ও ওর যোগ্য লাইনই বেছে নিয়েছে, কিন্তু এরপর বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়।

বন্ধু প্রতিবাদ করেছিল, এতবড় মনো-বিজ্ঞানী, মন বুঝে এখন তো আরো বেশ কষে বাঁধতে পারবে হে!

যুক্তির কথাই বটে। ফস্ করে কেন ওই উক্তি মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল নিজেই জানি না। শুনলাম, আট বছরের মধ্যে সেই প্রথম দেশে ফিরেছে সে। এই দীর্ঘকাল অবশ্যই স্ত্রী-বিরহিত জীবন যাপন করেনি। বছর তিনেকের মধ্যেই বউ অকাশ-পথে উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অসুবিধে আর কি, শ্বশুরের টাকা ছিলই, তার ওপর বিদেশের কৃতী ডাক্তার হয়েছে জামাই, আর তার রোজগারের ভাগ্যও খুলে গেছে। সেই ভাগ্য দিনে দিনে নাকি আরো বিস্তার লাভ

করেছে। বিদেশে অর্থাৎ লণ্ডনে আর জার্মানীতে বছর-তিনেক ঘরকরনা করেছে বউ। তার পর হাঁপ ধরে যেতে পালিয়ে এসেছে। কমল ফিরেছে তারও দু'বছর বাদে।

বন্ধুর কাছ থেকে একটা বড় হোটেল-সুইটের ঠিকানা পেয়ে আমি কমলের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখা হয়নি। সে তখন বম্বে না কোথায় চলে গেছে।

দেখা করতে গেছলাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে খুব একটা তাগিদ ছিল না। কারণ, নিজের তখন লেখক-জীবনের বহু হতাশা আর অনিশ্চয়তায় ক্ষতবিক্ষত সংগ্রামী জীবন। এর মধ্যে পরিচিতজনের দুর্লভ কোনো সাফল্যের খবর কানে এলে নিজের ব্যর্থতার ছায়াটা যেন আরো বেশি ঘন হয়ে উঠতে চায়।

এর বছর-দশেক বাদে হঠাৎ আর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে মোটামুটি সফল অ্যাডভোকেট। আমারো তখন দুর্দিনের মেঘ অনেকটাই কেটেছে। অতএব পরিচিত সফল মুখ দেখলে আনন্দই হয়। দু-পাঁচ কথার পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কমল গুহর খবর জানো?

বললাম, মস্ত মেণ্টাল সার্জন হয়েছে এই পর্যন্তই জানি। কেন?

—এখানেই তো ছিল কিছুদিন। আমাদের কোর্টেই ওর বউয়ের সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এ ভেরি পিসফুল ডাইভোর্স!

আমি হতভম্ব।—সে কি?

—হ্যাঁ। বউ সুট ফাইল করেছিল, ওর দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি।

মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়েছে শুনে আর এক বন্ধুর কাছে দশ বছর আগের সেই ঠাট্টাটা বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয় এমন কাকতালীয়ভাবে ফলে যাবে আর আমাকেই অপ্রস্তুত করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

এই ঘটনা শোনার পর আরো ছ' বছর বাদে অর্থাৎ পাকা দু' যুগ পরে কমল গুহর সঙ্গে আমার দেখা। বয়েস আমাদের তখন ঠিক পঞ্চাশ চলছে।

দিনকতকের অবকাশ পেয়ে বাংলাদেশের বাইরে এই ছিমছাম পাহাড়ী জায়গায় বেড়াতে এসেছিলাম। কমল গুহ এখানকার বিরাট পাগলের হাসপাতালের সর্বাধিনায়ক জানি। যাব যখন তার সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে ছিলই।

হোটেলে উঠেছিলাম। ঠিক দু' দিন বাদে বিকেলের দিকে তার রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার্সের চত্বরে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির গায়ে ওর নামের শৌখিন নেমপ্লেট তার পিছনে এক গাদা বিলিতি ডিগ্রী-ডিপ্লোমার মিছিল। দাঁড়িয়ে সেগুলো পড়ে নিলাম।

কিন্তু ওর কাছে যাবার পথ তেমন সুগম নয়। আপয়েণ্টমেণ্ট করা নেই শুনে দরোয়ান প্রথমে আমাকে দরজার কাছেই এগোতে দেবে না। আপনার জন বলতে সে শিলপ নিয়ে যেতে রাজি হল। ছাপানো শিলপে নামের সঙ্গে ওমুক জায়গার পুরনো বন্ধু তাও লিখে দিলাম। শুধু নামে যদি চিনতে না পেরে দেখা না করে দরোয়ানের কাছে ইজ্জত যাবে।

একটু পরেই ডাক এলো। দরোয়ান এবারে সেলাম ঠুকে ধুতি-চাদর পরা এই খাঁটি বাঙালীকেই বলল, বাইয়ে সাব্।

ঘরে ঢুকলাম। এটা ডাক্তারের আবাসিক আপিস-ঘর। মস্ত টেবিলের একদিকের রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে কমল গুহ। তার মুখোমুখি চার-পাঁচটা চেয়ার অন্য ভদ্রলোকদের দখলে। কোণের দিকে আলাদা ছোট টেবিলে বসে মৃদু টুকটুক শব্দে টাইপ করে চলেছে সুশ্রী একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে।

আমার দিকে এক-পলক চেয়ে থেকে একটু মাথা নাড়ল কমল গুহ। তারপর ইঙ্গিতে ভদ্রলোকদের পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। পাইপ দাঁতে চেপে অস্ফুট-স্বরে বলল, বিজ্-ই ফ' ফাইভ মিনিটস্ ওনলি, উড ইউ মাইণ্ড?

আমি বোকার মত মাথা নাড়লাম। কিন্তু সে-সেটা দেখলও না বোধহয়। কেতাদুরুস্ত কথা কটা বলেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হল। হাসপাতাল সংক্রান্ত কথা। এঁরা সকলেই এখানকার ডাক্তার বা অফিসার হবেন।

আমি ঠিক এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু হাসি একটু উচ্ছ্বাস না। তাঁদের আলোচনায় পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট গেল, তার মধ্যে চব্বিশ বছর বাদে এককালের অন্তরঙ্গ কেউ এসেছে বলেও আর একবার আমার দিকে ফিরে তাকালো না। হয়ত ভুলেই গেছে। আলোচনা যাদের সঙ্গে হচ্ছে তাদের সকলেই হয়ত বাঙালী, কিন্তু বাংলা কথা একটাও শুনলাম না। হাব-ভাব ছেড়ে কমল গুহর কথা-বার্তার আধো-আধো টান গুলোর মধ্যেও পুরো দস্তুর সাহেবিয়ানা।

হয়ত সীরিয়াস আলোচনাই কিছু, কারণ বাজেট ফাইন্যান্স ইত্যাদির বাধা অনেকবার কানে এলো। তবু আমার মনে হতে লাগল, চব্বিশ বছর যখন গেছে বাদ-বাকি জীবনটাও দেখা না হয়ে কেটে যেতে পারত। আবার সকৌতুকে ওকে দেখছিও আমি। জেনে শুনে এখানে ওর সামনে এসে না পড়লে কে বলবে সেই কমল গুহ। আধা-গম্ভীর ভারী মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দাঁতে মোটা পাইপ, মাথার ঝাঁকড়া চুলের দু-পাশে খানিকটা করে পাকা চুলের বর্ডার।

—ও কে!

সর্বাধিনায়কের ছাড়পত্র পেয়ে ভদ্রলোকদের সবিনয়ে প্রস্থান। আমার নিজের অবস্থানের মিয়াদও দশ বিশ মিনিটের বেশি হবে আশা করছি না। পাশে যে ভদ্রলোকটি তখনো দাঁড়িয়ে সে বোধহয় সেক্রেটারি। প্রভুর ইঙ্গিতে সেও প্রস্থান করল।

—মিস জোনস্!

কোণের টাইপের টেবিল থেকে সুশ্রী মেয়েটি শশব্যস্তে এদিকে ফিরল।—ইয়েস সার?

—উড ইউ প্লীজ.....

অসমাপ্ত বক্তব্য বুঝে সেও টাইপ ফেলে টক্-টক্ দ্রুত শব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কমল গুহ ততক্ষণে উঠে টেবিল ঘুরে আমার সামনে চলে এসেছে।

—ওঠ্।

সম্বোধন শুনে কান জুড়লো, তবু ঈষৎ বিস্ময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা দু' হাতে ও আমাকে বেশ জোরেই জাপটে ধরল, আর তারপরেই আমার দু' গালে সশব্দে দুটো চুমু।

—তুই একটা রাসকেল, তুই একটা হতভাগা, তুই একটা ওয়ান্ডারফুল!

একটু আগে কি চিন্তা করছিলাম ভেবে নিজেই আমি অপ্রস্তুত। হেসে বললাম, তুই পাগলের ডাক্তার হয়েছিস বটে।

হা-হ শব্দে হেসে উঠে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। আর তার ফলে ওর ওই পুষ্ট দুটো হাতের খুব কাছে থাকাও নিরাপদ মনে হল না আমার।

এরপর মিনিট পনের ধরে খুশির আলাপ চলল। কবে এসেছি, কোথায় উঠেছি জেনে নিল। হোটেলের নামটা শুনে কি ভাবল একটু।—চল্ ওদিকে আমার কাজও আছে একটু।

গাড়ি ও নিজেই ড্রাইভ করে দেখলাম। পাশে বসে পুরনো গল্প করতে করতে চলেছি। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে মিনিট আট দশের জন্য ও ভিতরে ঢুকে গেল। ফিরে এসে এবারে ড্রাইভ করে সোজা চলে এলো আমার হোটেলে।

এতবড় হোটেলের মালিক তাকে দেখা মাত্র হন্তদন্ত হয়ে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো। তার দিকে একবার সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে কমল গুহ আমার সুটকেস্ বেডিং মাল-পত্র যা আছে সব লোক দিয়ে তার গাড়িতে নামিয়ে দিতে বলল। আমাকে বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে হোটেলের মালিক তক্ষুনি ছুটল।

আমি বললাম, এটা কি-রকম হল?

জবাবে ও চোখ পাকালো, তুই একটা হতভাগা বলেছি না?

এবারে আমি নিঃসঙ্কোচ। ওর বাইরের খোলস একেবারে বদলেছে বটে ভিতরটা সেই চব্বিশ বছর আগের মত তাজা আর কাঁচা আছে।

সন্ধ্যের অনেক আগেই ওর বাড়িতে স্থিতি হয়ে দু'জনে মুখোমুখি চায়ের টেবিলে বসেছি। রসনা পরিতৃপ্তির অঢেল আয়োজন। প্রসন্ন মুখে কমল বলল, তোর একটু অসুবিধেই হবে হয়ত—

আমি মন্তব্য করলাম, অসুবিধের লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি।

—সে-অসুবিধের কথা বলছি না, রমণী-বর্জিত আতিথেয়তা তো, তোর ভালো না ও লাগতে পারে।.....ভালো কথা বউয়ের সঙ্গে আমার ডাইভোর্স হয়ে গেছে জানিস তো?

বিব্রত মুখে মাথা নাড়লাম।

বললাম, হঠাৎ এ-রকম একটা কাণ্ড.....

নাথিং নিউ, যেতে দে। বললাম এখানে একটিও সুন্দর মুখ না দেখে তোর

নীরস লাগাই স্বাভাবিক। ফেমিনাইন কার্ভস্ লুব্রিকেট মনোটনি।

মুখের আগল আগের থেকেও ঢিলে হয়েছে দেখছি। হেসেই জবাব দিলাম, বয়েসও তো পঞ্চাশ গড়িয়ে গেল।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ও বলে উঠল, তুই কি-রকম ছারপোকা-মার্কা সাহিত্যিক রে!...তাই বা কেন, তোর দুই একটা বইয়েতেও তো প্রেমের বে-পরোয়া কান্ডকারখানা দেখি!

এই ব্যস্ততার মধ্যেও পৃথিবী-চষা হোমরাচোমরা ডাক্তার আমাদের বই পড়ে বা পড়ার সময় পায় ভেবে অবাকই লাগল।

দুটো দিন বেশ কেটে গেল। ও যখন ব্যস্ত, আমি তখন হাসপাতাল দেখে বেড়াই। জীবনের রসদ খুঁজি খোদ-কর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাধা দেবার কেউ নেই।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে আবার লেখার কথা উঠল। কমল বলে বসল, এদেশে এ-কালের লেখকদের মধ্যে চরিত্র খোঁজার অ্যাডভেঞ্চার নেই—দুনিয়ায় কত কান্ড যে ঘটে তারও খবর রাখো না তোমরা।

আমি প্রতিবাদ করলাম, যে-টুকু অ্যাড-ভেঞ্চার করা হয় তাইতেই তো সমালোচনা হয়, গল্পের গরু গাছে তুলি আমরা।

ও জবাব দিল, গরু তুললে আপত্তি কিন্তু মানুষ সত্যি সত্যি বাতাসেও ভাসে পাতালে ডোবে। হি অর সী হ্যাজ আ পেয়র অভ্ ম্যাজিক উইংস—জাদু পাখা আছে দুটো করে বুঝলে? দে ওয়ার্ক মিরাকল্ অ্যান্ড ডিভাসটেট্ টু.....বিশেষ করে মেয়েদের পাখা—দোজ ইটারন্যাল ঐভ্স্'!

হেঁয়ালীর মত লাগলেও মনে মনে ধারণা উক্তিটা এক মেয়ের প্রসঙ্গে, যে ওর ঘর ভেঙেছে। এ-কদিনে আভাসেও স্ত্রী-বিচ্ছেদের কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি। নিরীহ মুখে বললাম, আরো একটু বিশদ না করলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক একটু। তারপরেই ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল। মুচকি হেসে জবাব দিল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে, তাড়া আছে—কাল বলব—দেন্ ওয়ার্ক ইফ ইউ ক্যান্।

আমি উদগ্রীব হয়ে সেই কালের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

পরদিন সকাল দশটা নাগাত হাসপাতালের একজন কর্মচারী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, সাহেব সেলাম দিয়েছে।

গেলাম। কমল বলল, চলো একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বেশ মেজাজে আছে মনে হল, হাসছে অল্প অল্প। লিফ্টএ উঠে আবার বলল, মহিলা যদি তোমাকে কিছু বলে, সায় দিয়ে যেও, নয়তো একটু মুশকিলে পড়তে পারো।

ওর গতকালের প্রসঙ্গের সঙ্গে হাসপাতালের কোনো মহিলার যোগ আছে ভাবিনি। ওর স্ত্রী-বিচ্ছেদের ঘটনাই শুনব ধরে নিয়েছি। আমি লেখক, তাই কোনো বিকার-বৈচিত্র্য দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলাম। হাসপাতালের খোদ কর্তা সঙ্গে আছে যখন আমার ঘাবড়াবার কারণ নেই।

তিন-তলার ওপর পাশা-পাশি গোটা কতক সুইট্। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নেই। মাঝে মাঝে কোলাপসিবল্ গেটএ দারোয়ান মোতায়েন। মাস গেলে যারা মোটা টাকা ফেলে দিতে পারে তাদের রোগী বা রোগিণী ভিন্ন এখানে আর কারো আশ্রয় মেলা সম্ভব নয়।

আমাকে সঙ্গে করে কমল এমনি একটা সুইটে ঢুকে গেল।

ওদিক ফিরে জানলার গরাদ ধরে আকাশ দেখছিল মহিলা। এক পিঠ খোলা চুল। দুখানা বাহু, কানের দু পাশ আর পায়ের পাতা দেখেই বোঝা গেল মহিলা রূপসী। কমলের গলা খাঁকারি শুনে এদিক ফিরল, তারপরে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েও আমাকে দেখে সুচারুভাবে থমকালো একটু।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়, রূপসীই বটে। কিন্তু ফর্সা মুখের দুদিকে কালচে ছোপ, আর সুন্দর টানা চোখের কোলে কালি। সুন্দর স্বাস্থ্য, বয়েস মনে হল আট-ত্রিশ উনচল্লিশ হবে। পরে শুনেছি ছেচল্লিশ।

তড়বড় করে কমল আমার যে পরিচয় দিল শুনে আমারই দু'চোখ কপালে উঠার দাখিল। বলল, আমার ছেলেবেলার বন্ধু ওমুক—মস্ত ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বাঙালীর গর্ব বলতে পারেন। তিন চার দিন হল এখানে বেড়াতে এসেছে। এসেই পালাই পালাই করছে, কেন বুঝলেন?

মহিলার হাসি-হাসি মুখের সুচারু অভিব্যক্তি, আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কমল তেমনি তড়বড় করেই আবার বলে গেল, ওর স্ত্রী। সাচ্ এ লাভ্লি লেডি, ওর টাকার জন্য নয়, এই জন্যেই ওকে আমার হিংসে হয়—কলকাতায় ওর বাড়ি গেলে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখার লোভেই আর চলে আসতে ইচ্ছে করে না। ওদের দুটো ছেলে একটা মেয়ে; এখনো দুজনের টানে দুজন অন্ধ একেবারে—এই যে এখানে আছে কদিন রোজ একটা করে মিসেসের ট্রাঙ্ক-কল্, কেমন আছ, কবে আসবে।

আমারই ঘেমে ওঠার দাখিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম মহিলার দুটি আয়ত নেত্র আমার মুখের ওপর ঘন হয়ে বসতে লাগল, এই প্রথম তার চাউনিও অস্বাভাবিক ঠেকছে।

এবারে কমল মহিলার পরিচয় দিল। স্মৃতি গুপ্ত। ইনিও এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, জায়গাটা ভালো লেগে গেছে তাই আরও কিছুদিন থাকবেন আশা করা যায়। ...এই ফাইন অ্যাকমপ্লিসড্ লেডি ও'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তোমার ভাগ্য ভালো।

আর এক-দফা নমস্কার বিনিময় হল। লক্ষ্য করলাম মহিলার চোখ দুটো যেন অস্বাভাবিক চকচক করছে। কমল চট করে উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা আপনারা আলাপ করুন, আমি পাশের সুইট থেকে ঘুরে আসছি।

কথা শেষ করেই সে অদৃশ্য। সেই মুহূর্তেই একটা ভয় যেন আমাকে ছেঁকে ধরতে লাগল। স্মৃতি গুপ্তর চকচকে দু চোখ আরও ঘন হয়ে আমার মুখের ওপর বসছে। হঠাৎ একটু হাসল মহিলা তার পরেই উঠে এসে অন্তরঙ্গ পরিচিতার মতই আমার গা ঘেঁষে বসল। চোখের মত সুন্দর দাঁতের সারিও ঝকঝক করে উঠল এবারে। —চার দিন হল এসেছেন আর আজ এখানে আসার কথা মনে পড়ল?

অজ্ঞাত ত্রাসে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে আমার। এ কি বিড়ম্বনা রে বাবা! সন্তর্পণে ব্যবধান রচনা করতে চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে শুকনো ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, সময় পেয়ে উঠিনি...।

—বলবেনই তো, আপনারা সব এই রকমই! আছেন তো কিছুদিন এখন, না স্ত্রীর টানে পালাবেন?

—না...দিন-কতক থাকব।

খুশি। সামনের চুলের গোছা সরাতে গিয়ে মহিলার বাহু আমার কাঁধে ঠেকল। তারপর আর একটু ঘুরে বসার ফলে ব্যবধান সংকীর্ণতর হল। উৎফুল্ল মুখে মহিলা বলে গেল, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আমার কত লোভ আপনি জানেন না, সত্যিকারের পুরুষকার বলতে তো তাদেরই। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একজন মানুষের মত মানুষ আমার ঘরে এলো। আমার কত ভাগ্য আজ!

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে আমি কাঁপছি। হন্তদন্ত হয়ে তক্ষুনি কমল ঘরে ঢুকতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। এগিয়ে এসে ও মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল আমার বন্ধুকে?

—ওয়ান্ডারফুল!

—এই জন্যেই তো নিয়ে এলাম, চলো হে আজ আর সময় নেই। বলেই সে আবার দরজার দিকে পা বাড়ালো। আমি উঠে অনুসরণ করার জন্য ব্যস্ত।

দরজার কাছে আসার আগেই পিছন থেকে খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল মহিলা। কমল ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কাল আবার আসবেন, আসবেন তো? একলা আসবেন আমি আশায় বসে থাকব—ঠিক আসবেন?

মাথা নেড়ে রাজি হয়ে ঘরের বাইরে পা দিয়ে বাঁচলাম আমি। কমল গুহ আগে আগে চলেছে। এই মুহূর্তে আমার সব থেকে রাগ হচ্ছে ওর ওপর।

ওর আপিস-ঘরে আসার পর গম্ভীর মুখে হাসি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করল, অক্ষত আছিস?

বললাম, তোর আসতে আর দু মিনিট দেরি হলে হার্টফেল করতাম। কি ব্যাপার?

—নট এ ওয়ার্ড টু ড্রে, আবার কাল।

সত্রাসে বলে উঠলাম, কাল আবার ওই ঘরে!

ও হাসতে লাগল, তুই একটা কাপুরুষ —ইজ্ন্ট সী রিয়েলি চার্মিং?

পর দিন বিকেলে কমল আবার আমাকে ধরে নিয়ে গেল। কথা দিল, আজ আর আমাকে ফেলে ঘর ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া আমারও কৌতূহল ছিলই।

আজ দ্বিতীয় প্রস্থ বিস্ময়। গতকালের পরিচয় মহিলার মনেও নেই। কমল বলল, আমার লেখক বন্ধু, আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। স্মৃতি গুপ্ত স্বাভাবিক মুখেই দুটি হাত জুড়ে নমস্কার করল, কি ভাগ্য বসুন।

গলা খাটো করে কমল যেন আমি শুনছি না এইভাবে মহিলাকে বলল, লিখে আরো কত নাম করতে পারত ঠিক নেই, বাড়িতে বড় অশান্তি, বউয়ের সঙ্গে এক মুহূর্তের বনিবনা নেই...হয়ত ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। বড় দুঃখের জীবন.....

গতকালের বিপরীত দৃশ্য দেখলাম আমি। আমার দিকে মহিলা তাকালো একবার। আয়ত চোখে বিমনা ব্যথার ছায়া! প্রায় ফিসফিস করে কমলকে বলল, আ-হা, আমার কাছে এ-সব লোককে কেন আনেন বলুন তো, বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

আজকের আলাপের মেয়াদ পাঁচ মিনিটও নয়। লেখার প্রসঙ্গেই দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করল স্মৃতি গুপ্ত। আসার সময় শান্ত দু চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, জীবনে শক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে পারাটাও কম কথা নয়, বুঝলেন...তখন দেখবেন সব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারপর কমলের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, মুখ শুকনো দেখছি কেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে না সে-সময়ও হয় নি?

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে কমল আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সন্ধ্যার পর এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে কমলকে বললাম, এবারে কি আমাকেই তুই পাগল করে ছাড়বি! কৌতূহল আর কত সহ্য হয়?

পাইপ ধরাবার ফাঁকে কমল হাসল একটু। আমি প্রসঙ্গ বিস্তারের আশায় আবার বললাম, আজ তো মহিলাকে বেশ শিক্ষিতা মনে হল?

—হ্যাঁ, এম-এ পাশ।...তা বয়েস কালে দেখতে কেমন ছিল মনে হয়?

জবাব দিলাম, বয়েস-কাল তো এখনো মায়া কাটাতে পারে নি মনে হল।

খুশি মুখে কমল মাথা নাড়ল। তারপর খুব চাছাছোলাভাবে একেবারে সংক্ষেপেই যে ঘটনাটা ব্যক্ত করল, তাই শুনে আমি স্তম্ভিত।

* * *

স্মৃতি গুপ্ত ইউ-পি'তে থাকত। সেখান থেকেই এম-এ পাস করেছিল। তার বাবা সেখানকার ডাক্তার। ছেলেবেলায় দু-একবার বাংলা দেশ, অর্থাৎ, কলকাতা দেখেছে।

ভারী এক সুপুরুষ স্মার্ট ছেলের প্রেমে পড়ল সে। নাম পরাশর দত্ত। সেই ছেলেরও কলকাতায় ব্যবসা — ডাক্তারি সরঞ্জাম আর পঙ্গু মানুষদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। নিজের হেলথ ক্লিনিক আছে।

পরাশর দত্ত যখন সেখানকার কলেজের ছোকরা, স্মৃতি গুপ্তর দিকে তখন থেকেই চোখ ছিল তার। কিন্তু স্মৃতি তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়িও ধরে নি। আলাপ ছিল, প্রেম বোঝার বয়েস তখনো সেটা নয়। কিন্তু খুব চৌকস মনে হত ছেলেটাকে তখন।

ভাগ্যের সন্ধানে পরাশর ইউ-পি ছাড়ল। আট বছর বাদে এই ইউ-পি'তেই ব্যবসার কাজে এসে আবার যোগাযোগ। স্মৃতি তখন এম-এ পড়ছে—সামনের বারে পরীক্ষা দেবে। আর পরাশর দত্তও তখন উঠতি অবস্থার মানুষ। দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ। স্মৃতিকে দেখে মুগ্ধ তখন অনেকেই। কিন্তু পরাশর আসাতে সকলে বরবাদ হয়ে গেল। ব্যবসার কাজে ঘনঘন বার দুই-তিন ইউ-পি আসার ফাঁকেই তাদের প্রেম জমাট বেঁধে গেল। তারপর বিয়ে।

স্মৃতির জীবনের সবথেকে সেরা কটা দিন কেটে গেল। পরাশর কলকাতায় ফিরল। স্মৃতি ছ মাস বাদে এম-এ পাস করার পর তাকে নিয়ে যাবে। তখন পরাশর তাকে কলকাতার এক নাম-করা হোটেলে। সেখানকার ঠিকানা হিসেবে একটা পোস্ট-অফিসের নাম লিখে দিল সে। তার চিঠি-পত্র সব ওই পোস্ট-অফিসের কেয়ারে যায়। ব্যবসার তাগিদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ঘুরতে হয় তাকে—কখন থাকে না থাকে ঠিক নেই। হোটেলের চিঠি মারা যায় বলে এই ব্যবস্থা।

এর পরের খানিকটা অংশ জানা গেছে পুলিশের রিপোর্ট থেকে।...অলক বিশ্বাস নামে একটা লোক সেই পোস্ট-অফিসে এসেছিল তাদের ব্যবসার অথবা সুধীর ঘোষের নামে চিঠিপত্র কি আছে সংগ্রহ করতে। পোস্ট-অফিসের লোক তাকে চেনে, সুধীর ঘোষের অনুপস্থিতিতে সেই এসে চিঠিপত্র নিয়ে যায়।

ব্যবসা এবং সুধীর ঘোষের নামে এক গোছা চিঠিই ছিল। অলক বিশ্বাস দেখল তার সঙ্গে পরাশর দত্ত নামে একজনের একটা খাম ভুল করে এসে গেছে। খামের ওপরে মেয়েলি হাতের লেখাটা বড় সুন্দর মনে হল তার। বাইরে এসে খামটা খুলল। লিখেছে স্মৃতি নামে এক মেয়ে। বেশ চাপা উচ্ছ্বাসের ঝকঝকে চিঠি। বেশি দিন বিয়ে হয় নি বোঝা যায়। নিজের এম-এ পাসের খবর দিয়েছে। তারপর লিখেছে, ওমুক দিন ওমুক গাড়িতে কলকাতা আসা স্থির করেছে। ছোট ভাইয়ের পরীক্ষা সামনে তাই একলাই রওনা হতে হবে। চিঠির শেষ, পত্র পাঠ প্রাপ্তি সংবাদ পেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে রওনা হব। তুমি অবশ্যই ঠিক সময়ে স্টেশনে থেকো। জ্ঞান বয়সে তো কলকাতা দেখি নি, ট্রেন থেকে নেমেই তোমার মুখখানা না দেখতে পেলে তালকানা হয়ে যাব।"

অলক বিশ্বাস তিন দিন বাদে স্মৃতি দত্তর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। পরাশর যখন দত্ত, স্মৃতিও তখন দত্তই হবে। টেলিগ্রামের বয়ান, স্টার্ট—পরাশর।

ব্যবসার বারো আনার অংশীদার সুধীর ঘোষকে এ ব্যাপারে সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানালো না। তাদের ব্যবসায় কুটির ভাগাভাগি করাটা রেওয়াজ নয়। তাছাড়া সুধীর ঘোষের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তার একটা চাপা বিরোধ চলেছে। জানলে ফোপরদালালী করবে। তারপর মেয়েটা যদি মনে ধরার মত না হয় তাহলে ঠাট্টা-ঠিসারা করবে। কিন্তু কে জানে কেন, চিঠি পড়েই অলক বিশ্বাসের আশা মনে ধরার মতই হবে মেয়েটা। তা যদি হয়, তাহলে সে-রকম শিকার ধরার বাড়তি প্রাপ্যও কম হবে না। অতএব পার্টনারের কাছে গোপন।

তার পরের ব্যাপারটা জল-ভাতের মত সহজে ঘটে গেল। উনিশ শ' সাতচল্লিশের শুরু সেটা। উদ্বাস্তুর চাপে শিয়ালদহ স্টেশন তখন নরক। কলকাতার বহু জায়গাই নরক।

ট্রেন থেকে নেমে স্মৃতি চেনা মুখ দেখল না। উদগ্রীব মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আর দূর থেকে অলক বিশ্বাসের মনে হল এই হবে। কিন্তু রূপ দেখে সে নিজেই হকচকিয়ে গেল প্রথম। ভরসা করে তক্ষুনি সামনে এগোতে পারল না। আরো খানিক বাদে নিঃসংশয় হয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তার কাছে এলো।—এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিসেস স্মৃতি দত্ত?

স্টেশনের সেই নরকের মধ্যে চেনা মুখ না দেখে স্মৃতি ভয়ানক উতলা হয়ে পড়েছিল। সাগ্রহে মাথা নাড়ল।

—সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। মিস্টার দত্ত মানে পরাশর দত্ত আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই আসতে পারলেন না...চলুন।

বেশ অসুস্থ শুনে স্মৃতি ঘাবড়ে গেল। —কি অসুখ?

—পেটের নীচের দিকে খুব যন্ত্রণা, চলাফেরা করতে পারছেন না। আপনি ঘাবড়াবেন না, আসুন।

চিন্তিত মুখে স্মৃতি তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল।

অলক বিশ্বাসের জীবনে আজ ভাগ্যের সূর্যোদয় যেন। বারো-আনার মালিক সুধীর ঘোষ রাত সাড়ে আটটার আগে আসবে না। সাড়ে আটটার পর বাবু এসে মালিকের আসনে জাঁকিয়ে বসে টাকা গোনেন। তার ওপর আজ কোনো টোপের আশায় চন্দননগর গেছে। আগে এসে হাজির হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভালোই হয়েছে। এ জিনিস দেখলে কিছুদিন অন্তত আর কাউকেও সে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিত না। ও নিজেই একটা রাঘব বোয়াল। আর একবার বেশ সুশ্রী এক শিকার ধরে আনার পর এক মাস পর্যন্ত নিজেই তাকে গিলে বসে থাকল। এভাবে ব্যবসা চলে!...জায়গায় গিয়েই অলক

বিশ্বাস অচিন্ত্য সরখেলকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানাবে। অঢেল টাকার মালিক অচিন্ত্য সরখেল। সরকারী-বেসরকারী মহলে তার প্রবল প্রতাপ। কখনো বিপদের গন্ধ নাকে এলে সে-ই তাদের ত্রাণকর্তা। মেয়েটাকে একবার তার কবলে ফেলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। সুধীর ঘোষ তখন 'নো-বাড়ি'। অচিন্ত্য সরখেলের কাছ থেকে সে আজ মোটা কিছুই খসাতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গৌখিন এলাকার অনেক ফ্ল্যাটের একটা বিশাল বাড়ির দোতলায় উঠে হেলথ ক্লিনিকের সাইন বোর্ড দেখল স্মৃতি। তাকে তিন তলায় নিয়ে এলো অলক বিশ্বাস। সুন্দর একটা সাজানো ঘরে এনে ঢোকালো। বাড়ির মধ্যে এটাই সাউন্ড-প্রুফ ঘর। বাইরে থেকে বা ভিতর থেকে গলা ফাটালেও দু দিকের কেউ শুনতে পাবে না।

তাকে বসতে বলে অলক বিশ্বাস বেরিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বাদেই এসে আবার খবর দিল, মিস্টার দত্ত গেছেন বেয়িয়াম-মিল এক্স-রে করাতে, তাই ফিরতে দেরি হবে। মিসেস দত্ত চা-টা খেয়ে রেস্ট নিন, চান-টান করুন, মিস্টার দত্ত ততক্ষণে এসে যাবেন।

বিভ্রাটের কথা শুনে স্মৃতির আবার মুখ শুকালো। বলল আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

অলক বিশ্বাস সবিনয়ে বলল, কোন্ ডাক্তারের চেম্বারে গেছেন তিনি তাদের জানা নেই।

একটু বাদে বেয়ারা চা ইত্যাদি দিয়ে গেল। তার চাউনিটা কি-রকম বিশ্রী লাগল স্মৃতির। চা খেতে খেতে ঘরটা দেখেও অবাক লাগল একটু। সুন্দর শয্যা পাতা, বসার শৌখিন আসবাব, ড্রেসিং টেবিল, টয়লেট সেট—সবই আছে, কিন্তু ঘরে কোন বাক্স বা সুটকেস বা জামা-কাপড়ের চিহ্নও নেই।...ভাবল, কোথায় কোথায় ঘোরে লোকটা তাই এ-সব রাখার জায়গারও হয়ত ঠিক নেই।

ঘরের সঙ্গে সুন্দর বাথরুম। ক্লান্তি দূর করার জন্য বেশ করে চান করে নিল। দুপুরের দিকে সত্যিই বিচলিত সে। একলাই খেয়ে নিতে হল, বেলা তিনটে বেজে যায় লোকটার পাত্তা নেই।

রাত হওয়া পর্যন্ত তার দুশ্চিন্তার বিবরণ বাদ দেওয়া যাক। বিকেলে বহুবার ঘর থেকে বেরুতে চেষ্টা করে দেখেছে বাইরে থেকে বন্ধ। চিৎকার করেও সাড় মেলে নি।

তারপর নরক। শক্তিশালী একটা জঘন্য পুরুষের সঙ্গে দিশেহারার মত ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে তাকে। লোকটা আধ ঘণ্টার চেষ্টায় কাবুই করে ফেলেছিল তাকে। হঠাৎ দাঁতে করে তার বাহুর মাংস প্রায় ছিঁড়ে নেবার উপক্রম করে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুক্তি পেয়েছিল সে। আর্তত্রাসে এবার ছুটে এসে হ্যান্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেছল। ত্রস্ত বসনে আলুথালু অবস্থায় পাগলের মত নীচে ছুটল।

নীচের সাজানো আপিস-ঘরে তখন সুধীর ঘোষ বসে। চার আনার পার্টনার অলক বিশ্বাস সন্ধ্যে থেকে মনের আনন্দে অঢেল মদ গিলে কোথায় নিপাত্তা হয়ে আছে জানে না। এসে অন্য লোকের মুখে শুনেছে বড় জবর শিকার ধরে এনেছে পার্টনার আজ। এবং খানিক আগে অচিন্ত্য সরখেল সে-ঘরে গেছে।

সিঁড়িতে অস্ফুট কাতর শব্দ শুনে কান খাড়া হল তার।

সামনে একটা আপিস-ঘর এবং আলো দেখে উদ্ধারের আশায় আর্তত্রাসে প্রচণ্ড বেগে দরজা ঠেলে স্মৃতি ভিতরে ঢুকল, বাঁচান!

পরমুহূর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত স্তব্ধ পঙ্গু একেবারে। মালিকের চেয়ারে বসে আছে পরাশর দত্ত, সহকর্মীরা সকলে যাকে জানে সুধীর ঘোষ বলে। তার সামনে মদের বোতল, মদের গেলাস—আর দু পাশে বসে দুটো মেয়ে হাসাহাসি করছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে পরাশর দত্তও বিমূঢ় হতচকিত। মদের নেশায় ভুল দেখছে কিনা সেই বিভ্রম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—স্মৃতি তুমি! তুমি এখানে!

ভাবার অবকাশ পেলে স্মৃতি কি করত জানে না, কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি তার মাথায় সর্বনাশা কিছু ঘটে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে সোজা আবার ওপরে উঠে গেল স্মৃতি। ঠাস করে সাউন্ড-প্রুফ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আবার। ঘরের মধ্যে সেই আহত বাঘ বসে তখনো।

তিন তলায় উঠে পাগলের মতই পরাশর দত্ত দরজা ধাক্কাতে লাগল। দরজা খোলার জন্য চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল। ও-ঘরে কোন শব্দ ঢুকবে না নিজেই ভুলে গেছে।

...বেশি রাতে সেই ঘর থেকে, সেই নরককুণ্ড ছেড়ে, স্মৃতি অচিন্ত্য সরখেলের সঙ্গেই বেরুতে পেরেছিল। দাঁতের কামড় খেয়ে হোক বা এমন এক দুর্বল রত্ন লাভের আনন্দে হোক, এই বারোয়ারি জায়গায় তাকে ছেড়ে যেতে অচিন্ত্য সরখেলের মন সরে নি। যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? ...এখানে থাকলে তোমার ওপর বেশি অত্যাচার হবে...এর থেকে তোমাকে অনেক ভালো জায়গায় রাখতে পারি।

নির্জীব কলের পুতুলের মত স্মৃতি মাথা নেড়েছে, যাবে।

পরাশর দত্ত অন্যথায় সুধীর ঘোষের চোখের ওপর দিয়েই স্মৃতিকে নিজের গাড়িতে এনে তুলেছে অচিন্ত্য সরখেল। বলেছে, একটু টুঁ-টা করলে তাকে হাজতে গিয়ে পচতে হবে।

নিষ্পন্দ পরাশর দত্ত টুঁ-টা করে নি।

হতচেতনের মত চার রাত্রি এক নাম-করা হোটেলে কাটিয়েছে স্মৃতি। প্রতি সন্ধ্যায়ই অচিন্ত্য সরখেল এসেছে। যাবার আগে মোটা টাকাও গুঁজে দিয়ে গেছে। সে এত খুশি যে সর্বস্ব দিতে পারে।

তারপর মাথায় খুন চেপেছে স্মৃতির। হোটেল থেকে বেরিয়ে থানায় এসেছে। কিন্তু সুধীর ঘোষ বা পরাশর দত্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। ধরা পড়েছে অলক বিশ্বাস।

সেই থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আক্রোশের জ্বলন্ত আগুন মাথায় নিয়ে কলকাতার রাতের অভিসারে পা বাড়িয়েছে স্মৃতি দত্ত—না দত্ত নয়, তখন আগের পদবী ব্যবহার করে সে—স্মৃতি গুপ্ত। একটি মাত্র নেশা তার, সুখের ঘর ভাঙবে। অনেক ভেঙেছে। অনেক।

কিন্তু সেই সঙ্গে মাথার গোলযোগও বেড়েই চলল। শেষের দিকে এক শাঁসালো মারোয়ারীর কাছে ছিল। মস্তিষ্কের বিকৃতি অসহ্য হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লোকটার নেশা ঘোচে নি। স্মৃতি ভালো হবে এই আশায় বহু পয়সা খরচ করে সে-ই তাকে এই হাসপাতালে রেখে যায়। কিন্তু চোখের বার হলে মনের বার, কত দিন সে আর পাগলের আশায় এই হাতীর খরচ টানবে! দু বছর হয়ে গেল সে আর খরচাপত্রও দেয় না, খবরও নেয় না।

*

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম জানি না। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন খরচ চালাচ্ছে কে?

নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে কমল গুহ জবাব দিল, আমি।

আমি অবাক।—তুমি কেন?

—কে জানে। একটু বিমনা দেখলাম ওকে, বলল, পিকিউলিয়ার কেস, কিন্তু সারার আশা আছে। আগের থেকে এখন অনেক ভালো।...তাছাড়া, স্ত্রীর সঙ্গে আমার ডাইভোর্সের মামলা চলছে শোনার পর থেকে এক অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে মহিলার—একমাত্র আমি ছাড়া হাসপাতালের আর কোন লোককে সে সহ্য করতে পারে না। ডাইভোর্স হয়ে গেছে জানার পর মায়াটা আরও বেড়েছে—আমাকে একটা অসহায় শিশু ভাবে।

আমি নীরব। বার-কয়েক পাইপে টান দিয়ে কমল হঠাৎ আমার দিকে ফিরল।—কিন্তু তারপর?

আমি তারই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম, তারপর কি?

উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করল বার দুই। তারপর দেশের নামজাদা এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার কমল গুহ আমার চেয়ারের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, তারপর কি? হোয়াট নেক্সট?

সিংড়ের কথা আজকাল একেবারেই শোনা যায় না, কিন্তু একটা ছোট ছেলে সেখানে পঁয়ষট্টি বছর আগে কিছুদিন ছিল, সেকথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। গ্রামটি যে অন্য সব গ্রাম থেকে আলাদা রকমের ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তখন হয়তো বর্ষাকাল, চারদিকে জল থৈ-থৈ। যেন ছোটখাটো একটা সমুদ্র, তাতে কতকগুলো দ্বীপ। একেকটা দ্বীপে কয়েকটি ঘর-বাড়ি গাছপালা। অন্য দ্বীপে যেতে হলে লোকে লম্বা লম্বা নৌকো চড়ত, তাকে বলত ছিপ।

ছিপে করেই গাঁয়ের লোকে সওদা করতে গঞ্জে যেত। নদী নালা খানা ডোবা বর্ষায় সব একাকার। যারা মাছ লাউ কুমড়ো বিক্রি করত, তারাও ছিপে করে এসে পাড়ি বেয়ে দ্বীপে উঠত। এত জল, তাতে মাছ-ই বা কত। কেউ মাছ কিনতে চাইত না। তারাও ছাড়ত না। 'মাছ নেব না বললেই হল কি না। কেন, আমরা কি শুকিয়ে মরব নাকি?' জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় সর-পুঁটি ফেলে দিত, তার একেকটার ওজনই হয়তো এক সের পাঁন সের। দাম হয়তো চার পয়সা। সেই চার পয়সা দিয়েই হয়তো পাঁচপো লাল বালাম চাল পাওয়া যেত।

ছোট ছেলেটার পায়ে যেন চাকা বাঁধা ছিল, সারা দিন চোখে ঘুম ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর চুপ করে মাদুরের উপর মার পাশে পড়ে থাকত। মা যেই ছেলে ঘুমিয়েছে মনে করে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কাঁথা সেলাই করতেন কি পাথরের উপরে ছাঁচ কুটতে বসে যেতেন, অমনি নিঃশব্দে ছেলে পিছনের দরজা খুলে একেবারে পগার পার।

পুরু খড়ের চাল দেওয়া শোবার ঘরগুলো, রান্নাঘরে টিনের চাল। বাবা তো আর যে সে লোক নন, সিংড়ের পোস্ট মাস্টার! সারাদিন পোস্টাপিসে কত কাজ তাঁর, পিওনরা কত খাতির করে। পোস্টাপিসের কাছেই থানা, সেখানকার দারোগা-বাবু কত মাছ মিষ্টি পাঠান। জমিদারবাবুর বাড়িতে কোনো ব্যাপার হলেই আদর করে নিয়ে যান। বেশ ছিল ছেলেটা। ছোড়দিকে একটু এড়িয়ে চলতে পারলেই ব্যস আর ভাবনা ছিল না।

একদিন দুপুরে ছেলেটি ঐ রকম বেরিয়ে দেখে পিওনের ছেলে সদাই তেঁতুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই সদাই বলল, 'এই, মাছ ধরবি?' মাছ? কোথায় মাছ? সদাই তাকে দ্বীপের ধারে পাড়ির কাছে নিয়ে গেল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। কি রে, ওগুলো কি রে, কালো কালো, হাজারে হাজারে জল ছেড়ে কানকোয় ভর দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আসছে! সদাই বলল, 'কৈ মাছ ছাড়া আবার কি! ধরবি তো চল।'

কিন্তু মাছ ধরা হবে কি দিয়ে, জাল নেই, ছিপ নেই? অবিশ্যি পরনে কাপড় ছিল। তাই খুলে নিয়ে রাশি রাশি মাছ ধরা হল। জলেও নামতে হল না, ডাঙাতেই মাছ ধরা। এত মাছ রাখবার জায়গাও তো চাই। টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল আর ছেলে দুটো আদুল গায়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কি আর করা, গোরুদের জাব খাবার চাড়ি উল্টে ফেলে খালি করে নিয়ে, তার মধ্যে মাছ রাখা ছাড়া উপায় রইল না। দেখতে দেখতে দুই চাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। সে কি কিলবিল লাফঝাঁপ! ছোট ছেলেটার ফুর্তি দেখে কে। এত মাছ ধরেছে দেখে বাড়ির লোকেদের চোখ নিশ্চয় ছানাবড়া হবে। মা নিশ্চয় বেজায় খুসি হবেন।

কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো। ছোড়দি এসে ব্যাপার দেখে রেগেমেগে একাকার। উঠোনময় গোরুর জাব ছড়াছড়ি আর চাড়ি ভরা বর্ষায় যাদের ছুঁতে নেই, সেই অখাদ্য কুখাদ্য মাছ! ফেলে দে ফেলে দে, এসময় কেউ ও মাছ খায় না।

ছেলেটা তাকিয়ে দেখে ছোড়দির সাড়া পেয়েই সদাই সটকেছে। চোখ পাকিয়ে ছোড়দি বলল, 'তার উপর পরনের কাপড় দিয়ে মাছ ধরা! দাঁড়া, মজা টের পাওয়াচ্ছি।' বলে মার কাছে নালিশ করতে চলল। মা এসে লোকজন ডাকিয়ে অত কষ্টের মাছ সব আবার জলে ফেলে দেওয়ালেন। সেকথা কি কখনো ভোলা যায়।

জায়গাটার কাছেই চলন বিল, তার ধারে কলম গ্রাম। সেখানে জমিদারবাড়িতে বিয়ে। ছিপ নিয়ে তারা এসে মাকে ছোড়দিকে আর ছেলেটাকে নিয়ে গেল। বাবা পরে গেলেন। বিয়েবাড়ির কথা আর কত মনে থাকে, কিন্তু পরদিন দেখা গেল চলন বিলে হাজার হাজার হাঁস। দেখে দেখে ছোড়দি আর চোখ ফেরাতে পারে না। এখনো ছেলেটার সে দৃশ্য মনে আছে। ছোড়দির দিকে তাকিয়ে বুড়ো কর্তা বললেন, 'কত নিবি বল্।' শেষ পর্যন্ত এক ঝাঁক হাঁস নৌকো করে ওদের বাড়িতে এল। সে ভাবা যায় না। যেমনি তাদের রূপ, তেমনি গাঁক-গাঁক ডাক।

তারপর যখন নৌকো করে দেশের বাড়িতে ফেরা হল, হাঁসরাও সঙ্গে এল। কি সুন্দর সব হাঁস, সাদা রাজহাঁস, ছাই রঙের বড় হাঁস, আরো কত। নৌকোর পিছন দিকে বড় মাঝি যেখানে হাল ধরে দাঁড়ায়, সেইখানে বাঁশ চিরে খাঁচা হল। তার মধ্যে হাঁসরা থাকত। আর দুই মাঝি কখনো দাঁড় বাইত, কখনো গুন টানত আবার কখনো লগি ঠেলত। জল সব জায়গায় সমান নয়।

পাঁচ দিনের পথ খাল বিল পেরিয়ে বড় নদী দিয়ে, তারপর গোরাই নদী দিয়ে। দুপুরে মাঝিরা কম জল জায়গা দেখে, নৌকোর দু পাশে লগি পুঁতে নৌকো বাঁধত। মা তোলা উনুনে ইলিশ মাছ রান্না করতেন। নদীর জলে স্নান সারা হত, হাঁসদেরও কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত। তারা মহানন্দে সাঁতরে বেড়াত, ডুব দিত, পালক পরিষ্কার করত। তারপর খাওয়া দাওয়া বাসন ধোয়া শেষ হলে, আবার তাদের ডেকে তুলে খাঁচায় পোরা হত। আবার নৌকো চলতে সুরু করত। পাটাতনে শুয়ে থাকলে কানের কাছে ছলাৎ ছলাৎ করে জলের শব্দ শোনা যেত।

রাতে, কোনো গ্রামের কাছে নৌকো বাঁধা হত। সবাই নিরাপদে ঘুমোত। পোস্ট মাস্টারের পরিবার যাচ্ছে, সবাই তাদের জানত শুনত, তাদের আবার কিসের ভয়। গয়না-গাঁটি পয়সাকড়ির বালাই ছিল না তাদের। সঙ্গে থাকত বড়জোড় কিছু সরু চাল, গুড়, চিড়ে, মিষ্টি, এই সব। নিজেদের গাঁয়ের ঘাটে পৌঁছে সে কি আরাম। ঘাটে নৌকো লেগেছে খবর শুনেই জমিরদা এসে উপস্থিত। বাড়ি যতদিন খালি থাকত, জমিরদা ঘরদোর বাগান আগলাত। ঐ গাঁয়েরি মুসলমানের ছেলে ছিল জমিরদা, ওকে ছাড়া এদের একদিনও চলত না। যত রাজ্যের বাইরের কাজ গাছপালা শাক-সব্জির কাজ, মাছ আনা, গঞ্জে যাওয়া, নৌকোর ব্যবস্থা করা আর ছোট ছেলেটার রাখালি করা, এই নিয়ে তার দিন কাটত। কম ভালো বাসতো না ওদের।

হাঁসের পাল দেখে জমিরদার চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু অত সহজে পেছ-পাও হবার ছেলেই নয় সে। দু-এক দিনেই হাঁসদের জন্য বাঁশের দেয়াল, খড়ের ছাউনি দিয়ে চালাঘর বানিয়ে ফেলল। পাশেই পুকুর সেখানে হাঁসরা চরবে, পাতকুড়ুনি খাবে, ডুব দিয়ে গুগলী তুলবে। ছেলেটা আনন্দে লাফাতে লাগল।

'গোরাই নদীতে চরতে নিয়ে যাবে না, জমিরদা?' শুনে জমিরদা অবাক। নদীতে যাবে কি! সেখানে না মাঝে মাঝে কুমীর আসে? হঠাৎ ধরে টেনে নামাতে কতক্ষণ? ছোড়দি শিউরে ওঠে। 'না, না, পুকুরেই চরবে, এত বড় পুকুর।'

তাই চরত। ভোরে বেশি খিদে পেলে গাঁক গাঁক করে ডাকত খালি বড় বড় পুরুষ রাজহাঁসগুলো একটু ফোঁস ফোঁস ছাড়া শব্দ করত না। পুকুরে হাঁসরা ভাসত, গায়ের সঙ্গে লেগে তাদের ছায়া ভাসত। কি সুন্দর যে লাগত। এই বড় বড় ডিম দিত। ছেলেটা ভাবত গোরাই নদীর মাঝখান দিয়ে বড় বড় মালের নৌকো যায়, সাদা লাল পাল তুলে। ঠাকুরবাবুদের বজরা যায়। সেই সঙ্গে যদি নদীর কিনারে কিনারে হাঁসগুলোও একের পিছনে এক সাঁতার কাটত, কি ভালোই না লাগত।

একদিন সকালে হাঁসের ঘরের দরজা খুলেই ছোড়দির সে কি হাউমাউ। বড় রাজহাঁসদের একটা মরে পড়ে আছে। গোলমাল শুনে জমিরদা ছুটে এল। কে যেন বলল, 'রাতে কেউ মেরে গেছে। এমন হাঁস কারো বাড়িতে নেই। পাড়ার লোকের তাই হিংসে।' জমিরদা বলল, 'কেউ মারে নি। সাপে কেটেছে। আমাদের পাড়ার হাঁস-মুর্গীর ঘরেও সাপ ঢোকে।'

'তা হলে কি হবে, জমিরদা? অন্যগুলোকেও যদি সাপে কাটে?'

'কি আবার হবে। গুণীর ওষুধ করব।'

গুণীর ওষুধ করা হবে শুনে অনেকে দেখতে এল। চারদিকে ভিড় জমে গেল। জমিরদা হাতে একটা লম্বা সাদা চোঙার মতো কি জিনিস নিয়ে, হাঁসের ঘরে ঢুকল। ছেলেটার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। 'কি ওটা, জমিরদা?' 'গুণীর ওষুধ।' 'কি দিয়ে তৈরি গুণীর ওষুধ?' জমিরদা কথা বলল না, এ বিষয় বেশি কিছু বলতে গুণীর বারণ ছিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে বড়রা কেউ বললেন, মনে হয় মানুষের হাতের হাড়। ছেলেটার দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। মরা মানুষের হাড় নিয়ে জমিরদা দিব্যি সুন্দর সাপের আস্তানায় ঢুকে পড়ল। কি সাহস তার।

বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল জমিরদা হাড় নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর এক সময় জমিরদা মন্ত্র পড়তে পড়তে বেরিয়ে এল। তার পিছন পিছন হিস্ হিস্ করতে করতে কুলোপানা চক্ষ ধরে সাপও বেরুল। জমিরদা চট করে এত খানি জায়গা জুড়ে সাপের চারদিকে মাটির উপর হাড়টা দিয়ে একটা গোল দাগ কেটে দিল। মাটির উপর হাড়ের আঁচড় ভালো করে দেখাই যাচ্ছিল না।

সাপ মাঝখানে ফণা তুলে গর্জাতে লাগল। ভিড়ের লোকেরা ভয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। জমিরদা বলল, 'কোনো ভয় নেই। বেড় ভেঙে ও বেরুতে পারবে না।'

বেড়? বেড়া আবার কই? মাটিতে একটা দাগ মাত্র, তাও ভালো করে চোখে পড়ে না। সবাই একটু সরে দাঁড়াল। সাপটা রেগে অন্ধ হয়ে তেড়ে এল। দাগের কাছে পৌঁছে মাথা নামিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে আবার পেছিয়ে গেল। এমনি করে চারদিক দিয়ে সাপটা বেরুবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু গুণীর ওষুধের দাগ পার হবার সাধ্য ছিল না তার। দাগের ভিতরে ছুটে বেড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল, 'আর কেন, জমির? এবার ওটাকে লাঠি পেটা দিয়ে শেষ করা যাক।' জমিরদা মাথা নাড়ল। গুণীর নিয়ম আগুনে পোড়ানো। খড় এনে চারদিকে জড়ো করা হল। তাতে আগুন ধরানো হল। তবু সাপটা দাগ পার হয়ে পালাতে পারল না। গোল হয়ে আগুনে জ্বলতে লাগল, সাপের সে কি আকুলি বিকুলি। শেষ পর্যন্ত নিজের গায়ে নিজে ছোবল মারতে লাগল। তারপর আগুনে পুড়ে মরে গেল। ছোট ছেলেটা এই ঘটনা এ জীবনে ভুলতে পারবে না।

গুণীর মন্ত্র আর ঐ হাড়ের সাহায্যে জমিরদা কত সাপে-কাটা, বিষে-জ্বলা লোককে ভালো করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকে শিখিয়ে গেল না। যাকে তাকে ওষুধ শেখানোতেও বারণ ছিল।

ঐ গ্রামকে মাটির পৃথিবীতে এখন আর দেখা যায় না। ভেঙে ভেঙে ঝুপঝুপ করে গোরাই নদীর জলে ডুবে গেছে। কিন্তু সেই ছেলেটা মনে মনে চেনা দৃশ্য আবার দেখে, চেনা শব্দ শোনে, চেনা গন্ধ পায়।

মডার্ণ ডেকরেটরস
৩৫ এ, ডব্লু, সি, বনার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৩৫ ২৫৪৯

নিত্য ডাক আসে অমলেশের। পুজো-পর্বে, পালা-পার্বনে, ব্রত-আচারে ডাক পড়ে একটু বেশী। আশপাশের আরও পাঁচটা গ্রাম থেকে ডাকাডাকি শুরু হয় তখন। বারো মাসের তেরো পর্ব লেগেই আছে। পাঁজির পাতা ওলটালেই দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিন একটি না একটি আচার-অনুষ্ঠানের বিধি লেখা আছে। তাই মেনে চলতে হয় গৃহস্থকে। নয়তো অমঙ্গল অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। সংসারে থেকে পুজো পাঠে মন না দিলে, আচার পালন না করলে কেউ রোধ করতে পারবে না ক্রুদ্ধ দেব-দেবীর অভিসম্পাত বর্ষণ। পরম দয়ালু ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হলে আর রক্ষে নেই।

সাধন-পূজনে অবহেলা করলে লক্ষ্মী আর ঘরে থাকবেন না। চঞ্চলা লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন। তখন দেখা দেবে দারিদ্র্য, অনটন, অভাব। অন্ন আর জুটবে না, উপোষী থাকতে হবে। অলক্ষ্মীকে কে ডেকে আনতে চায় স্বেচ্ছায়?

কথায় কথায় অমলেশ বলে,—দেশের এই যে দুর্দশা, দুরবস্থা, তার কারণ পুজো-পাঠে মন নেই দেশের লোকের। অনাচারে ডুবে গেল দেশটা। অন্যায় করলে ফল ভোগ করতেই হবে। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে।

অমলেশ যেন ভগবানের অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি। ঈশ্বরের দূত। স্বর্গের খাতায় সে যেন নাম লিখিয়েছে। সেই পরমপুরুষের সেনাবাহিনীর যেন এক অনুগত সৈনিক অমলেশ। মাথায় ছত্র, গায়ে শুভ্র উত্তরীয়, পরনে তসরের ধুতি, এক হাতে বুকের কাছে ধরে থাকে শালগ্রাম-শিলা। বাম বাহুতে ঝুলছে লাল শালুর ঝুলি।

দূর থেকে দেখলেই ধরা যায়, অমলেশ পুরোহিত চলেছে আল ভেঙে ভেঙে। পতিতপাবন চলেছেন যেন, উদ্ধার করতে।

পথ যতই হোক উঁচু-নীচু, যতই থাক চড়াই উৎরাই, অমলেশ চলতে চলতে গুন গুন করবেই। তার কণ্ঠে মন্ত্র-উচ্চারণের বেসুরো সুর থামে না। সদাই অমলেশ নাম গেয়ে চলেছে। মোহমুগ্গরের শ্লোক আওড়ায় সে। শক্তিদেবীর বীজমন্ত্র বলে। কোটিসূর্যের সমপ্রভা যাঁর, সেই মধুর কৃত মহানপুরুষের নাম করে। দেবকীনন্দন বাসুদেব নারায়ণের নাম। কৃষ্ণনাম।

কলির একজন মহত্তম পরিত্রাতে সম্বন্ধে বলেছেন, কলিতে নামেই কাজ হবে। অন্ন-দাস মানুষের সময় কোথায় তন্ত্র-মন্ত্র পালন করবে? জপে ধ্যানে বসবে?

অমলেশ সময় নেই, অসময় নেই বিড়-বিড় করে ডেকে চলেছে প্রায় সর্বক্ষণ.—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—

দৈর্ঘ্য আছে অমলেশের, প্রস্থ নেই তেমন দেহের। লম্বা আর ছোরা আকৃতির কঠিন মুখে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভঙ্গী স্পষ্ট। তার ভক্তি আর বিশ্বাস অনড় অটল। এক-এক দুই-দুই নেই। যা মানে তা যেন তার কাছে অবিমিশ্র নির্ভেজাল সত্য। যেমন সেই পরম তিনি সত্য।

সকালে সন্ধ্যায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাজিরা দিতে হয় অমলেশকে। নিত্যপূজো সেরে আসতে হয়। অন্দরের দরজায় পা দিয়ে কয়েকটা গলা-খাঁকারি দেয় অমলেশ। অন্তঃপুরের মেয়ে-মহলকে যেন সাবধানী ঘোষণায়। যেন বলে, সাবধান, সংবৃত হও, আমি এসে পড়েছি।

পুরবাসী কুলবধূরা অমলেশের কণ্ঠজ শব্দ শুনে মাথায় গুণ্ঠন টানে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় অন্তরালে। বয়োবৃদ্ধাদের সঙ্গে মৃদু কথা বলে অমলেশ, বিনা সঙ্কোচে। কেমন যেন যন্ত্রচালিতের মত পূজোর ঘরে সিঁদিয়ে যায়। আসনে বসে। আচমনের পরে পদ্ধতি অনুযায়ী পূজায় মন দেয়। এমনই নিবিষ্টচিত্তে, যে পার্থিব সকল কিছু যেন ভুলে যায় তখনকার মত। পূজোর শেষে নৈবেদ্য থেকে নিজের প্রাপ্য-টুকু নিয়ে ঝুলিতে ভরে তারপর নীরবে বিদায় গ্রহণ করে। এক ঘর সেরে অন্য ঘরের পথ ধরে।

নিজের আবাসে যতক্ষণ থাকে শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করে অমলেশ। কারও ব্যাখ্যাতেই তুষ্ট হতে পারে না। তাই মনোমত ব্যাখ্যার আবিষ্কর্তা স্বয়ং সে। নিজের বিচারে নিজে যেন আত্মহারা। শাস্ত্র পড়তে পড়তে যখন অমলেশের মুখে হাসি ফুটে ওঠে তখন বুঝতে হবে সে তার মনের অভিধানে কোন নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

—এই কাকু, যক দেখেছিস?

দূর থেকে অতর্কিতে হাতের ত্রিভঙ্গ ইঙ্গিত দেখিয়ে পালিয়ে যায় নীলা খিল-খিল হাসি তার শুভ্রসুন্দর মুখে। হাসতে হাসতে যেন লুটিয়ে পড়ছে নীলা।

দার পরিগ্রহ করলো না অমলেশ। থাকে বড় ভাইয়ের সংসারে। যখন তখন এসে এমন বেয়াদপি করে ফুটফুটে ভাইঝিটি। পাঠে বাধা দেয়।

—এই, ধরে আনতো মেয়েটাকে। খা কতক চড়াই। এই কে আছিস?

অদৃশ্য কে'র উদ্দেশে রাগে কাঁপতে কাঁপতে অমলেশ বললে ক্ষণেকের মধ্যে মেয়েটা অলক্ষ্যে পালিয়ে যায় দৌড় দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে আবার ফিরে আসে নীলা। বলে, —আমি আছি হুজুর। কাকে শাস্তি দিতে হবে হুকুম করুন।

হুজুরের আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। বধিরের ভূমিকা গ্রহণ করে অমলেশ।

সান্ধ্যের বেলায় পূজায় বসে অমলেশ, ঠাকুরঘরে, কুশের আসনে। জপ-আহ্নিক সারে। আনুনাসিক সুরে মন্ত্র বলে। পেছন থেকে নীলা এসে নকল করে। অমলেশের উচ্চারিত মন্ত্রের অক্ষম ও ভুল অনুকরণ মাত্র।

ভ্রাতৃবধূ অনুপমা নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে দুষ্টু মেয়েটাকে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ, বিরক্ত। আড়ালে গিয়ে নীলাকে তিরস্কার করে অনুপমা। ক্রোধের সুরে বলে,—ছিঃ! কোথাকার দুষ্টু মেয়ে তুমি। নির্লজ্জ, বেয়াড়া!

মৃদু হেসে নীলা বলে,—চন্দনপুরের চাটুজ্যে বাড়ীর। বাবার নাম কমলেশ। মায়ের নাম অনুপমা। কাকার নাম অমলেশ।

—থাক, ঢের হয়েছে। বড্ড কথা হয়েছে দেখছি! যেমন মেয়ে তেমনি থাকবে।

আচ্ছা আচ্ছা, আর কথা বলবো না।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নীলা।

অনুপমা বলে,—কোথায় চললে আবার? ঠাকুরঘরের দিকে গেলে কিন্তু এবার মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

অভিমানের সুরে নীলা বলে,—আমি তো পড়তে যাচ্ছি এখন।

পড়তে সত্যিই যায় নীলা। শুধু এক ফাঁকে ঠাকুরঘরের সমুখ থেকে কখন গিয়ে জোড়া খড়মের একটি তুলে এনে কোথায় যেন লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসে।

সংসারের এটা সেটা কাজ করতে করতে ফাঁকে ফাঁকে এসে মেয়েকে দেখে যায় অনুপমা। দেখে যায় নীলা সত্যিই পড়ায় মন দিয়েছে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়ছে দুলে দুলে। সরবে। দেখতে দেখতে আনন্দ যেন আর ধরে না, অনুপমার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একটা হুঙ্কার শোনা যায়। চমকে ওঠে অনুপমা।

পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে অমলেশ সোচ্চারে ডাকে জলদকণ্ঠে,—বলি ও বৌদি! তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখে যাও।

অনুপমাকে ছুটতে হয় তৎক্ষণাৎ। বলে,—কি ব্যাপার ঠাকুরপো?

অমলেশ রাগত মুখে বলে,—এক পাটি খড়ম বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গেছে দেখছি। তোমার মেয়ের কীর্তি।

—ইস! নাঃ, দেখছি আমাকে আর তিষ্ঠুতে দেবে না। নীলা—আ—আ—

মায়ের আহ্বান শুনে ছুটতে ছুটতে আসে নীলা। শাড়ীর আঁচলের আবরণ অধরে। হাসি যেন আর লুকোতে পারছে না। আঁচল চেপে ধরেছে মুখে।

অনুপমা বললে,—কাকুর খড়ম কোথায় রেখেছো তুমি?

—কাকুর খড়ম! আমি রেখেছি!

যেন আকাশ থেকে পড়লো নীলা। চোখে অসীম বিস্ময়।

—হ্যাঁ, তুমিই রেখেছো। আর কেউ নয়।

—কক্ষনও নয়। আমি তো তখন দেখলুম কাকু যখন এলো, কাকুর এক পায়ে খড়ম রয়েছে।

—মৃষা মা বদেৎ! মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় নীলা। ভুলে যেও না। গম্ভীর সুরে বলে অমলেশ। বিস্ফারিত চোখ তার। রাগের আধিক্যে যেন কাঁপছে সে।

অনুপমা বলে,—কোথায় রেখেছো বল, নয়তো এক্ষুনি—

অমলেশ বললে,—ঠিক আছে, বিনা খড়মেই চলবে আমার। খাদুকা ছাড়াই চলবো আমি। খালি পায়ে—

হাসি লুকিয়ে নীলা বলে,—দেখ খুঁজে কোথায় আছে। চারদিকে যা অন্ধকার!

মাঝে মাঝে হাতে কাজ না থাকলে গৃহের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে পায়চারী করে অমলেশ। সবুজ গাছ, ভিজে মাটি, ঠাণ্ডা বাতাস। সব কিছু মিলিয়ে স্নিগ্ধ পরিবেশ পছন্দ করে সে। অবসর পেলেই নেমে পড়ে ছায়াভরা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত চত্বরে। ফুলে আর ফলে ভারাক্রান্ত গাছে গাছে মৌমাছি নাচানাচি করে মনের সুখে। গাছের ডালে ডালে পাখীর কাকলী। অমলেশের মনে হয়, ঈশ্বর কেন এই সুন্দর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন? কেন সাজিয়ে রেখেছেন পৃথিবীকে, এমন প্রাকৃতিক শোভায়? ফুল সুগন্ধ ভাসিয়ে দেয়। ফল দান করে সুমিষ্ট আস্বাদ। পাখী গান করে শিস দিয়ে দিয়ে। ঐ আকাশের চাঁদ ছড়িয়ে দেয় সোনালী ভস্ম দিগ্বিদিকে। মনের চিন্তায় ঈশ্বরের আসনে যেন নিজেকে বসিয়ে দেয় সে। তারপর ভাবতে থাকে গভীর মনোনিবেশ। তখন সে সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। খুঁজে পায় যেন সৃষ্টির কারণ। নাস্তিক আর অবিশ্বাসীদের মত মুখ ফুটে সে বলতে পারে না ঈশ্বরের লীলার মানে বোঝা দায়। অর্থ খুঁজে পায় না ভিত্তিহীন ঈশ্বরবাদের। নিরর্থক পুতুল পূজা কেন? অহেতুকী ভক্তি?

বরং বিনয়নম্র সুরে অমলেশ বলে,—ঈশ্বর, আমি তোমার দাসানুদাস তোমার শ্রীচরণের সেবা করাই আমার একমাত্র কাম্য। তোমার খেলার অপার রহস্য জানবার অধিকার আমার আছে।

তাই সকল কিছুর মধ্যেই অমলেশ দেখতে পায় ঐশ্বরিক দর্শন। দেখতে পায় তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল কারণ। কার্য এবং কারণের কী অপূর্ব সমন্বয়।

রাত্রি-শেষে আসে প্রাতঃকালীন শুভ্রতা। সাদা আলো। আসে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে। দিন আসে উজ্জ্বল আলোক দান করতে। আলোয় সজীব হয়ে ওঠে প্রতিটি প্রাণী। আলোয় পরিপক্ক হয় ক্ষেতের ফসল। বৃষ্টি আসে জল-সিঞ্চনের কাজে। সন্ধ্যার আবির্ভাব হয় আকাশে চাঁদ তারা সঙ্গে সঙ্গে। দিনের অফুরন্ত আলো ক্লান্তি আনে, তাই যেন কৃষ্ণ রাত্রির আগমন। রাতের আঁধার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চোখে ঘুম আনে।

—কাকু শুনছো।

কোথা থেকে এসে ডাক দেয় নীলা

মুখ ঘুরিয়ে নেয় অমলেশ। যেন কী এক অচ্ছ্যুত অস্পৃশ্যকে দেখতে পেয়েছে সে। অন্যদিকে ফিরে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ শুনছি বৈকি। বল' তোমার কী বক্তব্য।

—পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো একটু পড়িয়ে দেবে? তুমি তো সংস্কৃত জানো। স্কুলের পরীক্ষার আর দেরী নেই। এসে গেল।

মিনতির সুরে বলে নীলা।

—আমার সময় নেই। যজমান-বাড়ীতে যেতে হবে আমাকে। আজ পূর্ণিমা। সত্য-নারায়ণের পূজো আছে সেখানে।

—তা বললে হবে না।

কথা বলতে বলতে কাকাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে নীলা। এতই জোরালো সেই আবেষ্টন যে অমলেশের দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মুক্তি চায় সে। পরিত্রাহি চেঁচায়। বলে,—ওগো বৌদি, দেখে যাও তোমার মেয়ের কাণ্ড।

অনুপমা এসে ধমক দেয় মেয়েকে। বলে,—শীগ্গির ছেড়ে দাও কাকাকে। কাজে যেতে দাও। আজ উনি কলকাতা থেকে ফিরলেই বলে দেবো ঠিক।

যাই হোক, অমলেশ যেন এক মিষ্টি আনন্দের আস্বাদ পায় মনে মনে। নীলার এই সজোর বন্ধনে অমলেশের ভেতরে জেগে ওঠে সেই গভীর অনুভূতি—যা প্রতিটি মানুষের অন্তরে ঘুমের মত লুকিয়ে থাকে। জেগে ওঠে যথাসময়ে।

কত সময়ে অমলেশ ঈশ্বরের দোহাই পাড়ে। নীলার কাছে নাম করে কত শত দেবদেবীর। নীলাকে শোনায় তাঁদের কৃপাকাহিনী। শাস্ত্র আর পুরাণ থেকে নজীর তুলে তুলে দেখায়। ন্যায় আর অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ব্যাখ্যা করে।

অবিশ্বাসের হাসি ফোটে নীলার মুখে। মুখে আঁচল চাপে সে।

অমলেশ বলে,—তাঁকে তুমি দেখতে পাও না নীলু?

—না, দেখতে পাই না। নেই, তা দেখবো কোত্থেকে!

নীলা বলে চাপা হাসির সঙ্গে।

—সে কী কথা? তিনি তো তোমার আশেপাশেই আছেন। তবুও দেখতে পাও না?

—না না না। ভূত দেখতে পাই, ভগবানকে দেখতে পাই না।

—তোমার দুর্ভাগ্য নীলু। বরাতের দোষ। ভাগ্যে না থাকলে—

—আচ্ছা কাকু, তুমি তো দেখতে পাও তাঁকে?

—হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। প্রায় স্তিমিত চোখে বললে অমলেশ।

—তবে আমাকে দেখাও তুমি।

—ভাগ্যে নেই তোমার ঈশ্বরদর্শন।

নীলার চোখে ধরা দেয় নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড মেঘের জটলা। শ্বেতবলাকার সারি উড়ছে আকাশে। নীলার নজরে পড়ে সবুজ ঘাস। গাছে গাছে ফুলের পশরা। তখন তার চোখে ফুটে ওঠে চিরকালীন হাসি। যা জীবন্ত, যা প্রাণবন্ত। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে প্রজাপতি ধরে নীলা। যেন স্বর্গ পায় হাতে। রঙীন স্বর্গ।

—কাকু, দেখো কী সুন্দর! আকুলকণ্ঠে কথা বলে নীলা।

—ছেড়ে দে, উড়িয়ে দে। প্রজাপতির হিংসে বিষ আছে।

বিরক্তির সুরে বলে অমলেশ।

—ধ্যেৎ, বাজে কথা বলছো। প্রজাপতি কামড়ায় না। আমি ছাড়বো না। বোতলে ভ'রে রেখে দেবো।

—জীবহত্যা করবি তুই?

—না। আমি মধু খেতে দেবো। বাঁচিয়ে রাখবো।

মৌমাছি, প্রজাপতি, গাছে গাছে পুষ্প-স্তবক. দেখতে দেখতে মেজাজ বিগড়ে যায় অমলেশের। এই প্রাকৃতিক সম্পদের মাঝে. সে যেন প্রাকৃতিক কোমলতা খুঁজে পায়। বিব্রত বোধ করে। তার মন আর চোখ যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অসহ্য ঠেকে তার কাছে প্রজাপতি, ফুল, নীলাভ আকাশ।

* * * *

সেদিন অমলেশ যজমানদের বাড়ী যেতে যেতে হঠাৎ শুনলো, তার নাম ধরে ডাকছে কে যেন। মাথায় ছাতা, গায়ে সাদা উত্তরীয়, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, হাতে ঝুলছে চাল-কলার ঝুলি।

—অমল না কী? ও অমল! অমলেশ।

ডাক শুনে পিছু ফিরে তাকালো সে। ইদিক-সিদিক চোখ বুলিয়ে খুঁজলো আহ্বানকারীকে। দেখলো পাড়ার গৌরী-পিশীকে। দুয়োরে দাঁড়িয়ে ডাকছেন হাত-ছানি দিয়ে।

—কিছু বলছো পিশী? ডাকলে কেন? কিছু পুজোপাঠ বাকী আছে না কী?

কথা বলতে বলতে অমলেশ এগিয়ে আসে।

—না গো না অমল। একটা গোপন কথা আছে। তাই ডাকছি।

—ঘটনাটি কী? বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র করতে চাও না কী?

—না না। বিষয় কোথায় যে, দানপত্তর করবো? থাকবার মধ্যে আছে এই ভাঙা চালাখানা। কোনদিন হয়তো ঝড়ে পড়ে যাবে!

—তবে আবার কী এমন গোপন কথা?

—তোমার ভাইঝি নীলা তো দেখছি খুব উড়ছে আজকাল। ভাব জমিয়েছে ঐ মুখুজ্জ্যে বাড়ীর সেজ কর্তার ছোট ছেলেটার সঙ্গে।

—ইন্দর? ইন্দ্রজিৎ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের সেই ইন্দ্রজিৎ।

—তবে তো দেখছি আমাদের নীলার ডানা গজিয়েছে। ঠিক দেখেছো তুমি? না কী লোকের মুখে শুনে—

—এই বুকে হাত রেখে বলছি। দিব্যি গালছি। মিথ্যে বলতে যাবো কোন্ দুঃখে? বলতে বলতে হাঁফ ধরে গৌরীপিশীর। খানিক দম নিয়ে বললেন,—নীলা আসা-যাওয়া করে গৌরীপিশীর বাড়ীতে। সন্ধ্যের পর সরস্বতী নদীর ধারে বেড়াতে যায় দু'জনে। ইচ্ছে হয়তো তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারো। এই সন্ধ্যের পর গেলেই দেখবে দুটিতে—

পূজা, যজমান, চাল-কলা কাঁচা দুধ মন থেকে উবে যায় কর্পূরের মত, অমলেশের মন থেকে। সেদিন আর পূজায় মন-সংযোগ করতে পারলো না সে। আরাধ্য দেবী, যেন অদৃশ্য হলেন তার চোখের সমুখ থেকে। মন্ত্র ভুল করলো অমলেশ। কি বলতে কী বললে। কাকে ডাকতে কাকে ডাকলো। বাসায় ফিরে অমলেশের পায়চারী যেন আর থামতে চায় না। চাল-কলার ঝুলি বৌদির হাতে তুলে দিয়ে বলে,—আমার মনটা বেঠিক আজ। কিছু আর খাবো না আজকের মত। উপবাস আজ আমার।

—শরীর-গতিক ভাল আছে তো ঠাকুরপো?

সস্নেহে বললে অনুপমা। মুখের আলো যেন নিভে গেল। বিষণ্ণতা ফুটলো মুখে।

—একটা দিন উপবাস দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নিরম্বু উপোষ।

—আজ একাদশী নয়, সংক্রান্তি নয়, অমাবস্যা নয়, তবুও তুমি উপোষে থাকবে ঠাকুরপো? ভাত না খাও নাই খেলে। ফলমিষ্টি খাও। সরবৎ খাও।

—না। কিছু নয়। এক বিন্দু জল পর্যন্ত নয় বৌদি। মাপ করো।

—কী যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে অমলেশ। বাগানের পায়ে চলা পথ ধরে পায়চারী করছে এক নাগাড়ে। দর্শনের কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলে এই ধরনের নির্বিকার পদচারণা চালিয়ে যায় অমলেশ।

প্রেম! ভালবাসা! এক ফোঁটা এক রত্তি মেয়ে নীলা কী না শেষে প্রেমের লীলা-খেলায় মেতে উঠেছে! অমলেশের আবার পণ্ডিতের মাথা। তার জেদ আর রাগও যেন অসাধারণ। একটু যেন বেশী। তার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির মতই উগ্র আর ধারালো।

পিতৃত্বের অপমান বোধ করে অমলেশ। গুরুগিরি যেন ঘুচে গেছে তার। আর মূল্য নেই কিছুর। রক্ষাকর্তার অসম্মান, ঠাওরায় যেন।

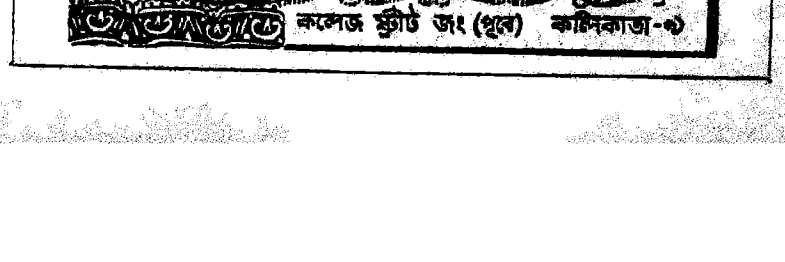

কুমারী কিশোরী নীলা। সে কী না শিখেছে বঞ্চনা। ছলনা।

অমলেশের যেন বুদ্ধিভ্রম হয়। সে যেন চরম ঠকে গেছে একটা এক টুকরো মেয়ের কাছে। মাঝে মাঝে দুঃখ অনুভব করে। অমলেশ যেন শুনতে পায় নীলা এসে তার কানে কানে বলছে,—তোমাদের বাদ দিয়ে আমি নিজেই আমার বর খুঁজে নিয়েছি।

সন্ধ্যার পরে অনেক অনুরোধে এক পাত্র মিছরীর সরবৎ পান করলো অমলেশ। পানের পরে বই খুলে বসলো। শ্রীমদ্ভাগবৎ। কিন্তু পাঠে মন বসলো না।

রাত্রি কিঞ্চিৎ ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লো অমলেশ। সকলের অজ্ঞাতে। তার হাতে একটা ছড়ি। রাতের বেলায় এই ছড়ি ছাড়া বেরোয় না সে কখনও। সাপের উপদ্রব আছে পথে-ঘাটে। চোরের উৎপাত আছে। ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক জটিল সমস্যার কথা চিন্তা করে সে।

চলতে চলতে যেন হঠাৎ নজরে পড়ে আকাশপ্রান্ত। চোখ ঝলসে যায় পূর্ণ গোলাকার চাঁদের আলোয়। সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এমন চোখজুড়ানো মনো-লোভা চন্দ্রশোভা। নীরস গদ্য যেন অমলেশ। তবুও চাঁদের আলো দেখে তার মন যেন কিঞ্চিৎ ভাবালু হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে যেমন কবিদের মনে আসে প্রেরণা। এই সোনালী রাত যেন তার মনে কবিত্ব জাগিয়ে তোলে।

পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ। রাস্তায় ছায়া পড়েছে গাছের। ডালপালার ফাঁক থেকে দেখা যায়, ধূর্ত চাঁদ উঁকি মারছে। যেন লুকোচুরি খেলছে অমলেশের সঙ্গে। লেবু ফুলের সুগন্ধে বাতাস যেন ভারী ভারী ঠেকছে। জলার ধার থেকে ভিজে হাওয়া আসে থেকে থেকে। শ্বাস টেনে টেনে স্নিগ্ধ টাটকা বাতাস পান করে অমলেশ। এক আভ্যন্তরীণ শীতলতায় ঘুম আসে যেন চোখে। উত্তেজিত মস্তিষ্ক, ঈষৎ ঠান্ডা হয়।

চাঁপার ডালপালার ফাঁক থেকে চাঁদের দেখা পাওয়া যায়। চঞ্চল দোদুল্যমান শাখা-পাতার আড়ালে মুখ লুকায় পূর্ণিমার সুগোল চাঁদ। অমলেশের সঙ্গে যেন এগিয়ে চললো সোনার থালা। ধাতব চাকতি। স্যাটিলাইট।

গতি এখন মন্থর অমলেশের। চাঁদের আকর্ষণে সে যেন কেমন পুলকে উচ্ছ্বসিত। কিম্বা কৃষ্ণনীল আকাশে এমন পূর্ণাবয়ব চাঁদ, ইতিপূর্বে কখনও দেখবার অবকাশ পায়নি অমলেশ। তাই যেন বিস্মিত কিছু বা। সে এখন স্রেফ ভুলে গেছে ভাইঝি নীলার নাম। প্রতিবেশী গৌরীপিশী কী যেন বলেছিলেন নীলার নামে। দুর্নাম দিয়েছিলেন কথায় কথায়।

গাঁয়ের পথ ছেড়ে নদীর বালিয়াড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ শুভ্র প্রান্তর চোখে পড়লো অমলেশের। চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে বাধাহীন। আকাশের সোনালী ছায়া পড়েছে মরানদীর দুই তীরে। দেখা যায় আসমান-জমির প্রেম। সাদা আকাশ ছুঁয়ে আছে কালো মাটিকে।

পৌর্ণমাসী চাঁদের ভাষা যেন কানে শোনা যায়। মুখর রাতের ফিসফিস কথা। কোথায় আবার ব্যাঙ ডাকছে যান্ত্রিক একঘেঁয়ে শব্দে। শুক্লারাতের জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত মদালস কাক ডেকে ডেকে উঠছে গাছের ঊর্ধ্বশাখে। কাক-জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। রাশি রাশি ঝাঁক ঝাঁক তারার ভীড় চাঁদের আশেপাশে।

কিন্তু আর যেন চলতে পারছে না অমলেশ। কোথাও একটু বসতে পারলে ভাল হয়। তার ঠিক পায়ের কাছেই শাখা-নদীর বিশীর্ণ জলধারা। চাঁদের কিরণে চিকচিক করছে জড়োয়া অলঙ্কারের মত। জলের কিনারা থেকে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ। বাতাসের ঘায়ে হেলে পড়ছে নর্তকীর সারি। আনত প্রণাম জানাচ্ছে রাতের আকাশকে।

ঈশ্বরের এই সৃষ্টির মূলে কী অর্থ নিহিত আছে? রাত্রির কোলে ঘুমিয়ে পড়ে সকল জীব। রাতের কুহকে অজ্ঞানতা আসে ঘুমের মাঝে। অব্যাহত বিভ্রান্তিতে ভুলে যেতে হয় মরজগতের যতেক ভাবনা। তবে কেন রাত্রি এত মধুময়ী? এমন মনোহর রূপ কেন আঁধার রাতের।

ওরা দুজন
ফটো : বিন্দুশেখর বিশ্বাস

ঐ যে জ্বলছে আকাশে ধিকি ধিকি মিটি মিটি তারা। কামনার দৃষ্টি হানছে যেন মদবিহ্বল তারার দল। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মিলনখেলা দেখতে দেখতে মনের কোমল সূক্ষ্মতন্ত্রী সাড়া দিয়ে ওঠে। রহস্য যেন আরও ঘন হয়। রহস্যের ওড়না পরেছে পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না-ধবল রাতে। কেন? কাকে দেখাবে?

বিপথে কুপথে যাওয়ার ফাঁদ পাতা থাকে রাতে। তার কেন তখন নিদ্রার নেশা ধরে? নিদ্রা না কী রাত্রিদেবীর ছায়াসম অনুগামিনী। পিছু পিছু আসে।

তবে কার জন্য এই ধ্যানগম্ভীর সুদৃশ্য! কার জন্য এত রাশি রাশি কবিতা ঝরে পড়ছে স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে?

সৃষ্টির রহস্য খুঁজে পায় না অমলেশ। বিধাতার নাম দেয় সে নিজের মনে, খামখেয়ালী। ধারণা করতে পারে না, এটা সৃষ্টি না অনাসৃষ্টি।

বাসার পথে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ চোখে পড়ল অমলেশের। শাল-বীথির আলো-অন্ধকারে যেন দুটি ছায়া। পাশা-পাশি চলেছে। কায়া না ছায়া, ঠিক ঠাওরাতে পারে না অমলেশ। চোখের ভুল নয়তো? গাছের ছায়া ভেদ করে জ্যোৎস্না এসে ছোঁয়া দেয় ওদের। ঐ চলমান দুজনকে ধরতে চায় যেন।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। চন্দ্রা-লোকিত স্তব্ধ বালিয়াড়ির পাশে বন-বীথিতে তারা দুজন—যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে পায় অমলেশ। একজন না দুজন? ওরা দুজনে যেন এক এখন। এক দেহ, এক প্রাণ, একাত্মা এই শান্ত নীরব সুন্দর রাত্রি যেন ওদের তরেই সৃষ্টি হয়েছে। ওরা যেন এগিয়ে আসছে মিলনের মন্ত্র শুনতে। আসছে পুরোহিতের কাছে।

দাঁড়িয়ে পড়লো অমলেশ। সে যেন স্তব্ধকণ্ঠ। হতবাক। বিস্ময়ে অভিভূত। শাস্ত্র-পুরাণের সঙ্গে এই দৃশ্যের যোগসূত্র খুঁজতে সচেষ্ট হয়।

রাধা আর কৃষ্ণের লীলা স্মরণে আসে। সুভদ্রা আর অর্জুনকে যেন দেখতে পায় সে। নল আর দময়ন্তীকে। উত্তরা অভিমন্যুকে।

একটি গাছের আড়ালে সরে গেল অমলেশ। অলক্ষ্যে লুকিয়ে পড়লো অকস্মাৎ। যদি ওরা দেখতে পায়!

অমলেশ স্বচক্ষে দেখলো তার আদুরে ভাইঝি নীলাকে। দেখতে নেই এই দৃশ্য চোখে। ঠাকুর নিষেধ করেছেন।

শেষতক লজ্জায় পালিয়ে যায় অমলেশ। সে যেন এক মন্দিরের দুয়োরে পৌঁছেছিল, —যেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই।

কবিতা

স্বায়ত্ত বরনারী ॥ বিষ্ণু দে

পিতার প্রেম ও বরাঙ্গী মাতা আদিতে,
আমার দীর্ঘ মমতায় তার বিস্তৃত পরিণতি,
কঠিন টোড়িকে নিটোল করেছি ইপ্সিত সম্বাদীতে।

আপন লালিত বাগানে যেমন ফুল
বিকশিত মধুসৌরভে রংবাহারে,
অথচ তাকালে কারোই হবে না ভুল,
স্পষ্টই তারা বিশেষ গোলাপ ঘ্রাণে
দর্শনে আর মনোনিবেশের অবিরাম সম্ভারে।

কবি বলেছেন প্রেয়সীকে তাঁর অর্ধেক কল্পনা।
কথাটা এখন অসম্পূর্ণ বলো উভয়ত বাস্তবিকের ব্যঞ্জনা,
একটি মানবী-মানবের দুই তটে জাহ্নবী-রচনা।

প্রাচুর্য? চাই আবিশ্ব সুখ মানবধর্মে ধীর
নিত্যকর্মে শুভ্রবিবেকে ঝরুক শান্তিবারি।
আমাদের ছায়ানীড় পত্তন সর্বদা প্রস্তুত
অস্থিচূর্ণ করুক্ষেত্রে, মানি না ভগ্নদূত
আমরা সবাই মানবজন্মে অমর মৌল প্রতীক—
কোমলে কোমল বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী।

শান্তির পক্ষে ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১॥ নিয়নের নিচে তুমি ঝলমল করে উঠেছিলে।
তাই আমি বাইরে গেলাম
আকাশের নিচে।
আকাশের নিচে মেঘ, উপরে কি আলো?
ঘোলাটে আলোয় আকাশের বালুচরে
ফের ধু-ধু প্রথম পৃথিবী।
তাই আমি বাইরে গেলাম।
নিয়নের নিচে বড়ো ঝলমল করে উঠেছিলে॥

২॥ খুব মেঘ করে এলে মনে হয় কা'কে যেন পাব।
বৃষ্টি নয়, কা'কে যেন মনের উপর
মনের উপর আর শরীরেও পাব।
পাব, যা'কে 'তুমি' বলা যায়,
স্তব্ধ হওয়া যায় যা'কে পেয়ে:
বৃষ্টি নয়, ঝরবে যে বৃষ্টির মতন॥

দুই বছর ॥ অরুণ মিত্র

মাটি ঝরতে দেখেছিলাম। ঢেউগুলো তখন আরও প্রতারক, তারা নিঃসাড়ে কাটছিল। দুর্ধর্ষ নারকেল গাছটা একমাথা মুমূর্ষু রোদ নিয়ে নুয়ে পড়েছিল। যেখানে আমরা আমাদের কাহিনী রেখেছিলাম তার উপর রাতের মাপে আঁকাবাঁকা চিড়। বুলার দুটো বছর সেই জমিটাকে শিকড় দিয়ে শিকড় দিয়ে আশ্চর্যভাবে বেঁধে ফেলেছে।

*

কথাগুলোর একেবারেই ভার নেই। পাতার মর্মরে মিশে যেতে পারে। অথচ তারা কল্লোল নিয়ে আসে। অথচ তারা বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অথচ তারা ফুল ফলকে নিশ্বাসের কাছে ধরে দেয়। পালকের মতো কথা, তার মধ্যে পৃথিবীর নড়াচড়ার শব্দ।

*

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় আবার অন্য ভাষায় যাওয়া ফিরে আসা। খরজ বদ্‌লে বদ্‌লে নতুন সুর। কথার রাজ্যে টলমল করতে করতে যে পা দিয়েছিল সে যেন এক জাদুকরী। কিন্তু সত্যিকার হদিস দেবে গাছেরা জন্তুরা আগুন আর জল। ছোট্ট বুকটা তাদের অভ্রান্তভাবে শুনেছে। সমস্ত ধ্বনি সেখানে হাওয়ার মতো সহজ।

*

কুয়াশার ঋতু গেল, বরফের ঋতু গেল, রোদবৃষ্টি গেল। তবু ঘরের কথকতায় আকাশ ভ'রে আছে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী অনবরত পারাপার, কেননা চব্বিশটা ঘণ্টা একনাগাড় রক্তের টানে বাঁধা। বরফের মধ্যে, কুয়াশার মধ্যে রোদবৃষ্টিতে পৃথিবী ভরতি কয়েকটা মুখ। বুলার চোখে ছবির পর ছবি।

স্লোগান ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

ইলেকট্রিক সে পাখার হাওয়ায় ভ্যাপসা সুবাস,
বিয়েবাড়ির শাড়ি-ব্লাউজ,
অঙ্গাভরণ,
মেয়েলি ঘ্রাণ,
পান-খাওয়া ঠোঁট খোকাখুকুর,
গলির মোড়ে শানাই,
রাস্তা ট্যাক্সি-জোড়া,
'চাই বেলফুল' হাঁক শোনা যায় যখন তখন—
জন্টি মাসের সে-কলকাতার সন্ধেগুলো
আছে আছেই অন্য জামার বুকপকেটে।

ওয়ার্ডরোবের তাকগুলো সব অগোছালো,
খুঁজলে কিছুই যায় না পাওয়া;
আগ্রহ আর বিরক্তির এই আসা-যাওয়া।
ব্যর্থ হাতের ব্যাকুলতায়—
অন্য কালে
যা ছিল, তা ন্যাপথালিনের গন্ধে নিভাঁজ।
যায় না চেনা,
যায় না চেনা।

মিথ্যে সময় ধ্বংসই হয় এসব কাজে —
ন্যাপথালিনের গন্ধ তারই
উচ্চস্লোগান।

মডেল ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যখন সেই সব মরা দিনের কথা
মনে পড়ে
সূর্যকে অভিশাপ দিই
কারণ সূর্য তার লাল চোখ মটকে
মুচকি হাসে।

আয়না থেকে কুয়াশা মিলিয়ে যায়
তার মধ্যে ছায়া পড়ে :
বর্ষায় কোন নদীটা পাগলা হয়ে উঠছে
কোন্ ফুলটা প্রজাপতি ধরতে চাইছে
রাত থেকে তুমি বেরিয়ে আসছো
কোণারকের একটা পাথর-মূর্তি
হঠাৎ নড়ে উঠে মাদল বাজাচ্ছে।

তারপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুকরো-টুকরো বিষণ্ণতা
তারপর বর্ষার মেঘের মতো বুক-চাপা পাথর
তারপর রাত জেগে-জেগে ভোলবার স্বপ্ন দেখা
তারপর স্বপ্ন দেখে-দেখে জেগে ওঠা।

হেমন্তের শুকনো পাতার মতো মরা দিন
নেশার ঘুম-ভাঙা চোখ যেন সায়াহ্নের সূর্য,
শো-কেসে সাজানো পোশাক-পরা মোমের মডেল হয়ে
প্রেম
মরা চোখে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে॥

সব বয়সের ॥ উমা দেবী

সব বয়সেরই একটা রূপ আছে—
রূপ-দেখা চোখ যার তারই কাছে।
তারই কাছে জমা পড়ে রসের ভাণ্ডারের কণ্ঠলিকা।
সেই রূপ দেখলাম একদিন
যেন উত্তোলিত নব-নীত তক্রের তুলনা,
শীতল সুরভি স্বাদু সুপেয় সুন্দর,
আকণ্ঠ পান করলাম সেই তৃষ্ণাহরণ বস্তু।

সব ইচ্ছেরই একটা সীমা আছে।
সেই সীমাকে লঙ্ঘন না করেই তো অসীমের স্পর্শ!
আমি বসলাম তরঙ্গ-উত্তাল সমুদ্র-তীরের হাওয়ায় হাওয়ায়,
দেখলাম, তীরে আছড়ে-পড়া তরঙ্গের জ্বালা,
সংরাগ-আবেগে শতধা বিকীর্ণ।
শুনলাম, গভীর জলে শ্বাসরোধকারী অতলের অলক্ষ্য আহ্বান,
তবু অবগাহনের সময় গেল পেরিয়ে
ইচ্ছা আমার আত্মাকে আশ্রয় করে ঘুমিয়ে পড়ল।
আর এক অলোক-সুষমায় মনকে দিল ভরিয়ে—
একেই কি বলে চরিতার্থতা!!

সব ভালোবাসারই এক রোদন আছে,
কখনো নামে চক্ষে, কখনো নামে বক্ষে।
আমার ভালবাসার রোদনকে আমি হারিয়ে ফেললাম কোথায়!
মনে করে দেখি—মনে করে দেখি!
কখন যে তারার আলোর এক ধূমল জ্যোতি গেল ছড়িয়ে,
কখন যে স্বাতী নক্ষত্রের আলোর সমুদ্রে জাগল হাওয়ার ঢেউ,
আমি হারিয়ে ফেললাম আমার রোদনকে,
এক জনাকীর্ণ সময়ের ভিড়ে।

আমার অশ্রুর নোনা স্বাদে দুঃখ হলো স্বাদু,
সেই স্বাদুতাকে কবিতার রসের ভিয়েনে চড়ালাম,
এখন ভাবছি—সেই মধুর রোদন,
সেই উত্তাপ-সুকুমার কোমল রোদন
গেল কোথায়—গেল কোথায়!

নির্বোধ, নির্বোধ ॥ মৃগাঙ্ক রায়

কতদূর গেলে জন্মের বারিধারা?
মৃত্যু কতদূর? কোথায় ভূমিষ্ঠ হবার মাটি,
প্রাণের নির্ভর? জানে না উত্তর
তাই কবিতার সেই নির্বোধ কারিগর
শব্দের ভেতরে খোঁজে স্থিরতার বিন্দু প্রতিদিন,
খোঁজে মাটি নিটোল নিভাঁজ,
শব্দ বাঁধে শব্দের সংরাগে, বাঁধে বিরুদ্ধ ধ্বনিকে
কূটগ্রন্থির কারিগরিতে। প্রতিটি কবিতার জন্ম হলে
তার মৃত্যু হয় একবার, একবার ভূমিষ্ঠ হয় নিজে।
অমনি নিঃশব্দে বাজে কার খর করতালি,
দশ দিকে দিগন্তে বাজে, ঊর্ধ্বে বাজে,
বাজে আয়ুর ভিতরে অন্ধকারে। হায়! ধ্বনি তার
সুস্থির পাখীর মতো বাসা বাঁধে না করতলে।।

নদীর ধারে একদিন ॥ রাম বসু

আমরা একদিন নদীর ধারে বসে কেঁদেছিলাম
আমাদের চুলের ভিতরে লুকিয়ে পড়ছিল রৌদ্র
আমরা পৃথিবীর শেষ ফুলের মতো চুপ করেছিলাম
আমরা টের পাচ্ছিলাম আমাদের সময় হয়ে আসছে।

তখন সব কথা বলার ব্যাকুলতা ছিল না
আমাদের শরীরে জলের আর্দ্রতায় রামধনু ছিল
সব চেয়ে নিঃসঙ্গ মেঘটির দিকে তাকিয়ে আমরা হেসেছিলাম
কারণ রক্তবর্ণ গোলাপও আমাদের চেয়েও মুখর।

কোন একটা পাখি আমাদের একটি পালক দিয়েছিল
কোন এক খণ্ড বন্ধ্যা মাটি একটি অপরূপ আর্তনাদ দিয়েছিল
কোন এক স্রোত মুখ তুলে বলেছিল : শেষ দীপ শিখা
আমরা নদীর ধারে কাঁদছিলাম তখন অন্ধকার এল।

কোন দিন ফুলগুলি রামধনু হবে না, কোন দিন না
আমাদের চোখের তারা থেকে উৎসারিত হবে না ঝর্ণা,
কোন দিন না
পৃথিবীর মৃত পরাজিত পাথর খণ্ডের মতো আমরা থাকবো
নদীর কিনারে
কেবল আমাদের সত্তা ব্যাপ্ত হতে থাকবে আমাদের অগোচরে।

কারণ সময়ের প্রোজ্জ্বল দাবী মানুষের বিবেকের কাছে
কারণ অন্তরীপের অরণ্যে ভাসে লবণের শান্ত সমারোহ
ফলভারে অবনত এক শান্ত নীড় পৃথিবীর মানচিত্র
শুধু সেদিন আমরা থাকবো না, আমরা থাকবো না।

কেবল হৃদয় ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অথচ একদিন আমি চাবিকাঠি আমিই দরোজা
আমিই ভিতর-আমি, কড়া নেড়ে বাইরে আমি ম্লান
আর ছিলে তুমি, ছিল তোমার—ওই অন্ধকারে স্নান
লবণার্দ্র সুদেহের ঢেউ সেঁচে মনমুক্তো খোঁজা
কিংবা ও-মুকুরে খোঁজা প্রতিচিত্রে আত্মপরিচয়
উপরিপাওনায় যদি হয় চিত্রে হৃদয়ও ব্যঞ্জিত :
ভাবিনি, হৃদয় শুধু স্মৃতিগন্ধ স্বপ্ন-সুরঞ্জিত
কেবল হৃদয়।

তারপর আমার যাত্রা আমারই ভিতর, দোর খুলে
সিঁড়ি ভেঙে বয়সের বাঁক নিয়ে শ্যাওলায় ছাতায়
মখমলমলিন জীর্ণ শূন্য উচ্চ উচ্চ উচ্চতায়
গভীর গভীরতায়—হায়, চেয়েছি তোমায় মনভুলে।
প্রদোষপৈঠার প্রান্তে অকস্মাৎ তীব্র আবিষ্কার
—হারিয়ে গিয়েছি আমি এবং পেয়েছি ও-হৃদয়
নিজেকে ছাড়িয়ে স্মৃতিগন্ধ স্বপ্ন-সুরঞ্জিত আর
কেবল হৃদয়।

সারা রাত ধরে ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

সারা রাত ধরে
ভাঙা টুকরোগুলি ঝরে পড়ছিল
ঝনঝন ঝনঝন ঝনঝন
সারা রাত ধরে, ভাঙা কাচ,
যেন উচ্ছ্বসিত টুকরো টুকরো কান্না,
যেন গলির দেয়ালের ওপর
ছেঁড়া বালিশ থেকে ছিটানো অসংখ্য তুলো—
যেন কেউ কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি
যেন কোন বাগান কখনো ফুলে অহঙ্কৃত হবে না,
যেন আমরা কেউ কারো হাত ধরিনি।

সারা রাত ধরে শব্দটা বড়ো হল,
আরো বড়ো হল
শব্দের ছায়া আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত
হেঁটে গেল,
যেন কেউ আকাশের মতোই নিমগ্ন,
নগ্ন।

সারা রাত খাঁচার মধ্যে একটা পাখি,
বটফলের মতো লাল,
ছটফট করছিল, সারা রাত,
যেন বুকের পিঞ্জরের মধ্যে।

ঝরে পড়ছিল কাচ
ছায়াটা ভয়ের মধ্যে ভেঙে যাচ্ছিল,
একটা ডানা, শুধু একটা আলোকিত তৃষ্ণার্ত ডানা,
সারা রাত।

অন্য মরুভূমি ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মরুভূমি দু'রকম উষ্ণ কিংবা হিম হতে পারে।
আফ্রিকায় যেতে পারে কিংবা যাও তুহিন তুন্দ্রায়।
ভীষণ উত্তাপময় ধূ ধূ বালি যেমন মরুতে,
অন্য দিকে শস্যহীন বৃক্ষশূন্য হিমার্দ্র অঞ্চল।
অথচ তোমাকে কিন্তু যেতেও হবে না দূরদেশে,
মরুভূমি অতি কাছে মরুভূমি সমস্ত শহরে;
মরুভূমি ট্রামে বাসে মরুভূমি সুবার্বান ট্রেনে,
চৌমাথার চৌরঙ্গীতে ট্রাফিক পুলিশ যেইখানে।
মরুভূমি জ্বলে' ওঠে নিয়ন আলোয় সন্ধ্যাকালে
ভিড়াক্রান্ত শহরের বিচিত্র উদ্বায়ু পদক্ষেপে;
মরুভূমি প্রেমিকের বিভিন্ন উদ্যোগপর্বে, চোখে,
প্রেমিকার অবয়বে, যৌবনের অকাল ক্লান্তিতে।
মরুভূমি রেস্তোরায়, টেবিলের মৃদু গুঞ্জরণে,
দিনের অসহ্য রৌদ্রে, নাগরিক বিমর্ষ মিছিলে;
মরুভূমি অব্যাহত বিবাহবিহীন মাতৃস্তনে,
যে-কোনো উদ্যোগপর্বে বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তে কার্বঙ্কলে।
বালুকায় তীব্রতাপে কিংবা হিমে মৌন শূন্যতায়
অন্য এক মরুভূমি শতাব্দীর পথে জ্বলে' যায়॥

কখনো বর্ষণশেষে ॥ তরুণ সান্যাল

কখনো বর্ষণ শেষে কলকাতার গোয়ালন্দ হাতে রাখে হাত
দুরন্ত চাকায় যেন খোলা পদ্ম এবং নরক
প্লাবনে রাস্তার প্রতি মোড়ে
হাঁটু জলে আত্মঘাতী বাহিনী হঠাৎ
বাস স্টপে দোতলা একতলা ট্যাক্স আক্রমণ করে

এবং কলকাতা—
ইস্পাত পাথর পিচ ডাস্টবিন খোয়ায়
সুতানুটি না গোবিন্দপুর
কবে-বা বন্দর ছিল
মনে পড়ে যায়
বাংলার শ্যামল যেন ভেজা মাথা দাউ দাউ জিহ্বায়
মৌসুমী বর্ষণ চায়
কলেজ স্ট্রীটে বকুলের পাতা
এপার ওপার গঙ্গা
মেঘনা ব্রহ্মপুত্র না যমুনা
না সমুদ্র ঘরের দুয়ারে ছলছলায়

দশতলা বাড়ীর চূড়া কালো মেঘে উদ্যত ফলক
ঊর্ধ-অধঃ সুতানুটি গ্রামের মানুষ লিফ্‌টে
উঠে নেমে যায়
অনেক ভেসাল পানশী উলাপ চলেছে ঘোলা জলে
জলের কোমলে বৈঠা বাম্পারে ছপাস ঢেউয়ে
কল্লোলে চলক
হঠাৎ ট্রামের তারে এসপ্লানেডে
ঘনশ্যাম সুবিস্তারে দ্রুত শাঁই শাঁই ট্রাম বকের জাঙাল

আমি বলি হা কাঙাল
পরবাসী স্বদেশে বিদেশী
শেয়ালদায় ছুটি ডাকে,
দূরে সারা ব্রীজ ঝমঝমায় ॥

কেন দুঃখ নেশার মত ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

কেন দুঃখ নেশার মতন লাগে
শুধু অনিদ্রায় রাত্রির হৃৎপিণ্ড শোনা
প্রহর কাটছে গোটা পৃথিবীর ভার বয়ে

আলপিন ফুটে কখন চুপসে গেছে বেলুনগুলো
এক অদৃশ্য কৃপাণ আমাকে দুভাগ রাখে সব কিছু থেকে
অনিদ্রায় শুনি রাত্রির হৃৎপিণ্ড

ফাঁকা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে যেন সারা আকাশ ঝরছে
আলপিন ফুটে কখন চুপসে গেছে বেলুনগুলো
যার বিশাল পাখির ছায়া মুখের উপর দিয়ে

দুঃখ এখন নেশার মত লাগে
আর্তেজির গভীরতা থেকে উঠে আসবে কিছু কি
বজ্রাহত শাল কাঠে ওম ব্যনায় বুদ্ধের দেবতা

জয়ী নই, পরাজিত নই ॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টনটন করে ওঠে
হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন
সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আদিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ
কিছু নিচে ছটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায় চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা—এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্ণার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোলকা ডট্ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাবুলা গাছের শুকনো কাঁটাও দাবি করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব।
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনিই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।

কিন্তু ॥ গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

আমার মনের বেহালাটা অকেজো হয়ে
অযত্নে পড়ে ছিল;
ওর তারগুলোয় জং
আর সারা গায়ে মাকড়সা ধরে গিয়েছিল।
ফেলে রেখেছিলাম ওটাকে অতীতের বাক্সয় পুরে
কিন্তু হঠাৎ তুমি এলে,
বের করলে ওটাকে,
যত্ন করে জং খসালে,
ঘষে মেজে চকচকে করলে।
ওর ঢিলেঢালা তারগুলোকে
টানাটানি করে টনৎকারের উপযোগী করে তুললে,
তার পরে মারলে ঘা তোমার ছড় দিয়ে।
আর ওর সমস্ত তারগুলো
সুরে সুরে গেয়ে উঠল,
নেয়ে উঠল।
আমার উদাসীন দিনের ঘুম ভাঙল
ভাঙল।

কিন্তু যখন তুমি চলে যাবে?

শ্বেতপদ্ম ॥ আলোক সরকার

রঙের ব্যবহার এখন সীমিত। এখন কেবল
শাদা আর কালো। এখন তোমার প্রতিফলনের উপচার
শাদা আর কালো।

দুপুরবেলার আলস্যনিদ্রা, বিকেলবেলার
হলুদাভ আলো—এরই ভিতর তোমার প্রণয়
তোমার অভিমান।

আলতো চুম্বন অথবা উদাস ক্ষণিক হাত-রাখা
নমিত পিঠের শীতল সহজতায়, পশ্চিম দিকের
মাঠের উপর নীরব ভ্রমণ—

শিশুরা খেলা করে, প্রজাপতি ওড়ে, নিমগাছের তলায়
নিমফল ছড়ানো। কাঠবেরালির স্তব্ধতা, নির্জন গোরুগুলোর
চিরদিনের নিরাসক্তি ক্রমজায়মান।

জারুল গাছ নেই, কৃষ্ণচূড়া নেই, তোমার আগ্রহ
খোঁপার অন্তরালে গোলাপের রক্তিম সংগ্রহ করে নি—
অলস স্বাভাবিকতা। আধো অন্ধকার সন্ধ্যায়

আমরা বাড়ি যাবো। শিশিরঝরার স্তব্ধতা, গোরুরগাড়ির স্তব্ধতা
অস্বীকৃত তন্দ্রায় ধ্যানমগন শ্বেতপদ্ম অকম্পিত শ্বেতপদ্ম
তোমার দুই হাত অলস সমর্পণে আমার দুই হাত।

কৃষিপ্রণালী ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জল টেনে দিয়ে শুধু লক্ষ্য রাখি শিকড়ের দিকে।
আনি স্রোত কোমল শ্যামল বাঁকা গোপন গঙ্গার
পাথরের ঢালু খুলে আনি ধারা ঝর্ণার প্রতীকে,
কব্জির কঠিন শব্দে ফেটে যায় বৃষ্টির ভৃঙ্গার।

প্রেমের বিষয়ে ঠিক একই উপমায় কাজ চলে:
রমণীর প্রতি প্রেম কিংবা গাঢ় স্বাদৌশকতার
ক্ষেত্রে উক্ত দৃশ্যগুলি কবিতার মত কথা বলে,
রক্তের নিয়মে সবই সমার্থক সূত্রে একাকার।

যেমন শস্যের শীষ যথারীতি প্রকাশ্য বাতাসে
কর্ষণে মাখায় রৌদ্র ভরামাঠ প্রবল লাঙলে,
তেমনই সহজ ভঙ্গি প্রেমচ্ছায়া—মৃদু চারাঘাসে
সবুজ লজ্জায় দোলে প্রাকৃতিক সজল উজ্জ্বলে।

শুধু জল টেনে দিলে বৃক্ষশাখা ওঠে না আকাশে
লক্ষ্য রাখা চাই মাটি মৃত্তিকার ভূমধ্যনিরিখে,
জল চাই শিকড়ে সুপ্ত উশখুশ বীজের বিশ্বাসে;
নচেৎ হয় না কিছু শুধু জলে চাষবাস শিখে।

তিন সঙ্গী ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাগ্‌নানে যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেবো,
সারা রাস্তা কথা বলবে।
বাগ্‌নানে যাবার পথে কাদা ছুঁড়বে যে-কেউ আমাকে
তল্লিপতল্পা থেকে অমনি তিনটে বাচাল ফলকলাবে,
কথায় কথায় তারা লোফালুফি করবে কলকাতাকে,
তাদের বাদ্যি জানি বড়ো জোর আম আঁটির ভেঁপু।

তাদের গোলমাল কিছু ভিন্ন ধরনের, থেকে-থেকে
শোনাবে ছড়ার ছন্দ।
স্টেশনে লোকাল থামলে তালে-তালে বলে উঠবে : "কে কে
দজ্জালতা করবে এসো ঢেলে দেবো মালতীর গন্ধ"—
ট্রেন চলতে শুরু করলে চোখা চোখা শব্দের চেরাগে
এমন জ্বলবে যেন জোনাকি জ্বলেনি এর আগে।

বাগ্‌নানে পৌঁছবো যেই আমার চৌহদ্দি সারা হবে,
বাচাল তিনটেকে ডেকে পয়সা দেবো, এক মুহূর্তে ওরা
থেমে যাবে, সব পাগলাঝোরা
থামিয়ে এ ওর দিকে তাকাবে অকূল পরাভবে;
কেননা আমি তো যাবো ঘরণীর কাছে বাড়িতেই,
তিনটে বাচাল জানে তাদের কোথাও বাড়ি নেই।

নৈবেদ্য ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ক্ষমা? কার কাছে ক্ষমা? শোনো দেবীবাদ্যে বেজে ওঠে
প্রথম পূজার হাহাকার। না, আমার পাশে কোনো
ব্রাহ্মণমন্ত্রের ধ্বনি নেই; জামাকাপড় না ছেড়েই আমাকে
সেই করে

ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল, বাঙ্ময় শুধু
একটি উৎপল। বারবার
কোন দুঃখে কম পড়ে যায় ফুল, অধিবাস অসমাপ্ত থাকে,
আমি দেবীকামূর্তির চোখে একদৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা
তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি মুখের আধেয় ঐ
কাঠ, মড়, শিল্পী মাটির আড়ালে
কোনো প্রচ্ছন্ন পদ্মের চৌর্য লুকানো রয়েছে কিনা।

এখন আমার বাঁহাতে চোখের দুই মণির চেয়েও দামী
গায়ত্রী উষার পদ্ম
ডানহাতে চণ্ড কুঠার, আর আমি আরূঢ় জল্লাদ,
মূল তোরণ এড়িয়ে
ঢুকে পড়েছি মণ্ডপে—মা, মাগো, তাকিয়ে দ্যাখো এই
অচ্ছুতই এনেছে আজ ব্রহ্মশব্দ দিয়ে গড়া শেষ নিসর্গের পদ্ম,
কবির নিজস্ব দুঃখে একা

পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে আদিত্য উত্তাপে এতদিন পরে
ফুটে উঠেছে। না আমি
স্নান করে, পাটভাঙা ধুতি আণ্ডারওয়ের পরে

ঢুকতে পারবো না ইষ্ট সৌন্দর্যের কাছে;
কিন্তু তার জন্য কার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে?
কে আমার শরীরের কাছে গঙ্গাজল আনার সাহস রাখে।

চলে যাবার পায়ের চিহ্ন ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মস্ত বড়ো বাগান, আমি তার কাছে নগণ্য বাড়ি
শূন্য, ফাঁকা, ঈষৎ বাঁকা। দাগ পড়েছে হয়তো তাঁরই
চলে যাবার চিহ্ন...হলেন দ্বিধায় প'ড়ে বিদেশমুখী—
বৃহতে বাস করণীয়ই, আমায় দিতেন ইচ্ছে-উঁকি
তৃপ্তি পেতুম, তার বদলে, এই যে নিছক সটকে-পড়া
কোন্ প্রতিকূল আকর্ষণে আমাকে তাঁর সঙ্গে জড়ায়...
ছিন্নভিন্ন

মস্ত বড়ো বাগান, আমি তার কাছে নগণ্য বাড়ি
শূন্য, ফাঁকা, ঈষৎ বাঁকা। দাগ পড়েছে হয়তো তারই
চলে যাবার পায়ের চিহ্ন॥

কুমোরটুলির পোটো ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

দুহাতে দুচোখ ঢাকলে শেল বেঁধে অনাবৃত বুকে।

সহজাত কবচকুণ্ডল নেই, তবু সম্রাটের অভিমানে
বিশ্বের স্থপতি সাজি। তর্জনীর ঈষৎ হেলনে
জন্ম মৃত্যু স্বৈরাচার—এই সব অস্থায়ী পুতুল
নাড়াচাড়া করে যেতে লোভ হয়,
উদগ্র বুকের শিরশির
দুই ব্যগ্র ঠোঁটে চেপে কুমোরটুলির পোটো
যেভাবে দিন-কে করে রাত,
যে নিবিড় আকাঙ্ক্ষায়
আভার নরম বুক দুধে টন্‌টনে হয়ে ওঠে—
সেই রাজকীয় অহঙ্কারে
যেন একা চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই অন্ধের সমাজে,
সহজাত কবচকুণ্ডল নেই, হায় নির্বীজন, অক্ষমতা,
দুহাতে দুচোখ ঢাকলে অনাবৃত বুকে শেল বাজে।

আত্ম নিবেদনে ॥ হরেন্দ্রনাথ সিংহ

তুমি নয়নের জ্যোতি আঁধারের আলো,
কাছে লভি স্পর্শমণি জীবনসন্ধ্যায়।
দেহমনে শক্তি দিলে অজানা ব্যথায়,
কি আশ্চর্য মরীচিকা চকিতে পালালো।
কত প্রিয় বিচ্ছেদের হোম অগ্নি জ্বালো,
তৃষিত বাসনা বুকে চিত্তের চিতায়—।
অতীতের স্মৃতি তবু ভোলা নাহি যায়,
সর্বস্ব সঁপিয়া তোরে হৃদয় জুড়ালো।

প্রণয়ের অভিনয়ে ক্ষণেক বন্ধন,
দগ্ধ করে নরদেহ—দেহের মিলনে।
ফুরায় কালের স্রোতে নশ্বর জীবন,
আশা লয়ে আয়ু যায় অলীক স্বপনে।

মোহিনী মায়ার মোহে মানব বিহ্বল,
পাথেয় হারায়ে ফেলে শেষের সম্বল॥

মুঠোর ভিতরে বৃষ্টি ॥

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

কিছু চাঁদ উড়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে বেলুনের সাথে
কিছু মেঘ লেগে আছে করতলে রেখায় জড়িয়ে;
মুঠোর ভিতরে তাই বৃষ্টি হতে পারে
জ্যোৎস্না হতে পারে দূরে, মুঠোর বাহিরে।

আমি কোনদিকে যাব? নদীর দুধারে দুটি আঁখি;
দুহাত বাড়িয়ে শুধু জল পারে দুই পাড় ছুঁতে
অনাথায় ছাড়াছাড়ি—দুই খণ্ড মাটি!
আমি এইখানে থাকি, জলের নিকট কিছু শিখি।

আমি এইখানে থাকি
অতি ধীর পায়ে পায়ে হাঁটি।
অনুযোগ করে কিছু হয়?
যেখানে হৃদয়
সেইখানে যেতে হ'লে পথে দেরী হয়।

যতক্ষণ ফুশফুশের শব্দ ॥

শান্তনু দাস

বেঁচে আছি
আক্ষরিক কোন শব্দ মাদলের দ্রিমি দ্রিমি হয়ে কানে বাজে,
ফোঁটা ফোঁটা স্যালাইন বুদবুদ
শিরা উপশিরা বেয়ে কখনো রক্তে খেলা করে :

বুকের মধ্যে বুক, সিলিণ্ডারে অক্সিজেন নিয়ে
যতক্ষণ ফুশফুশের শব্দ শোনা যায়
চৌকাঠেতে অন্ধকার হাঁটু গেড়ে বেড়ালের থাবা
বহুক্ষণ ওৎ পেতে আছে :

শরৎকালের মেঘ, মেঘ সরে গেলে
শাণিত ছোরার মতো হৃদপিণ্ডে রৌদ্র গিয়ে বেঁধে
কাশফুল হাওয়া লুকোচুরি:
তবু বৃষ্টি শার্সি ঠেলে উদ্দাম শৈশব
কখনো চোখের মণি কখনো দু ভুরু ছুঁয়ে যায়.....
শিউলি ঝরার শব্দে, নূপুরের ধ্বনি কানে বাজে :

রক্তের ভেতরে বীজ, বুকের মধ্যে বুক,
সিলিণ্ডারে অক্সিজেন.....
অন্ধকার বেড়ালের মতো থাবা গেড়ে
বহুক্ষণ ওৎ পেতে আছে

ডাক্তার, যতক্ষণ ফুশফুশের শব্দ শোনা যায়।

এতো অক্ষমতা নিয়ে ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এতো অক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকা
দুর্যোধন! কেন বেঁচে আছো?
হ্রদের দর্পণে মুগ্ধ প্রতিচ্ছবি দেখে অনুসূয়া অরুন্ধতী
হেঁটে আসে ক্লান্ত চাঁদ
মধ্য আকাশের রুগ্ন নক্ষত্র-সভার মধ্যস্থলে
খুব বেশি উজ্জ্বলতা নীলিমায় এখনো ফোটেনি
বড়ো বেশি অন্ধকার! রাত্রির সমুদ্র ফোঁসে
শূন্যে ছোঁড়ে লাথি

মাংসভুক্ প্রাণীদের স্থির লক্ষ্যে
উপবাসী লুণ্ঠিত শরীর ফেলে রেখে
কেন রাত্রি জাগরণ?
কেন পূর্বাকাশে খোঁজো সূর্যের সূচনা?

এখনো দুহাতে ভর দিয়ে খুঁজছো ধুলোমাখা মুকুট রাজন!
অস্থির মাটিতে শব্দ বাতাসে তরঙ্গ অশ্বগজের চীৎকার
হাওয়ায় মৃত্যুর গন্ধ
রণক্ষেত্র ফুঁড়ে উঠছে অতৃপ্ত নিঃশ্বাস
কুরুক্ষেত্র ঢেকে দিচ্ছে বিষাদের মেঘ
কান পাতো দ্বৈপায়ন রক্তের সমুদ্র
তুমি কোথায় পালাবে?

কিছুই ফেরে না
তুমি হাতের মুঠোয় কাকে ফিরে পেতে চাও?

এতো অক্ষমতা নিয়ে জেগে থাকা?
হাঁটু মুড়ে কতোকাল ধুলোয় লুটোবে?
জ্যোৎস্নার লণ্ঠন নিয়ে রাতের পৃথিবী হাঁটে সূর্যের উদ্দেশে
এতো অন্ধকার নিয়ে বুকের খোদলে রাজা কেন জেগে থাক?

মুকুট হারিয়ে গেলে অক্ষমতা বড়ো তীব্র বাজে
এর চেয়ে পলায়ন নিঃশব্দ প্রয়াণ ঢের ভালো মনে হয়।

প্রস্তাব ॥

রাজলক্ষ্মী দেবী

যে-যাদুর যে-মন্তর, তা-ই যদি জানো,
তবে কেন কথা বাড়াও ললিতা? তবে, অপরাহ্নকালে
কনে-চন্দনের মতো অন্ধকার মেখে
সর্বাংগে প্রস্তুত হও। তবে নিরালায়, মুখোমুখি,—
বসো মাপসই ছায়া গলগ্ন ক'রে।
তবে আমি চাপ চাপ কালি ছেনে গড়বো প্রতিমা,
ছায়া-শরীরিণী হবে, ধূমাবতী অস্পষ্ট ইশারা।
মুখের কুঞ্চিত রেখা, বয়স-বাড়ানো চুলগুলি
উহ্য থেকে যাবে। হবে অভিরাম সৌন্দর্যপুতুলি।
তবে স্বপ্নমধুসরিত নেশার বে-আইনী কুঠুরিতে
ধ্যানমগ্ন হ'য়ে যাও। মগ্ন হও যুগলমিলনে।
তরংগের মতো সন্ধ্যা ঝরুক্। একান্তে, সন্তর্পণে
যে-প্রশ্নের যে-উত্তর, তা-ই শুধু দিয়ো।

তৃষ্ণা ॥

গণেশ বসু

তোমাকে ঘিরে সেদিনও ছিলো বুকের গভীরে
সাহস বড়ো বাঁচার, ঘন বিষাদ আকাশে
নক্সানিপুণ কার্পেটেরও তারার শরীরে
আনন্দেরই স্বপ্ন গাঢ়, শীতল বাতাসে
ঘর বানানো রোদের ঘ্রাণ নিকট প্রবাসে।

সাহস বড়ো বাঁচার ঘন, দুহাত বাড়ালে
দুঃখ ভুলে প্রতিশ্রুতি, খুশির এষণা
কংক্রিটেরও বাঁধ মানে না, ধোঁয়ার আড়ালে
অনন্তকাল উপস্থিতি, দামাল চেতনা
যৌবনেরই, রক্তে শুনি তৃষ্ণা রেখো না।

তৃষ্ণা ছিলো রুক্ষ বিশাল অবাক পাঁজরে,
প্রপেলারের স্বপ্নে গাঢ়, চোখের দীঘলে
ফসল তোলার পেশল হাসি, প্রেমের ভিতরে
সাঁতরে ফিরি; কিন্তু একি, আশার ফাটলে
যন্ত্রণারই কান্না, ত্রিকাল সাপের ছোবলে।

অনাবাদী রক্তে শুনি তৃষ্ণা রেখো না।

তোমার বুকের মধ্যে ॥

গৌরাংগ ভৌমিক

কিছুই তোমার নেই আর্তনাদহীন।
তোমার বুকের মধ্যে দৃশ্যপট নিয়ত বদলায়—
গভীর মায়াবী স্পর্শে, জাদুকরী স্মৃতি
অর্ধেক শরীর গড়ে
অসমাপ্ত মুখের মিছিলে।

প্রত্যহ বিকেলবেলা
হাওয়া বয় দিল্লী থেকে কলকাতার দিকে।
হাওড়ার ব্রীজের চূড়ো কেঁপে ওঠে,
নীলকণ্ঠ পাখির শরীর—
শহরে বিচূর্ণ হয়।
ময়দানের ঘাসের কার্পেটে
কিছুক্ষণ ভালোবাসা রক্তবমি করে।

অবশ্য এসবই তুমি
বুঝতে পারো পাখিদের সাথে কথা বলে।
তোমার ঘরের মধ্যে আয়না নেই
কিংবা নদী কিংবা বৃক্ষ কিংবা ক্যালেণ্ডার।
পৃথিবী মাপতে গিয়ে ফিরে আসো নিজেকেই মেপে।

এখন সকালসন্ধ্যা-মধ্যদিন-মধ্যরাতময়
অজ্ঞাতবাসের সংগী
কাকে চাও?—নারী! ভালোবাসা!
তোমার বুকের মধ্যে, একা হাওয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে—
ঘড়ির ডায়াল জ্বলে,
সমস্ত কলকাতা।

ত্রিকূটে পাহাড়ে বাঘ ॥

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

শুনেছি সেদিনও ডোরাকাটা দুটি বাঘ
নেমে এসেছিল পাহাড়ের কোল বেয়ে
গভীর বনের ছড়ানো পাতার স্তূপে
পা টিপে পা টিপে নেমে এসেছিল তারা
সভ্যজগতে বায়ুবদলের লোভে।

ওরা এসেছিল শহরের কাছাকাছি
পাঁচক্রোশ পথ দৌড়ে, অন্ধকারে
অনেকে দেখেছে আগুনের মতো লাল
গোলাকার চোখ জ্বলেছে অনেকক্ষণ
শহরে তখন সবাই মগ্ন ঘুমে।

ত্রিকূটে এখনো মাঝে মাঝে বাঘ ডাকে
প্রতিধ্বনিতে পাখিগুলো ছাড়ে বাসা
পাথরে পাথরে জ্বলে ওঠে চকমকি
ভয়ে কাঁপে পথ, পাহাড়ের যত প্রাণী
ঘুম ভেঙে যায় গম্ভীর গর্জনে।

এখনো স্বপ্নে পা টিপে পা টিপে আসে
থাবায় নখরে বিদ্যুৎ ঝলসায়
আয়নার বুকে নিজের ছায়ার মাঝে
ত্রিকূটের বাঘ রক্তের লোভে ডাকে

বড়ো চেনা সেই ডোরাকাটা দুটি বাঘ।

সন্ধ্যার বনভূমি ॥

আশিস সান্যাল

অদ্ভুত নিরালা এই বনভূমি,
নির্জন জোছনা;
যতদূর বিরাজিত সুনির্মল সবুজ পাহাড়।
হাওয়ার উজ্জ্বল ধ্বনি
জলের মতন দ্রুত উৎসারিত।

আমি পুনর্বার
দাঁড়ালাম মুখোমুখি তোমার সম্মুখে।

মুহূর্তে উদাসী চাঁদ,
সুদূর বিজন,
ছুটে এসে শব্দহীন শুধালো আমাকে:
'কোথায় চলেছো বন্ধু?
কি চাও আমার কাছে স্বাধীন বিশ্বাসে?'
বললাম : 'ভালোবাসা।'

সহসা মেঘের শব্দ ছড়ালো আকাশে।

মনে হলো, শব্দ নয়—
পুনর্বার ক্লান্ত রক্তে যেন এক নবীন বিস্ময়,
অকস্মাৎ আবির্ভূত।
তৃষ্ণার ভেতরে
যেন ফের শুভ্র পাখি উড়ে যায়।
উতল ডানার শব্দ
শিউলি ঝরার মতো ছড়ায় ক্রমশ শুধু বিশ্বস্ত নিখিলে।
মেঘে মেঘে শব্দ নয়—
আবার বেদনা ঝরে
প্রবল বৃষ্টির মতো পুনর্বার প্রবাহিত রক্তের তিমিরে॥

ক্রস-কানেকশান-এ ॥

মণীন্দ্র রায়

ওরা কথা বলে কারা?
আমাদের কথার আড়ালে
যেন হিজিবিজি রেখা, বহুদূরে যার
যোজন ব্যাপ্ত শূন্যতায় দিয়েছে হেঁয়ালি
আমাদের দুটি মুখ?

ওরা কে? কী চায়? ওকি প্রতিধ্বনি:
নাকি চেতনার অন্য দিগন্তের স্তরে
সংসারের স্থির নড়াচড়া—
যার বেচাকেনা, দ্রোহ, অশ্রুময় হাসি
নিয়ত গোপন থেকে হৃদয়ে ফোটায়
আকুল শব্দের তৃষ্ণা,
এই কথা বলা, এই
রাত্রিদীর্ণ উল্কার আকাশ!

অনুসন্ধান

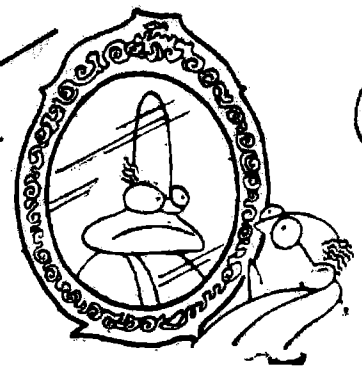

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটা অদ্ভুত যোগাযোগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয়টুকু হোল। দুজনেই ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে আছি চৌমাথায়, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারছি না। এই সময়টায় চাহিদা বেশি। ভর্তিই বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ পরে পরে গোটা-দুই যা খালি দেখা গেল, তাদের ড্রাইভারও হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল; নেবে না।

উভয়েই অধৈর্য হয়ে উঠেছি, তবে ভদ্রলোক একটু যেন বেশি; অন্তত তাঁর দু'-একটা মুদ্রাদোষের জন্যে বোধ হচ্ছিল বেশি। খালি হোক, ভর্তি হোক, বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখটা কুঁচকে 'ইস!' করে একটা শব্দ করে মাটিতে পা ঠুকে যাচ্ছিলেন; শেষের খালিটা ডাকা সত্ত্বেও হাত নেড়ে বেরিয়ে গেলে আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন—"ভেবেছে কি বলুন দেখি? ধরে পুলিশে হ্যান্ডওভার করা যায়। খালি থাকলে ওরা থামতে বাধ্য।"

বলতে কি, অধৈর্য হলেও ও'র অধীরতার ভঙ্গি থেকে খানিকটা কৌতুক আহরণও করছিলাম, একটু হেসেই বললাম —"পয়সার জন্যেই ধরা দিল না, হ্যান্ড-ওভার হওয়ার জন্যে দেবে?"

বলা-মুখ বলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেই বলতে পারি। ভদ্রলোক একটু কড়া দৃষ্টিতেই আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন —"আপনার বেশ ভালো লাগছে? যাবেন কোথায়?"—বিদ্রূপের টোনেই।

আমি হেসে উত্তর করলাম—"লাগে কখনও, বলুন? যেতে হবে সেই শিবপুর।"

কোন উত্তর না দিয়ে, হাতে যে একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছিল, সেটা মাটিতে ফেলে জুতার ডগা দিয়ে পিষতে পিষতে নিজের মনেই বললেন—"নাঃ, এগিয়ে দেখতে হোল; আমার এখানে হাঁ করে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।...যত্তো সব!..."

আমার ভুল হতে পারে, তবে ও'র ভঙ্গি দেখে মনে হোল 'ভ্যাগাবন্ড' বা ঐ জাতীয় কোন কথা দিয়ে মনে মনে বাক্যটা পূরণ করে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর ঘুরে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা এগিয়েছেন, এদিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসতে আমি হাত তুলে ডাক দিয়েছি, উনি ঘুরে চাইলেন এবং সেটা এসে দাঁড়িয়ে পড়তে এগিয়ে এসে বললেন—"পেয়ে গেলেন দেখছি শেষ-পর্যন্ত।"

—প্রথম দিকটায় একটু ঈর্ষা বা অনুতাপের ভাব, তারপরেই প্রশ্ন করলেন—"শিবপুরে যাবেন বললেন না?"

উত্তর করলাম—"হ্যাঁ, শিবপুরেই।"

"শিবপুরে—কোথায়?"

বললাম। শুনে একটু বিস্মিত হাসি নিয়ে চাইলেন আমার পানে, একটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে যেমন করে চায় মানুষে। বললেন—"সে তো বি-ই কলেজের কাছে।... কৈ বলেননি তো এতক্ষণ আমায়!"

না বলার নিতান্ত স্বাভাবিক হেতুটা জানাতে যাচ্ছিলাম, উনি তার আগেই বললেন—"তাহলে তো একসঙ্গেই যেতে পারি, আপত্তি আছে?"

বললাম—"আপত্তি আর কি? বেশ তো গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। উঠুন।"

গাড়ি স্টার্ট দিলে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি নিকেলের সিগারেট কেস বের করে ডালাটা খুলে আমার সামনে ধরলেন। বললেন—"আসুন; চলে?"

বললাম—"আজ্ঞে না; ধন্যবাদ। আপনি দেখছি প্রায় চেন-স্মোকারই একরকম।"

ভদ্রলোক একটি বের করে নিয়ে সিগারেট-লাইটারে ধরালেন। মুখের ধোঁয়াটা বের করতে করতে বললেন—"ঠিক অতটা নয়। ওটা তো অবথাই গেল।"

"আপনি সে-রাগটা ওটার ওপর দিয়েই মেটালেন।"—একটু হেসে বললাম আমি। রাগটা তো আসলে ছিল আমার মন্তব্য নিয়েই, একটু অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে সামলে নিয়ে বললাম—"কলকাতায় বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি নিয়ে অধৈর্য হওয়া আর চলে না, যেমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

একটু আলাপের টোনে প্রশ্ন করলাম—"চলে? আপনিই বলুন না।"

"কোনমতেই না।"—মাথা নেড়েই অভিমতটুকু জানালেন ভদ্রলোক। তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন—"কিন্তু আমার যে এক মুশকিল হয়েছে, সময়টা তো আমার নিজের নয়। ট্যাক্সিটা না পেলে যে কি করতাম!...

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"যাচ্ছি তো এক জায়গাতেই আমরা, আপনার রাস্তাটার নাম?"

বললাম। শুনে একেবারে ঘুরে বসলেন আমার দিকে, প্রশ্ন করলেন—"নম্বর?"

আমাদের বাড়িটা এজমালি পুরাতন আমলের বড় বাড়ি, কয়েকটি জ্ঞাতি-পরিবার নিয়ে। এক নম্বরেই চলে, তবে কি মনে হতে আমি নম্বরটার সঙ্গে একটা ইংরেজি 'এ' জুড়ে দিলাম।

খুশিতে-বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললেন—"বলেন কি! আমিও তো সেই বাড়িতেই যাচ্ছি। একটা ইন্টারভিউ রয়েছে। সন্ধানীর পক্ষ থেকে।"

"কার সঙ্গে?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

এবার আমারই বিস্মিত ওয়ার পালা, যেহেতু উনি নাম যা বললেন সেটা আমারই। আমার কিন্তু বিস্ময়ের চেয়ে কৌতুকবোধই প্রবল হয়ে উঠল। কেন, ঠিক বলতে পারি না, ইন্টারভিউ এমন কিছু নূতন অভিজ্ঞতাও নয়, তবে ভদ্রলোক একটু নূতন ধরনের মনে হওয়ায় এ-অভিজ্ঞতায় যেন একটু নূতনত্বের সম্ভাবনা দেখা গেল। নামটা চেপে গিয়ে বললাম—"ও! তাঁর সঙ্গে? তা কটায় এন্‌গেজমেন্ট হয়েছে?"

বললেন—"ঠিক তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি এন্‌গেজমেন্ট হয়নি। ফোন করেছিলাম, খবর পেলাম সমস্ত দিনটা একরকম বাইরে বাইরে কাটিয়ে একটু রাত করেই ফেরেন সাধারণত। সকাল সকাল ফিরলেও আবার বেরিয়ে যান কখনও কখনও। আজ বলেছি আটকে রাখতে একটু..."

হয়তো ভাবার অভাব নয়, রসিকতা করেই বলা কথাটা, তবু কানে খট করে একটু লাগলই। তবে আমিও রসিকতার সুরটাই ধরে রেখে টিপ্পনী করলাম—"একটু যেন ভবঘুরে প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে, নয়কি?"

একটু হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন—"না, না। ...তবে বলাও যায় না, লেখক-মানুষই তো, কখন কি খেয়ালে থাকেন। তাছাড়া বাইরের মানুষ তো. কলকাতায় এলে একটু কাজের চাপে পড়ে যান বোধ

হয়।... আপনার সঙ্গে জানাশোনা নেই? একরকম একবাড়তেই তো থাকেন এলে।"

বললাম—"মুখচেনা আছে, তবে ঠিক পরিচয় বলতে যা বোঝায় তা নেই। আমিও তো বরাবর থাকি না এখানে। একটা কারণ সেই। তা ছাড়া প্রকাণ্ড এজমালি বাড়ি—একটা পাড়াই বলতে গেলে, কে কার খোঁজ রাখে? এ-ছাড়াও একটা কথা আছে মশাই।"

হেসে চুপ করলাম ওঁর মুখের দিকে চেয়ে।

প্রশ্ন করলেন—"কি?"—বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই।

বললাম—"ঐ যা আপনি বললেন—লেখক-মানুষ; ওঁদের একটু এড়িয়েই চলি আমি, কখন কি ভাব নিয়ে থাকেন। উনি আবার শুনেছি লেখেন হাসির গল্প, অথচ মুখখানা দেখলে মনে হয়....."

"আসুন।"—বলে হঠাৎ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাত মেলাবার ভঙ্গিতে। একটু বিমূঢ়ভাবেই হাত বাড়িয়ে দিতে বেশ চেপে ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—"আমারও ঐ কথা। আর আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমি যে যাচ্ছি তা ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই।"

মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে।

"ঠিক বুঝলাম না তো?"—হঠাৎ পরিবর্তনে আমি বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করলাম। তাইতেই মনের কপাট খুলে দিলেন ভদ্রলোক। প্রশ্ন করলেন—"আপনি পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে সব ইন্টারভিউ বেরোয়, পড়েন?"

বললাম—"পড়ে চোখে কখন-কখনও; তবে বেশি পড়া অভ্যেস তো নেই..."

"একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন?"—একটু বেশ তেতে উঠেছেন, বাধা দিয়েই শুরু করলেন—"লক্ষ্য করে দেখবেন—সব মিস্টি করে সামলে-সুমলে লেখা—লেখকই হোন, ফিল্ম-স্টারই হোন—বাঁচিয়ে, এড়িয়ে এমনভাবে প্রশ্ন, উত্তরগুলোও এমন কাটছাঁট করে সাজিয়ে-গুজিয়ে লেখা, আপনার মনে হতেই হবে তাঁরা যেন মর্তের জীবই নয়। এদিকে তাঁদের লেখা পড়ুন বা, অভিনয়ই দেখুন—(তাতেও তো মানুষটার খানিকটা বেরিয়ে আসেছেই)—কিম্বা একটু, কি যে বলে, ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখুন, আমাদের মতনই দোষেগুণে এই মর-জগতেরই মানুষ। তা যদি হয় তো অন্ধকারের দিকটা বাদ দিয়ে শুধু আলোর দিকটা জাহির করে ধরি কেন মশাই? একে এঁদের একটা ফলস গ্ল্যামার (false glamour) থাকেই, তার ওপর যদি একটা ঝুটো সোনালি রং চাপিয়ে তুলে ধরি সবার সামনে তো সেটা সমাজকে মিস্‌লীড (mislead) করা হবে না? প্রবঞ্চনার দায়ে দায়ী হব না আমরা? বলুন?"

বললাম—"ঘটেই তো।"

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক একেবারে সাধারণ থেকে বিশেষে এসে পড়লেন, অর্থাৎ অজান্তে আমারই ওপর। বললেন—"এই তো, এঁকেই ধরা যাক না, দেখছি আপনারও স্ট্রাইক (strike) করেছে। কেনরে বাপু! আমায় তো সমস্ত মানুষটাকে তুলে ধরতে হবে সবার সামনে। তা তোমার যখন ভেতর-বার এক নয়—কি করে জানব তোমার কোনটে খাঁটি কোনটে মেকি...না, না, আমি অবিচার করব না ওঁর ওপর—হাসিও ভালো, গাম্ভীর্যও ভালো, তবে একটা দিয়ে একটা চাপা দিতে গেলেই কেমন যেন মনে হয় না এও একটা অভিনয়ই চলছে? তা অভিনয় জিনিসটাকে তো সাচ্চা জিনিস বলা যায় না। যায়? আপনিই বলুন না?"

হাসিই পাচ্ছে, তবু গাম্ভীর্যের অভিনয় করে বললাম—"কি করে যাবে?"

"তাহলে টেনে বের করে আনতে হবে না আমায় ভেতরকার আসল মানুষটিকে?"

"না আনলে চলে?"—মন্তব্য করলাম আমি।

ভদ্রলোক এবার চুপ করে গেলেন। এ সিগারেটটাও ঝোঁকের মাথায় ফেলে দেওয়ায় ইতিমধ্যে আর একটা ধরিয়েছেন, একটু আড়ে চেয়ে সেটা বিলম্বিত লয়ে টানার ভঙ্গিতে মনে হোল এবার যা বলবেন সে সম্বন্ধে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। হয়,

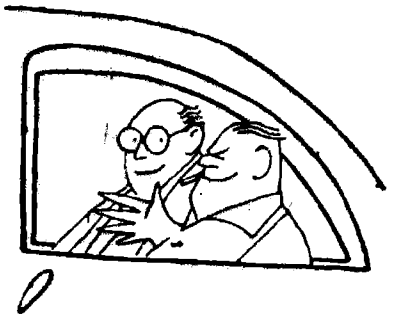

উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না, কিম্বা আদৌ বলা ঠিক হবে কিনা স্থির করে উঠতে পারছেন না। তারপর একসময় একটু গা ঝাড়া দিয়ে, একটা টোকা মেরে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললেন—"তাহলে ঐ যে আপনাকে বললাম, আরও একটু ভেতর দিকে উঁকি মারা—তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন?"

এবার আমাকেই একটু চুপ করে যেতে হোল; কতদূর উঁকি মারবেন, বিশেষ করে কিরূপ ভাষায় সেটা প্রকাশ করবেন চিন্তা করেই। তবে, শেষ পর্যন্ত কৌতূহলটাই জয়ী হোল, বললাম—"যেটা করবার করতেই হবে বৈকি। একটা তো ডিউটিই এখন আপনার।"

"ভদ্রলোক চুলে কলপ দেন মশাই।"

—এতই হঠাৎ, এবং তদুপরি এতই ব্যক্তিগত যে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে যেতেই হোল আমায়। প্রশ্নটাও সেই ধরনেরই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে—"আপনি দেখছেন তাঁকে?"

একটু চ্যালেঞ্জের ভাবও ফুটে থাকতে পারে, কেননা, উনিও যেন একটু থমকে গেলেন। তারপর একটু টেনে টেনে বললেন—"না—ঠিক যে স্পষ্টভাবে দেখা তা বলতে পারি না। দেখেছিলাম একবার মাত্র একটা মিটিঙে— রাত্তিরবেলা— ভালো আলোর ব্যবস্থাও ছিল না ডায়াসে—আমি ছিলামও ডায়াস থেকে অনেক দূরে..."

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বললেন—"আপনি তো দেখেছেন, নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন?"

"আমার তো কাঁচাপাকা বলেই মনে হয়"—অপবাদটা গায়ে লাগার জন্যেই বললাম আমি, তারপর আবার কৌতুকের ভাবটাই বলবৎ হয়ে ওঠায় সুরটা বজায় রেখে যাওয়ার জন্যে বললাম—"তবে বলা যায় কি? ও-ও বোধহয় একটা মেক্-আপই—ধারে ধারে একটু একটু শাদা ছেড়ে দিয়ে মাঝখানটায় কলপ। আপনার ঐ অভিনয়ের কথাতেই খেয়াল হোল আমার।"

খুব খুশী হয়েছেন, শুনতে শুনতে চোখদুটো চকচক করে উঠেছে। আমি থেমে যেতে বললেন—"দেখুন, মিলে যাচ্ছে তো আমার সঙ্গে! তাহলে, আমি যদি বলি, যার মাথায় কলপ তার ভেতরটাও নিশ্চয় ঐরকম কলপ দিয়ে কাঁচা করে রাখা—বয়েসকে ফাঁকি দিয়ে..."

"তা—মিথ্যে আর কি এমন?"—আমিও টেনে টেনে উত্তর দিলাম। বললাম—"বয়েস মানেই আর সবাইকেও তো।"

"দেখুন! বেরিয়ে আসছে তো আসল মানুষটি? তাহলে আর একটু উঁকি মারা যাক ভেতরের দিকে; ভদ্রলোক অবিবাহিত—চিরকুমার বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন নিজের; জানেন বোধহয়?"

—একটি গভীর অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

এবার ইংগিতটা এতই মোক্ষম যে ভেতরটা যেন জ্বালা করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে এতটা এগিয়ে এসেছি যে আর পশ্চাদপসরণের উপায় নেই। নিজের আগেকার অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যেও বলতে হোল—"অতটা জানা ছিল না।...হ্যাঁ, তাহলে ভেবে দেখবার কথা বৈকি।"

আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন নিজের অনুমানের সফলতায়। বললেন—"এবার তাহলে এদিকটায় আসা যাক—তাঁর সাহিত্যের দিকটায়। এবার যা প্রমাণটা দিতে যাচ্ছি—একটু বেশি ডেলিকেট, তবে এমন অকাট্য..."

আবার মুখের পানে চেয়ে রইলেন প্রতীক্ষার ভাব নিয়ে।

মড়ার চেয়ে বড় গাল নেই; তা যখন হয়েই গেছে, আমার আর দ্বিধাসঙ্কোচের কোন বালাই-ই নেই। ওঁর হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে বললাম—"শুনতে হয় তো তাহলে।"

"নিজেও পড়ে দেখেছি, পাঠক-সমালোচকদেরও তাই মত—আপনারও যদি

দুঃসাহসী : ফটো—মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

পড়া থাকে কিছু কিছু তো লক্ষ্য করে থাকবেন—ও'র লেখায় পুরুষ চরিত্রের তুলনায় স্ত্রী-চরিত্রগুলি বেশি জীবন্ত, বিশেষ করে, যাকে বলে 'নভেলিয়ানা' সেটা সেখানে একটু বেশি। এ-অভিজ্ঞতা তো 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—করে হয় না মশাই, জলে ডুব দিয়ে হাসিল করতে হয়; গভীর জলে।... এবার ওদিকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন—ব্যাচিলার—মাথায় কলপ—ভেতরটা দিব্যি হাসিখুশি ফুর্তির ভাব—সব কিছুকে চাপা দিয়ে, ওপরে ওপরে গম্ভীর, স্বল্পবাক!... আর কিছু বলতে হবে?"

সেই অর্থপূর্ণ হাসিটুকুর সঙ্গে চোখ দুটো আয়ত করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। অকাট্য প্রমাণের সঙ্গে নিজের এমন একটি অভিনব চিত্র পূর্বে মানস-গোচর হয়নি, অনুরূপ হাসি নিয়ে আমারও ও'র দিকে চেয়ে থাকতে কোন অসুবিধা হোল না। অর্থাৎ—সত্যিই তো!

হাওড়ায় এসে পড়েছি; মল্লিক ফটকের সামনে একটা ঠাকুর-বিসর্জনের মিছিলের জন্যে খানিকটা আটকে পড়তে হোল। ভাববার যে সময়টুকু পাওয়া গেল তাতে সমস্তটুকু মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোকের কি আমার ওপর কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে যার জন্যে এই নিষ্করুণ অভিযান? কিন্তু হাজার খুঁজেপেতেও তো কিছু পাওয়া গেল না। উনি আমায় দেখেন নি, আমারও এই প্রথম দেখা। যা যা বলে গেলেন সবই শোনা কথা; যেন শুনে শুনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল মনে, ইন্টারভিউয়ের আগে সেটা সচেষ্ট হলে একটু পাশ করে নেওয়া। বাকিটা বই পড়ে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা কিছু দাঁড় করিয়ে নেওয়া। অবশ্য ইন্টার-ভিউয়ে এসে একটা অপক্ষপাত মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হবেন, এতে বলার কিছু নেই. কিন্তু এ যেন পাল্লা একদিকেই ঝুঁকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

মিছিলটা বেরিয়ে গেলে ভিড় থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে অনেকটা এইভাবেই আমি আবার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম। বললাম—"কিন্তু—আপনি যেন বেশিরকম বিরূপ মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের ওপর..."

"কিচ্ছু নয়!" —বেশ বিস্মিত হয়েই আমার দিকে ঘুরে উত্তর করলেন। বললেন—"এই আমার মিশন মশাই, আগেই তো বললাম আপনাকে। আমি রক্তে-মাংসে মানুষটিকে তুলে ধরতে চাই, সব বাদসাদ দিয়ে একটি ক্ষীরের পুতুল দাঁড় করাতে যাই কেন বলুন আমায়। গুণের দিকও কি নেই? অনেক আছে; না থাকলে একটা মানুষ এতদিন ধরে যে মোটামুটি খানিকটা খাতির জমিয়ে এল..."

বললাম—"সেটা অবশ্য স্বীকার করতে হয়। তবে তার সঙ্গে, আপনি যেমন বলছেন, এটাও তো সত্যি যে বেশ কিছু চাপাচুপি দিয়ে, ভাঁওতা দিয়েই বলতে হবে, খাতিরটা বজায় রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি সেই চাপা দেওয়া অন্ধকারের দিকটা বের করবেন কি করে? আপনি চুলের কলপটা দেখলেন, অবিবাহিত সে, সেটাও জানাই, তারপর বইয়ে জীবন্ত নারীচরিত্রগুলোও রয়েছে; কিন্তু এই সব নিয়ে আপনার যা আন্দাজ সে সম্বন্ধে ও'র একটু স্বীকৃতির আভাস না পেলে..."

"ঐখানেই তো মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে, ইচ্ছে করে কেউ করেছে স্বীকার কখনও মশাই? না, সেভাবে ছাপাই চলবে কাগজে? 'সন্ধানী'র এ একটা নতুন একস্‌পেরিমেণ্ট (experiment)। পাঠক এখনকার তো আর সেই পাতাসাজানো একঘেয়ে জিনিস পছন্দ করছে না—লেখক হোল তো তার বাড়া আর আদর্শ পুরুষ কেউ নেই; ওদিকে সিনেমা-স্টার হোল তো...সে আপনি দেখবেন'খন লেখাটা বেরুলে—এমনভাবে সাজিয়ে ধরব দোষেগুণে মিলিয়ে, ও'র সন্দেহ হতে দোব? রামঃ!... অথচ এদিকে পাঠকের মনে একটু ধোঁকা ঢুকেই যাচ্ছে—তাহলে লোকটার সম্বন্ধে অতটা যে মনে হয়েছিল...ইন্টারভিউয়ের একঘেয়েমিটা নষ্ট করে একটা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কি—সে আপনি দেখে নেবেন—নাম-ঠিকানা লিখে নিচ্ছি, বেরুলেই এক কপি পাঠিয়ে দোব। আর গুণই কি নেই? এই ধরুন না কেন....."

গুণের তালিকা আর শোনা হোল না। ভালো করে ঠিকানা বলা ছিল, আমাদের অন্যমনস্কতার মধ্যেই ট্যাক্সিটা গলির মোড় ঘুরে বাড়ির সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিটার দেখে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে নেমে পড়ে বললাম—"আসুন।"

নম্বরটা দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনারও এই বাড়ি?

বললাম—"সদর দরজা একই, এজমালি বাড়ি তো? আসুন।"

একটা বড় উঠান, তারপরেই টানা সদর বাড়ির বারান্দা। চেয়ার-বেঞ্চ পাতা। উঠান থেকেই দেখলাম জন চার আগন্তুক অপেক্ষা করছেন; একজন পরিচিত দেখে বুঝলাম আমার জন্যই। দাঁড়িয়েও উঠেছেন চারজনে। কিন্তু মুখ খোলবার আগেই "বসুন, বসুন, এক্ষুনি আসছি।" বলে, ভদ্রলোককেও উঠে বসতে অনুরোধ করে তাড়াতাড়ি বাঁদিক ঘুরে বাড়ির গলিটার ভেতর ঢুকে গেলাম।

একটু দেরি হোল বৈকি বেরুতে। কথায় কথায় যে ব্যাপারটুকু দাঁড়িয়ে গেল সেটাকে একটি ভদ্ররকম পরিহাসের রূপ দিয়ে কি করে ও'র সম্মুখীন হওয়া যায় তার একটা খসড়া করে নিতে হোল বৈকি।

বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি নেই। প্রশ্ন করে জানলাম—এখুনি আসছেন বলে অনেকক্ষণ হোল বেরিয়ে গেছেন।

আর অবশ্য এলেন না।

এর পর সন্ধানী'র কয়েকটা সংখ্যার ওপরই নজর রেখে গেছি; অতগুলো ভাঁওতার ওপর শেষের এটা আবার এক উৎকট রকম ভাঁওতা তো, কীভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে কী বেরোয় একটা ধুকধুকানি লেগেই থাকবার কথা।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়ল না।

দূরবীণ

দীপক চৌধুরী

দু-কামরার আধুনিক ফ্ল্যাটে পুবের দিকের জানালাটা খোলা। শীতের সকাল। সুকুমারী শুয়েছিল বিছানায়। আজ রবিবার বলে বেলা সাতটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে আরাম করছে। সকালের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গায়ে। কলকাতার আধুনিক ফ্ল্যাট। শুধু পুব দিকেই একটা জানালা। ও-পাশের দরজা খুলে না রাখলে হাওয়া চলাচল করে না। উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমটা বন্ধ। এই তিনটে দিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি। পুব দিকেও বাড়ি আছে কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে। মাঝখানে বাড়িওয়ালার একটা বাগান রয়েছে। ফ্ল্যাটটা পাঁচ তলায় বলে ভাড়া একটু কম। সুকুমারীর জানালার সামনে একটা নারকেল গাছ। ডালপালাগুলো ভেতরের দৃশ্য ঢেকে রাখে। পাতার ফাঁক দিয়ে তেরছাভাবে রোদ আসে ঘরে। বাড়িওয়ালার একমাত্র ছেলে নন্দদুলাল পাতাগুলো ছেঁটে দিতে চায়। সুকুমারী বাধা দেয়। বলে, 'থাক না, ওদের তো আর চোখ নেই।'

চোখ আছে অন্য তিন দিকের বাড়িগুলোর। বাড়িওয়ালা জানালা রাখেন নি বলে সুকুমারীর যেমন-তেমনভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতে অসুবিধে হয় না। শীতের সকালে রোদ লাগছে চামড়ায়। নরম রোদ পিছলে গিয়ে ঢুকে পড়ছে রোমকূপে। স্পর্শেন্দ্রিয়ে তাপের পুলক। জানালাটা খোলা। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় পুরো দেহটা দেখা যায়। ছাব্বিশ পার হচ্ছে। কলেজে ইতিহাস পড়ায় সুকুমারী দত্ত।

সকাল থেকে দুটো চড়ুই ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে ঢুকে পড়ছে পুব দেয়ালের ঘুলঘুলিতে। আজ ক'দিন থেকে খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে বাসা তৈরি করছে। বোধহয় বাচ্চা হবে। সুকুমারী নিজের পেটের ওপর হাত রাখল। কিন্তু হাত রাখলেই বাচ্চা হয় না। পাখি দুটোর মতো একসঙ্গে মিলিত হতে হয়। পাখি দুটো কতদিন ধরে একসঙ্গে বাস করছে কে জানে। এখন তো নারকেল গাছের ডালে বসে চড়ুই দুটো চেয়ে রয়েছে

সুকুমারীর দিকে। লজ্জা পাচ্ছে না সে। কোন্ চড়ুইটা পুরুষ কে জানে।

আয়নার দিকে মুখ করে পাশ ফিরল সুকুমারী। অটুট স্বাস্থ্য। ভাঁজ পড়েনি চামড়ায়। তার ওপরে এম-এ পাস। কলকাতার একটা বিখ্যাত কলেজে ইতিহাস পড়ায়। মেয়েরা তন্ময় হয়ে ওর লেকচার শোনে। সুকুদির সঙ্গে ভাব করবার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে থাকে। ছাব্বিশ বছর বয়সেও সুকুদিকে ছাত্রী বলে মনে হয়।

নিজের ফ্ল্যাটেই একটা ক্লাব খুলেছে সুকুমারী দত্ত। বেছে বেছে পাঁচটি মেয়েকে সে মেম্বার করে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে নানারকমের গল্প করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করতে করতে যৌনবিজ্ঞান নিয়েও নাড়াচাড়া করে। বলে, 'দেহবিজ্ঞানের কোনো সত্যই লুকনো থাকা উচিত নয়। যত বেশি জানবে, তত বেশি ভয় কাটবে। পুরুষরা হচ্ছে সবচেয়ে চালাক পশু। মেয়েদের অজ্ঞানতার সুযোগ নেয়।'

সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী শর্মিলা। উনিশ বছর বয়স। মস্ত বড় একজন ধনী শিল্প-পতির মেয়ে। একমাত্র সন্তান। ওকে বিয়ে করবার জন্য শুধু কলকাতার বাজারেই হাজার কয়েক যুবক অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। সেই কারণেই শর্মিলার জন্য সুকুমারীর ভয় সবচেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে শর্মিলাকে সে সাবধান করে বলে, 'পুরুষদের সঙ্গে খেলা করো কিন্তু বিয়ে করো না। এ যুগের আমরা স্বাধীনচেতা মেয়ে। নিজেরাই রোজগার করি।'

নিজের ঘরেই ক্লাবের ঠিকানা। প্রায় প্রতি রবিবারেই বিকেলবেলা মেয়েরা এসে তার ঘরে মিলিত হয়। পুরুষদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয় অধ্যাপিকা। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। দেহতত্ত্বের কোনো কিছুই লুকনো থাকে না।

গত দু-বছরের মধ্যে পাঁচটির মধ্যে তিনটি মেয়েই ক্লাবে আর আসে না। বিয়ের সিজন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

দিন পনরো আগে জয়া মিত্র কাঁদতে কাঁদতে এসে ঘোষণা করেছিল, 'সুকুদি, সর্বনাশ হয়েছে।' আমাকে না জানিয়ে বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। কি করি বলুন তো?'

'বিয়ে ভেঙে দাও।' বলেছিল অধ্যাপিকা।

'কি করে ভেঙে দিই? কাল যে তাঁরা আশীর্বাদ করতে আসছেন!'

'তুমি পালিয়ে চলে এসো আমার কাছে। আমার তো ডবল খাট। সামান্য একটা বিয়ের জন্য আমরা ক্লাবের আদর্শটিকে নষ্ট করতে পারি না। তুমি নাবালিকা নও, জয়া। জোর করে তাঁরা তোমার বিয়ে দিতে পারেন না।'

'কিন্তু বাবা বলছেন ছেলেটি নাকি মস্তবড় একটা বাণিজ্য অফিসের কভেনেন্টেড অফিসার—এই বয়সেই হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে!'

'মগের মুলুকে হাজার টাকা আবার একটা মাইনে নাকি? সাবধান জয়া, পুরুষের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করো। মেয়েদের কাছ থেকে ওরা যে কি চায় তা তো তুমি জানো।'

তারপর থেকে জয়া আর আসে না। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু বাকী রয়েছে শর্মিলা। দু-জনকে নিয়েই ক্লাবটা চলছে। ডবলখাটে পাশাপাশি শুয়ে গল্পগুজব করে। ওদের নিয়ে অন্যান্য অধ্যাপিকারা স্টাফ-রুমে বসে হাসিঠাট্টা করেন। কেউ কেউ বলেন, 'সুকুমারীর দেহে আর মনে বিকারের সঞ্চার হয়েছে।'

আজ রবিবার। শীতের সকালে নরম রোদে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে সুকুমারী। চড়ুই পাখি দুটো মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে ওকে দেখছে। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। পাখির মুখে ভাষা নেই। কলেজের স্টাফ-রুমে গিয়ে ওরা কুৎসা রটাতে পারবে না। কি দেখল আর কতোটা দেখল সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার ক্ষমতা নেই ওদের। ওরা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ধুলোধুলিতে ঘর তৈরি করছে। আঁতুড়-ঘর। বাচ্চা হওয়ার আগে ঘরটা শেষ হবে কিনা কে জানে।

বাগানটার পুব দিকে রাস্তা। রাস্তার ধারে উঁচু উঁচু বাড়ি। ছাদের ওপরে লোকজন ঘোরাফেরা করে। কিন্তু অনেকটা দূরে। তা ছাড়া সুকুমারীর জানালার সামনে একটা নারকেল গাছ। ওদিক থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এদিক থেকে সুকুমারী যখন তাদের স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, তখন তারাই বা ওকে দেখবে কি করে?

গতকাল বাড়িওয়ালার একমাত্র ছেলে নন্দদুলাল একটা দূরবীন কিনেছে বলে পিতা-পুত্রের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। বাগানের উত্তর দিকে বাড়িওয়ালা তাঁর পৈতৃক বাড়িতে বাস করেন। একতলা বাড়ি। ছাদে উঠলে আকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু সুকুমারীর ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরটা দেখা যায় না। নন্দদুলাল হঠাৎ কেন একটা দূরবীন কিনল, তাই নিয়ে বাড়িওয়ালার দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই। ছেলেটা বোধহয় ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যেতে আরম্ভ করেছে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে সে ঘোড়ার দৌড় দেখছে। তা যদি হয়, তবে পাঁচতলা ম্যানশনটা ওর ফুঁকে দিতে কদিনই বা লাগবে। নন্দদুলালই একমাত্র ওয়ারিশ। দূরবীন কিনল কেন? কি দেখতে চায় সে? দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর।

আজ সকাল থেকে দুশ্চিন্তা হচ্ছে সুকুমারীরও। হঠাৎ যেন মনে হল, পুব দিকের সেই উঁচু বাড়িটার ছাদের ওপর ঘোরাফেরা করছে নন্দদুলাল। নারকোল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আরো সে লক্ষ্য করল, দুলালের হাতে একটা দূরবীন। ছেলেটির বয়স বোধহয় পঁচিশ। দেখতে-শুনতে ভাল। ফুটবল খেলায় নাম আছে ওর। খেলাপড়া বিশেষ কিছু করেনি। কিন্তু বাড়িওয়ালা চোখ বুঁজলেই সম্পত্তির মালিক হবে নন্দদুলাল। এখন সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সুকুমারীকে দেখবার চেষ্টা করছে।

বিস্মিত বোধ করল সুকুমারী। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো পুরুষই তার দেহের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে নি। পুরুষের চোখে সে পুরোপুরি আবৃত ছিল। আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ ঘরের সীমানা কখনো অতিক্রম করে নি। সংযমের প্রাচীর তুলে রেখেছিল সতীত্বের সবগুলো সীমান্তে। বোধহয় সেই কারণেই ওর দেহে আর মনে বিকারের সৃষ্টি হয়েছে। একজন পুরুষের পক্ষে হয়তো ষোল আনা অধ্যাপক হওয়া সম্ভব, কিন্তু একটি যুবতীর পক্ষে ষোল আনা অধ্যাপিকা হওয়া সম্ভব নয়।

সুকুমারী অসুস্থ। দুলালের চোখে দূরবীন। মাঝখানে শুধু বাগানের ব্যবধান। কিন্তু প্রতাপ থাকে বিলেতে। তার চোখে কি দূরবীন আছে? যাওয়ার সময় সে তো বলে গিয়েছিল, তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কোনো দূরবীনের দরকার হবে না। বিলেতে বসেই চোখ রাখবে সুকুমারীর ওপর। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। বিশ্বাসঘাতক পুরুষ। বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। জানালাটা দিল বন্ধ করে। টেবিলটাকে টেনে নিয়ে এল পুব দেয়ালের কাছে। লাফিয়ে উঠে পড়ল টেবিলের ওপর। আধুনিক ফ্ল্যাটের সিলিংটা খুব নিচু। দুলঘুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে খড়কুটো-গুলো টেনে টেনে বার করল সুকুমারী। ছড়িয়ে দিল মেঝের ওপর। বিশ্বাসঘাতক পুরুষ।

নারকোল গাছের ডালে বসে চড়ুই দুটো দেখতে পেল না। দেখলে কি ভাবত কে জানে।

॥ দুই ॥

আজ রবিবার। কাজকর্ম কিছু নেই। ক্যানটিন থেকে দুপুরবেলা খাবার আসবে। রান্নাবান্নার ঝামেলা রাখেনি সুকুমারী। ভাল ভাল খাদ্য খাওয়ার দরকার নেই। ক্যানটিনের লোকেরা যা দেয় তাই খায়। কার জন্য দেহটাকে টাইট আর সবল রাখবে সে? বিশ্বাসঘাতক পুরুষ! ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক তাড়া চিঠি বার করল সুকুমারী। প্রতাপের লেখা চিঠি।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই প্রতাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। এম-এ পাস করবার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে চাকরি নিল সুকুমারী। প্রতাপ চলে গেল বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। বলে গেল, গোটা তিন বছর অপেক্ষা করতে। তিন বছর শেষ হওয়ার পর চিঠি লিখে জানালো, আরো দুটো বছর অপেক্ষা করতে হবে। কোন্ একটা বড় কারখানায় ট্রেনিং নিচ্ছে সে। শেষের একটা বছর প্রতাপ আর চিঠি লিখল না। জবাবও দিল না। এদিক থেকে সুকুমারী প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতে লিখতে হাঁপিয়ে পড়ল। বিলেত যাওয়ার আগে প্রতাপ ওকে

ছা : ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

স্পর্শ করেছে, আলিঙ্গন করেছে—নারীত্বের নরম মাটিতে স্ফুটনের প্রত্যাশা রেখে গিয়েছে। দিনরাত্রির চিন্তাভাবনা থেকে প্রতাপ কখনো অনুপস্থিত থাকেনি।

তারপরেই সেই চিঠিটা এল। বান্ডিল থেকে চিঠিখানা বার করল সুকুমারী। প্রতাপের শেষ চিঠি। আজ রবিবার। হাতে কোনো কাজ নেই। চিঠিখানা পড়বে। শর্মিলা আসবে বিকেলে। এখন আলোচনার বিষয়বস্তুও ফুরিয়ে গিয়েছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই জিনিস আলোচনা করতে হয়। যৌনতত্ত্বেরও শেষ আছে।

তাছাড়া সুকুমারী জানে, শর্মিলাও একদিন এখানে আসা বন্ধ করে দেবে। বাড়ি গিয়েই চিঠি লিখে জানাবে, বাবা আর মা জোরজার করে একটি পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। ক্লাবটা নিজে থেকেই যাবে বন্ধ হয়ে। তারপর শুরু হবে একটানা নিঃসঙ্গ জীবন। দু-কামরার একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে অধ্যাপিকা সুকুমারী দত্ত। দুটো চড়ুই পাখিকে ছাড়া আর কাকে শাস্তি দিতে পারল সে?

নন্দদুলালকে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিয়ে আসতে পারত। ধনী ঝাড়ওয়ালার একমাত্র পুত্র। লোভী পুরুষ। লোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে সুকুমারী। খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সে দেখতে পারত, নন্দদুলাল পড়ছে। পড়ছে ওর নতুন-কেনা দূরবীনটাও। কামাতুর পুরুষ, দূরবীন দিয়ে কি দেখতে চাও তুমি? নারী-হৃদয়ের দগদগে ঘা-টা তো দেখতে পাবে না!

প্রতাপের শেষ চিঠিখানা পড়তে লাগল অধ্যাপিকা। তাকে ভুলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে প্রতাপ। তার জন্য অপেক্ষা করতে নিষেধ করেছে। ভারতবর্ষে আর কোনো দিন ফিরে যাবে কিনা তারও ঠিক নেই। এই অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করলে সুকুমারীর শুধু বয়স বাড়বে, মুখের রেখাগুলো ভাঙতে থাকবে, চামড়ায় ভাঁজ পড়বে ইত্যাদি। সোয়াইন কাঁহাকার! বলো, বিলিতী ছুঁড়ির প্রেমে পড়েছে? ঝুট্! চিঠিখানা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবরণমুক্ত করল। পরীক্ষা করতে লাগল, কোথাও ভাঁজ পড়েছে কিনা, মুখের রেখাগুলো ভেঙে গিয়েছে কিনা।

খিলখিল করে হেসে উঠল সুকুমারী। ভাঁজ তো দূরের কথা, দেহটা যেন আরো বেশি টাইট হয়েছে। এক ইঞ্চি বাড়তি চর্বি নেই। বিকার না ছাই! সুকুমারী তৈরি, ক্ষয়ে যায়নি। ওকে দেখলে কোটি কোটি মেয়ে হিংসে করবে। এই অবস্থায় একবার যদি সে কলেজের স্টাফ-রুমটা ঘুরে আসতে পারত! সহসা স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের সমুদ্রে মন্থন উঠল। সারা দেহটা ওর কাঁপতে লাগল। আকাঙ্ক্ষার বান ডাকল দেহে। দূরবীন দিয়ে কতটুকু আর দেখতে পেয়েছে নন্দদুলাল!

ক্যানটিন থেকে খাবার নিয়ে এসেছে বেয়ারা। সুকুমারী জানে ওতে ব্যবসার মুনাফা রয়েছে। এক হাজার ক্যালরীও নেই। কিন্তু উৎপাদনের যখন সমস্যা নেই, তখন এক হাজার ক্যালরীও বা খাবে কেন? যারা সন্তান প্রসব করে, তারা ওটা খেয়ে নিক।

বেয়ারাকে বলল সে, 'আমি আজ খাব না। এখন থেকে প্রতি রবিবার ব্রত পালন করব। খাবারের পয়সা আমি দেব—এটা নিয়ে যাও। তোমার বউকে গিয়ে খাওয়াও। কেন্ট, ক'টি বাচ্চা তোমার?'

হকচকিয়ে গেল, কেন্ট। বলল সে, 'আজ্ঞে আমি তো এখনো বিয়ে করি নি!'

'তাহলে রাস্তার কোনো ভিখিরী মেয়েকে দিয়ে দাও। ওরাও সন্তান প্রসব করে।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল সুকুমারী। ঘরে এখন সে একা। চড়ুই পাখি দুটো এখনো ঢুকতে পারে নি। নারকোল গাছের ডালে বসে চোখের জল ফেলছে কিনা কে জানে!

বেলা চারটের আগেই এসে আজ উপস্থিত হল শর্মিলা। ওর মধ্যে খানিকটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি লক্ষ্য করল সুকুমারী। অন্যদিন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দু-জনে বিছানায় শুয়ে আলাপ-আলোচনা করে। আজ দরজাটা আর ভেতর থেকে বন্ধ করল না কেউ।

শর্মিলা বলল, 'সুকুদি, আর বোধহয় আমার ক্লাবের মেম্বার থাকা সম্ভব হবে না—'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করল অধ্যাপিকা।

'মা বললেন, শুধু খাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। সেটা স্বাভাবিকও নয়। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা জিনিসেরও দরকার।'

'সেটা কি, শর্মিলা?'

'প্রেম। এবং সেটা পুরুষের সঙ্গেই হওয়া উচিত।'

'এত তাড়াতাড়ি পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? কতই বা বয়স!'

'মা বললেন, ভাল একটি পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন বাবা। জানেন তো বাংলাদেশের বিয়ের বাজারে ভীষণ মন্দা চলেছে। বাবা বাজারের খবর রাখেন। মস্তবড় একটা কারখানা চালাচ্ছেন তিনি। বলেন, বাঙালী ছেলেদের মধ্যে বেশির ভাগই তিন-চারশো

টাকার চাকুরে—' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে শর্মিলাই বলল, 'আমাদের হেড-ড্রাইভার পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, সুকুদি।'

'সে তো মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ, শর্মিলা। ওসব কথা থাক। মা কি তোমায় প্রেমের অর্থটা বুঝিয়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। বলেছেন, প্রেম মানেই মাতৃত্ব।'

'অর্থাৎ প্রতি বছর একটি করে সন্তান পয়দা করা?'

'প্রতি বছর নয়, দু-তিন বছর পর পর হলেও ক্ষতি নেই। মা বললেন, আমাদের অনেক টাকা। বড় সংসার প্রতিপালন করতে অসুবিধে হবে না। যারা গরিব, তাদের জন্যই গভর্নমেন্ট ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর ব্যবস্থা করেছেন।'

'বটে?' রেগে আগুন হয়ে গেল সুকুমারী দত্ত। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল বার কয়েক। ঠেলা মেরে পুবের জানালাটা দিল খুলে। খুব জোরে শব্দ হল। নন্দদুলাল শুনল কিনা কে জানে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল সুকুমারী। না, ধারেকাছে কোথাও তাকে দেখতে পেল না। আরো বেশি রেগে গেল সে। দূরবীনটা হাত নিয়ে কোথায় সে সরে পড়ল? নাবালক কাঁহাকার!

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করল, 'বললে তো বাজার মন্দা, কোন্ বাজার থেকে পাত্রটিকে কিনে নিয়ে এলেন তোমার বাবা? বড়বাজার নাকি?'

'না। বাবা লন্ডন গিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর ব্যবসা আছে। লন্ডনেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে মস্তবড় একটা কারখানায় চাকরি করছিল। এবার সে বাবার কারখানার মালিক হবে—মানে আমার সঙ্গে যদি বিয়ে হয়।'

'অতো বড় একটা কারখানার মালিক হতে পারলে সকলেই তোমায় বিয়ে করতে চাইত। হয়তো সেই জন্যই তোমায় বিয়ে করতে আসছে সে। এর মধ্যে প্রেমের কথা উঠতেই পারে না। ছি ছি, শেষ পর্যন্ত নিজেকে নষ্ট করলে? এত সহজে ধরা দিলে? একবার দেখলে না—'

'দেখেছি সুকুদি। কাল এসেছিল আমাদের বাড়িতে। এই তো চারদিন আগে বিলেত থেকে ফিরল।'

'কি নাম তার?'

'প্রতাপচন্দ্র সিংহরায়।'

পাঁচ তলার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেও এত বেশি আঘাত পেত না সুকুমারী। মিনিট কয়েক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। চিঠির বান্ডিলটা এখনো ড্রেসিং-টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওটাকে সে হাত-বোমার মতো ছুঁড়ে মারতে পারে শর্মিলাদের কারখানার ওপর। কারখানাটা ভাঙলেই শর্মিলার জগৎটাও ভেঙে পড়বে। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তা সে করল না। চিঠির বান্ডিলটা ঢুকিয়ে রাখল ড্রয়ারের ভেতর। টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখটা নিচু করে রাখল। সুকুমারী বোধহয় কান্না চেপে রাখবার জন্য চেষ্টা করছিল।

শর্মিলা উঠে পড়ল। বলল সে, 'বিলেত থেকে প্রতাপ আসতে চায়নি। অনেক বলে-কয়ে বাবা তাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে এনেছেন। বিদেশের কারখানায় চাকরি করার চেয়ে নিজের দেশের কারখানার মালিক হওয়া কি অনেক বেশি সম্মানের নয়, সুকুদি!'

জবাব দিল না অধ্যাপিকা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু চোখের জল ফেলতে লাগল। চড়ুই পাখি দুটো কি বুঝল কে জানে।

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার বিয়ে হচ্ছে বলে কি আপনি কাঁদছেন, সুকুদি? আপনি কেন বিয়ে করছেন না? আপনার তুলনায় আমরা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমি তো জানি আপনার কি আছে আর কি নেই। সুকুদি, আপনি ঠিকই বলেছেন, শুধু বাবার ঐ কারখানার জোরেই আমি উতরে গেলাম। নইলে বিলেত থেকে প্রতাপ কিছুতেই ফিরে আসত না।'

সুকুমারী ভাবল, সে যা পারেনি, শর্মিলা তাই পারল। প্রতাপকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছে। এখন একবার দেখা হলে মন্দ হতো না।

দরজার ও-পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রতাপ। ওদের কথাবার্তা সবই শুনেছে সে। ভাবছিল ঢুকবে কিনা ভেতরে। না কি আগামীকালই প্লেন ধরে পালিয়ে যাবে বিলেত? প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে লাগল। জীবনে এই যেন সে প্রথম সংগ্রাম করছে। অকস্মাৎ মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো। শুধু একটা মিনিট, তবু মনে হল, কি যেন একটা ভেঙে গেল। শর্মিলাদের কারখানাটা নয়তো? অসহায় বোধ করছে প্রতাপ। ভারতবর্ষের মাটিতে অসহায়তা ছাড়া বুঝি আর কিছু নেই। বিলেত থেকে না ফিরলেই বোধহয় ভাল হতো। খানিকটা মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারত। কেউ বলতে পারত না, কারখানার লোভে সে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্তের সংগ্রাম কাবু করে ফেলল ওকে। প্রতাপ ভেবেছিল, এতদিনে সুকুমারীর নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। খবরটা সংগ্রহ করতে এসে এখন বিপদে পড়ে গিয়েছে।

শর্মিলা বলল, 'আমি চলি, সুকুদি। আর হয়তো আসতে পারব না। মুখেই নেমন্তন্ন করে গেলাম। তারিখটা শুধু বিয়ের চিঠিতে লেখা থাকবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ভেতরে প্রবেশ করল প্রতাপ। সুকুমারী অবাক হওয়ার বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করল না। অবাক হল শর্মিলা। জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি এখানে?'

'মিস দত্তকে আমি ছাত্রজীবন থেকেই চিনতাম। তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

সুকুমারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ভাবল, প্রতাপ কি তবে অতো দূরে বসেও ওর দু-কামরার ফ্ল্যাটের মধ্যে দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল?

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের ওখানে যাবেন না?'

'যাব। সে তো সাতটায়।'

হাসির রেখা ভেসে উঠল শর্মিলার ঠোঁটে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতাপ বলল, 'আজ চলি, সুকু। অন্য একদিন আসব।' দু-জনের কারো দিকেই দৃষ্টি দিল না সে। পাঁচতলা থেকে নেমে যেতে লাগল। দু-জনের মুখেই হাসি ফুটিয়ে গেল প্রতাপচন্দ্র সিংহরায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার মুখে যে হাসিটা টিকে থাকবে প্রতাপের কথা শুনে তা বোঝা গেল না।

সন্দেশ

মহাশ্বেতা দেবী

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুড়মুড় করে কাচের গেলাস খাচ্ছিল। চারদিকে যত লোক, সকলেই নানারঙের গেলাস থেকে নানারকম জিনিস খাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা শুধু কাচের গেলাসই খাচ্ছিল।

'এই যে, তুমি কাচের গেলাস খাচ্ছ কেন? শাদাভালুকের মত মোটা আর আহ্লাদের চেহারার সুশোভন রায় জিগ্যেস করলেন।

'কেন খাচ্ছ বল তো? আমার এই বান্ধবীটি জানতে চাইছেন।' মাদুরার দেবমন্দিরের বিখ্যাত বেনারসীপরা মেমসায়েবটির গালে টোকা দিলেন সুশোভন রায়। পার্টিতে এলেই সুশোভন রায় টোকা দেন মেয়েদের গালে।

'ইয়েস, হোআই?' বেগুনী শাড়ীর জরির আঁচল জ্বলে উঠল। মেমসায়েবের কানের হীরে দুটো আসল। কাচ খেতে খেতে লোকটা বুঝতে পারল। আহা, আজ না হয় সে কাচ খাচ্ছে, কিন্তু হীরে তো সে এক সময়ে দেখেছে। ঠাকুর্দার আংটিটাতেই একটা কলমহীরে ছিল।

'আজ্ঞে, আমাকে কাচ খাবার জন্যেই এখানে আনা হয়েছে। মানে ভাড়া করা হয়েছে।'

'এই, মিথ্যে কথা বলে না!' সুশোভন রায় আঙুল তুলে শাসালেন।

'সত্যি কথা সার!'

'আবার?'

'বিশ্বাস না করেন অনাদিবাবুকে জিগ্যেস করুন।'

অনাদি চিন্তামণি দেশাইয়ের সেক্রেটারী হিসেবে ঢুকেছিল কিন্তু বর্তমানে তার একমাত্র কাজ হচ্ছে চিন্তামণি দেশাইকে আনন্দে রাখা। এখন আর আনন্দ হয় না চিন্তামণি দেশাইয়ের আর ডাক্তাররা বলেছেন

মন প্রফুল্ল রাখা ওষুধের চেয়েও দরকারী। অনাদির চেহারা কার্তিকের মত, পরনে ধোপদোস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি।

'হ্যাঁ সার, অনাদি বললে, 'আমার মনিবের পার্টিতে একেকটা, যাকে বলে এনটারটেইনমেন্ট, তা চাই-ই চাই। একটা লোককে গত বছর এনেছিলাম, সে জ্যান্ত গোখরো সাপ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত।'

'সাপ খেত?'

'হ্যাঁ সার। এখানে দাঁড়িয়ে একটা জ্যান্ত তাজা গোখরো সাপ ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল। সার খুব খুশী হয়েছিলেন। এ বাড়ীতে সার, আমি একবার ছোরা ছোঁড়ার খেলা এনেছি, একবার তো একটা সার্কাসের মেয়ে বাঘের খাঁচায় ঢুকে নেচেছিল।'

'এবার কি আর কিছু পেলে না? এই মরকটের মত লোকটাকে ধরে এনেছ?'

'উনি বড় বংশের ছেলে সার। আগে ওনার নিজেরই একটা জিমনাশিআমের আখড়া ছিল। উনি সেখানে কাচের গেলাস চিবিয়ে খেতেন। ওনার পিতামহের নামে কলকাতায় একটা রাস্তা অব্দি আছে।'

রাস্তা নয় সরু গলি। ঠাকুর্দার তৈরী বাড়ীটাও আছে। যদিও সেখানে এখন থাকে না লোকটি।

'কিন্তু কাচ খেলে ও মরে যাবে না?

মেমসায়েবটি যেন একটু ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল।

কথা বলতে বলতে সবাই আবার ঝুঁকে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাদা চাদর ঢাকা টেবিলে বড় বড় রুপোর বাসনে উঁচু করে রাখা বাদামী মাছভাজা, মুরগীর পোলাও, সাদা সসে-ডোবানো কাঁকড়ার শাঁস। বরফের কুচি মেশানো কালো আঙুর, আইসক্রীম, জমাট লালচে ক্ষীরে টুকটুকে লাল ল্যাংড়া আমের টুকরো। তা ছাড়া বিরাট একটি রুপোর ময়ূরপঙ্খী নৌকায় ফ্রুট-ককটেইল। সোনালী সিরাপে লালচেরী, আমের কুচি, হলুদ রঙের আনারস, সিঁদুর-লাল পীচ, এপ্রিকট, স্ট্রবেরী এমন কি আঙ্গীরও দেখা গেল। এত খাবার একসঙ্গে লোকটা অনেকদিন দেখেনি।

'মরবে কেন, এটাই তো ওর পেশা।'

'কিন্তু কেন? বিপদ হতে কতক্ষণ?'

লোকটা বুঝতে পারল মেমসায়েবটি ভাল জিনিস খেলে যা হয়, এখন বিশ্ব-সংসারকে মমতা করতে সুরু করেছে। আহা, আজ না হয় ভাগাড়ের গরুর অবস্থা, কিন্তু দিন যখন ছিল তখন তো লোকটা ভালমন্দ জিনিস খেয়েছে। অবিশ্যি নেশা করে সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়নি, ভাগ্যে শনি থাকলে যা হয়, অমন সোনায় বাঁধানো মেশিনারী-লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা জলে চলে যায়।

এখন আর মদ খায় না লোকটা। মদের গেলাস খায়। বউ হাতে-পায়ে ধরে দিব্যি দিয়েছে, তাই মদ খায় না। কিন্তু গেলাস খাবার নেমন্তন্নও তো অবুরে-সবুরে আসে আজকাল।

'খাবার ব্যাপারটা যাকে বলে চেনে বাঁধা, বুঝলেন ম্যাডাম?'

লোকটার ইংরিজী উচ্চারণ সুশোভন রায়ের চেয়ে অনেক ভাল। মেমসায়েব হাতে এতবড় একটা আপেল তুলে নিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে লোকটা বললে 'আপনারা যদি ভালমন্দ খেতে পান তাহলেই আমি গেলাস খেতে পাব। আমি যদি গেলাস খেতে পাই তাহলে আমার বউ ছেলেমেয়ে দুটো খেতে পাবে।'

'দিনের পরে রাত্তির, রাতের পর আরেকটা দিন।' সুশোভন রায় হঠাৎ অনাদির কানের কাছে গিয়ে বললেন। যেন একটা দরকারী খবর দিলেন। তারপরই অনাদির পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'চল না গো! বাগানে গিয়ে একটু চোর-চোর খেলি? আমি লুকোই, তুমি ধর, খেলবে?' ধপাস করে উনি মেঝেতেই বসে পড়লেন।

'আঃ!' মেমসায়েব ওঁকে একটা ধমক দিল। তারপর হুরেমুক্তোআপেল সবশুদ্ধ লোকটার কাছে ঘন হয়ে এসে বললে, 'তুমি মরে যাবে জান?'

লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর অনাদিকে জিগ্যেস করলে, 'আমি এবার যাব?'

'যান।'

কাচের গেলাস খাবার পর লোকটা একটু বিশ্রাম করে। আগে করত না, আজ-কাল করে। বউ পকেটে কালীঘাটের নির্মাল্য গুঁজে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে, 'একটু জিরিয়ে নিও।'

'নেব।' মাখন-মিছরীর তালটা পকেটে পুরে নিতে নিতে লোকটা জবাব দেয়। মাখন-মিছরী একটু খেয়ে নিতে বলত মল্লিক, বলত ওতে না কি গলার ভেতরটা মোলায়েম থাকে। থাকে কি না থাকে, কে জানে, তবে বাইরে ডাক পড়লে লোকটা একডেলা সাদা মাখন আর একটু মিছরী পায়।

এখন মাখন-মিছরী গালে ফেলে জল খেয়ে লোকটা ঝিম মেরে বসে রইল পাশের ঘরে। হলঘরের টেবিলটা এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। খাবার যেন আর ফুরোতেই চায় না, আসছে তো আসছেই। এবার সন্দেশ নিয়ে এল বেয়ারা। চিন্তামণি দেশাই এক সময় গোগ্রাসে সন্দেশ খেতেন।

যারা চিনি খায়, তাদের চিন্তামণি আজও যোগান দিতে চেষ্টা করেন, চিনির হোলসেল কারবার আছে তাঁর। কিন্তু চিনি খাওয়া একদম বারণ এখন। নিজে খেতে পারেন না বলেই অপরকে খাইয়ে বোধহয় এত আনন্দ পান।

শাদা সন্দেশ, লাল আপেল, বাদামী মাছভাজা, লোকটা এ ঘর থেকে বসে বসে দেখতে লাগল। এই পার্টি ভাঙবে, তারপর অনাদি ওকে টাকা দেবে। টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অনেক রাত।

মেমসায়েবটি এদিক-ওদিক চেয়ে লোক-টাকে দেখতে পেল না। 'রিয়ালি!' বলে আপেলটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাদুরা-মন্দির শাড়ীর জ্বলন্ত আঁচল লুটিয়ে মেমসায়েব ওর স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। স্বামীর হাতের নড়া ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানো, এ-জন্যেই আমি ভারতে আসতে চাইনি? কি হত বাপু ক্যানাডায় থাকলে? জানো, লোকটা পয়সা রোজগারের জন্যে কাচ চিবোয়।'

প্রায় কেঁদে ফেললে মেয়েটি। লোকটা দূর থেকে দেখতে পেল ওকে। আসলে মেয়েটি ছেলেমানুষ। বোধহয় কোন বড়-লোকের বউ।

চিন্তামণি দেশাই ঠিক একটা কাঁছিমের মত ডিভানে ডুবে বসেছিলেন। নিচের ঠোঁটটা ঝোলা, দুটো ঘোলাটে চোখে বিরক্তি। এ কি রকম পার্টি বাবা? মোটে তো আনন্দ হল না।

অনাদি ও'র পাশে ঘুর ঘুর করছিল।

'এই অনাদি!' চিন্তামণি দেশাই ওকে ডাকলেন, 'কি করেছ কি? পার্টি জমছে না কেন? হোস্টেস আননি?'

'এনেছি সার, চারজন এসেছেন।'

'সবাই ভালঘরের মেয়ে তো?'

'নিশ্চয়,' অনাদি জিভ কেটে বললে, 'হোস্টেসরা তো খাওয়া-দাওয়া দেখবেন, অতিথিদের সঙ্গে ও'রাও চলে যাবেন। ভালঘরের মেয়ে তো বটেই! দুটো পয়সার জন্যে আসেন-টাসেন ...'

'তবে কি খাবার ভাল নয়?'

'সবাই তো খুব এনজয় করছে সার ঐ দেখুন না! সুশোভন রায় বোধহয় নাচবেন এখন।'

'ঐ লোকটাকে কেন যে আনলে! কাচ খাবার মধ্যে আর মজা কি আছে বল? এর চেয়ে যদি সেই মেয়েটাকে আনতে! কাঁধে আর মাথায় মোমবাতি বসিয়ে না কি ও বেলিডান্স করে?'

'নেই সার: বন্ধে গেছে।' অনাদি একটু চেঁচিয়েই বললে কেননা বহুক্ষণ হতভম্বের মত মেঝেতে বসে থাকবার পর সুশোভন রায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পানু বোসের সঙ্গে টুইস্ট করতে লাগলেন। সবাই বেজায় খুশী। যারা যারা নাচতে জানে সবাই নাচতে সুরু করলে।

'নাচবে না কি? মেমসায়েবের স্বামী জিগ্যেস করলে।

'জানো, তোমরা ভীষণ নিষ্ঠুর?' মেম-সায়েব ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, তারপর নাচতে সুরু করলে। স্বামী ওর কানে কানে বললে, 'সবাই তোমায় দেখে হিংসেয় নীল হয়ে যাচ্ছে, জানো? এ ঘরে যতজন এসেছে সবার চেয়ে তুমি দেখতে ভাল। তোমার মত গয়নাও ওদের কারো নেই।'

চিন্তামণি দেশাই শুধু দেয়ালের দিকে চেয়ে কাকে যেন ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার আনন্দ হচ্ছে না।' তারপরই অনাদিকে ডাকতে লাগলেন। দুটো বেটাছেলেকে ঘিরে সবাই নাচছে তাই দেখে তাঁর আনন্দ হবে? আনন্দে যদি আমাকে রাখতে না পারিস, তাহলে আমি মরে যাব আর তোরা ভেসে যাবি।

'দিন দিন গাধা হয়ে যাচ্ছ!' অনাদিকে সামনে দেখতে পেয়ে বললেন চিন্তামণি দেশাই।

'হ্যাঁ সার।' অনাদি ও'র হাত ধরল।

এখন উনি স্নান করবেন, একটু দুধ-ই খাবেন তারপর ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে যাবেন।

'রাতে হলঘরটা বন্ধ করে দিও, রুপোর বাসনগুলো দেখো।'

'হ্যাঁ সার!'

অনাদি অভ্যেসবশতই বললে। চিন্তামণি দেশাইয়ের বহু খাজে খেয়ালের মধ্যে অন্যতম হল রাতে এই পর্বতপ্রমাণ খাবার এই ঘরেই রাখতে হয়। ঘরটি, পূর্বভাষা অনুযায়ী বাতানুকূল, বেজায় ঠান্ডা। সমস্ত রাত আলো জ্বলে, খাবার, মদের গেলাস, চেয়ার-টেবিল, সিগারেটের প্যাকেট, পানের দোনা গড়াগড়ি যায়। অনাদির ধারণা, উনি রাতে উঠে এসে চুরি করে সন্দেশ-টন্দেশ খান।

ছোট আলোটা অনাদি জ্বালিয়েই রেখেছিল। ঘরে এয়ার কণ্ডিশনার চলবার মৃদু ভারী শব্দ। লোকটা কোত্থেকে একটা রুমালের ওআড় খুলে নিয়ে তাতে ফল, সন্দেশ, কাটলেট, যা পাচ্ছিল তাই পুরছিল। চিন্তামণি দেশাইকে দেখে ওর হাত মাঝপথে থেমে গেল। চিন্তামণির চোখ-মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। নিচের ঠোঁটটা উনি বার দুয়েক চেটে নিলেন।

'তুমি কাচ খাচ্ছিলে না?'

লোকটা জবাব দিলে না। অনেকটা ফাঁদেপড়া খরগোশের মত এদিক থেকে ওদিক চাইলে আর চোখ নামিয়ে নিলে। বোধহয় বুঝল যে এটি মরণফাঁদ।

'পালাবার চেষ্টা কোর না। ঘরের চারদিকে খন্তা আছে। বেরুবার দরজাগুলো তালা আটা। আমার ছটা ডালকুত্তা আছে জানো? তাছাড়া দরোয়ান দুটো।'

চিন্তামণি কচ্ছপের মত দেখতে হলে কি হয়, দিব্যি চটপটে। তাছাড়া, চোর ধরবার উত্তেজনায় ভেতর থেকে যেন ফূর্তি পাচ্ছেন। বেশ লাগছে তো? অনাদি তো কতরকম চেষ্টাই করে ওঁর জন্যে কিন্তু কিছুতেই এত ফূর্তি তো হয় না? একটা লোককে এনেছিল সে জিবে-গলায়-ঘাড়ে সাপের ছোবল নিত। আর সেই মেয়েটা? বাঘের খাঁচায় ঢুকে কি নাচই নেচেছিল। সিনেমা-থিয়েটার তো দেখতে যান না চিন্তামণি। ওসব হল বাজে আমোদ-প্রমোদ, মনটা হালকা করে দেয়। বিদেশে বেড়াতে যেতেও ভাল লাগে না ওঁর। বাংলা ছাড়া কিছুই ভাল বলতে পারেন না, একশো বছর ধরে ওঁরা কলকাতায় আছেন, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? এখন যদি বা বিদেশে যেতে একটু ইচ্ছে করে, শরীরের জন্যে সেটি হবার জো-টি নেই। চিন্তামণি দেশাইয়ের পয়সায় অনেকে আমোদ করে ঠিকই, কিন্তু উনি নিজে অত্যন্ত সাত্ত্বিক মানুষ। নিরিমিষ আহারটি—রাতে খই-দুধ—মদপান বা ধূমপান কোনটাই চলে না। এরকম লোককে, আনন্দে রাখা যে কঠিন তা চিন্তামণিও ভালই বোঝেন। কিন্তু আজ লোকটাকে চুরি করতে দেখে ওঁর আনন্দ হল।

'হাতে ওটা কি? কি নিচ্ছিলে?'

চিন্তামণি পোঁটলাটা দেখতে পেয়েছেন।

লোকটা পোঁটলাটা নামিয়ে রাখল। পাকানো, ক্ষয়ে যাওয়া, প্রৌঢ় চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। এরকম চেহারার লোক কলকাতায় আর যারা আছে তারা সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফেরবার পথে বাজার সেরে ফিরে এসেছে আর এতক্ষণে যে-যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্কামারা ভদ্রলোকের চেহারা। একজনকে দেখলে সবাইকে চেনা যায়।

'কি নিচ্ছিলে দেখি?'

চিন্তামণি দেশাইয়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কাটলেট ভেঙে সন্দেশের সঙ্গে চেপটে গিয়েছে, মাছভাজা আর আইসক্রীমে চটকাচটকি। কি অপচয়, কি নষ্ট, কিন্তু লোকটা কি বদ্ধ পাগল না কি?

'রুপোর জিনিসগুলো ফেলে তুমি খাবার নিচ্ছিলে?' চিন্তামণি দেশাই এরকম পর্বতপ্রমাণ হাঁদা মানুষ খুব কম দেখেছেন। চুরি করবার ঝুঁকিই যদি নিলি, তাহলে এমন জিনিস চুরি কর, যাতে আখেরে সুবিধে হয়। এসব কি আজকের জিনিস? এখন আর সে হ্যামিলটনও নেই, তেমন রুপোর বাসনও তৈরী হয় না।

লোকটা লজ্জায় মাথা নিচু করলে। সবটাই তো অ্যাক্সিডেন্ট বাপু! অনাদি টাকা দিলে বটে কিন্তু তবু বলতে বলেছিল। বোধহয় নিজে দু টাকা দালালী চায়। তা, লোকটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে কেউ কোথাও নেই, সেইজন্যেই আর লোভ সামলাতে পারেনি। নিদারুণ বোকামি হয়ে গিয়েছে তো! এ বাড়ীতে কুকুর থাকবে, লোহার গেট আর পাগলাঘন্টি, বন্দুকবাজ দরোয়ান সে তো জানা কথা।

'আমাকে চলে যেতে দিন সার!' লোকটা মিনতি করে বলল। বুড়োটাকে এক ঠেলা দিলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে কিন্তু লোকটা পালাবে কি করে?

লোকটা ভয় পেয়েছে, পালাতে চাইছে। টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণি দেশাইয়ের শরীর থেকে ডায়াবেটিসের দুর্বলতা, হার্টের ধড়ফড়ানি সব কোথায় চলে গেল। মনে হল শিরায় শিরায় তরল আগুনের মত তাজা রক্ত। কি আনন্দ, কি আশ্চর্য আনন্দ। লোকটাকে কেমন করে ছেড়ে দেবেন চিন্তামণি দেশাই? ও তো ওঁকে আনন্দ দিয়েছে।

'ছেড়ে দেব না, পুলিশে দেব তাই ভাবছি।'

'পুলিশে!' লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল 'পুলিশে দেবেন না সার, আমার ফ্যামিলি আছে।'

'পকেটে ওগুলো কি?'

লোকটা পকেট থেকে একটা তালগোল পাকানো সন্দেশের ডেলা বের করলে।

'সন্দেশ!'

'হ্যাঁ সার। কাচ খেয়ে খেয়ে গলায় আর কিছু থাকে না। তাই ভেবেছিলাম দু'দিন ধরে সন্দেশটা খাব।'

'ও! তুমি তো কাচ খাও।'

'হ্যাঁ।'

লোকটা আবার ফাঁদেপড়া জন্তুর মত এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে চোখটা ঘুরিয়ে আনল। ভীষণ ভয় করছে আজ, লজ্জা করছে নিজের বোকামি আর লোভের জন্যে। ছি ছি, এমন কাজ কোন ফ্যামিলিম্যান করে? এর চেয়ে রাস্তায় ফিরি করবে কাল থেকে। নয়তো লজ্জার মাথা খেয়ে ভগ্নীপতির কারখানায় কাজ নেবে। বুড়োটা কি রকম তাকিয়ে আছে দেখ, যেন বুকের ভেতরটা অব্দি দেখতে পাচ্ছে।

'ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি না।'

স্বস্তিতে লোকটার হাঁটু কাঁপতে সুরু করল। ধপাস করে চেআরে বসে পড়ল সে। চিন্তামণি দেশাই খুব চিন্তাকুল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণের জন্যে তিনি লোকটার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইচ্ছে হলে ওকে রাখতে পারেন, ধরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু এ-কথাটা স্বীকার করতেই হবে একা-একা চোর ধরার আনন্দে ওঁর শরীরটা ভাল লাগছে। ডাক্তার তো বলে, যা ভাল লাগে তাই করুন। চিন্তামণি দেশাই সব ভুলে গিয়ে কয়েকটা আঙুর ফেলে দিলেন মুখে। একটিও নাগপুর বা মাদ্রাজের আঙুর নয়। প্রতিটি পাহাড়ের, রসে টুব-টুবে, গাঢ় বেগুনী রঙের।

চিন্তামণি দেশাইয়ের মনে হল, তাঁর রক্তের চিনি আর আঙুরের রস মিলেমিশে অ্যালকোহল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। নইলে শিরায়-শিরায়, কানের পেছনে এত কোলাহল কেন? তিনি তো মদ খাননি?

'ধরিয়ে দেব কেন? তুমি তো খেটে খাও, কাচ খেয়ে মানুষের কাছ থেকে পয়সা নাও। আচ্ছা, কাচ খেতে গলার চামড়া ছিঁড়ে যায় না? এমনকি হতে পারে, যে কাচ চিবুতে গিয়ে তুমি মরে গেলে?'

'চিবোবার নিয়ম আছে। অ্যাক্সিডেন্ট যদি না হয়, তাহলে দুম করে মরমো কেন?'

'পাতলা কাচের গেলাস ভাল, না মোটা?'

'দাঁত ভাল থাকলে দুই-ই সমান: আমি অবিশ্যি মোটা দিশী গেলাসই পছন্দ করি। পাতলা গেলাসে ভয় বেশী।'

আর, চিন্তামণি দেশাই ভেবেছিলেন মোটা গেলাসে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তাই মোটা গেলাস এনেছিলেন লোকটার জন্য। একটু বিপদ হলে চিন্তামণি দেশাই-এর কেন যেন ভালো লাগে। আসলে কে সাপ ছিঁড়ে খাচ্ছে, কে সাপের ছোবল খাচ্ছে, কে বাঘের খাঁচায় ঢুকে নাচছে সেটাই তো কথা নয়। যার যা পেশা তাই করুক বাপু, যে যেটি জানে, সেই বিদ্যেটি বেচে খাচ্ছে, এর মধ্যে আর কথা কি আছে!

কিন্তু যদি হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে যায়?

সাপ খেতে খেতে গোখরো সাপের হলদে বিষে টইটম্বুর বিষ-থলিটা খেয়ে ফেলে যদি কেউ খাবি খায়?

কিম্বা মেয়েটা যেদিন খাঁচায় নাচবে, সেদিন যদি বাঘটাকে আফিম দিতে ভুলে যায় কেউ? আর বাঘটা যদি নেশার অভাবে বিরক্ত হয়ে মেয়েটাকে থাবা মেরে বসে?

কোনদিন কি সে-রকম হবে না? চিন্তামণি দেশাই তো সে-কথাটাই জানতে চান। এই যে লোকটা কাচ খাবে, উনি তো আশা করেছিলেন কাচ খেতে খেতে লোকটার গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত উঠবে। সেই-জন্যেই মোটা কাচের গেলাস এনেছিলেন। এখন শুনলেন লোকটার মোটা কাচেই সুবিধে হয়।

'পাতলা কাচের গেলাসে কি বিপদ বেশী?'

'আজ্ঞে।'

চিন্তামণি দেশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু ঝুঁকে বসে, গোপন পরামর্শ করবার ভংগীতে উনি বললেন, 'অনাদি তোমায় কত টাকা দিয়েছিল বল তো?'

'পঁচিশ।'

'আমি কিন্তু ওকে পঞ্চাশ টাকা দিতে বলেছিলাম। অনাদিটা তো কম ছ্যাঁচোড় নয়? একটা লোক তার বিদ্যে বেচে খাবে, তাকে তুই আমার পয়সা দিবি, সেখানেও কমিশন মারতে চাস? না না, আমি তোমায় বাকি পঁচিশটা, না, পঁচিশ কেন, পঞ্চাশ টাকাই দিয়ে দেব।'

বুড়োটাকে যত বজ্জাত মনে হয়েছিল, তত বজ্জাত বোধহয় নয়। মাথাটাথা খারাপ আছে বলে মনে হয়। লোকটা এখন দেখতে পেল মেঝের কার্পেটের রঙটা অদ্ভুত। গাঢ় লালের ওপর কালচে-লাল জমাট বেঁধে আছে চাপচাপ। লোকটার মত, ময়দানে যারা কাচ চিবিয়ে খায়, সেইরকম কয়েক হাজার লোক যেন মন দিয়ে ঝুঁকে বসে কার্পেটটার ওপর নকশামাফিক রক্তবমি করে গেছে। একেবারে রক্তের দাগ।

কিন্তু ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ।

'ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ।' চিন্তামণি দেশাই বললেন, 'টেবিলে কতগুলো গেলাস আছে দেখতে পাচ্ছ?'

'আজ্ঞে।' লোকটা আবার বোকা বনছে।

'অন্তত চল্লিশটা। মদের গেলাস। এই গেলাপীগুলো হচ্ছে জাপানী কাচের গেলাস, সবুজ পাতা আঁকাগুলো বোধহয় প্যারিস থেকে আনানো। তা, আমার কথা হচ্ছে তুমি বাপু গেলাসগুলো খেতে থাক। আমি বসে বসে দেখি। বেশী নয় দুটো থেকে আড়াইটে অব্দি, মোটে আধঘন্টা। তারপরই আমি তোমায় ছেড়ে দেব।'

'না!' লোকটা যেন ককিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ।'

'আমি পারব না।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ।'

'আমি যেতে চাই।'

'যাবার ক্ষমতা থাকলে তুমি আগেই যেতে।'

'কিন্তু আপনি আমাকে এভাবে ডিটেইন করতে পারেন না। আমি আপনার একটা চামচও চুরি করিনি। ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম, আটকে পড়েছি, হ্যাঁ স্বীকার করছি যে, খাবারও নিতে গেছলাম। কিন্তু তাই বলেই কি আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারেন? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা-নয়-তাই করাতে পারেন?'

'না। তোমাকে লম্ফঝম্ফ ধরিয়ে দিতে পারি। নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছ? তোমায় যদি ধরিয়ে দিতে চাই, তাহলে এটা নিয়েছ, ওটা নিয়েছ বলে একখানা লিস্টি বের করতে কি আমার খুব একটা কষ্ট হবে?'

'হা ভগবান!' লোকটা এমন করে চেঁচাল যে কেউ যেন ওকে হঠাৎ ছেঁকা মেরেছে হাতে অথবা পায়ে। যেন বিছে কামড়েছে, কালো কাঁকড়া বিছে। তারপর গেলাসগুলো তুলে খেতে আরম্ভ করল। একটার পর একটা।

ঘড়ির কাঁটা সরছে। লোকটার মুখ ক্রমেই ঘোলাটে আর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। যেন ওর মুখের চামড়ার নিচে এখন আর ও বসবাস করে না। অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর নাক-মুখ-রক্তের ছিটে-জমা চোখ কিন্তু ভাড়াটে এখনো আসেনি। সব ফাঁকা, অর্থহীন, বোবা।

চিন্তামণি দেশাইয়ের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু এখন যেন উত্তপ্ত সুরা। কি কি মদ যেন আছে যা গরম করে খেতে হয়। চিন্তামণি কি গরম মদ খেয়েছেন? আরো কয়েকটা আঙুর খেলেন উনি।

হঠাৎ লোকটার চোখটায় ভয় চমকে উঠল, মুখের চামড়া কুঁচকে উঠল যন্ত্রণায়, 'জল, একটু জল!' লোকটা খাঁটি, বরফের চেয়েও শাদা দামাস্ক কাপড়ের টেবিল-ঢাকনী খামচে ধরল।

'পড়ে যাবে...ভেঙে যাবে সব...তুমি কি করছ?'

লোকটা কাপড়টা খামচে বলল, 'আমায় একটু জল দিন।'

'নাও না...জল খাও না...' চিন্তামণি দেশাই ভয় পেয়ে গেলেন। লোকটা এরকম করছে কেন?

'তুমি এরকম করছ কেন?'

লোকটার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আহা, হয়তো কষ্ট হচ্ছে ওর। চিন্তামণি আবার ছারপোকা মশা পর্যন্ত নিজের হাতে মারেন না, একটা জলজ্যান্ত মানুষ কষ্ট পাবে তা কেমন করে দেখবেন?

'একটু সন্দেশ খাবে?' তুমি ভাল হয়ে ওঠ বাপু। তারপর না-হয় আধমণ সন্দেশ ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেও।

লোকটা একটা বিশ্রী শব্দ করল। যেন চড়াই পাখীর ছানা বেড়ালের হাতে ধরা পড়বার আগে 'কুঁকু' করে ডাকছে। হাতটা কিন্তু টেবিলের শাদা দামাস্ক কাপড়টা আঁকড়েই রইল। জল খেল লোকটা। খোকার মত হাঁ করল। একটু সন্দেশও খেল। আবার খানিকটা জল।

তারপর লোকটা কার্পেটে আছাড় খেয়ে পড়ল। কাপড়টা হাতের মুঠোয় টেবিল থেকে উপড়ে এল। মাছভাজা, আঙুর, সোনালী সিরাপে ডোবানো ফল, সন্দেশ, রুপোর প্লেট, নীল, সোনালী, সবুজ, গোলাপী কাচের গেলাস। চিন্তামণি দেশাই বেল টিপতে লাগলেন।

দুজনে একই হাসপাতালে মারা গেলেন। লোকটার পেটের পাকস্থলীতে আর নাড়ীতে কুচো-বরফের মত কাচের টুকরো। ইলিআম আর কোলোনে কন্ত। ভীষণরকম হেমারেজ হয়েছিল ভেতরে। ডাক্তাররা বললে, হেমারেজিক গ্যাস্ট্রাইটিস। কাচের সঙ্গে, গলনালীর মুখে একটি গোলাপী সন্দেশ দেখে ওরা অবাক।

চিন্তামণি দেশাই মারা গেলেন হার্ট-ফেল করে। অত উত্তেজনা আর ছোটাছুটি ও'র সহ্য হয়নি।

লোকটার জন্যে সৎকার সমিতির গাড়ী এল। ওর বউ-ছেলে-মেয়ে হাসপাতালের ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদল। মর্গ থেকে মরা খালাস করতে ওদের জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল।

চিন্তামণি দেশাইকে মহাসমারোহে পোড়ানো হল। অজস্র ফুল এসেছিল, তাছাড়া বাজনা। কাঙাল-ভিখিরীকে সন্দেশ বিলোন হল শ্মশানে। অনাদি কয়েকজন মেয়ে-ছেলেকে ভাড়া করে এনেছিল। তারা বুক-চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে শুকনো চোখে মড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের দরজা পর্যন্ত গেল। ও'র নিজের লোক বলতে কেউ ছিল না।

কালীদহের কুমীর

বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মানিকচাঁদ তলাও। মুর্শিদাবাদের লালগোলা অঞ্চলে এই পুকুরের খুব নামডাক—ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিও আছে। যে জগৎশেঠ বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন—তাঁর নাম জগৎশেঠ মহতাব। তাঁর ঠাকুরদা ফতেচাঁদ সম্রাট মহম্মদ শা'র কাছে জগৎশেঠ উপাধি পান। এই ফতেচাঁদের পিতা ছিলেন মানিকচাঁদ—মুর্শিদাবাদের নবাবের দক্ষিণ হস্ত।

এই মানিকচাঁদের স্মৃতি বহন করে চলছে মানিকচাঁদ তলাও। নবাব বাদশার কাণ্ড কিনা—চারিদিক পাথরে বাঁধানো—ধাপে ধাপে সিঁড়ি হয়ে নেমে এসেছে। পাথর বসানো ঘাট—এমন কি পুকুরের তল পর্যন্ত পাথর বসানো—জল সব সময়েই টলটলে পরিষ্কার। চারকোণে নাকি চারটি খুব বড় ইঁদারা আছে—তাদের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক উৎস আছে কিনা জানি না—কিন্তু জলে বারোমাস পুকুরটা ভরে থাকে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল জায়গাটাকে একটা অপূর্ব পরিবেশ এনে দিয়েছে। এই তলাওটা আমাদের কিনে নিতে হয়েছিল।

এরও একটা ইতিহাস আছে। মানিকচাঁদ তলাও ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের সম্পত্তি। এই নবাবরা কিন্তু নিজেরা কেউ কস্মিনকালে নবাব নয়—নবাববংশের শাখা-প্রশাখায় বহুবিস্তৃত এক বিরাট গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে অনেকেরই আর টাকাকড়ি কিছু নেই—নবাব সরকার নির্ধারিত পূর্বপুরুষের মাসোহারা ভাগ-বাঁটোয়ারা হতে হতে এমন অঙ্কে এসে পৌঁছেচে যে তা উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। হয়ত এইভাবে, কোন এক নবাব সাহেবের মাসোহারা দশ টাকায় এসে ঠেকেছে—তাঁর চার ছেলে—বাপের এন্তেকাল হলে চারটি আড়াই টাকার নবাব তৈরী হবে তা টাকা যাই হোক, মেজাজে কিন্তু সবাই নবাব—আর নবাব সাহেব বলে সম্বোধন করলে সবাই খুশী—ছেলেদেরও সাহেবজাদা বললে আহ্লাদে আটখানা। কিছু না থাকলেও মুখে কিন্তু খৈ ফোটে, গাল ভরতি পানের পিক নিয়ে ঠাণ্ডি পোলাও, বাইগন কা কোপ্তা আর সরষোঁ কে আরক অর্থাৎ পান্তাভাত, বেগুন পোড়া সরষের তেল দিয়ে খানাপিনার বড়াই করেন। আমাদের ওখানেই লালগোলাতেও এ রকম দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তাঁরা আমাদের ওখানেই ডেরাডাণ্ডা গেড়েছেন। মানুষ হিসেবে ভদ্র, মিষ্টিস্বভাব আর খুবই আদবকায়দাদুরস্ত। গায়ে ময়লা চোগা চাপকান, পরনে ঢোলা পায়জামা, হাসিমুখে কথায় কথায় কুর্নিশ, তাঁদের খানদানী চাল-চলনে বিগত ঐতিহ্যের পূর্ণ স্বাক্ষর।

আরও একটা নবাবী চাল এঁদের ছিল। প্রতি বছর লক্ষ্ণৌতে গিয়ে খরমুজা খাওয়া চাই। যাতায়াতের ভাড়া জোটে না, কেউ ঘোড়া, কেউ সাইকেল, কেউ বা আম বাগান পর্যন্ত বিক্রী করে লক্ষ্ণৌ যায়। মানিকচাঁদ তলাও-এর মালিক নবাব সাহেবের আর কোন পুঁজি নেই, তিনি তলাও-এর খদ্দের খোঁজেন। কিন্তু তলাওটা কুমীরের

ডিপো—কে কিনবে? মাছ ছাড়লেও, ছোট বড় আন্ডা বাচ্চা সব কুমীরের পেটে। তা ছাড়া একটা প্রবাদও ছিল—যার জন্যে ওটা কেউ কিনতে চাইতো না।

গন্তব্যস্থল না দেখে নবাব সাহেব আমার ঠাকুরদার কাছে এসে ধরনা দিলেন। এটা কিনতেই হবে এবং কিছু টাকা নবাব সাহেবকে দিতেই হবে—নইলে তাঁর নবাবী আর থাকে না—লক্ষ্ণীতে খরমুজা ভক্ষণের উৎসব বরবাদ হয়ে যায়।

মহারাজারও ইচ্ছে ছিল না।

কিন্তু নবাবের কাতরতায় তাঁর মন ভিজে গেল। সবরকম আইনঘটিত খোঁজ-খবর নিয়ে কিছু বেশী মূল্য দিয়েই কিনে নিতে তিনি দেওয়ানজীকে আদেশ দিলেন।

আমাদের স্বত্বস্বামিত্বে এসে যাওয়ায় আমার প্রথম কাজ হল মানিকচাঁদ তলাও-এর কুমীরকুলকে নির্মূল করা।

কথায় বলে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। ডাঙার বাঘ আমার হাতে অনেকবারই জব্দ হয়েছে—এখন জলের কুমীর কীভাবে আমার সংগে মহড়া নেয়, তাই দেখতে বাকী।

কুম্ভীরাশ্রু কথাটাও আমাদের ইংরেজীর মাস্টারমশায়ের মুখে অনেকবার শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। কথাটির তাৎপর্য তাঁর কাছে জেনে নিয়েছিলাম। কপট সহানুভূতির সমার্থক ক্রোকোডাইল টিয়ার্স—তারই বংগানুবাদ কুম্ভীরাশ্রু। সুযোগমত তার জীবন্ত উদাহরণ চাক্ষুষ করার প্রবল বাসনা বহুদিন থেকেই ছিল। তাই কুমীর শিকার উপলক্ষে একবার যাচাই করে নিতে হবে—সত্যিই কুমীর কাঁদে কিনা এবং তার চোখের জল কোন পথে বয়ে যায়।

প্রথম যেদিন মানিকচাঁদ তলাও-এর কুমীর আমার গুলীর আঘাতে উল্টে গেল, লক্ষ্য করে দেখি, সত্যিই কুমীরের কুচকুচে মুখে চোখ থেকে মুখের হাঁ পর্যন্ত দুদিকেই চামড়ার ভাঁজ—দুটো কালো দাগ—জ্বল-জ্বল করছে—যেন চোখের জল ঐ দাগ ধরেই গড়িয়ে পড়ে।

সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা।

আমি প্রায় রোজই সেখানে কুমীর শিকারে যেতাম। খালি হাতে ফিরতে হয়নি কোনদিন। লালগোলা থেকে বেশী দূরে নয়, মাত্র ছ' মাইল। ভোরবেলায় রওনা দিতাম আমার হুড্‌খোলা ফোর্ড গাড়ীতে—মানিকচাঁদ তলাও পৌঁছতে সূর্য উঠে পড়ত। আর একটু বেলা হতেই কুমীররাও রোদ পোহানোর জন্য চারদিকের পাথর-বাঁধানো ঘাপগুলির ওপর নির্বিকারে এখানে সেখানে বসে থাকত।

শুধু মানিকচাঁদ তলাও নয়—মাইল-খানেক দূরে দেওয়ানসরাই পুকুরেও বেশ কিছু কুমীর ঘর বেঁধেছিল। মানুষ যেমন সিমলা দার্জিলিঙে বায়ু পরিবর্তনে যায়, এরাও জল-পরিবর্তনে যেত অর্থাৎ এদের মধ্যে চলত পুকুর-বদলের পালা। জংগলের রাস্তা দিয়ে ঘাপটি মেরে যাওয়া আসার পথে বুনো শুওরের পাল্লায় পড়ে কখনও তীর বা বল্লমের খোঁচায়, কখনও বা লগ্‌ড়াঘাতে দু'চারটে প্রাণ হারাতো।

কুমীর শিকারের মরশুম ছিল শীত-কাল। পাথর বাঁধানো তলাও-এর হিম-শীতল জল থেকে উঠে রোদ পোহাতে এসে ছোট বড় মিলিয়ে অন্ততঃ ডজন তিনেক কুমীর বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে আমার হাতে অক্কা পেয়েছে। কিন্তু মানিকচাঁদ তলাও থেকে আরও মাইল পাঁচেক দূরে, কালীকুয়ো বা কালীদহের কুমীর শিকার করতে গিয়ে যে বিপত্তি হয়েছিল—আজ এখানে সেই কাহিনীই বলতে চাই।

লালগোলা-বহরমপুর রাস্তায় ভগবান-গোলা ছাড়িয়ে জিয়াগঞ্জের পথেই কালী-দহের ওপরে ব্রিজ। দু'পাশেই গভীর জল। লালগোলাতেই কথাটা শুনেছিলাম বটে—আর মানিকচাঁদ তলাও-এ কুমীর শিকারে গিয়ে সেখানেও বিশদ খবর পেলাম—কালীদহের কুমীরের সম্বন্ধে। কুমীর গড়ে কতদিন বাঁচে সেটা জানা থাকলেও, হিসেবের বাইরের কথা শুনতাম—কেউ বলত একশ' কেউ পঞ্চাশ—কেউ বা বলত বাপ দাদার আমল থেকে শুনে আসছি—যার যা খুশী তাই বলে যেত, এমন কি ভৌতিক কিংবদন্তীও বাদ যেত না।

কত যে নাম-করা শিকারীর আনাগোনা কিন্তু কারো সাধ্য হত না কুমীরটাকে ঘায়েল করতে। আছে চোখের সামনেই—বন্দুকের তাক্‌ও ঠিক—কিন্তু গুলী তার গায়ে লাগে না। ক্রমে এই বিশ্বাসই লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে ওটা মা-কালীর পোষা কুমীর। কেউ কেউ আবার আরও বাড়িয়ে গল্প করে—মা-কালীর সহচরী ডাকিনী যোগিনীদের একজন কুমীর হয়ে আছে—ওর গায়ে গুলী লাগবে না—আর কেউ যদি ওটাকে নেহাৎ শিকার করেই তবে তারও ঘোর অমংগল।

এইসব আজগুবী প্রবাদও আমার কানে এসেছে। কুমীর শিকারের নেশায়, তার ওপর কোনও গুরুত্ব দিইনি। দিনের পর দিন ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছি। কখনও কুমীরের কাছে পৌঁছানোর আগেই সেটা জলে নেমে গিয়েছে; গুলী করেছি, কিন্তু তার গায়ে লাগেনি। এর মধ্যে অন্ততঃ একশ'র ওপর গুলী খরচ হয়ে গিয়েছে। গুলী না লাগলেও সেটা আর দেখতে পাওয়া যায় না—জলে ডুবে যায়—সেদিন আর ওঠে না—আবার হয়ত তিন চার ঘন্টা পরে ওঠে। কাজেই একবারে একটার বেশী গুলী করার সুযোগ পাওয়া যায় না। কুমীরের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে যদি সে রকম জায়গায় গুলী লাগেও, জলের মধ্যে ডুবে যায়—তলার মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তারপর চিৎ হয়ে ভেসে ওঠে। কতদিন এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের ধারে সংগে আনা তৈরী খাবার খেয়ে অপেক্ষা করেছি এই আশায়—যদি কুমীরটা দুপুরের দিকে আবার দর্শন দেয়। কিন্তু কষ্টভোগই সার, কুমীরের দেখা পাওয়া যায় না। আর যদিই বা পাওয়া যায়, গুলী করলেও লাগে না।

আশ্চর্য!

এ কী?—

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে—

হায়রে—

কত বাঘ ভালুক গেল চলে,
এখন কুমীর মারতে চোখে জল।

প্রায় ছ'মাস ধরে চেষ্টার পর, একদিন কুমীরটাকে বাগে আনতে পারা গেল।

সেদিন খুব ভোরেই লালগোলা থেকে রওনা হবার কথা। ঘুম থেকে উঠে মা-কালীর নাম নিয়ে ফোর্ড গাড়ীতে চেপে বসি—সংগে আমার পিসতুতো ভাই নীরেন। অনেক শিকারেই সে আমার সহযাত্রী হয়েছে।

গাড়ী ছুটে চলে—নীরেন আমার উৎসাহকে ছাঁটির পথে চালাতে চায়

—দাদা, কালীকুয়োর কুমীরটা দেখাশুনা—ওর গায়ে হাত দেওয়া কী ভাল হবে?

তাকে একটা ধমক দিই

—তোমার কাছে হিতোপদেশ শোনবার জন্যই কী সংগে নিয়ে এলাম? মেলা বোকো না। দেরাদুনী আমরা সবাই—চারিদিকে জীবজন্তু যা দেখা যায়, সবই ভগবানের অংশ। তাহলে বল, গলায় কণ্ঠি নিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে বেরুলে পার—

—তা যা বলছ বল, তবে কুমীরটাকে কেউ ঘায়েল করতে পারেনি, তা জানো?

—তার কী হয়েছে? কেউ না কেউ একদিন তাকে মারবেই—যদি সেই তার নিয়তি হয়। তাই বলে আমরা চুপ করে থাকব কেন? আমার কাজ আমি করে যাব—এতে যা হয় হোক—জানব সেই আমার নসীব। তা ছাড়া, এতবার গুলী করেছি, লাগেনি—সেই জন্যেই জেদটা চড়মে উঠেছে। আর সব শিকারী যারা আসে, তারা আট দশ দিন পরেই বিরক্ত হয়ে সরে পড়ে। আর জানো? এতবার গুলী করেও যদি শিকারের গায়ে না লাগে, তবে নিজের হাত নিজেই কামড়াতে ইচ্ছে হয়। তা ছাড়া এর পেছনে কী অলৌকিক রহস্য আছে, সেটাও জানতে চাই।

আমার এই কট্‌কটে চাঁছাছোলা বচন শুনে নীরেন চুপ মেরে গেল।

বহুদিনের পুরোতন মেকানিক ড্রাইভার বিশ্বাস কুট করে একটি চিমটি কাটে—

—কিছু বলে লাভ নেই—'না'-কে 'হাঁ' করাতেই হুজুরের বাহাদুরি।

কিন্তু এই বাহাদুরি দেখানোই যে কত মর্মান্তিক হতে যাচ্ছিল, তার বিবরণ পরে দিচ্ছি—আপাততঃ কুমীর শিকারের ঘটনাই বলি।

কালীদহের ব্রিজের নীচেই মোটর থেকে নেমে পড়ি। নীরেনকে সংগে নিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় ব্রিজের ওপর থেকেই অন্য দিনের মত সেদিনও দেখি, বটগাছের গুঁড়ির মত একটা প্রকাণ্ড পেটমোটা কুমীর দূরে হাঁ করে পড়ে আছে। জল থেকে আট দশ হাত ওপরে জংগলের ধারে

উঠে এসেছে। কুমীরটা যেখানে আছে, তার কাছের একটা গাছকে চিহ্নিত করে নিলাম।

ওপারে গিয়ে সেই গাছ লক্ষ্য করে এগিয়ে যাই। সেদিকটায় শুধুই কাঁটা গাছের জঙ্গল। বন্দুকের নল দিয়ে গাছ সরিয়ে গা বাঁচিয়ে চলি, ব্রিচেস্ কত জায়গায় ছিঁড়ে গেল।

খুব ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বহু কষ্টে গাছতলায় পৌঁছলাম। সেখানটাতেও বড়বড় ঝোপজঙ্গল—সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখা যায় না।

ভগবান সদয়। ছোট্ট একটা ফাঁক পেয়ে নজর চালাতেই কুমীরটার গলা থেকে বুক অবধি স্পষ্ট দেখা গেল।

মুহূর্তকাল স্থির লক্ষ্যে কুমীরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর গুলীভরা Manton-এর heavy rifle টা তুলে সেই ট্রিগার টিপেছি, গুলীটা ঘাড়ের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কুমীরটা উল্টে গেল—তার বুকের সাদা অংশ দেখা দিতেই আবারও গুলী।

ভাগ্য ভাল, গুলী-খাওয়া কুমীরটা জলে ঝাঁপ দেয় নি। আর দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয় গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের নলটা ফেটে গেল। এত হেভী রাইফেলে এ রকম কখনও হয় না। মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাই। আরও অবাক হয়ে দেখি, কুমীরটার কপাল জুড়ে টকটকে সিঁদুরের মত লাল দাগ—রক্ত নয়।

সেই বিরাটকায় কুমীর বার কয়েক তার লেজটা মাটির ওপর উল্টে-পাল্টে সেখানেই স্থির হয়ে গেল।

সাঁওতালদের ডেকে গরুর গাড়ীতে করে কুমীরটাকে লালগোলায় নিয়ে যেতে বলে গোটা পঁচিশেক টাকা তাদের খরচা দিলাম। আমরাও মোটরে ফেরার পথে।

এখান থেকেই নতুন করে দুর্ভাগ্যের পালা সুরু।

পথেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে প্রবল জ্বর। দেহে অসহ্য যন্ত্রণা—কে যেন সর্বাঙ্গে সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

আমল দিলাম না। এই আফশোস্—আমার এমন মজবুত রাইফেলের নলটা ফেটে গেল—

নীরেন আমাকে চেপে ধরে—তবু তুমি মানতে চাও না, দাদা? বন্দুকটা ফাটলো, তোমার এই অবস্থা—তবু স্বীকার করতে চাও না?

কথা বলার শক্তি নেই, কোনও রকমে উচ্চারণ করি—নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

যখন লালগোলায় পৌঁছলাম, সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে—প্রায় বেহুঁশ অবস্থা—কত যে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখি, জ্বর-বিকারে বিশ-বাইশ দিনের মাথায় কানের পাশে গ্ল্যান্ড ফুলে যমে-মানুষে টানাটানি। ডাক্তার এলো, নার্স এলো—অপারেশন করতে হবে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম করা চলবে না—যেখানে অপারেশন করা হবে, সেটা মস্তিষ্কের শিরার এত কাছাকাছি যে যদি সামান্য এদিক-ওদিক হয়, তবে হয়তো সেখানেই সব শেষ।

আমার পিতৃদেব নীরেনের কাছে সব কথা জেনে নিলেন। দৈব অভিশাপের আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল।

এখন উপায়?

উপায় আছে বৈকি। আমার ধর্ম-জীবনের গুরু, স্বামী দ্বারিকানাথের কথা উঠল। তিনি যে আমার জীবনের কী ছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর কৃপাধন্য আমি। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, জটাজুটধারী ঋষিকল্প মহাপুরুষ—উত্তরাখণ্ডে নন্দপ্রয়াগে সাধনাশ্রমে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

সাধুবাবার কাছে সব ঘটনা জানিয়ে তাঁর কৃপাপ্রার্থনা করে চিঠি দিতে হবে। আমার হাত-পা আড়ষ্ট—নিজের হাতে লেখবার ক্ষমতা নেই, অন্য কেউ আমার নাম করে চিঠি লিখে বকলমে সই করে দেবে। মাও তাতে সায় দিলেন।

কিন্তু আমার মন কিছুতেই রাজী নয়। পারমার্থিক ছাড়া ঐহিক কিছুই তো তাঁর কাছে কখনো চাই নি। পিতৃদেব আমার মনের ভাব বুঝে নিজেই চিঠি লিখে সাধুবাবার কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর সদয় উত্তর এলো। তিনি সমস্ত ব্যাপার পূর্বেই জেনেছেন এবং জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

অপারেশনের আদেশ পাওয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে সার্জন সাহেব এলেন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে—দুই গালপাট্টা জোয়ান দু-দিক থেকে আমার মাথা চেপে ধরলে—যাতে একটু নড়াচড়া না হয়।

সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার জীবনে এই প্রথম—কী যে যন্ত্রণা আর চোখের সামনে নিজের দেহ থেকে অজস্র রক্তপাত—মুখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে; সাধুবাবার কথাই শুধু স্মরণে আসছিল।

ভোগান্ত হল। কিন্তু কালীদহে কুমীর শিকার করার দুর্ভোগ আমি আজও ভুলি নি।

ভাল হয়ে শুনেছিলাম, সেই প্রকাণ্ড পাকা কুমীরটাকে আনতে দুটো মোষের গাড়ীর দরকার হয়। কাঠের তক্তা দিয়ে দুখানা গাড়ীর ওপর পাটাতন করে তার ওপর কুমীর চাপিয়ে দুটো মোষ সেই দুখানা গাড়ী টেনে এনেছিল। তখন গভীর রাত—তাই কুমীরটা কত বড়, সেটা আর মাপা হয় নি। আমিও পাঁচ সাড়ে পাঁচ ডিগ্রী জ্বরে বেহুঁশ, তাই দ্বিতীয়বার সেটাকে চাক্ষুষ করার প্রশ্নই ওঠে না।

সাঁওতালরা কুমীর খায়—তাই তাদেরকেই কুমীরটাকে দেওয়া হয়েছিল। তারা কুমীরটার পেটে কিছু সোনা-চাঁদির গহনা পায়। সেগুলো আর চামড়াটা আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলে, আমার ঠাকুরদা, মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ বল্লেন, —ওগুলো বিক্রী করে কাঙালী ভোজন করাও, যারা কুমীরের পেটে গিয়েছে, তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

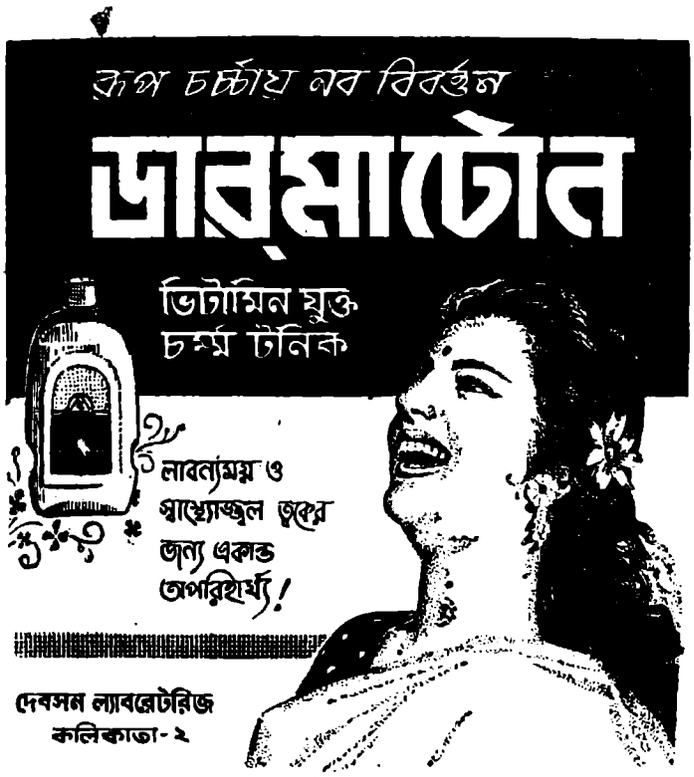

শহরে শহরে
গ্রামে গ্রামে
পাড়ায় পাড়ায়
ঘরে ঘরে

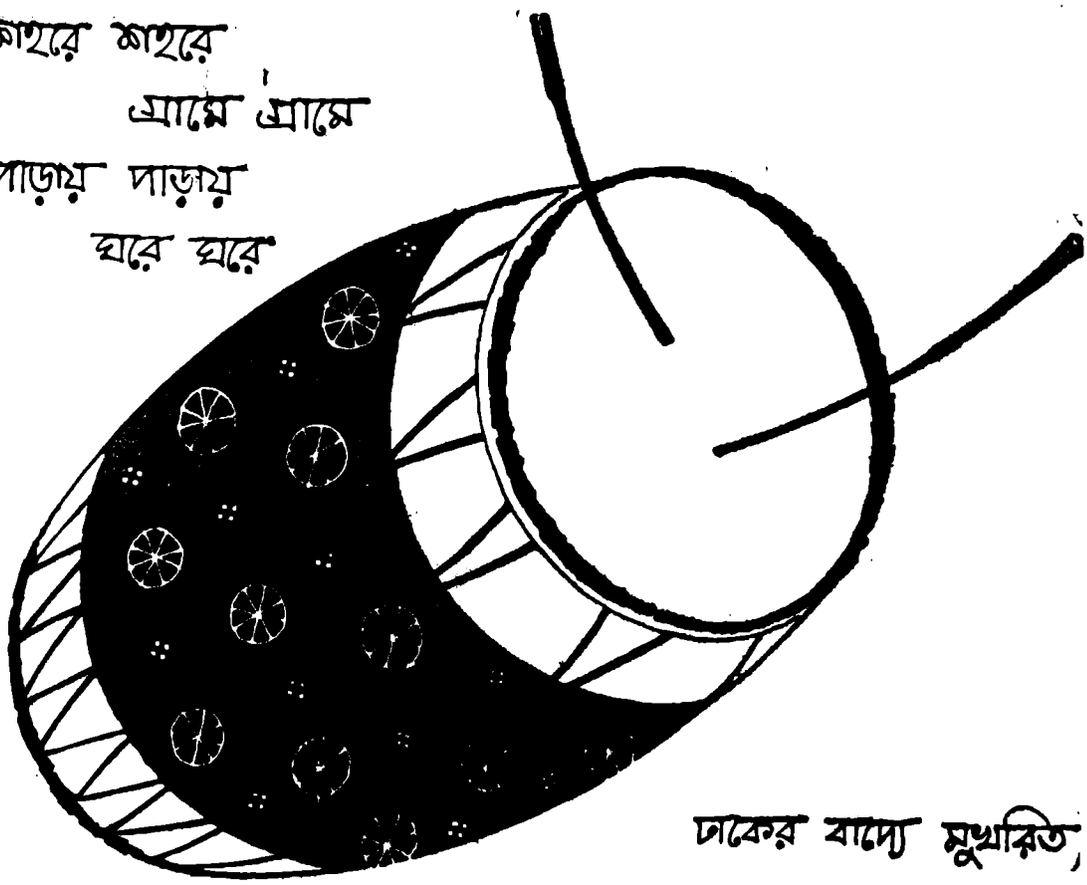

ঢাকের বাদ্যে মুখরিত,
আকাশ বাতাস,
আবার মা আসছেন ঘরে

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

আজ সকলের প্রিয়,
পুজোর বাজারে আর সব কিছুর
সঙ্গে চাই — বোরোলীনও
ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায় তার জুড়ি নেই

বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

দৃশ্যের গভীরে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

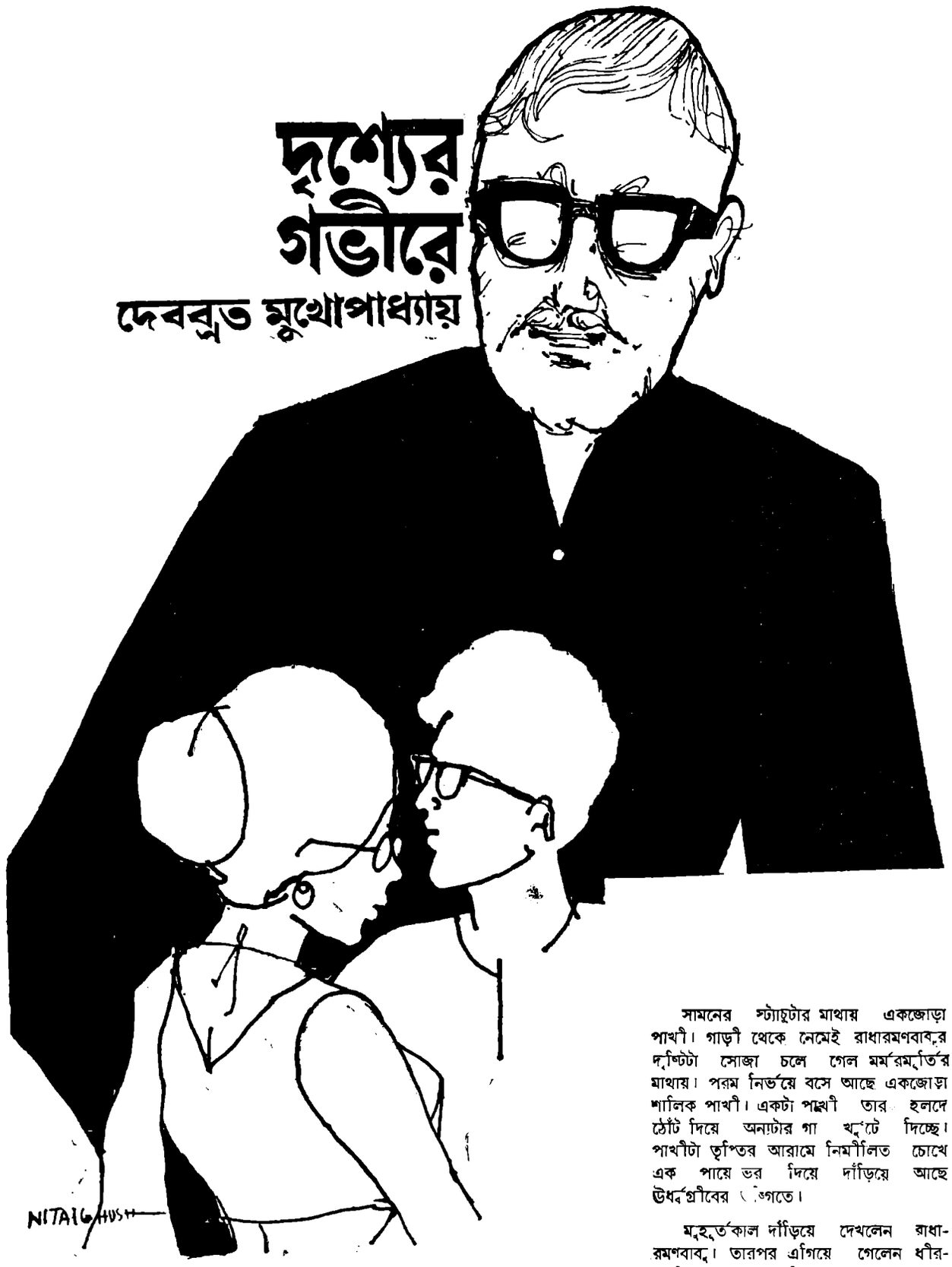

সামনের স্ট্যাচুটার মাথায় একজোড়া পাখী। গাড়ী থেকে নেমেই রাধারমণবাবুর দৃষ্টিটা সোজা চলে গেল মর্মরমূর্তির মাথায়। পরম নির্ভয়ে বসে আছে একজোড়া শালিক পাখী। একটা পাখী তার হলদে ঠোঁট দিয়ে অন্যটার গা খুঁটে দিচ্ছে। পাখীটা তৃপ্তির আরামে নিমীলিত চোখে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঊর্ধ্বগ্রীবের ভঙ্গিতে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে দেখলেন রাধারমণবাবু। তারপর এগিয়ে গেলেন ধীর-পদবিক্ষেপে মর্মরমূর্তির পাদদেশে।

—ফুরুৎ,—উড়ে গেল একটা পাখী। অন্যটা পলকের জন্যে এপাশ-ওপাশ চেয়ে অনুসরণ করলে তার সাথীকে।

রাধারমণবাবু তাঁর ছুঁচলো গোঁফের প্রান্তভাগটা অকারণেই একবার চুমরে দিয়ে হাসলেন মনে মনে। চেয়ে দেখলেন হাতির দাঁতের বাঁটওলা ছড়িটার দিকে। বুঝতে

পারলেন না, তাঁকে দেখে পক্ষী-যুগলের উড়ে যাবার কারণটা কি? তাঁর হাতের ছড়ি না রাজকীয় গোঁফ?

দৃষ্টিটা নেমে এল মর্মরমূর্তির পাদদেশে। কয়েকটা অর্ধউলঙ্গ ছেলে মনের আনন্দে খেলা করছে পাথরের নুড়ি নিয়ে। মুড়িওলা আপন মনে মুড়ির সঙ্গে ছোলা-পেঁয়াজ-নারকেল মিশিয়ে তেল দিয়ে মাখছে একটা এলুমিনিয়মের বাটিতে। খদ্দের এলেই দিয়ে দেবে ঠোঙা ভর্তি করে। মুড়ি মাখা দেখে হঠাৎ রাধারমণবাবুর মুখটা রসালো হয়ে উঠলো। তখুনি সেই অসঙ্গত ইচ্ছাকে দমন করে ফিরিয়ে নিলেন দৃষ্টি। ছেলেগুলো খেলে যাচ্ছে নিজের মনে, ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে। আবার মনে মনে হাসলেন রাধারমণবাবু। এতগুলো ছেলের হৈ-হৈ চীৎকার পক্ষীযুগলের নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের ব্যাঘাত ঘটায় নি, ব্যাঘাত ঘটলো তাঁর আগমনে। উড়ে গেল পক্ষী-যুগল। দৃষ্টিটা আর একবার বুলিয়ে নিলেন মর্মরমূর্তির ওপর। তারপর ছড়িটা নাচাতে নাচাতে পা চালিয়ে দিলেন তিনি।

ময়দান এবং ইডেন উদ্যানে বেড়ানো রাধারমণবাবুর প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে একটা। চাকরী থেকে অবসর নেবার পর থেকেই শারীরিক এবং মানসিক ব্যায়ামের অঙ্গ হিসেবে প্রতিদিন বিকেলে বেড়াতে আসেন। রেড রোডের মুখে নেমে পড়েন মোটর থেকে, তারপর ময়দানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। কেল্লার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন ইডেনে। সন্ধ্যে পার করে দিয়ে আউটরাম ঘাটের কাছে অপেক্ষমান গাড়ীতে এসে ওঠেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোন ঋতুতেই তাঁর এই বৈকালিক ভ্রমণ বাদ পড়ে না।

ছড়িটা নাচাতে নাচাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছেন রাধারমণবাবু। দৃষ্টিটা সম্মুখ-প্রসারিত, মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছেন এপাশ-ওপাশ।

বিচিত্র জায়গা এই ময়দান। প্রতিদিন কত জিনিসই চোখে পড়ে তাঁর। কখনো বা দাঁড়িয়ে দ্যাখেন, কখনো চলে যান পাশ কাটিয়ে। ফুচকাওলা বসেছে তার পসরা সাজিয়ে, তাকে ঘিরে বসেছে খদ্দেরের দল। অম্ল-মধুর রসে চুবিয়ে ফুচকাওলা পরিবেশন করছে তার দ্রব্যসম্ভার, অমৃতের আস্বাদন পাচ্ছে খদ্দেররা। অন্তত তাদের চোখে মুখে সেই রকমের ভাব। ছায়াঘেরা গাছের তলায় বসেছে গণকঠাকুর। সামনে ছকপাতা, পাশে তারের খাঁচায় ছোট্ট একটা পাখী। ভাগ্য গণনা করবে গণকঠাকুর, পাখী বলে দেবে ভবিষ্যৎ। ছকের সামনে হয়তো বা বসে আছে কোন যুবক। জিজ্ঞেস করছে গণকঠাকুরকে তার পরীক্ষার ফলাফল কিম্বা গুপ্ত প্রণয়ের সাফল্য। প্রশ্ন অনুযায়ী মূল্য হাঁকেন গণকঠাকুর। একেবারে শেষপ্রান্তে পানের পসরা সাজিয়ে বসেছে পানউলী। পানের রসে ঠোঁট দুটি জরিয়ে বিগত-যৌবনা পানউলী অফিস ফেরৎ মাঝবয়সী খদ্দেরের হাতে তুলে দিচ্ছে পানের খিলি, সেই সঙ্গে দিচ্ছে মুচকি হাসির ঝিলিক। অফিসফেরতা বাবু উবু হয়ে বসে পান কিনছেন, আর উপভোগ করছেন সেই মুচকি হাসির ঝিলিক। কখনো বা ফিস্-ফিস্ করে কথা বলে কোন এক অপূর্ণ বাসনা নিচ্ছেন পূরণ করে।

থেমে পড়লেন রাধারমণবাবু। খোলা মাঠে কাঠের বদলে ইট সাজিয়ে গোলপোস্ট তৈরী করে ফুটবল খেলছে ছেলেরা। ছেলে-দের খেলা দেখতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মনে পড়লো তাঁর নিজের কৈশোর আর যৌবনের কথা। ভালো ফুটবল খেলতেন তিনি। সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলতেন। গোল করতে পারতেন খুব। কুশলী দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে নাম ছিল তাঁর। আসল খেলায় কিন্তু পারেন নি ফরওয়ার্ড হতে। পেছিয়ে এসেছিলেন। আর কিউব হেরে গিয়েছিল সি কিউবের কাছে। রাধারমণ রায়—তাই চারু ডাকতো আর কিউব বলে। রাধারমণবাবু চারুকে ডাকতেন সি কিউব বলে—চারুছন্দা চাটুজ্যে। খেলার মাঠেই পরিচয় হয় চারুর সঙ্গে।—এত ভাল খেলেন আপনি! জবাব না দিয়ে মুচকি হেসেছিলেন রাধারমণবাবু।

বেথুনে পড়তো চারু। ধনীর সন্তান, পরিতোষ চ্যাটার্জি, বার-য়্যাট-ল, তাঁর এক-মাত্র আদরের দুলালী। বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছিলো। মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল—"বাবা, স্কটিশে পড়ে। আমার বন্ধু,—আর কিউব।" মিঃ চ্যাটার্জির বিস্মিত কথাটা এখনো বাজে রাধারমণবাবুর কানে—

"আ-র কি-উ-ব!" "হ্যাঁ গো, রাধারমণ রায়," পিতার কোলের ওপর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল চারু। মিঃ চ্যাটার্জিও হেসে উঠেছিলেন জোরে। মিঃ চ্যাটার্জির উচ্চহাস্যটা মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়েছিল রাধারমণবাবুর কথা শুনে। "আমিও ওকে ডাকি সি কিউব বলে, চারুছন্দা চ্যাটার্জি।" মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধ হাসিটা আরো জোরে বেরিয়ে এসেছিল গলা দিয়ে।

হাসি থামার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি, কোন লাইনে যাবে ভেবেছো?

সলজ্জভাবে জবাব দিয়েছিলেন রাধা-রমণবাবু, "এখনো কিছু ঠিক করিনি। দেখি বাবা কি বলেন।"

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে একটা টান মারলেন মিঃ চ্যাটার্জি। পরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "না-না, কেরিয়ারের কথা আগে থাকতে ঠিক করে রাখতে হয়। যাও—যাও বিলেত যাও। আই-সি-এসটা শেষ করে এস।"

বিলেত যাওয়া বা আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠে নি রাধারমণবাবুর। আব-গারী ইন্সপেকটরের ছেলে—তাঁর পক্ষে বিলেত যাওয়া বা আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া একটা স্বপ্ন। পরীক্ষা দিয়ে পেয়ে-ছিলেন মুনসেফের পদ।

—আরে ফুঃ, মুনসেফী করে চারুর খরচ যোগাবে কেমন করে? ব্যারিস্টার-নন্দিনী কি কখনো মুনসেফ-ঘরণী হতে পারে!

চারু বোলেছিল, "চল, আমরা চলে যাই।"

রাধারমণবাবু বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে-ছিলেন, "কোথায়?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়," বলে চারু ধরেছিল রাধারমণবাবুর হাতটা।

বুকটা কেঁপে উঠেছিল রাধারমণবাবুর। উত্তরে শুধু বলেছিলেন, "তা কি কখনো হয়!"

হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল চারু। বেশ কিছুদিন বাদে সেই হাত ধরেছিল কমলা।

বলটা ছিটকে এসে পড়লো রাধারমণ-বাবুর পায়ের কাছে। পাটা উসখুস করে উঠলো অকারণেই। ছড়িটা মাটিতে রেখে বলটায় শট করলেন। অল্প দূরে গিয়ে পড়লো বলটা। পাটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো, মনে হল বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল হাঁটুর কাছ থেকে। কোমরটাও কন্‌কন্ করছে। পাটা ধরে মাটিতে বসে পড়লেন তিনি। হাত বুলোতে লাগলেন ধীরে ধীরে। নিজের পায়ের দিকে নিজেই দেখতে লাগলেন চেয়ে-চেয়ে। সরু হয়ে গ্যাছে এখন। আগে কত মোটা, কত পুরুষ্ট ছিল। ডিমের কাছটা মনে হত যেন একটা মাঝারি লোহার থাম। শটেরই কত তেজ ছিল তখন, অর্ধেক মাঠ পেরিয়ে যেত। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রাধারমণবাবুর বুক থেকে। উঠে পড়ে আবার পা চালিয়ে দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলেন কেল্লার ধারে। জায়গাটা বেশ গড়ানে। একদমে উঠতে কষ্ট হয়, হাঁপ লাগে বুকে। নিচে দাঁড়িয়ে তাকালেন ওপরের দিকে। পশ্চিম-দিকটা বেশ লাল হয়ে উঠেছে। বিদায় নেবার আগে সূর্যদেব যেন আবিরে রাঙিয়ে দিয়েছে পশ্চিমাকাশ। বিরাট একটা তপ্ত লোহার থালা কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। খানিক পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে পরিপূর্ণভাবে, রেখে যাবে শুধু শেষ রশ্মির উষ্ণ নিশ্বাস পৃথিবীর বুকে। তেজ নেই অস্তাচলগামী সূর্যের। চশমাটা খুলে রাধারমণবাবু অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সূর্যের পানে।

চোখ রগড়ে নিয়ে চশমাটা লাগালেন চোখে। ঘাড়টা তুলে তাকালেন কেল্লার গড়ানে জমির একেবারে ওপরের দিকে। দূরত্ব অনেকটা তবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটি যুবক একটি যুবতীর হাত ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাতাসে যুবতীর আঁচলটা উড়ছে, মাঝে মাঝে খসে পড়ছে কাঁধ থেকে। যুবতীটি অবহেলাভরে খসেপড়া আঁচল তুলে দিচ্ছে কাঁধের ওপর। দোদুল্যমান

ঝিনুনিটাও বাতাসের দাপটে মাতামাতি করছে, যেন যৌবনোদ্দীপ্ত নাগরাজ আপন খেয়ালে খেলে বেড়াচ্ছে হিস্-হিস্ করে। যুবকটির রুক্ষ লম্বা চুল উড়ছে বাতাসে। মাঝে মাঝে আছড়ে এসে পড়ছে চোখে-মুখে। ডানহাতটা জোড়া, তাই বাঁহাত দিয়ে শাসন করছে অবাধ্য চুলগুলোকে।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন রাধারমণবাবু সন্তরমান যুবক-যুবতীর দিকে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে মুছে গেল যুবক-যুবতী। ভেসে উঠলো যুবক রাধারমণ আর যুবতী চারু। যহু বছর আগে এমনি করে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতো গঙ্গার ধারে। এক জায়গায় বসতে চাইত না চারু, চঞ্চলা হরিণীর মত ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতো। চিনে-বাদামের খোসা ছাড়িয়ে বলতো, হাঁ কর। হাঁ করলেই মুখের মধ্যে ফেলে দিত বাদামভাজা। চারুর চাঁপার কলির মত পুরুষ্ট আঙুলের স্পর্শ অনুভব করতেন ঠোঁটে, জিভে। সমস্ত দেহে শিহরণ লাগতো। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন চারুর মুখের দিকে। রকম দেখে হেসে ফেলতো চারু। বলতো, অত কি দেখছো চেয়ে চেয়ে? এর আগে কি আর দ্যাখোনি আমাকে? হাসলে চারুর মুক্তোর মত ছোট-ছোট দাঁতগুলো চক-চক করে উঠতো। মোহাবিষ্টের মত চেয়ে-চেয়ে দেখতেন রাধারমণবাবু।

ছাড়াছাড়ির দিনটা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। বড় বড় চোখদুটো আরো বড় করে বলেছিলো চারু, "তুমি কাপুরুষ।" স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন নি রাধারমণবাবু। আমতা আমতা করে শুধু বলেছিলেন... না...মানে তোমার বাবা...। ধমক দিয়ে উঠেছিল চারু, "থামো। আর মানে করতে হবে না। আমার বাবা তো কি হয়েছে? আমি কি এখনো ঝিনুকে করে দুধ খাই?" বলেই হন্-হন্ করে চলে গিয়েছিল চারু। একবার মনে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে ধরেন চারুর হাতটা। বলেন, ঠিক আছে, চল—চলেই যাই। পারেন নি বলতে। মুখটা যেন কে চেপে ধরেছিল। এগিয়ে যেতে পারেন নি, কে যেন জাপটে ধরেছিল পেছন থেকে। বোকার মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছিলেন চারুর চলে যাওয়া।

সে আজ কতকাল হয়ে গেল। ভাবতে কষ্ট হয় রাধারমণবাবুর, তবুও সেই কষ্টের মধ্যেও যেন একটা ভালো লাগা ভাব থাকে।

অনেককাল পরে একবার দেখা হয়েছিল চারুর সঙ্গে দমদম এয়ার পোর্টে। দিল্লী থেকে আসছিল চারু। চারুর স্বামী দিল্লীর মলনদে বড় চাকরে। মোটা মাইনে পান। দেহও হয়তো সেই অনুপাতে স্ফীত। অন্তত চারুকে দেখে তাই মনে হয়েছিল।

চোখে গগ্‌লস্, স্থূলাঙ্গী চারুকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেন নি রাধারমণবাবু। চারুই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আর কিউব না? কোন কিছু বলার আগেই চারু বলে উঠেছিল, চুলগুলো যে সব রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছো একেবারে!

চারুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই তন্বী দেহলতা এই হয়েছে! কটিদেশ যার আগে হাতের দু'মুঠোয় ধরা যেতো, এখন দু'বাহু এক করলেও তাকে ধরা যাবে না। বিস্মিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভালো আছ?

গগ্‌লস্‌টা চোখ থেকে খুলে জবাবে বলেছিল চারু, ভালো আর কোথায়? দিল্লী-কলকাতা করেই কাহিল হয়ে পড়ছি। ও'র এমন চাকরী যে দু'দিন আপিসে না গেলেই মসনদ উলটে যাবে। তাই লোক-লৌকিকতা-গুলো আমাকেই করতে হয়। এখন আসছি জাস্টিস সেনের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

—আচ্ছা চলি, বলে গগ্‌লস্‌টা চোখে লাগিয়ে হেলে-দুলে চলে গিয়েছিল চারু।

চারুর গমনপথের পানে চেয়েছিলেন রাধারমণবাবু। অজ্ঞাতেই বেরিয়ে এসেছিল একটা দীর্ঘশ্বাস।

স্বচ্ছ হয়ে এল দৃষ্টিটা। দেখতে পেলেন যুবক-যুবতীকে। হাত ধরাধরি করে ওপর থেকে নেমে আসছে নিচের দিকে। বাতাসে উড়ছে আঁচল, অবাধ্য দু-এক গুচ্ছ চুল খেলা করছে কপালে, মুখে সলজ্জ হাসি। রাধারমণবাবু আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন সামনের দিকে। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অভদ্রতা।—আরে, সেই ছেলে-মেয়েটি তো। এদের তো প্রায় রোজই দ্যাখেন ইডেন-গার্ডেনের ঝোপ-ঝাড়ের আশে-পাশে। গতকালই দেখেছিলেন মল্লিকা গাছটার পাশে। চিনেবাদাম ছাড়িয়ে খাচ্ছিলো, মত্ত ছিল রসালো আলাপে। ওদের মৃদু-কণ্ঠের আলাপ যেতে যেতে শুনতে পেয়েছিলেন।

রাধারমণবাবুকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল যুবক-যুবতী। মেয়েটির শুধু একটা কথা কানে গেল, চল না, কাল আপিস কামাই করে ডায়মণ্ড হারবার যাই।

যুবক-যুবতী এগিয়ে চললো, রাধারমণবাবু অনাবশ্যকভাবে চললেন তাদের পিছু পিছু নেশাখোরের মত। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়গুঞ্জন শুনে শিহরিত হয়ে ওঠবার বয়েস তিনি বহুকাল আগে পেছনে ফেলে এসেছেন। তবু যেন কেমন ভালো লাগে ওদের কথা শুনতে। ক্ষণিকের জন্যেও ফিরে পান নিজের উচ্ছল যৌবনকে।

ফটক পেরিয়ে ওরা ঢুকলো ইডেন গার্ডেনে। রাধারমণবাবুও ঢুকলেন পিছু পিছু। কথোপকথনে এতই বিভোর ওরা, একবারও ফিরে তাকায় নি পিছনে।

ফটক পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যুবক-যুবতী চলে যাচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট মল্লিকা গাছটার দিকে। রাধারমণবাবু পথ ধরলেন ডান দিকের নরু রাস্তাটা দিয়ে।

পথের দু ধারেই ঝোপ-ঝাড়ের আশে-পাশে অস্ফুট গুঞ্জন। বাতাসে ভেসে মৃদু মৃদু কানে আসছে। সোজা দৃষ্টি রেখে পথ চেয়ে চলেছেন রাধারমণবাবু। চোখের সামনে দেখছেন ঐ যুবক-যুবতীর হাত ধরাধরি করে হেঁটে বেড়ানো।

তখন এক অদ্ভুত রাজ্যে বিচরণ করছে ওরা। সে রাজ্যে অভাব-অনটন নেই, সেই রোগ-দুঃখ-শোক। এমারসনের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়ে গেল তাঁর - 'আ, ইয়ংম্যান এণ্ড উওম্যান, ইউ মেক মি ইয়ং এগেন।' এদের দেখলে নিজের যৌবনটা মনে পড়ে বেশী করে। মনে পড়ে ষোড়শী তন্বী চারুকে, মনে পড়ে পেছনে ফেলে-আসা স্মৃতির কাঁটায় ঘেরা সুন্দর দিনগুলোকে।

দুটো রাস্তার সংযোগস্থলে এসে ইচ্ছে করেই বাঁদিকের রাস্তাটা বেছে নিলেন রাধারমণবাবু। এগিয়ে চললেন। এই সেই মল্লিকার ঝোপ না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো। ঝোপের ওপাশে পরম নিশ্চিন্তে বসে বাদামভাজা খাচ্ছে যুবক-যুবতী। ঝোপের অল্প ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। তারপর খুব সন্তর্পণে বসে পড়লেন ঘাসের ওপর ঝোপের গা ঘেঁসে।

উৎকর্ণ হয়ে আছে রাধারমণবাবুর কান। খুব সচেতন, যাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও শব্দ না হয়।

কানে এল মোলায়েম কণ্ঠ, 'ভারী দুষ্টু তুমি।'

যুবকের আবেশমাখানো উত্তর, 'তোমার জন্যে আরও দুষ্টু হতে পারি আমি।'

—'কেন মিছিমিছি বড়বাবুকে টেলি-ফোন করে বললে আমার বাড়ীতে অসুখ। তাড়াতাড়ি বাড়ী আসতে হবে।'

'তা নইলে তোমার আসতে দেরী হবে যে। বেশীক্ষণ তোমাকে কাছে পাব না।'

'যাতে সর্বক্ষণ কাছে পাও সেই ব্যবস্থাই কর না।'

'এম-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে বলবো মাকে।'

'তোমার বাবা যদি আপত্তি করেন?'

'ইস, আপত্তি অমনি করলেই হল। মার কাছে বাবার কোন আপত্তিই টিঁকবে না।'

বাতাসটা যেন আগেকার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। কয়েক ফোঁটা জল পড়লো রাধারমণবাবুর মুখের ওপর। আকাশের দিকে চাইলেন তিনি। তাই তো, এ যে কালো অন্ধকার হয়ে এসেছে আকাশ। এতক্ষণ লক্ষ্যই করেন নি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পা চালিয়ে দিলেন। ইচ্ছে ছিল একেবারে গাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। তা আর হল না, মাঝপথেই বৃষ্টি নেমে এল। জোর কদমে পা চালিয়ে গুমটির মধ্যে উঠে পড়লেন। জোরে বৃষ্টি নামলো, সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। গুমটির মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির খেলা দেখতে লাগলেন রাধারমণবাবু।

সমুদ্রস্নান— ফটো : সত্যব্রত ঘোষ

কারা যেন বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে ছুটতে আসছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলো গুমটির মধ্যে। চেয়ে চেয়ে দেখলেন রাধারমণবাবু। সেই যুবক আর যুবতী।

যুবতীটির পাতলা কাপড় ভিজে সপ-সপ করছে। লেপটে গেছে দেহের সঙ্গে। মাথা ছাপিয়ে টপ-টপ করে জল ঝরছে বিনুনি দিয়ে। যুবকটিও ভিজে গেছে। রুক্ষ লম্বা চুল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখনো হাঁপাচ্ছে ওরা।

নিজের কোঁচার কাপড়টা ফস করে খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে যুবকটি, 'নাও, মাথাটা মুছে নাও। ভিজে একেবারে জব-জব করছে।'

মুখে একটা আবদারের ভঙ্গি করে বলে উঠলো যুবতী, 'তোমার জন্যেই তো। সেই থেকে বলছি, ওঠ, বৃষ্টি আসছে তেড়ে। তা না, ও কিছু না, এখুনি থেমে যাবে। হল তো।'

যুবকটির কোঁচার কাপড়ে নিজের মাথা মুছে কাপড়ের অংশটা যুবকের হাতে দিয়ে বললে যুবতী, 'তোমার মাথাটাও মুছে নাও। বড্ড ভিজে গেছে।'

যুবকটি নিজের রুমালে মাথা মুছছিলো। যুবতী ধমক দিয়ে বলে উঠলো, 'অত বাহারে কাজ নেই। এস দেখি মুছিয়ে দি মাথা।' তারপর সেই কোঁচার কাপড়ে সে নিজেই পারপাটি করে মুছিয়ে দিলে যুবকটির মাথা। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট চিরুনি বার করে বললে, 'মাথাটা আঁচড়ে নাও। যেন বকের বাসা হয়ে আছে।'

রাধারমণবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন নির্নিমেষ মনে। একটা অজানা পরিতৃপ্তিতে মনটা তাঁর তখন ভরপুর।

বৃষ্টির দাপটটা কমে এল খানিক পরে। সন্ধ্যে পেরিয়ে বেশ খানিকটা রাতও হয়েছে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। যুবক-যুবতীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

উত্তর দিল যুবকটি, 'ভবানীপুর যাবো আমরা।'

'আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। বালিগঞ্জ যাবো আমি। যদি আপত্তি না থাকে যাবার পথে আমি তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।'

যুবকটি চাইল যুবতীর মুখের দিকে। চোখের ইসারায় কি কথা হল তাদের বুঝলেন না রাধারমণবাবু। যুবকটি বললে, 'না না, আপত্তি কিসের। আমাদের তাতে বরং সুবিধেই হবে।'

পেছনের সীটে বসলো যুবক-যুবতী। ড্রাইভারের পাশে বসলেন রাধারমণবাবু। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে ছুটলো রেড রোড ধরে।

পিচের রাস্তার ওপর জল পড়ে চকচক করে উঠছে। যেন মরীচিকা। রাধারমণবাবু সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছেন টপ গ্লাসের দিকে। পেছনের সীটের ছবিটা ফুটে উঠছে আয়নার মধ্য দিয়ে। দুজনের পক্ষে সীটটা যদিও বেশ প্রশস্ত, ওরা দুজনে বসেছে ঘেঁসাঘেঁসি করে।

জগুবাবুর বাজারের কাছে গাড়ী আসতেই ছেলেটি বলে উঠলো, 'আমাদের এখানে নামিয়ে দিলেই হবে।'

ছেলেটি নামলো আগে। রাধারমণবাবুকে উদ্দেশ করে বললে, 'অনেক উপকার করলেন। মেয়েটি নামলো পরে। মৃদু হেসে বললে, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল ওরা। রাধারমণবাবু এক পলক চেয়ে দেখলেন। বড় ভাল লাগলো ওদের চলার গতিটা। কে বলবে একটু আগে ওদের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়-বৃষ্টি।

ড্রাইভারকে বললেন, 'চল।'

গাড়ী এসে থামলো বারান্দার নিচে। রাধারমণবাবু যুবকের বিক্রমে নেমে পড়লেন গাড়ীর দরজা খুলে। প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন বারান্দার ওপর। আট বছরের নাতনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'দাদু, আমার টফি?'

'এই নাও দিদি,' বলে পকেট থেকে টফির ঠোঙাটা বার করে দিলেন নাতনীর হাতে। তারপর এগিয়ে গিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। বেশ সহজভাবেই উঠতে লাগলেন একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে।

দোতলায় প্রথম ঘরটাই ও'র। ঘরে ঢুকেই দেখলেন গৃহিণী শুয়ে বিছানায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, এই অসময়ে শুয়ে কেন?'

মুখটা বিকৃত করে জবাব দিলে গৃহিনী, 'বাতের ব্যাথাটা আজ আবার বড্ড বেড়েছে।'

ছড়িটা রাখবার জন্যে পা চালাতেই মনে হল তাঁর নিজের হাঁটুর কাছটাও যেন ব্যথা ব্যথা করছে। বাতের ব্যথাই হবে বোধ হয়।

দুঃস্বপ্নমূলক বহুবাদ

পরিমল গোস্বামী

কোনো বিষয়ে মনস্থির করতে আমার দেরি হয়। এবং সেজন্য অতি তুচ্ছ কারণেও মনে সন্দেহ জেগে ওঠে।

এই তো বিবাহ নিয়ে সম্প্রতি দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। এই বস্তুটিতে কোনো বৈচিত্র্য নেই বলে ওর প্রতি ছিল আমার ঘোর বিতৃষ্ণা। বৈচিত্র্য না থাকলে কোনো কাজেই আমি হাত দিতে পারি না।

পরিচিত সবাইকেই দেখছি বিয়ের পরদিন থেকে পূর্বের যাবতীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়ে দিব্যি সংসারের ঘানি টেনে চলেছে, একই চক্রপথে, একই নিয়মে। ভাবতেও অসহ্য বোধ হয়েছে। তাই অভিভাবককে জানিয়েই দিয়েছিলাম আমি বিয়ে করব না। অথচ পরিহাস এই যে, এই কার্যটি সম্প্রতি আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এবং উৎসাহের সঙ্গে করতে যাচ্ছি।

'টু বী অর নট টু বী'—একটি অতি মারাত্মক সমস্যা, চারশ' বছরের পুরানো। ব্যাপক সমস্যা। বিয়ে করব কি করব না, সমস্যাটিও ঐ একই সুরে বাঁধা। ভাবতে ভাবতে দেহ ক্ষীণ হচ্ছিল।

সেদিন এই প্রশ্নটিই ছাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, এবং সমস্ত ভাবনা সেদিন রাত্রে আমার গলা পর্যন্ত ঠেলে ঠেলে উঠছিল। চোখ ছিল আকাশ ও মহাকাশের দিকে খোলা। ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়াও বহু জাগতিক প্রশ্ন সেই খোলা চোখের পথে একে একে মনের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। দূরে সূর্যদের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল এদের কোনো গ্রহে কোনো বুদ্ধিমান জীব আছে কি? কে যেন বলেছেন, বুদ্ধিমান জীব পৃথিবী নামক গ্রহেই আছে কি না আগে দেখ। দামী কথা। নিজের কথা ভেবে সেই সন্দেহই জাগছিল মনে।

এই সব মিলেমনের বিবাহসমস্যাচিন্তা-পীড়িত পটভূমিটি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। মন অতঃপর এক দুর্দান্ত লাফে চলে গেল 'মানুষ মরে গেলে কি হয়' এই প্রশ্নে। এই লাফটা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু মনকে ঠেকাবে কে? মন কি কোনো যুক্তি মানে?

[illegible] শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিল, তখন এক অতি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। দেখতে পেলাম আমারই পাশ দিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রা চলেছে। শোভাযাত্রা ছায়ামূর্তির। তারা চলেছে আনন্দে গান করতে করতে, শিস দিতে দিতে, কোলাহল করতে করতে। একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো বোধ হতে লাগল সব। মন আবিষ্ট হল, এতক্ষণ পরে একটা ছন্দ যেন প্রভাব বিস্তার করল মনের উপর—একটি ভৌতিক ছন্দ। ভয় আদৌ হল না।

এইভাবেই চলছিল, হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ঠিক আমার কানের পাশেই আমাকে সচকিত করে তুলল। দেখলাম একটি ছায়ামূর্তি এসে বসে পড়ল আমার পাশে। সমস্ত চলার ছন্দে সে বাধা সৃষ্টি করল, একটা অপ্রীতিকর ছন্দঃপতন ঘটল তার এই কাজে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? এবং আপনি বেসুরো কেন? এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যেন এটি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

ছায়ামূর্তি দীর্ঘতর নিশ্বাসের সঙ্গে বলল, যারা চলেছে তারা সবাই ভূত, আমিও ভূত। ওরা ওদের এই জীবনে বহুদিন অভ্যস্ত, ওরা চলার একটা ছন্দ আবিষ্কার করে নিয়েছে, কিন্তু আমি পারছি না। ওদের দলে চলতে তাই সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে সরে এসে বিশ্রাম নিই।

বললাম, আপনারা যে ভূত তা আপনি না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আপনি ওদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না কেন?

পারছি না বোধ হয় এই জন্য যে, ওরা সবাই বহুদিনের প্রাচীন ভূত, ভিক্টোরিয়ান যুগের, আর আমি ১৯৬৭ সনের পয়লা এপ্রিল ভূত হয়েছি। কিন্তু তবু যে ওদের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিয়েছে কেন, তা আমি জানি না। এতে আমার কোনো হাত নেই। খুব সম্ভব আমাকে বিশেষ শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যেই এই বিষম ব্যবস্থা। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের গরমিলটাই আমার পক্ষে শাস্তি। আগে জানলে এরকম করতাম না।

আমি সচকিতভাবে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতেন না?

নির্বুদ্ধিতার কাজ। যত ভূত শোভাযাত্রায় চলেছে, তারা জীবনে কি করেছে জানি না, কিন্তু আমি একটি গুরু অন্যায় করেছি।

শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধৈর্য থাকবে কি? এই অন্যায়ের মূলে আমার স্ত্রী।

সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু তার আগে ভূত বিষয়ে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। অন্যায় করলে ভূত হয়, যেমন আপনি নির্বুদ্ধিতা করে হয়েছেন। অন্যায় না করলে মানুষ মরে কি হয়?

অন্যায় না করলে মৃত্যুর পর আত্মার পরমাণুগুলো কেউ বা ইলেকট্রন কমিয়ে পজিটিভ বিদ্যুৎ আহিত হয়, কেউ বা ইলেকট্রন বাড়িয়ে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-আহিত হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ওদের নিরপেক্ষ ধর্ম আর তখন বজায় থাকে না।

আমারও তাই বিশ্বাস। এইবার বলুন আপনার ইতিহাস—মানে, আপনার স্ত্রীর। অথবা দুজনেরই।

স্ত্রী অত্যাচার করত।

সেটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু আপনার পৌরুষ ছিল না?

ছিল কিন্তু তার ধারের কাছে ঐ ভোঁতা অস্ত্রটি খাটত না।

অত্যাচারী হবার উৎসাহ তিনি পেলেন কি করে? কোনো একটা কারণ অবশ্যই ছিল? হয় তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন, না হয় খুব ধনী ছিলেন, না হয় আপনি অতি মাত্রায় স্ত্রৈণ ছিলেন। কিসের জোরে তিনি এমন হলেন?

ভালবাসার জোরে।

কার? আপনার না তার?

আমার।

তাই বলুন—স্ত্রৈণ ছিলেন। এবং তিনি আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু কি এইজন্যই অত্যাচারী হয়েছিলেন? আর কোনো কারণ ছিল না?

না। ওটা ধাপে ধাপে হয়েছিল। প্রথম

দিকে তাঁর সব অনুরোধ পালন করতাম। অনুরোধ ক্রমে আদেশে পরিণত হল।

আদেশ পালন করতেন?

করতাম।

আপনার উপার্জন খুব বেশি ছিল?

না। উপার্জন ছিল মাঝারি।

তাহলে আপনার স্ত্রী অত্যাচারের অতিরিক্ত জোরটা কোথায় পেলেন?

টাকার জোর।

কার টাকা?

তাঁর বাবার টাকা।

তাই বলুন। তাহলে সংসার চালাতেন তিনি, এবং ঐ সঙ্গে আপনাকেও?

মোটেই না। সংসার চালাতাম আমি, আর বিলাসিতা চালাতেন তিনি। আগেই বলেছি সেটি তাঁর বাবার টাকায়।

আপনার স্ত্রীর আর কি কি অভ্যাস ছিল?

জলের মতো টাকা খরচ, আমার কথা গ্রাহ্য না করা, এবং বেশি আপত্তি করলে কথা শোনানো। দু-একবার আমার মাথা লক্ষ্য করে চায়ের কাপ জলের গ্লাস ছুঁড়েও মেরেছেন, কিন্তু প্রতিবারেই আমি 'ডজ্' করে মাথা বাঁচিয়েছি। কিন্তু মান বাঁচাতে পারিনি।

তাঁর টাকা তিনি খরচ করতেন, তবে আপত্তি করতেন কেন?

স্বভাববশত। কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে যাওয়া, হোটেলে খানা খাওয়ানো, রাত বারোটা একটায় ফেরা, এমন স্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে কোন্ স্বামী না বিজয়গর্ব অনুভব করে? কিন্তু তাঁর এই বেপরোয়া বিলাস জীবনের আনন্দের মধ্যে হঠাৎ খবর এলো তাঁর মা মারা গেছেন।

তাতে চরিত্রের বদল ঘটল?

ঘটল। এবং আসল ইতিহাস সেইখান থেকেই আরম্ভ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্বশুর-মশাই কিছুদিন বাদে আবার এক স্ত্রী ঘরে আনলেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। শ্বশুর-মশাই শোক ভুললেন। এবং সেই সঙ্গে মেয়েকেও।

বিবাহ করলেন ধনীর মেয়েকে?

না, গরিবের সুন্দরী মেয়েকে। তিনি এসে কিছুদিনের মধ্যেই সতীনের মেয়েকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন।

বন্ধ করালেন, না করলেন?

করলেন। টাকা পয়সার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর হাতে এসে গেল কি না? তাই। কিন্তু এতে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

দ্বিতীয় পক্ষ অত্যাচারী ছিলেন?

মনে হয় ছিলেন। তাঁর জোর সৌন্দর্যের জন্য কিছু, কিন্তু বাকি সবটাই দ্বিতীয়-পক্ষের দরুন। অতি আদরের প্রতিক্রিয়া।

আপনার উপর কি প্রতিক্রিয়া হল?

আমার স্ত্রীর সমস্ত আক্রোশ এবারে গিয়ে পড়ল আমার উপর। বললেন টাকা চাই। এতদিন আমার বাবার টাকায় নবাবি করেছ, এবারে নিজের টাকা বার কর। না থাকে যথেষ্ট উপার্জন কর। কিন্তু তাঁর ওড়াবার উপযুক্ত টাকা উপার্জন আমার অসাধ্য ছিল। এবং তিনি তাঁর বাবার টাকা সম্পর্কে সত্য কথা বলেননি। সে টাকায় আমি নবাবি করিনি। আর আমার ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেখান থেকেও তিনি প্রায় সব তুলে নিয়েছেন। আমরা দুজনে একাত্মা প্রমাণের জন্য যুক্ত নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম।

তারপর?

তারপর তাঁর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচব ঠিক করলাম।

কোথায় পালাবেন ঠিক করলেন?

পালানোর তো একটিমাত্র জায়গাই আছে, দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই সেখানে যাওয়া যায়।

আপনার কি ধারণা, তেমন অবস্থায় সবাই এক জায়গায় যায়?

অবশ্যই না। কিন্তু এখানে—মানে এখন যেখানে এসেছি, সেখানে যত শ্রেণীভেদই থাকুক, জায়গাটা তো ইহলোকের বাইরে, হাত বাড়িয়ে সেটা ছোঁয়া যায় না।

তারপর কি হল বলুন।

তারপর সমস্যা হল সেখানে কিভাবে যাওয়া যায়। যতগুলো উপায় জানা আছে তা একে একে চিন্তা করলাম, কিন্তু কোনোটাই আমার দ্বারা সম্ভব মনে হল না। ফাঁসিতে ঝোলা, বিষ খাওয়া, গলায় পাথর বেঁধে জলে ডোবা, উঁচু বাড়ি থেকে নিচে লাফিয়ে পড়া, ব্লিজের উপর থেকে ঝাঁপ দেওয়া, এঞ্জিনের নিচে শুয়ে পড়া, বাসের চাকায় চূর্ণ হওয়া, সবই অত্যন্ত হীন বোধ হল। রুচিতে আটকাল। কারণ আমার পরিকল্পনা তো হঠাৎ-আবেগের নয়, সবই হিসাব করে স্থির করা। আবেগের জোর থাকলে আগুনে পুড়ে মরতেও আটকায় না।

সেকথা ঠিক, তারপর কি করলেন?

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটা পথ যেন দেখতে পেলাম। দেখলাম এই সময় কলকাতার কাছেই বিশেষ একটা জায়গায় যখন তখন মানুষ খুন হচ্ছে। যারা খুন করছে তারা ওখানে এক জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। কোনো বাধা নেই। তারপর বিষয়টা নিয়ে অনেক গবেষণা করে দেখলাম ওখানে অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী দল আছে, এক দলের লোককে অন্য দলের লোক ইচ্ছা হলেই খুন করে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। মনে হল, ঐখানে গেলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

গেলেন সেখানে?

আমাকে কি করতে হবে না জেনে তো অকারণ সেখানে গিয়ে লাভ নেই, তাই জানা লোকের পরামর্শ নিতে হল আগে। শুনলাম একটিমাত্র মন্ত্রোচ্চারণের ব্যাপার—একটিমাত্র ধ্বনি। যে কোনো দলের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিলে অন্য দলের লোক বেরিয়ে এসে খুন করে চলে যায়। কিন্তু তবু শুনতে যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে কাজটা তত সহজ নয়। কোন্ দলের বিরুদ্ধে কোন্ ধ্বনি দেব তা স্থির করতে এবং তা অভ্যাস করতে বেশ কয়েকদিন গেল।—এই তো ঘণ্টাখানেক হল ভূত হয়েছি, এখন আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ, এখন আমি অদৃশ্য থেকেও সব দেখতে পাই।

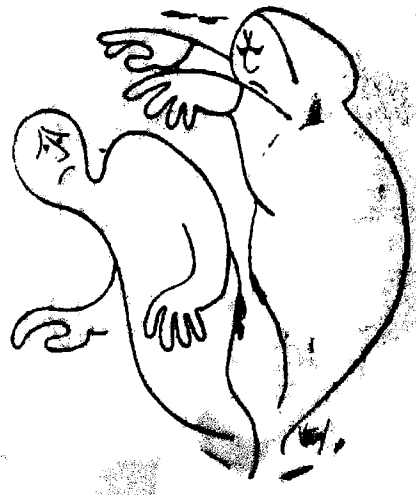

স্ত্রীর কি দুর্দশা হল, দেখতে পেলেন?

পেলাম বৈকি। সে কথাটা সংক্ষেপে বলি। আমার মৃত্যুতে তিনি প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। দুদিক থেকেই তিনি আশ্রয়হীন হওয়াতে নিজের অন্যায়টা এত-দিনে বুঝতে পারলেন, কিন্তু এখন আর সংশোধনের তাঁর কোনো পথ রইল না। তিনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন। অনুতাপ এসে তাঁকে পাগল করে তুলল। এতটা যে হতে পারে কল্পনা করতে পারেননি। বাপকে গিলেছে দ্বিতীয় পক্ষ, স্বামীকে গিলল সেই বিশেষ স্থানটি। পৃথিবীটা একেবারে শূন্য বোধ হল তাঁর কাছে। এতদিনে তিনি প্রাণ-খুলে কাঁদবার অবকাশ পেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে গায়ে পেট্রল ঢাললেন, দেশলাই ছিল হাতের মুঠোয়—কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকে জব্দ করবেন আশাতেই একাজ করেছেন। কারণ এখন আমি তাঁর ধরাছোঁয়ার মধ্যে—

কথা শেষ হল না। একটি স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্তি শোভাযাত্রার দল থেকে বেরিয়ে একলাফে তার ঘাড়ে এসে পড়ল, এবং বাঘিনী যেমন করে শিকার ধরে এক ঝাঁকুনিতে পিঠে তুলে পালায়, দৃশ্যটি দেখতে হল তেমনি। আমি শুনতে পেলাম স্বামীটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে, দেখলেন মশাই, স্বভাব যায় না মলে—এখন আমার কি দুর্দশা হবে—এখন—

কিন্তু কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আমি তড়াক করে উঠে ঘরে চলে গেলাম। সমস্ত রাত উত্তেজনায়, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল—ঘুম হল না। স্বপ্ন ঘুচে গেছে। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বস্তুর প্রতি বিষম এক ঝোঁক জেগে উঠেছে মনে।

পরদিন বাবাকে গিয়ে বললাম, বাবা, আমি বিয়ে করতে রাজি আছি।

পুষ্পো কীট সম

সুমথনাথ ঘোষ

অন্য কেউ হলে আনন্দে ডিগবাজী খেতো। কিন্তু ননীবাবুর মুখের রেখায় কোথাও এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না।

পাঁচ টাকা, দশ টাকা নয়, একেবারে দেড়শো টাকা বেতনবৃদ্ধি, তার চেয়েও বড় কথা প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ যেসব সহকর্মীর সঙ্গে এতকাল নীচের বড় হল ঘরটায় ফাইলের স্তূপ, মোটা মোটা খাতা, কাগজ-পত্রের পাহাড়ে লোকজনের আসা-যাওয়া, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কাটিয়েছেন, তাঁদের সকলের মাথা ডিঙিয়ে, চারতলার কাঁচ ও প্লাইউডের পার্টিশান করা, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, চকচকে টেবিল-চেয়ার ও গদ্-রেজের ফার্ণিচার সুশোভিত, কেরাণীর কল্পনার স্বর্গে কেবল সর্বেসর্বা হয়ে বড়-বাবুর চেয়ারে বসার সৌভাগ্য নয়, সেই সঙ্গে চিনির নিবেদোর মাথায় সন্দেশের চূড়ার মত আবার নিজস্ব পি-এ—আপিসের সবসেরা সুন্দরী, তরুণী মিস রোজী। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা প্রতিদিন সেই রোজীর দেহসৌরভ কেবল চোখে-মুখে এসে লাগা নয়, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং, তার চাঁপার কলির মত কোমল সুন্দর আঙুলের স্পর্শে টাইপ রাইটারের বক্ষনিঃসৃত ধ্বনি দু'কানে ভরে নিয়ে কাজ করার মধ্যে স্বপ্ন ও অচিন্তিতপূর্ব আনন্দ লুকনো থাকুক না কেন, ননীবাবুর মনকে তা নাড়া দেয় না। বরং আনন্দের বদলে কেমন যেন ম্রিয়মাণ করে তোলে!

মাসে সাড়ে চারশো টাকার ওপর আরো দেড়শো বেশী পকেটে আসবে ভাবতে যতখানি ভাল লাগে, ঠিক তেমনি খারাপ লাগে যখনই ননীবাবুর মনে পড়ে যায় রোজীর মুখখানা! সেই নির্জন সুসজ্জিত কক্ষে এক সুন্দরী তরুণী,

আর তার সামনে এক প্রৌঢ় যার সামনের পাটির দাঁত চার-পাঁচটা নেই, গাল ডুবড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে, মাথার চুল নীচের দিকটা অনেকখানি সাদা। দেওয়াল জোড়া আয়না দেওয়া ঘরে, কোন হাতেখড়ি মেয়ে ঢুকে পড়লে যেমন তার মনের অবস্থা হয়, তেমনি মনোভাব বুঝি ননীবাবুর। ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে ঠিক বলে তা বোঝানো যায় না।

হয়ত ননীবাবু 'বস' বলে রোজী মুখে কিছু প্রকাশ না করে মনের মধ্যে সব সময় একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা চেপে রাখবে। টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখটা একটু তুলে তার দেখতে ইচ্ছা করবে না, চেয়ারে বসে সামনের টেবিলের ওপর খাতা-পত্র খুলে যিনি কাজ করছেন তাঁর হাতের কলমটা থেমে গেছে কিনা, চুরি করে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন কিনা।

এ চিন্তা যখন মনে আসে, তখন ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠেন ননীবাবু। তাঁর পৌরুষ যেন তাঁকে ধিক্কার দিতে থাকে। তাঁর সেই পরম সৌভাগ্যের দিনটি যত এগিয়ে আসে ননীবাবুর আনন্দের উৎস যেন তত শুকিয়ে ওঠে! কেন তা ঈশ্বর জানেন!

সেদিন নিকলসন সাহেব লাঞ্চের পর ননীবাবুকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে তিনি বললেন, সিট্ ডাউন।

এর আগে আরও অনেকবার ননীবাবুকে আপিসের চিঠিপত্র সই করাতে তাঁর কাছে আসতে হয়েছিল, কিন্তু কখনই এভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করে চেয়ারে বসতে বলেন নি। তাই প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বড়সাহেবের ঠিক সামনের চেয়ারটায় বসলে তিনি বলে উঠলেন, 'আই কংগ্রেচুলেট্ ইউ, মিঃ ব্যানার্জী!' তোমাকে একটা সুখবর দেবার জন্যে ডেকেছি।

ননীবাবু তখনো অনুমান করতে পারেন নি, ব্যাপারটা কি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন আকাশ-পাতাল ভাবছেন, হঠাৎ সিগারেটটা দাঁতে চেপে তিনি বললেন, মিঃ মজুমদার সামনের মাস থেকে রিটায়ার করছেন। দুটো স্ট্রোক তাঁর হয়ে গেছে, ডাক্তার বাড়ী থেকে বেরুতে নিষেধ করেছেন তাই আমি তোমার নামটা ডাইরেক্টরদের কাছে রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিলুম। এইমাত্র বোম্বে থেকে তাঁদের সম্মতিপত্র এলো। তোমাকেই তাঁরা ইনচার্জ করেছেন। অগাস্ট থেকে তুমি ঘড়বাবুর পোস্টে কাজ করবে।

ননীবাবু এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর চেয়ে সিনিয়র আরো কয়েকজন থাকতে, তাঁর ওপর সাহেবের এ অনুগ্রহ কেন বুঝতে পারেন না। তবু মুখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, 'ভেরী কাইণ্ড অফ ইউ স্যার।'

না না, এতে আমার কিছু হাত নেই! এ তোমার যোগ্যতার পুরস্কার! তোমার মত সব ডিপার্টমেণ্টের কাজ-জানা লোক আমার এ অফিসে আর কেউ নেই! তোমার মত 'সিনসিয়ার' ও 'অনেষ্ট ম্যান'ও কেউ নেই।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!' বলে বড়সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ 'ইন-চার্জে'র ঘরের কাছে আসতেই তাঁর বুকের মধ্যেটা ধক্ করে ওঠে। তিনি দেখলেন 'রোজী' একটা 'ফাইল' নিয়ে কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে বড়সাহেবের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। কি জানি কেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের রেখার সব দীপ্তি যেন এক সঙ্গে নিভে গেল!

এদিকে সহকর্মীদের কাছে ততক্ষণে সে সংবাদ পৌঁছে গেছে। বড়সাহেবের ঘর থেকে ফিরে নিজের ডিপার্টমেণ্টে আসতেই সবাই ঘিরে ধরে ননীবাবুকে। বলে, ওসব শুনবো না খাইয়ে দিন এখুনি।

আবার এত দল বলে, না ওভাবে খেতে চাই না। একটা গ্রাণ্ড ফিস্ট দিতে হবে আমাদের ননীদা! এক লাফে দেড়শো টাকা মাইনে বাড়া কি সোজা কথা! তাছাড়া সকলকে ভিঙিয়ে!

আর এক দল ফোড়ন কাটে, যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যে!

সবচেয়ে কম বয়েসী ছোকরারা বলে, ফিস্টের দিন কিন্তু 'রোজী'কেও নেমন্তন্ন করতে হবে ননীদা; আপনি বললে, না করতে পারবে না! আপনি তার 'বস'।

থাম্ থাম্, আর চ্যাংড়ামো করতে হবে না। আমি যখন এখানে কাজে ঢুকি, তোরা তখন দিগম্বর হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াস, ভুলে যাস নি!

প্রত্যেক আপিসে যেমন একজন করে সরকারী দাদু থাকে—ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আড্ডা, ইয়ারকি ও মুখ-খিস্তী করতে তাঁর বাধে না। রঙ্গরস করে মাতিয়ে রাখে সকলকে। ননীবাবুদেরও তেমনি এক দাদু ছিল। তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে এসে ভাঁড়ের মত সুর ধরলেন,—

"আজি হৃদয়ের সব আশা,
সব সুখ ভালবাসা
রোজীতেই হোক অবসান।
(ক্ষতি নেই) যায় যদি চলে যাক প্রাণ।"

আঃ কি হচ্ছে দাদু! এই সব ছেলে-ছোকরাদের সামনে—

আরে থামো তুমি! ওরা আজকালকার ছোকরা, ভুলে যেয়ো না। তোমার 'গাণ্ড ফাদারের' সমান! সকলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, ননীবাবু কিন্তু কেন জানি না গম্ভীর হয়ে যান।

বাড়ীতে গিয়ে সেই শুভ সংবাদটা দেওয়া মাত্র সকলের মুখে আর আনন্দ ধরে না। সেদিন রাত্রে বিছানায় শুতে না শুতে অন্য দিনের মত ননীবাবুর নাসিকা গর্জন শোনা যায় না। তার বদলে স্ত্রী-স্বামীর মৃদু গুঞ্জন চলে অনেক রাত পর্যন্ত। স্ত্রী সোহাগজড়ানো কণ্ঠে বলেন, এবার কিন্তু এক জোড়া 'বাউটি' আমায় গড়িয়ে দিতেই হবে। না বললে শুনবো না। এ পাড়ায় এমন গিন্নীবান্নী কেউ নেই, যে গড়ায় নি! এতদিন তোমার টাকার টানাটানি বলে চুপ করে ছিলুম, এবার থেকে ত মাসে মাসে দেড়শো টাকা করে বেশী পাবে!

স্বামীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একভাবে তিনি বলে চলেন, জানো সেদিন প্রতিমাদি এসেছিল বেড়াতে। ওদের বলি-গঞ্জের স্যাকরাকে দিয়ে কি সুন্দর বাউটি গড়িয়েছে। মোটে সাড়ে তিন ভরি সোনা লেগেছে কিন্তু দেখলে মন হয় যেন পাঁচ-ছ ভরিতে তৈরী। আর যা সুন্দর ডিজাইন তার তুলনায় মজুরী বেশী নয়। পাথর সমেত একশো টাকা চেয়েছিল, প্রতিমাদি আশি দিয়েছে। ওদের অনেক কালের পুরনো স্যাকরা, প্রতিমাদি বলেছে, যদি গড়াস আমায় বলিস, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। এক সঙ্গে টাকাও দিতে হবে না, মাসে মাসে একশো করে দিলেই হবে! ঠিক প্রতিমাদির মত গড়াতে, মোট সাতশো টাকা মজুরী নিয়ে পড়বে। তা তোমার যখন দেড়শো টাকা করে মাইনে বাড়লো, তখন একশো করে ওর থেকে দিতে পারবে না?

ননীবাবু বলেন, আচ্ছা তাই হবে। বলে পাশ ফিরে শোন। গলার স্বরে কোথাও এতটুকু আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় না।

ছোট ছেলে মায়ের কাছে আবদার ধরে, বাবার যখন মাইনে বাড়ছে, এবার কিন্তু আমায় টেরিলিনের স্যুট করিয়ে দিতে হবে! আবদুল দরজি একশো তিরিশ টাকা চেয়েছিল বলে গত বছর পুজোয় তুমি করতে দাও নি। এবার কিন্তু শুনবো না, মনে থাকে যেন। আমি তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে মাপ দেবো, বলে দিলুম।

আচ্ছা, এবারে আমি তোকে ঠিক-ই করে দেবো। বলে ছেলেকে সন্তুষ্ট করতে-না-করতেই মেজ মেয়ে এসে বলে, বাবুলির বুঝি সব হবে, আর আমি যে কতদিন থেকে একটা রিস্টওয়াচের কথা বলছি, তার বেলা বুঝি তুমি শুনতে পাও না?

ঠোঁট ফুলিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে অমিতা বলে, আমার এত লজ্জা করে কলেজে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে কটা বেজেছে! আমাদের ক্লাশের প্রত্যেকেরই ঘড়ি আছে, শুধু আমার নেই।

তা আমায় বলছিস কেন? যে টাকা দেবে, তার কাছে বলগে যা!

হ্যাঁ, যাবো ত? ভয় নাকি? সকলের সব হবে, আর আমার বুঝি কিছু হবে না? বলে মেজ মেয়ে অমিতা মায়ের সঙ্গে কৃত্রিম কলহ করতে করতে কলেজে চলে যায়।

ওদিকে আবার বড় মেয়ে চিঠি লেখে দিল্লী থেকে বাবাকে। তোমার পদোন্নতির কথা শুনে আমরা সকলে খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমার জামাই আজ আজ

মা ও ছেলে। ফটো : অনিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীতে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে। এবার পুজোর ছুটিতে কলকাতায় যাওয়া হবে না। অনেক দিন পরে তাই একটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি, যুদ্ধের সময় ঘড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তুমি বলেছিলে পরে তোমার জামাইকে দেবে। এতদিন তোমার টানাটানি যাচ্ছে বলে কিছু বলি নি, যদি এইবার একটা ঘড়ি ওকে দিতে পারো ত ভাল হয়। ও অবশ্য কোনদিনই ওকথা উত্থাপন করে নি। আমার শাশুড়ীও কিছু বলেন নি। যদি সম্ভব হয়, এখন ত তোমার এক সঙ্গে এত টাকা মাইনে বেড়ে গেলো, ভেবে দেখো!

এই বলে যথারীতি গুরুজনদের প্রণাম ও ছোটদের স্নেহাশীষ জানিয়ে চিঠি শেষ করেছে।

মোট কথা আনন্দে উৎফুল্ল সবাই। একমাত্র ননীবাবু ছাড়া! কেন, তা তিনি নিজেও হয়ত জানেন না। মনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেন! হোক রোজী সুন্দরী, যুবতী,—সে তাঁর সামনে বসে কাজ করে চলে যাবে, তাতে কি এসে-যায় ননীবাবুর! ট্রামে-বাসে, পেশাপেশি হয়ে কত তরুণী সুন্দরীর সঙ্গে ত রোজই অপিসে যান, ট্রেনে আপিসের কাজে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় চেপে যখন সে বছর বোম্বে যান, একা এক অপূর্ব সুন্দরী মারাঠি মেয়ে ত তাঁর সঙ্গে এক কামরায় হাওড়া থেকে বোম্বে পর্যন্ত গেল! তবে কেন, রোজীর কথা মনে হলে এত নার্ভাস হয়ে পড়েন! মনকে এইভাবে সবল করার চেষ্টা করেন। তিনি তার 'বস', রোজী তাঁর অধীনা, এক কর্মচারী মাত্র। কেবল তার কাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তবে কেন মিছিমিছি ভাবছেন! মনে প্রফুল্লতা আনার চেষ্টা করেন। বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, প্রৌঢ় হলেও অগাস্ট মাসের পয়লা তারিখটা যত কাছে এগিয়ে আসে, তত যেন ননীবাবু ভেতরে ভেতরে কোথায় কিসের একটা অভাব, শূন্যতা বোধ করেন। দাড়ি কামাতে আগে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী ব্যয় হত না ননীবাবুর, কিন্তু ইদানীং বিশ-পঁচিশ মিনিট কেটে যায়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মুখটার ভেতর যেন কি খুঁজতে চেষ্টা করেন? হাঁ, বার্ধক্যের রেখা পড়েছে! একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চেপে নেন মনের মধ্যে। উপায় কি, দিন যত যাবে, বয়েসও তত বাড়বে—তাকে ঠেকাবে কি করে মানুষ! মানুষের কি সাধ্য আছে!

খবরটা পেয়েই ননীবাবুর স্ত্রী কালীঘাটে গিয়ে মা কালীর পুজো দিয়ে এসেছিলেন। আবার ভাল একটা দিনে সত্যনারায়ণের সিন্নী দেবেন বলে, পুরোহিত-মশাইয়ের বাড়ী ছেলেকে পাঠালে তিনি একতিরিশে জুলাই, যেদিন পূর্ণিমা, সেদিনেই পুজোর আয়োজন করতে বলে-দিয়েছিলেন।

ননীবাবুর স্ত্রী মনে মনে আরো খুশি হয়ে ওঠেন, ভালই হলো, নতুন কাজে লাগার ঠিক আগের দিন পুজো! পরের দিন সকালে ঠাকুরের নির্মাল্য সঙ্গে নিয়ে আপিসে যাবেন এবং যাতে স্বামীর চাকরীতে আরো উন্নতি হয়, তার জন্যে দু'হাত কপালে জুড়ে মনে মনে বাবা সত্যনারায়ণের কাছে আরো পুজো মানত অগ্রিম করে রাখলেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীতে ভীড় লেগেছে। ঘটার সিন্নী! ননীবাবুর স্ত্রী পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সবাইকে প্রসাদ খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। কাউকে বাদ রাখেন নি। হঠাৎ মস মস জুতোর শব্দ করে বাড়ীর ভেতরে সুট পরিহিত এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালে, কে, কাকে চান? বলে ওঠে ননীবাবুর ছেলে।

কোন জবাব না দিয়ে সেই ভদ্রলোক হন হন করে এগিয়ে ঘরের দিকে গেলে, ছুটে আসেন ননীবাবুর স্ত্রী আগে। তাঁর পিছনে পিছনে ছেলে-মেয়ে আরো কয়েক-জন।

কি বে-আক্কেলে মানুষ! আমার ঘরের ভেতরে সব খোলা ছড়ানো পড়ে রয়েছে এগিয়ে যা না খোকা, বলে নিজেই যখন চৌকাটটা আগলে দাঁড়ালেন, তখন ননীবাবু ঈষৎ হেসে বলে উঠলেন, ভয় নেই, আমি চোর নই।

ওমা তুমি! তা একি তোমার বেশ-ভূষা। একেবারে সাহেব বনে গেছো যে! চিনবো কি করে।

ছেলেমেয়েরা লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে যায়। কেবল স্বামীর পিছনে পিছনে তিনি নিজে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন। কি ব্যাপার! চুলগুলো, কুচকুচ করছে কালো। সামনের ফোকলা দাঁতগুলোর জায়গায় নতুন দাঁত চকচক করছে। পায়ে ঝকঝকে ছুঁচলো মুখ জুতো, নতুন প্যান্ট-কোট!

কোটটা গা থেকে খুলতে খুলতে জবাব দেন, যে পুজোর যে মন্ত্র! যেমন বড় পোষ্ট দিয়েছে সাহেব, তেমনি তার উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করতে হবে ত? নইলে মানবে কেন সকলে! আজকাল এক-একটা ছোকরা কর্মচারী দেড়শো, পৌনে দুশো টাকা যারা মাইনে পায়, তারা যেসব দামী টেরিলিনের সুট, জুতো পায়ে দিয়ে অপিসে আসে, দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে—তার দাম কম করে দেড়শো দুশো টাকার নীচে নয়। কাজেই পোষাক-পরিচ্ছদে

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সন্নিবিষ্ট)

হংকং ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর একটি সদস্য • ১০০ বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

কলিকাতার প্রধান কার্য্যালয়

গিলাণ্ডার হাউস, ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

স্থানীয় শাখা সমূহ

- ১৫, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
- পি৩৭৫, ব্লক 'জি' নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
- ২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
- ২১, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া
- ১৬৬/২, বেলিলিয়স রোড, কদমতলা, হাওড়া
- ৩-এ, নেতাজীর সরণী, কলিকাতা-১৬

IPB|MB|12|68 b

অবলক খরচ হয়ে গেল। সেই সংগে দাঁত-গুলোও বাঁধিয়ে নিলুম!

ভালই করেছো, ফোকলা দাঁতের সংগে এই দামী স্যুট পরলে মোটেই মানাতো না। এই বলে মুচকি হেসে ননীবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-স্বরে তিনি বললেন, আরো ভালো দেখাচ্ছে চুলগুলো কুচকুচে কালো করেছো বলে। মনে হচ্ছে যেন পঁচিশ বছর তোমার বয়েস কমে গেছে!

কি বললে! যেন ঠিক এই কথাটাকেই তিনি শুনতে চাইছিলেন। তাই আরো একবার স্ত্রীর মুখে সেই কথাটা শোনার জন্যে বলে উঠলেন, কি বললে? যেন শুনতে পাননি আগে।

শিগগির, জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে চলে এসো। পুজো শেষ হয়ে এসেছে। এখনি 'সত্যনারায়ণের কথা' শুরু হবে! বলেই তিনি ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

তোমার পঁচিশ বছর বয়েস কমে গেছে। সেই কথাটা শুখনো কানের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেন মনের গভীর অতলে নেমে যায়। আর নিমেষে রোজীর মুখটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে!

বৃটিশ আমলে ননীবাবুর চেয়ে কম মাইনে পায় নিম্নস্তরের যেসব কেরাণী তারাও প্যান্ট-কোট পরে অপিসে আসতো। কিন্তু ননীবাবু কখনো সে চেষ্টা করেননি। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, বাঙ্গালীর বজায় রাখার মধ্যে যেমন গৌরব অনুভব করতেন তেমনি ইংরেজের চাকরী করেন বলে, দাসত্বের নামাবলী যারা সারাগায়ে জড়িয়ে থাকে, তাদের মনে মনে ঘৃণা করতেন।

মাচেন্ট অপিস হলেও সাহেব, বড়-বাবু প্রভৃতি অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে বাধ্য করাতে পারেনি। এমন কি ননীবাবুর স্ত্রীও হার মেনেছিলেন। বিয়ের পর থেকে কতবার তাঁকে বলেছেন, হ্যাগো তুমি প্যান্ট-কোট পরো না কেন? আমার ছোট জামাইবাবু তোমার চেয়ে কত কম মাইনে পায়। আমাদের পাড়ার পচাদা, ঘেঁটুদার কথা না বলাই ভালো, তবু তারা সব অপিসে সাহেব সেজে যায় বলে সকলের ধারণা তারা কত বড় চাকরী করে, তাই তোমার মাইনের কথা শুনলে, কেউ বিশ্বাস করে না। আমার আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শী সকলের ধারণা ধুতি পাঞ্জাবি পরে যারা অপিস যায়, তাদের চেয়ে প্যান্ট-কোট যারা পরে তারা অনেক ভাল চাকরী করে। হয়ত ননীবাবুকে এতকাল পরে প্যান্ট-কোট পরতে দেখে তাঁর মনে বিশ্বাস হয়েছে সত্যিসত্যি উঁচু পদ পেয়েছেন তিনি। তাই অন্য কোন প্রশ্ন না করে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর স্ত্রীর চোখ দুটো।

কোট প্যান্ট খুলে আলনায় রাখতে রাখতে ননীবাবুর হঠাৎ মনে হয়, ভাগ্যিস তাঁর স্ত্রী জানেন না, অপিসে সেই ছোট্ট কাঁচের ঘরে রোজী আর তিনি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না!

তাহলে হয়ত এতকাল পরে এইভাবে সাহেবী পোষাক পরে দাঁত বাঁধিয়ে, চুলে কলপ দিতে দেখলে, তাঁর মনের অলিতে-গলিতে নানারকম সন্দেহ উঁকি মারতো। যাক বাঁচা গেল! মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন তিনি।

পরদিন অপিসে গেলে বড়সাহেব ননী-বাবুকে নিয়ে গিয়ে ইনচার্জের চেয়ারে বসিয়ে রোজীর সংগে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আজ থেকে মিঃ ব্যানার্জী হলেন তোমার 'বস'। যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি খাঁটি লোক। অপিসের কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করেন।

'গুড মর্নিং স্যার!' বলে ননীবাবুকে ঘাড় নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে রোজী তার আসনে গিয়ে বসলো। তারপর ননী-বাবুর কাছে উঠে গিয়ে তাঁর কাজ বুঝে নিয়ে টাইপ শুরু করে দিলে।

অর্ধচক্রাকৃত টেবিল সামনে রেখে ননী-বাবু মোটা ফাইলের পাতা ওলটাতে থাকেন। জরুরী চিঠিপত্রগুলোর জবাব দিতে যাতে বিলম্ব না হয়, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোজী যে পাউডার মেখে এসেছিল, তার সুগন্ধ নাকে এসে, বারে বারে তাঁকে অন্যমনস্ক করে দেয়। স্ত্রী ছাড়া, অন্য কোন মেয়ের, বিশেষতঃ রোজীর মত তরুণী, সুন্দরী স্বল্পবসনার এত কাছে এমনিভাবে বসার সৌভাগ্য তাঁর আর কখনো হয়নি!

আচ্ছা, রোজীর লজ্জা করে না, এই রকম কাটা পোষাক পরে অপিসে আসতে! বাহুমূল থেকে তার নিটোল হাত দুটি যেমন নিরাবরণ তেমনি হাঁটুর অনেকটা ওপর থেকে পা দুটিও নগ্ন। সংক্ষিপ্ত স্কার্টের ঠিক নীচের অংশটায় তার চোখ-দুটো গিয়ে যেন আটকে যায়। ননী দিয়ে যেন গড়েছে বিধাতা পা দুটো। কোমল, পেলব, পিচ্ছিল। যেমন চোখ, মুখ, তেমনি বাহু, তেমনি দুটো পা। কোনটা যে বেশী সুন্দর ঠিক করতে পারেন না ননীবাবু। কখনো চোখে ধাঁধা লাগে, মনে হয় কোমর থেকে ওপরের অংশটা বুঝি আরো ভাল। আবার নিজের মনেই সে ভুল সংশোধন করেন, না তার দেহের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর উরুৎ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যাকে বলে নিখুঁত।

ননীবাবুর বুকের মধ্যেটা ঢিপ-ঢিপ করে ওঠে! কেন কে জানে। ঘন্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে জল দিতে বলেন। বেয়ারা ফ্রিজিডেয়ারের ঠাণ্ডা জল সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাসে করে দিয়ে গেলে, একচুমুকে সবটা নিঃশেষ করে ফেলেন তবু যেন তেষ্টা মেটে না। রোজী কতকগুলো টাইপ করা কাগজ এনে ননীবাবুর হাতে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাঁচের টেবিলের একধারে তার বাঁ-হাতখানা ছুঁয়েছিল।

ননীবাবু কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে আড় চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন তার আঙ্গুলের নখগুলোর ওপর। যেমন সুন্দর সরু সরু চাঁপার কলির মত আঙ্গুল তেমনি মাথাগুলো, নেল-পালিশ করা; ঈষৎ রক্তাভ! রিস্টওয়াচটা যেখানে কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা, সবুজ রঙের কয়েকটা শিরা ধবধবে ফর্সা ত্বকের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সোনালী পাতলা রোমরাজি কনুইয়ের নীচে থেকে নেমে এসেছে।

হঠাৎ ননীবাবুর গায়ের মধ্যেটা শির-শির করে ওঠে। তিনি কাগজের ওপর থেকে মুখটা না তুলে বলেন, প্লিজ গো টু ইওর সিট!

রোজীর কানে ননীবাবুর কণ্ঠস্বর কেমন বেসুরো ঠেকলো। সে যেন কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে!

মুখটা ভার করে রোজী ফিরে আসে নিজের চেয়ারে। তারপর দুখানা সাদা কাগজ নিয়ে তার মধ্যে কার্বন পেপার ভরে, মেসিনে টাইপ শুরু করে দেয়। হাত দিয়ে মেসিনের চাবি টিপতে টিপতে, রোজী ভাবে, লোকটা সুবিধের নয়। তার সামনে থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে, তার আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগে।

আরো দুচারদিন যেতেই রোজীর মনোভাব ননীবাবুর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। দু' দশ মিনিট 'লেট' হলে তিনি প্রশ্ন করেন, হোয়াই সো লেট?

আজ পর্যন্ত অনেক অপিসে সে কাজ করেছে কিন্তু তাকে একথা ইতিপূর্বে কেউ কোনদিন বলেনি। সুন্দর মুখ দিয়ে সবাইকে জয় করেছে কিন্তু এরকম ব্যাদড়া পুরুষের পাল্লায় কখনো পড়েনি।

রাস্তা জ্যাম! ট্রামে ভীড়। কোন কৈফিয়ৎই ননীবাবু শোনেন না। বলেন, এর জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে কেন বাড়ী থেকে বেরোয় না? তুমি আমার পি-এ, আমার পরে অপিসে আসবে, এটা আমি পছন্দ করি না।

সেদিন শনিবার। ছুটির একটু আগে সে চলে যেতে চাইলে, ননীবাবু প্রশ্ন করেন, কেন?

একটু ইতস্তত করে রোজী উত্তর দেয়, এক বন্ধুর সংগে সিনেমা যাবার কথা আছে!

কঠিন হয়ে ওঠে ননীবাবুর মুখ, 'নো', সিনেমা দেখে স্ফূর্তি করার জন্যে অপিসের ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

একে ফাঁকি বলেন? রোজীর কণ্ঠ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ননীবাবু জবাব দেন, হাঁ, দুটোয় অপিস বন্ধ হবে। এখন একটা বেজেছে। এক ঘন্টার কাজ না করে চলে যাওয়াকে, এছাড়া আর কি বলে আমার জানা নেই! যদি বাড়ীতে কোন অসুখ-বিসুখ কিংবা অন্য কোন জরুরী কাজ থাকতো তাহলে অন্য কথা; কিন্তু স্রেফ স্ফূর্তি করাই যখন উদ্দেশ্য তখন ওই ফাঁকি কথাটাই একমাত্র প্রযোজ্য।

কিন্তু স্যার, আমি যদি মিথ্যে করে অন্য কিছু বলতুম আপনাকে, তাহলে ত ছুটি দিতেন!

হয়ত দিতুম। তবু সিনেমা দেখার কথা শুনে আমি যেতে দিতে পারি না। বিশেষ যখন 'ম্যাটিনী শো' ছাড়া দেখার সুযোগ রয়েছে তখন এটাকে আমি ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে করি।

সিনেমা দেখার জন্যে, এর আগে যখন যার কাছে ছুটি চেয়েছে কোন 'বস'ই এইভাবে রোজীকে বিমুখ করেনি। বরং কোন ছবি দেখতে যাচ্ছে, কার সঙ্গে ইত্যাদি জেনে তাদের কাছে উৎসাহ পেয়েছে! এরকম সত্যপীর অফিসারের পাল্লায় এর আগে কখনো পড়েনি রোজী।

সেদিন মাথায় একটা ফুল গুঁজে রোজী এসে ঢুকলো ঘরে। যথারীতি ননীবাবুকে গুড মরনিং স্যার বলে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে চট করে ছোট্ট আয়নাটার ভেতরে একবার মুখটা দেখে নিলে রোজী।

ননীবাবু যে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন তার দিকে জানতে পারেনি। ফুলটা বাঁদিকের চুলে গুঁজে মুখটাকে কতটা বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে, বোধহয় মুহূর্তের জন্যে তারি স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ননীবাবুর দিকে ঘাড়টা ফেরাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'দিস ইস নট ইওর ক্লাব রুম', এটা অপিস ভুলে যেয়ো না। ফুলটা ছুটির পর বাইরে গিয়ে মাথায় দিলে খুশি হবো।

এমন ঠাণ্ডা গম্ভীর সে কণ্ঠস্বর, যে ফুলটা তখনি মাথা থেকে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলে রোজী। কিন্তু এত বড় অপমান যেন হজম করতে পারছিল না। তাই ধীর ও মধুর কণ্ঠে শুধু বললে, স্যার, ওই ছোট্ট ফুলটা কি দোষ করলে, বুঝলুম না। ফুল মেয়েদের বেশভূষার একটা অঙ্গ!

ননীবাবুর ঠোঁটের ডগায় এর উত্তরটা এসেছিল, কিন্তু সামলে নিলেন। তিনি তার 'বস' সেকথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে, তিনিই ছোট হয়ে যাবেন তার কাছে। একে সে রূপসী, তায় আবার ফুল মাথায় দিয়ে এলে তাঁর যে বদনাম রটাবে লোকে, সেটা মুখে আনতে পারলেন না। তার বদলে, একটু থেমে তিনি বললেন, অপিসে চাকরী করতে গেলে, কতগুলো 'ডিসিপ্লিন' মেনে চলতে হয়। আমার মনে হয় এখানে খুব সাজসজ্জা করে আসা উচিত নয় মেয়েদের।

তার মানে রোজী যেভাবে সেজে অপিসে আসে, সেটাও ননীবাবুর পছন্দ নয়। রাগে 'রোজীর' ভেতরটা জ্বলতে থাকে! কোন পুরুষ যে এমন কথা বলতে পারে, এ তার কল্পনার বাইরে! প্রথমদিন থেকে যেন সে তাঁর বিষ নজরে পড়েছে! এই বয়সে সে কত অপিসে চাকরী করেছে, কোথাও এমনধারা পুরুষ দেখেনি। সবাই তার সঙ্গে হেসে গল্প করতে ভালবাসতো। গোপনে 'নাইট শো'তে সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ জানাতো। কতদিন গ্রেট ইষ্টার্ণ, গ্রাণ্ড হোটেলে শনিবারের সন্ধ্যা কাটিয়েছে তাঁদের সঙ্গে। এমন অদ্ভুত পুরুষহীন বাঙ্গালী 'বস' কখনো দেখেনি! কেবল 'ডিসিপ্লিন' আর 'ডিউটি' ছাড়া অন্য কথা মুখে নেই। চিঠিপত্র পড়ে কেবল বানান ভুল ধরে তাঁকে বকেন। অথচ নোট দেবার সময় যদি পেন্সিলটা থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, একস্‌কিউজ মি, এটার বানান কি? তাহলেও তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। একদিন একটা রিপোর্টে অনেকগুলো বানান ভুল দেখে তিনি তার মুখের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন, কি করে তুমি, তিন-চার বছর এ অপিসের কাজ করেছো আমি বুঝতে পারি না। বলে রিপোর্টটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে টাইপ করে দিতে বলেছিলেন।

অথচ অন্য সব 'বস'রা বানান জিজ্ঞেস করলে, হেসে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন! এ লোকটার মত এমন বদরাগী পুরুষ সে আর দেখেনি। কেমন একটা জাতক্রোধ যেন তার ওপর, সকল সময়ই যেন বিরক্ত হয়ে আছেন তার ওপর!

রোজী যতক্ষণ অপিসে থাকে, সব সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করে। অপিসে চাকরী করতে এসে যে আনন্দ এতদিন লাভ করেছে, প্রতিপদে যেন তাতে বাধা পায়।

সেবার পুজোর ছুটিতে গোপালপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ননীবাবু। অন্য কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে শেষে মিসেস্ মুরের হোটেলে অনেক বেশী চার্জ দিয়ে একটা ঘর পেয়েছিলেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও অবাঙ্গালীই সেখানে বেশী। বাঙ্গালী যা দু'চার জন সেখানে উঠেছিলেন সকলেই ইংরেজী ভাষাপন্ন। কেউ বা বড় চাকুরে, কেউবা ব্যবসায়ী। ননীবাবুর মত অবস্থার লোক সেখানে যায় না। অন্য কোথাও কোন স্থান জোগাড় করতে না পেরে, যখন ফিরে আসবেন কিনা ভাবছেন, তখন একটা সাইকেল রিক্‌সাওলা, তাঁকে ওই হোটেলের সন্ধান দিয়ে, সেখানে নিয়ে যায়। বলে, সাহেব আমায় কিন্তু একটা টাকা বকশিস দিতে হবে।

অগত্যা তাতেই রাজী হন ননীবাবু!

একেবারে সমুদ্রের গর্ভে যেন হোটেলের বাড়ীটা। মনে হয় পায়ের কাছে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আছড়ে এসে পড়ছে। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, এই জন্যেই এ হোটেলের চার্জ এত বেশী। সমুদ্র দেখতে যারা ভালোবাসে, তারাও তাই পছন্দ করে এখানে থাকতে। একেবারে সাহেবী ব্যাপার। ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার, বেড্ টি—সব কিছু একটার পর একটা হয়ে যায়। কেবল ঘণ্টা বাজে সময় হলে। আর সুড়সুড় করে টেবিলে লোক এসে খেতে বসে যায়।

সেদিন ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা পড়তে, খাবার টেবিলে বসেই চমকে ওঠেন ননীবাবু। ঠিক তাঁর সামনে বসে আছে রোজী। অদ্ভুত তার সাজসজ্জা, মাথার চুলে টাট্‌কা ফুলের গুচ্ছ। হ্যাল্লো! বলে সম্বোধন করেন ননীবাবু!.

গুড মরনিং স্যার। সো ইউ হ্যাভ কাম্ হিয়ার! বলেই তাড়াতাড়ি মাথা থেকে ফুলের গুচ্ছটা যেমন খুলতে যায় রোজী, অমনি হেসে ফেলেন ননীবাবু, ডোন্ট ডু ইট্! খুলো না, এটা ত অফিস নয়। এখানে ত আনন্দ করতে এসেছো!

ইয়েস, স্যার!

তবে কেন খুলে ফেলছো। বেশ ভাল মানিয়েছে তোমায়! লাভলি।

এই প্রথম ননীবাবুর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে, রোজীর গাল দুটো আরো বেশী লাল হয়ে উঠলো!

খেতে খেতে চলে খুচরো আলাপ। রোজী একলা এসেছে কেন, তার সংসারে কে কে আছে ইত্যাদি ঘরোয়া অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে করে বসেন ননীবাবু। খুব আন্তরিক ও সস্নেহভাব ফুটে ওঠে ননীবাবুর মুখে চোখে।

রোজী অবাক হয়ে ভাবে লোকটার অদ্ভুত চরিত্র ত! অপিসে যাকে কর্তব্যপরায়ণ, কঠিন, গম্ভীর, বলে মনে হয়েছিল, এখন ঠিক তার উল্টো বলে বোধ হচ্ছে। একই মানুষের ভেতর কি তাহলে দুটো লোক বাস করে!

রোজী জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন?

না, একলা! বলেই ননীবাবু প্রশ্ন করেন, তুমি কবে এসেছো? এখানের সন্ধান পেলে কোথায়?

রোজী বলে, এটা আমার আন্টির খুড়ু শাশুড়ীর হোটেল। আমি এখানে এর আগেও আরো দু'বার এসেছি! তারপর একটু থেমে বলে, আমি একাই এসেছি। সঙ্গে আসার মত আমার কোন দোসর নেই!

তাহলে ভালই হলো। এখানে দেখবার কি কি আছে, তোমার কাছ থেকে লিখে নেবো সব।

না-না স্যার, আমি সঙ্গে করে আপনাকে সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবো। কিছু ভাববেন না।

থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ্। বলে খাওয়া শেষ করে ঘরে উঠে গিয়ে প্রস্তুত হতে না হতেই, অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হয়ে রোজী এসে দাঁড়ালো ননীবাবুর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ননীবাবু বলে ওঠেন, ইয়েস্ আই য়্যাম রেডি! কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি এরকম অদ্ভুতভাবে সেজে এলে কি করে ভেবে পাচ্ছি না!

আজ সানডে! চার্চে যেতে হবে কিনা। তাই এত সেজেছি, অন্য কিছু মনে করবেন না যেন। বলে সঙ্কোচজড়িত দৃষ্টিতে বস্ এর মুখের দিকে তাকাল। ননীবাবু সস্নেহ কণ্ঠে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। সাজতে আমি তোমায় নিষেধ করিনি। এই ত তোমার সাজগোজ করার বয়েস! তবে কি জানো, বলে একটু থেমে, তারপর আবার বলেন, ওই রকম সেজে তুমি যদি অপিসে আসো, তাহলে আমার কাজে যে ভুল হয়ে যাবে বুঝতে পারো না? বলেই ননীবাবু যেমন হেসে উঠলেন, তাঁর সঙ্গে রোজীও একটা হাসির তরঙ্গ তুলে বললে, 'ইউ নটি বয়'! রোজীর বুকে এতদিন যে পাষাণভার চেপে ছিল তা যেন তৎক্ষণাৎ নেমে গেল, 'বস্'-এর মুখের ঐ কথায়।

নিমেষে যেন দু'জনের বয়সের পার্থক্য ঘুচে যায়। গল্প করতে করতে তারা হাঁটতে থাকে পথে। ননীবাবুর বাঁ-পাশে গা-ঘেঁষে ঘেঁষে চলে রোজী। গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি লাগে। রোজী বলে, আমি চট্ করে চার্চের সার্ভিসটা সেরে নিয়ে বেরিয়ে আসব, আপনি ততক্ষণ একটু বাইরে অপেক্ষা করবেন, কেমন?

তোমার যেমন ইচ্ছে। বলে একটু থেমে ননীবাবু বলেন, চার্চটা কত দূরে—আমি বুড়োমানুষ এতটা পথ হেঁটে যেতে পারবো ত?

বুড়ো? 'ডোন্ট্ সে দ্যাট এগেন। অনেক 'ইয়ং ম্যানের চেয়ে আপনি বেশী মজবুত ও কর্মঠ।

সত্যি বলছো? তুমি কিন্তু চার্চে যাচ্ছো মনে থাকে যেন, এখন মিথ্যে বলতে নেই!

ননীবাবুর বাঁ-হাতের ওপর মাথা দিয়ে একটা গোঁত্তা মেরে, রোজী বলে, বিশ্বাস করুন। আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলিনি।

সহসা গম্ভীর হয়ে যান ননীবাবু! রোজীর মত সুন্দরী তরুণী মেয়ে তাঁকে 'ইয়ং ম্যান'-এর সঙ্গে তুলনা করছে! না ওটা বৃথা তোষামোদ! তাঁর মনের মধ্যে সব যেন ওলট্-পালট্ করে দেয় রোজীর মুখের ওই একটা কথা!

ওখানে মেমসাহেবরা সমুদ্রে স্নান করতে নামে সাড়ে তিনটে চারটের সময়, তা তিনি জানতেন না। হঠাৎ রোজী স্নানের পোষাক পরে ননীবাবুর ঘরে এসে বলে, চলুন স্নান করতে যাবেন না?

স্নান! এই অসময়ে! তাছাড়া—বলে আসল কথাটা চেপে যান ননীবাবু। অর্থাৎ তাঁর মত প্রৌঢ় লোকের কি ওই উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আছে!

রোজী উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে, চলুন কিছু ভয় নেই। নুলিয়া আছে সঙ্গে। ভারী ভাল লাগবে, দেখবেন! এখানে ত এই সমুদ্র-স্নানের জন্যেই আসা! দেখবেন, স্নানের পর শরীরে কি রকম নতুন আনন্দ পাবেন!

তাই নাকি? আচ্ছা চলো। বলেই তৎক্ষণাৎ বাথরুমে ঢুকে খাঁকীরঙের একটা হাফপ্যান্ট পরে তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে আসেন ননীবাবু!

রোজীর সঙ্গে একত্র সমুদ্রে স্নান করতে নেমে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি। একই ঢেউ রোজীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার তাঁরই গায়ে এসে পড়ছে। কখনো বা ঢেউয়ের সঙ্গে লাফালাফি করতে করতে ছুটে এসে রোজী ননীবাবুকে জড়িয়ে ধরে। ননীবাবুও পা ঠিকমত সামলাতে না পেরে এক একবার রোজীর ওপর গিয়ে পড়েন। টানের মুখে ননীবাবুর দেহটা যখন সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে চায়, তাঁর একটা হাত নুলিয়া চেপে ধরে, আর একটা হাত রোজী নিজে। ননীবাবুর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে! স্নান করে ডাঙ্গায় উঠে, রোজী প্রশ্ন করে, 'হাউ ডু ইউ ফিল্'?

চার্মিং! হেভেন্‌লি!

দেখুন আপনাকে ত আগেই একথা বলেছিলুম। মিছিমিছি আপনি ভয় পাচ্ছিলেন! বলে ভিজে মুখে হেসে উঠলো। সে হাসিতে ননীবাবুও যোগ না দিয়ে পারলেন না। বললেন, আগে আমি কখনো সমুদ্রে স্নান করিনি, এই প্রথম। তাও তুমি না জোর করলে হয়ত ঘর থেকে কেবল সমুদ্রের রূপ দেখে ফিরে যেতুম বাড়িতে।

রোজী বললে, শুধু দূর থেকে দেখে কিছুই হয় না, সমুদ্রকে 'এনজয়' করতে হলে জলে নেমে ডুব দিতে হবে, ঢেউ খেতে হবে! ভয় করলে জীবনকে উপভোগ করা যায় না!

রাইট! ঠিক বলেছো!

সেদিন রাত্রে ডিনারের পর চেয়ারটা বারান্দায় টেনে নিয়ে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যখন বসে ছিলেন ননীবাবু, হঠাৎ ভেতরের হলঘরে অদ্ভুত বাজনা বেজে উঠলো। বসেছিলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, তারপর পর্দার ভেতর দিয়ে উঁকি মারতে, দেখেন নৃত্যের আসর জমে উঠেছে। বিলিতী বাজনার তালে তালে জোড়ায় জোড়ায় নাচছে। তা কে জানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর কে জানে তরুণ-তরুণী! রঙ বঙের নিওনের আলো যেন চাঁদের আলো বলে ভুল হয়। মাইকের ভেতর দিয়ে বিলিতী সঙ্গীতের সুর যেন সারা হল্ ঘরটাকে কৃত্রিম স্বর্গে পরিণত করেছে।

রোজী নাচছিল, একটি বৃদ্ধের কোমর জড়িয়ে। হঠাৎ ননীবাবুকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এলো। 'কাম্ অন্', 'লেট আস এনজয়' বলে ননীবাবুকে টানতে টানতে একেবারে হলের মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর কোনের একটা টেবিল থেকে এক পেগ সুরা হাতে নিয়ে ননীবাবুর মুখের কাছে তুলে ধরলে। রোজীর মুখ দিয়ে ভর ভর করে গন্ধ বেরুচ্ছিল। সারা হলটার মধ্যে গানের উন্মত্ত সুর, মদের গন্ধ ও নারী-দেহের সৌরভ মিলে যেন একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছিল।

না, বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও পারলেন না ননীবাবু। রোজী তার স্বপ্ন-বিহ্বল চোখ দুটো তার চোখের উপর রেখে বললে, 'লেট আস এনজয়', 'হোয়াই নট?'

ননীবাবুর একটা হাত তখন রোজীর কোমরে, না বলার সাধ্য নেই। এক চুমুকে গ্লাশটি খালি করে, সকলের সঙ্গে তিনি মিশে গেলেন। বাঁ-হাতে রোজীর কোমরটা জড়িয়ে, ডান হাতে তার একটা হাত উঁচু করে ধরে সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে নাচতে লাগলেন।

রোজীর উষ্ণ-নিঃশ্বাস যখন ঘন ঘন তাঁর মুখে-চোখে এসে পড়তে লাগল, তখন নাচতে নাচতে রোজীকে বক্ষে আকর্ষণ করে যেমন নিজের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন, অন্ধকারে পা হড়কে ধড়াস করে পড়ে গেলেন ননীবাবু। যেন স্বর্গ থেকে একেবারে নরকে কে ঠেলে ফেলে দিলে তাঁকে।

উঃ মরে গেলুম বলে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতেই রোজী খপ্ করে আলোটা জেলে দিলে; হোটেলের বেয়ারারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে, তাঁকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর বরফের চাঁই এনে হাঁটুর ওপর চেপে ধরলে।

যন্ত্রণা যখন তাতে বেড়েই চললো, তখন ডাক্তার ডেকে আনলে রোজী। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, হাড় ভেঙ্গে গেছে। এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

বারহামপুর হাসপাতালে প্লাস্টার জড়িয়ে পড়ে থাকেন ননীবাবু। একটা মাস ওখানে থাকতে হবে, তারপর কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে গিয়েও এইভাবে আরো ছ'মাস শুয়ে থাকতে হবে।

হাড়টা জুড়ে যাবে ত? রোজী সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

তা বলা যায় না কিছু। বুড়ো হাড় সহজে কি জোড়া লাগে!

রোজীর মুখ কালো হয়ে ওঠে। তারি জন্যে আজ তার 'বস'-এর এই অবস্থা। সে যদি না তাঁকে নাচের আসরে টেনে নিয়ে যেতো!

ছুটি ফুরিয়ে এলো। কলকাতায় ফিরে যাবে রোজী। অপিসে জয়েন করতে হবে। অপরাধিনীর মত ধীরে ধীরে ননীবাবুর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনার বাড়ীতে কি কিছু খবর দিতে হবে?

ননীবাবু রোজীর বাঁ হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিতে, রোজীর চোখের কোলে জল টলটল করে উঠলো। বললে, সব অপরাধ আমার। আমার জন্যে আজ আপনার এই দুর্দশা। আমায় ক্ষমা করুন।

ছিঃ ছিঃ ওকথা বলো না রোজী। এ একটা এক্‌সিডেন্ট। এখানে না হয়ে আমার বাড়ীতেও ত হতে পারতো। তোমার কোন দোষ নেই। আমারই অদৃষ্ট মন্দ।

হাঁ। তোমার বাড়ীতে কি কিছু খবর দিতে হবে?

না। তোমাকে কিছু খবর দিতে হবে না। সব আমি চিঠিতে লিখে দিয়েছি। এই বলে একটু থেমে তিনি বললেন, যদি বাড়ী থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে আসে, কি করে পড়ে পা ভাঙলো, তাহলে বলো, সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে। প্লিজ্ আমার জন্যে এই মিথ্যে কথাটুকু তোমায় বলতে হবে। বলো, কথা দাও!

আচ্ছা, তাই বলবো। তুমি আমার 'বস্', তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

যদি নিকলসন সাহেব জিজ্ঞেস করেন, তার কাছেও কিন্তু ওই কথা বলো। আমি চিঠি অপিসে ও বাড়ীতে লিখে দিয়েছি। আমার ছেলে ও স্ত্রী হয়ত আজকালের মধ্যেই এসে যাবেন। তুমি আজ চলে যাচ্ছো। ভালই হলো! বলে একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

রোজী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবে, কেন এইভাবে মিথ্যা কথা তাঁর 'বস' বড় সাহেবকে আর বাড়ীর লোককে বলতে বললেন। তিনি ত কোন অন্যায় করেননি!

মনোময়ন

মীহির আচার্য

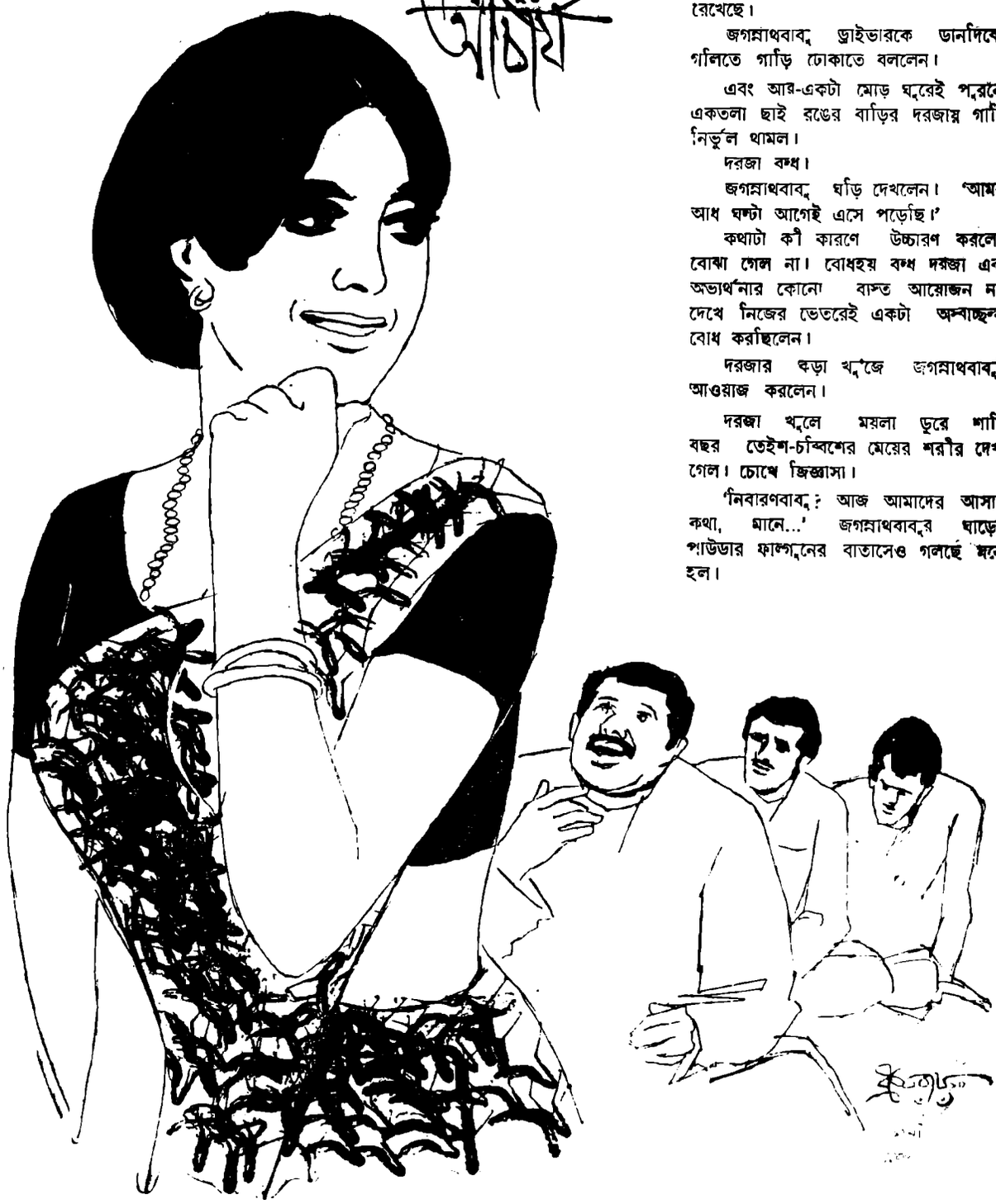

অগত্যা ফাল্গুনের এই শৈষ বিকেলে ওরা সওয়ার হল।

সুদর্শন, সুদর্শনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাপস, আর সুদর্শনের মামা জগন্নাথ মল্লিক।

সুদর্শন সারা দুপুর তাপসের সঙ্গে ছিল। এবং উত্তেজিত কণ্ঠে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেঃ 'এ একটা গভীর ষড়যন্ত্র। মা এবং মামার। আমি থিয়েটার করে বেড়াচ্ছি, মা মামার কানভারি করেছে। তাই আমাকে হাড়িকাঠে ফেলে বলিদানের ব্যবস্থা। চলো এখন মেয়ে দেখতে। উফ্, বড়লোক মামা পিতৃহীন ভাগনের পক্ষে একটা অনাবশ্যক অত্যাচার। এর চেয়ে সুইসাইড করা সোজা।'

তাপসের এই নাটকে কোনো উজ্জ্বল ভূমিকা নেই। অথচ সুদর্শন মামার ওই য়াশভারি গুমট অস্তিত্বের থেকে জানালা খুলে রাখবার গরজেই তাপসকে সঙ্গী করেছে।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

জগন্নাথবাবুর গিলে-করা পাঞ্জাবি, সোনার রিস্টওয়াচ, পুরু ঠোঁটে চুরুটের ভারি গন্ধ দুই বন্ধুকে কয়েদী করে রেখেছে।

জগন্নাথবাবু ড্রাইভারকে ডানদিকের গলিতে গাড়ি ঢোকাতে বললেন।

এবং আর-একটা মোড় ঘুরেই পুরনো একতলা ছাই রঙের বাড়ির দরজায় গাড়ি নির্ভুল থামল।

দরজা বন্ধ।

জগন্নাথবাবু ঘড়ি দেখলেন। 'আমরা আধ ঘন্টা আগেই এসে পড়েছি।'

কথাটা কী কারণে উচ্চারণ করলেন বোঝা গেল না। বোধহয় বন্ধ দরজা এবং অভ্যর্থনার কোনো বাস্ত আয়োজন না-দেখে নিজের ভেতরেই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন।

দরজার কড়া খুঁজে জগন্নাথবাবুই আওয়াজ করলেন।

দরজা খুলে ময়লা ডুরে শাড়ি বছর তেইশ-চব্বিশের মেয়ের শরীর দেখা গেল। চোখে জিজ্ঞাসা।

'নিবারণবাবু? আজ আমাদের আসার কথা, মানে...' জগন্নাথবাবুর ঘাড়ের পাউডার ফাল্গুনের বাতাসেও গলছে মনে হল।

মেয়েটি এবার মিষ্টি হাসল। 'ও বুঝেছি, আসুন ভেতরে আসুন।'

জগন্নাথবাবু দ্বিধাভরে ভেতরে পা দিলেন।

সুদর্শন তাপস পিছনে চোরের মতো।

বারান্দা পার হয়ে দক্ষিণের ঘর। ভেজানো দরজা শব্দ করে খুলে দিল মেয়েটি।

'বসুন।'

জগন্নাথবাবু চেয়ার খুঁজে বসে আবার জিগ্যেস করলেন, 'নিবারণবাবু? উনি কী আমাদের চিঠি পাননি!'

মেয়েটি হাসল অকারণ। 'বাবা এসে পড়বেন। হাতে সময় রয়েছে দেখে বাবা আজ আগেই পার্কে চলে গেছেন। বুড়ো-মানুষ বিকেলে একটু না বেড়ালে রাত্তিরে খিদে পায় না।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ও।'

'আপনারা একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসি।'

'সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। নিবারণবাবু আসুন।'

'আপনাদের একটু কষ্ট হবে। এঘরে পাখা নেই।'

'ঠিক আছে।'

মেয়েটি বারান্দা পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

জগন্নাথবাবুর চুরুটের আগুন অনেক-ক্ষণ নিবে গেছে। সুদর্শন এবং তার বন্ধু পিছনে তক্তপোশের ওপর স্থির হয়ে বসে। ঘাড় ফেরালে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগন্নাথবাবুর ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেছে। এই অনাড়ম্বর অভ্যর্থনার ভঙ্গিটুকু মনে মনে অপছন্দ করছিলেন তিনি। উপায় নেই কোনো। সম্বন্ধটা তার শ্যালক-বাবু ঠিক করেছেন। কন্ট্রাক্টার মানুষ ছঠাৎ কাজে আজ সকালেই ডিলাই চলে যেতে হয়েছে। জগন্নাথবাবু স্বগত উচ্চারণ করলেন 'শালা'।

বাইরে ফাল্গুনের বিকেল সরে যায়নি! এখনো আলো আছে। কনে-দেখা আলো। শেষ পর্যন্ত মেয়ে পছন্দ হলেও এখানে সম্বন্ধ পাকা-করার আগে তাঁকে দ্বিতীয়-বার ভাবতে হবে। ভদ্রতার খাতিরে মেয়ে দেখার পর্বটা সমাধা করে যেতে হবে।

হয়তো হতে পারে মানুষ হিসেবে এঁরা খারাপ নন। একেকধরনের মানুষের একেকজাতীয় নিরুত্তেজ স্বভাব থাকা বিচিত্র নয়। অতিরিক্ত সরলতাও কারণ হতে পারে।

কিন্তু তাঁর পিছনে-বসা ওই দুটি তরুণ সম্ভবত মানবচরিত্র সম্পর্কে এতদূর প্রজ্ঞা লাভ করেনি।

কে জানে, ওরাই এখন তাঁর সমা-লোচকের ভূমিকা নিয়েছে!

আজকের দিনের খাতিরও নিবারণ-বাবুর বৈকালিক ভ্রমণটুকু স্থগিত রাখলে কী খুব ক্ষতি হত!

জগন্নাথবাবু চুরুটে অগ্নিসংযোগ করবেন কিনা ভাবছিলেন, এই সময়ে একটা সুগন্ধি অস্তিত্ব ভারিপায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে হেঁটে এল।

আর, অবাক হয়ে তাকালেন জগন্নাথ-বাবু মেয়েটির দিকে। পরনে মুর্শিদাবাদী সিল্ক, পাউডার আর চোখের কাজলে, সজ্জিত বেশবাসে আর-এক নতুন অভিজ্ঞতা।

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করল।

'আমারি নাম নমিতা। বাবার দেরি দেখে মা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।'

জগন্নাথবাবু চোখ থেকে বিস্ময়কে মুছে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বোসো।'

নমিতা তক্তপোশের এক কোণে গুটিয়ে বসল।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল...' জগন্নাথবাবু কাশলেন: 'নিবারণবাবুর এক মেয়ে।'

নমিতা মৃদু হাসল।

'পাইকপাড়া থেকে আমার মাসিমার আসার কথা ছিল। মা তো বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। বাড়িতে বাচ্চা চাকরটা ছাড়া কেউ নেই। আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে...'

'ঠিক আছে।'

'আমাকে প্রশ্ন করবেন না?'

জগন্নাথবাবু কেমন বোকা হয়ে গেছেন। পিছনে-বসা তরুণ দুটি কী তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করছে!

'পড়াশোনা কদ্দুর করেছ?'

'বি-এ'

'পাশ?'

'না। পাশ করতে পারিনি।'

'রান্নাবান্না জানো?'

'আমাদের বাঙাল-রান্না।'

'গান-বাজনা?'

'না। মাসির বাড়িতে গেলে অবশ্যি গ্রামোফোন বাজাই—'

জগন্নাথবাবু উচ্চগ্রামে হেসে উঠলেন।

'কথা বলাটা তোমার বেশ অভ্যেস আছে।'

'হ্যাঁ। মণিকাও তাই বলছিল। আমার বন্ধু মণিকা। ওরও আসার কথা ছিল। আসেনি।' নমিতা বারান্দার দিকে চেয়ে এবার উঠে দাঁড়াল। 'এক মিনিট। আসছি।'

ট্রেতে মিষ্টি আর ধূমায়িত চা হাতে নমিতা ঘরে এল।

'বাবা এখনো এলেন না। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। এটুকু খেয়ে নিন।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।'

জগন্নাথবাবু চায়ে চুমুক দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভাবলেন।

নমিতা বলল, 'আপনিই জগন্নাথ-বাবু—'

জগন্নাথবাবু বিষম খেলেন। 'হ্যাঁ। ছেলের মামাবাবু!'

'আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

'ও।'

'বাবা এখনো এলেন না।' নমিতা একটু থেমে জিগ্যেস করল: 'ওঁদের পরিচয় তো হল না?'

'হ্যাঁ। এই যে। ও সুদর্শন, আমার ভাগ্নে, আর তাপস, ওর বন্ধু।'

'নমস্কার।'

সুদর্শনের নমস্কারটা কেঁপে উঠল।

'আপনার কী করা হয়?'

সুদর্শন চমকে উঠল। 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

সুদর্শন মামার দিকে কাতর দৃষ্টি রাখল।

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ও কিছু করে না।'

'তাহলে ওঁর চলে কী করে?'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'আমার ব্যবসায়—'

নমিতা এবার হাসল। 'আমি ওঁকেই জিগ্যেস করছি। বিয়ে তো উনি করবেন?'

জগন্নাথবাবু মূক হয়ে গেলেন।

নমিতা আবার বলল, 'সুদর্শনবাবু, আপনি জানেন কলকাতায় একটা ঘরের ভাড়া কত?'

জগন্নাথবাবুকে তর্জনী তুলে পুনরায় নিষেধ করল নমিতা।

'আচ্ছা সুদর্শনবাবু, রেশনে গমের দাম কত বেড়েছে খবর রাখেন? আপনি কোনোদিন নিজে বাজারে গেছেন?'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'দ্যাখো মা—'

'মামাবাবু, সংসার তো আমাকেই করতে হবে। আপনি বলছেন উনি রোজগার করেন না, অথচ বিয়ে করতে যাচ্ছেন। বিয়েটা তো...'

'আমার ব্যবসায়ে ওকে ঢুকিয়ে নেবো।'

'তার মানে ওঁর নিজের রোজগারের ক্ষমতার ওপর আপনার বিশ্বাস নেই। তার অর্থ ওঁর খাওয়াপরা থেকে বিয়ে করার সমস্যা পর্যন্ত আপনাকেই ঘাড়ে নিতে হবে। আপনি ভালো লোক, কিন্তু পৃথিবীতে তো ভালো লোক বেশি নেই!'

'দ্যাখো মা, এইসকল প্রশ্ন—'

'বলবেন ভালো দেখায় না। মেয়ে দেখতে এসে গান জানি কিনা রান্নাবান্না জানি কিনা এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে, অথচ ছেলে সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই আমরা করতে পারব না, মামাবাবু, সেটা বড় একচোখোমি হয়!'

'ছেলের দায়িত্ব আমাদের।'

'তাই বলে একটি ছেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, এইটেই কী সব জানা? আপনারা আমাকে হাজারটা প্রশ্ন করুন আপত্তি করব না, আমার তরফ থেকে জিজ্ঞাসাগুলোও আমাকে জানতে হবে। হবে না? সংসার তো আমাকেই করতে হবে।'

'তোমার বাবা খোঁজ-খবর নিয়েই...'

'বাবা এখনো এলেন না।' নমিতা হেসে বলল, 'বাবা আপনার খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

ছেলের নেননি। বোধহয় আপনার ব্যক্তিত্বই আর কিছু বাবাকে জানবার সুযোগ দেয়নি। সুদর্শনবাবু আপনার ভাগনে, এইটেই বাবার পক্ষে সমস্ত জানা। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা অন্যরকম।'

ঘরের ভেতরটা ঘষা কাচের মতো অন্ধকার হয়ে আসছে। নমিতার এই প্রগলভতা জগন্নাথবাবুর মতো রাশভারি মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তিনি দস্তুরমতো রাগছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তক্তপোশে স্থির ওই তরুণদুটি এখন তাঁর আচরণের কড়া বিচারক।

উশখুশ করে জগন্নাথবাবু কোনো রকমে বললেন, 'এসব কথা তোমার বাবার সঙ্গে হলেই—'

নমিতা হাসল। 'বেশ তো। বাবার সঙ্গেই হবে। অবশ্যি আমার বাবা যেমন নার্ভাস প্রকৃতির, সংকোচে আপনাদের সঙ্গে এ সকল আলোচনাই করতে পারবেন না। আপনার কিসের ব্যবসা?'

'হার্ডওআর।' জগন্নাথবাবু এবার হাসবার কারণ খুঁজে পেলেন: 'তোমার লজ্জাটা কম, তাই না?'

নমিতা অবাক চোখে বলল, 'লজ্জা। কার? আমার! কেন লজ্জা করতে যাব? আমার বয়েস চব্বিশ পেরিয়েছে।'

জগন্নাথবাবু হাসিটা নিবোতে চেষ্টা করলেন।

'আমাকে আপনারা দেখতে আসবেন। আমাকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে হবে। তারপর গান জানি কিনা রান্নাবান্না... সমস্ত পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে কোথাও লজ্জা আছে কী? বাবা হাজির থাকলে আপনাদের একতরফা প্রশ্ন করতে সুবিধে হত। আমাকে পুঁটলির মতো বসে থাকতে হত।'

'আমার এখন মনে হচ্ছে এইভাবে মেয়ে দেখার ব্যাপারটায় তোমার অসন্তোষ আছে। কিন্তু মেয়ে তো দেখেশুনে নিতে হবে, এছাড়া তো অন্য উপায় নেই মা। আমার বা নিবারণবাবুর এইভাবেই বিয়ে হয়েছে।'

'একদিনের দেখা-শোনাতেই সব জানা যায়? যেতে পারে? আমি সুন্দরী কিনা জানিনে তবে অনেকেই আমাকে সুশ্রী বলে। আমার গায়ের রঙ কালোই বলা যেতে পারে, চোখের তারাও ঈষৎ কটা, কাজল পরলে ধরা যায় না। হাতের আঙুলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন কড়ায়ের আংটা ধরে ধরে শক্ত হয়ে গেছে। হাতের তলা দেখছেন সাবান কেচে খশখশে হয়ে পড়েছে।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'আমরা এই ধরনের কর্মনিপুণ মেয়েই চাই।'

নমিতা হাসল। 'তাহলে আপনাদের আমাকে পছন্দ হবে।'

'এই রকম চালাক-চতুর শক্ত মেয়েই আমাদের দরকার। জানো তো আমাদের কোনো দাবিদাওয়া নেই।'

'জানি। আপনারা বড়লোক, আপনাদের মনও উদার। না হলে আমাদের মতো ঘরে সম্বন্ধ করতে আসবেন কেন? সেজন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'আমাদের বিষয়ে তোমার আপত্তি নেই তো? মনে হচ্ছে...'

'না, না। সেসব কিছু নয়।' নমিতা বলল, 'বিয়েটা তো আর কিছু নয়। ঘর-পাল্টানো। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি। এ একটা ব্রত বা সংকল্প নয় যে যার জন্যে জীবন উৎসর্গ করা যায়। বিয়ের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন মেয়ে না চায়।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'তোমার বয়েসের তুলনায় তুমি বড় বেশি ভাবো বলে মনে হচ্ছে।'

নমিতা বলল, 'কী করব বলুন, আমাদের ভাবনা ছাড়া আর কী কাজ আছে?'

'এই ভাবনাগুলো তোমাকে ছাড়তে হবে। ভাবতে হলে আমরা আছি। তোমার বাবা, আমি, আমরা—'

নমিতা অস্ফুটে বলল, 'বাবা এখনো এলেন না।'

'কোনো বিপদটিপদ হয়নি তো? পাকে আজকাল রাস্তার কুকুরগুলো শুয়ে থাকে।'

'না, কুকুর বাবাকে কামড়াবে না।'

'কিছু বলা যায় না। বিপদ কখন কোথা দিয়ে আসে—'

'আলোটা জ্বেলে দিই।' নমিতা আলো জ্বেলে দিল।

সুদর্শন তক্তপোশের ওপর ঘাড় গুঁজে বসেছিল।

নমিতা ওর দিকে তাকাল। 'আপনি তো গ্র্যাজুয়েট?'

সুদর্শন ধূসর চোখে নমিতার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ।'

'অনারস ছিল?'

'না।'

'আজকাল অনারস ছাড়া পড়ার কোনো মানেই হয় না।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ওর চাকরি করার দরকার হবে না।'

'আপনার মতো উদার অভিভাবক...'

'অবশ্য ও পড়তে চাইলে আমি বাধা দেবো না।'

নমিতা হাসল শুধু।

তাপস অনেকক্ষণ থেকে সুযোগ খুঁজছিল। এবার বন্ধুর পবিত্র সম্মান রক্ষার জন্যে সে সরব হল: 'দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমরাও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এ ধরনের অসভ্যতা কোনো মেয়ের কাছে আশাও করা যায় না।'

নমিতা বলল, 'আপনি রাগ করলে আমাকে চুপ করে যেতে হবে।'

তাপস বলল, 'রাগের ব্যাপার নয়। ন্যূনতম শিষ্টতা, বিশেষ করে নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি, আশা করাটা স্বাভাবিক।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'তাপস তুমি চুপ করো।'

'না মামাবাবু চুপ করে থাকা যায় না। এতক্ষণ আমরা যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়েছি। এই-ক্ষণ ইনি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন। দস্তুরমতো অপমান।'

'আঃ তাপস—'

নমিতার সারা অবয়বে একটা কঠিন ছায়া নেমে এল। সংযত অথচ ধীর গলায় বলল, 'না মামাবাবু, তাপসবাবু ঠিকই বলেছেন। এটা একটা রসিকতা, নির্মম রসিকতা। এবং এই রসিকতা পর্যায়ক্রমে চারবার আমাকে সয়ে যেতে হয়েছে। তাপসবাবু সে খবর জানেন না, জানার কথাও নয়। প্রথমবারের রসিকতা, আমার রঙ ভীষণ কালো। দ্বিতীয়বার এই তক্তপোশেই হেঁচকা টানে পরীক্ষা করে দেখা হল আমার চুল ফলস কিনা। তৃতীয়বার নগদ দু হাজার টাকা না-দিতে পারার অক্ষমতা। চতুর্থবার গ্রহনক্ষত্র বিরোধ ঘটালো। তাপসবাবু এ সকল রসিকতার কী উত্তর দেবেন? আমি একটি সাধারণ মেয়ে, অতি সাধারণ। কিন্তু আমারো একটা মন বলে জিনিস আছে।'

তাপস কিছু বলতে গিয়ে নমিতার স্ফিংসের মতো মূর্তি দেখে স্তব্ধবাক হয়ে গেল।

নমিতা অস্ফুটে বলল, 'শুনেছি সমাজের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এ নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ। আপনারাই করেছেন। কিন্তু আরো যে সকল ছোটো কাজ রয়েছে সেগুলোর কী হবে?'

তাপস কোনো রকমে বলল, 'আপনার এই জাতীয় অভিজ্ঞতার জন্যে নিশ্চয়ই আমাদের দায়ি করবেন না।'

নমিতা মলিন হাসল। না দায়ি করব কেন? সংসারে কোন কাজের জন্যে কাকে দায়ি করা যায়! দায়ি আমার ভাগ্য, এই নারীজন্ম। এইভাবেই আমরা মা-মাসির কাছে বড় হয়েছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা-গুলো খোঁটায় বাঁধা হয়ে আমাদের এক-দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

বাইরে পদশব্দ।

হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল নমিতা। তার চাঁপা রঙের শাড়িটা স্রোতের মতো চলকে উঠল, ওর গালের পাউডারের বার্নিশ গলে পড়ছে।

নমিতা বলল, 'অনেক অপরাধ করলাম। আমি ক্ষমা চাইছি।' হাত তুলে নমস্কার করল নমিতা: 'বাবা আসছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আশা করি আমার থাকার আর দরকার হবে না।'

একটা ভারি বুরুশ দিয়ে তার অস্তিত্বকে মুছে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল নমিতা।

ঘরে তিনটি মানুষ। নমিতার এই কঠিন বিদায় অথবা নিবারণবাবুর বিলম্বিত উপস্থিতির জন্যে তারা নিথর হয়ে রইল।

তুষের আগুন

এদীশ বর্ধন

আর্ত চীৎকারে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেছে মুন্নার। প্রতিবারেই ঠিক এই জায়গাতেই উধাও হয়েছে স্বপ্ন—শুরু হয়েছে স্মৃতির রোমন্থন।

সঞ্জয় নেই। এ দুনিয়ায় সঞ্জয় আর নেই। বাবাও নেই। বাবা-হীন সঞ্জয়-হীন এ সংসারে মুন্না একা। একেবারে একা।

মুন্না এখন বিধবা।

প্রতিরাতে এই একই স্বপ্ন ফিরে ফিরে এসেছে। একই চিন্তা কুরে কুরে খেয়েছে মগজটাকে।

প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘন্টায় এই চিন্তা। সরীসৃপের মত ক্লেদাক্ত কিলবিলে চিন্তা। বৃশ্চিক দংশনের মত আতীব্র বেদনাময় চিন্তা।

হাসপাতাল থেকে বেরোনোর আগেই জানলা দিয়ে সবুজ আকাশ দেখেছিল মুন্না। সবুজ আকাশ আর কাশফুলের মত হালকা মেঘ। ঝকঝকে রোদ্দুর আর দূরে কোথায় পাপিয়ার গান। বিধাতার সাজানো বাগানে সব আছে। নেই শুধু সঞ্জয়।

মোহনলাল এসেছিল ওকে নিয়ে যেতে।

নাতিদীর্ঘ পুরুষ মোহনলাল। বছর চল্লিশ বয়স। অত্যন্ত ধারালো নাক। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু লেগেই আছে।

অ্যাডভোকেট মোহনলাল সঞ্জয়ের শুধু প্রিয় বন্ধুই নয়, বিষয়সম্পত্তির রক্ষকও বটে। এই ঘোর দুর্দিনে এসেছে মুন্নাকে নিয়ে যেতে।

ওকে দেখে হাসল মোহনলাল। স্থির

চোখে তাকিয়ে রইল মুন্না। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখার অভ্যেস এসে গেছে ওর মধ্যে। মোহনলালের খড়্গনাসিকা, অধরকোণে গুপ্ত-হাসি আর শান্ত সুন্দর দুই চোখের গহনে তাই অনেকক্ষণ সঞ্চরণ করল ওর পলকহীন দৃষ্টি।

মোহনলাল কিন্তু অবিচল।

বলল—"পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে হবে আপনাকে। গাড়ী আছে।"

"কেন?" যন্ত্রবৎ প্রশ্ন করল মুন্না।

গালে টোল ফেলে আবার সেই হাসি হাসল মোহনলাল। বিষণ্ণ হাসি।

বলল—"যে কদিন হাসপাতালে ছিলেন, বাইরের কোনো খবর রাখেন নি তো। রাখলে জানতে পারতেন, সঞ্জয়কে নিয়ে দেশজুড়ে কি কান্ডটাই না চলছে। ওরা তাই এসেছে।'

"কারা?"

"রিপোর্টাররা।"

"না।" অকস্মাৎ যেন ককিয়ে উঠল মুন্না। নিজেই চমকে উঠল নিজের স্বর শুনে।

মোহনলাল চুপ করে চেয়ে রইল।

ঠোঁট কাঁপছিল মুন্নার। আস্তে সামলে নিল নিজেকে।

বলল—"না। এখন নয়। সামলে নিতে একটু সময় দিন।"

"জানি", সহানুভূতিকোমল কণ্ঠ মোহনলালের। "সেই জন্যেই তো পেছনের দরজায় গাড়ী রেখেছি। চলুন।"

"কোথায়?"

"বাড়ীতে।"

"না, বাড়ীতে নয়।"

"তবে কোথায়?"

"দীঘায়। সমুদ্রের তীরে। আমার ...মানে, আমাদের লুকিয়ে থাকবার জায়গায়। সঞ্জয় পালিয়ে যেতো সেখানে... কেউ জানতো না। চলুন মোহনলালবাবু। সেখানেই যাই।"

এবার স্থির চোখে তাকিয়ে থাকবার পালা মোহনলালের। মুন্নার কালোহরিণ চোখের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল ওর হিসেবী দৃষ্টি।

বলল ছোট্ট করে—"চলুন।"

করিডরেই দেখা হয়ে গেল ডাক্তারের সঙ্গে। প্রৌঢ়। শ্যামবর্ণ। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখ। চিকিৎসাজগতে ডক্টর চিন্তাহরণ ব্যানার্জী একজন খ্যাতনামা পুরুষ।

এ হেন যশস্বী মানুষটি নিজেই হন হন করে এগিয়ে এল মুন্নার দিকে। হাসল। নমস্কার করে বললে—"শরীরের দিক দিয়ে এখন আপনি সুস্থ। তবে ভবিষ্যতে যদি কোনদিন দরকার মনে করেন, তাহলে আমার এই বন্ধুটিকে কনসাল্ট করতে পারেন।"

বলে একটা খাম এগিয়ে দিল। খামের ওপর লেখা,

ডক্টর প্রেম দত্ত, সাইকিয়াট্রিক।

অর্থাৎ মনোব্যাধির চিকিৎসক!

নিজের অজান্তেই চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে উঠেছিল মুন্নার। মনটাও অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার বলছিল—"মনে রাখবেন, বিরাট একটা শক কাটিয়ে উঠেছেন। কাজেই মনের ওপর নতুন কোনো চাপ দেওয়া এখন সমীচীন হবে না। নার্ভ তো আর লোহা দিয়ে তৈরি হয় না। ধাক্কার জের সামলাতে মাস কয়েক যাবে।"

আর কোনো কথা হয়নি। মুন্না কাষ্ঠ-হেসে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছে।

পরক্ষণেই চিঠিটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়েছে মুন্না। হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ যেন ঐ খাম আর চিঠির মধ্যে দিয়েই গেছে। মোহনলাল এগিয়ে গিয়েছিল। তাই দেখতে পায়নি কাগজের দলাটা কখন ঠিকরে পড়ল করিডরের এককোণে।

মনের মধ্যে একটা হারিয়ে-যাওয়া কণ্ঠের অনুকরণ শুনতে পেয়েছে মুন্না। সঞ্জয়ের গলা। মিনতি করছে সঞ্জয়... বলছে...'সময় দাও...আরো কিছু সময় দাও।' কিসের সময়? ধৈর্য! সহিষ্ণুতা! তিতিক্ষা! সঞ্জয় সে পরিচয় দিয়েছিল কি? সঞ্জয়, তুমি তো বোঝোনি মুন্নারও অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু কোনোদিনই বলতে পারেনি। বলবে কি করে? মনের ছবি কি পুরোপুরি মুখের আয়নায় দেখা যায়? যায় না। গেলে, সঞ্জয়, তুমি শিউরে উঠতে? সঞ্জয়, তুমি কি জানো না, মুন্না প্রতিবারেই সংকুচিতা হয়েছে তোমার স্পর্শে? ঝাউ-বনের ফাঁকে ফাঁকে যখন রক্তচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে, কেয়াঝোপের নিচে দেখতে দেখতে কালিমা লেপে গেছে— তখনও, সেই নির্জন সৈকতেও, তুমি কোনোদিনই নিঃশেষে নিজস্ব করে নিতে পারোনি মুন্নাকে? তোমার আবেশমুগ্ধ চোখ যখন মুন্নার বিহ্বল নয়নে স্থির থেকেছে, যখন তোমার অধর মুন্নার অধরে মিশে গেছে— তখনও তুমি উপলব্ধি করোনি সেই মুহূর্তে তোমার মুন্না তোমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে? সঞ্জয়, সেই মুহূর্তে তুমি মুন্নার কাছে অচেনা আগন্তুক হয়ে গেছিলে। সমুদ্রের নিরন্তর গর্জনের মত মুন্নার অন্তরের অলিন্দে অলিন্দে খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মৃত মায়ের কণ্ঠ...আর্তকণ্ঠ পাশের ঘরে যেন ককিয়ে উঠেছে মা...গোঙাচ্ছে... "ছুঁয়ো না...ছুঁয়ো না আমায়!"

শৈশবের সেই বিবর্ণ স্মৃতি হাস-পাতালে থাকার সময়ে নিশার স্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছে। মুন্না দেখেছে বাবাকে... সদাহাস্যমুখ সবল পুরুষ। কিন্তু...কিন্তু গলায় ও কিসের ফাঁস?...দড়ির ফাঁস না?

হ্যাঁ..দড়িটা ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে!

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেছে মায়ের ফিস-ফিসানি— "মুন্না...মুন্না...চেয়ারটা এগিয়ে দে...দড়িটা কেটে ফেলি!"

দুঃস্বপ্নের সেই জগতে গিয়ে চেতনা বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মুন্নার। মায়ের ফিসফিসানি তাই দ্রিমি দ্রিমি ডম্বরু ধ্বনির মতই মগজের কন্দরে সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রতিরাতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসার পর।

পাশ থেকে কে যেন কি বলছে...কে? ...মোহনলালবাবু?...দরজা এই দিকে? থ্যাংকিউ...দরজা মানেই বাইরে যাওয়ার পথ ...বহির্জগত মানেই আলো হাসি গান (কিন্তু সে জগতে সঞ্জয় নেই)।

ঝমঝকে রোদ্দুরের মধ্যে এসে দাঁড়াল মুন্না।

দীঘা।

সৈকত বরাবর যে রাস্তাটা পশ্চিমদিকে চলে গেছে ঝাউবনের গা ঘেঁসে—সেই রাস্তায় বেশ খানিকটা গেলে লোকালয় থেকে অনেক দূরে সমুদ্রতীরে ওদের কটেজ প্যাটার্ণের ছোট্ট বাড়ীটা। ঝাউবনের আড়ালে প্রোথিত। ছায়াস্নিগ্ধ। নিরালা।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ীটা।

নিষ্পলকে পাথরের ফলকটার দিকে তাকিয়েছিল মুন্না। বড় বড় কালো হরফে লেখা :

"শুক্তি-গৃহ"

নামটা সঞ্জয়ের দেওয়া। ঠাট্টা করে বলত—'মুন্না, শুক্তির বুকে মুক্তাবিন্দুর মতই এ বাড়ীর প্রাণ তুমি।"

ভ্যানিটি ব্যাগে অভ্যেসমত হাত ঢুকিয়ে দিল মুন্না। আছে। চাবিটা আছে। মোহনলাল ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল মুন্না। দৌড়ে পৌঁছোলো ফটকের সামনে। বারান্দায় উড়ে আসা বালির স্তূপ জমে গেছে। ঘরের ভেতর ধুলোর স্তর। সাদামাকা আঁটা টেবিলগুলো নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে ধুলোর দৌরাত্ম্যে। পর্দা সরিয়ে দিল মুন্না কাঁচের সার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। ঢেউগুলো সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বালুকাবেলার ওপর। ঐখানে...ঐ সৈকতভূমিতে কেটেছে কত ঊষা...কত গোধূলি কত রাত্রি...!

মোহনলাল এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

বলছে—"চলুন, ঘরদোর নিজেরাই ঝেড়ে মুছে নিই।"

ফিরে তাকাল মুন্না। শান্ত দৃষ্টি মেলে বললে—"আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি একাই করে নিতে পারব।"

হকচকিয়ে গেল মোহনলাল। বলল—"একা পারবেন?"

"পারব।"

"জায়গাটা কিন্তু ভয়ানক নির্জন।"

"আমার অভ্যেস আছে।"

"খাবার-দাবারও তো আনতে হবে।"

"দরকার হবে না। গতবারেই ভাঁড়ার বোঝাই করে গেছে সঞ্জয়। টিনফুডও বিস্তর আছে।"

"হঠাৎ কাউকে দরকার পড়লে?"

"টেলিফোন আছে।"

"কিন্তু এ সময়ে আপনার একলা থাকাটা—"

"আমি তো এখন একাই থাকতে চাই মোহনলালবাবু।"

"কিন্তু—"

"কিন্তুর কিছু নেই। আপনি ফিরে যান কলকাতায়।" কথাটা একটু মৃদুই শোনালো বোধহয়। কেন না, গম্ভীর হয়ে গেল মোহনলাল।

হাতের সুটকেশটা সোফার ওপর রেখে ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াল দরজার দিকে। তারপরেই থমকে গেল।

ভুরু কুঁচকে ওঠে মুন্নার। মহানুভবতা তো! বিদেয় হয়েও হচ্ছে চায় না।

আমতা আমতা করে বলে মোহনলাল—"বলছিলাম কি...হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন তো...তাই—।"

মোহনলালের চোখে সেই দৃষ্টি। সেই ভাষা। বোবা ভালবাসা। মরেছে! মোহনলালও মজেছে। বহু পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে যে আবেদন দেখেছে মুন্না, মোহনলালের চোখেও সেই মিনতি দেখে সহসা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে মনটা।

"শুনুন," কঠিনস্বরে বলে মুন্না—"আমার মন মেজাজ এখন ভালো নেই। দিনকয়েক আমাকে একলা থাকতে দিন।"

কি বলতে গিয়েও বলতে পারল না মোহনলাল। আস্তে আস্তে পৌঁছোলো চৌকাঠের ওপর। হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে মুন্না।

কিন্তু না তো! আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মোহনলাল। —"না, না, এ অবস্থায় আপনাকে একা ফেলে যেতে পারব না।"

ঝনঝন শব্দে যেন ভেঙে গেল একটা কাঁচপাত্র। ফেটে পড়ল মুন্না—"না, না, না। আপনি যান। এখুনি যান। এখুনি।"

থতমত খেয়ে গেল মোহনলাল। পরক্ষণেই দরজার ফ্রেম থেকে উধাও হল তার মূর্তি।

পরম স্বস্তিতে দুই চোখ মুদল মুন্না। শান্তি, শান্তি, শান্তি। মনের সঙ্গে কথা বলার এবার অখণ্ড অবকাশ। হিসেব-নিকেশের নিশ্চিন্ত অবসর। চোখ মুদেই মুন্না শুনতে পেল মোহনলালের পদশব্দ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে ফটকের দিকে। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পরম অভিমানে ফুঁসে উঠে দূরে মিলিয়ে গেল সে শব্দ।

সব চুপ। না। এখনো নয়। সমুদ্র এখনো গর্জাচ্ছে।

গর্জাচ্ছে না শাসাচ্ছে?

দুই চোখ খুলল মুন্না। খুলেই চমকে উঠল।

দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হয়েছে আর একটা মূর্তি।

দু পাল্লার ওপর দু হাত রেখে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

চোখের ভ্রম নয় তো? অথবা মনের ভুল?

কিন্তু কই, না তো? নিশ্চল বটে, কিন্তু নিষ্প্রাণ নয় পাথরের মূর্তি। দুই চোখের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ মুন্নার ওপর।

কেঁচোর মত যেন গুটিয়ে গেল মুন্না।

"কে আপনি?"

শিলামূর্তিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটল। মৃদুস্বরে বলল আগন্তুক—"নাম জেনে লাভ নেই। আপনাকে ফলো করে পৌঁছেছি এখানে।"

ঢোক গিলল মুন্না। ভয় পেয়েছে ও। অথচ ভয় করার মত চেহারা নয় লোকটার। ডাকাবুকো গুণ্ডা বলে মনে হয় না। ছিপ-ছিপে লম্বা। গৌরবর্ণ তনু। টানাটানা স্বপ্নছাওয়া চোখ। শানিত নাকের নিচে সরু গোঁফ। পরনে মুগার পাঞ্জাবি আর ধুতি। সুপুরুষ সন্দেহ নেই। সঞ্জয়ও সুপুরুষ ছিল। সঞ্জয়!

কাষ্ঠহেসে বলল মুন্না—"মোহনলাল গাড়ী নিয়ে বাজারে গেল, এখুনি ফিরে আসবে।"

হাসল লোকটা। প্রচ্ছন্ন কৌতুক ঝলমল করে উঠল বুদ্ধিদীপ্ত মুখে।

দরজার গা থেকে হাত নামিয়ে বলল নরম গলায়—"শুনলাম ভাঁড়ার নাকি জিন-ফুডে বোঝাই। দেখে আসি অরেঞ্জ স্কোয়াশ জাতীয় কিছু আছে কিনা। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

চৌকাঠের বাইরে পা দিল লোকটা। বলল—"ভাল কথা। টেলিফোন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। লাইনটা আমি কেটে দিয়েছি।"

মুন্নার মাথার মধ্যে ছুঁচ ফোটার মত সেই যন্ত্রণাটা আবার দেখা দিয়েছে। লোকটা ভাঁড়ার ঘরে গেছে। ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল দুহাতে দুটো গেলাস নিয়ে। মুন্নার হাতে একটা তুলে দিয়ে বলল—"ফ্রিজে বরফ পেলাম না। তাহলেও গলাটা ভিজিয়ে নিন। তারপর সমুদ্রে স্নান করা যাবে এক সাথে।

অবাধ্য স্নায়ুগুলোকে বাগে আনতে পারল না মুন্না। কাঁপাগলায় বলল — "আপনাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

(সঞ্জয়ের সঙ্গে চেহারার মিল আছে বলেই কী?)

ঠোঁটের ওপর কমলা-সরবতের প্রলেপ দিল লোকটা।

ধীরেসুস্থে বলল — "দেখেও দেখেননি তখন, তাই চিনতে পারছেন না।"

"কোথায়?"

"প্লেনে। প্যান-আমেরিকান ৩০৭ বোইং জেটে।"

কাঁচ ভাঙার শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেল মুন্না। শিথিল মুষ্টি থেকে গেলাসটা কখন জানি খসে পড়েছে!

"আপনারা আসছিলেন ব্যাংকক থেকে। শুনলাম, সঞ্জয়বাবু ওখানে গেছিলেন ফিল্মের ব্যাপারে। আমি উঠেছিলাম হনুলুলু থেকে।" ভাঙা গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বলল আগন্তুক।

"এখানে কি চান?" ঠোঁট কাঁপছে মুন্নার।

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিল আগন্তুক। উত্তাল হয়ে উঠল মুন্নার বুক।

একগোছা কাগজ বার করে আনল লোকটা। খবরের কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে কাটা কাগজ। ক্লিপ দিয়ে আঁটা। কৌতুক-উজ্জ্বসিত চোখে অপাঙ্গে মুন্নাকে একবার দেখে নিয়ে পড়তে শুরু করল আগন্তুক।

"বৈরকমে ৫৬ জন যাত্রীর অব্যাহতি... দমদমে বিদেশী বিমান বিধ্বস্ত। সঞ্জয়কুমার সহ ৬ জন নিহত।" চোখ না তুলেই বলল লোকটা—"লোমহর্ষক শিরোনামা, তাই না?"

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল মুন্না। সার্সি দিয়ে রোদ্দুর আসছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। মুন্নার কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কনকনে বরফ স্রোত বইছে শিরদাঁড়া বেয়ে।

লোকটার বাচনভঙ্গী ভাল। আকাশ-বাণীর সংবাদদাতার মত পড়ে চলেছে—"বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জয়কুমার গত-কাল নিহত হয়েছেন। ঝড়-জলের মধ্যে বুধবার শেষরাত্রি একটা বাইশ মিনিটে দমদম বিমানবন্দরের দক্ষিণ প্রান্তে রাজারহাট থানার সলুয়া দশদ্রোণ গ্রামে একটি বিদেশী বিমান ভূপতিত হলে ছয়জন নিহত এবং অন্তত আটাশজন জোর আঘাত পান।

"প্যান-আমেরিকান এয়ার ওয়েজের বোয়িং ৭০৭ ক্লিপার ওয়ান বিমানটি সান-ফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল। দমদমে নামার ঠিক আগে দুটো নারকেল গাছের মাথা উড়িয়ে বাতাবি লেবু, আম, লিচু, পেয়ারা গাছ ভেঙে হাজার কলা-গাছের বাগান প্রায় সাফ করে এবং একতলা পাকা বাড়ির আলসেতে ঘা দিয়ে বিমানটি কর্দমাক্ত মাঠে হুড়মুড় করে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে। একজন এয়ার হোসটেস, একজন মহিলা, বছর তিনেকের একটি মেয়ে এবং একজন পুরুষ মিলে পাঁচজনের দেহ আগুনে পুড়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। বিমানবন্দরের দমকলকর্মীরা বিধ্বস্ত বিমানের জঠর থেকে পাঁচটি মৃতদেহ টেনে বার করেন। একটি মৃতদেহ পাওয়া যায় বিমানের বাইরে। দাউ দাউ আগুনে বিধ্বস্ত বিমানের চারদিকের মাটি জ্বলন্ত ফারনেসের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই উত্তপ্ত মাঠে কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে-ছিলেন বাংলার অশ্বিতীয় ফিল্মনায়ক সঞ্জয়কুমার। প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর খুলি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাশেই পাওয়া গেছে তাঁর স্ত্রী মুন্না দেবীকে জ্ঞানহীনা অবস্থায়। স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করতে গিয়েই মৃত্যুকে বরণ করেছিল সঞ্জয়কুমার। বিস্ফোরিত বিমানের টুকরো অংশ শূন্য-পথে ধেয়ে আসতে দেখে স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তাই করোটি চূর্ণ হয়ে গেছে। টুকরো অংশগুলি আশপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিমানের আর্টটি চাকার দুটি পড়েছিল সঞ্জয়কুমারের পাশেই।

"মধ্যরাত্রির ঘটনা। যাত্রীদের বেশির ভাগই তখন ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁরা প্রথমটা মুহ্যমান হয়ে পড়েন। যাঁরা জেগেছিলেন তাঁদের মনে তখন দমদমের মাটির আকর্ষণ।

"দুর্ঘটনার ঘোর কাটার আগেই—প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যাত্রীদের হুড়োহুড়ি শুরু

মাদ্রাজের সমুদ্রতটে। ফটো : রেখা সেন

হয়ে যায়। দুর্ঘটনায় বিমানের ভেঙে যাওয়া অংশ থেকে কয়েকজন লাফিয়ে পড়েন। বাকিরা তখন বন্দী। দুদিকের দরজাই বন্ধ ছিল। দশদ্রোণ থেকে ছুটে যাওয়া যুবকরা আমাদের জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁরা দউ-দাউ করে বিমানটিকে জ্বলতে দেখেন। সেই আগুনে চারদিক আলোয় আলো হয় ওঠে। একটা দরজা খোলা হয়েছিল—কিন্তু তখনও অধিকাংশ যাত্রী ভিতরে। কেউ কেউ মুহ্যমান, কেউ কেউ বা সাহায্যের আশায় চিৎকার করছেন—আর্তনাদ। অনেকে লাফিয়েও পড়ছেন। তাঁদের দেখে দুজন মহিলা দুটি শিশুকে এগিয়ে দিয়ে বলেন,—এদের বাঁচান, এদের বাঁচান।

"তুমুল বৃষ্টির মধ্যে এবং ঐ রকম দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু সঞ্জয়কুমার স্ত্রীর সঙ্গ ছাড়েননি এবং স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। গ্রামের যুবকরা দুজনকে পড়ে থাকতে দেখেন বিমানের অনতিদূরে একজোড়া ভাঙা চাকার পাশে।"

পড়া থামিয়ে চোখ তুলল আগন্তুক। বলল—"আর পড়ার দরকার আছে?"

মুন্না আর সইতে পারছিল না। মাথার মধ্যে ছুঁচ ফোটার মত সেই যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। স্ফীত হয়ে উঠেছিল নাসিকারন্ধ্র থর-থর করে কাঁপছিল পাতলা ঠোঁট।

তারই মধ্যে কোনমতে গুঙিয়ে উঠে বলল—"না, না, না, থামুন।"

ক্লিপলক্ষ কাগজের তাড়াটা পকেটের মধ্যে চালান করেছিল আগন্তুক। ধীরে-সুস্থে গেলাসটা তুলে নিয়ে আমেজী চুমুক দিল।

বলল — " সব কাগজই ফলাও করে ছেপেছে। সেই সঙ্গে আপনাদের পূর্ব-কাহিনী। এককালে যিনি বাংলার ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে একছত্র নায়িকা ছিলেন, সেই প্রশান্তি। কিভাবে ভালবেসে বিয়ে করলেন, সেই উপাখ্যান। বিয়ের পর শুধু সঞ্জয়-কুমারের কথায় ফিল্মলাইন ছেড়ে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর গল্প। শুধু একটা কথা কেউ লেখেনি", বলে আবার চুমুক দিল আগন্তুক। "আপনি যে এখনও পরমা-সুন্দরী, এ কথাটা কোনো সাংবাদিকের খেয়াল হয়নি। কিন্তু আমার হয়েছে। তাই তো ধাওয়া করে এলাম এদ্দুর।"

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল মুন্নার। পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল লোকটার পকেটের দিকে। দুরন্ত ইচ্ছে হচ্ছে...এই মুহূর্তে লাফিয়ে কাগজগুলো বার করে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে...

কিন্তু তা তো পারবে না মুন্না...আগুন জ্বালতে পারবে না...বিধ্বস্ত বিমানের দশদিক রাঙা করা সেই দাউ-দাউ অগ্নি-শিখা দেখার পর থেকে...!

লোকটা মুচকি মুচকি হাসছে। মুন্নার অসহায় অবস্থাটা উপভোগ করছে নিশ্চয়। চোখের কোণে হাসি নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বলছে — "অবশ্য মুন্নাদেবীর রূপের বর্ণনা না ছাপলেও ছবি ছাপা হয়েছে। রূপের বর্ণনা আমিই দিচ্ছি। মেঘবরণ চুল। তিলফুলজিনিনাসা। গ্রীক মুখ। অজন্তা বুক। তিলোত্তমা তনু। আরও কত কী।"

"কি চাই আপনার?"

লোকটা কালা নাকি? কথাটা কানে গেল না। হীরের মত ঝকঝকে একজোড়া চোখ দিয়ে মুন্নাকে অদ্ভুতভাবে দেখতে দেখতে বলে চলেছে "মুন্নাদেবীর বয়স? সঞ্জয়কুমারের অর্ধেক। দশ বছর বিবাহিত জীবনযাপন করার পরেও আজও মুন্নাদেবী অষ্টাদশীর মতই পূর্ণযৌবনা। ফিল্ম-নায়ক হয়েও তাই সঞ্জয়কুমারের জীবন থেকে রোমান্সের অন্তর্ধান ঘটেনি। ঘটে-ছিল কি?"

দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল মুন্না। আঙুল কাঁপছে। ভীষণ কাঁপছে। গলার স্বরও—"আমার স্বামীও এভারগ্রীন।"

"তাতো বটেই," হেসে বলল আগন্তুক। ব্যঙ্গের হাসি, "এভারগ্রীন তো বটেই। চুলে পাক ধরলেও তাই বয়স কিছুতেই বাড়তে চায়নি। মেয়েরা তাই পাগল হয়ে যায় পর্দায় তাকে একবারটি দেখার জন্যে। তাই সঞ্জয়কুমারের ছবি মানেই হিট ছবি।"

"কি চান বলুন তো?"

"তেমন কিছুই নয়। কাজেই গলার স্বরটা ওরকম না করলেও চলবে। এখনো ধাতস্থ হননি দেখছি।"

কান্না পাচ্ছে মুন্নার। কিন্তু এখন তো কাঁদলে চলবে না। এর সামনে তো নয়ই।

"খবরের কাগজগুলোর দৌলতে কিন্তু রাতারাতি মহাপুরুষ বনে গেলেন আপনার স্বামী। প্রিয়ার জন্যে প্রাণ বিসর্জন। কোথায় লাগে শাজাহানের অমর প্রেম। ডানপিটে, নির্ভীক, দুর্মদ। আর কি কি

বিশেষণ লাগিয়েছিল মনে নেই। মোট কথা, একটা মহাকাব্য রচনা করার মত রসদ জুগিয়ে গেলেন আপনার পতি পরম-দেবতাটি।"

মুন্না আর থাকতে পারল না। চোখের বাঁধ উপচে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুগাল বেয়ে। বাধা দিল না আগন্তুক। দুহাতে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল মুন্না।

ভাবলেশহীন মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আগন্তুক। তারপর ধীরপদে এসে দাঁড়াল পাশে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নীরবে গুজে দিল মুন্নার হাতে।

বলল, হিমানী স্নিগ্ধস্বরে—"কাদুন। যত পারেন কেঁদে নিন। এ কান্না আপনার প্রাপ্য।"

অশ্রুর কলংক মুছতে মুছতে পদ্ম-পলাশ আঁখি তুলল মুন্না। অস্ফুটকণ্ঠে বলল— "এক গেলাস জল এনে দেবেন?"

"অফ কোর্স।" ঘরের বাইরে গেল আগন্তুক। ফিরে এল মিনিট খানেকের মধ্যেই। এক চুমুকে গেলাস শেষ করে দিয়ে অনেকটা ধাতস্থ হল মুন্না।

বুকের ওপর দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে-ছিল লোকটা। আশ্চর্য শান্ত অথচ হীরের মত ঝকঝকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মুন্নার সদাধোয়া হরিণচোখের ওপর। অস্বস্তি হচ্ছিল মুন্নার। লোকটার চাউনি যেন কি রকম। চোখের পাতা পড়ে না। মণি দুটো যেন রক্ত-মাংসের নয়—গ্র্যানাইট পাথরের।

গ্রানাইট কাঠিনতা এবার বুঝি লোকটার স্বরেও শুনতে পেল মুন্না—"মহাকাব্য লেখা যায় সাংবাদিকদের এই উচ্ছ্বাস দিয়ে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব বলেছে। বলেনি শুধু একটা কথা। আসল কথাটা।" একটু থামল লোকটা। "ভুল, ভুল, সব ভুল। দশখানা কাগজে যা বেরিয়েছে, সব মিথ্যে। কাঁচা মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে। কিন্তু কেউ তা জানে না। শুধু দুজন বাদে। আপনি আর আমি।"

বোবার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মুন্না।

আগন্তুকের সুঠাম দেহ কিন্তু তখনও স্ট্যাচুর মত অনড়। দুই হাত ভাঁজ করা বুকের ওপর। দৃষ্টি অচঞ্চল, হীরক-উজ্জ্বল।

"আপনি জানেন, আমিও জানি, সঞ্জয়-কুমার বউকে মৃত্যুমুখ থেকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই করেনি। আপনি জানেন, আমিও জানি, যে মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে বোইং ৭০৭ দুলে উঠেছে, বিষম আতংকে দিশেহারা হয়ে সবাই ইমারজেনসি-দরজার দিকে দৌড়েছে, সেই মুহূর্তে মহাপুরুষ সঞ্জয়কুমার, বীর নায়ক সঞ্জয়কুমার সবেগে উঠে দাঁড়িয়েছে নিজের সিট ছেড়ে, স্ত্রীর দিকে দৃকপাত না করে তীরের মত ছুটে গেছে দরজার দিকে। আপনি জানেন, আমিও জানি, সেই মুহূর্তে বহু রমণীর হৃদয়-দেবতা সঞ্জয় কুমার অন্যের প্রাণ তো দূরের কথা, নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর কথাও তিলমাত্র না ভেবে নিদারুণ ভয়ে খরগোসের মত ধেয়ে গেছে শুধু একজনের প্রাণ বাঁচাতে—সে তার নিজের প্রাণ। মুন্নাদেবী, এই বিরাট প্রচণ্ড সত্যিটা শুধু আমরাই জানি তাই না?"

রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকল মুন্না। কান্না-জড়ানো অস্ফুট গলায় বললে—"ওর দোষ নেই। বাইরের কেউ জানে না, কিন্তু আমি জানি, অসম্ভব ভীতু, অবিশ্বাস্য রকমের স্বার্থপর ও। শুধু তাই নয়। পৌরুষ ওর বাইরেই। চেহারাই সার ভেতরে শিশুরও অধম। কাপুরুষ। তাই চারদিকের আগুন আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি।"

আগন্তুক কিন্তু মার্বেল স্ট্যাচুর মত তখনও নিস্পন্দ। না তাকিয়েও মুন্না উপলব্ধি করল কাঁচকাটা হীরের মত জোড়া চোখের দৃষ্টি তার অন্তরের অন্দরে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। কি অসম্ভব ধার ওর কণ্ঠস্বরেও।

বলছে লোকটা—"উন্মাদের মত ইমার-জেনসি-দরজার দিকে ছিটকে গেল সঞ্জয়-কুমার। বর্ণনাতীত সেই হট্টগোলের মধ্যে আসুরিক শক্তিতে শিশু-বুড়ো-মেয়ে সবাইকে ঠেলে ধাক্কা মেরে সবার আগে পৌঁছোলো ডানদিকের দরজার দিকে। কিন্তু দরজা খোলা পেল না। যাত্রীরা বিমূঢ়, ভয়ার্ত আর্তনাদ, কান্নাকাটি, হট্ট-রোল। সঞ্জয়কুমার এবার বাঁদিকের ইমার-জেনসি-দরজাটাতে ধাক্কা লাগাল প্রাণপণে। খুলে গেল। ঝাঁপ দিল সবার আগে। বিমানে তখন আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। বেল্ট খুলে আমি আমার সিটে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। দেখলাম ধীরে-সুস্থে বেল্ট খুলে সিট ছেড়ে মটন দাঁড়িয়ে উঠলেন আপনি। পল্লকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন সঞ্জয়-কুমারের দিকে। বড় অভিনেত্রী হয়েও সেই প্রলয়-মুহূর্তে মনের ভাব চেপে রাখতে পারেন নি। তাই পলকের মধ্যে দেখেছিলাম আপনার মুখে বিস্ময় নেই, আতংক নেই, উদ্বেগ নেই। শুধু আছে ঘৃণা। সঞ্জয়-কুমারের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা।"

চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল মুন্না—"ভুল করলেন। ঠিক তখন আমার মনে আর কি ভাব এসেছিল জানি না, কিন্তু ঘৃণার ভাব যে আসেনি, তা বলতে পারি। আসবে কি করে? আমি নিজেই যে তখন পালাবার পথ খুঁজছি।"

"জানি", যেন শাঁখের করাত চলছে আগন্তুকের কণ্ঠে। "তাও দেখেছি আমি। ইনজিনের দিক থেকে তখন আগুন জিভ বাড়িয়েছে ভেতর দিকে। এমন সময়ে পর-পর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। উড়ে গেল বিমানের খানিকটা অংশ। আপনি ঝাঁপ দিলেন ফাঁক দিয়ে। আপনার পেছনে আমি এবং আরো অনেকে। তাই আমি নিজের চোখে দেখেছি সেই বাদলা রাতের বিচিত্র নাটক। কাগজওয়ালারা যা লিখেছে, সব ভুল। সঞ্জয়কুমার আপনার পেছনে দৌড়োয়নি—আপনিই দৌড়েছিলেন তার পেছনে।"

"হাজার হোক স্বামী তো।"

"তা তো বটেই।"

"সবই দেখেছেন তাহলে?"

"সমস্ত।"

"শুধু এই কথাটা বলার জন্যেই কি এতদূর এসেছেন?"

মিটিমিটি হাসতে লাগল লোকটা।

মুন্না বলল—"বুঝলাম। আমি যা জানি, আপনিও তা জানেন। একই সিক্রেট আমরা দুজনেই জানি। কিন্তু জেনে এখন কি করতে চান বলুন তো?"

"কিসসু না। কি আবার করবো?"

খুটিয়ে খুটিয়ে লোকটার মুখ দেখল মুন্না। কিছুই ধরতে পারল না। মুখে মুচকি হাসির আভাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

চোখে চোখ রেখে বলল আগন্তুক—"এমন একটা জিনিস আমি জেনে ফেলেছি, যা শুধু আপনারই জানা উচিত ছিল—আমার নয়। কিন্তু জেনেই যখন ফেলেছি, তখন এই সিক্রেট আমাদের দুজনের সম্পত্তি। এ সম্পত্তি যে কোনো কাগজ-ওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়ে যে দামই হাঁকি না কেন—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুন্না।

বলল—"তাই বলুন। আপনি টাকা চান। স্বামীর নামে কালি দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা বার করতে চান।"

কপট আতংকে যেন শিউরে উঠল আগন্তুক।

বলল—"আরে ছিঃ, ছিঃ। আপনি কি আমাকে আর পাঁচটা ব্ল্যাকমেলারের সমান ভেবেছেন? দু মুঠো টাকা পেলেই খুশী হব?"

"কি চান তাহলে?"

এতক্ষণ বাদে নড়ে উঠল আগন্তুকের দীর্ঘ তনু। বুকের ওপর থেকে ভাঁজ করা দু হাত নামিয়ে রাখল মুন্নার দু কাঁধে। বলল গাঢ়কণ্ঠে—"বন্ধুত্ব।"

কিছুক্ষণ সব চুপ।

দ্রুত ছন্দে ওঠে নামে মুন্নার পীবর বক্ষ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায় সুচারু ললাটে।

আগন্তুক বলল—"একদা যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, পরমাসুন্দরী ফিল্মস্টার, সেই মুন্নাদেবীর একটা সিক্রেট জেনে ফেলেছি। জেনেছি বলেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। তাই চাই বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়।"

মুন্নার সমস্ত দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। স্নায়ুগুলো কি অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করল? না, অকস্মাৎ আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে সুষুম্না কেন্দ্র? স্পর্শরত লোকটার হাত দুটো কাঁধ থেকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিতে পারছে না কেন মুন্না? লোকটা আর কি-কি জানে? জানে কি কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে মুন্নার দুস্তর এক মানসিক প্রাচীর পেরিয়ে প্রিয়-

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাসে নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

সন্নিকটে আসতে পারেনি বলে?

জানে! হয়তো জানে।

অনেক...অনেকক্ষণ পরে ওরা সাঁতারে নামল। বেদিং কসটিউম পরে আগে এক দৌড়ে সৈকতে চলে গেল মুন্না। ডাঙ্গায় উঠে আসা মৎস্যকন্যার মত পড়ে রইল বালুকাবেলায়। তারও কিছুক্ষণ পরে এল আগন্তুক। পরনে সঞ্জয়কুমারের সাঁতারের পোশাক। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে শায়িতা মুন্নার পাশে দাঁড়াল। উজ্জ্বল হলুদ রঙের বিকিনি-আবৃত ধবধবে সাদা তন্বী দেহটির দিকে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। হাতীর দাঁতের মত শুভ্র ত্বকে চিকমিকে বালি লেপে গেছে। নিবিড় উত্তেজনায় কাশ্মিরী বুক উঠছে আর নামছে। দুই হাত মাথার তলায় দিয়ে চিং হয়ে শুয়ে মুন্না। হরিণচোখ দুটো কালো গগলসে ঢাকা। তবুও আগন্তুকের মনে হল, কালো কাঁচের আড়াল থেকে দুটি কালো চোখ নিষ্পলক হয়ে রয়েছে সুঠাম একটি পৌরুষের ওপর।

নতজানু হয়ে বসল আগন্তুক। সামান্য ব্যবধান রেখে আড় হয়ে শুয়ে পড়ল পাশে। কনুইয়ে ভর দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় মাথা রেখে নিবিড় চোখে তাকিয়ে রইল রাঙা টুকটুকে দুটি ইয়াণী-ঠোঁটের দিকে।

মুন্না জানে, এখনো ব্যবধান রয়েছে দু দেহে। ব্যবধান সত্ত্বেও উত্তাপ অনুভব করছে সে। রোদের আঁচ নয়। পৌরুষের।

নিঃশ্বাস ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে মুন্নার। মুঠিতে-ধরা-ঘাস-এমনি সরু কাঁকাল কেঁপে কেঁপে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। মুন্না জানে সময় আসছে। সময় আসছে দেহের এই সামান্য দূরত্বটুকু ঘুচে যাওয়ার। ছোঁয়া লাগবেই। তারপর...তারপর

তাই প্রতীক্ষায় রইল মুন্না। দু হাত রইল মাথার নিচে। হু-হু করে বাতাস বইছে। লোনা, কিন্তু টাটকা বাতাস। সমুদ্র শাসাচ্ছে। মুন্না প্রতীক্ষা করছে। নিজেকে এলিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা করছে চরম মুহূর্তের.....

ডান হাত দিয়ে আলতোভাবে মুন্নার থুংনি ধরলো আগন্তুক। মুখটি ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে। হীরক-উজ্জ্বল চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল মুখ।

উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করল মুন্না। ইষৎ দ্বিধাবিভক্ত তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে যেন অকস্মাৎ মরুভূমির হল্কা লাগল। রক্তরাঙা অধরে জোঁকের সঞ্চরণ।

ঠিক এই মুহূর্তটার প্রতীক্ষা করছিল মুন্না। ধীরে ধীরে ওর ডান হাতটা সরে এল মাথার নিচ থেকে। আন্দাজে হাত ছড়িয়ে দিতেই বালির ঢিবিটা আঙুলে ঠেকল। স্তূপাকার বালি ঢাকা ছুরিকাটা ধরল শক্ত মুঠিতে। আসবার সময় বিকিনির মধ্যে লুকিয়ে এনে বালি দিয়ে ঢেকে রাখা এবার বুঝি সার্থক হল।

ছুরিসুদ্ধ ডানহাতটা শূন্যে তুলে বেগে আগন্তুকের পিঠের ওপর নামিয়ে আনল মুন্না...অবিকল সেই বাদলা রাতে ধাতুর ভারি টুকরোটার মত...শূন্যপথে উড়ে আসা ভাণ্ডাটা দিয়ে পলায়মান সঞ্জয়-কুমারের মাথায় উপর্যুপরি কয়েকবার ঘৃণা-বৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে নিবিড় তমিস্রায় ঢেকে গিয়েছিল চেতনা—হতচেতন মুন্না লুটিয়ে পড়েছিল নিহত স্বামীর পাশে।.....

মিনিট পনেরো পরে।

হিস্টিরিয়া রুগীর মত তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল মুন্না। তাই সাড়ী দিয়ে মুখ হাত পা বেঁধে খাটে ফেলে রাখল আগন্তুক। টেলিফোনের কাটা তার জুড়ে দিয়ে রিসিভার তুলে নিল।

"হ্যালো...পুলিশ ফাঁড়ি? দীঘার "শুক্তি-গৃহে" এখনি চলে আসুন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সঞ্জয়কুমারের কটেজ...সঞ্জয়কুমারকে যিনি খুন করেছেন, আমাকেও তিনি এইমাত্র কৃপা করছিলেন...সুযোগটা অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম...আরে মশাই নইলে হাতেনাতে ধরা যেত না.....খুনের মোটিভ? খুবই জটিল। মনের রোগ তো। সাইকিয়াট্রিকই ভালো বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, মুন্না দেবী নার্সিসিজম্ রোগে ভুগছিলেন। রোগটা ইলেকট্রা কমপ্লেক্সে দাঁড়িয়েছিল কিনা, মনোবিজ্ঞানী সঠিক বলতে পারবেন। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, রোজ রাতে উনি স্বপ্ন দেখতেন, মায়ের জন্যে বাবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। একথাও জেনেছি, বাবাকে অসম্ভব ভালবাসতেন মুন্নাদেবী—সাধারণত ইলেকট্রা পেসেন্টদের মধ্যে যা দেখা যায় আর কি। বাপখেষা মেয়ে। তাই আমার অনুমান, ওঁর নির্জ্ঞান মনে বাবার নির্বাসিত স্মৃতি স্থায়ী আসন নিয়েছিল, সে আসন সঞ্জয়কুমারও টলাতে পারেন নি। কারণ, সঞ্জয়কুমার বাবার মত সুপুরুষ হলেও ছিলেন ভয়ানক স্বার্থপর, ভীরু আর কাপুরুষ। তাই অবচেতন মনে ওঁর প্রতি ছিল ঘৃণা। বিমান দুর্ঘটনার রাতে প্রলয়-কান্ডর মধ্যে সঞ্জয়কুমার যখন স্ত্রীকে ফেলে ভয়ে পালালেন, তখন এই সুপ্ত ঘৃণা আর গুপ্ত রইল না। প্রচন্ড হল। অধিকার করল মুন্নাদেবীকে পুরোপুরি। সেই মুহূর্তে উনি আর নিজের মধ্যে ছিলেন না। তাই উন্মাদিনীর মত পলায়মান স্বামীর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। ভীরু স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকদিন ধরেই চেয়েছিলেন, বিমান-দুর্ঘটনা সে সুযোগ তাঁকে দিয়েছে মনের ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়ে। ভদ্রমহিলা এখন যে রকম চেঁচামেচি করছেন, তাতে মনে হয় ওঁকে পাগলাগারদে রাখাই ভাল। বিপজ্জনক মহিলা। কি বললেন? আমি ওঁকে খুন করতে দেখেছি কিনা? না দেখলে বলছি কেন? আমার চোখের সামনেই ছাতু হয়ে গেছে সঞ্জয়কুমারের খুলি. আমার নাম? ইন্দ্রনাথ রুদ্র।... প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র!"

[এ গল্পের ১৫-২০ শতাংশ সত্যি, ৮০-৮৫ শতাংশ মিথ্যে। দুটোরই কিছু কিছু ধার করা। বাদবাকী কল্পনার ভেজাল। নামধাম সব কাল্পনিক।]

বিস্মৃত মাস্টারপীস

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃত মাস্টারপীসের কাহিনী বলা আর মাছধরার গল্প বলা প্রায় একই ধরনের। যাঁরা মাছ ধরে থাকেন তাঁরা যখন যে-মাছটি সুতো ছিঁড়ে পালিয়েছে তার আকারের বিবরণ দেন, তখন শ্রোতারা সে কথা নেহাৎ মেছুড়ে গল্প হিসাবেই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শুনে যান, কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে মাছটি সত্যি বড়ো ছিল। তাদের কাছে তাই বিস্মৃত মাস্টারপীসের কাহিনী অতি-রঞ্জন হওয়া সম্ভব। এই সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদিও তাঁদের কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

চার্লস রবার্ট মাতুরিনের উপন্যাস "মেলমথ দি ওয়ানডারার" ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, আর প্রায় আশী বছর আগে তার সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাস ইদানীংকালে কদাচিৎ পড়া হয়, এবং কারো নজরে পড়লেও তার যথাযথ মূল্য সম্পর্কে হয়ত সেই পাঠক যথেষ্ট অবহিত নন।

অসকার ওয়াইল্ড যখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে প্যারিসে বাণ্ডেভালে গেলেন, তখন বন্ধু রবার্ট রসের উপদেশে সাহিত্যাদর্শকর ওয়াইল্ড নিজের ছদ্মনাম স্থির করলেন সেবাস্তিয়ান মেলমথ। এর ফলে সেদিন মাতুরিন এবং তাঁর উপন্যাসের নায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।

তারও সত্তর বছর আগে বালজাক মাতুরিণের উপন্যাসের অনুবাদ পাঠ করে লিখেছিলেন ঃ

"This is the work of one of the greatest geniuses in Europe"

এবং বালজাক এমনই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, মেলমথের একটি উপসংহার লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে লিখতে সুরু করলেন, তার নাম

"Melmoth Reconcilie"

প্রকাশক "মেলমথ" উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে কয়েকটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। সমকালীনদের চোখে 'মেলমথ' কি জাতীয় অভিনন্দন লাভ করেছিল তা এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। উপন্যাসটির নিশ্চয়ই যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ছিল—না হলে স্কট, বদলেয়র, থ্যাকারে, র‍্যালে, বাইরন রসেটি হয়ত এই জাতীয় মন্তব্য করতেন না।

মাতুরিনের উপন্যাস মেলমথ প্রসঙ্গে স্কট বলছেন—

..Grand and powerful, the language most animated and poetical ..characters sketched with masterly enthusiasm."

বদলেয়র বলছেন—

..Grande creation Satanique,"

বাইরন বলেছেন ছাড়িত ভঙ্গীতে—

"..This very clever fellow."

আর রসেটি নিজের মত প্রকাশ না করে বলেছিলেন—

"This book was my father's supreme delight,"

এই রকম আরো হরেক রকম মজার মন্তব্য।

গথিক উপন্যাস 'মেলমথ' মারিয়া এজওয়ার্থ এবং মনক লুইসের মনোহর কিন্তু তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরেস গথিক উপন্যাসের চেয়ে অবহেলিত হল সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে উদারহৃদয়, মধুরস্বভাব এবং কিঞ্চিৎ এলোমেলো প্রকৃতির বিস্মৃত লেখকের কথা বলা যাক।

চার্লস রবার্ট মাতুরিনের ১৭৮২ খৃঃ ডাবলিন শহরে জন্ম। এঁদের পরিবার নির্বাসিত ফরাসী প্রোটেস্ট্যান্ট। চার্লসের পিতামহ সেন্ট প্যাট্রিকের ডীন হিসাবে সুইফটের পরবর্তী। চার্লসের বাবা সরকারী কর্মচারী। মোটামুটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হলেও অতি-রোমান্টিক চার্লসের পক্ষে যেন যথেষ্ট নয়।

পরিণত বয়সে পৌঁছে চার্লস আত্ম-পরিচয় সূত্রে যা বলতেন তা হ্যারিসন আইনসওয়ার্থের বামনকেও হার মানায়। তিনি বলে বেড়াতেন—

"Some years before the French revolution an infant was discovered exposed in the Rue-des Mathurines in Paris by a lady connected with the court. The rich and splendid clothes of the child betokened him of no ordinary rank She took him home and adopted him giving him the name Maturin, after the street where he was found Being doubtless a child of love he was destined, according to the custom of those days for the church"

এরপর সবিস্তারে কুড়ি বছর বয়সের চার্লস রবার্ট কিভাবে বাস্তিল থেকে পালিয়ে এসে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ট্রিনিটি কলেজে একটি উচ্চমানের ডিগ্রী লাভের পর তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত গ্রহণ করেন। ট্রিনিটিতে ভর্তি হয়েছিলেন পনের বছর বয়সে এবং কুড়ি বছর বয়সে কিল্লালার ডীনের তিনটি সুন্দরী কন্যার অন্যতমা মিস হেনরিয়েটা কিংসবেরীকে বিবাহ করেন. প্রোটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেন তারপর। দারিদ্র্য সত্ত্বেও এই বিবাহ সাহিত্যিক ইতিহাসে এক অতিশয় সুখময় সফল বিবাহ, তিনি ডাবলিনের সেন্ট পীটার্স চার্চের কিউরেট হিসাবে আশী পাউণ্ড বৃত্তি পেতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়িয়েও কিছু রোজগার করতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মাতুরিনের মৃত্যু হয়, আর আমরণ স্ত্রীর প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ ছিল। কথিত আছে যে, এক শিশি মালিসের ওষুধ ভ্রমক্রমে পান করে এই অকাল মৃত্যু ঘটে। মাতুরিনের উপন্যাস এবং নাটকগুলি উদ্দাম, উৎকট এবং উৎকেন্দ্রিক এবং "মেলমথ" তারই চরম পরিণতি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন ছিল মেঘমুক্ত এবং আনন্দময়। মাতুরিন ছিলেন মধুর প্রকৃতির মানুষ, তাঁর ভঙ্গীটা ছিল অতি নাটকীয়, আবেগময় এবং ছিটগ্রস্ত। পোষাক পরিচ্ছদ পরে বেশ সেজেগুজে থাকার ঝোঁক ছিল প্রবল, নিজের সাজ-সজ্জায় বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মাতুরিনের পা দুটি ছিল লম্বা এবং শীর্ণ তিনি সেই পা দুটি আমাদের চোস্ত পাজামা ধরনের একরকম সুদীর্ঘ মোজাসহ প্যাতলুনে আবৃত রাখতেন, তার পরিকল্পনা তাঁর নিজস্ব. এর ওপর থাকত সর্বগ্রাসী বিরাট্কৃতি ওভার কোট।

মাতুরিন সংগীত শিল্পী হিসাবেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, 'লাইট ডাবলিন টেনরসে'র মধ্যে তিনি অন্যতম এবং উচ্চাঙ্গের নৃত্যশিল্পী ছিলেন। এস্টারিস্ড চার্চের মধ্যে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ নর্তক এই বলে তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। সেই কালে মাতুরিনের বাড়িতে যে পঞ্চরঙ্গ নৃত্যের আসর বসত তার মধ্যমণি ছিলেন মাতুরিনের সুন্দরী স্ত্রী, পঞ্চরঙ্গ নৃত্য সেকালে ডাবলিন শহরে বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাতুরিন জেদ ধরতেন যে, তাঁর হেনরিয়েটাকে সব সময় সর্বোত্তম পোষাক পরতে হবে, সমকালীন ফ্যাসনের পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকতে হবে, মাঝে মাঝে পোষাকের মধ্যে ত্রুটি গেলে ভীষণ রাগারাগি করতেন। প্রসাধন ব্যাপারেও তাই, মাঝে মাঝে ড্রেসিং টেবলে ফিরে গিয়ে আরও রুজ দিয়ে গণ্ডকে রঞ্জিত করতে হত।

মাতুরিন 'পান' পছন্দ করতেন না, এ বিষয়ে তাঁর আতঙ্ক ছিল। শব্দ নিয়ে খেলা তার স্নায়ুতে আঘাত করত, এমনকি তিনি চেতনাহীন হয়ে পড়তেন।

লেখার সময় অন্য লোকে তর্ক-বিতর্কে মেতে থাক এই পছন্দ করতেন মাতুরিন, ধরে ভীড় করে সব যদি থাকত তাহলে

লেখা খুলত। সব চেয়ে লেখার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ছিল স্ত্রী এবং দুই শ্যালিকার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে আলাপচারি। তাঁর শ্যালিকা দুজন মিসেস এনজি এবং লেডী অরমসবি ছিলেন পরমাসুন্দরী, তাঁরা যখন কথা বলতেন তা ভালো লাগলেও নিজে পাছে তাঁদের সংগে যোগ দিতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন এই আশংকায় মাতুরিন মুখে একটা টুকরা রুটি জল দিয়ে সেঁটে রাখতেন। মাঝে মাঝে কপালে একটুকরা পাতলা বিস্কুট এঁটে রাখতেন। এর অর্থ তখন তিনি কল্পনায় মগ্ন চৈতন্য, কোনো মতে কথা বলতে প্রবৃত্ত করে যেন বিরক্ত না করা হয়।

আশাতীতভাবে উত্তম প্রচারক ছিলেন মাতুরিন, রোমানিজমের ভ্রান্তি বিষয়ে তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে এমনই হৃদয়গ্রাহী হত যে যে কোনো ঋতুতেই গির্জাঘরে লোক ভেঙে পড়ত। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং বাগ্মিতার এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাঁর পদোন্নতি হচ্ছিল না।

একদিন কি উপলক্ষে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ওর বাড়িতে দেখা করতে এলেন, মাতুরিন একঘণ্টা তাঁকে বসিয়ে রেখে তারপর দেখা দিলেন, তখন তাঁর অংগে এক বিচিত্র ড্রেসিং গাউন, আর মাথার চুলে অসংখ্য কলম গোঁজা, রেড ইনডিয়ানরা যেমন পালক গোঁজে মাথায় অনেকটা সেইরকম, এর ওপর তিনি উচ্চকণ্ঠে তাঁর 'বারটরাম' নামক ট্র্যাজেডির একটি অংশ আবৃত্তি করতে, করতে আবির্ভূত হলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি এই অর্ধোন্মাদ ধর্মযাজকের কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। ধর্মযাজক মাতুরিনের পদোন্নতির প্রস্তাব মাথায় রইল। আর 'বারটরাম' প্রকাশিত হওয়ার পর সব আশা বিলুপ্ত হল। কারণ 'বারটরামে'র একটি চরিত্রকে ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ করে রূপায়িত করা হয়েছে।

১৮১৩ খৃঃ ড্রুরি লেন থিয়েটারে 'বারটরাম' যখন অভিনীত হয় তখন বিখ্যাত অভিনেতা কীন নামভূমিকায় অভিনয় করেন। মাতুরিনের আগের লেখা 'মনটোরিয়ো' উপন্যাসটি পাঠ করে স্কট অতিশয় প্রশংসা করেছিলেন, 'বারটরাম' নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর একখণ্ড 'বায়রণে'র কাছে পাঠালেন। বায়রণ ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। এই নাটকের সম্পর্কে সকলে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করলেও, কোলরিজ আক্রমণ করেছিলেন। সমকালীনদের মতে, কোলরিজ মাতুরিনের প্রতি ঈর্ষিত ছিলেন, কারণ তাঁর নাটক অনুমোদিত হয়নি।

আতুরিনের 'বারটরাম' বিশেষ সাফল্যলাভ করল, নাট্যকার পেলেন ১০০০ হাজার পাউণ্ড, কিন্তু তার একটি কানাকড়িও তিনি রাখতে পারেননি। কারণ, সেই সময় এক হৃতসর্বস্ব আত্মীয়ের ঋণভার তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বপ্রকার বেহিসাবী কাজের মধ্যে এই কাণ্ডটি সবচেয়ে সর্বনাশা। এরপর আর দু'খানি ট্রাজেডি 'ফ্রে গেলফো' এবং 'অসমাইন' প্রত্যাখ্যাত হল। মাতুরিন তখন আরো উপন্যাস লিখতে সুরু করলেন—'দি মাইলেসিয়ান চীফ', 'উইমেন', 'দি এলবাইগনেসেস্' এবং 'মেলমথ'। এরপর মাতুরিনের কলমের স্রোত যখন শুকিয়ে এল সেই সময় এক প্রকাশকের কাছে অগ্রিম বাবদ টাকা নিয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। তখন নাকি কেঁদে-কেটে বন্ধু রেভারেণ্ড জেমস্ ওইলসের লেখা সুদীর্ঘ কবিতা 'দি ইউনিভার্স' স্বনামে ছাপার জন্য দিয়েছিলেন' এই ঘটনা অবশ্য অনেক পরে জানা গেছে।

মাতুরিন যা-কিছু লিখেছেন তার মধ্যে মৌলিকত্ব ছিল—এমনকি 'ফ্রেডলফো' নাটকটি পর্যন্ত, তার চরিত্রাবলীর দুষ্কৃতি মার্লোর 'জু অব মলটা'কেও ম্লান করে দেয়। আইরিশ-ন্যাশনালিস্ট সোসাইটি উপন্যাস 'দি ওয়াইলড আইরিশ বয়' এবং গথিক ঐতিহাসিক রোম্যান্স 'মনটোরিও', 'দি মাইলেসিয়ন চীফ', 'দি এলবাইগনেসেস' প্রভৃতির মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় আছে। কিন্তু 'মেলমথ দি ওয়ানডারার' সবাইকে অতিক্রম করে গেছে। এ এক অনন্যসাধারণ উপন্যাস, অসামান্য প্রতিভাধর লেখকের শক্তির পরিচয় এই উপন্যাসে, মানবিক আত্মার গভীর গহনে অনুপ্রবেশ করেছে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ এবং অনেক দিয়ে সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

তবু বিস্মৃত হল কেন এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক কারণে মনে জাগে। যা জনপ্রিয়, যার পরিকল্পনা এবং বিন্যাস প্রশংসনীয়, যা মানব-হৃদয়কে স্পর্শ করে, যা কাল অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় দিয়েছে, সেই উপন্যাস এমনভাবে একেবারে মুছে গেল কেন?

একরকম চীনা বাক্স আছে, তার একটি বাক্সের ভেতর অন্তত ত্রিশটি নানা আকারের বাক্স থাকে, একের ভেতর ত্রিশ। কাশীতেও পাওয়া যেত তার নাম বিশ কৌটো—একের ভেতর বিশটি নানা আকারের কৌটো। মাতুরিনের 'মেলমথে'র গঠনভংগীর ত্রুটি এই অবলুপ্তির প্রধানতম কারণ। গল্পের ভেতর গল্প, তার ভেতর গল্প, তার ভেতর আবার অন্য কাহিনী—এই বিচিত্র কাহিনীসমন্বয় গোলকধাঁধার মত যেন সদা ঘূর্ণমান, পাঠকের পক্ষে গল্পের গতির সংগে তাল সামলে চলা কঠিন। একজন সমালোচক মরিস রিচার্ডসন লিখেছেন—

> It is a gigantic madman's fly-trap of a book, and the average English reader, accustomed to relatively straightforward narrative, can be excused for quailing before its thousand very odd pages."

প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিগত পরিকল্পনা সারল্যের দিক থেকে চমৎকার কিন্তু প্রথম দু-তিন খণ্ড পাঠ করে হতভাগ্য পাঠক তার অতি সামান্য স্বাদ পেয়ে থাকেন।

সেবাস্তিয়ান মেলমথ, ক্রমওয়েলের সেনা-বিভাগের একজন প্রাক্তন সৈনিক, তার চরিত্রের মধ্যে গভীরতা এবং সূক্ষ্মতা আছে, তিনি একটা বীভৎস চুক্তি সম্পাদন করেন। বায়রণীয় কাল্পেনাগিরি এবং ল্যাম্পটো কাতর হয়ে মনের মধ্যে অপরাধবোধ নিয়ে তিনি যন্ত্রণাকাতর হয়ে মহাকাশ এবং মহাকাল পরিক্রমণ করে এমন একজনের সন্ধানরত যিনি তাঁর জর্জরিত আত্মার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন স্থানে, কখনও এই শতাব্দীতে কখনো অন্য শতাব্দীতে। কখনও লণ্ডনে, কখনও বা সেভাইলে, যখনই কেউ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত, তখনই তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে উত্তম সেলস্‌ম্যানের ভংগীতে তাকে যন্ত্রণামুক্ত করার প্রলোভন দেখান—তাঁর আত্মার সংগে বিনিময় হবে যন্ত্রণাকাতর আত্মার। তিনি বলেন—

> "I never desert my friends in misfortune. When they are plunged in the lowest abyss of human calamity, they are sure to be visited by me."

তাঁর সম্ভাব্য মক্কেলরা এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরীক্ষাভূমি কিংবা বীক্ষণাগার।

প্রথম ব্যক্তি স্ট্যানটন রেস্টোরেশন পিরিয়ডের একজন ইংরাজ, মেলমথের সংগে তার স্পেনে যোগাযোগ, তারপর লণ্ডনের জনপূর্ণ এক নাট্যশালায় একটা অর্ধবিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার পর এই বিবরণটির মধ্যে আতংককর বাস্তবতা বর্তমান। এই ঘটনার ফলে ভদ্রলোককে অন্যায় বিধান বলে উন্মাদাগারে আটক করা হয়। পাগলাগারদের দৃশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর নিখুঁত চিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে পাগলা-গারদের কোনো বর্ণনাই বাদ নেই। এই বিবরণের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরাসক্ত বর্ণনাভংগীর মধ্যে মাতুরিন এক অসামান্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে স্ট্যানটন আখ্যানটির সবটুকুর মধ্যে সামাজিক পুনর্গঠনের এক চমকপ্রদ ইংগিত আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এর পরবর্তী শতাব্দীর বা তারো পরের একজন স্পেনবাসী, তার নাম মনকাদা, ইনকুইজিসনের হাত থেকে ছিন্নমূল হয়ে পালিয়ে এসেছে। একজন স্পেনীয় গোলন্দাজ সৈনিকের তিনি অবৈধ সন্তান, পিতার বাসনা—পুত্র আজীবন কোন মঠের আশ্রয়ে কাটায়। মঠের অধ্যক্ষমহোদয়ের হাতে তাকে নিয়মিত নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তার ফলে সে নিরতিশয় মানসিক ক্লেশ ভোগ করে। মাতুরিনের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নীচের উধৃতিটুকু লক্ষ্য করুন :

> "When art assumes the omnipotence of reality, when we feel we suffer as much from an illusion as from truth, our sufferings lose all dignity and all consolation. We turn demons against ourselves and laugh at what we are writhing under It is better to be mad at once, than to believe that all the world is sworn to think

and make you be so, in spite of your own consciousness of your sanity. The whispers this night were so horrible, so full of in. effable abominations, of — I can not think of them—that they maddened my very ear.."

এর পর তৃতীয় ঘটনা হল মেলমথের এক প্রেমলীলার বিবরণ, সুন্দরী ইমালী অর্বিমিশ্র সারল্য এবং কলুষহীনতার প্রতীক এক নিষ্পাপ চরিত্র—তাকে নিয়ে যে প্যারাডক্স রচিত হয়েছে, তার দ্বারাই ব্যালজ্যাক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ইমালী অপরূপা। নারী হিসাবে সে প্রকৃতির সন্তান। মাতুরিন তাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন। জনৈক স্পেনীয় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ইমালী জাহাজ ডুবির ফলে সে করমণ্ডলের উপকূলের এক দ্বীপে নার্সিসীয় ভঙ্গীতে আপনাতে আপনি বিকশি এবং আপনার প্রেমে আত্মহারা হয়ে নিরালা নির্জনে দিনাতিপাত করছিল। এই কালেই সেখানে আগমন হল পর্যটক মেলমথের। মেয়েটিকে প্রভাবিত এবং লুব্ধ করার জন্য সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগ করল মেলমথ, তার যা-কিছু অস্ত্র সবই ব্যবহার করল। একটি টেলিস্কোপের সাহায্যে অন্তরের গভীরের দৃশ্য দেখানোর প্রয়াস করে মেলমথ। জগরনাটের (জগন্নাথের ইংরাজী নাম) পূজারীরা কি বীভৎস ভঙ্গীতে পূজা করে মূলভূমিতে টেলিস্কোপ প্রক্ষেপ করে তা দেখায়।

মেলমথের এইসব প্রক্রিয়ার ফলে ইমালী তার প্রতি অধিকতর আসক্ত হয় এবং খৃস্টীয় ধর্মমতের প্রতি অনুরাগ আরো বেড়ে যায়। তার পরিণতি চিরন্তন নায়িকার মত নিপীড়নের কাহিনী—একজন নিহিলিস্টকে বিবাহ করে তার জীবন চিরকালের মত জর্জরিত হয়।

ছয়টি মূলকাহিনীর মধ্যে এই তিনটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আর যে অসংখ্য পার্শ্ব-কাহিনী এবং পার্শ্বচরিত্র আছে, তার কথা সংক্ষেপে বলা কঠিন। কারণ, গল্পের ভেতর গল্প কখনো পিছু হঠেছে, কখনো সামনে এগিয়েছে এবং তার ভেতর টাইম এবং স্পেসের ব্যাপার আছে। আর যেসব সংযোগসূত্র তা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম।

গ্রন্থের আরম্ভ পর্যটক মেলমথের তরুণ বংশধর জন মেলমথকে নিয়ে আর পৌঁছেচে উইকলো পাহাড়ের ওপর এক ভগ্নপ্রায় কুটিরে কৃপণ খুড়োর মৃত্যুশয্যায়। গোপন নথিপত্র খুঁজে একতাড়া পুরাতন কাগজ পড়তে দিয়েছেন। সেই কাহিনী শেষ হয়েছে যখন পরিব্রাজক তার পূর্বপুরুষদের বাস্তুভিটায় ফিরে এসেছেন সেইখানে। আর বর্ণনা আছে এক অন্তিম রজনীর, সেই রজনীতে বিবেক-তাড়িত হয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে সে ডন জিওভান্নীর মত তীব্র চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অতল গহ্বরে।

সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য অধ্যাত্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বয়ং মেলমথ, কালজয়ী মানুষ।

উনিশ শতকে যেসব মানুষ এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন মেলমথ তাঁদের একজন। বায়রণ এবং লারমণ্টভের আঁকা সমতুল চরিত্র মেলমথ। তার উত্থানপতনের ইতিহাস নিখুঁত এবং যথাযথ এ-কথা বলেছেন সমালোচকরা। এক বিরাটাকৃতি কালো শিকারী কুকুরের মত যা-কিছু অশুভ তারই অরণ্যভূমিতে তিনি বিচরণ করেছেন।

মাতুরিন লিখেছেন ড্রয়িংরুম, যা পাঠাগারের জন্য, সাইকিআ্যাস্টের কনসালটিং রুমের প্রয়োজনে নয়, কিন্তু অচেতন মানসের সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বিস্ময়কর।

লতরেমোঁ ফ্যানটাসি রচনায় এক আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, অতি-প্রাকৃত বা সার-রিয়ালিস্ট রচনাকার হিসাবে মাতুরিন এইসব লেখকের সমকক্ষ।

'পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে' হয়ত মাতুরিন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে অসকার ওয়াইল্ড লিখেছেন এবং সেই কৃতজ্ঞতার বশেই জীবনের শেষপর্বে মাতুরিনের অঙ্কিত এই বিখ্যাত চরিত্রের নামটি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। পর্যটক করুণার ভিখারী হয়ে নির্জন পথের অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ।

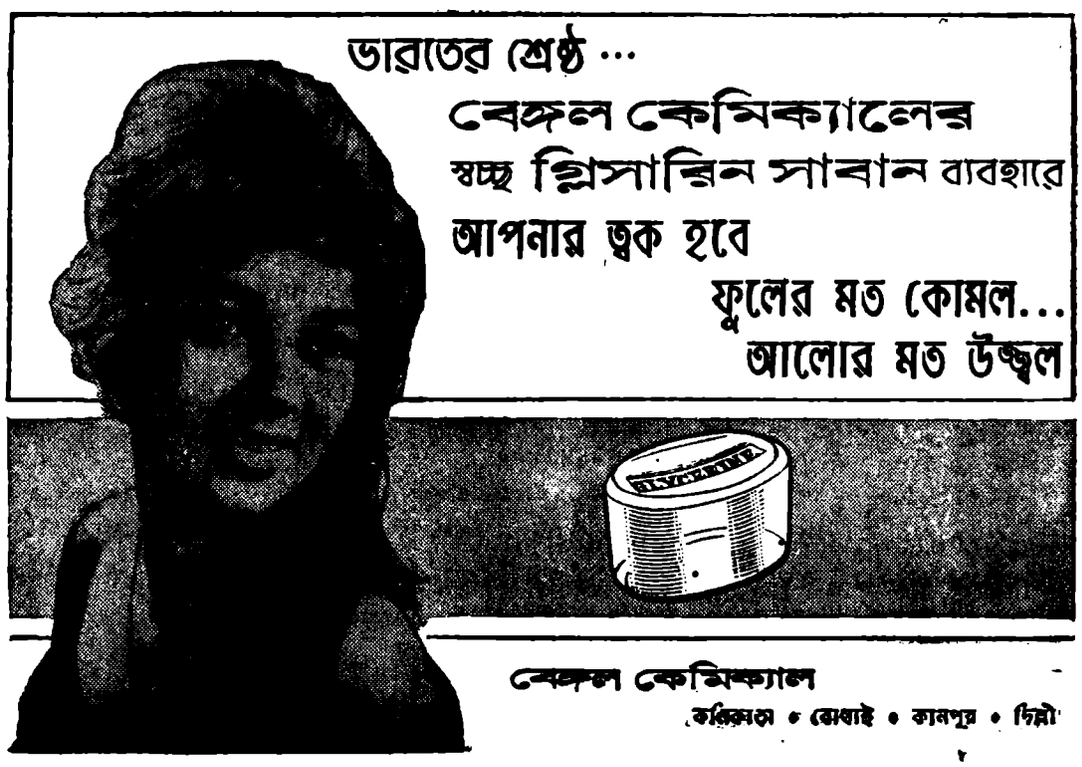

বৃত্তের বাইরে

প্রফুল্ল রায়

কোঙ্কন উপকূলের এই ছোট্ট শহরটির দিকে তাকালে চোখ আর ফেরে না। তিন দিক ঘিরে আরব সাগর, দূরে ধোঁয়ার দৈত্যের মতন উঁচু উঁচু পাহাড়। সমুদ্র আর বেলাভূমির ফ্রেমে-আঁটা শহরটা যেন চমৎকার একখানা ছবি। নাম সাবন্তপুর।

সাবন্তপুরের সব চাইতে মনোরম আকর্ষণ মিস্টার বন্দোদকরের বাড়ি। শহর পেছনে রেখে বেলাভূমি পেরিয়ে সমুদ্রের খানিকটা ভেতরে মস্ত এক টিলা ; বাড়িটা তার মাথায়।

নানা ঘাটে ভাসতে ভাসতে কেমন করে সাবন্তপুরে এসেছি আর কিভাবেই বা মিস্টার বন্দোদকরের অতিথি হয়েছি তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

বন্দোদকর এ অঞ্চলের বাঘা উকিল—ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। বয়েস পঁয়ষট্টির মতন। যেসব কেসের আশা নেই, অন্য উকিলেরা যেসব কেস ভয়ে ভয়ে ছেড়ে দেয়, বেছে বেছে সেগুলোই হাতে নেন বন্দোদকর। এবং প্রায় অলৌকিক শক্তিতে নিশ্চিত ভরাডুবির কেস-গুলো জিতিয়ে আনেন। আয় দেদার, হৃদয় দরাজ। খেতে পারেন প্রচুর, খাওয়াতে ততোধিক। এত জোরে হাসেন, মনে হয়, চারদিকে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তাঁর বাড়ির দরজা সর্বক্ষণ সবার জন্য অবারিত। সকালের দিকটা আর আদালতের সময়টুকু বাদ দিলে বাকি দিন দ্বারা খেলে আর আড্ডা দিয়ে কাটান। বন্দোদকর রসীতমত মজলিশী মানুষ।

আড্ডাটা সব চাইতে বেশী জমে সন্ধ্যের পর। বাড়ির সামনের দিকে ছোট্ট ঘাসের লন। সেখানে ছয় ঋতু বারো মাস গোল করে অনেকগুলো বেতের চেয়ার পাতা। সন্ধ্যেটি নামার শুধু অপেক্ষা। তারপর একে একে এ শহরের অন্য উকিলেরা, দু-চারজন অধ্যাপক, স্কুলমাস্টার, সার্কেল ইন্সপেক্টর, মুনসেফ, থানা অফিসার—এমনি অনেকে এসে আসর জমিয়ে তোলেন। মাঝে মাঝে এস-ডি-ও সাহেব, ফার্স্ট আর সেকেন্ড ম্যাজিস্ট্রেটও হাজিরা দেন। পদ-মর্যাদা যেমনই হোক, এ বাড়ির উদার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে কারো বাধা নেই। তাছাড়া আরো একটা লোভনীয় ব্যাপার আছে। তা হল চা-পান-সিগারেট আর নানা-রকম সুস্বাদু মুখরোচক খাবারের সদাব্রত।

যথারীতি আজও আড্ডা বসেছিল। তবে হাজিরের সংখ্যা নগণ্য। সেই বিকেল থেকে জোর হাওয়া দিতে শুরু করেছে, আকাশের কোণে কোণে কালো ভারী মেঘ জমেছে, আরব সাগরের ঢেউ ফুলে ফুলে পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠেছে। আয়োজনে কোথাও ত্রুটি নেই; যেকোন মুহূর্তে আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। খুব সম্ভব সেই জন্যই জমায়েতটি ক্ষীণ।

মিস্টার বন্দোদকর আর আমি তো ছিলামই। দুর্যোগের সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে এ শহরের আরো দুজন এসেছেন—নীল-কান্ত আপ্তে আর যশোবন্ত নায়েক—নীল-কান্ত স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক, যশোবন্ত দেওয়ানী আদালতের কনিষ্ঠ উকিল।

হাজিরা কম বলে নিরুদ্যম হয়ে পড়েন নি বন্দোদকর; প্রচন্ড উৎসাহে গল্প করে চলেছেন। আড্ডার অনুপান হিসেবে আজ আছে কড়াইশুটির ঘুগনি, মুচমুচে কুচো নিমকি আর কড়া ব্ল্যাক টী।

নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রেম-রাজনীতি - শিকার - সাম্প্রদায়িকতা - প্রাদে-শিকতা-দেশভাগ (খুব সম্ভব আমি বাঙালী বলে) ইত্যাদি ইত্যাদি কত প্রসঙ্গ যে আমাদের আসরটাকে ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়ে যাচ্ছে হিসেব নেই। গল্প করতে করতে কখন আমরা জগতের সব চাইতে উত্তেজক আর লোভনীয় প্রসঙ্গ 'সেক্স'-এ এসে ঠেকেছিলাম, বলতে পারব না।

নীলকান্ত বললেন, 'সেক্স লাইফ সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। জ্ঞানবুদ্ধি

হবার পর যে যেরকম এনভায়রনমেন্ট পায় তার যৌনজীবনও অবিকল সেইভাবেই গড়ে ওঠে।'

জুনিয়ার উকিল যশোবন্ত নায়েক তবলায় ঠেকো দেবার মতন করে বলে উঠলেন, 'রাইট।'

স্বজাতির মর্যাদা রাখতে আমি প্রতিবাদ জানালাম, 'প্রফেসর আপ্তে আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। একমাত্র পরিবেশই সেক্স লাইফকে নিয়ন্ত্রিত করে—এ মানতে পারা যায় না। দেয়ার আর আদার ফ্যাক্টরস্—'

ঘাড় সোজা করে নীলকান্ত বললেন, 'আদার ফ্যাক্টরসের কথা বলছেন? বেশ প্রমাণ দিয়ে দেখান, পরিবেশ ছাড়া অন্য কিছু যৌনজীবনকে প্রভাবিত করেছে—'

হাতের কাছে দলিলপত্র ছিল না। নীলকান্তর থিওরি ধরাশায়ী করার মতন কোন ঘটনাও এই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না। থতমত খেয়ে বললাম, 'এক্ষুনি কোত্থেকে দিই!'

'ওসব ছেঁদো কথায় চলবে না, ধরা-ছোঁয়া যায় এইরকম প্রমাণ চাই।' নীলকান্ত প্রায় মারমুখী হয়ে উঠলেন, 'পরিবেশ—পরিবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। একটা কথা মনে রাখবেন, কেউ যদি চোখের সামনে সব-সময় অবাধ যৌনলীলা দ্যাখে, তার কথা ক্রমাগত শুনতে থাকে—বিকৃত হতে সে বাধ্য। আর শুচিশুদ্ধ পবিত্র এনভায়রনমেন্ট—যেমন ধরুন চার্চে-মঠে থাকলে সেক্স সম্বন্ধে বোধই জন্মায় না। ঐ দিকটা একেবারে ব্লক্‌ড্ হয়ে যায়। নয়ত সেক্সকে সে ঘৃণা করতে শেখে। না কি বলেন, বন্দোদকর সাহেব'—সমর্থনের আশায় তিনি ডাইনে ফিরলেন।

ডাইনে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছিলেন বন্দোদকর আর নিঃশব্দে বাঁকা হাসছিলেন; তাঁর ঠোঁটের প্রান্তে ধারাল বিদ্রূপ খেলে যাচ্ছিল। 'সেক্স' সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা হচ্ছিল তাতে একটি কথাও বলেন নি তিনি। এবার কিন্তু তাঁকে মুখ খুলতে হল। ধীরেসুস্থে একটি সিগার ধরিয়ে দাঁতের ফাঁকে বসিয়ে বলতে লাগলেন, 'প্রফেসর আপ্তে, আপনি যা বলেছেন তা হয়ত ঠিক। তবে আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'অন্য কথা বলে।'

আমি উৎসাহিত হলাম। কেননা মিস্টার বন্দোদকর মোটামুটি আমাকেই সমর্থন করেছেন।

এদিকে নীলকান্তর চোখ জ্বলে উঠেছে। সাতদিন এখানে এসেছি। সাতদিন ধরেই দেখছি তর্কের ব্যাপারে ভদ্রলোকের প্রচন্ড আগ্রহ। নিজের মতামত অন্যের ঘাড়ে যেমন করে হোক চাপিয়ে দেবেনই। সব বিষয়ে শেষ কথা বলবার জন্যই বোধহয় পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব। নীলকান্ত ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কিরকম?'

হাসতে হাসতে বন্দোদকর বললেন, 'ছেঁদো কথায় তো আপনি ভুলবেন না; সলিড একখানা প্রমাণ চাই—'

স্নানের পর। ফটো: অনিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের উরুতে প্রচন্ড চাপড় বসিয়ে নীলকান্ত বললেন, 'নিশ্চয়ই—'

'প্রমাণ দেব, তার আগে একটা গল্প শুনতে হবে।'

'গল্প!' নীলকান্তর ঠোঁট বেঁকে গেল।

বন্দোদকর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বানানো গল্প না, সত্যি ঘটনা। তার মধ্যে আমার প্রমাণটা রয়েছে।'

'বেশ বলুন'—

যশোবন্ত বললেন, 'বেশ মশলাদার ঘটনা তো দাদা?'

বন্দোদকর বললেন, 'শুনে সেটা তুমিই ঠিক কোরো।'

যশোবন্ত আবার বললেন, 'গল্পের আগে আরেকবার চা হলে ভাল হত—'

'অবশ্য, অবশ্য—'

দ্বিতীয় দফা চা এল। খেতে খেতে মিস্টার বন্দোদকর বললেন, 'আচ্ছা যশোবন্ত, তুমি তো এ অঞ্চলের লোক না। কতদিন সাবন্তপুর আছ?'

'পাঁচ বছর।'

'আপনি প্রফেসর আপ্তে?'

'সাত বছরের মতন।' নীলকান্ত মনে মনে হিসেব কষে বললেন, 'আপনাদের এ শহরে আমিও প্রবাসী।'

একটু চুপ করে থেকে বন্দোদকর বললেন, 'আর ব্যানার্জিবাবু তো মোটে সাত দিন এসেছেন। কাজেই আপনাদের কারো জানবার কথা নয়। কারণ ব্যাপারটা ঘটেছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে।'

বন্দোদকরের গল্প শুরু হল।

'আমাদের এই ছোট্ট শহর সাবন্তপুর বড় শান্ত, বড় নিরীহ। এখানে চাঞ্চল্যকর ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। আদৌ ঘটে কিনা সন্দেহ। কুড়ি বছর আগে এমন একটা ব্যাপার এখানে ঘটল যাতে সারা শহর চমকে উঠেছিল — একটি মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। মহিলা অসাধারণ রূপসী। জগতে রূপসী নারীর অজস্র লাঞ্ছনার কাহিনী আছে। কিন্তু সাবন্তপুর ছোট্ট নিরীহ জায়গা বলে চমকটা লেগেছিল খুব বেশী। তাছাড়া মহিলা শুধু সুন্দরীই নন, একটি

বিখ্যাত পরিবারের তিনি বধূ। এ শহরের সবাই তাঁদের জানে। জানেই না, অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করে। নাম বললে ব্যানার্জি-বাবু হয়ত চিনবেন না কিন্তু যশোবন্ত আর প্রফেসর আস্তে নিশ্চয়ই চিনে ফেলবেন। নামটা আমি বলব না। সুবিধের জন্যে বানানো নামে কাজ চালাব।'

'যার জন্যে মাঝিতা মহিলাটির নাম মেরী সুনন্দা ঘোষী; তাঁর স্বামীর নাম ডেভিড নারায়ণ ঘোষী। ওঁরা নিষ্ঠাবান দিশী ক্রীশ্চান। নারায়ণ ঘোষীর বয়েস তখন পঞ্চাশের নীচে, সুনন্দার তিরিশের নীচে। সুনন্দার বয়েসের ব্যাপারে আমার অনুমান নির্ভুল না-ও হতে পারে, কেননা মেয়েদের বয়েস আমার কাছে আজও রহস্য।'

'নারায়ণ ঘোষীরা নিষ্ঠাবান ক্রীশ্চান একথা আগেই বলেছি। কোঙ্কন উপকূলে, বিশেষ করে এ অঞ্চলে বংশপরম্পরায় ওঁরা খৃস্টধর্ম প্রচার করে আসছেন। জামজমা থেকে ওঁদের প্রচুর আয়। আয়ের টাকা থেকে নিজেরা সামান্য কিছু রেখে বাকিটা ক্রীশ্চানিটির জন্যে খরচ করেন। জীবনযাত্রা খুবই সাদাসিধে; পোশাকে-আহারে-বিহারে বিন্দুমাত্র আড়ম্বর নেই। এই অঞ্চলে ওঁরা বাইবেল সোসাইটি খুলেছেন, চার্চ বসিয়েছেন। মানুষের সেবামূলক সবরকম কাজে ওঁরা ব্রতী। পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির বাইবেল কণ্ঠস্থ; ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি অনুশাসন ওঁরা মেনে চলেন।'

'হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এ শহরের এবং আশেপাশের সব মানুষ ওঁদের ভালবাসে, দেবতার মতন ভক্তি করে। এইরকম একটি পরিবারের বধূ লাঞ্ছিতা হয়েছেন। বুঝতেই পারছেন ঘটনাটি সাংঘাতিক।'

'জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। যে নারী-মাংসলোভী দস্যুর হাতে মহিলা নিগৃহীত হয়েছেন, সে ধরা পড়েছে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত। সবার ইচ্ছা দস্যুটার শাস্তি হোক। চরমতম দণ্ডই তার প্রাপ্য।'

'আর সবারমতই ঘটনাটা আমিও জেনেছিলাম। এ শহরে তখন আমার পসার খুব জমে উঠেছে। ভেবেছিলাম কেসটা আমার হাতে আসবে। কিন্তু আসে নি। অন্য উকিলের হাতে চলে গিয়েছিল। তার জন্যে অবশ্য আমার ক্ষোভ ছিল না।'

'যাই হোক, মাসখানেকের ভেতরে উত্তেজনা অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছিল। দুঃখ শোক চমক যত বড় আর কঠিনই হোক না, একদিন তা স্তিমিত হয়ে যায়, স্মৃতে বাধ্য। নানা কাজের চাপে ঘটনাটা আমিও ভুলতে বসেছিলাম। ঠিক সেই সময় এমন আরেকটা ব্যাপার ঘটল যাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।'

'আপনারা জানেন আমি মহা আড্ডাবাজ। ছেলেবেলা থেকেই আড্ডা আমার অঙ্গাঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে। মনে আছে, সেদিনও ছুটিয়ে আড্ডা দিয়েছিলাম। গল্প-টল্প করে একে একে সবাই যখন বিদায় নিলেন তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। তার পরও একা-একা অনেকক্ষণ বসেছিলাম। কতক্ষণ পর বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, কেউ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিলাম, কালো-শাড়িতে সমস্ত শরীর ঢাকা একটি মহিলা। শুধু চোখ দুটিই তাঁর দেখা যাচ্ছিল—দীর্ঘ ঘন-পালকে-ঘেরা রুপোর কাজললতার মতন চোখ। অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাকে চান?' মহিলা আবছা গলায় বলেছিলেন, 'আপনাকে। বসতে পারি?' ব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অনুগ্রহ করে বসুন।' মুখোমুখি একটা চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। এবার আমি শুধিয়েছি, 'আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, বলুন।' মহিলা বলেছেন, 'একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।' আমি বলেছি, 'কীসের প্রতিশ্রুতি?' মহিলা বলেছিলেন, 'আমি যে এসেছি এবং একটি কেসে সাহায্যপ্রার্থিনী, সে-কথা গোপন রাখতে হবে।' আমি হেসে ফেলেছিলাম, 'দেখুন, গোপনতা আমাদের প্রফেসনের একমাত্র মূলধন। বাপের কথা আমরা ছেলেকে বলি না; স্ত্রীর কথা স্বামীকে না। আমরা শুধু শুনি; মুখ আমাদের বন্ধ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' মহিলা বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ।' একটু চুপ করে থেকে আমি বলেছিলাম, 'এবার আপনার কেসের কথা বলুন। খুটিনাটি কিছু বাদ দেবেন না। তার আগে আপনার পরিচয় আমার জানা দরকার।' চোখ দুটি ছাড়া মহিলার সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। মহিলা বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে চেনেন, আমার নাম মেরী সুনন্দা ঘোষী।' বলে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়েছিলেন। বজ্রপাত হলেও আমি এতখানি চমকাতাম না। রাতের মধ্যযামে একা-একা সুনন্দা ঘোষী আমার কাছে একটি কেসের সাহায্য-প্রার্থিনী হয়ে আসতে পারেন—এ ছিল অভাবনীয়, আমার সুদূর কল্পনাতেও এমন সম্ভাবনা ছিল না। চমকটা কিছু থিতোলে বলেছিলাম, 'এবার যে জন্যে এসেছেন বলুন।' সুনন্দা কিছুক্ষণ চোখ নত করে বসেছিলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে অস্ফুট গলায় বলেছিলেন, 'আমার লাঞ্ছনার কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন? এ-শহরের কারো তো জানতে বাকী নেই।' এ জাতীয় আলোচনায় খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সংকুচিত সুরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, কিছু-কিছু শুনেছি।' সুনন্দা বলেছিলেন, 'যে লোকটির হাতে আমি নিগৃহীত হয়েছি তার নাম শিবল রাও। শিবল এখন জেল হাজতে। আমার ইচ্ছা—আমার ইচ্ছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। আমি খানিক ঝুঁকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ইচ্ছে?' তক্ষুনি উত্তর দ্যান নি সুনন্দা। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন, 'শিবলের শাস্তি হোক, এ আমি চাই না। ওকে বাঁচাতে হবে; আর সে দায়িত্ব আপনার হাতে দেবার জন্যে এত রাত্রে ছুটে এসেছি।'

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। আমাদের মানে প্রফেসনাল ল-ইয়ারদের অনেক রকম কেস ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনের বেশির ভাগ কোমল দিক একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়। খুব সহজে আমরা বিচলিত বা বিহ্বল হই না। কিন্তু সুনন্দা ঘোষীর কথাগুলো আমার যুক্তি, বুদ্ধি এবং মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে বলেছিলাম, 'শিবলকে বাঁচাতে চান!' সুনন্দা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। সে ভার আপনাকে নিতেই হবে। না' বলতে পারবেন না।' আমার বিস্ময় বিহ্বলতা প্রায় শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছেছিল। বলেছিলাম, 'একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে। যে আপনাকে চরম অসম্মান করেছে, তাকে আপনি বাঁচাতে চান কেন?' রহস্যময় সংকেতের মতন বিচিত্র একটু হাসি সুনন্দার ঠোঁটে ফুটি-ফুটি করেই মিলিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'সে কথা আমি মুখে বলতে পারব না। এই নিন—' বলে আমার দিকে একখানা মুখবন্ধ বড় খাম এগিয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনি যে ঐ প্রশ্নটা করবেন, আগেই তা অনুমান করেছিলাম। আমার উত্তর খামের ভেতর আছে আর আছে আপনার ফী। যেভাবেই হোক শিবলকে বাঁচাবেন। আচ্ছা এখন চলি; অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনার নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয় নি। নমস্কার।' আমি কিছু বলবার আগেই সুনন্দা চলে গিয়েছিলেন।'

'সুনন্দা চলে যাবার পরও খামখানা হাতে নিয়ে অনেক অনেকক্ষণ বসেছিলাম। চাকরটা খাবার জন্যে তিন-চারবার তাগিদ দিয়ে গেছে। কিন্তু বিহ্বলতার জের কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটি সম্ভ্রান্ত শ্রদ্ধেয় পরিবারের বধূ লম্পটের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে তাকেই বাঁচাতে ছুটে এসেছেন; আমার আইন-ব্যবসার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তখনও পর্যন্ত ছিল না। যাই হোক খামটা খুলতে একশ টাকার পাঁচখানা নোট আর একখানা চিঠি বেরিয়ে এসেছিল।'

প্রায় এক নিশ্বাসে এই পর্যন্ত বলে মিস্টার বন্দোদকর থামলেন। আর তিনি থামতেই নীলকান্ত আস্তে বললেন, 'সেই চিঠিখানা আছে?'

বন্দোদকর হাসলেন, 'নিশ্চয়ই আছে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রমাণ রেখে দেওয়াই তো উচিত। আপনারা একটু বসুন, চিঠিটা নিয়ে আসছি।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন। একটু পর চিঠি নিয়ে ফিরে এলেন বন্দোদকর। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, 'অনুগ্রহ করে চিঠিটা কেউ দেখতে চাইবেন না, কেননা ওতে সুনন্দা আর নারায়ণ

যোশীর আসল নাম আছে। নকল নাম বসিয়ে আমি পড়ে শোনাচ্ছি।'

বন্দোদকর পড়তে শুরু করলেন।

'শ্রদ্ধেয় মিস্টার বন্দোদকর, এ চিঠি পড়ে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আমি কোন পরিবারের বধূ, সাবরতপুরের মানুষের কাছে তার মর্যাদা এবং সম্মান কতখানি, আপনাকে নতুন করে তা জানাবার প্রয়োজন নেই। ঐ রকম একটি পরিবারের বধূ হয়ে এ জাতীয় চিঠি লেখার কথা কল্পনা করাও অন্যায়। তবু না লিখে পারি নি। এ চিঠি আমার স্বীকারোক্তি বলতে পারেন; জীবনের একটি প্রধান নিষ্ঠুর সত্যকে আমি এখানে স্বীকার করেছি। শিবল রাও নামে ঐ লম্পটটা আমার নারীত্বকে অপমান করেছে বলে সবাই জানে কিন্তু এ কথা কি কেউ জানে, ঐ বদমাসটা একটানে সব পর্দা ছিঁড়ে নিষ্ঠুর নিদারুণ সত্যটার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল? শিবলের কথা পরে। আগে আমার কথা লিখে নিই। আঠার বছর বয়েসে ডেভিড নারায়ণ যোশীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। স্বামীর সঙ্গে আমার বয়েসের তফাত প্রায় কুড়ি বছর। আমি তখন পরিপূর্ণ যুবতী—সে সময়ে আমার রক্তে আগুন, নিশ্বাসে আগুন। ত্বকে-ঠোঁটে-গ্রীবায়, দেহের প্রতিটি বিভঙ্গে এবং রেখায় তীব্র উগ্র দাহ আর সম্ভোগের পিপাসা। কিন্তু আমার স্বামী আশ্চর্যরকমের শীতল, সবগুলি ইন্দ্রিয়ই তাঁর মৃত। রাত্রিবেলা স্বামীর পাশে শুয়ে আমি যখন অস্থির-চঞ্চল হয়েছি তিনি তখন শান্তভাবে ঘুমিয়েছেন। আমি এ-দেশের মেয়ে—স্বভাব-লাজুক। তবু যতখানি পেরেছি চটুল ভ্রূভঙ্গে, ইঙ্গিতময় হাসিতে, লাস্য-মধুর অভিমানে স্বামীকে জানাতে চেয়েছি কিন্তু পারি নি। তাঁকে ঘিরে শুধু মেরু-দেশের হিম। আমার চঞ্চলতা স্বামী লক্ষ্য করেছিলেন কিনা বলতে পারব না। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে তিনি উঠতে-বসতে সব সময় সংযম, সুনীতি আর শীলাচরণের উপদেশ দিতেন। আমার উন্মুখ মন, বিকশিত দেহ, তাদের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা আর পিপাসা, তাদের দাহ আর উত্তেজনা—সমস্ত কিছু একটি শান্ত নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বইয়ে দিতে শুরু করেছিলেন তিনি। স্বামী আমাকে চার্চে নিয়ে যেতেন, বাইবেল সোসাইটিতে নিয়ে যেতেন, মানুষের কল্যাণ-মূলক নানা কাজে যোগ দেবার জন্য প্রেরণা দিতেন। ধীরে ধীরে ঐসব ব্যাপারে আমি উৎসাহী হয়ে পড়লাম। শুধু তাই নয়, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই বয়েসে ঈশ্বর উপাসনাতেও নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। আর এরই মধ্যে একটা সাংঘাতিক কথা জানতে পেরেছিলাম, আমার স্বামী বিবাহিত জীবনের পক্ষে অযোগ্য। যে সামর্থ্য একজনকে পুরুষ করে তোলে তা তাঁর নেই। তিনি পুরুষত্বহীন, ক্লীব। নিজের অক্ষমতা ঢাকতেই তিনি হয়ত আমাকে সুনীতির দিকে, সংযমের দিকে আর ঈশ্বরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক এমন মর্মান্তিক সংবাদও আমাকে তেমন বিচলিত করতে পারে নি; কেননা তত দিনে আমি জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছি। তারপর কত বছর কেটে গেছে! ঈশ্বর-চিন্তায় আমি এখন সমর্পিত; বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি! এইভাবেই জীবনটা কেটে যেত। যৌবনের আরম্ভে যে উত্তেজনা যে জ্বালা আমাকে নিয়ত অস্থির করে রাখত তার কণামাত্রও আর অবশিষ্ট ছিল না। ঈশ্বর-উপলব্ধি ঈশ্বর-চেতনা তখন আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু কে জানত, স্বামী আমাকে যে আবরণের মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন তা মিথ্যে মায়াবরণ মাত্র; ধীরে ধীরে যে দুর্গে আমি ঢুকেছিলাম তা নকল দুর্গ। তাদের উড়িয়ে দিতে একটি ফুঁ-ই যথেষ্ট। দিন কয়েক আগে ঐ লোকটা—শিবল রাও—আমাকে বাজপাখির মতন ছোঁ মেরে একটা ভাঙা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটার অসুরের মতন চেহারা, অসীম শক্তি, বিপুল পৌরুষ। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে আমি চিৎকার করেছিলাম, লোকটা আমার মুখে কাপড় ঠেসে দিয়েছিল। আমি তাকে আঁচড়েছি, কামড়েছি কিন্তু সে গ্রাহ্য করে নি। আমাকে বুকের ভেতর পুরে লোকটা ভাঙা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানেও আমি তার বুকেই ছিলাম। সেখানে গিয়েও আমি যুদ্ধ করেছি। এত দিনের অর্জিত সুনীতি-সংযম আর ঈশ্বর-বোধ থেকে কণা-কণা শক্তি সংগ্রহ করে প্রতি মুহূর্তে তাকে বাধা দিয়েছি কিন্তু ঐ দৈত্যের বিপুল শক্তির কাছে আমার শক্তি আর কতটুকু? তার বুকের ভেতর উথল-পাথল হতে হতে হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমার শরীর ক্রমশ ভারহীন হয়ে যাচ্ছে আর কিসের এক স্রোতে দ্রুত ভেসে যাচ্ছি। পাপ-পুণ্যের কথা তখন আমার মনে পড়ছিল না, যন্ত্রণার কথাও না। ছটফট করতে করতে আমি স্থির হয়ে গিয়েছিলাম; অতল সমুদ্রের মতন কি এক সুখের ভেতর আমার চেতনা ডুবে যাচ্ছিল। কতক্ষণ পর মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, মনে নেই। ফিরে ঘর বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সবাই ভেবেছে, দরজা বন্ধ করে আমি কাঁদছি। কিন্তু তা নয়; সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে নিজেকে আমি শুধু দেখেছি। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়েছি, নেশা ধরে গেছে। রাজহংসীর মতন গ্রীবা, সোনার আভা-মাখানো মসৃণ ত্বক, বুকের দুই পাহাড়চূড়া, দেহের বঙ্কিম রেখাগুলো, তার উঁচু-নীচু বিস্ময়, স্তম্ভের মতন দুই উরু—আমার স্বামী কোনদিন এদের মর্যাদা দেন নি। কিন্তু ঐ লোকটা—ঐ নিদারুণ দস্যু বুঝিয়ে দিয়েছে আমি নির্বাপিত হই নি; আমার কোমল লোভনীয় দেহের ভেতর এখনও আগ্নেয়গিরি বিদীর্ণ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। লোকটা আমার সর্বস্ব হননই করে নি, কিছু দিয়েছেও। সে যা দিয়েছে সুনীতি-সংযমের কোন গ্রন্থে, উপাসনার কোন মন্ত্রে তার অস্তিত্ব নেই। জীবনে এমন আনন্দের আস্বাদ আগে আর কখনও পাই নি। সেই কৃতজ্ঞতার বশে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। পঁচিশ টাকা রেখে গেলাম; যেভাবেই হোক শিবলকে মুক্ত করবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ—মেরী সুনন্দা যোশী।'

চিঠি শেষ করে মৃদু হাসলেন মিস্টার বন্দোদকর।

জুনিয়র উকিল যশোবন্ত বললেন, 'শিবলকে ডিফেন্ড করেছিলেন দাদা?'

বন্দোদকর বললেন, 'করেছি, কি করি নি, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এ গল্পে তা অবান্তর।' বলতে বলতে নীলকান্তর দিকে ফিরলেন, 'গল্পও বললাম, চিঠিও শোনালাম। এর থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, শুধু পরিবেশ নয়। পরিবেশই যদি হত, সুনন্দা যোশী শিবলকে ঘৃণা করতেন কিংবা মানসিক অসুস্থ বলে ক্ষমাও করতে পারতেন। কিন্তু ঐ রকম একখানা চিঠি লিখতেন না বা তাকে বাঁচাবার জন্যে মাঝরাতে আকুল হয়ে ছুটে আসতেন না।'

জড়ানো গলায় নীলকান্ত আস্তে কী বললেন, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

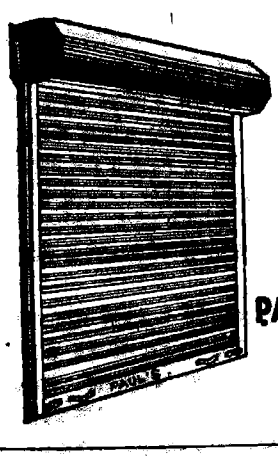
The modern way to security and protection
RING UP :—24-1527
PAUL'S ROLLING SHUTTERS & ENG. WORKS
1A/H/11, LIME STREET,
CALCUTTA-13.

রোজমেরির হত্যা রহস্য

বিশু মুখোপাধ্যায়

হত্যার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে যে কিভাবে জাগে, কেন যে সে নৃশংসতার দিকে এগিয়ে যায়, এ-প্রশ্ন আজ বহু মনস্তত্ত্ববিদকে দিশেহারা করে তুলেছে। পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলির মধ্যে এ নিয়ে নানা গবেষণাও আরম্ভ হয়েছে নানাদিকে।

প্রকৃতপক্ষে আয়ার্ল্যাণ্ডে যুবতী রোজমেরি রীনানের মৃত্যুর পর ও-দেশের গোয়েন্দা-বিভাগের গবেষকরা যেন আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। সত্যিই সে-মৃত্যু বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক। কিন্তু গোয়েন্দা-বিভাগ কিভাবে যে এই ঘটনার তদন্ত করে হত্যাকারীকে আবিষ্কার করেছিল, সে-কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি হত্যার ইতিহাসে ও-দেশে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

রোজমেরি রীনান আয়ার্ল্যাণ্ডের একটি গণ্ডগ্রাম ডানমোহনে তার বাপ-মার সঙ্গে বাস করত। ডানমোহন অঞ্চলটি ডাবলিনের খুব কাছাকাছি। সেখানকার স্থানীয় লোকদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষ-আবাদ। শিল্প-বাণিজ্যের দাপাদাপি সেখানে প্রবেশ করার বিশেষ সুযোগ পায়নি। গ্রামের লোকদের যেমন হয়ে থাকে, তেমনি সেখানকার লোকদের একটা সহজাত ধর্মবোধ ছিল এবং প্রাচীন আচার-ব্যবহারকেও তারা আঁকড়ে ধরেছিল সেই অতীত দিনের মত। প্রচলিত যানবাহনের মধ্যে সাইকেলই ছিল সেখানকার প্রধান পরিবহন যান; অবশ্য কেউ কেউ ঘোড়ার গাড়ি বা মোটর যে একেবারে ব্যবহার না করত, তা নয়।

রোজমেরির বাবা ছিলেন কাছাকাছি শহর ডানডকের একজন লরি-চালক। আর রোজমেরি নিজেও ঐ ছোট্ট বন্দর-শহরের একটি জুতোর কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করত। সপ্তাহে পাঁচদিন ছিল সেখানের কাজ। এই পাঁচদিনই বাড়ি থেকে সাইকেল করে সে যাতায়াত করত। বাড়ি থেকে এই পথের দূরত্ব ছিল মাইল ছ'য়েক অর্থাৎ যেতে তিন মাইল, আসতে তিন মাইল।

দেখতে রোজমেরি ছিল ভারী মিষ্টি। যেমন ছিল তার ভরাট সুডৌল দেহের গঠন, তেমনি তার চলনে-বলনে ছিল উচ্ছল যৌবনের ছাপ। সাধারণ ঘরের গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে সত্যিকার সুন্দরই বলা যেতে পারত তাকে। তার মাথায় ছিল একরাশ কুঞ্চিত কেশদাম, আর চোখে ছিল মায়ার মদিরা। আসলে রোজমেরির হাসিটাই ছিল নাকি সবচেয়ে মারাত্মক। তাকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করত সকলের। শুধু পুরুষই নয়, তার বয়সী বন্ধু মেয়েরাও ভালবাসত তাকে, হিংসে করত তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধুর লক্ষ্য করে।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই খেলাধূলায় তার বেশ নাম হয়েছিল। এই সময় যথারীতি একটি ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। ছেলেটির নাম ডেসমণ্ড ম্যাকফাডেন। সে থাকত ডানডকে। তার বয়স হয়েছিল কুড়ির মত। ম্যাকফাডেন একটি ভাল ফার্মে চাকরি করত এবং সে-চাকরিতে ভবিষ্যতে তার যথেষ্টই উন্নতি হবার সম্ভাবনা ছিল।

সাধারণ দৃষ্টিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, রোজমেরি রীনান যথাসময়ে বিবাহাদি করে সুন্দর, সহজ জীবন যাপন করবে, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র উনিশ বছর বয়সেই হঠাৎ একদিন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল—বীভৎসভাবে নিহত হল সে।

ঘটনাটি ঘটেছিল খুব বেশীদিন পূর্বে নয়, মাত্র ১৯৬৫ সালের ৫ মার্চ।

২ মার্চ মঙ্গলবার ডানডকে মহামান্য কার্ডিনাল কনওয়ে এসেছিলেন। সেই উপলক্ষে হ্যালোওয়ের জুতোর কারখানার লোকেরা সেদিন বিকালে ছুটি পেয়েছিল কার্ডিনালের বক্তৃতা শোনার জন্য। এর পরিবর্তে সপ্তাহের শেষ তিনদিন তারা একঘণ্টা করে বেশী খেটে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফলে, রোজমেরিকেও সেই ৫ তারিখের অশুভ শুক্রবারের দিনটিতে ৫টার পরিবর্তে ৬টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছিল, এবং তখন প্রায় সন্ধ্যাই হয়ে এসেছিল বলতে হয়। কিন্তু এই দেরীর জন্যে তার মনের প্রফুল্লতা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। কারণ, সে দিনটা ছিল তার টেলিভিশনে 'ক্রশ রোড' শোনার দিন। এই প্রোগ্রামটি ভারী প্রিয় ছিল রোজমেরির। প্রতি শুক্রবার সাড়ে ছ'টায় এই প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। তাছাড়া সেদিন ৯টার সময় তার বন্ধু ডেসমণ্ড ম্যাকফাডেনের আসার কথা ছিল তাদের বাড়িতে। এছাড়াও সে-দিনটা ছিল সপ্তাহের মাইনে পাওয়ার দিন। অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ভরতে-ভরতেই সে ভেবেছিল, শনিবার ঐ টাকা থেকে সে কিছু টাকা দিয়ে ছোট ভাই-বোনদের জন্যে কিছু খেলনা ও খাবার-দাবার কিনবে। তার সবচেয়ে ছোট্ট বোনটিকে ভীষণ ভালবাসত সে।

সেদিন ছুটির পর কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে রোজমেরি তার বড়বোন মিসেস মোরা স্মিথের বাড়িতে তার একটি বই ফেরত দেবার জন্য যায়, কিন্তু বইটি দিয়েই সে চলে আসে, এক কাপ চা খাবার জন্য পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। মোরা স্মিথ থাকত ডানডকের একেবারে শেষ প্রান্তে।

তার দিদি তাকে চা খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে রোজমেরি বলেছিল, 'আমাকে এখুনি পড়ি-কি-মরি করে যেতে হবে, তা নাহলে আজ আর আমার 'ক্রশ রোড' শোনার সময়ই হবে না!'

৬-১০ মিনিটের সময় দিদির বাড়ি থেকে সাইকেল করে বেরিয়ে যাবার মুখে আবার তার ভগ্নীপতি হ্যারি স্মিথের সঙ্গে তার দেখা। তিনি যখন সবেমাত্র কাজ থেকে বাড়িতে ফিরছেন। তাঁকে কোনরকমে হাসি-মুখে অভিবাদন জানিয়েই সে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দেয়।

বাড়িতে তখন রোজমেরির তিনটি ছোট ভাই-বোন তার জন্যে মুহূর্ত গুনছিল। দিদিঅন্ত প্রাণ তাদের। দিদি এলেই তার সঙ্গে তারা টেলিভিশনে ঐ ছয় রোড প্রোগ্রাম শুনবে ও দেখবে। কিন্তু কই দিদি কোথা? ঘড়ির দুটো কাঁটা ছ'টার ঘরে এসে এক হয়ে গেল, তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল বড় কাঁটাটা। দিদির জন্য আর প্রতীক্ষা না করে ওরা খুলে দিল যন্ত্রের চাবিটা। পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, আজ নিশ্চয়ই দিদি কোন জরুরী কাজে আটকা পড়েছে।

প্রথমটা রোজমেরির বাবা-মা সাড়ে ছ'টার মধ্যে তার বাড়িতে না ফেরার জন্য খুব বেশী বিচলিত হননি। কারণ, তাঁরা জানতেন, আজ রাত্রে ম্যাকফাডেনের সঙ্গে তার দেখা করার কথা আছে, কাজেই এমনও হতে পারে যে, তারা দুজনে হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কোথাও গিয়ে থাকবে।

কিন্তু সাড়ে ছ'টা থেকে ক্রমশঃ ঘড়ির কাঁটা যখন ৯টার ঘরে এসে পৌঁছল, ঠিক সেই সময় ডেসমণ্ড একা এসে হাজির হল ওঁদের বাড়ি। তার সঙ্গে রোজমেরিকে না দেখে চমকে উঠলেন তার বাবা-মা। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ডেসমণ্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়ের কথা।

কোথায় ওঁদের মেয়ে রোজমেরি?

ডেসমণ্ড হতবাক। বললে, সে কি! এখানেই তো তার সঙ্গে আমার ৯টায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট!'

'আমরা তো মনে করেছিলুম সে তোমার সঙ্গেই আছে।' বললেন রোজমেরির বাবা টমাস রীনান।

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে টমাস রীনান তাঁর বড় মেয়ের কাছে টেলিফোন করলেন রোজমেরির খবর জানবার জন্য। বড় মেয়ে তৎক্ষণাৎ জানাল যে, সে ৬-১০ মিনিটের সময় সেখান থেকে চলে গেছে।

ওদিকের ঐ পথটা অবশ্য খুবই নির্জন, অল্প কয়েকটা বসতবাটী যদিও আছে দূরে দূরে, তাহলেও সেখানকার কোন বাড়িতেই রোজমেরির অপেক্ষা করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

রোজমেরির বাবা-মা দুজনেই এরপর খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং ভাই-বোনদের মুখও যেন ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। নানা অমঙ্গলের কথাই ভাবতে লাগলেন মিঃ ও মিসেস টমাস রীনান ঃ তবে কি সে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কোন অঘটন ঘটিয়েছে? আবার এমনও হতে পারে যে, পাহাড়ের গায়ে হয়ত মাথা ঠুকে পড়ে গেছে, অথবা কোন গাড়ি চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে হাসপাতালে- নানারকম বিপদের আশঙ্কায় ছটফট করতে লাগলেন তাঁরা। এবং শেষপর্যন্ত বাড়িতে আর থাকতে না পেরে রীনান পরিবারের সকলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন রোজমেরিকে আশপাশে খোঁজার জন্য। বড় মেয়ের স্বামী হ্যারি স্মিথও ছুটে এলেন শ্বশুর-বাড়িতে এবং তিনিও ওঁদের সঙ্গে পড়শী-দের কাছে খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

জ্ঞান গোয়েরান নামে রোজমেরির একজন বান্ধবী কাছাকাছিই থাকত, তার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে সে তাদের বাড়ি থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে সাইকেলে আসতে-আসতে ৬-২৫ মিনিটের সময় রোজমেরিকে দেখেছে। এই সময় একজন যুবককে মোটর সাইকেল করে রাস্তায় যেতে দেখে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোন মেয়েকে এই রাস্তায় সাইকেল চেপে যেতে দেখেছেন কিনা। কিন্তু তিনি বললেন, '৬-৩০ মিনিটের সময় আমি এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি বটে, কিন্তু এমন কোন মেয়ে আমার চোখে পড়েনি।'

এই ধরনের অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত রাত একটু বাড়লে পুলিশে খবর দেওয়া হল।

সেদিন সারা রাত নিখোঁজ রোজমেরির দুশ্চিন্তায় রীনান পরিবারের সকলেরই প্রায় জেগে কাটল। স্নেহপ্রবণ দিদির জন্যে ছোট ভাই-বোনদের চোখেও ঘুম এলো না। সবচেয়ে ছোট সাত বছরের 'পপি' সারারাত ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল দিদির জন্যে। তাকে যত সবাই বোঝাতে লাগল, দিদি সকালে ফিরে আসবে, সে বলে না আসবে না। বলে আর কাঁদে 'দিদি' 'দিদি' করে।

সত্যিই রোজমেরি সকালে আর ফিরে এলো না। তবে তার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেল পরের দিন সকাল ৮-১০ মিনিটের সময়। তাদেরই বাড়ির কয়েক শত গজ দূরে, রাস্তার ধারে জলে-ভর্তি একটা ড্রেনের গর্তে পাথর-চাপা অবস্থায়! তার সাইকেলটিও পাওয়া গেল কাছেই একটি ঝোপের মধ্যে লুকোন।

মৃতদেহটি আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করলেন রোজমেরির ভগ্নীপতি হ্যারি স্মিথ। স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট জে জে বাইরন ও গোয়েন্দা-বিভাগের সারজেণ্ট জন ওডনোভান খবর পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ফটোগ্রাফারসহ। তারপর প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সমাধা করার পর ময়না তদন্তের জন্য সরকারী ডাক্তারকেও খবর দিয়ে লাস পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা।

নীচু ড্রেনের গর্তের মধ্যে রোজমেরির দেহটা এমনভাবে ভারী পাথর চাপা দেওয়া ছিল যে, দেহের সামান্য অংশই মাত্র দেখা যাচ্ছিল। এই পাথরগুলি ওপর থেকেই ড্রেনের মধ্যে তার গায়ে ফেলা হয়েছিল। সে উপুড় হয়ে পড়েছিল ড্রেনের জলের মধ্যে এবং বেশ কোড়েই জলের স্রোত বয়ে চলেছিল তার উপর দিয়ে। পরনে ছিল তার কালো স্ল্যাকস্ ও গায়ে নীল নাইলনের একটা জ্যাকেট। সাধারণত এই ধরনের পোশাক পরেই রোজমেরি অধিকাংশ সময় কারখানায় যেত।

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরা ড্রেনের গর্ত ও রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজা-খুঁজি করতে লাগলেন; কিন্তু কোন জায়গাতেই ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সে যাই হোক, এটা অনুমান করা মোটেই শক্ত হল না যে, সাইকেল চেপে বাড়ি আসার পথেই সে বাধা পেয়েছিল। হয় সে তার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাইকেলে থেকে নেমেছিল—যে-লোক সম্ভবতঃ মোটরে করে এসেছিল, অথবা কোন অপরিচিত দুর্বৃত্ত অতর্কিতে তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার মৃতদেহটিকে ড্রেনের জলে ফেলে, সেখানে পাথর চাপা দিয়ে চলে যায়। আর যাবার সময় তার সাইকেলটিকে কাছেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে যায়।

ময়না তদন্তের জন্য রোজমেরির দেহকে বিশেষ শবাগারে পাঠাবার আগে, সেইদিনই আরও বহু গোয়েন্দা-বিভাগের লোক এসে-ছিলেন অকুস্থলে। তাঁদের সঙ্গে পুলিশের ডাক্তার মরিস হিকে এসে রোজমেরি সম্বন্ধে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করলেন। সাময়িক-ভাবে এই রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল কিছুক্ষণের জন্য এবং পথচারীদেরও সে-পথ দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ রইল ততক্ষণ, যতক্ষণ ডাক্তার তাঁর পরীক্ষার কাজ শেষ না করলেন। ডাঃ হিকে যথাসাধ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষাকার্য শেষ করে বললেন, 'মেয়েটি গতকাল সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটের অল্পক্ষণ পরেই মারা গেছে। তার দেহে ছোটখাটো দু'-একটি আঘাতের চিহ্নও আছে বটে, কিন্তু এমন কোন ক্ষত-চিহ্ন নেই যাকে মারাত্মক বলা যায়। কিভাবে যে সে মারা গেছে, তা বলা খুবই শক্ত। খুব সম্ভব তার হত্যাকারী তাকে ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ঐ জলনালির গর্তের মধ্যে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে দেয়। জলের মধ্যে পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।' ডাঃ হিকে আরও অনুমান করলেন যে, তরুণীকে পাথর চাপা দেওয়ার পেছনে হত্যাকারীর দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমতঃ, দেহটিকে লুকিয়ে ফেলা, আর দ্বিতীয়তঃ, যদি সে জ্ঞান ফিরে পায়, তাহলেও সলিলসমাধি থেকে ত্রাণ পাবে না। এরপর মৃতদেহ আরও পরীক্ষার জন্য লোউথ কাউণ্টি হাসপাতালে পাঠান হল।

স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দারা আশ-পাশের জায়গাগুলি অন্বেষণ করে সেদিন আর এমন কিছুই পেলেন না যাতে হত্যা-কারী আবিষ্কারের সামান্য কিছুও হদিস পাওয়া যায়। যাই হোক রোজমেরির সাই-কেলটাকে যদি আততায়ী হাতে গ্লাভস না পরে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার গায়ে অবশ্যই আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে এই অনুমান করে পুলিশ যত্নসহকারে সেটিকে থানায় তুলে নিয়ে গেল। এবং সেইদিনই একটু বেলার দিকে ডাবলিন থেকে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA/CKS/15/1/68.

বিশেষজ্ঞদের ডেকে তাদের হাতে সে-ভার দিয়ে দেওয়া হল।

এরপর নানা জনকে আরম্ভ হল প্রশ্নের পালা। পুলিশ সুপার বাইরেন রোজমেরির মাকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেন না। মিসেস এলিজাবেথ রীনান মেয়ের এই নৃশংস হত্যা-কাহিনী শোনার পর থেকেই শয্যা নিয়েছিলেন এবং তাঁর কথা বলারও কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁর স্বামী মিঃ রীনান পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'রোজমেরিকে হত্যা করার পেছনে এমন কোন কারণ থাকতে পারে বলে তিনি মনেই করেন না, যার জন্যে কেউ তার প্রাণ নিতে পারে!' তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আরও বলেন, সে অত্যন্ত শান্ত ও লাজুক স্বভাবের গম্ভীর মেয়ে, ছ্যাবলামি বলতে যা বোঝায়, তা একেবারেই ছিল না তার মধ্যে। তাছাড়া এই ধরনের বিপদ থেকে নিজেকে দূরে রাখার বুদ্ধিও ছিল তার যথেষ্ট। কখনও বাজে ছেলেদের সঙ্গে ঘোরা-ঘুরি করে, একজনের উপর আর একজনকে ক্ষেপিয়ে তোলেনি সে। তার একমাত্র বাল্য-বন্ধু হল ডেসমন্ড ম্যাকফাডেন। এমন সৎ ও ভদ্র ছেলে সচরাচর দেখা যায় না! তার দ্বারা ওর কখনও কোন ক্ষতি হতে পারে না। ওদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা চলছিল।'

মিঃ রীনানের পরই মিঃ বাইরেন যখন ম্যাকফাডেনের সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে একেবারে ভেঙে পড়েছেই বলতে হয়। সে বললে, 'রোজমেরির সঙ্গে তার ভালবাসা ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাস থেকে। কিছু টাকা দুজনে জমাতে পারলেই তারা বিবাহ করবে এই স্থির ছিল। তার মত ভাল মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখিনি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সে অপর কোন ছেলের সঙ্গে কোনদিনও মেশেনি—আমাদের ভালবাসা ছিল খুবই গভীর।' এই কথাগুলি বলতে-বলতেই ফোঁপাতে লাগল ম্যাক-ফাডেন; তার দুচোখ বেয়ে অজস্রধারায় জল গড়াতে লাগল।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ম্যাক-ফাডেন আরও বললে, 'এই শুক্রবার রাত্রের তারিখটা ছিল তাদের কাছে খুব গুরুত্ব-পূর্ণ। অনেকদিন আগে থেকেই এই তারিখটিকে সে ঠিক করে রেখেছিল কোন সিনেমায় বা নাচ দেখতে যাবে বলে। সেদিনই ফোনে তারা কথাটা পাকাপাকি করে নিয়েছিল। টেলিফোনে যখন সে কথা বলল, তখন তাকে খুবই হাসিখুশি মনে হয়েছিল তার। সে ডানডকের আর একদিকে ঐদিন তার মা-বাবার সঙ্গে বিকাল ৫-৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত ছিল। কোনদিন তাদের মধ্যে ঝগড়া তো দূরের কথা, মন-কষাকষি পর্যন্ত হয়নি। এইসব বলতে-বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল ম্যাকফাডেন।

পুলিশের চোখে সাধারণত জল আসে না। এমন সত্যি-মিথ্যে অভিনয় তারা অনেক দেখেছে, তবু পুলিশ সুপার মিঃ বাইরেন যেন একটু অস্বস্তিবোধ করেই বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।' বলে তিনি ম্যাকফাডেনের 'অ্যালিবাই' (alibi) সম্বন্ধে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন ও মনে মনে এই সিদ্ধান্তই করলেন যে, রোজমেরির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার এই যুবক বন্ধুর কোন সম্বন্ধ নেই।

রোজমেরির ভস্মীপতি হ্যারি স্মিথ ও মিসেস স্মিথকেও প্রশ্ন করলেন পুলিশ। তারপর তাঁরা ডানমোহন অঞ্চলের প্রত্যেককে প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, যে জুতোর কারখানায় রোজমেরি কাজ করত, সেখানেও সারজেন্ট ওডনোভানকে পাঠালেন মিঃ বাইরেন। যে মেয়েদের সঙ্গে সে কাজ করত, তাদের কাছ থেকে কোন খবরাখবর যদি পাওয়া যায়, এটাও ছিল যেমন মিঃ বাইরেনের উদ্দেশ্য, তেমনি এটাও তিনি জানতে চান যে, সেদিন তাকে কেউ কারখানা থেকেই অনুসরণ করেছিল কিনা।

সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য চারিদিকেই আটঘাট বাঁধা হতে লাগল। গোয়েন্দাদের নানা অনু-সন্ধান চলতে লাগল সারা অঞ্চল জুড়ে।

পুলিশ-সুপার বাইরেন নিজেই রোজ-মেরির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অ্যানি গোগরানের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। গোগরানের বয়স বছর কুড়ি হবে, কিন্তু সে খুবই চালাক-চতুর মেয়ে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে অ্যানি বললে, 'সে রোজীকে ৬-২৫ মিনিটের সময় সাইকেলে চেপে আসতে দেখেছে। সেও তখন সাইকেলে চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল বিপরীত দিকে। সেদিন রোজী তাকে শুধু হাত তুলে 'উইশ' করেছিল মাত্র—ব্যস্ ঐ পর্যন্তই।'

'আচ্ছা সেই সময় তুমি কি অপর কারুকে রাস্তায় সাইকেল চেপে অথবা মোটর গাড়িতে যেতে দেখেছিলে?' বাইরেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু সময় নিয়ে মনে করবার চেষ্টা করে অ্যানি বললে, 'না, অপর কারুকেই সে দেখেনি। রাস্তা সে সময় সম্পূর্ণই নির্জন ছিল।'

'তুমি কি কোন গাড়ির শব্দও শোননি—কোন মোটর, বা দূর থেকে আসছিল?' পুলিশ সুপার আবার প্রশ্ন করলেন।

অ্যানি এবার যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। সে বললে, 'হ্যাঁ, আমি একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। রোজমেরির মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় গাড়িখানা তার কাছেই পড়ে ছিল। তবে তার মধ্যে কোন লোক ছিল না।'

'কি ধরনের গাড়ি?'

'একখানা পুরোন ছোট গাড়ি—অস্টিন বলেই মনে হয়।' উত্তরে অ্যানি বললে।

'কোন লোকই তার কাছে দেখনি তুমি?'

অ্যানি মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর দিলে। তবে সে বললে যে, 'সে-গাড়ির কালো রঙ ছাড়া লাইসেন্স নম্বর বা অন্য কোন কিছুই দেখেনি।'

ডানডকের রাস্তার শেষ সীমানায়, অর্থাৎ ঘটনাস্থল থেকে মাইলখানেক দূরে এক ভাটিখানার এই সূত্র ধরে নিতে গিয়ে মিঃ বাইরেন ঐ ভাটিখানার মালিকের কাছে শুনলেন যে, 'যদি ঐ গাড়িটা কাদা-মাখা একটা কাল রঙের পুরোন অস্টিন হয় তাহলে সেটা ফার্গাস ম্যাকসেনের গাড়ি বলেই মনে হয়।' তাছাড়া ঐ বারের মালিক আরও বললে যে, 'ঐ গাড়ির মালিক ও তার বাবা হ্যাগার্ডস্টাউনের কাছে একটা খামারে কাজ করে, আর সে থাকেও তারই কাছা-কাছি। গতকাল বিকালে সে এখানে এসে-ছিল।'

ফার্গাস ম্যাকাসেন সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলল ঐ 'বারের' মালিকটি। যেমন : 'ম্যাকসেন অবিবাহিত, তার বয়স আন্দাজ পঁচিশের কাছাকাছি। সে খুব বলিষ্ঠ ও মোটাসোটা ধরনের লোক, আর কথা বলে একটু বেশী-বেশী। তাছাড়া এমনিতে সে ভাল হলেও, যখনই একটু-আধটু ড্রিংক করে, তখনই তার অবস্থা জঘন্য হয়ে ওঠে। তার কয়েকজন সঙ্গীও আছে ঐ ধরনের। গতকাল বিকালে তাদের আমি দেখেছিলুম।'

'কটা আন্দাজ সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল?' বাইরেন প্রশ্ন করলেন।

'যখন মদের দাম দেবার জন্য তার আর টাকা ছিল না, তখন সে টাকা ধার করতে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ফেরাটা আর আমি দেখিনি।'

'তখন সময় কত হবে?' বাইরেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'আন্দাজ ৬-১৫ মিনিট হবে। মদের দোকানের মালিক উত্তর দিলে।

মিঃ বাইরেন সেখানে আর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে, তৎক্ষণাৎ অ্যানি গোগরানের বাড়িতে চলে এলেন এবং এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে ফার্গাস ম্যাক-সেনকে চেনে কিনা?

উত্তরে অ্যানি বললে, 'হ্যাঁ, সে তাকে চেনে। এখন মনে হচ্ছে সেদিন তার গাড়িই আমি রাস্তায় দেখেছিলুম তাহলে রোজ-মেরিও বাড়িতে ফেরার মুখে তার গাড়ির পাশ দিয়েই এসেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'রোজমেরি কি তাকে চিনতো?' প্রশ্ন করলেন বাইরেন।

'হ্যাঁ, তারা দুজনেই দুজনকে চিনত। তবে রোজমেরি তাকে মোটেই পছন্দ করত না। দুবছর আগে সে রোজমেরির পেছনে ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়াত। সন্দেহজনক ঐ লোকটা ওর সঙ্গ ছাড়ছে না দেখে রোজ-মেরির বাপ-মাও ভেবেছিলেন, হয়ত ওর সঙ্গে পড়ে রোজমেরিও মদ খেতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু ডেসমন্ড-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সে অবশ্য ম্যাকসনের ছায়াও মাড়াত না।' অ্যানি বললে

এরপর মিঃ বাইরেন দুজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে হ্যাগার্ডস্-টাউনের দিকে রওনা হলেন। ফার্গাস ম্যাক-সেনের তাঁরা দেখা পেলেন তার বাবার খামার বাড়িতে। খামারে কাজ করার পোশাকই পরে ছিল সে। পুলিশের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন কেমন হয়ে গেল। তার

চোখ রক্তবর্ণ, মুখটা থমথমে। একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা যেন বোধ করতে লাগল সে।

বাইরেন তার সঙ্গে ম্যাকসেনকে একবার থানায় যেতে হবে বললেন এবং জায়গাটা 'সার্চ' করার অনুমতি চাইলেন ম্যাকসেনের বাবার কাছে। এই অনুমতি চাওয়াটা সৌজন্য মাত্র। পুলিশ দুজনকে সেখানে রেখে, বাইরেন যুবকটিকে সোজা থানায় নিয়ে এসে তুললেন। থানায় এসেই তাঁর কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেল। ম্যাকসেনকে অত্যন্ত রূঢ়স্বরে তিনি বললেন 'আমরা তোমাকে রেজমোর রীনানের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছি। গতকাল সন্ধ্যার দিকে তুমি কোথায় কি করছিলে সব খুলে বলো—কিছু গোপন করার চেষ্টা করো না।'

মোটা ও উদ্ধত ম্যাকসেন বাইরেনের প্রশ্নে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই যেন বললে, 'আমার মনে হয় আপনি বোধহয় আগেই জেনেছেন যে, আমি গতকাল বিকালে পার্-এ ছিলুম ৬-১৫ মিনিট পর্যন্ত। ওখানে পঁচ-ছটা বা তার চেয়ে এক-আধ পেগ বেশীও 'জীন' হয়ত আমি খেয়েছিলুম ওখানে বসে। আর বেশী খাবার মত টাকা ছিল না আমার কাছে। আগে থেকেই আমার কাছে ওদের কিছু টাকা বকেয়া ছিল বলে, ওরা আমায় ধার দিতে আমায় রাজি হল না। তখন আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ধার করার জন্য বেরিয়েছিলুম। কিন্তু মাইল-খানেক যেতে-না-যেতেই দেখলুম গাড়িতে আর পেট্রোল নেই। ফলে, কাছেই একটি খামারে গিয়ে সামান্য তেল চাওয়ায় তারা আমাকে এক গ্যালন তেল ধার হিসাবে দেয়। সেই সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করায় বন্ধুর ওখানে আর না গিয়ে সোজাসুজি বাড়ি চলে আসি।'

'রাস্তায় তুমি রোজমেরি রীনানকে কি দেখেছিলে?' পুলিশ সুপার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আমার তেলের ট্যাঙ্কে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমি তাকে দেখে-ছিলুম।' উত্তরে ম্যাকসেন বললে।

'তুমি তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'তার সঙ্গে আর কি কথা আমি বলব! সে তো পরিষ্কার আমাকে একদিন বলেই দিয়েছিল, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখতে চায় না।'

'আমার মনে হয়, তুমি তাকে দাঁড় করিয়ে তার কাছ থেকে টাকা ধার চেয়ে-ছিলে। গতকাল দিনটা ছিল শুক্রবার; তুমি জানতে সে ঐদিন ক্যাশ টাকা সাপ্তাহিক মাইনে পায়। যদি সে তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করে থাকে, তাহলে তোমার মেজাজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে থাকবে!' মিঃ বাইরেন এই কথাগুলি অবশ্য একটু হাসি-হাসিভাবেই বললেন তাকে।

ফার্গাস ম্যাকসেন হঠাৎ যেন কেমন একটু গম্ভীর ও ভীত হয়ে গেল। তবু এতটুকু না দমে, কথাতে বাঁকি মিশিয়ে সে সরাসরি বলে বসল, 'আপনার যদি মনে হয়ে থাকে যে, আমি রোজমেরিকে হত্যা করেছি তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ভুল করবেন। আমি একটু মদ খাই বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই; মেয়েদের দিকে আমার নজর নেই। তাছাড়া আমি আপনাকে বলেছি যে, আমি তার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করি না। সেদিন যখন সে চলে যাচ্ছিল, আমি তখন কেবল হাত তুলে সাধারণ সৌজন্যরক্ষা করেছিলুম মাত্র। এর-পর আমার গাড়িতে তেল ফুরিয়ে গেলে, রাস্তার ধারে সেটা আমি রেখে গিয়েছিলুম। আমি কোন ধারণাই করতে পারি না যে, কেউ তাকে হত্যা করতে পারে।'

ম্যাকসেন পুলিশ সুপারের কাছে তখনই যে-লোকের কাছ থেকে সে পেট্রোল ধার নিয়েছিল, তার নাম করলে এবং তার কথা সত্য না মিথ্যা তা ঐ লোকের কাছে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে দেখতে বললে।

বাইরেন সাময়িকভাবে ম্যাকসেনকে থানায় আটক রাখার নির্দেশ দিয়ে, তখনই গাড়ি করে সেই খামার-বাড়ির চাষীর কাছে ছুটলেন। এসব ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করা বিপজ্জনক। ঐ চাষীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বললে যে, 'ম্যাকসেন সত্যি কথাই বলেছে—সে তার কাছ থেকে এক গ্যালন পেট্রোল ধার করেছিল, সোমবার সন্ধ্যার দিকে।' লোকটি আরও বললে, 'ম্যাকসেন তখন এমনই ব্যস্ত ছিল যে, সে তাকে তেল ধার দেবে কিনা সেটা ভেবে স্থির করতে তার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। কিন্তু ম্যাকসেন তাকে পাকা কথা দিয়েছিল যে, সে তেলটুকু নিয়েই সোজা বাড়ি চলে যাবে।'

থানায় ফিরে এসে বাইরেন স্থির করলেন যে, আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য ম্যাকসেনকে উপস্থিত কয়েকদিন আটকে রাখাই দরকার। কারণ, সত্যিই যদি সে তখন ঐরকম বেহিসেবী মাতাল হয়ে থাকে, তাহলে অনেক কথা হয়ত একেবারে তার মনে নাও পড়তে পারে।

এই সময় লোউথ কাউণ্ট হাসপাতাল থেকে, অর্থাৎ যেখানে রোজমেরির মৃতদেহ 'অট্যাপসি' করার জন্য পাঠান হয়েছিল, সেখান থেকে ডাঃ হিকে আবার ফোন করলেন। ফোনে তিনি জানালেন যে, ফুস-ফুসের পরীক্ষায় এটাই পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে যে, এই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। এছাড়া তার শরীরে ও মাথায় কয়েক জায়গায় যে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে, তা পাথরের আঘাত থেকেই হওয়া সম্ভব।

ডাঃ হিকে এ-কথাও গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টার্স-এ জানিয়েছিলেন যে, তার উপর যৌনলালসা পরিতৃপ্ত করার কোন চিহ্নও তিনি তার দেহে দেখতে পাননি। তাহলেও আক্রমণকারীর প্রধান উদ্দেশ্য এটা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

এই খবর পাবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে যে দুজন পুলিশ কর্মচারী নটকু ম্যাকসেনের বাড়িতে তদন্তকার্যে নিযুক্ত ছিল, তারা ফিরে এল। এসে হতাশার সঙ্গে বললে, 'ম্যাকসেনের বাড়িতে এমন কিছুই পাওয়া গেল না, যা থেকে তাকে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত করা যেতে পারে।'

এটা শুনে বাইরেন ম্যাকসেনকে থানা থেকে তখনকার মত ছেড়ে দিলেও, প্রত্যহ থানায় এসে তাকে একবার করে হাজিরা দিতে বললেন। অধিকাংশ খুনে ও আততায়ী মদ খেয়ে যে এই ধরনের কাজ করে, তা যেমন পুলিশের অজানা নয়, তেমনি মদ খাওয়ার জন্যে মেশার ঝোঁকেও এমন অনেক অভাবনীয় কাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক মানুষ যে করে বসে, তাও পুলিশ ভাল-ভাবেই জানে।

সন্ধ্যার দিকে ডানমোইন অঞ্চলে যেসব গোয়েন্দাদের গুপ্ত তদন্তকার্যের জন্য পাঠান হয়েছিল, তারা সব ফিরে এল এবং দুঃখের বিষয় কেউই এমন কোন খবর দিতে পারল না, যা থেকে এই হত্যাকাণ্ডের কোন হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তারা পঞ্চাশজনের বেশী লোককে এটা-ওটা জেরা করেছিল, কিন্তু কারুকেই সন্দেহ করতে পারেনি। তবে এই খবরটুকু শুধু মাত্র তারা জেনে এসেছিল যে, যেখানে রোজমেরির মৃত্যু ঘটেছিল, সেই অঞ্চলের মালিক হলেন বিধবা মিসেস ব্রিগেট হিগিনস। তিনি একাই ওখানে তাঁর একটি কটেজে বাস করেন। তাঁর বাড়ির একপাশে থাকে মার্ফি নামে এক চাষী পরিবার, আর অন্য পাশে থাকে সোরগান ফ্যামেলি। এরা কেউই এ-ব্যাপারে সন্দেহ করার মত লোক নয়।

সেদিন পরপর কয়েকটি হতাশ ব্যঞ্জক সংবাদ যখন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট বাইরেনকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত করে তুলেছে, তখনই অদ্ভুতভাবে তাঁর মনকে নাড়া দিল সার্জেণ্ট ও'ডনাভান-এর একটি বিশেষ সংবাদ। রাত্রি প্রায় নটার সময় তিনি রোজমেরি যেখানে কাজ করত, সেই জুতোর কারখানা থেকে ফিরে এলেন। তিনি এসে বললেন, 'আমি যদিও খুব বেশী কিছু জানতে পারিনি, তবে রোজমেরির একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করে প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়া সম্পর্কে মজার একটা কাহিনী শুনে এলুম। রোজমেরির এই বান্ধবীটির নাম প্যাট্রিসিয়া। সে ডানডাকের একটি যুবককে ভালবাসত। সেই যুবকটির নাম নোয়েল হোয়ে। প্যাট্রিসিয়া ও নোয়েলের মধ্যে বিবাহ হবে এমন কথাবার্তা চলছিল। রোজমেরিও যুবকটির কাছাকাছি থাকত। একদিন রোজমেরি প্যাট্রিসিয়াকে নোয়েল হোয়ে সম্পর্কে একটু সাবধান থাকতে বলে। প্যাট্রিসিয়া যখন এর কারণ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন সে বলে যে, নোয়েল হোয়ের আর একটি মেয়ে রয়েছে এবং তাকে দিয়েই ও সব সময় তুমি অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মেশ কিনা নজর রেখেছে। এই কথা শোনার পর প্যাট্রিসিয়া নাকি ঐ ছেলেটির সঙ্গে মেশামেশি বন্ধ করে দেয়। নোয়েল এ-খবরটা জানতে পারে যে, রোজমেরিই প্যাট্রিসিয়ার মন ভেঙে দেবার মূলে। তখন সে তার উপর ভীষণ রেগে যায় এবং এর প্রতিশোধ নেবে বলেও একদিন শাসায়।'

কাহিনীটি সমস্ত ঘটনার পটপরিবর্তন করে অন্য দিকে।

বাইরেন বলেন, 'এই তো, এই নতুন সূত্র ধরেই এখন এগুতে হবে আমাদের।' উৎসাহিত বোধ করেন তিনি।

প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনী থেকেই প্রথম জানা গেল যে, রোজমেরি রীনানের শত্রু ছিল। এর আগে পর্যন্ত এটাই সবার ধারণা ছিল যে রোজমেরিকে সবাই ভালবাসে—তার কোন শত্রু নেই।

মিঃ বাইরেন তখুনিই সার্জেন্ট ও'ডানোভানকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলছেন, নোয়েল নামের ঐ ছোকরাটি রোজমেরিদের ডানমোহন অঞ্চলেই থাকে কিন্তু ঐ নামের কোন ছেলে-ছোকরার কথা তো কেউই আমাদের বলেনি—রোজমেরির বাড়ির সংলগ্ন অঞ্চল তো প্রায় সমস্তই আমরা খোঁজখবর করেছি।'

ও'ডানোভান তখন বিষয়টা একটু বিশদ করে বললো, 'আসলে নোয়েল হোয়ে ডানডাকের লোক। কিন্তু তার দিদিমা ডানমোহনে রোজমেরির বাড়ির কাছে থাকে। যুবকটির বয়স একুশ বছর। সে একটা কারখানায় কাজ করত, কিন্তু এখন বেকার হয়ে পড়ায় প্রত্যহ তার দিদিমার বাড়িতে গিয়ে তাঁর কিছু কাজকর্ম করে দেয় এবং তার পরিবর্তে দুবেলার খাওয়াটা সেখান থেকে খেয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে।'

'হোয়ের দিদিমাটি কে?' বাইরেন প্রশ্ন করলেন।

'তাঁর নাম হল ব্রিগেট হিগিনস্। তিনি রোজমেরির বাড়ির খুব কাছাকাছিই থাকেন।' উত্তরে ও'ডানোভান বললেন।

বাইরেন তখুনিই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন যে, ঐ এই মহিলা। এঁর পরিচয় আগেই তিনি পেয়েছেন এবং সেখানে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেই অঞ্চলেরই মালিক ইনি।

পরের দিনই প্রত্যূষে বাইরেন, ও'ডানোভান ও আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার নোয়েল হোয়েলের আসল বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

সুঠাম সুন্দর চেহারার যুবক এই নোয়েল হোয়েল। মুখটা হাসিখুশি এবং ব্যবহার খুবই মিষ্টি। দেখে তাকে মনেই হয় না যে, তার দ্বারা হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, কোন অসৎ কাজ হতে পারে। কিন্তু ঝানু পুলিশ অফিসার বাইরেন লক্ষ্য করলেন, তার ব্যবহার যথাসম্ভব ভদ্র হলেও, কোথায় যেন একটা ভয় তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। কারণ, যখনই সে জানল যে, তাঁরা মিস রীনানের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্ত করতে এসেছে তখনই সে বেশ কিছুটা যেন থতমত খেয়ে গেল।

ও'ডানোভান প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করলেন, শুক্রবার সে তার দিদিমার বাড়িতে গিয়েছিল কিনা?'

'আমি এ-সপ্তাহের প্রতিদিনই সেখানে গিয়েছিলুম।' হোয়ে জবাব দিল।

'এ শুক্রবার ৬-৩০ মিনিটের সময় তুমি সেখানে ছিলে কিনা?' এবার তাকে বাইরেন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ঠিক সেই সময়ে আমি দিদিমার বাড়ি খড় কাটছিলুম বটে, তবে যতদূর মনে হয় ৬-৩০ মিনিটের আগেই ও-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলুম। আমি রোজমেরির মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি কখনও তাকে দেখিনি এবং জীবনে কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলিনি। ওদের পরিবারের একটি ছেলেকে মাত্র আমি জানি, সে রোজমেরির ভাই।' কথাগুলো একটানা বলে গেল নোয়েল হোয়ে।

বাইরেন তাকে তৎক্ষণাৎ ডানডকের গোয়েন্দা-দপ্তরে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। আর সার্জেন্ট ও'ডানোভান ও অন্যান্য গোয়েন্দা যাঁরা তার খোঁজে এখানে এসেছিলেন, তাঁদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন তন্নতন্ন করে বাড়িটা 'সার্চ' করার জন্যে। চীফ ইনস্পেক্টার জে ম্যাক্‌কনভিলকে ড্রসহেডের পল্লী থানা থেকে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স-এ ডাকা হল এবং তিনি আসার পর সম্পূর্ণ একাকী তাকে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ করলেন বাইরেন ও ম্যাক্‌কনভিল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে এই বেকার শ্রমিক যুবকটি একই কথা বলে চলল যে, সে রোজমেরির হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। নানা ধরনের ঘোরানো-ফেরানো প্রশ্নের মধ্যেও তার উত্তর ঐ এক। এই প্রশ্নের মধ্যে একবার ম্যাক্‌কনভিল তাকে চেপে ধরে বললেন, 'তোমাকে দেখলে যত ভদ্র, নির্দোষ বলে মনে হয়, তুমি মোটেই তা নয়। সমস্তটাই তুমি গোপন করছ! কিন্তু তুমি যতই চাপবার চেষ্টা করছ, আসল কথা না বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ এদিক-সেদিকে, ততই তোমার উপর সন্দেহ আমাদের বাড়ছে বেশী করে।'

এই ধরনের প্রশ্নের চাপে হোয়ে শুধু একবার বলেছিল, 'সে সেদিন শুক্রবার তার দিদিমার বাড়িতে রাত্রের আহারের জন্য ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত ছিল, তারপর সাইকেলে চেপে ডানডকে ফিরে আসে।'

ঠিক সেই সময় যে দুজন গোয়েন্দা নোয়েলদের বাড়িতে তল্লাস করার জন্য ছিলেন, তাঁরা ফিরে এলেন। শিকার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, মুখে তাঁদের এমনি ভাব। তাঁরা নিয়ে এলেন সদ্য রক্তের দাগ-লাগা একটা প্যান্ট ও একটা হ্যান্ডব্যাগ। প্যান্টটা হোয়ের আর হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে এমন কাগজপত্র ছিল, যাতে সেটি যে রোজমেরি রীনানের, তা সনাক্ত করা মোটেই কঠিন হয় না। শুধু তার সদ্য পাওয়া মাইনের খামটি পাওয়া যায়নি ওর মধ্যে।

গোয়েন্দা পুলিশের একজন বললেন, 'হোয়ের ঘরের মধ্যেই আমরা ওই প্যান্টটি পেয়েছি, আর হ্যান্ডব্যাগটিও সেই ঘরের মধ্যে এক কোণে লুকোন ছিল।'

মজা হচ্ছে এই যে, যুবক নোয়েল হোয়ে এতক্ষণ পুলিশের কাছে সবকিছুই অস্বীকার করে চলেছিল এবং করছিল দম্ভের সঙ্গেই, সেই এখন তার বিরুদ্ধে এইসব প্রমাণ হাজির করার পর থেকেই যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। পুলিশ সুপার বাইরেনের কাছে সে আলাদা একটা জবানবন্দী দিতে তখুনি রাজি হয়ে গেল।

পুলিশের ডায়েরীতে একজন অফিসার লিখে নিতে লাগল তার জবানবন্দী।

নোয়েল বললে, 'শুক্রবার দিন সে তার দিদিমার বাড়িতে খড় কাটার পর প্রায় ৬-১৫ মিনিটের সময় রাস্তার ওপারে একটা খামারবাড়িতে আমি একটা খবর দিতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফেরবার মুখে সোজা রাস্তা ধরব মনে করে যেই জলভর্তি ড্রেনের খাতটি লাফিয়ে পার হতে যাব, ঠিক সেই সময় ঐ জলের মধ্যে একটি মেয়ের দেহ দেখতে পাই। এই দেহ কিভাবে যে এখানে আসতে পারে ভেবে আমি খুবই ভয় পেয়ে যাই। সেই সময় আবার সামনের রাস্তায় একখানা গাড়িকে আসতে দেখে আমি পাশেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি। তারপর সম্ভবত ঐ মেয়েটিরই একটি সাইকেল সেখানে পড়ে থাকতে দেখে, আমি সেটিকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিই। এছাড়া ঐ সাইকেলটার কাছাকাছি একটা হ্যান্ডব্যাগ পড়েছিল, সেটিকে আমি কুড়িয়ে নিই। আর কি মনে করে জানি না, সেখান থেকে চলে আসার সময় ড্রেনের গর্তের মধ্যে পাথর ফেলে ফেলে মেয়েটিকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করি।'

এই পর্যন্ত বলার পর তাকে আরও জেরা করায় সে বললে, 'মেয়েটির তখনও হয়ত বেঁচে থাকা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার মনে হয়েছিল সে মারা গেছে।' এরপর নোয়েল হোয়ে আর কিছু বলতে সরাসরি অস্বীকার করে। তবু পুলিশ তাকে চাপ দেওয়ায় সে বললে যে, 'আমি যা জানি, যা ঘটেছে, তাই আপনাদের কাছে বললুম। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই—সব সাঁচ্চা।'

পুলিশের লোকেরা তার এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে সোজাসুজিই বললে যে, 'আমরা তোমার পুরোতন প্রণয়িনীর সঙ্গে কথা বলেছি। সে আমাদের কাছে তোমার সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কথা বলেছে। তুমি রোজমেরির উপর এজন্য খুবই রেগে যাও এবং তাকে এই বলে শাসাও যে একদিন তুমি তাকে দেখে নেবে—এ-কথা কি ঠিক নয়?'

এর উত্তরে হোয়ে একেবারে অস্বীকার করে আবার বললে, 'সে রোজমেরিকে কখনও দেখেনি এবং তার সঙ্গে জীবনে কখনও কথা বলেনি।' কিন্তু এই কথাগুলি বলার সময় গোয়েন্দা-বিভাগের লোকেরা ও মিঃ বাইরেন নিজে লক্ষ্য করলেন যে, ভয়ে তার হাত-পা বেশ কাঁপছে। তখন মিঃ বাইরেন অত্যন্ত মিষ্টি কথায় তার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'হোয়ে, এ অবস্থায় তোমার পক্ষে সব সত্যি কথা বলাই ভাল—তাতে তুমি নিজেও যেমন স্বস্তি বোধ করবে, আমাদেরও তেমনি তোমাকে অহেতুক কষ্ট দিতে হবে না।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে হোয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি সব সত্যি কথাই বলব—আমি জানি রোজমেরি রীদানকে, সেই শয়তানী করে আমার প্রণয়িনীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।' তারপর সে আরও অনেক কথা গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। পুলিশ অফিসারদের একজন আবার তার এই বক্তব্যগুলিকে দ্বিতীয় জবানবন্দী হিসাবে ডায়েরীতে নোট করে নিতে লাগলেন।

ভাঙা ভাঙা গলায় হোয়ে বললে, 'শুক্রবার দিন সন্ধ্যার দিকে যখন আমি দিদিমার বাড়ি খড় কাটছিলুম, তখন দেখি কি রোজমেরি সাইকেলে চেপে সেইদিকে আসছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এগিয়ে যাই এবং সাইকেলটা ধরায় সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। তার সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়। তারপর আমাকে এড়িয়ে যেই সে আবার সাইকেলে উঠতে যাবে, তখন আবার আমি তার সাইকেলটি ধরে ফেলি। সেই সময় রোজমেরি সাইকেলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং আমাদের দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়। আমি তখন তার কাছ থেকে সাইকেলটি কেড়ে নিয়ে তার দিকেই ছুঁড়ে মারি। সে ছুটে চলে যায় অনেকটা দূরে এবং সাইকেলের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পিছনে লাফিয়ে যেতেই ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় ওখানকার রাস্তায় একটা গাড়ি এসে পড়ায় আমি লাফ দিয়ে কয়েক গজ দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি এবং গাড়িটা দৃশ্যের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ ঝোপের মধ্যে বসে থাকি।'

এই সময় সম্ভবত একটু দম নেবার জন্যে নোয়েল হোয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে পুলিশের কাছে একটু জল চাইলে। তারপর জল খেয়ে সে আবার বলতে আরম্ভ করলে, 'ঝোপ থেকে বেরিয়ে রোজমেরির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, তার দেহটা ড্রেনের জল স্রোতের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমি তখন বুঝতেই পারিনি যে, সে জীবিত না মৃত। তখন আমি নিরুপায় হয়ে তার সাইকেলটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, কিছুটা সময় সেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর পাশের স্তূপাকার বড় বড় ভারী পাথর থেকে একটা-একটা করে ড্রেনের মধ্যে তার উপর ফেলতে আরম্ভ করি। সে সময় আমি কেন যে এটা করেছিলুম, তা আমি আজও বলতে পারব না। কিন্তু আমি যে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তাতে আর ভুল নেই এবং আমার এটাই মনে হয়েছিল যে, সে মারা গেছে। একটু পরে, পাশে পড়ে থাকা তার হ্যান্ডব্যাগটি নিয়ে আমি আমার সাইকেল করে বাড়ি চলে আসি।'

এরপর ঘটনার সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু তা হলেও, তবুও, হোয়ে তাকে হত্যা করে ড্রেনের মধ্যে ফেলেছে না ড্রেনের মধ্যে পড়ে সে মারা গেছে—পুলিশের কাছে তা পরিষ্কার হয় না, এবং পুলিশের এই ধারণা হয় যে হোয়ে তার দ্বিতীয় জবানবন্দীতেও কিছুটা যেন হেঁয়ালির মত রেখে দিয়ে যায়। এদিকে আবার ডাক্তারি পরীক্ষাতেও তার মৃত্যুর কারণ দেখান হয়েছে জলে ডুবে, দমবন্ধ হয়ে। যাই হোক পুলিশ সে-রাত্রে তাকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় কারাকক্ষে আটক রাখে।

১৯৬৫ সালের ৭ মার্চ সকালে আইনজ্ঞের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় তাকে। ডানডক-এর বিশেষ আদালতে 'পীস কমিশনার' পীটার পি ম্যাকডোনাল্ড-এর কাছে তরুণী রোজমেরি রীনানকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় নোয়েল হোয়েকে। তার পক্ষের উকিল তৎক্ষণাৎ তার বেলের জন্য এই বলে প্রার্থনা করেন যে, 'আইনতঃ আয়ার্ল্যান্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড যখন উঠেই গেছে, তখন বেলে তাকে মুক্তি দেওয়ায় বাধা নেই।'

কিন্তু কমিশনার ম্যাকডোনাল্ড হোয়ের কৌঁসুলির অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। নিজের যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন যে, 'যে পর্যন্ত না হত্যার অভিযোগের শুনানী সম্পূর্ণ হয়, সে পর্যন্ত তাকে ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডানডকের জেলা আদালতের বিশেষ অধিবেশনে এই হত্যাকাণ্ডের রোমাঞ্চকর শুনানী আরম্ভ হয়। প্রথম থেকেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় আদালত-গৃহ। নোয়েল হোয়েকে দেখার জন্য, রোজমেরির বয়ফ্রেণ্ড ডেসমণ্ড ম্যাকফাডেনকে এবং পার্ট্রিসিয়াকে দেখার জন্য প্রত্যহ অসংখ্য লোক ভেঙে পড়তে থাকে আদালতে। হোয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করার সময়, স্টেট প্রসিকিউটার মিঃ উডস্ ৩২ জন সাক্ষীকে জেরা করেছিলেন এবং ডাবলিনের পুলিশ ব্যুরো থেকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞরাও সাক্ষী দিতে এসেছিলেন আদালতে।

নোয়েল হোয়ের উকিল তাকে নানাভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে, বিচারকের কাছে এ-কথাও বলেছিলেন যে, 'পুলিশের জেরার চাপে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা যেভাবে তাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছেন, সে তার দ্বিতীয় জবানবন্দী দিয়েছে সেইভাবেই।'

কিন্তু মহামান্য বিচারক মিঃ ডানলেভি কৌঁসুলির কোন যুক্তি না মেনে, সুবক নোয়েল হোয়ের দ্বিতীয় জবানবন্দীর সমর্থনে এবং সাক্ষীসাবুদের বক্তব্য দৃষ্টে তার উপর সমস্ত অভিযোগ সত্য বলেই মেনে নেন এবং নোয়েল হোয়েকেই রোজমেরির হত্যাকারী বলে স্বীকার করেন।

এইখানেই এই রোমাঞ্চকর হত্যাকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

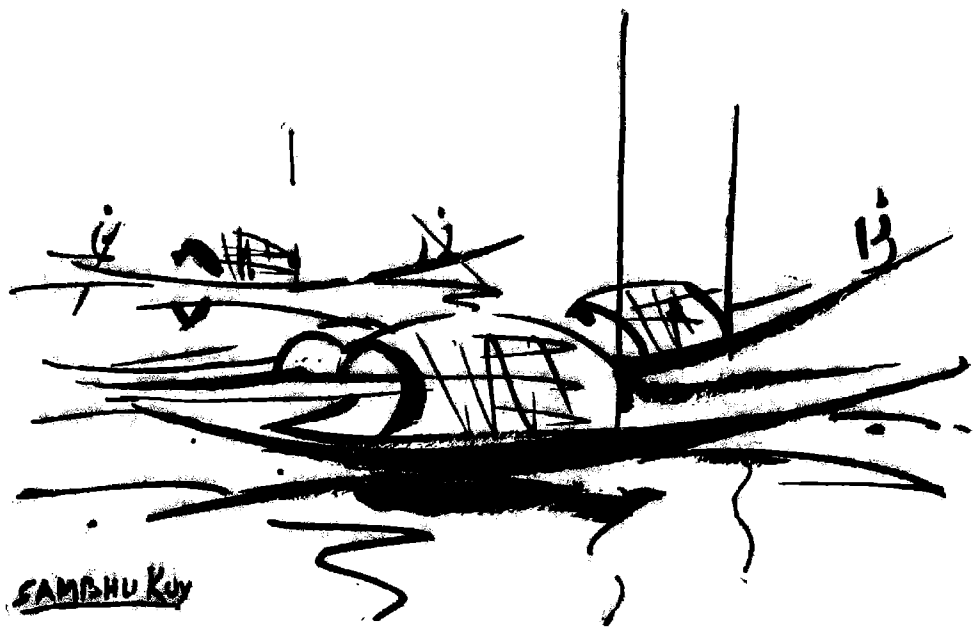

হারজিৎ

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

এই অশোক! দূর থেকে চাপা গলায় ডাকলো তনিমা। নতুন পরিচয় হয়েছে ওদের। এক সঙ্গে বি এ পড়ে ওরা। অবশ্য অশোকই ওর প্রথম পুরুষ বন্ধু নয়। সংখ্যাতীত বন্ধু ওর জীবনে যেমন আসে চলেও যায় তেমনি। একঘেয়ে জিনিস বেশী দিন ভালো লাগে না তনিমার। অন্য ছেলেরা বলে খেলার পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দিলো যেন তনিমা।

তনিমা সেন, শহরের নামকরা ধনীর একমাত্র মেয়ে। অবাধ মেলামেশায় বাধা নেই বাবার। তবে মা মিসেস সেনের স্বভাব যেন একটু কড়া। তোষামোদী পাওয়া তাঁর একটা হবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেটা পেলে তিনি শুধু মেয়েই নয়, সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। আর আছে তাঁর পোষা কুকুর টমি। তাকে যে ভালবাসবে তার জন্য সেনবাড়ীর দরজা সব সময় খোলা। যখন যাকে ভাল লাগে, তাকে তনিমা বাড়ী আনতে চায়।

কিন্তু কুকুর আর মিসেস সেনের দৃষ্টির সামনে দিয়ে কেউ সাহস করে না সেনবাড়ীর দরজা পেরিয়ে ভিতরে যেতে।

অথচ তনিমা সেনের সান্নিধ্য সব ছেলের গৌরবের। একে বড়লোকের মেয়ে তাতে সুন্দরী। নিত্য নতুন শাড়ীর বদল—গাড়ীর বদলও মাঝে মাঝে। তার কাছে মেয়ে বন্ধুর স্থান নেই। নক্ষত্রসম পুরুষ-বন্ধুর মধ্যে চাঁদের মতো আলোকিত হয়ে থাকে তনিমা।

ঠিক এমনি দিনে সবাইকে ডিঙিয়ে তনিমার নিকটতম হল অশোক। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে সে সবার সেরা। কথা বলে কম। কেমন যেন স্বপ্নালু চাহনি নিয়ে চায় তনিমার দিকে; মুগ্ধ হয়ে যায় তনিমা।

পোষাকে পরিপাট্য না থাকলেও অযত্ন অবহেলার এলোমেলো পোষাকে কেমন যেন ভাল লাগে ওকে। রুক্ষ একমাথা চুল চোখেমুখে ছড়ান, তার মধ্যে দিয়ে ঘুমজড়ানো চোখদুটো অশোকের হাসিতে ভরে থাকে। ওকে ছাড়তে মন চায় না তনিমার।

পার্কে-গঙ্গার ধারে, মনুমেন্টের নীচে কয়েকদিন ঘুরবার পর বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্য ব্যস্ত হয় তনিমা। এতদিন ত রাজী হয় নি কেউ। এবারে কিন্তু রাজী হ'ল অশোক। চোখে তার বিজয়ীর দৃষ্টি। যে দৃষ্টি হয়ত সংযুক্তাকে জয় করবার আগে ছিল পৃথ্বিরাজের চোখে, ঠিক তেমনি দৃষ্টি নিয়ে চার আনার বিস্কুট হাতে করে তনিমার গায়ে গা মিশিয়ে চলতে চলতে অশোক বলছে—

কুকুরকে আবার ভয় কি। তুমি দেখো কুকুর আর তোমার মাকে আপন করে আমি আবার ফিরে আসবো।

তনিমার পিছনে সেনবাড়ী ঢুকবার সংগে সংগে টমি তার বিরাট দেহ নিয়ে বিরাট চিৎকার করতে করতে বিপুল বিক্রমে ছুটে এসে একেবারে অশোকের দুটো কাঁধে দুটো পা তুলে বিরাট হাঁ করে যখন আস্ফালন করতে লাগলো তখন আতঙ্কে অশোকের আর্ত চীৎকারে গোটা বাড়ী ভরে উঠলো। ঠকঠক করে কাঁপছে সে।

নিমিষের মাঝে মিসেস সেন এসে দাঁড়ালেন হাসিমুখে। মিষ্টি করে ডাকলেন —টম্।

টমি অশোককে ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগলো। টমির গায়ে হাত রেখে মুগ্ধ হাসিতে তিনি বলছেন—

বড় দুষ্টু হয়েছ টমি।

মূর্তি হয়ে গেছে অশোক। তখনও কাঁপুনি থামেনি তার। পাশে দাঁড়িয়ে তনিমা বারবার ইঙ্গিত করছে—যাও—মাকে গিয়ে প্রণাম করো। টমির গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। বার করো তোমার বিস্কুট।

একি! মৃত ব্যক্তির মতো স্থির হয়ে গেছে যেন অশোকের চোখ। শূন্য চেয়ে আছে তনিমার দিকে।

মা—ও। তবুও ইঙ্গিত তনিমার। বলছে—

ভীতু কোথাকার, কী করে আশা কর সেনবাড়ীর একমাত্র জামাই হওয়ার? পারছ না মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্নালু চোখে তেমনি করেই মিষ্টি হাসি হাসতে?

এতক্ষণ পরে মিসেস সেনের দৃষ্টি পড়ল অশোকের দিকে—এমনি করে বললেন—

এসব ভীতু ছেলেদের এ বাড়ী নিয়ে এসো না বেবী। হার্টফেল করলে জবাব-দিহি করতে হবে।

টমিকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন মিসেস সেন।

হার্টফেল?—হ্যাঁ তাইতো। তনিমার চোখের সামনে বুঝি মাটিতে পড়ে যাবে অশোক। তাকে দু' হাত দিয়ে ধরে তনিমা বলছে ভয় কি অশোক, মা, টমি দু' জনেই চলে গেছে।

আবার হয়ত আসবে।

এবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে অশোক বললো—

আমাকে বাইরে নিয়ে চলো তনিমা।—

—তুমি ছেড়ে যাবে অশোক?

অশোক কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ভেতর দিকে আবার ভেসে এলো টমির সশব্দ চীৎকার। গোটা বাড়ী যেন ঝন-ঝন করে উঠলো।

না—আর দ্বিধাভয় নয়। তনিমার হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে পালালো অশোক। কুকুরকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসার পরীক্ষা দেবার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছে নেই তার।

চাঁদের দেশে

দিলীপ বসু

"... Tender is the night
And happy the queen moon
is on her throne,
Clustered around by all her
starry fays."

লিখেছিলেন কীটস্। কিন্তু কেবল তিনিই নন, গ্রীক কবি হোমার থেকে ভারতের কবি কালিদাস, এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই—সব দেশের বহু কবিই চাঁদের বর্ণনায় উদ্দীপ্ত। হোমার লিখছেন :

"The heavenly gleam from her immortal head circles the earth, and all beauty arises under her glowing light, and the lampless air beams from her golden crown, and the rays dwell lingering when air beams from her golden crown...." ইত্যাদি।

হোমারের চন্দ্র-স্তুতি খৃস্টজন্মের প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে লেখা; কিন্তু তৎকালীন চিন্তাশীল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক এলাক্সিম্যান্ডার (জন্ম ৬১০ খৃস্টপূর্ব) চাঁদের উৎপত্তি কী করে হোলো সে সম্পর্কে একটা থিওরী খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। খৃস্টজন্মের দুইশত বছরের মধ্যে সামোসের লুসিয়ান যখন প্রথম কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক কাহিনীতে (science fiction) চন্দ্রযাত্রার বর্ণনা দেন, তখন স্পষ্টই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, চাঁদ পৃথিবীরই মতো আরো একটা জগৎ, যেখানে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, মহাদেশ সবই আছে।

তা হলেও চাঁদ সম্পর্কে আধুনিক ধারণা ও জ্ঞানের শুরু গ্যালিলিওর সময় থেকে। গ্যালিলিওই প্রথম তাঁর স্বরচিত দূরবীণ বা টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদকে নিরীক্ষণ করে (১৬০৯-১০ খৃস্টাব্দ) বুঝলেন যে, চাঁদ আসলে আর একটি ছোট পৃথিবী, সেখানে পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকা রয়েছে কিন্তু বোধহয় জলাশয় বা সমুদ্র নেই। তাঁর সমসাময়িক কেপলার জানালেন : "কালো এলাকাগুলোকে (চাঁদের গায়ে, যাকে আমরা চলতি কথায় চাঁদের কলঙ্ক বলি) আমি সমুদ্র বলে মনে করি, আর জ্বলজ্বলে জায়গাগুলো নিশ্চয়ই চাঁদের জমি।"

১৬৪৭ খৃস্টাব্দে জ্যোতির্বিদ হেভেলিয়স তাঁর বিখ্যাত "সেলেনোগ্রাফিয়া" বা 'চাঁদের ম্যাপ' পুস্তকে চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের যে নামকরণ করেছিলেন ('মেঘের সমুদ্র' 'শিশিরের সমুদ্র' 'শান্তির সমুদ্র' প্রভৃতি) সেইগুলিই আমরা আজো ব্যবহার করে থাকি, যদিও আমরা এখন নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চাঁদে এক ফোঁটাও জল নেই এবং প্রাকৃতিক নিয়মের খাতিরে সেখানে জল থাকতেও পারে না। রেনেসাঁর যুগে এই নামকরণগুলি হয়েছিল বলে আমরা দেখছি, চাঁদের পর্বতমালার নাম দেওয়া হয়েছে ইয়োরোপের পর্বতগুলির নামানুসারে—এপেনাইন (চাঁদের এই পর্বতের উচ্চতা আমাদের মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও বেশী), আলপস্ প্রভৃতি—বাদ গেছে হিমালয়, আণ্ডিজ ইত্যাদি। গ্যালিলিওই প্রথম চাঁদের গায়ে এপেনাইন পর্বতের ছায়ার দৈর্ঘ্যতা মেপে এপেনাইনের উচ্চতা (৩০,০০০ ফুটেরও বেশী) ঠিক করেন।

যুগ্ম গ্রহ

চলতি ধারণা এবং হিসাবের জন্য চাঁদকে আমরা পৃথিবীর উপগ্রহ বলে থাকি। চাঁদের আয়তনের ও পৃথিবীতে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা ইত্যাদি মেপে একটা থিওরী বহুদিন চালু ছিল যে, সুদূর অতীতে একটা দারুণ বিস্ফোরণের ফলে একটা বড়ো অংশ ছিটকে বেরিয়ে চাঁদের সৃষ্টি করেছে, আর সেই গর্তটা জলে ভর্তি হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উৎপত্তি। খুবই চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ থিইরী। কিন্তু ধোপে টেঁকে নি। কারণ অতোবড়ো বিস্ফোরণ ঘটলে সারা পৃথিবীই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙা টুকরোগুলি গ্রহ-কণিকার মতো (যেমন মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে প্রায় ১,৫০০ গ্রহ-কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে) সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে।

তাছাড়া এতোদিন পর্যন্ত এবং এখনও সাধারণ চলতি হিসাবের জন্য বলা হয়ে থাকে যে চাঁদ পৃথিবী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতে মোটামুটি ২৯½ দিন সময় নেয়। এই ২৯½ দিনকে ১২ দিয়ে গুণ করে ১২টি চান্দ্রমাসে ৩৫৪ দিনে একটি পুরো চান্দ্র বছর ধরা হয়। ইস্‌লাম-ধর্মীয় পর্বের দিনগুলিকে ঠিক করতে এই চান্দ্র-ক্যালেন্ডারই চালু আছে বলে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে পবিত্র ঈদ প্রতি বছরই (সৌর বছর) ১১ দিন করে এগিয়ে আসে।

যাই হোক, চাঁদের উৎপত্তি যদি পৃথিবী থেকে হয়ে থাকে এবং চাঁদ যদি পৃথিবীরই চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত হয়, তাহলে চাঁদকে নিশ্চয়ই পৃথিবীর উপগ্রহ বলা যেতে পারে।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এরকম ঘটছে না।

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাধুনিক যে থিওরী চালু আছে (অটো স্মিড, হ্যারল্ড উরে প্রভৃতির) এবং নিশ্চয়ই গাণিতিক হিসাবে যেটা সবচেয়ে মিলে যায়, সেটাতে চাঁদ ও পৃথিবীর জন্ম একই লগ্নে এবং তাদের উৎপত্তির সূত্রও একই জায়গায় —মহাজাগতিক ধূলিকণা থেকে। স্থানাভাববশত সেটা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, চাঁদ পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে না; আসলে চাঁদ ও পৃথিবী একটা আলম্বের (fulurum) চতুর্দিকে পারস্পরিক প্রদক্ষিণরত, যে আলম্বের পয়েন্টটি পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে মোটামুটি ২৯৫০ মাইল দূরে অথবা ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১,০০০ মাইল নীচে। এই আলম্বের পয়েন্টটি সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে। অবশ্যই সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এই সূক্ষ্ম হিসাবের আমাদের দরকার নেই, গাণিতিক হিসাবে বাস্তব ঘটনা অবশ্য এটাই।

তৃতীয়ত, চাঁদের আয়তন পৃথিবীর প্রায় ০·০২০ বা ৫০ ভাগের এক ভাগ (৫,২৬০,০০০,০০০ ঘন-মাইল), ভর পৃথিবীর তুলনায় ০·০১২ বা প্রায় ৮১ ভাগের এক ভাগ থেকে সামান্য বেশী; চাঁদের ব্যাস ২,১৬০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কাজেই গ্রহ-পৃথিবীর তুলনায় এতো বড়ো উপগ্রহ-চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে, বিশেষ করে তার জলভাগে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত, খৃস্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীতেই গ্রীক পাইথিয়াস বুঝতে পেরেছিলেন যে, চাঁদের জন্যই পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি। অবশ্যই তখনকার দিনে মাধ্যাকর্ষণের থিওরী জানা ছিল না, কিন্তু পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের টান যে সবচেয়ে বেশী হয়, এইরকম কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করেই এটা বলা সম্ভব হয়েছিল।

এখন মোটকথা দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের পৃথিবীর তথাকথিত উপগ্রহটি (চাঁদ) তাহলে আকারে বেশ বড়ো, তার উৎপত্তি পৃথিবীরই সঙ্গে একই সূত্র থেকে এবং তার আকর্ষণের প্রভাব পৃথিবীতে বাস বেশ ভালোভাবেই অনুভূত হয়। এক কথায় আমাদের চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ না বলে **পৃথিবী-চাঁদকে যুগ্ম বা যমজ গ্রহ** বলা উচিত। যমজ তো বটেই, কারণ তাদের জন্ম তো একই লগ্নে।

পৃথিবীর শৈশব

চাঁদ-পৃথিবীর জন্ম একই লগ্নে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর অতীতে। মজার কথা হচ্ছে, এই সাড়ে চারশ কোটি বছরে পৃথিবীর বয়স বেড়েছে, কিন্তু চাঁদের কোন ক্ষয় হয়নি। অর্থাৎ, চাঁদে এখনও পৃথিবীর শৈশবেরই অবস্থা। কেন?

পৃথিবীর শৈশবের বাতাবরণের বহু পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল তার আঘাতে ও প্রভাবে পৃথিবীর পর্বতগাত্র মসৃণ হয়েছে জল-ঝড়ে জমির চেহারা বহু বদলে গেছে। সূর্যজাত

অতি-বেগুনী রশ্মির আঘাতে পৃথিবীর উপর অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল (সমুদ্রতলের ৪০ থেকে ১২০ মাইলের উচ্চের) আয়নিত; কাজেই সূর্যজাত অতি-বেগুনী রশ্মি তার অত্যধিক তেজঃশক্তি নিয়ে সরাসরি ভূপৃষ্ঠ অবধি নেমে আসতে পারে না বলে প্রাণী-জগৎ বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। স্থানাভাবে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে আমরা এক কথায় বলতে পারি, শৈশবের পৃথিবীর বহু লক্ষণ পৃথিবীতে চিরতরে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, আজকের পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর জন্ম-বৃত্তান্তের পুরো ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর সেজন্যেই কেবল পৃথিবী নয়, পুরো সৌরজগতের ৯টি গ্রহ ও ৩১টি উপগ্রহের উৎপত্তি নিয়ে তেমনি পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হোলো ইত্যাদি বহু বিষয়ে তর্কের আর অবধি নেই।

এইরকম বহু তর্কের মীমাংসা হবে যদি আমরা চাঁদে গিয়ে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা পৃথিবীর শৈশবকে জানতে পারি। আর তাহলেই কেবল পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত নয়, সমস্ত সৌরজগতের তথা হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি রহস্যের চাবি-কাঠিরই সন্ধান পাওয়া যাবে। পৃথিবীর যে কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই এটা দারুণ প্রলোভনের ব্যাপার নয় কি? আর সেজন্যই আমরা চাঁদে পাড়ি জমাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

আজকের পরিকল্পনা মাফিক কাজ চললে আমরা ১৯৭০ নাগাদ চাঁদে সশরীরে হাজির হবো। ইতিমধ্যেই অবশ্য আমাদের দূত, বেশ কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-স্টেশনকে চাঁদে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিরাপদে চাঁদের বুকে নেমে চাঁদের জমির খবর ও ছবি আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আর কয়েকটির সাহায্যে চাঁদের চির-অদৃশ্য উল্টোপিঠের ছবিও আমরা পেয়েছি, যার দ্বারা চাঁদকে আর থালার মতন নয় চাঁদের পুরো গ্লোব তৈরী করাই সম্ভব হয়েছে।

চাঁদে পাড়ি

চাঁদে মানুষের সশরীরে নিরাপদে পৌঁছবার সমস্যা ও তাদের সমাধানগুলি এবার এক এক করে আলোচনা করা যাক।

প্রথম সমস্যা : চাঁদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে গড়পড়তা ২,৪০,০০০ মাইল। সঠিক হিসাবে পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে চন্দ্র-কেন্দ্রের দূরত্ব ২,৫২,৭২০ মাইল থেকে ২,২১,৪৬৩ মাইল অবধি বদলায়। (চাঁদের পৃথিবী-পরিক্রমার কক্ষপথ নিশ্চয়ই উপবৃত্তাকারে)। পৃথিবীর জমি থেকে চাঁদের জমির ন্যূনতম দূরত্ব হচ্ছে ২,১৬,৪৩৩ মাইল। চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর বিষুবরেখার তল থেকে ২৩ ডিগ্রি হেলানো।

মোটকথা, পৃথিবী-চাঁদের এই ২,৪০,০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে সোজা পথে পাড়ি দেওয়া যায় না। কেন?

আগেই বলেছি, চাঁদের ভর পৃথিবীর তুলনায় ৮১ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। তাহলে বিপরীত বর্গক্ষেত্রের নিয়ম (universe square law) অনুসারে পৃথিবী-চাঁদের এই ২,৪০,০০০ মাইল ব্যবধানের ৯/১০ ভাগে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইলে থাকবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্য, আর (চাঁদের দিকে) শেষ ২৪,০০০ মাইলে থাকবে চাঁদের।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রগামী ব্যোমযানকে যাত্রা শুরু করে প্রথম ২,১৬,০০০ মাইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে কাটিয়ে যেতে হবে। সঠিক উপমা দিয়েই বলা যেতে পারে, ২,১৬,০০০ উঁচু খাড়া পর্বতের গা বেয়ে যেন ব্যোমযানকে তার শীর্ষদেশে আরোহণ করতে হবে।

তারপরের ২৪,০০০ মাইল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টানে যেন গা-ভাসিয়ে নেমে যেতে হবে। অর্থাৎ, ২,১৬,০০০ মাইল উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে পাহাড়ের উল্টো বা অপরদিকে ২৪,০০০ মাইল অবতরণ করলেই চাঁদের সাক্ষাৎ মিলবে।

ভালো কথা। তাহলে পৃথিবী থেকে যাত্রা করার সময়ে ২,১৬,০০০ মাইল উঁচু খাড়া (vertical) চড়াই উঠবার মতো গতিবেগ সংগ্রহ করা দরকার। একেবারে ঠিক ঠিক হিসাব ধরলে ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল গতিবেগ হলেই কাজ চলতে পারে, কিন্তু কিছু বাড়তি হাতে না রাখলে শীর্ষদেশ অবধি পৌঁছেও ছুঁই-ছুঁই করে শেষ অবধি শীর্ষদেশ অতিক্রম করতে না পারলে হড়কে পৃথিবীতে নেমে আসার বিপদ আছে। কাজেই ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগই আমাদের দরকার। আর প্রসঙ্গত, ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগে কোনো বস্তুকে পৃথিবী থেকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে সে বস্তু চিরকালের মতো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মহাকাশে ছুটে চলে যাবে: সে আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে না। একেই বলা হয়, 'পলায়নী গতিবেগ' বা (escape velocity!)

দ্বিতীয় সমস্যা : আচ্ছা, ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগে পৃথিবী থেকে যাত্রা করে ২,১৬,০০০ মাইল দূরে যখন আমরা "শীর্ষদেশে" * অতিক্রম করে চাঁদের জমির দিকে অবতরণ করছি, তখন আমাদের গতিবেগ নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। হিসাব মতো বৃদ্ধি পেতে পেতে ২৪,০০০ মাইলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের অপেক্ষাকৃত কমজোরী টানে ঘণ্টায় ৫,২৫০ মাইল গতিবেগে চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়বো।

* এখানে পৃথিবী ও চাঁদের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ বা টানাটানি নাকচ হয়ে যাচ্ছে—তাকে "নিউট্রাল পয়েন্ট" বলা হয়ে থাকে; বলা বাহুল্য, এই শীর্ষদেশ বা নিউট্রাল পয়েন্টটি সব সময়েই সামান্য স্থান পরিবর্তন করছে।

বলা বাহুল্য, এই ঘণ্টায় ৫,২৫০ মাইল গতিবেগকে রোধ করতে হবে। শীর্ষদেশ অতিক্রম করার পরে ব্যোমযানের মুখটাকে পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তাকে চন্দ্রের দিকে যেন পেছু হেঁটে চাঁদের জমির দিকে নামানো হবে। এই অবস্থায় চাঁদের জমি থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যদি ব্যোম-যানের রকেটের ইঞ্জিনকে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে রকেট-নির্গত গ্যাসের (চাঁদের জমির দিকে বিস্ফোরণ ঘটছে এখন, কারণ ব্যোমযান নেমে আসছে) প্রতিধাক্কায় ব্যোমযানটি চাঁদের জমির দিকে পতনের উল্টো দিকে যাবার চেষ্টা করবে। কাজেই চাঁদের মধ্যাকর্ষণে চাঁদের জমির দিকে অবতরণের গতিবেগ আর রকেট-ইঞ্জিনের উল্টো প্রতিধাক্কা—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে চন্দ্রগামী ব্যোমযানটি ধীরে ধীরে চাঁদের জমিতে অবতরণ করবে। নিশ্চয়ই হিসাবটি নির্ভুল হওয়া চাই।

তৃতীয় সমস্যা : চাঁদের জমিতে অবতরণের জন্য শক্ত জমি পাওয়া যাবে তো? চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই মহাকাশের উল্কাপিণ্ডটা বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় না, সরাসরি চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল না থাকাতে কোনো ঝড় এই টুকরোগুলিকে উড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে না। তাহলে কি, চাঁদের বুকে উল্কাপিণ্ডের ভাঙা টুকরো জমে জমে চোরাবালির পাহাড়ের মতো হয়ে আছে, যাতে ব্যোমযান অবতরণ করলে তলিয়ে যাবে?

যুক্তিসঙ্গত প্রতিপাদ্য। তবে আনন্দের কথা, আমাদের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-স্টেশন-গুলি চাঁদের বুকে নিরাপদে অবতরণ করে সেখানকার জমির ছবি ও রাসায়নিক উপাদানের তথ্য আমাদের কাছে পাঠিয়ে এই ভয় দূর করেছে। চাঁদে অবতরণের জন্য শক্ত জমি পাওয়া যাবে, তবে জমি ছোঁবার মুহূর্তের ধাক্কাতে যাতে সামান্যতম ক্ষতিও না হয় তার জন্য বিশ ফুট উঁচু চারটি শক্ত স্প্রিংয়ের পায়ার বন্দোবস্ত থাকবে। বলা বাহুল্য, যে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-স্টেশনগুলি চাঁদে নিরাপদে অবতরণ করেছে, তাতেও এই ব্যবস্থাই ছিল।

চতুর্থ সমস্যা : পৃথিবী ও চাঁদ, দুই-ই ভ্রাম্যমাণ; সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল বা সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ মাইল বেগে। চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের গতিবেগ ঘণ্টায় ২,২৮৭ মাইল বা সেকেণ্ডে প্রায় ৩/৫ মাইল। বাস্তব ঘটনা হল, পৃথিবী ও চাঁদ যুগ্মভাবে একটি অলক্ষ্যের চতুর্দিকে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে, একথা আমরা আগেই বলেছি। এর অর্থ হলো যে, পৃথিবী থেকে চাঁদে যাত্রাকালীন আমরা সূর্যের দারুণ মহাকর্ষকে উপেক্ষা করেই যাতায়াত করতে পারি, কারণ সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাব সমানভাবেই পৃথিবী ও চাঁদের উপর পড়ছে।

কিন্তু ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী থেকে চলমান চাঁদে কোনো বস্তুকে বা ব্যোমযানকে ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করা তাহলে যেন দুরন্ত ধাবমান মোটরগাড়ীর উপর আরূঢ় হয়ে উড়ন্ত পাখীকে গুলি করে মারা। মহাভারতের অর্জুনের মীনচক্ষুকে লক্ষ্যভেদ করা নিশ্চয়ই এর থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল; এক্ষেত্রে বীর্যশুল্কা হলেন স্বয়ং চন্দ্র। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা বার বার এটা করতে পেরেছেন, আর ভবিষ্যতে চন্দ্রগামী ব্যোমযানে যখন মানুষ যাত্রী হবে, তখন অবশ্য সবটাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াও যাত্রীরা প্রয়োজন মতো কক্ষপথের সামান্য অদল-বদল ক'রে নিতে পারবেন।

চাঁদে বৈজ্ঞানিকদের বাসস্থান

প্রথম যাত্রাতে চাঁদে পৌঁছে আমরা বড়ো জোর সপ্তাহখানেক থাকবো। এখানে অবশ্য সপ্তাহের হিসাব পৃথিবীর দিনের হিসাবে, ২৪ ঘণ্টাতে একদিন ধরে। চাঁদের নিজের চতুর্দিকে পুরো একবার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতে সময় লাগে মোটামুটি ২৮ দিন বা ২৮×২৪=৬৭২ ঘণ্টা। তাহলে এর অর্ধেক, অর্থাৎ ১৪ দিন (পৃথিবীর দিন) বা ৩৩৬ ঘণ্টা ধরে চাঁদের একপিঠ যখন সূর্যের দিকে ফেরানো, তখন অন্যদিকে রাত্রির অন্ধকার।

মজার কথা হচ্ছে, মোটামুটি এই ২৮ দিনে (বা ৬৭২ ঘণ্টাতে) চাঁদ একবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ ও সমাপ্ত করে বলে চাঁদের একটা পিঠই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ঘোরানো—কাজেই আমরা পুরো চাঁদের গোলকের অর্ধেকের সামান্য বেশী, শতকরা ৫৯ ভাগ দেখতে পাই। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্য একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেণ্ট করা যেতে পারে। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল ল্যাম্প রেখে যদি আমরা সবসময়েই তার দিকে চোখ রেখে (অর্থাৎ আমার শরীরের সামনের দিকটা ফিরিয়ে) একবার পুরো প্রদক্ষিণ করি, তাহলে দেখবো, যে সময়ে একবার টেবিল ল্যাম্পটাকে প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করলুম, ঠিক সেই সময়েই আমি নিজের চারধারে নিজেও একবার ঘুরে গেছি।

১৯৫৯ অক্টোবর মাস প্রথম এবং তার পরে কয়েকবার সোভিয়েত ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বে চাঁদের চির-অদৃশ্য উল্টো পিঠের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখছি, চাঁদের উল্টো পিঠ তার দৃশ্য পিঠের মতো অতো এবড়ো-খেবড়ো নয়। কেন, এ নিয়ে বহু তর্কের অবতারণা হয়েছে।

চাঁদের যে পিঠ ১৪ দিন বা ৩৩৬ ঘণ্টা ধরে সূর্যের আলোক পায়, তখন সেখানে তাপমাত্রা হয়ে দাঁড়ায় ২১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট, আর রাত্রির অন্ধকারের শীতলতার তাপমাত্রা নেমে শূন্য থেকে ২৪৩ ডিগ্রিতে পৌঁছায়। গরম ও ঠাণ্ডা এতো বেশী, যেটা আমরা পৃথিবীতেও কখনও স্বাভাবিক ভাবে কল্পনা করতে পারি না। চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। কাজেই সেখানে সূর্যালোকে তাপমাত্রা অতো উচ্চ, আর তাই আলোক থেকে ছায়াতে সরে গেলেই চাঁদে রাত্রির অতো শীতলতা পাওয়া যাবে। এতো উচ্চ-নীচ তাপমাত্রা পাশাপাশি পাওয়া যাওয়াতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভূতপূর্ব সুবিধা।

তাছাড়া চাঁদ একেবারে বায়ুশূন্য হওয়াতে (অতো ভালো ভ্যাকুয়াম পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে করা সম্ভব নয়। নানারকম নতুন রকমের বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট করারও অভূতপূর্ব সুবিধা। আর এই ভ্যাকুয়ামের জন্য মহাকাশের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জ প্রভৃতিকে নিরীক্ষণ করারও যে সুযোগ আমরা পাবো, আর কিছু না হোক অন্তত তার জন্যও চাঁদে যাওয়া আমাদের একান্ত দরকার। এই পৃথিবীর নাইট্রোজেন-অক্সিজেন ভর্তি ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি বহুদূর যেতে পারলেও অপর গ্রহের ছবি বা দৃশ্যবস্তুর প্রতিচ্ছায়া ঝাপসা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষাকৃত এতো নিকটে থেকে (পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব গড়পড়তা চার কোটি মাইল) আমরা এখনও তার জমিতে 'খাল' আছে কি নেই, মঙ্গলের গ্রীষ্মে তার ধূসর অঞ্চলের রংয়ের আসল কারণ কি ইত্যাদি কিছুই সঠিকভাবে বলতে পারি না। চাঁদে একটা সাধারণ জ্যোতির্মানমন্দির (অবজারভেটরি) বসাতে

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

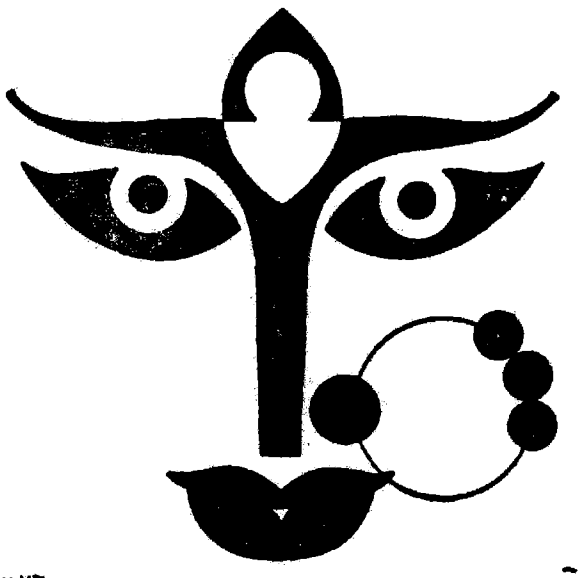

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য **ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট** খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।
প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পূজার সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ টাকার গুণিত অধিক পরিমাণ টাকাও জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস :
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৯৫টিরও অধিক শাখা আছে

Before Therapy

After Therapy

পারলেও মঙ্গলে পৌঁছবার বহু পূর্বেই এইসব প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যাবে।

অতএব আমাদের পরিকল্পনা কেবলমাত্র চাঁদে গিয়ে, সেখানে যাকে বলে খানিকটা বেড়িয়ে-চেড়িয়ে (যেন দেশভ্রমণ করে) কৌতূহল চরিতার্থ করে ফিরে আসা নয়। আমাদের ক্রমশই সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ছোটো মতো একটি বৈজ্ঞানিক কলোনী গড়ে তুলতে হবে।

অবশ্যই চাঁদে সাধারণভাবে বেড়িয়ে বেড়ানো বা বসবাস করা সম্ভব নয়। চাঁদ একটি মরা জগৎ, সেখানে রূপ-রস-শব্দ-বর্ণ-গন্ধের সমারোহ পাওয়া যাবে না। বায়ুমণ্ডল নেই অতএব অক্সিজেন এবং বায়ুর চাপ বজায় রাখতে আমাদের মহাকাশের উপযোগী পোশাক (স্পেস-স্যুট) পরে ছোটো রেডিও মারফৎ কথাবার্তা বলতে হবে। তাতে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে অন্যান্য ভাবে কথা বা বিশ্রম্ভালাপের অসুবিধা থাকলেও অন্যান্য কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

বায়ুমণ্ডল না থাকাতে অতলস্পর্শী নিস্তব্ধতা; আর রঙের বাহার থাকবে না, হয় শাদা না হয় কালো। তার ওপর তাপ-মাত্রার তারতম্য এতো বেশী, হয় দারুণ গরম (সূর্যালোকে), না হলে দারুণ ঠাণ্ডা (চাঁদের দীর্ঘ ৩৩৬ ঘণ্টা রাত্রির পূর্বেই আমরা অবশ্য গোড়ার দিকে পৃথিবীতে ফিরে আসবো)। আর চাঁদের জমির উপরে উল্কাপিণ্ডের আঘাত এতো বেশী হতে পারে যে, তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তাই আমাদের বৈজ্ঞানিক কলোনীকে গড়ে তুলতে হবে চাঁদের জমির নীচে। সেখানে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সাধারণ আরামের ব্যবস্থা করে একটি ছোটো 'নকল পৃথিবী' গড়ে তুলতে হবে।

এমন কি নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা ও নিঃসৃত প্রশ্বাসের কারবন ডাই-অক্সাইডকে সরবার ব্যবস্থা করার জন্য ক্লরেলা নামে এক ধরনের শ্যাওলা চাষের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তেমনি ক্লরেলা উদ্ভিদ থেকে প্রোটিন উৎপাদন করা যেতে পারে এবং ক্লরেলার চাষ করার জন্য সূর্যালোক ও আমাদের শরীরের নির্গত নাইট্রোজেনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে। এক কথায়, এই নকল পৃথিবীতে (চাঁদের জমির নীচের বৈজ্ঞানিক কলোনীতে) পৃথিবীর অক্সিজেন-কারবন ডাইঅক্সাইড চক্র ও নাইট্রোজেন চক্রের মতো একটি বাস্তব্য (ecological) স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

উপরে আমরা যা লিখলাম, তা আর মোটেই গল্পকথা বা কাল্পনিক কাহিনী নয়। প্রথম দিকে চাঁদের একই স্থানে বারবার অভিযান পাঠিয়ে (খুব সম্ভব "চাঁদে বৃষ্টির" সমুদ্র বলে যে উপত্যকা আছে সেইখানে) আস্তে আস্তে একটি বৈজ্ঞানিক কলোনী স্থাপিত হবে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করারও অভূতপূর্ব সুবিধা। চাঁদের আকাশে (অবশ্য বায়ুমণ্ডল নেই বলে চাঁদের আকাশ বলতে আলাদা কিছু নেই) আমাদের আকাশের পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে বারোগুণ বড়ো পৃথিবী ভেসে আছে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসমুদ্রের চেহারা পরিষ্কার দেখা যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, চাঁদে প্রকৃতি বড়ো নির্মম, প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে চরম আঘাত হানতে উদ্যত, একটু অসাবধান হলেই মৃত্যু অনিবার্য।

চাঁদের অভিযাত্রীরা ঐ প্রতিকূল পরিবেশে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে প্রথমেই এটা বুঝে নেবে যে, তারা ঐ পৃথিবীরই সন্তান, কোনো বিশেষ দেশের নয়। সে ঐ দূরের পৃথিবীতে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সুন্দর জীবনকে ছেড়ে এসেছে মহত্তর জ্ঞানের বিস্তারে। চন্দ্রজয়ের সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে বার বার সে তাই প্রণতি জানাবে পৃথিবীকে—"তোমার অযুত নিযুত হংসস্ত সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে যে বিপুল নিমেষ-গুলি উন্মীলিত হতে থাকে

তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্যে যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার
একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের
মধ্যে যায় মিশে।
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
(শ্রীম-কথিত)
সাধারণ — ২৬, কাপড়ে — ৩১,
কথামৃত ভবন
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৬

অধ্যাপক ডি কে রায় এম-এ প্রণীত
এ গাইড টু ডিগ্রি ইংলিস
(ইংরেজী ১ম ও ২য় পত্র ১৯৬৮
প্রশ্নোত্তরসহ) কলা ও বাণিজ্য ৪·৫০ পঃ
এ গাইড টু জুলিয়াস সীজার
(পাঠ্যপুস্তক প্রশ্নোত্তরসহ) ৪·৫০ পঃ
ই. সি. আই. পাবলিকেশনস্
২২।এফ, শংকর ঘোষ লেন, কলিঃ—৬

পূজার অবকাশে
দার্জিলিং
আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে।
স্নো ভিউ হোটেল
মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভ্রমণ বিলাসীদের জন্য ইহাই একমাত্র
আদর্শ আবাসিক হোটেল
(পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন)
ফোন : দার্জিলিং ৪০

মধুরা

ভেড়িটোলার কাঠের সেতুটার নীচে মালগাড়ীগুলি। মাল নিচ্ছে, মাল তুলছে। পাশেই একটা বড় ফটক। আকাশের ভোরের তারাগুলি একে একে ডুবে গেলো। পুব দিকে সোনা রোদের আভা। মধু পা টিপে টিপে ছেঁড়া বস্তাটা নিয়ে ফটকের ভেতর ঢুকলো। পায়ের ফ্রকটা চারদিকে ছেঁড়া, তার ফাঁকে ফাঁকে গায়ের হলুদ রঙের ছটা বার হচ্ছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাজল কালো দুটো চোখ। আরো কটি ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে ছিলো। কিন্তু এরা তার সঙ্গী সাথী নয়, এটা তার মুখ দেখলে বোঝা যায়। আস্তে আস্তে মধু তার বস্তাতে কয়লার বিরাট বিরাট স্তূপ থেকে শুধু গুঁড়োগুলি ভরে নিলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো—রোদে ভরে গেছে। ভীরু চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফটকের বার হয়ে এলো মধু।

তখনকার দিনের এল এম এফ ডাক্তার উমানাথ রায়। বরিশালে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর বাস্তুহারা হয়ে কল্পুর বাগানের বস্তিতে এসে পনেরো টাকায় ঘর ভাড়া নিলেন। ছ মাসের মধ্যে স্ত্রী মারা গেলেন। একমাত্র এগারো বছরের মেয়ে মধুরাকে নিয়েই তাঁর সংসার। ইদানীং তাঁর চোখদুটো প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছে। মধুরা পাশের বস্তীর মেয়েদের দেখে গোবর আর কয়লার গুঁড়ো কুড়োতে শিখেছে। উমানাথবাবুর বুক ফেটে যায়—তাঁর একমাত্র বুকের ধনের দুর্দশা দেখে। কিন্তু উপায় কি তাঁর?

ভোরবেলায় কয়লার গুঁড়ো এনে, হাত-পা ধুয়ে বাবাকে যা থাকে খেতে দেয়, নিজেও হয়তো কিছু মুখে দেয়। তারপর আবার ঝুড়ি নিয়ে পাশের খাটাল থেকে গোবর আনতে যায়। বাড়ীতে যা থাকে তাই রান্না করে বাবাকে খেতে দেয়, নিজে খায়। তারপর সারাদিন চলে তার গুলে দেওয়া আর ঘুঁটে দেওয়া এ পাশের মাঠটায়।

এদিকে দিন দিন উমানাথবাবুর চোখ আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কেউই তাঁকে চিকিৎসার জন্য ডেকে নিয়ে যায় না। আর ডাকবেই বা কেন? আজকাল ত্রীম বি বি এস পাশ করা ডাক্তারের অভাব নেই, কাজেই লোকের কাছে আগেকার দিনের এল এম এফ পাশ করা ডাক্তারের দাম কি? তার উপরে আবার প্রায় অন্ধ তিনি।

বাড়ীওয়ালা হিন্দুস্তানী হলেও তার মায়াদয়া আছে। চার মাসের ভাড়া বাকী, তবুও কিছু বলে না। বরং তার স্ত্রী মধুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়, চুল বেঁধে দেয়। কিন্তু পাশের মুদীখানার দোকানী রোজই বকাবকি করে বাকী পাওনার জন্যে। মধু বাবার এই অপমান সহ্য করে, আর নীরবে চোখের জল ফেলে।

তেরো বছর বয়সেই মধুকে গোবর আর কয়লার গুঁড়ো আনতে হয়। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে মনে হয় পনেরো ষোল বছর ওর বয়স। অত অনাহার আর খাটুনিতেও রূপ যেন ফেটে পড়ছে। রাস্তায় নোংরা লোকগুলো ওকে দেখে নানারকম কুৎসিত ইঙ্গিত করে। রাস্তার কলে জল নিতে গেলে ও পাড়ার ভবেন—যার বৌ ছেলে আছে, সেও মাঝে মাঝে বলে, "চল না মধু, তোকে ঘর ভাড়া করে সুখে রাখবো।"

অবাক হয়ে মধু ভাবে—ঘর তো ভাড়া করেই আছে। তবে কেন ভবেনকাকা এমন কথা বলে!

সেদিন মধু রাত থাকতেই উঠে বস্তাটা নিয়ে ভেড়ীটোলার পোলের তলায় এলো। বড্ড অন্ধকার। ফটকের ভেতর ঢুকতেই গাটা ছমছম করে উঠলো। আস্তে আস্তে গুঁড়োগুলো বস্তায় ভরতে আরম্ভ করেছে—কে যেন তার মুখটা চেপে ধরলো। চেঁচাতে গিয়েও পারলো না মধু। তিন চার জনে ধরে তাকে ট্যাক্সিতে তুললো। মধু তখন নিঃসাড়, অজ্ঞান।

চারদিন পরে জ্ঞান হতে মধু দেখে, সে একটা মেঠো বাড়ীতে শুয়ে আছে। শুধু বছর পঞ্চাশের একটি স্ত্রীলোক তার পাশে বসে আছে। বিচিত্র তার বেশভূষা। কান বড় বড় দুটো মাকড়ী—মাথার চুলগুলো একেবারে টিকিতে বাঁধা। বিশ্রী কালো দাঁত বার করে হেসে বললো, "মা ভয় কোর না। আমি তোমার মাসী হই। ভবেনবাবুই তোমাকে এনেছে। সে খুব সুখে রাখবে মা তোমায়।"

ভবেনের নাম শুনেই মধুর মুখ শুকিয়ে গেলো। বলল, "মাসী, তুমি আমায় ছেড়ে দাও। আমার বাবা আমায় না দেখলে মরে যাবে।"

বলেই আবার অজ্ঞান হয়ে গেলো।

এইভাবে প্রায় তিন মাস কেটে গেলো। মধু ঐ নোংরা জায়গায় বন্দিনী হয়েই রইলো। রোজ নানা প্রলোভন। চারদিকে হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ। কোন সুযোগই মধু পায় না যে, ডানা মেলে বনের পাখী বনে উড়ে যাবে। সেদিন রাত তখন দুটো। সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ। নোংরা পল্লীর লোকগুলো ক্লান্ত হয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মধু আস্তে আস্তে উঠে দরজায় হাত দিয়ে বুঝতে পারলো, মাসী আজ নেশার ঘোরে তাকে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিতে ভুলে গেছে।

'ঠাকুর আমায় রক্ষা করো'—মনে মনে এই কথা বলে একেবারে সদরে ট্রাম রাস্তায়। এরপর মাত্র একবার চকিতে এদিক ওদিক চেয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো। কোনও হুঁস নেই, ছুট-ছুট-ছুট। একেবারে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে পড়ে আবার ছুট।

ক্যাচ করে গাড়ীর ব্রেক কষার শব্দ হলো। গাড়ীর ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষেছে, কিন্তু? অত রাতে লোক নেই রাস্তায়, শুধু ব্রেক কষার শব্দে রাস্তাটা যেন একবার শিউরে উঠলো। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে দেখলো, না মরেনি, চাপাও পড়েনি, শুধু কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে। আস্তে আস্তে গাড়ীর পিছন দিককার সিটের দরজা খুলে মধুকে শুইয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো ড্রাইভার, তারপর ষ্টার্ট দিলো গাড়ীতে।

গাড়ীর মালিকই গাড়ীর ড্রাইভার। তার সুদীর্ঘ দেহ ও সুশ্রী মুখ দেখে মনে হয় সে খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক। নাম তার সুদীপ সেন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই সুদীপ তার বাড়ীতে পৌঁছে গেলো। দরোয়ান এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। সুদীপ দরোয়ানকে বললো, "বৌরাণীকে নীচে ডেকে আনো, বলো আমি ডাকছি।"

দরোয়ান একটু অবাক হলো। ভাবতে লাগলো, দাদাবাবু এত রাতে ধরমতলায় মায়ের জন্য ওষুধ আনতে গেলেন। আবার এখন ফিরে এসে বৌরাণীকে নীচে ডাকছেন কেন?

দরোয়ানের ভাব দেখে সুদীপ একটু ধমকের সুরে বললো, "তোমায় অত ভাবতে হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি বৌরাণীকে ডাকো।"

সুদীপের উপরে যেতে দেরী হচ্ছে দেখে ইতিমধ্যে রচনা নিজেই নীচে নেমে এসেছে। সুদীপ বললো, "দেখ আমার গাড়ীতে ধাক্কা খেয়েছে একটি মেয়ে। আমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে তোমার কাছে তাকে এনেছি।"

গাড়ীর আলো জেবলে দুজনেই দেখলো। তখনও জ্ঞান হয়নি মধুর। কপাল দিয়ে তখনও অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রচনা কপালটা নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিলো। সুদীপ দেহটা দুহাতে ধরে তুলে এনে নীচের ঘরের সোফায় শুইয়ে দিলো। রচনা মধুকে একটু ব্যান্ডি খাইয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। তারপর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে থেকে ভাবলো— এ যে সত্যিই একটা নিখুঁত প্রতিমা।

মধুরার জ্ঞান ফিরে এলো পরদিন সকালে। সুদীপের স্ত্রী রচনা মধুকে ভুলিয়ে ও আদর করে সব কথা জেনে নিলো। সুদীপকে রচনা মধুরার বাবার ঠিকানা দিয়ে বললো, "খবর নিয়ে দেখো, ভদ্রলোক এখনও ওখানে আছেন কিনা?"

বিকালে সুদীপ খোঁজ নিয়ে এসে জানালো, ভবেন মধুরাকে নিয়ে পালিয়েছে শুনে ডাক্তার উমানাথ রায় তখনি হার্টফেল করে মারা গেছেন। রচনা ভাবলো—এ কথা যদি মধুরাকে এখন না বলি তো পরে বেচারা আরো কষ্ট পাবে।

বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে মধু আকুল হয়ে রচনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। রচনা ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "ভয় কি মধু, আমার তো ছোট বোন নেই, তুমিই আজ থেকে আমার ছোট বোন হলে।"

মধুরা হাত বাড়িয়ে সুদীপকে ও রচনাকে প্রণাম করলো।

এর পরে সুদীপ ও রচনার স্নেহের আশ্রয়ে মধুরার দিন সুখে আর আনন্দে কাটতে লাগলো। মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার বাবার কথা—আর আঁতকে ওঠে ভবেনের মত পশুর কথা মনে পড়লে। যদি না পালাতে পারতো। যদি তাকে ওরা ওখানে আটকে রেখে ওদের মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করতো! আর ভাবতে পারে না, মধুর মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। রচনার স্নেহের বুকে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে থাকে।

এইভাবে মধুরা ষোল বছরের হয়ে উঠলো। রচনার লেখাপড়াও শিখছে। সামনের পুজোয় সুদীপ ও রচনা ঠিক করলো হরিদ্বার যাবে, মধুরাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। মধুরা না থাকলে ওদের এখন আর একটুও ভালো লাগে না।

হরিদ্বারে শান্তিনিকেতন বোর্ডিং-এ ওরা তিন জনে উঠেছে। ঘরটা বেশ বড়। জানালার ধারে বসলেই হরকিপ্যারে দেখা যায়। গঙ্গার ওপারে পাহাড়, মাঝে মাঝে সবুজ গাছ এ এক অপূর্ব শোভা! মধুরা তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

বিকালে ওরা তিনজনেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে। হঠাৎ সিগারেটের শেষটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুদীপ চেঁচিয়ে উঠলো, "কি হে, সুবীর না?"

সুবীর রচনার পিসতুত ভাই। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এখানে দিন দুয়েক হলো এসেছে মিলিটারী অফিসে ইন্টারভিউ দিতে।

রচনা তো আনন্দে বলে উঠলো, "কি মজা! আমাদের মধ্যে তোকে পেয়ে গেলাম। তোকে আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। আর এই দেখ মধুরা—এটি আমার ছোট বোন।"

সুবীর অবাক হয়ে মধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—ভাবে, এ যে অনেক দিনের চেনা বলে মনে হয়! মধুরা নীরব প্রতিমার মত চোখ দুটি নামিয়ে গঙ্গার ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুদীপ সুবীরের হাত টেনে বললো, "এস হে, এইখানে সব বসা যাক। আর মধুরার গান শোনা যাক।"

সুবীর মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো মধুরার গান। সত্যিই ভালো গান শিখেছে মধুরা।

পরদিন মধুরা পাশের ঘরে ছিল, এই সুযোগে সুবীর রচনাকে জিজ্ঞেস করলো, "ছোটদি, বল্ তো মেয়েটি কে? তোর বোন হয়, অথচ আমি চিনি না।"

রচনা সুবীরের ডানহাতটা টেনে নিয়ে মধুরার জীবনকাহিনী সব জানালো, তারপর চোখের জল মুছে বললো, "বল্ তো ভাই, এ মেয়েকে জেনেশুনে কে বিয়ে করবে?"

সুবীর চুপ করে সব শুনে ওপারে পাহাড়ের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "ছোটদি, আমি যদি মধুরাকে বিয়ে করি, তোর কি কোন আপত্তি হবে?"

রচনা সুবীরের মাথায় হাত দিয়ে বললো, "সুবীর, তুই আরো মহৎ, আরো বড় হ ভাই।"

একথা পাশের ঘর থেকে শুনে এক অজ্ঞাত আলোড়নে মধুরার দুচোখ হঠাৎ জল ভরে এল।

বিবাহে ও উপহারে বেনারসী

আধুনিক ডিজাইনের সিল্ক শাড়ী, সর্বভারতীয় তাঁত শাড়ী, নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, কম্বল, লোয়েটার, গরম জামা, শার্টিং, সুটিং।

বস্ত্র ও পোষাকের বিভাগীয় বিপণি

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিঃ—৭. ফোন : ৩৩-২৩০৩

ইলেকট্রিক মোটর, গ্রাইণ্ডার, ডবল এণ্ডেড, গ্রাইণ্ডার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক

ক্ষমা ইলেক্‌ট্রো ওয়ার্কস্

২৬।২, প্রিয়নাথ মিত্র রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬

অনুসন্ধান অফিস

নিমাই ভট্টাচার্য

লক্ষ্মী দত্ত লেনের গোরা দত্তকে চেনেন? তপু, ছোটভাই, দেবী, মানা, জ্যোতিকে? সারা বছর পাড়ার মোড় গরম করে রাখে। গরম গরম তেলে-ভাজার মত গরম আর মুখরোচক করে রাখে। কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে কেউ ফর্সা, কেউ কালো; কেউ চাকুরিয়া, কেউ বেকার। কেউ আলুরি, কেউ ফুলুরি, কেউ পিঁয়াজী, কেউ বেগুনি, কেউ আলুর চপ অথবা কচুরি। তা হোক। সবাই ভাজা, সবাই গরম, সবাই টাটকা, সবাই মুখরোচক।

এক কথায় পাড়ার মাস্তানরা। কিন্তু কেউ কোনদিন কোন কমিটির মেম্বার হলো না। ছোটভাই বলে, অল পার্টি নমিনেশন পেয়েছিলুম ইউনাইটেড নেশনস'এ যাবার জন্য। তাই গেলুম না। তা আমার দুগ্গা পুজো কমিটিতে?

পাড়ার এই মাস্তানরা কমিটি গড়ে, কমিটি ভাঙে কিন্তু কমিটিতে ঢুকবে না। দুগ্গা পুজোর কমিটিতেও না।

নিবেদিতা লেনের শংকরবাবুকে তো নিশ্চয়ই চেনেন। ঐ যে রোজ সকালে ধাক্কা মেরে স্টার্ট করে মরিস এইট'এ চেপে শিয়ালদা কোর্টে যান, যার বাড়ীর দরজায় পাথরে বড় বড় করে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, শাংকরলাল সরকার, এম-এ, বি-এল। তিনি পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু পাড়ার মাস্তানদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ভাঙা যায়নি।

ছোটভাই হাত-পা নেড়ে বলেছে, শংকরদা, তুমি রোজ সকালে ধাক্কা মেরে মরিসে চেপে শিয়ালদা কোর্টে যাচ্ছ আর আসামীদের বদলে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাজা পাইয়ে দিচ্ছ অথচ আমাদের এই সিম্পল কেশটা বোঝ না? আমি বা গোরা যদি তোমাদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মা-দুগ্গার টেম্পোরারি ক্যাবিনেটে জয়েন করি, তাহলে কি আমাদের ইউনিটি থাকবে?

শংকরদা এবার লজিক খুঁজে পায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"তাছাড়া আমরা পাওয়ার হাঙরী না। আমরা অনুসন্ধান অফিসের চার্জেই থাকব।"

ছোটভাই প্রাইভেটলি শ্যামলকে বলেছে, অনুসন্ধান অফিসের চার্জ নেবার কারণ ভেরি সিম্পল। চেয়ারে বসে, টেবিলে পা তুলে, দু'হাতে দুটো মাইক্রোফোন নিয়ে কাজ করার একটা প্লেজার আছে। পুজো, এন্টারটেনমেন্ট, ইমারসন, ডেকরেশন—যাতেই যান না তাতেই ঝামেলা। এই আরাম কোথাও নেই। তাছাড়া ভ্যারাইটি মানুষ দেখার এত সুযোগ কোথাও পাবেন না।

একটু থেমে কলিগদের মুখের পর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলে, বছর বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হারিয়ে যাচ্ছে। আমি, গোরা, তপু, মানা মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা করে তাদের উদ্ধার করছি। দেবী আর জ্যোতি লং হ্যান্ডে সব নোট নিয়ে যাচ্ছে।

'লং হ্যান্ডে নোট নেয় মানে?'

'গত দশ বছরের কালেকশন দেখলেই বুঝবেন। দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট করে বুঝবেন। আমরা নিজেরাই এডিট করে যা দাঁড় করিয়েছি, তাতেই কেল্লা ফতে! শ্যামলদা যদি এডিট করে দেয়, তাহলে তো শরৎচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের সেল বন্ধ হয়ে যাবে।'

'একবার চোখ বুলিয়েই দেখুন না!'

প্রথম বছর—

...'ভাটপাড়া, ভাটপাড়া থেকে এসেছেন উদয়নকুমার সরকার। আপনার জন্য শ্রীমতী বলাকা ঘোষ অনুসন্ধান অফিসে অপেক্ষা করছেন।... উদয়নকুমার! আপনি যেখানেই থাকুন, এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে আসুন।'...

...'দমদম, দমদম থেকে এসেছেন শ্রীমতী মালতী সেন। আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য অলক মুখার্জী অপেক্ষা করছেন।...

'টালিগঞ্জ ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড থেকে এসেছেন আশিসবাবু! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী বেলা...'

...'বরানগর নেতাজী কলোনীর অনিন্দ্য রায়! আপনার জন্য দক্ষিণেশ্বরের ভারতী বসাক অনুসন্ধান অফিসে...'

...'দুয়ের এক! দুয়ের এক হিদারাম ব্যানার্জি লেনের তৃপ্তি বসু। আপনার জন্য অশোক মিত্র অনুসন্ধান অফিসে...'

...'ফার্ন রোড! ফার্ন রোড থেকে এসেছেন রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা! রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা! আপনার জন্য তপন বসু...'

...'বিরাটি! বিরাটি থেকে এসেছেন মৃন্ময় ভট্টাচার্য! আপনার জন্য কমলা অধিকারী অনুসন্ধান অফিসে...'

...'যে কোন স্বেচ্ছাসেবককে বললেই তারা অনুসন্ধান অফিসের সন্ধান দিয়ে দেবেন।'...

...'সরস্বতী হোস্টেলের শ্রীমতী অলকা মন্ডল! অলকা মন্ডল! আপনি যেখানেই থাকুন, এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন! আপনার জন্য ক্যাপ্টেন মালহোত্রা...'

...'মুঙ্গের সে আয়া দেওকীনন্দন মিশ্রজী! আপ যাহা পর হো জলদি সে এনকোয়ারি অফিস মে আযাইয়ে। আপকে লিয়ে পাটনাকা ফুল্লরাজী ইন্তেজার...'

দ্বিতীয় বছর—

...'নিউ আলিপুর থেকে এসেছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে...। আপনার জন্য বালীগঞ্জ গার্ডেনস'এর তরুণ সরকার অপেক্ষা করছেন।'...

...'আদিত্য মিত্র! ল্যান্সডাউন থেকে এসেছেন আদিত্য মিত্র! আপনার জন্য হাজরা লেনের বিনতা মুখার্জী...। আপনি যেখানেই থাকুন...।'

...'বরানগর নেতাজী কলোনীর অনিন্দ্য রায়! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী ভারতী রায়...। আপনি যেখানেই থাকুন সত্বর...।'

...'দমদম থেকে এসেছেন অলক মুখার্জী! আপনার জন্য মালতী সেন অনুসন্ধান অফিসে অপেক্ষা করছেন।...

...'এন্টালী থেকে এসেছেন অতুল দত্ত! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য ফার্ন রোডের রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা...'

...'নৈহাটি-ভাটপাড়া থেকে এসেছেন শ্রীমতী বলাকা ঘোষ। আপনার জন্য উদয়ন সরকার অনুসন্ধান অফিসে...।'

...'হিদারাম ব্যানার্জী' লেনের তৃপ্তি বসু! তৃপ্তি বসু! আপনার জন্য অশোক মিত্র এক নম্বর গেটের সামনে অপেক্ষা করছেন।... তৃপ্তি বসু! আপনি এক্ষুনি এক নম্বর গেটের সামনে যান। যে-কোন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করলেই তারা আপনাকে এক নম্বর গেট দেখিয়ে দেবেন।...

...'ক্যাপ্টেন মালহোত্রা! ক্যাপ্টেন মালহোত্রা! প্লিজ গো টু কফি বার। মিস অলকা মন্ডল ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।'...

'দেওকীনন্দন মিশ্র! দেওকীনন্দন মিশ্র! আপ ফোরন এক নম্বর গেট কা পাশ চলা যাইয়ে। আপকে লিয়ে পাটনাকা মশহুর মতীবাঈ ইন্তেজার...'

তৃতীয় বছর—

...'মোগলসরাই থেকে এসেছেন অনিল ব্যানার্জী! অনিল ব্যানার্জী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী মঞ্জু ব্যানার্জী অনুসন্ধান অফিসে...। আপনি তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন।'

...'ফার্ন রোড থেকে এসেছেন রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা! আপনার জন্য ডাঃ অশেষ বর্মন মিনিট বারে অপেক্ষা করছেন। রজনীগন্ধা দেবী! আপনি এক্ষুনি মিনিট বারে চলে যান।'...

...'নৈহাটি থেকে এসেছেন উদয়ন সরকার! উদয়নবাবু! আপনার স্ত্রী শ্রীমতী মিনতি সরকার অনুসন্ধান অফিসে...।'

...'বিরাটি থেকে এসেছেন মৃন্ময় ভট্টাচার্য! আপনার জন্য আরতি রাহা অনুসন্ধান অফিসে...। আপনি যেখানেই থাকুন...।'

...'হাজরা লেনের বিনতা মুখার্জী' আপনার জন্য নিউ আলিপুরের ছাপঘর সেন অনুসন্ধান অফিসে...।'...

...'বেলেঘাটা সি-আই-টি রোড থেকে এসেছেন মীরা রায়। আপনার জন্য স্কোয়ার্ডন লীডার ঘোষ অনুসন্ধান অফিসে...। আপনি সত্বর...। স্বেচ্ছাসেবকদের জিজ্ঞাসা করলেই অনুসন্ধান অফিসের খবর পাবেন।'

...'সরস্বতী হোস্টেলের মিস অলকা মন্ডল! মিস মন্ডল! আপনার জন্য ক্যাপ্টেন ইন্দুরকার অনুসন্ধান অফিসে...।'...

পঞ্চম বছর—

'দমদম থেকে এসেছেন মিস মালতী সেন! মিস সেন! আপনার জন্য অলক মুখার্জী পূজা মন্ডপে অপেক্ষা করছেন। মিস মালতী সেন পূজা মন্ডপে যান।'...

...'বিরাটি থেকে এসেছেন আরতি রাহা! মিস আরতি রাহা! আপনার জন্য মৃন্ময় ভট্টাচার্য...'

...'মিসেস বন্দনা সরকার! আপনার জন্য ক্যাপ্টেন মালহোত্রা গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন! মিসেস সরকার! আপনি গাড়ীর কাছে চলে যান।'...

'জামালপুর! জামালপুর কা ইন্দুবাঈ! ইন্দুবাঈ! আপ ফোরন এক নম্বর গেট পর...। দেওকীনন্দনজী আপকে ইন্তেজার...।'

...'ডাঃ অশেষ বর্মন! ডাঃ বর্মন! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী রজনীগন্ধা দেবী অনুসন্ধান অফিসে...। ডাঃ বর্মন! আপনি অনুসন্ধান অফিসে আসুন।'

...'টালিগঞ্জ ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড থেকে এসেছেন আশিসবাবু! আশিস ভট্টাচার্য! আপনার স্ত্রী বেলা দেবী ও আপনার মেয়ে শকুন্তলা...।'...

...'নিউ আলিপুর থেকে এসেছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ। মিস ঘোষ! আপনার জন্য অভিজিৎ মল্লিক অনুসন্ধান অফিসে...।'...

...'হাজরা লেনের শ্রীমতী বিনতা মুখার্জী! বিনতা দেবী! আপনার জন্য আদিত্য মিত্র অনুসন্ধান অফিসে...। আপনি সত্বর অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন।'...

'ভাটপাড়া থেকে এসেছেন উদয়ন সরকার! উদয়নবাবু! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী মিনতি সরকার ও খোকন অনুসন্ধান অফিসে...।'...

'স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! মিস অলকা মন্ডল ইজ ইন দি কফি কর্নার! স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! প্লিজ গো টু কফি কর্নার।"

'গয়া সে আয়া লছমীবাঈ! লছমীবাঈ! আপ জলদি সে বাহার গেট কা পাশ আযাইয়ে। মুঙ্গের কা দেওকীনন্দনবাবু আপকে ইন্তেজার মে...।'...

...'বেলেঘাটা সি-আই-টি রোড থেকে এসেছেন মীরা রায়! মিস রায়! আপনার জন্য স্কোয়ার্ডন লীডার ঘোষ গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।'

...'বিরাটি থেকে এসেছেন আরতি রাহা! আরতি রাহা! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য মৃন্ময় ভট্টাচার্য'

চোখ বুলিয়ে যেতে ভারী মজা লাগছিল। তাজা গরম মুখরোচক খবরের চপটা শেষ করতে না করতেই গোরা নীলুর দোকানের পান এনে দিল। পানটা খেয়ে ঠোঁট লাল করার আগেই মনটা লাল হয়েছিল।

তপু বল্লো, কি কেমন লাগছে?

'বেশ ভাল।'

ছোটভাই বল্লো, এই অনুসন্ধান অফিসে বসি বলে আমরা তো কেউ কোন পূজা সংখ্যা কিনি না। সাতটা উপন্যাস, তিরিশটা বড় গল্প, দু'শোটা ছোট গল্পের চাইতেও অনেক বেশী, অনেক ভাল, অনেক ইন্টারেস্টিং পূজা সংখ্যা বিনি পয়সায় চোখের সামনে দেখতে পাই।

একটু থেকে আবার বলে, এই কলকাতা শহরে ছেলেমেয়েদের ইয়ে-টিয়ে নিয়ে কম কান্ড তো হচ্ছে না। মারামারি, কাটাকাটি, ডিভোর্স থেকে শুরু করে মার্ডার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের কাছে কোন ব্যাক গ্রাউন্ড মেটিরিয়াল, কোন রেফারেন্স নেই। সাব-ইনস্পেক্টার পদ্মলোচনবাবু থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের শরণাপন্ন হন। জ্যোতি, মানা, তপু ফাইল হাতড়ে ঠিক বলে দেবে ক্যাপ্টেন মালহোত্রা বা মিসকাম-মিসেস অলকা মন্ডলের হোল হিস্ট্রী।

দেবী বল্লো, দেওকীনন্দনবাবু ফি বছর এক একটি সাঙ্গিনী নিয়ে পূজোর সময় কলকাতা বেড়াতে আসতেন। আর এমনই পোড়া কপাল যে ওকে আমাদের অনুসন্ধান অফিসে আসতেই হতো। আমাদের সঙ্গে ওর দারুণ ফ্রেন্ডসিপ হয়ে গেল। গতবার দেওকীনন্দনবাবু যখন মিলিওনার হলেন, তখন আমরা একটা টেলিগ্রাম পাঠালুম, বেস্ট উইসেস ফ্রম পূজা এনকোয়ারি অফিস। ব্যস তারপরেই ইনভিটেশন। ক্রীস্টমাসের ছুটিতে আমরা বিনি পয়সায় দেওকীনন্দনবাবুর গেস্ট হয়ে ঘুরে এলুম।

মানা বল্লো, প্যাসেঞ্জারদার মত জন'সিস্ট আমাদের অনুসন্ধান অফিসে বসলে 'চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড লাভ' লিখে ফেলতে পারতেন।

ছোটভাই বল্লো, আরো পড়ুন। আরো মজা পাবেন। আমাদের হ্যাঙ্ক ক্যালেকশনও তো পড়লেন না।

আমি বল্লাম, থ্যাঙ্ক ইউ অল। এবার থেকে দুর্গাপূজার সময় দুর্গাকে না দেখে শুধু অনুসন্ধান অফিস দেখব।

ঘর থেকে পাড়ার মাস্তানরা বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, মিস মন্ডল, আপনি যেখানেই থাকুন, সত্বর অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। মেজর ব্যানার্জী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রাজ জ্যোতিষী

কিম্বদন্তিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট উপাধিপ্রাপ্ত মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশচন্দ্র শাস্ত্রী যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি - স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোষ্ঠির গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা মোকদ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। প্রশ্ন গণনায়, করকোষ্ঠি নির্মাণে এবং লগ্ন কোষ্ঠি উদ্ধারে অদ্বিতীয়। দেশ-বিদেশে উচ্চপ্রশংসিত।

সদ্য ফলপ্রদ কয়েকটি আশ্চর্য কবচ

শান্তি কবচ :—পরীক্ষার পাস, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্বদুর্গতিনাশক, সাধারণ—৫৲, বিশেষ—২০৲।

বগলা কবচ : মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে বশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲, বিশেষ—৪৫৲।

তাঁহার বই পড়ে হস্তরেখা বিচার ও জ্যোতিষী বিদ্যা সহজেই শিখুন :

১। সামুদ্রিক রত্ন (বাংলা) ২য় সংস্করণ—৬৲
২। জুয়েল্স অব পামিস্ট্রী (ইং) ২য় সং—১০৲
৩। এ গাইড টু এস্ট্রোলজি (ইংরেজী) ১১৲

হাউস অব এস্ট্রোলজি (ফোন ৪৭-৪৬৯৩)
৪৫এ, এস পি মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৬

খালাস

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আচ্ছা, এর কি কোনো মানে হয়? কিন্তু কোনটার মানে হয় আর কোনটার মানে হয় না? হবে না কেন, মানে হওয়ালেই হয়। রতীন হো হো করে হেসে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের হাসির শব্দে লজ্জিতও বোধ করে। ভাবে, রান্নার লোকটা ধারে-কাছে আছে কোথাও, নিশ্চয় ধরে নেবে বাবুর মাথায় ছিট আছে। একবার আশেপাশে তাকিয়ে নেয়, পাখাটা ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নড়ে না, এবং পাখাটাকে না নাড়িয়ে উপায় নেই কারণ গরম যে প্রচন্ড। এ-ঘরে সব সুবিন্যস্ত, যে যার নিজের জায়গায়, ছবির জায়গায় ছবি, বিছানার জায়গায় বিছানা, কার্পেটের জায়গায় কার্পেট এবং—আবার হাসি পায় রতীনের—রতীনের জায়গায় রতীন।

এবং এই সুবিন্যস্ত ঘরের শৃংখলা সে ভাঙতে চায়—সে ততটা নয়, বরং অন্য কেউ বা অন্য কিছু কোত্থেকে হঠাৎ এসে সেটা ভাঙুক, তাই চায়। নীরবতার বুক চিরে দামামা বেজে উঠুক, যে-কোনো দামামা, যে-কোন শব্দ—যা চাই, তা শুধু অপ্রত্যাশিত, শুধু একটা কিছু তাকে চমকে দেওয়ার মত, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার মত, এক-ঘেঁয়েমিতে চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসা তার আত্মার পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়ার মত, বা হোক না তার মাথায় সজোরে চাঁটি মারারই মত। এবং সেই সুড়সুড়ি পড়বে তার পিঠে, কেউ বা কিছু এসে সেই চাঁটি সজোরে মারবে তার মাথায়, মারবেই—সেটা রতীন ধরেই নিয়েছে, আর ঘটবে আজই সন্ধ্যায় সাতটার মধ্যে, ঘটবেই। ঠিক যেমন যাদু-করের এক-দুই-তিন বলা, বা তুড়ি মারা, বা আলিবাবার চিচিংফাঁক উচ্চারণ এবং সংগে সংগে একটা কিছু ঘটে যাওয়া।

কিন্তু—আর সেইটে ভেবেই একলা একলা কয়েক সেকেন্ড আগের আতর্কিত সচকিত হাসি—পৃথিবীটা মামদোবাজি না কি, হবে বললেই হবে, ঘটবে বললেই ঘটবে? একটা কার্যকারণ নেই, যুক্তি নেই, এক জিনিসের সম্বন্ধ বহন করে আরেক জিনিসের আসা নেই? শুধু ভূঁইফোড়ের রাজত্ব, ভূতের নাচ? আর সবচেয়ে আশ্চর্য যেটা, সেটা হল রতীনের মানসিক গঠন তো এ-রকম একেবারেই নয়, তার দৈনন্দিন বা ব্যবহারিক জীবনে সে তো অপ্রত্যাশিতের কোনো ধারই ধারে না, তাতে বিশ্বাসও করে না—বিশ্বাস তার হাঁচি-টিকটিকিতেও নেই, জ্যোতিষশাস্ত্রে নেই, পাঁজি দেখে বেগুন খাওয়া বা না খাওয়ায় নেই। কই, তার আপিসের কোনো কোনো ভদ্রলোক যখন সোমবার না মঙ্গলবার (বা বুধবার না কি?) খবরের কাগজ খুলে বসবেই, এবং রাশি ফলাফলের পাতাটা দেখে ঠিক করতে বসবে কার কোন রাশি বা কোন লগ্ন, এবং সেই বুঝে কাগজের ঘোষণা অনুযায়ী তারা একে অন্যে কোনো বিশেষ সপ্তাহে ঠিক কোন ধরণের জিনিস প্রত্যাশা

করবে বা ঠিক কোন ধরণের জিনিস সম্বন্ধে সাবধান হবে, তখন তাদের সেই আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনায় রতীন কখনো হঠাৎ এসে হাজির হলে শ্লেষ ও বিরক্তির যুগপৎ ভাবে সে নীরবে বিড়ম্বিত বোধ করতে থাকে না, নিজেকে তাদের থেকে উঁচুও মনে করে না? কিন্তু বান্ধাধন, নিজেকে নিয়ে সে-দম্ভ তোমার এখন গেল কোথায়! এই যে অপ্রত্যাশিতকে চাওয়া, এবং শুধু চাওয়াই নয়, সেটা যে ঘটবেই, ঘটতে বাধ্য তোমার নিজেরি বেঁধে দেওয়া একটা বিশিষ্ট সময়ের মধ্যে, এ-বিশ্বাসটা কি সোজা কথায় বুজরুকি নয়, নিজেকে নিজের ছলনা নয়? প্রশ্নটা রতীন তোলে মনে মনেই এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠতে চায়, যাঃ, এর কি কোনো মানে হয়?

অবশ্য প্রশ্নের উত্তরটাও সে আগেই দিয়েছে : কোনটার মানে হয় আর কোনটার মানে হয় না? যা কিছু ঘটে জীবনে, কল্পনায় নয়, বাস্তবে, তার সব কিছুরই কি মানে আবিষ্কার করতে পারা যায়? বরং সব কিছুর মানে আবিষ্কার করা যায় না বলেই হয়তো জীবনটা সুন্দর বা বেদনাবহ। রতীন তাই তাদের সমগোত্রীয় যারা মনে করে, হাজার যুক্তির মানুষকেও অপ্রত্যাশিত বা অলৌকিকের চেতনা নিয়েই চলতে হয়, নইলে জীবনের তো কোনো ব্যাপ্তি থাকে না, সৌন্দর্য থাকে না, জীবনে অসীম থাকে না—আর অসীম বাদ দিয়ে সে-জীবন, সে তো প্রাণের নয়, জড়ের। তাছাড়া এমন একটা ভাব যে রতীনের আজই এসেছে, তা তো নয়—এসেছে আগেও কতবার। একটা কিছু হওয়ার আছে, যা অবিলম্বে হবে, এবং যা হওয়ার ফলে সামগ্রিক একঘেঁয়েমিটা কাটবে, অদ্ভুত ঠেকলেও এমন প্রত্যাশার তো বহু মুহূর্ত এসেছে রতীনের জীবনে। এবং অলৌকিক-ভাবে যে প্রত্যাশা সফলও হয়েছে কতবার, হয়নি? অনেক ঘটনার মধ্যে না হয় শুধু একটারই উল্লেখ করা যাক, এবং যেটা রতীনের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসছে। এই তো সেদিন, সন্ধ্যেবেলা, রেডিওটা খুলতেই কী শুনল? এবং কেনই বা হঠাৎ রেডিওটা সে খুলতে গেল সেদিন, যখন আগের বেশ কয়েক দিন ধরে রেডিওর ধারে-কাছে ঘেঁষছিল না? এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে সেদিন সে রেডিওটা খুলতে যায় শুধু এই ভেবেই : আজ বোধ হয় একটা কিছু খবর থাকবে—বোধ হয় নয়, নিশ্চয় থাকবে, কারণ এভাবে আর যে চলে না, না হয় কিছু আপিসে, না হয় কিছু বাড়ীতে তার ব্যক্তি-গত জীবনে, ব্যক্তি ছাড়িয়ে বিশ্বেও এমন কিছু ঘটে না যাতে মুখ বদলায়। এবং মুখ তো বদলাল সেদিন, বদলায় নি? রেডিও খুলতেই নটার খবর, একেবারে সুরুতেই : মহাকাশে মানুষ যাত্রা করেছে। মনে আছে, তারা তখন সবাই খাবার টেবিলে —সে নিজে, তার স্ত্রী রাত্রি ও ছেলেমেয়েরা। এবং খবরটা শুনেই আনন্দ ও বিস্ময়ের সে কী সমুদ্র-উত্তাল তার হৃদয়ে—যেমন তার, তেমনি রাত্রির। আনন্দ হবে না? সে-খবর শুনে এমন পাষণ্ড কে কোথায় আছে যে চেঁচিয়ে উঠবে না, হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে হৃদয় নাচে রে?

আপত্তি উঠবে, এবং রতীন তা মানবে, যে এভাবে এটাকে অলৌকিক মনে করাটা যেমন অসত্য, এক প্রচণ্ড অজ্ঞতার পরিচয়, তেমনি এই বিশেষ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-বোধহীন আনন্দের চেতনাও এক সমানই অন্যায়। কারণ অলৌকিক বা অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে তাদের কাছে, অর্থাৎ তার ও রাত্রির কাছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একে-বারেই অলৌকিক নয়, বরং তা মহাকাশ-চারীদের প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার নিছক অঙ্ক-কষা ফল—তা হতই, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। এবং এতে রতীনের আনন্দ পাওয়াটা দায়িত্ববোধহীন বলেই অন্যায় এই কারণে যে যে-আনন্দ পাওয়ার জন্যে সে আজ উন্মুখ তার জন্যে তো তাকে কোনো আত্মত্যাগই কখনো স্বীকার করতে হয় নি। বরং সে-রকম কোনো আত্মত্যাগের জন্যে সে সত্যিই প্রস্তুত কি না, এমন প্রশ্ন তুললে তাকে বিড়ম্বিত করা হবে। তবে সান্ত্বনা এই যে, এ-ব্যাপারে রতীন একলা নয়, তার দলে অনেকে, প্রায় সবাই—সুতরাং খামাখা সে কেন অপরাধী বোধ করে দুঃখ পেতে যাবে? যেচে দুঃখ কে পেতে চায়? আর রতীন তা তো একেবারেই চায় না, একথা অন্যের কাছে অকপটে স্বীকার করতে তার লজ্জা থাকুক বা না থাকুক (আসলে লজ্জা আছে), নিজের কাছে সে স্বীকারে তার কোনো দ্বিধা অন্তত নেই। মোদ্দা কথাটা হল, রেডিও-র খবরটার পরে তার একঘেঁয়েমির ভাবটা বেশ কয়েকদিনের জন্যে কেটে যায়।

এবং এটা সাম্প্রতিক ঘটনা বলেই ঝট্ করে মনে পড়ে গেল, নইলে এমন ঘটনা আরো অনেক আছে, যখন কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটবে বলে আশা করেছিল রতীন এবং সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিম্বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হয়তো এ ধরণের আশা তার জয়ী হয় নি—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রের কথা কে মনে রাখতে গেছে? মানুষ মনে রাখে তাই যা তার মনে রাখতে ভালো লাগে।

তবে আজকের ঘটনাটা ঘটবে, যে-কোনো ঘটনাই হোক না কেন সেটা, তাকে ঘটাতে হবে—অন্তত মনের ভিতরে বসে মন বলছে রতীনের, ঘটবে, ঘটবে, ঘটবে। এবং যতক্ষণ না ঘটে, আশাতেও আনন্দ। অবশ্য ঘটার পরেও যে তা আনন্দজনক থাকবে, জোর করে সে-রকম কিছু বলা যায় না—কে জানে, হয়তো দুঃখজনকই হবে। তবু হোক না তা, অন্তত তা নিয়ে তো তখন কতকগুলো চিন্তার মুহূর্তকে কাজে লাগানো যাবে, ঘুচবে মনের এই বর্তমান বিস্বাদটা—এক কথায়, মুখটা বদলাবে। এবং মুখ বদলানোটাই প্রধান কথা আজ।

কী হয়েছে, ব্যাপারটা কী? তা সম্বন্ধে আরো একবার ভাবতে বসার আগে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নেয় রতীন—প্রায় সাড়ে ছটা। তার মানে আপিস থেকে ফিরেছে সে পাঁচটায়, তারপর চান করেছে, চা খেয়েছে, ইতিমধ্যে বার দু-তিন চিঠির বাক্সে গিয়ে দেখে এসেছে চিঠি আছে কি না, দেখেছে নেই, কখন পাখার তলায় বেতের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে ভাবতে সুরু করেছে—এবং পুরো একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে বেঁহুশের মত চলে গেছে। তবু যেহেতু নিজে সে সময় দিয়েছে সাতটা, যার মধ্যে কিছু ঘটতেই হবে, এখনো হাতে তার আধ ঘণ্টা কম করে—এবং সেটা কিছু কম সময় নয়, আধ ঘণ্টায় কত কী হতে পারে, অর্থাৎ কী না হতে পারে, পৃথিবী রসাতলেও যেতে পারে। গেট খোলার কোনো শব্দ হচ্ছে কি না, সে-দিকে কান খাড়াই আছে, কিন্তু বৃথাই। হঠাৎ হঠাৎ সন্দেহ জাগে, ভাবে, যদি কিছু না ঘটে বা কিছু সত্যিই ঘটবে কি? এবং সে-রকম সন্দেহের মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাবও কখনো কখনো জাগে, মনে হয়, না ঘটল তো নাই ঘটল, আশা করতে আপত্তি কী একই সঙ্গে নিজের অবস্থাটা দেখে হাসিও বার বার পায়, পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করে ফেলতে চায়, কোনো মানে হয়?

তবে সবথেকে হাসি পাওয়ার হেতু-সঙ্গত কারণ যাতে, সেটা আষাঢ়গোড়া ব্যাপারটাই, এবং সেটা নিয়ে যে রতীন সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করছে, তা মানতে পর্যন্ত তার আপত্তি নেই। প্রায় দু মাসের ওপর আজ সে একলা আছে, কারণ গরমের ছুটিতে রাত্রিরা কলকাতায়—আপিস না থাকলে রতীনও পালাত, প্রথমত কলকাতার লোভ তো আছেই, বাড়ী-ঘর-দোর-বন্ধু-পরিজন, দ্বিতীয়ত কে পড়ে থাকতে চায় এই দিল্লীর মাথাখারাপকরা গরমে? আব-হাওয়া আপিস যদিও বর্ষার ঘোষণা করেই চলেছে এবং বর্ষার সময়ও হয়ে গেছে, এখনো বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। শরীরের ওপর এই দিন-রাত্রি ধরে উত্তাপের অত্যা-চারে মনও জরাক্রান্ত, তায় আবার আপিসের এ সময়কার দিনগুলো বিশেষ করে হতকুচ্ছিত, শুধু দিনগত পাপক্ষয়। অন্যান্য দিকেও অদ্ভুত এক রুটিন, ঠিক মুখে সর্বক্ষণ লেগে থাকা ঘামের চটচটে টক গন্ধের মত। এ হতভাগা শহরে একটা লোক নেই যার কাছে তিন মাইল ভেঙে আড্ডা মারতে যাওয়া যায়—আর বাংলা দেশের কালবৈশাখীও চেনে না এ উদ্ভট জায়গা, এর আকাশ চেনে না আষাঢ়ের সবুজকৃষ্ণ ভয়াবহ মেঘ। অন্তত হৈ-হুল্লোড় করে যদি একদিন বৃষ্টিও নামতে পারত তো তা হয়তো ঝেঁটিয়ে বিদায় করত যেমন রাস্তার ধুলো, তেমনি মনের বিস্বাদ। কথাটা হলো তাই, এখানে আত্মা কাঁদে, আর সেই আত্মা আজ কাঁদতে বসেছে রতীনের, এর বেশি আর কিছু নয়। অর্থাৎ, আর কিছুই যদি না হয় এবং যদি শুধু ঐ

কবি। ফটো : প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

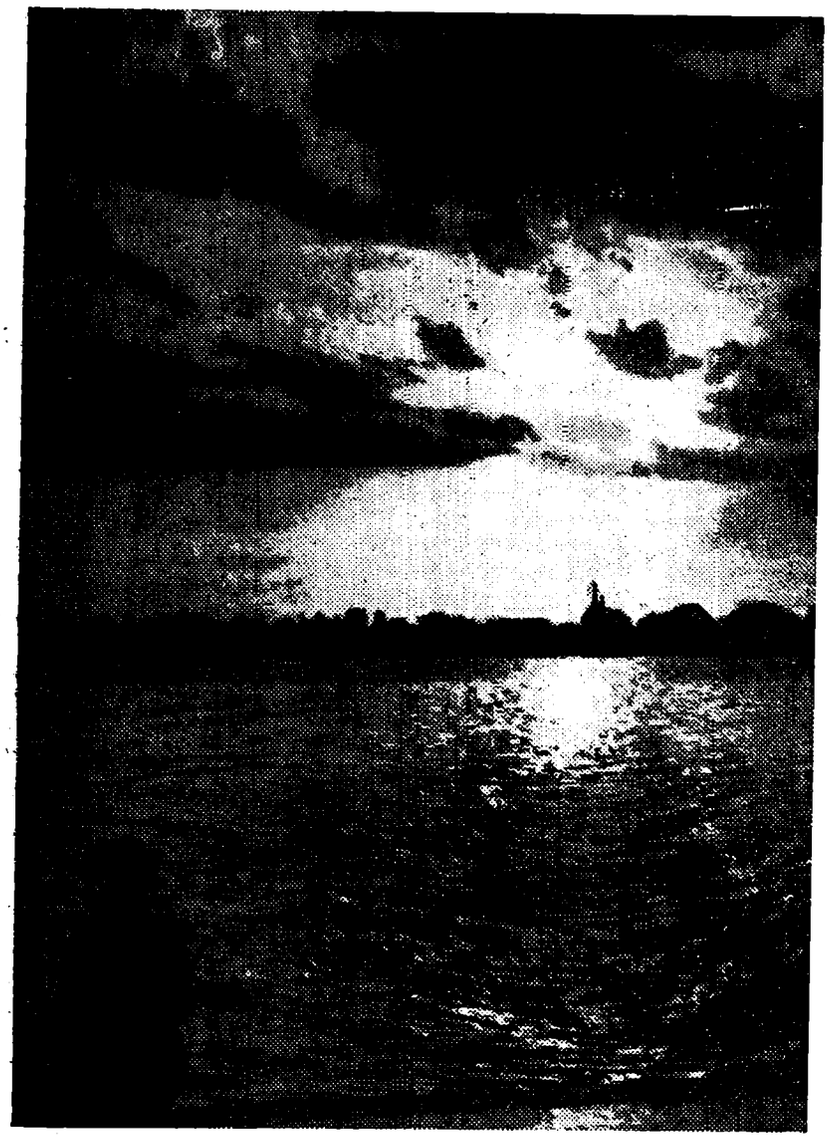

বৃষ্টিটাই নামতে পারে, জাগতে পারে সবুজ-কৃষ্ণ মেঘ, তাহলেও তথাস্তু বলতে রাজী থাকবে রতীন, ভাববে, যাক মুখটা বদলে গেল।

মুস্কিল আরো হয়েছে রাত্রির কোনো চিঠি না পাওয়ায়। শেষ চিঠি যা পেয়েছে, তা দশ দিন আগে—এবং রাত্রি এমন কান্ড কখনো করে না, সপ্তাহে দুটো চিঠি সে দেবেই, আর তার চিঠির সঙ্গে সঙ্গে রতীন উত্তরও দেয়, এবারও দিয়েছে। তবু এই দশদিন রাত্রি এমন চুপচাপ কেন? অবশ্য চিন্তার কারণ তেমন নেই, যেহেতু রাত্রি প্রথমে যায় তার মা-বাবার কাছে, সেখানে মাস দেড়েক থাকার পর এখন উঠে গেছে রতীনদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে। বাড়ীতে রতীনের বৃদ্ধা মা, ভাইবোন, ভাইয়ের পরিবার, সকলেই বিদ্যমান—দেখাশোনা করার লোকের অভাব নেই। আর ওদের ফেরার সময়ও তো হয়ে এল, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল খুলছে—সুতরাং ভাবনাটা কী? কিন্তু আশে-পাশে কেউ যখন নেই এবং কথাটা শোনাচ্ছেও না সে কাউকে, তো নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জাটা কী রতীনের যে হ্যাঁ, ভাবনা একটা আছে, মনে একটা কুশ বিঁধছে। এবং সে-কুশটা হল বিভাস, নয় কি? শেষ চিঠিতে রাত্রি জানায় যে, বহুকাল বাদে সেদিন নাকি বিভাসের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা নিউ মার্কেটে, এবং বিভাস নাকি তখন তাকে চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়, কফি খাওয়ায়। ওরা দুজনে এক-সঙ্গে স্কটিশে পড়ত এককালে, এবং কথাটা যদিও রাত্রি স্পষ্ট করে রতীনকে কখনো বলে নি, এ-সম্বন্ধে রতীনের সন্দেহ নেই। এক অনেকের মুখে সে আভাসও পেয়েছে যে রাত্রি ও বিভাসের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল একদিন। এমন কি এটাও কিছুতে অসম্ভব নয় যে, বিভাস তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, হয়তো রাত্রিও বিভাসকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সে-বিয়ে হয়নি। কে জানে, কারণটা হয়তো বিভাসের অর্থনৈতিক অবস্থাই —সাহিত্য করে (অর্থাৎ সোজা কথায় কবিতা লিখে) ও দুয়েকটা এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীতে বিজ্ঞাপনের কপি লিখে কত পয়সাই বা সে উপার্জন করতে পারে? এবং যে-চাকরী সে তখন করত—যদি চাকরিই তাকে বলা চলে—এই বারো-তেরো বছর পরেও সেই একই চাকরি সে আজও করছে। এতটুকু এগোয়নি জীবনে, অন্তত সত্যিকারের এগোনো যাকে বলে, যে এগোনোকে এগোনো বলে মনে করে রতীন, সে-অর্থে বিভাস এগোয়নি। তবু তার সম্বন্ধে দুর্বলতাটা যে রাত্রি এখনো জীইয়ে রেখেছে, সেটাও কিছু অজানা নয় রতীনের, কারণ দিল্লীতেও এটা-ওটা বাংলা পত্রিকা রাত্রি আনায়, ও তাতে প্রায়ই বিভাসের কবিতা বেরোয়—সে কবিতা পড়ে রাত্রিকে রতীন গদগদ হতেও দেখে। তা নিয়ে আলোচনা তুলতেও রাত্রি চেয়েছে কত না বার, কিন্তু যেহেতু নিজে রতীন কাঠখোট্টা মানুষ, সাহিত্যের কোনো বালাই নেই, সে কী বলবে?

অবশ্য এখন রাত্রির নিজের বয়স পঁয়ত্রিশ, রতীনের আটত্রিশ, তাছাড়া ছেলে-মেয়ে, সংসার ও সংসারজনিত একই সুখ-দুঃখ-বেদনা-আশার উপলব্ধির বহমান নদী দুজনেরই মনে—তাই বিভাসের সঙ্গে যদি আজ তার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়ে থাকে তো হয়েছে, তাতে কী? একটা দেখা মাত্র, এবং আগে দুজন দুজনকে চিনত বলেই খানিকটা কথাবার্তা, না হয় রেস্তোরাঁতেও যাওয়া, না হয় কফিও খাওয়া—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। তা ছাড়া সহজে পা পিছলানোর মত মেয়েও রাত্রি নয়, বরং হয়তো নানান দিক দিয়ে রতীনের থেকে তার দায়িত্ববোধ অনেক বেশীই—সুতরাং রতীন ভাববে কেন? না, ভাবনাটা তার হত না আজ যদি পরে অন্তত একটা চিঠিও পেত—কারণ রাত্রি জানুক বা না জানুক, বিভাসের সঙ্গে তার আবার দেখা হল কি না (যেমন একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়া বা থিয়েটারে যাওয়া বা বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘুরে আসা, বা এমন কি পালিয়ে তার সঙ্গে হোটেলে একটা রাত কাটানো, অসম্ভব কিছুই নয়), সেটা জানবার জন্যে রতীন তো স্বভাবতই চিন্তিত থাকবে। অবশ্য হোটেলে যদি সে রাত কাটিয়েই থাকে তো সেটা কি সে লিখতে যাবে রতীনকে? কই, রতীন কি কখনো তাকে বলতে গেছে একদিন সে মালাকে নিয়ে কী করেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে? বিয়ের আগে নয়, তখন সেটা তো রতীন করেছেই, বিলেতে ছাত্রাবস্থায় মালাকে নিয়ে একাধিক রাতও সে কাটিয়েছে হোটেলে—কিন্তু সেটা বিয়ের আগের ঘটনা বলেই তা নিয়ে রতীনের তেমন কোনো মনঃপীড়া নেই। যেটা বিলেতে বোঝেনি রতীন কিন্তু আজ জানে, সেটা হচ্ছে মালা আসলে অতি ঘড়েল মেয়ে,

সে রতীনকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হয়নি, কারণ তখনও রতীন ছাত্রমাত্র ও তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, শুধু হ্যাঁ-না-দেখব-ভাবছি করে কাটিয়ে দিল মালা, পরে দেশে ফিরে এসে তার আগের ব্যারিস্টার প্রেমিক-টিকেই ঠিক বিয়ে করল। অর্থাৎ বিলেতে থাকাকালীন সে দুকূলই বজায় রাখে—হোটেলে রতীন, কলকাতায় প্রেমিক। কিন্তু সেই বিলেতের কথা তো হচ্ছে না, হচ্ছে মাত্র বছরখানের আগের কথা, যখন রাত্রির সঙ্গে রতীন এগারো বছর ধরে বিবাহিত। মালা তখন বোধ হয় বেড়াতেই দিল্লী আসে, ওঠে তার উচ্চপদস্থ কাকা না জ্যেঠা না মামার কাছে, এবং সকালের দিকে এক-দিন রতীনকে আপিসে হঠাৎ ফোন করে বসে। রতীন সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে তুলে নেয়, পরে দুজনে ছোটে দিল্লীর বাইরে নিরিবিলি প্রান্তরের দিকে, কারণ মালা জানায়, 'আঃ, একটু হাওয়া খেতে চাই।' এবং সেই জনমানবহীন প্রান্তরে বসে দুজনের কত কথাবার্তা হয়, পরস্পরের ঘরসংসারের অনেক কথাও, কখন দুর্বল মুহূর্তে রতীনের পুরানো আবেগ ফিরে আসে (এবং মালারও নিশ্চয়ই—কারণ তাকেও তো কিছু কম ব্যগ্র মনে হয় নি), আর তখন তারা দুজনে...যাকগে। কিন্তু কই, রাত্রিকে রতীন কি কিছু বলতে গিয়েছিল পরে? এমন কি মালা যে দিল্লীতে এসেছিল বা তার সঙ্গে যে রতীনের দেখা হয়, সেটা পর্যন্ত চেপে যায়।

তবু ঘটনাটার কারণে অস্বস্তির একটা ভাব জেগে থাকে, আর সে ভাবটা যেন কিছুতেই যায় না। মনে হতে থাকে রতীনের, রাত্রির প্রতি তার স্বামীর কর্তব্যে সে শিথিল হয়েছে, যে-রাত্রি তাকে দেয় নি এমন জিনিস নেই, যে-রাত্রি তার কোনো অভাব বোধের কারণ কখনো হয়নি। কিন্তু সেই একই ছলনা যদি রাত্রিও তাকে করে একদিন, লুকিয়ে লুকিয়ে? ভাবতে ভয় হয়, যেমন সমানই ভয় তার জাগে সেদিনই, ঐ প্রান্তর থেকে ফিরেই, যখন তার মনে হতে থাকে যে ভাগ্যিস, ফেরার সময় পথে টায়ার পাংচার হয় নি, বা অন্য কোনো কারণে গাড়ীটা আটকে যায় নি, মালাকে নিয়ে সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে নি, ও এ-সবের ফলে কথাটা শেষ পর্যন্ত কানে ওঠেনি রাত্রির! কথাটা ভেবে ভয় হয় সত্যি, আজো ভয় হয়—তবু আশ্চর্য, এমন চিন্তাও আজ হঠাৎ হঠাৎ জাগছে রতীনের মনে যে বিভাসের সঙ্গে ঐ মোলাকাতটা যদি হয় রাত্রির তো হোক না, যায় যদি যাক না তারা হোটেলে—হয়তো তাহলে খুশীই হবে রতীন, কারণ তখন তাদের বিবাহিত জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকবে, আমি পাপ করেছি, তুমিও পাপ করলে, শোধবোধ। শুধু আক্ষেপ রতীনের ঃ তো কথাটা লিখছে না কেন রাত্রি? স্পষ্ট করে না লিখতে পারুক—এবং তা স্পষ্ট করে লেখা সম্ভব নয়, মেনে নিচ্ছে রতীন—অন্তত আভাসে জানাক, এই যেমন, 'আবার দেখা হল বিভাসের সঙ্গে।' ব্যস, সেইটুকুই যথেষ্ট, বাকীটা রতীন অনুমান করে নিতে পারবে। হোটেলে তারা শেষ পর্যন্ত যাক বা না যাক, ঐ যে 'আবার' তাদের দেখা হয়েছে, বরং দুজনে স্বেচ্ছায় আগে থেকে ঠিক করে আবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে নিযুক্ত হয়েছে, সেই সত্যটাকেই রতীন নেবে গভীরতার সূচক বলে। এবং তখন একটা কিছু ঘটবে তো—কোথায় থাকবে তার একঘেয়েমি?

আরে এ কি, এ যে সাড়ে আটটা বেজে গেল—ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে রতীন। এবং আবার হাসি পায় তার, এবার প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ তার নিজের দেওয়া সময় কখন পেরিয়ে গেছে অজান্তে, কিছুই হয় নি। হওয়ার আছেই বা কী, যতসব বুজরুকি ঃ রান্নাঘরের দিক থেকে খুটখাট শব্দ আসছিল কিছুক্ষণ আগেও, এখন চুপচাপ, অর্থাৎ লোকটার রান্না নিশ্চয় তৈরি—ওকে বসিয়ে রেখে লাভ নেই, খেয়ে নিলেই হয়। এবং খাওয়ার পরে রতীনও ছাদে উঠবে, যেখানে শোয়—ঐ একটি আরাম দিল্লীর, গরমের রাতে মুক্ত আকাশে শোওয়া। সুতরাং খেয়ে নেয়, পরে রান্নার লোকটি বাড়ীরই সংলগ্ন তার কোয়ার্টারে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ খবরের কাগজে চোখ বোলায় রতীন, অনমনস্কের মত, কাটায় হয়তো আরো আধ ঘন্টাটাক, কি তারো কিছু বেশি, পরে ছাদে উঠতে উদ্যত হয়।

সত্যিই, বাংলো ধাঁচের একতলা এই বাড়ীটা ভারী চমৎকার, বেশ মনের মত, অসুবিধা নেই, অভিযোগের তাই কারণও থাকা উচিত নয় রতীনের। ছাদে উঠেই তলার বাগান হতে হাস্নাহানার গন্ধ পায়, কৃষ্ণপক্ষের রাত, ওপরে তারকাখচিত আকাশ—শুয়ে পড়ে। এটা-ওটা ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা প্রায় এসে গেছে, এমন সময় হঠাৎ যেন বাইরের লোহার গেটটায় অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনল। রাতে গেট খুলে সরা-সরি কারুর ঢোকার উপায় নেই, কারণ শুতে যাওয়ার আগে গেটটায় তালা মেরে তবে ওপরে ওঠে রতীন। তাহলে কেউ এল না কি? বিছানা ছেড়ে উঠে ছাদ থেকেই গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে, হ্যাঁ, কাউকে দেখা যাচ্ছে—তবে ছেলে কি মেয়ে, দূর থেকে অন্ধকারে সেটা বোঝা গেল না। একবার চেঁচিয়ে উঠল রতীন, জানতে চাইল, কে? সাড়া যেটা পেল, সেটা অস্পষ্ট, গলাটা ছেলের না মেয়ের সে সন্দেহও ঘুচল না। অতএব বালিশের তলা থেকে চাবিটা তুলে নেয় রতীন, সিঁড়ির পথ ধরে। নামতে নামতে মনে হয়, সেদিনকার সেই মেয়েটাই আবার এল না তো? সেটা সত্যি হলে রতীনের এই মনের অবস্থায় আজ তাকে ফেরানো হয়তো দায় হবে—বিশেষত আজ যখন একটা কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটাতে চেয়ে-ছিলই রতীন, তাই কে জানে মেয়েটাকে পেলে হয়তো সে-অঘটন সে ঘটিয়ে ছাড়বে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেমন এক ধরণের ভয় ধরতে থাকে তার, আবার শিরায় শিরায় উন্মাদনাও জাগে। অথচ আশ্চর্য, প্রথম যেদিন মেয়েটা আসে, সে কিছুই বোঝেনি—বোঝে মেয়েটাকে তাড়াবার পরই। এই তো সেদিনই, বোধ হয় পরশুই হবে, সন্ধ্যার খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাদে ওঠার আগে তলার বাগানে একটু বসেছে রতীন, আর মেয়েটা এসে হাজির হয় গেটের সামনে—বলে কে নাকি তাকে খবর দিয়েছে এ বাড়ীতে আয়ার দরকার আছে, তাই জানতে এসেছে। না, এখানে আয়ার কোন দরকার নেই, সরাসরি বলে দেয় রতীন। তবু মেয়েটা নড়ে না শেষে দৃঢ়স্বরেই রতীনকে বলতে হয় যে না, দরকার নেই, ও তা বলে সে ফিরতে উদ্যত হয়। মেয়েটার বয়স হবে বছর পঁচিশেক, মুখশ্রী তেমন না হলেও দেহ অত্যন্ত উন্নত—অল্প আলোতেও রতীন স্পষ্ট দেখতে পায়, বাবার

গোপীনাথ টেলার্স
কুথ স্টকিস্ট
ও
আধুনিক রুচিসম্মত সকল প্রকার
পোষাক প্রস্তুতকারক
কে এন সি রোড (হরিতলা)
বারাসাত

আগে মেয়েটা চোখের কোণে এমন একটা হাসি ছড়ে যাতে রতীন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। মেয়েটা তখন বলে, সে আবার আসবে খোঁজ নিতে, এবং গভীর অর্থবহ সেই একই হাসি চোখের কোণে আরো একবার খেলিয়ে চলে যায়। আর তখনি এক মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় রতীনের কাছে—না, আয়ার দরকার আছে বলে কোনো খবর মেয়েটা পায়নি, বরং যে খবর সে পেয়েছে ও যার জন্যে সে এসেছিল, তা হচ্ছে রতীন একলা আছে। শুনেছিল বটে রতীন, দিল্লীতে এসব জিনিসের রেওয়াজটা একটু বেশি, বিশেষত নাকউঁচু পয়সাওলা পাড়ায়।

না থানা, থাক, বাঁচা গেল, মেয়েটা নয়, বরং পুরুষ একজন, নিঃসন্দেহে—গেটের কাছে আসতেই দেখতে পেল রতীন। বলা যায় না, হয়তো দুরভিসন্ধি নিয়েও কেউ আসতে পারে, আর এই গরম কালেই চুরিডাকাতি খুন-খারাপি দিল্লীতে বড্ড বেশি হয়, তাই চাবিটা খোলার আগেও একটু দূর থেকে গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'কাকে চাই?'

'আমি মনু, রতীন', পরিচিতস্বরে উত্তর এল।

'সে কি, মনু? এত রাত্তিরে? কী ব্যাপার? এসো এসো', গেটটা খুলতে খুলতে বলল রতীন।

'অনেক রাতে এসে খামাখা তোমায় বিরক্তি করছি তো?'

মনুকে ভিতরে ঢোকানোর পর গেট বন্ধ করতে করতে রতীন বলে :

'না না, বিরক্তের কি, আমি তো এখন একলাই।'

'হ্যাঁ, জানতাম সেটা, অনেকটা সেই কারণেই আমার ভরসা পেলাম।'

'হ্যাঁ, সত্যিই তো, তোমার সঙ্গে তো সেদিনই দেখা হ'ল। এখন বসি কোথায় বল ভাই—ঘরে বসবে না বাগানে?'

'যেখানে বলবে' নির্লিপ্তের ভাবে জানায় মনু।

'তবে ঘরেই চল ভাই, গরম অবশ্য, কিন্তু বাগানে ব'সে এত রাতে কথা বলা মুস্কিল—আশপাশে সব ঘুমোচ্ছে তো।'

'চল।'

বসবার ঘরে তাকে নিয়ে যায় রতীন, আলো জ্বালায়, পাখা চালায়, বলে :

'বস। খাওয়া-দাওয়া করেছ কি?'

'এমন ভেবে তুমি চঞ্চল হ'য়ো না, আমি শুধু তোমার কাছে একটু বসতে এসেছি, এই পর্যন্ত।'

তার উত্তরটা যদিও পেল না, তবু মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে রতীন। কারণ বাড়ীতে তৈরি কিছু নেই, আর এই রাতে যদি দারোয়ান লোকটাকে ঘুম থেকে টেনে তোলাতে হয় তো সেটা সে খুব পছন্দ করবে ব'লে মনে হয় না। ঘরটা বন্ধ ছিল, তাই ভয়ানকর এক গুমোট ভাব—জানলা-দরজা খুলতে খুলতে বলে রতীন :

'বাঃ, বসবেই তো। আমার আবার রান্নার লোকটি ভাই চ'লে গেছে, বুঝলে—চা করাও মুস্কিল এখন। তবু করার একটু চেষ্টা করতে পারি—করব?'

'না, না, সত্যি, কোনো দরকার নেই।'

'কেন, আমার কষ্ট তো কিছু নেই—শুধু গ্যাসটা ধরানো ও জল চাপিয়ে দেওয়া। তবে দুধ আছে কি না বলতে পারছি না, দেখতে হয়।'

'না ভাই, সত্যি, দরকার নেই—অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না কর।'

'আমার মনে করার কী আছে', হাসতে হাসতে বলে রতীন ও ব'সে পড়ে। মনু ইতিমধ্যেই আসীন, সামনের সোফাটায়—নিশ্চয় অনেকটা হেঁটে এসেছে, সারা মুখে ঘাম। ঘরের কোণের এয়ার কন্ডিশনারটার দিকে তাকিয়ে আবার বলে রতীন—যেন কিছু বলতে হবে, এইভাবেই :

'যন্ত্রটা ভাই খারাপ হ'য়ে প'ড়ে আছে—বেশি কিছু নয়, সামান্য একটা সুইচের গন্ডগোল। কিন্তু এখানে তো কিছু মিলবে না, সেই হংকং-এ লিখতে হয়েছে একটা নতুন সুইচের জন্যে। ভাগ্যে আপিস সাহায্য করে, নইলে সেটা পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না—সব আমদানি তো বন্ধ।'

'তাতে কী', স্বাভাবিক সৌম্য হাসিতে মুখটা ভ'রে ওঠে মনুর, 'এয়ার কন্ডিশনারে তো আমি ভারী অভ্যস্ত যে তা না হ'লে চলবে না।

'না, তা নয়', লজ্জিতের ভাবে বলে রতীন, 'যন্ত্রটা যখন রয়েছেই, চলতে তো পারত। ফ্যানের হাওয়াটা কী রকম গরম দেখছ?'

মনু উত্তর দেয় না, ভাবছে যেন কিছু। তবে সর্বদাই একটু চিন্তিত ধরণের ছেলে সে, দার্শনিক যথার্থ অর্থে। আবার বলে রতীন :

'তো তুমি বাড়ী চিনে এলে কেমন ক'রে? এ-বাড়ীতে তো আগে কখনো আসোনি।'

'না, তুমি বোধ হয় বাড়ী বদল করেছ মাস ছয়েক হ'ল, না?'

'হ্যাঁ, তা হবেই'. ভাববার চেষ্টা ক'রে বলে রতীন, 'গত অকটোবরে এসেছি তো—তার মানে ধর মাস নয়েক হ'তে চলল। আর তুমি? সেই একই বাড়ীটায় আছ?'

'না, আমরাও.....' ব'লে হঠাৎ থেমে যায় মনু, পরে বলে, 'আমিও অন্য বাড়ীতে উঠে গেছি, যদিও একই এলাকায়। তুমি তো আস না অনেকদিন, শুধু তোমার অপিসে কখনোসখনো দেখা হয়, বা ফোনে কথা হয়।'

'এ-অভিযোগ তোমার সত্যি', লজ্জিত না হ'য়ে পারে না রতীন, 'কিন্তু কী করি বল ভাই, জানোই তো কুনো মানুষ...আমি, সহজে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠতে পারি না।'

এ-অজুহাতটা অবশ্য ধোপে টিঁকবে না, জানে তা রতীন। কারণ এমন তো নয় যে সে সাঁতাকারের কুনো ব্যাঙ, কোথাও যায় না। বরং সে অনেক জায়গায়ই যায়—এক গাদা ককটেল পার্টিফার্টিতে, কত সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। কত লোককে সে বাড়িতেও ডাকে, কখনো ড্রিংকসের জন্যে, কখনো ডিনারের জন্যে—এবং যে চাকরি তার, তা না ক'রে উপায়ও নেই। অথচ দিল্লীতে বন্ধু বলতে তার মনু, এ-কথা তো সে নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারে না। তবে কেন মনুর কাছে সে কখনো যাওয়ার সময় ক'রে উঠতে পারে না, বিশেষত আজকাল তো নয়ই—কেন সে মনুকে তার বাড়ীতে কখনো ডাকে না? অবশ্য এখানকার ড্রিংকস-ডিনারে যারা অভ্যস্ত, মনু তাদের দলে একেবারেই নয়, সুতরাং তাদের সঙ্গে মনুকে ডাকার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কোনো কোনো সন্ধ্যা তো খালি থাকে রতীনের, থাকে না? সে-সন্ধ্যায় কেন সে মনুর কাছে যায় না বা তাকে ও তার স্ত্রীকে বাড়ীতে ডাকে না? মনু তার বাল্য-বন্ধু, দুজনের আদি নিবাস কলকাতার কাছে একই গ্রামে, যেখানে আজ বিস্মৃত এক শরতের শুভ সোনালী প্রাতে কপালে চন্দনের ফোঁটা প'রে দুজনের হাতেখড়ি হয় একত্র, গ্রামের একই পাঠশালায় তারা ভর্তি হয়, পরে একই স্কুলে যায়, তারো পরে কলকাতাতেও একই কলেজে পড়তে আসে—শুধু তফাত যা মনুর ছিল আর্টস্, রতীনের সায়েন্স। এবং আজ ভেবে হাসি পেলেও এই মনুরই হাতে একদিন তার রাজনীতিতে দীক্ষা হয় কলেজে, একদিন এই মনুরই সঙ্গে সে কত পিকেটিং করেছে, রাস্তার কত শোভা-যাত্রায় নেমেছে—আজ রতীন সে-রতীনও নয়, মনুও সে-মনু নয়। রতীন যে-পথ নিয়েছে, তা তো জানাই আছে—আর মনু যেন ক্রমশই এক ধরণের অধ্যাত্মবাদী হ'য়ে পড়ছে, কথাবার্তায় প্রায়ই বেদান্তের প্রসঙ্গ পাড়বে, দৈনন্দিন আলাপে-আলোচনায় বা আচরণেও তার দার্শনিকতার ভাব সুস্পষ্ট। নিঃসন্তান জীবনে সে একা-একাই থাকে, তার অতি প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে, আর আছে নিজের পড়াশুনো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো—ইতিহাসের লেক-চারার সে। লেকচারার থেকে রীডার ও রীডার থেকে প্রফেসরের যে-সিঁড়ি, তাতে ওঠার জন্যে প্রাণপণ কোনো বাসনাও তার নেই—যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট। কি কর্ম-ক্ষেত্রে, কি চিত্তবৃত্তিতে, রতীন সম্পূর্ণ আলাদা, তবু তাদের বন্ধুত্বটা বজায় ঠিকই আছে, হয়তো ছেলেবেলাকার টান এমনই টান ব'লে। এবং এটাও সত্য, মনু সম্বন্ধে রতীনের মনে চিরকালই একটি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব—ব্যক্তিগত জীবনে আশ্চর্য রকম সৎ ও সর্বপ্রলোভনবর্জিত এমন একটা মানুষকে দেখে কার না শ্রদ্ধা হয়? আর সে-শ্রদ্ধা তো রতীনের হবে আরো বিশেষ ক'রেই, কারণ সততা ও প্রলোভন-শূন্যতার গুণে হয়তো তার নিজের চরিত্র ততটা চিহ্নিত নয়। কিন্তু এ-সবের মোদ্দা কথাটা হ'ল এই যে যদিও সে

মনুকে আজও বন্ধু ব'লে মানে ও তাকে শ্রদ্ধা করে, এবং যদিও তারা দুজনেই বহু ঘাটের জল খেয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে আবার দিল্লীতে মিলিত, সে কেন আরো ঘন ঘন দেখা করে না মনুর সঙ্গে?

'হ্যাঁ, তবে বাড়ী চিনে তুমি এলে কেমন করে বল তো?' আগের প্রশ্নে আবার ফেরে রতীন।

'টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নম্বরটা বার করে নিই, তারপর খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম। এভাবে হুট করে এসে পড়া, আর এত রাত্তিরে, তোমার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি তো?'

'এই দেখ.....' আপত্তি তুলতে যায় রতীন।

'আচ্ছা, তুমি ঘুমোচ্ছিলে, না?'

'সত্যি বলতে কি, শুয়ে পড়েছিলাম—তবে ঘুম আসেনি। কিন্তু তোমাকে এভাবে একলা বেরোতে তো আগে কখনো দেখিনি, না তুমিও এখন আমারই মত ব্যাচিলর—অর্থাৎ স্ত্রী সাময়িকভাবে অন্যত্র কোথাও?'

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলে রতীন, কিন্তু মনু হঠাৎ অসাধারণ গম্ভীর হয়ে যায়, চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে আনে। বলে :

'তবে বলি তোমায় ভাই,' ব'লে থেমে যায়। আবার ধরে, 'কারণ বলতেই যখন এসেছি, কারণ একা একা আর পারছিলাম না—অসহ্য ঠেকছিল, বিশ্বাস কর।'

রতীনও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে হঠাৎ, জানতে চায়, 'কী হয়েছে?'

'বলছিলে যখন তো বলি—হ্যাঁ, আমিও একলা, আজ ভয়ংকর একলা ভাই এই পৃথিবীতে।'

'কী হয়েছে ভাই?'

'তোমার স্ত্রী রতীন, আজ নেই, কাল ফিরবেন। কাল না ফিরলে পরশু বা দুদিন কি তিনদিন কি চারদিন বাদে ফিরবেন। ফিরবেনই তো, ব্যালাই ঘাট, ফেরার মত জিনিস আছে? আবার এ-গৃহ উজ্জ্বল হোক, আবার এর প্রতিটি কোণে কল্যাণী গৃহকর্ত্রীর স্নেহ দৃষ্টি পড়ুক—সেইটেই তো কাম্য, নয় কি ভাই?'

রতীন কিছুই বুঝতে পারে না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তখন রতীনের চোখে চোখ রেখে প্রতিটি শব্দ পৃথক করে ধীর গলায় বলে মনু :

'কিন্তু অঞ্জলি আর ফিরবে না, সে আজ সকালে মারা গেছে।'

যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে রতীনের, স্তম্ভিত হয়ে যায়। অবিশ্বাসের সুরে বলে :

'মানে?'

মনু শুধু নীরবে ঘাড় নাড়ে একবার, পরে হয়তো রতীনের মুখে-চোখে বিহ্বলতার লক্ষণ দেখেই বলে ওঠে

'কিন্তু না-না ভাই, তুমি দুঃখ পাবে না, তোমাকে দুঃখ দিতে আমি আসিনি—আমার যে-দুঃখটা রতীন, সেটা এমনিতেই প্রচণ্ড, এ নিয়ে অন্যের আরো দুঃখের দরকার কি বল? তা ছাড়া ইতিমধ্যেই তোমাকে অনেক বিরক্ত করেছি, এই নিশুতি রাতে তোমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে এনেছি—শুধু নিজেরই স্বার্থে। তার ওপর দুঃখও দেব তোমায়—না—না, সেটা চাই না ভাই। আসলে জানো কি রতীন, আমি কারুর অনুকম্পাও চাই না, শুধু.....'

থেমে যায় মনু—রতীনও ভেবে পায় না কী বলবে। আবার বলতে থাকে মনু

'শুধু আজ সন্ধ্যায় ঐ একই বাড়ীতে আমি আর ফিরতে পারলাম না। আসলে ফিরেছিলামও জানো, কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে সমস্ত শরীরটা যেন কেমন করতে লাগল, বুকের ভেতরটায় যেন হু হু করে ঝড় বইতে শুরু করল—ভাবলাম, এ-মুহূর্তে কোনো বন্ধুজনের সঙ্গ চাই। একটা কোনো চেনা মুখ, একটা আপনার জন—হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল, তোমার ঠিকানাটা বার করতে ছুটলাম পাশের বাড়ী। সেখানে টেলিফোন আছে। তাই চলে এলাম ভাই, এবং একটু সুস্থ বোধ করলেই আবার ফিরে যাব। এবং সুস্থ তো বোধ করবই, জীবন তো চলবেই, কাল সকালে আবার সূর্য তো উঠবেই, উঠবে না রতীন?'

রতীন তবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। একটু হেসে বলে মনু :

'আসলে বলতে পার, তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্বের কর্তব্য পালন করতেই এসেছি। কারণ জানো, মনে হয় এ-সময়টা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে যেন তোমাকে কাছে পাওয়ার দরকার আমার, যেন আমার কর্তব্যও তোমাকে কাছে পাওয়া। তুমি যে বন্ধু, তাই আমার কষ্টটা জানার তোমার দরকার, বরং সে-কষ্টটা তোমাকে জানানো আমার দরকার।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রতীন জানতে চায় :

'কী হয়েছিল?'

'সে শুনে আর লাভ কি ভাই, যা হয়েছিল, তা তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

রতীন পীড়াপীড়ি করে না, কিন্তু মনুই আপনা থেকে বলে :

'না, এটাও শোনার দরকার তোমার, বরং তোমাকে শোনানো আমার দরকার—তাতে সাহসটা ফিরবে। কারণ এটা যদি মুখ ফুটে কাউকে বলতে না পারি, শুধু জিনিসটার স্মৃতিটাই সারাক্ষণ হৃদয় বিদীর্ণ করতে থাকে, তো সেটাও তো কাম্য নয়, আমারই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কাম্য নয়।'

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে মনু, পরে বলে :

'কী হয়েছিল জানো? কাল রান্না করতে গিয়ে শাড়ীতে আগুন লেগে যায়।'

তার নিজের অজ্ঞাতে রতীনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে : 'উঃ!'

যাকে মানুষ চেনে না, জানে না, সেও যদি এমনভাবে মারা যায় ও সে-খবর যদি শুধু খবরের কাগজেও পড়তে হয়, তবু মানুষ ব্যথিত না হয়ে পারে না। আর এ তো মনুর স্ত্রী। বলে মনু :

'কালই তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ও পরে আজ সকালে শ্মশানে।'

কথা কেবলি আটকে যায়—কী কথা বলার আছে এখন? তবু রতীন চেষ্টা করে, বলে :

'আজ তোমাকে আসতে দেখেই কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল, এত রাত্তিরে, এভাবে.....'

আবার সর্বগ্রাসী নীরবতা। রতীন বিড়ম্বিত বোধ করতে থাকে, মনুর এত বড় শোকের সামনে সে জাগবে কেমন করে, বুঝতে পারে না। কোন কথা বলা উচিত তার, কোন কথা বললে অশোভন ঠেকবে না, সেটাও ঠাওর করে উঠতে পারে না। বিশেষত শোকটা যার, সে যখন সামনে বসে আছে, রতীন তো হাজার হলেও বাইরের লোক মাত্র—কারণ যতই চেষ্টা করুক, এটাকে তো

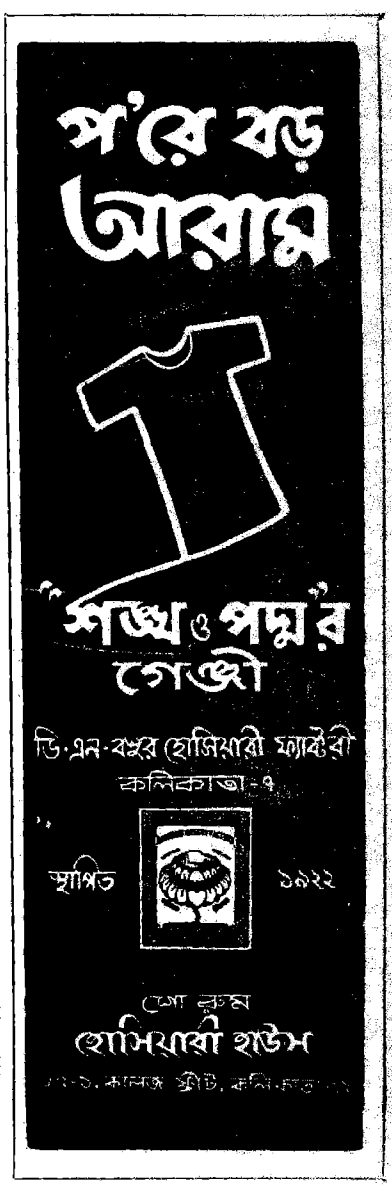

সে তার নিজের শোক বলে নিতে পারবে না, পারছেও না। ভয়ংকর দুঃখের কথা, সত্যি, কিন্তু জিনিসটা তার নিজের থেকে দূরেরও, এ-কথা মানতে আপত্তি কী!

'সান্ত্বনা তোমায় কী যে দেব ভাই, জানি না,' কখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে রতীন।

'সান্ত্বনা চাইতে তো আমি আসিনি, সান্ত্বনা দেওয়ারও নেই। এসেছি শুধু তোমার একটু সঙ্গ পেতে—এখানে আর কার কাছেই বা যাই বল।'

'ছাদে যাবে মনু? চল না। সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়া আছে—একটু বিশ্রাম করবে, আমিও থাকব।'

মুখ তুলে একবার তাকাল মনু, কিছু ভাববার চেষ্টা করল, পরে বলল :

'বেশ, চল।'

হেলান দিয়ে বসা যায়, এমন একটা বেতের চেয়ার তলা থেকে ছাদে নিয়ে গেল রতীন, পরে নিজের পাতা বিছানাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মনুকে বলল :

'নাও, তুমি একটু গড়িয়ে নাও, আমি চেয়ারটায় বসছি।'

'সেটা হয় না,' আপত্তি তোলে মনু, 'তাছাড়া গড়াবার কোনো ইচ্ছাও নেই আমার তুমিই একটু শোও, ঘুমোবার চেষ্টা কর—বরং আমিই চেয়ারটাতে বসি, এ্যাঁ?'

বলার কিছু নেই, শুয়ে পড়ে রতীন—মনুও চেয়ারটায় গিয়ে বসে। কে জানে কত রাত, আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে সমান। রাতের পর রাত একই তারা রোজ দেখে রতীন, এবং হয়তো প্রায় একই জায়গায় কোনো বিশেষ মুহূর্তে—বড় বিস্ময় এই রাতের আকাশ। যেমন সপ্তর্ষি বা কালপুরুষ, বা আরো কত তারার সমষ্টি রয়েছে, যারা পরস্পরের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের চুলচেরা ব্যবধান ঠিক বজায় রেখে চলে। কী ক'রে? কারণ শোনা যায়, ওরাও তো প্রত্যেকে সর্বক্ষণ ভয়ংকরভাবে নড়ছে, ঘুরছে, যে যার নিজের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তে চরকিবাজী খাচ্ছে। অথচ এই দূর থেকে সব এত শান্ত, সব এমন যে যার ঠিক ঠিক জায়গায়—শুধু পৃথিবীরই পঁচকে মানুষদের জীবনে হুলস্থুল বেধেই আছে। তারামণ্ডল সম্বন্ধে এত কম জানে রতীন, মনে হয়, একটু পড়াশুনো করার দরকার। দিল্লীর এক বাঙালী ভদ্রলোক একবার তাকে আমন্ত্রণ জানান—ভদ্রলোক এসব নিয়ে রীতিমত পড়াশুনো করেছেন, তাঁর বাড়ীতে নাকি একটা দূরবীণও আছে, রাতের আকাশে অনেককিছু ভাল করে দেখা যায়। হ্যাঁ, যাবে একদিন রতীন তাঁর বাড়ী।

রতীনের ভাবনা চলতে থাকে এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে, লাফিয়ে লাফিয়ে, কখনো পৃথিবী, কখনো আকাশ, কখনো তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন, রাত্রি ও ছেলে-মেয়েরা, কখনো মনুর এই শোক ও হঠাৎ ভেসে ওঠা অঞ্জলির মুখ, কখনো কল্পনায় রাত্রি ও বিভাস চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় কফি পানরত। জানে না কতটা সময় চলে গেছে, হয়তো আবার একটু তন্দ্রাও আসে, যখন খুট করে কী একটা শব্দে চোখ মেলে তাকায় দেখে চেয়ার ছেড়ে মনু উঠে দাঁড়িয়েছে, রতীনও তাই বিছানায় উঠে বসে, বলে :

'কী হ'ল?'

'চলি ভাই, তুমি ঘুমোও এবার।'

'এখন যাবে কোথায় এই রাত্তিরে, অন্তত রাতটা কাটিয়ে যাও।'

'না, অনেক বিরক্ত করলাম তোমায়, এবার আমায় যেতে দাও।'

ভাবে রতীন, আজ মনুর এই অবস্থা মনের, নিজের দুঃখের সঙ্গে তাকে নিজেই যুঝতে হবে এবং তাছাড়া হাজার হ'লেও দার্শনিক ছেলে সে, ভাবনা কিসের? আত্মশক্তি তাকে ফিরে পেতেই হবে, তাই সে যদি একলা থাকতে চায় তো তাকে ছেড়ে দিক না রতীন। বলে :

"কিন্তু যাবে কোথায়?'

'বাড়ীতেই, আর কোথায়?'

'তো বেশ, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, তুমি ঘুমোও।'

'কিন্তু এত রাত্তিরে তুমি পাবে কী—না বাস, না ট্যাক্সি—অতদূর যাবে কী করে?'

'একটা কিছু পেয়ে যাবই', হেসে বলে মনু, 'নইলে পা দুটো তো আছেই।'

পরে হয়তো রতীনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই আবার বলে :

'তুমি ভেবো না ভাই, ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডে এন্তার ট্যাক্সি তো আছেই, দরকার হলে ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে নেব।'

এর ওপর আর কথা চলে না। তাছাড়া মনে হয় রতীনের, সব বিরাট শোকেরই একটা মহিমান্বিত স্বাতন্ত্র্য থাকে, শোকাচ্ছন্নকে বাইরের লোকেরা স্পর্শ করতে ভয় পায়। অতএব মনুকে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে, নামতে নামতে বলে :

'আমার মনে হয়, কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও ভাই, ভালো লাগবে।'

'কী করব এখনো জানি না। আসলে ভাবিনি, দেখব। কিন্তু তুমি আর নামবে না, আমি চলি।'

'আমাকে তো নামতেই হবে গেট খোলার জন্যে।'

'ও।'

আর কোনো কথা না ব'লে মন পথে বেরিয়ে পড়ে, একবার পিছনে তাকায়ও না—তার চলে যাওয়ার দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে অস্ফুটে ব'লে ওঠে রতীন, 'বেচারা!' পরে গেট বন্ধ করে, ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে ও ঘড়িতে দেখে রাত তিনটে, আলো নেভায় ও ছাদে ওঠে।

শুল তো আবার, কিন্তু এসবের পরে আর কি ঘুম আসবে? রাতও কত সামান্য এখন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হ'তে শুরু করবে। এদিকে কাল আপিসে একগাদা কাজ, রুটিন শুধু, উদ্দীপক কিছু নয়—আর ভালো লাগে না। মে-জুন-জুলাই, তিন তিনটে মাস, অথচ রবিবার ছাড়া একটা ছুটির দিন নেই—প্রথম ছুটি সেই ১৫ই আগস্ট। দিল্লীর এই গরম কালটা সবদিক থেকেই অতি অপদার্থ সময়।

ভাবে রতীন, তাহলে অপ্রত্যাশিত একটা কিছু সত্যিই ঘটল, যদিও তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নয়—কিন্তু তাতে কী, ঘটেছে তো। যাক, একটা লাভ যে তার এক-ঘেঁয়েমি ভাবটা কাটল। এখন যা ঘটেছে, তা হবে তার আগামী অনেক মুহূর্তের রোমন্থনের সঞ্চয়। হঠাৎ মনে হয়, মনুর এই শোচনীয় দুর্ঘটনাটার জন্যে সে কোনো অংশে দায়ী নয় তো? কারণ সে-ই তো বেচেছিল অপ্রত্যাশিত ঘটাতে—চায় 'ন? পরমুহূর্তে মনে হয়, যাঃ, তাই বা কী ক'রে হয়, অঞ্জলি তো মারা গেছে সেই কোন সকালে, যখন রতীন তেমন কিছুই চায়নি, চাওয়ার কল্পনাও তার মনে আসেনি। অতএব অভিযুক্ত তো তাকে করা চলে না, তার দোষটা স্খলন হয়ে গেল—আবার হাল্কা বোধ করতে শুরু করে সে।

মাথার উপরে বিরাট আকাশ, মেঘহীন। হয়তো ঠিক এত বড় শূন্যতাটাই আজ মনুর বুকে, এ শূন্যতা সে ভরবে কেমন ক'রে? আর আশ্চর্য, এমন একটা সময় সে সকলকে ছেড়ে হাজির হল এসে রতীনের কাছে। স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ হাতের কাছে যে-কোনো খড়কুটো পেলে আঁকড়ে ধরতে চায়—কিন্তু মনুর হাতে রতীন তো সে খড়কুটো নয় আজ, কারণ মনু যে সকলকে ছেড়ে একমাত্র তাকেই বেছে নিল এই ভীষণ মুহূর্তে, চেষ্টা করে সে রতীনের নতুন ঠিকানা অবশেষে বার ক'রে এসে হাজির হ'ল। এবং বাড়ী খুঁজতে কষ্টও হয়েছে তার নিশ্চয়ই, অনেক সময়ও লেগেছে—এ পাড়ায় বাড়ীর নম্বরগুলো বিশেষত বড় গোলমেলে, তিনের পরে পাঁচ ও পাঁচের পরে নয় এবং কখনো নয়ের পরে হঠাৎ চারও দেখা যায়। আর সেই কারণেই হয়তো মনুর পৌঁছোতে এত দেরী হল। কিন্তু আশ্চর্য, এই প্রকাণ্ড দায়িত্বের জন্যে সে রতীনকে কেন নির্বাচন ক'রে নিল—আর দায়িত্বটা কি কিছু কম? এক ভয়াবহ শূন্যতার অতল গহ্বরে পড়ে যাচ্ছিল মনু, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সে রতীনের হাত ধ'রে তার পতন থেকে নিজেকে সামলাতে চায়। কিন্তু তাকে সেই সহযোগী হাত কি এগিয়ে দিল রতীন, তার দায়িত্ব সে কি পালন করল? মনে হল রতীনের, তার অন্তরের কোন অগম্য প্রদেশে যেন এক অদ্ভুত যন্ত্রণাবোধের শুরু হচ্ছে, যে-বোধ তার পক্ষে হয়তো যেমন অভূতপূর্ব তেমনি অপ্রকাশ্য।

লোকটা রতীন সত্যিই কী ভয়ংকর সুবিধাবাদী, কী চরম স্বার্থান্বেষী—মনে

হয় তার। ভোগ করার বা অর্জন করার একটা সুযোগও সে জীবনে হারায়নি, সুবিধা পেয়েছে যেই ঘৃণ্য বন্য পশুর মত লাফ মেরে সেটা আঁকড়ে ধরেছে। ছাত্রাবস্থার পর হ'তে তার একটার পর একটা কীর্তি শুধু সেই কাহিনীই মাত্র—আর এখন তো বিদেশী কোম্পানীর চাকরিতে বেশ গুছিয়ে বসেছে। এত তো ভালবাসে সে তার কলকাতাকে, কিন্তু পেলে সেই কলকাতায় সে কি রাজী থাকবে ফিরতে? প্রশ্নটা বাহুল্য, কারণ সে-পরীক্ষা তো আগেই হ'য়ে গেছে। তার কোম্পানী তো বছর খানেক আগে আপনা থেকেই জানায়, তাদের কলকাতার শাখা আপিসে সে যদি যেতে চায় তো যেতে পারে। কই, রতীন তো রাজী হয়নি? কারণ কলকাতার জীবন দুর্বিষহ—ভিড়, ঘাম, নোংরা, সেখানে দিল্লীর মত এমন নানাদিক দিয়ে নিরিবিলি সুখে থাকার কোনো উপায় নেই, এখানকার এমন বাড়ীও মিলবে না। তার ওপর সেখানে রয়েছে আত্মীয়স্বজনের বিরাট গোষ্ঠী, যারা তাকে জ্বালিয়ে খাবে, চাকরি চেয়ে, পয়সা চেয়ে, সাহায্য চেয়ে—না, কলকাতায় সে যায়নি। তাছাড়া আজকের সন্ধ্যা থেকে এই যে এত সব জল্পনাকল্পনা তার, এগুলোও কি কম ঘৃণ্য? অপ্রত্যাশিত ঘটবে—কেন? কারণ তাতে আমি একটু আনন্দ পাব, আমার একঘেঁয়েমিটা কাটবে—চমৎকার। এ কি এক ধরনের আত্ম-কন্ডুয়ন নয়, এক নিকৃষ্টতম আত্ম-মৈথুন নয়? রাত্রি ও বিভাস নিয়ে তার এত কথা ফাঁদা, অথবা সেই উন্নত দেহের মেয়েটা তার তথাকথিত আয়ার চাকরি চেয়ে গেটে আবার এল কিনা ভেবে শঙ্কিত ও ব্যগ্র হওয়া, এমনকি সবার ওপর মনুর এই অসহ্য শোকের ঘটনার ভিতরেও অপ্রত্যাশিতকে আবিষ্কার করে রতীনের একঘেঁয়েমি ভাব কাটানোর আশা, এর কোনটা তাকে মনুষ্যপদবাচ্য করে তোলে?

কিন্তু মনুর ব্যাপারটায় সত্যিই কি কিছু করার ছিল তার? এতবড় একটা শোকের সামনে আর কী সে বলতে পারত, বা আর কী করতে পারত? করতে পারত মানে? ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই পারত—কই, সে অস্বীকার করুক তো নিজের বুকে হাত দিয়ে যে মনুর দুঃখটা আসলে তাকে তেমন স্পর্শ একেবারেই করেনি? অথচ তাকে বন্ধু ভেবে, তার প্রতি কী প্রচন্ড বিশ্বাসের ভাবে সেই মনু আজ এসেছিল তার দরজায়। কিন্তু রতীন তাকে উল্টে এমন নীরবে চ'লে যেতে দিল, শুধু এই মিথ্যা অজুহাতে মনে মনে সান্ত্বনা পেতে চেয়ে যে মনু এখন একলা থাকতে চায়, ও তার একলা থাকাই ভালো। একলাই যদি থাকতে চাইবে সে তো এত কষ্ট করে কেন এসেছিল রতীনের দরজায়? রতীন অন্তত জোর করে তাকে এখানে রেখে দিতে পারত কয়েকদিন, তার কারণে আপিস থেকে ছুটি পর্যন্ত নিতে পারত—আর এখন তো তার বাড়ী খালি পড়ে আছে, রাত্রিদের ফিরতে ফিরতে আরো কয়েকদিন যাবেই। অন্তত আজ রাতটা তো সে রেখে দিতে পারতই মনুকে, পারত না? মনু যদি না শুনত তো না শুনত, সে-চেষ্টার মধ্য দিয়ে মনুর প্রতি তার আগ্রহটাও দেখাতে পারত—এক কথায়, সে আরো একটু মানুষ হতে পারত, শুধু মনুর বা অন্যের চোখে নয়, লোক দেখিয়ে নয়, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার নিজেরি চোখে, এই মুক্ত আকাশ-ভরা তারার চোখে। হঠাৎ মনে হল রতীনের, এই তারাগুলোও তাকে বলতে চায় ঐ একই কথা, যে-কথা একের প্রতি অন্যের বিশ্বাসের, একের সঙ্গে অন্যের সমন্বয়ের, এবং যে-একমাত্র সম্বন্ধের যোগে অর্থবহ এই বিশ্বজগৎ। সে-সম্বন্ধটা বাদ দিলে বা রতীনের মত শুধু স্বার্থপর হলে পৃথিবীর কিছুরই কোন অর্থ থাকে না।

তবে কি সে ছুটে এখনি যাবে মনুর কাছে? পরক্ষণেই মনে হয়, আজ রাতটা থাক না, কাল সকালে গেলেই হবে। তখনি আবার নিজেকে বিশ্লেষণ করতে বসে: কেন সে উঠতে চায় না এখন, কারণ সারা রাত চোখের পাতা বোজে নি, পারলে একটু ঘুমোতে চায়, এই তো? অথবা যতটা পারে, দায়িত্ব বহন করার মুহূর্তটাকে পিছিয়ে রাখতে চায়, এই তো? না, সেটা করতে দেওয়া হবে না, কারণ জীবনটা একটাই ও তা ছোট, এবং ডাকও কদাচিত কদাচিতই আসে—আর যখন তা আসে ঠিক মুহূর্তে সাড়াটি না দিতে পারলে সে-ডাক চিরকালের নীলিমায় হারিয়ে যায়। কিন্তু যাবে কোথায় রতীন? সে তো মনুর নতুন বাড়ীটা চেনে না—সে-বাড়ীতে টেলিফোনও নেই যে ডিরেকটরি দেখে বার করে ফেলবে। তবে মনু বলছিল, বাড়ীটা তার আগের এলাকোতেই, সুতরাং লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুঁজে বার করা হয়তো কঠিন হবে না— অন্তত আগের বাড়ীটাতেও প্রথমে যেতে পারে, সেখানে হয়তো আরো সহজে খোঁজ পেয়ে যাবে। এবং এত চিন্তার দরকারই বা কী, কারণ মনু নিশ্চয় এখনো রাস্তায়, হাঁটছে, কারণ ট্যাকসি সে নেয়নি, নিতে চায়নি, চাইলেও পায় নি, কারণ এত রাত্তিরে ড্রাইভারদের রাজী করানো প্রায় অসম্ভব। সুতরাং গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লে অচিরেই রতীন ধরে ফেলবে মনুকে পথেই—আর এখান হতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে পথটা তো মোটামুটি একটাই, যেটা সবাই সাধারণত নেয়। ওঠা যাক তবে, এই প্রথম আরো একটু মানুষ হতে চাওয়ার যাত্রায়—সেটা রতীন শেষ পর্যন্ত পারুক বা না পারুক, চাওয়াটাই যথেষ্ট।

ঝটপট তলায় নেমে তৈরী হয়ে নেয়, গাড়ী বার করার জন্যে গ্যারেজ খোলে। এবং ঠিক সেই সময় গেটে আবার আওয়াজ, এবার সজোরে—তালাটা ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে কেউ। চেঁচিয়ে বলছে কে, 'টেলিগ্রাম!'

টেলিগ্রাম? কার আবার? এগিয়ে গিয়ে টেলিগ্রাম নেয় রতীন, পিওনের হাতের কাগজটায় সই করে ও বাগানের বারান্দাটায় ফিরে এসে আলো জ্বালায়। টেলিগ্রামটা খোলে, পড়ে:

'মোটর দুর্ঘটনায় বৌদি নিদারুণ আহত। অবিলম্বে এসো। আনন্দ।'

সে কি? পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে রতীনের, অক্ষরগুলো নাচতে থাকে তার চোখে। প্রথম যা মনে আসে সেটা হল সকালের দিকে একটা ফ্লাইটের আছে এবং যেমন করে হোক সেটা ধরতে হবে। কিন্তু জায়গা পাবে তো? পেতেই হবে—এখনি ছুটছে সে এয়ারলাইন্সে আপিসে। আপিস এখন খোলা তো? দেখতে দোষ কি—দরকার হলে সে না হয় সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে যাবে। কিন্তু সেখানে টিকিট বিক্রী করে তো? সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে রতীনের।

আর আশ্চর্য, ওরাই বা কী, একটা ট্রাংক-কল করতে কী হয়েছিল, বিশেষত কলকাতার বাড়ীতে যখন ফোন রয়েছে, এখানে ফোন রয়েছে? না কি ফোন কাজ করছে না কলকাতায়? হয়তো পথে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, কিম্বা অন্য কিছু কারণ ঘটেছে, যার ফলে দিল্লী-কলকাতার লাইনে গন্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে? এরকম তো প্রায়ই হয়, এই সেদিনই হয়েছিল। এবং সে-ধরণের একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছে, নইলে আনন্দ ফোন করতই, সে অত্যন্ত বিবেচক ছেলে। কে জানে কোথাও তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে কি না, হয়তো হচ্ছে, এখানেও মেঘহীন আকাশ সত্ত্বেও কী দুর্যোগের এই রাত—মনে হল রতীনের, দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তখন তা আসে এমন করেই একটার পর একটা। মুখে হুইস্কি ও এক ভীষণ দুঃখিত হাসি ফোটে তার, তবে এই হল পাল্টা জবাব বাড়ীতে আগুন লেগে অঞ্জলির পুড়ে মরে যাওয়ার! হায় রে অতি-নাটকীয় পৃথিবী!

কিন্তু রাত্রি বাঁচবে তো, বেঁচে ফিরে আসবে তো? আসবেই। নইলে পরে এক-দিন কোন মুখে রতীন ফিরে আসবে মনুর কাছে, বলবে, 'ভাই তুমি চলে যাওয়ার পরেই আমারো সে কী সাংঘাতিক এক কান্ড!' এবং এটা বলতে তার ভালো লাগবে তখনই, যখন রাত্রি তার পাশে পাশে থাকবে।—এবং রাত্রি পাশে থাকবেই, বলেনি মনুও, 'ফিরবেই তো, কলগার্ল, গৃহকর্ত্রী' ইত্যাদি? মনুর কথা মিথ্যা হওয়ার নয়, মনকে প্রবোধ দেয় রতীন।

আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে, এবং যদিও পাখি এখনো ডাকেনি, ভোরের প্রথম হওয়া সবে ছেড়েছে ইতিমধ্যেই। গাড়ী বার করতে করতে ভাবে রতীন, যাক বাবা, টেলিগ্রামটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এখন তার সত্যিই বেশ ভালোই লাগতে সুরু করেছে—কারণ সে যা করতে যাচ্ছিল, ঐ মনুর কাছে ছোটা-টোটা, সেটা যেন বড্ড বাড়াবাড়ি, সেটা ওর ধাতে সইত না।

অনেকক্ষণ ধরেই টুকরো টুকরো মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করে দিচ্ছিল। ক্রমে বেশ ঘন অন্ধকার হয়ে এল।

গাড়ীর মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল সঞ্জীব।

'নন্দি, বেশ মুস্কিলে পড়তে হবে মনে হচ্ছে। এখনও নদী পার হওয়া বাকী। বৃষ্টি এলে নৌকোয় উঠতেই পারব না।'

'নদী! নৌকো!' এসব শব্দ যেন নন্দিনী শোনেইনি জীবনে।

'তোমাদের গ্রামে যেতে নৌকোয় উঠে নদী পেরোতে হয়? কই একথা আগে বলনি তো?'

'কত কথাই তো বলা হয়নি নন্দি—সব কথা, সব ঘটনা তো এতদিন ভালবাসার গুঞ্জন হয়ে তোমার কানের কাছে গুনগুন করছিল। প্রেমের জোয়ার যে উত্তাল বন্যার মত সব ডুবিয়ে দেয়। পুরোন জীবনটা যেন ওপারের সরে আসা নদীর চর—দূরে দৃশ্যমান, তাকে তুমি চেনো না। সেখানেও কেউ তোমায় দেখেনি। আজকের যাত্রাটা দুইপারে সেতু বাঁধবার প্রথম পদক্ষেপ।'

নন্দিনীর চোখ ততক্ষণ ছলছলে,—'আমার বড্ড ভয় করছে সঞ্জীব।'

সঞ্জীব অভয় হাসি হাসল, 'শ্বশুরবাড়ী যেতে সব মেয়েরই বুক কাঁপে। তারপর ভয়তরাসে মেয়েই অভয়দাত্রীর পদ নেয়। নিজের ঘরে যাচ্ছ নন্দি—ভয় কি?'

'কিন্তু উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তাদের বরণ করে নেওয়া তো নিয়ম। ছেলে মতের অপেক্ষা না রেখে যাকে আগেভাগে বরণ করে বসে আছে, তাকে স্বাগত জানান সহজ নয় সঞ্জীব। স্নেহ আদরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ নরম নরম অভিভাবকেরা তখন কুলীশ-কঠোর মূর্তি ধারণ করেন।'

'অভিভাবক আমার মাত্র একজনই নন্দি, তিনি আমার মা। তাঁর কথা তোমায় বলেছি, তোমার কথা অবশ্য তাঁকে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি। জানি এ আমার অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তোমাকে পাবার জন্য আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, দেরী সইছিল না। শুধু তাই নয়, যদি মায়ের কাছ থেকে বাধা আসত তাকে আমি অতিক্রম করতে পারতাম না, সে সাধ্য ও সাহস আমার নেই। তাই সবদিক ভেবে দেখলাম, চোখ বুজে ডুব তো দিই, কূল পরে মিলবেই।'

'সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা আমি কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব সঞ্জীব?' নন্দিনী প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম।

সঞ্জীব অভয় হাত রাখল কাঁধের ওপর, 'ভয় নেই নন্দি, অচেনাকে খানিক চেনা করার কাজ এগিয়ে রেখেছি। তোমার ছবি পাঠিয়েছি চিঠির মধ্যে। চিঠিতে লিখেছি, 'মাগো এ ছবি যার সে তোমার পুত্রবধূ হয়েছে। জীবনের এতবড় ঘটনা তোমার অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে হয়ে গেছে বলে আমায় তুমি ক্ষমা কর মা। জাতের বাধা ছিল বলে তোমাকে জানাতে সাহস পাইনি। তোমার আমি একমাত্র সন্তান, তুমিও আমার একমাত্র আপন জন। তোমার স্নেহ আর অগাধ ভালবাসা এ ভুলকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলবে, এ বিশ্বাস আছে বলেই চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছি। জাতে না মিললেও স্বভাবের গুণে, তোমার আশ্রয়ে এ মেয়ে বেমানান হবে না বলে আমার ধারণা। আগামী রবিবার আমরা তোমার কাছে যাচ্ছি—এর মধ্যে চিঠি দেবে তো?' চিঠি এসেছে নন্দি, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মা লিখেছেন, 'তোমরা এসো।'

আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক নন্দিনী চোখে মুখে শঙ্কা ঘনীভূত হলো।

'তার মানেই রেগে আগুন হয়ে গেছেন। নীরবতা মানেই ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। সঞ্জীব, আমি এখান থেকেই পালাই. তুমি একা গিয়ে আগে ঠান্ডা কর, তারপর সময় বুঝে আমি বউ হয়ে ঢুকব।'

সঞ্জীব বললে, 'তোমার নার্ভের অবস্থা নিতান্ত পলকা মনে হচ্ছে। ভালবাসলে অথচ ভরসা রাখতে এত দ্বিধা কেন বলত? জীবনের পথে আমার পাশে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ, আমার ওপর বিশ্বাস নেই তোমার?'

উত্তরে নন্দিনী কাছে সরে এল। সঞ্জীবের প্রশস্ত বুক, পৌরুষদৃপ্ত সৌন্দর্য,

নির্ভরতার প্রতীক চওড়া হাতের কব্জির দিকে চেয়ে চুপি চুপি বললে, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি তো ওপথ চিনি না।'

দুজনের উচ্চহাসিতে ভয়, গুমোট কেটে গেল।

মেঘও সরতে আরম্ভ করেছে। চওড়া নদী ইছামতী, বর্ষায় খরস্রোতা। নৌকোয় উঠে নন্দিনী যেন ছোট্ট খুকী। 'কি সুন্দর নৌকো, জান এই আমি প্রথম নৌকোয় উঠলুম। কলকাতার এত কাছে এত সুন্দর নদী আছে মোটে জানতুমই না। আচ্ছা—ডুবছে আবার উঠছে, ওটা কি বলত?'

'ওটা মোটেই সুন্দর জিনিস নয় নন্দি, ওকে কামট বলে। সুযোগ পেলেই পা কেটে নিয়ে যাবে টেরও পাবে না। খবর্দার পা ঝুলিয়ে বোস না।'

বিকেলের নরম রোদ উঠেছে এখন। বাসায় ফেরা পাখীদের ডাক শোনা যাচ্ছে। ছায়া ছায়া পথ, দু'ধারে গাছের সারি—মাঝখান দিয়ে ওরা চলেছে সাইকেল রিক্সায় চেপে।

সঞ্জীব বললে, 'জান নন্দি, এ রাস্তায় আগে শুধু গরুর গাড়ী চলত। নৌকো থেকে নেমে দু'ক্রোশ পথ হয় হাঁটতে হত নইলে গরুর গাড়ী চড়ে যেতে হত। স্কুলের হোস্টেল থেকে যখন বাড়ী আসতুম, মনে হত এ রাস্তা আর ফুরোবে না। ভারী বিশ্রী লাগত। কতই বা বয়স তখন আমার, মোটে নয় কি দশ। মাকে দেখার জন্য মনটা তখন আকুল হয়ে থাকত।'

'তোমাদের গ্রামে বুঝি কোনো স্কুল ছিল না? ঐটুকু ছেলে মাকে ছেড়ে বিদেশে পড়তে গিয়েছিলে?'

'স্কুল একটা ছিল কিন্তু মা সেখানে পড়তে দেননি। শহরের ভাল স্কুলে পড়িয়ে ছেলেকে দিগ্‌গজ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তা মায়ের আশা পূর্ণ হয়েছে কি বল? গ্রামের ছেলে আজ বাহুবলে—না হৃদয়বলে শহরের পরীকে গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে চলেছে। আরে রথতলা এসে পড়েছে যে, আমাদের ছোটবেলার খেলার জায়গা। দূরে তোমার শ্বশুরবাড়ীর দেউড়ি দেখা যাচ্ছে নন্দি। গেটের মাথায় বড় বড় সিংহ দুটো কালের শাসনে সৌন্দর্য খুইয়েছে বটে, কিন্তু দৃপ্ত গর্বিত ভঙ্গীতে এখনও কৌলীন্য জ্বলজ্বলে।'

নন্দিনী হেসে বললে, 'আলোর রোশনাই জ্বালিয়ে ময়ূরপঙ্খী পাল্কি চড়ে সম্মারোহে বৌ আসা দেখতে অভ্যস্ত ওরা। সামান্য রিকসা করে এক অকুলীন মেয়ে একা বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী এসেছে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে মাথার ওপর ভেঙ্গে না পড়ে।'

লোহার গুলবসান বিরাট সুদৃশ্য কাঠের দরজা পেরিয়ে রিকসা ঠাকুরদালানের সামনের চওড়া উঠোনে থামতেই নন্দিনীর

ইন্দ্রনীল সেন

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ভয়ে তার বুক দুরদুর করছে।

দিনশেষের ম্লান আলোয় আবছা ঠাকুরদালান। ওপরে ওঠার চওড়া সিঁড়ির এখানে ওখানে গাছ গজিয়ে উঠেছে। বাড়ীটা নিষ্প্রাণ নিঃশব্দ। অসীম উপেক্ষায় যেন নন্দিনীকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে। শাঁখ, উলু দূরে থাক, দু'চারজন মানুষও কি বধূবরণের জন্য উপস্থিত থাকতে নেই! বুক ভেঙ্গে কান্না এল নন্দিনীর। সাইকেল রিকসার ঘন্টি আর একবার বাজাতেই দরজা খুলে শুভ্রাবসন সুন্দরী একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। সঞ্জীব ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে।

উপেক্ষিতা, লজ্জিতা নন্দিনী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মত।

মা ও ছেলের মিলনের আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওখানে নন্দিনী কি অবান্তর, অবাঞ্ছিত?

ছেলের কপালে চুমু খেয়ে মা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন— নন্দিনীর হাত ধরে শান্তস্বরে বললেন—'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বৌমা, ঘরে এসো।'

বৌমা! নন্দিনীর অশান্ত মন বন্যা হয়ে চোখে নামল। ঝড়ের মুখে পড়া পাখী নীড়ে পৌঁছিয়েছে। সুখ, আনন্দে উদ্বেলিত নন্দিনী শাশুড়ীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আলো এখনও জ্বালা হয়নি, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রসন্ন জ্যোৎস্না আশীর্বাদের মত ওদের মাথার ওপর এসে পড়ল।

কী সুন্দর ঘর সাজিয়েছে ইথেল!

খুশিতে যেন টম একেবারে ভেঙেই পড়ে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে।

ঘরের চেহারাই পাল্টে গেছে একদম। মনে হয়, নতুন কোনো এপার্টমেন্টে উঠে এসেছে ওরা। অবাক হয়ে টম ভাবে।

কিন্তু সত্যি সত্যিতো আর তা নয়। বিয়ের পর ওরা যেখানে উঠেছিল আজো সেখানেই আছে।

আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। পরিশ্রমও খুব বেশি দরকার হয় না এতে। প্রয়োজন হলো রুচি-জ্ঞানের আর শিল্প-বোধের। ঘরের জিনিষপত্তর ও সাজ-সরঞ্জাম-গুলো নতুন করে মাঝে মাঝে এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যাতে চোখের তৃপ্তি ঘটে।

চোখের তৃপ্তি মানেই তো মনের তৃপ্তি। গৃহসজ্জা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ইথেলই একদিন বলেছিল টমকে এসব কথা। তার সেই কথাগুলো যে কতো সত্যি আজকের ঘর সাজানোর রকম দেখেই তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

না, সে মোটেই ভুল করে নি। গলার টাইটা খুলতে খুলতে আপন মনেই ভাবে টম জলি। ইথেল এসে তার কোটটা খুলে নিয়ে হ্যাঙ্গারে টানিয়ে রাখে। তারপর চায়ের আয়োজন করতে সে কিচেনে চলে গেলে একখানি সোফায় গা এলিয়ে দেয় টম।

আজ সে খুবই ক্লান্ত। মিশরের এক অধ্যাপক প্রতিনিধিদল এসেছিলেন নিউ-ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী দেখতে। লাই-ব্রেরীর সমস্ত বিভাগ তাঁদের ঘুরে ঘুরে দেখাতে হয়েছে। সে কি সোজা ব্যাপার! যেমনি পা চালাতে হয়েছে তেমনি কথা বলতে হয়েছে একটানা। সেই থেকে পা তার টনটন করছে। এখন শিল্পী স্ত্রীর হাতে এক কাপ চা খেয়ে সব শ্রান্তি দূর করে নেবে এ মুহূর্তে সেটাই তার সবচেয়ে বড়ো আশা।

রিডার্স ডাইজেস্টের শেষ সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে সে-সব কথাই একা একা বসে ভাবছিল টম। আর ভাবছিল ইথেলের সব গুণের কথা।

হ্যাঁ যে যাই বলুক, ইথেল মেয়ার বাস্তবিকই গুণী মেয়ে, একজন মস্ত বড়ো শিল্পী। ইথেল কথা বলে গানের মতো করে, চলা যেন তার নদীর তরঙ্গমালা, আর তার প্রতিটি কাজ ঠিক যেন একএক টুকরো কবিতা।

দেখতেও ইথেল নিরুপমা। তাকে দেখা মাত্রই তো টম প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। যাকে বলে 'লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'।

সেই মিষ্টি মধুর স্মৃতিই টমের মনে পড়ে যাচ্ছিল একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে। আর তাতে হাসির রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার চোখে-মুখে।

ঠিক তখুনি ট্রে-হাতে নিয়ে সেখানে এসে হাজির ইথেল মেয়ার অর্থাৎ হালের মিসেস জলি।

ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মুখোমুখি হয়ে বসেই প্রশ্ন, কী ব্যাপার, খুবই খুশি খুশি মনে হচ্ছে যেন!

বারে, একা ঘরে তোমার কথাই বসে বসে ভাবছিলাম, খুশি খুশি মনে হবে না?

আমার কথা ভাবছিলে না, ছাই! ঐ কানাডিয়ান মেয়ে দুটোর কথা বোধহয় মনে পড়ছিল, তাই মুচকি মুচকি হাসছিলে।

আচ্ছা ইথেল, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো? রাগ করবে না তো?

সে আবার কি? তোমার কথায় আমি রাগ করবো, আমার কথায় তুমি রাগ করবে, তাহলে আবার আমাদের প্রেমটা হলো কোথায়?

তার প্রশ্নের এই জবাব শুনে আর বসে থাকতে পারে না টম।

ওয়ান্ডারফুল, মাই ডার্লিং বলে লাফিয়ে উঠে ইথেলকে টেনে তুলে চুমুতে চুমুতে সে একেবারে অস্থির করে তোলে তাকে।

তারপর দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে

প্রেমাবদ্ধ বসু

বিড়ম্বিনী

নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কয়েকটি আনন্দময় মুহূর্ত এমনিভাবে কাটিয়ে দিয়ে আবার শান্ত হয়ে বসে পড়ে ওরা।

ইথেল কেটলি থেকে গরম চা ঢেলে নেয় দুটি কাপে। তারপর গল্প শুরু করে।

কি জানি বলবে বলেছিলে, বলো এবার।

. হ্যাঁ, তুমি আরেকদিনও ঐ কানাডিয়ান মেয়ের কথা তুলেছিলে।

ঠিক তাই।—ইথেল স্বীকার করে নেয়।

তাই বলছিলাম, তোমার মনে বোধহয় ঐ কানাডিয়ান মেয়ে দুটিকে নিয়ে একটা খটকা লেগে আছে। খুলে যদি সব কথা বলতে পারো তাহলে আমিও ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করতে পারি।

নো, মাই ডিয়ার! এ কোনো খটকা বা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়। কাজেই ভুল ভাঙানোরও কথা ওঠে না। তবে আমি যা নিজের চোখে দেখেছি এবং নিজের কানে শুনেছি তা না বলতে পারার মতো কোনো কারণই থাকতে পারে না।

বেশ বলো তাহলে।

তখন চা খেতে খেতে সেই কানাডিয়ান মেয়ে দুটির গল্প বলতে শুরু করে ইথেল। টম যে তাদের সঙ্গে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানে কিভাবে ভাব জমিয়ে তুলেছিল সেই গল্প। এবং সে গল্পের শ্রোতা টম নিজেই।

ইথেল বলছে—

আমি বাবার সঙ্গে নভেম্বরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তোমার মতো আমরাও গিয়েছিলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান দেখতে। আমরা বোধহয় একদিন আগেই গিয়েছিলাম সেখানে। অন্তত তোমার কথা শুনে তাই আমার মনে হয়েছে।

তার মানে?

তার মানে আবার কি? গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানে পৌঁছে আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়ে পড়েছিল। তাই প্রথম দিনটা আমাকে কটেজে শুয়েই কাটাতে হয়।

তার পর?

পরদিন সকালে একগাড়ি ভর্তি লোক নিয়ে যে ট্যুরিস্ট ডিলাক্স বাসটি সবাইকে ঘুরিয়ে আনতে বেরুলো তাতে আমরাও ছিলাম যাত্রী। তোমরা তিনজন দরজার কাছের প্রথম সারির তিনটি আসনে বসেছিলে—তুমি আর কানাডিয়ান মেয়ে দুটি।

আর তুমি?

আমি বসেছিলাম ঠিক তোমারই পিছনের সীটে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তাই। এবং সে জন্যেই তোমাদের সব কথাবার্তাই আমি শুনেছি। তোমাদের হাসি-তামাসাও চোখে পড়েছে।

অমরনাথের পথে ফটো : তারাপদ বসু

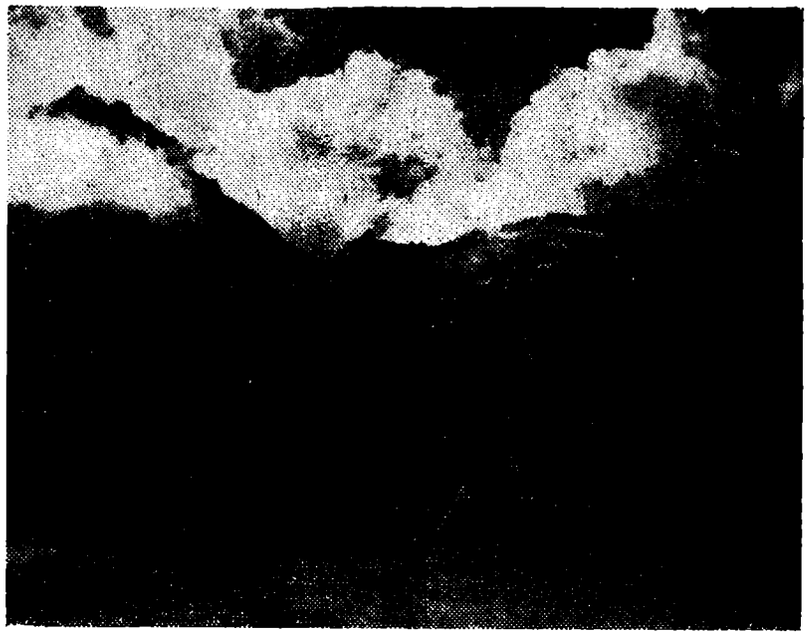

কী শুনেছ, কী দেখেছ বলো দেখি।—খুব আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞেস করে টম জলি।

ঐ তো যা বলছিলাম, তোমার পাশের মেয়েটি তোমার সব খবর জানবার জন্যে একের পর এক প্রশ্ন করছিল আর তুমি এক এক করে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলে। তখনই তুমি বলছিলে, ঐ দিনই খুব ভোরে তুমি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানে পৌঁছেছ। আরো বলছিলে যে গ্র্যাজুয়েশনের পর বছর দেড় আগে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে তুমি কাজ পেয়েছ। ফরেন গেস্টদের রিসিভ করা, তাঁদের লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখানো, বোঝানো এবং তাঁদের যথাযোগ্য এন্টারটেইন করাই তোমার কাজ। আর তুমি অমন সুন্দর একটা কাজে আছ বলেই পার্শ্ববর্তিনী বান্ধবী দুজনকে সানন্দে আমন্ত্রণ জানালে তোমাদের লাইব্রেরী দেখতে যেতে। তারাও রাজী হলো।

তাহলে সবই তো শুনেছ দেখছি।—টম জলি আর মন্তব্য না করে চুপ থাকতে পারে না। স্পষ্ট জবাবও আসে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই।

শুধু শোনাই তো নয়, দেখেওছি অনেক কিছু।

যেমন?

ধরো, পকেট থেকে বার করে তুমি যে তোমার বান্ধবীদের চকোলেট দিলে; ওরা লজ্জায় নিতে চাইছিল না তুমি যে জোর করে গছিয়ে দিলে, তুমি কি ভাবছ তোমার পেছনে-বসা আরেকটি মেয়ের তা চোখ এড়িয়ে যাবে?..

ও, বুঝতে পেরেছি, পেছনের মেয়েটির খুব হিংসে হচ্ছিল। তাই না? তা কোনো-রকমে সে যদি আমার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতো তাহলেই সে দেখতে পেতো আমি কত নিরপেক্ষ। তাকেও আমি ঠিক একই-ভাবে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী দেখতে আমন্ত্রণ জানাতাম, চকোলেট দিতাম এবং...

খুব হয়েছে, আর দরকার নেই। ও মেয়েটার ভারি বয়ে গেছে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার। নিউইয়র্ক পাবলিক লাই-ব্রেরী তার অদেখা কিনা, তোমার আমন্ত্রণের সে অপেক্ষা করবে। নিউইয়র্কের সে বাসিন্দে, ব্রুকলিনে তার জন্ম—তোমাদের লাইব্রেরীর সবগুলো ঘরের ইতিহাসই তার জানা, ভালো করে এবং বার বার করে দেখা। আর চকোলেট। ও তো আমার নিজেরই সর্বক্ষণের সঙ্গী। ছোটবেলায় পোলিও রোগে আমায় যখন বন্দী থাকতে হতো পুতুল-ঘরে, মস্ত থাকতে হতো পুতুল খেলার আনন্দে বাবা-মা তখন একরকম ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে নানা রকমের টফি-চকোলেট ইত্যাদি এনে দিতেন। সেই থেকে এমন একটা অভ্যাস আমার হয়ে গেছে যে, এসবের কিছু না কিছু আমার পকেটে থাকেই সব সময়। কাজেই...

থাক, থাক। আই বেগ টু বি একস-কিউজড মাই ডার্লিং। আর বেশি কিছু চোখে পড়ে নি তো সেদিন?

পড়েছে বৈকি। তোমাদের সেই নিজ নিজ ছবি বিনিময়ের দৃশ্যটি ভারি চমৎকার লেগেছিল আমার।— বলেই হাসতে হাসতে আরেক দফা চা ঢেলে নেয় দুজনের দু'কাপে।

থ্যাঙকস, তারপর?—কাপটি এগিয়ে দিতেই ইথেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরো জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে টম।

কিন্তু সেদিনের ব্যাপারে তেমন আর

কিছু বলার নেই শ্রীমতীর। শুধু একটি বিষয় সে না বলে পারে না। তা হলো, বাস থেকে বার কয়েকই যাত্রীদের এটা-সেটা দেখবার জন্যে নামতে হয়েছে। অনেকেরই সীট বদল হয়ে গেছে তাতে, হয়নি শুধু টম আর তার দুই বান্ধবীর। একসঙ্গে পাশাপাশি বসার ব্যাপারে তারা তিনজনেই ছিল এমনি সতর্ক।

এর দ্বারা কী মীন করতে চাও তুমি?—জিজ্ঞেস করে টম।

কেন, এতে কি তোমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় না?—বলেই হাতের কাছের 'রিডার্স' ডাইজেস্টখানা খুলে 'সাইকোলজি অব লভ' শিরোনামার লেখাটি ইথেল পড়তে বলে মিঃ টম জলিকে। সে নিজে সেদিনই পড়েছে ঐ লেখাটি।

তুমি দেখছি উকীল হলেই ভালো করতে। হলে শিল্পী।

শিল্পী হলে বোকা হতে হয় বুঝি।—ঠোক্কর দিয়ে কঠিনতর ঠোক্কর খেতে হয় টমকে। এরপরে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গম্ভীর ছবিখানাকে সামনের দেয়াল থেকে নিয়ে পিছনের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয় ইথেল।

এটা আবার কী হলো?—একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে টম।

কিছুই নয়। লক্ষ্য করেছি, এ ছবিটার স্মৃতি প্রায়ই তোমায় কেমন উন্মনা করে তোলে। তাই চোখের সামনে থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলাম। তুমি ঐ সোফাটাতেই সব সময় বসো কিনা, তাই ওটার পেছনে রাখলাম।

কী আশ্চর্য। আরে, ওদুটো মেয়ের স্মৃতি আমায় যদি অতোই পাগল করবে তাহলে তোমায় আমি এমন করে পেলাম কী করে?—বলেই ছুটে এসে ইথেলের পাশে বসে পড়ে টম বড়ো সোফাটায়, তাকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে কচলিয়ে একটা পিন্ডের মতো করে ফেলে।

তারপর উত্তেজনা একটু শান্ত হলে পাশাপাশি বসেই ইথেলকে জিজ্ঞেস করে টম—ইজ দিস নট দি এফেক্ট অব লভ সাইকোলজি?

পরক্ষণেই নতুনভাবে টাঙানো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবিটা তার চোখে পড়ে যায়। একেবারে তার মুখোমুখি। সূর্যাস্তের আভা এসে পড়েছে ছবিটার ওপর। চমৎকার লাগছে দেখতে। টম চিৎকার করে ওঠে—ফাইন! ইথেল, মাই ডার্লিং, তুমি সত্যি আর্টিস্ট! কিন্তু আর্টিস্টরা তো খেলা মনের মানুষ হয়ে থাকে জানি। তুমি যদি সন্দেহের কুয়াসায় পথ হারিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, আমি কী করে তা সহ্য করবো?

টমের এই কথাগুলো শুনে কেমন যেন মায়া লেগে যায় ইথেলের। মনটা তার শীতল হয়ে যায়। সে বলে ফেলে—ভুলে যাও, মাই ডিয়ার, ওসব কথা ভুলে যাও। টমের মুখখানি টেনে নিয়ে পরম আদরে একটি চুমু খেয়ে তাকে জানায়, সন্দেহের কুয়াসায় সত্যি সত্যি আমি পড়িনি, কাজেই পথ হারাবার কোনো আশংকাই নেই। আমি বরং তোমারই প্রেমে পরম নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে ডুবে আছি।

বাঃ, এর চেয়ে বড়ো আশ্বাস আর কী হতে পারে? কিন্তু মাই তুমি বলো না কেন ইথেল, একবার তুমি শুধু মনে করে দ্যাখো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন থেকে লস এঞ্জেলেসের পথে সান্টা ফি ট্রেনে কী গভীরভাবে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তোমার প্রতি। ট্যুরিস্ট ক্লাসে একই কামরায় কাছাকাছি সিট পড়েছিল আমাদের দুজনের। তোমার বাবার সিট ছিল একটু বেঁকনার দিকে। তোমার চোখের দৃষ্টি আমায় মাতাল করে তুলেছিল। আমি যেচে কথা না বলে পারিনি তোমার সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম তুমিও মজে গিয়েছ আমার সঙ্গে আলাপে। কথায় কথায় রাত প্রায় ভোর করে দিলাম দুজনে। জানতে পারলাম তোমার ছোট-বেলার বেদনাময় জীবন-সংগ্রামের কথা, তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে কৈশোর ও প্রথম যৌবনে শিক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যের কথা। শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। শিক্ষা জীবনে ছ-ছটা স্কলারশিপ পাওয়া কি সহজ কথা! তাছাড়া পোলিও রোগে একেবারে শৈশবেই যার জীবনের আশা বাপ-মাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, বাইশ বছর বয়েসের লম্বায় পাঁচ ফিট সেই মেয়েটির ওজন ১০৮ পাউন্ডের বেশি। এ যেমনি বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের। সেকথাও সেদিন রাতের ট্রেনেই তোমার মুখ থেকে শুনেছিলাম। ব্রুকলিন প্রাট ইন্সটিটিউটের উজ্জ্বল রত্ন তুমি। নেহাৎই আকস্মিকভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল বলেই না আজ আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য।

থাক থাক আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলতে হবে না। পরে যখন বুঝবে লাভের চেয়ে লোকসানটা কতো বেশি হয়েছে আমায় পেয়ে, তখন রীতিমতো পস্তাবে বলে দিচ্ছি।

মাই সুইট ডার্লিং, কেন এসব কথা বলছ তুমি? এর চেয়ে বেশি সুখ, বেশি আনন্দ তো আমি চাইনে। মনে করে দ্যাখো, লস এঞ্জেলেসে আমি থাকতাম মাউন্ট ওয়াশিংটনে আর তুমি থাকতে হলিউডের কাছাকাছি একটা হোটেলে। তুমিই তোমার হোটেলের ঠিকানা আমায় দিয়ে দিয়েছিলে। অনেকটা পথ। তবু ফোনে এনগেজমেন্ট করে দু-তিন দিন আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি। এক-সঙ্গে আমরা হলিউডে বেড়িয়েছি, বার্কলে য়ুনিভার্সিটিতে সব কিছু ঘুরে দেখেছি। ভারি আনন্দে কেটে গেছে সে কয়টা দিন। তারপর নিউইয়র্কে ফিরে এসে তো তুমি হয়ে উঠলে আমার নিত্যকার সন্ধ্যা-সঙ্গিনী।

আর শনি-রবিবার সারা দিনের। তাই না?—ইথেল আগ বাড়িয়ে বলে দেয় এটুকু।

ঠিক তাই। আমিও সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আর তার ফলেই তো তুমি আমার সুইট হার্ট হয়ে আমার ঘরকে আলোময় করে রেখেছ। মনে আছে তোমার, আমি সেদিন এনগেজমেন্টের কথা তুলেছিলাম তুমি আপত্তি জানিয়েছিলে? তুমি বলেছিলে, বিয়ে তুমি করবে না কারণ তোমার সন্তান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ও মাই ডিয়ার, সেজন্যেই তো একটু আগে আমি বললাম, ক্ষতির হিসেব যখন ধরা পড়বে তখন আপশোস করবে।

কিন্তু কী উত্তর আমি তার দিয়েছিলাম, সেটা মনে পড়ে? আমি বলেছিলাম, চাই না আমার সন্তান; পৃথিবীতে লোকের এমন কোনো কমতি নেই—চাই আমি তোমাকেই, তোমার মতো দ্বিতীয় এমন একটি সঙ্গিনী তো আমার চোখে পড়ছে না, ইথেল! তারপরেই এনগেজমেন্টে তুমি রাজী হলে। আমাদের বিয়ে হলো। তাই ভাবছিলাম, তুমি আমার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের

দান। ভাগ্যি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং তুমিও গিয়েছিলে, তাই তো তোমাকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে! দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেল। তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক এক বছর। ঠিকই বলেছ তুমি। আসছে কালই তো 'থ্যাংকস গিভিং ডে', নভেম্বরেরর চতুর্থ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার। গত বছর এই উৎসব দিনটিতে আমরা ছিলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে। সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের নাচ-গান আমরা খুবই উপভোগ করেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ছে, তুমি তোমার দুই ক্যানেডিয়ান বান্ধবীকে দুপাশে নিয়ে বক্তৃতা শুনছিলে, নাচ দেখছিলে এবং খুব গল্প করছিলে।

গল্প এমন কিছু নয়, ওদের দুজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে আমরা এই যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস পালন করে আসছি সে ব্যাপারটা কি, তার পেছনের ইতিহাসটা কি। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে যে সব তীর্থযাত্রী মে ফ্লাওয়ার জাহাজে করে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকার পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন, ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাঁদের অনেককেই মৃত্যু বরণ করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয় আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এবং অরণ্যসংকুল অঞ্চলে হিংস্র শ্বাপদকুলের সঙ্গে। কিন্তু এতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁদের শক্তি দিয়েছেন নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠায়, শান্তি ও সমৃদ্ধির নীড় গড়বার। সেজন্যেই প্রতি বছর এই নির্দিষ্ট দিনে এই 'থ্যাংকস গিভিং ডে' পালিত হয়ে আসছে। সে বিষয়টিই আমি ঐ মেয়ে দুটিকে বুঝিয়ে বলছিলাম।

ড্যাম ইট! অতো সব কথা শোনার কোনো দরকারই নেই আমার। আমি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে তোমাদের ব্যাপারে যা দেখেছি এবং শুনেছি তা তুমি জানতে চেয়েছিলে, তার প্রায় সবই আমি খোলাখুলি প্রকাশ করেছি। ব্যস, এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর কোনোই দরকার নেই। তারচেয়ে বরং চলো ব্রডওয়েতে গিয়ে আজ ভালো একটা থিয়েটার দেখে আসি। তারপর একটা নাইট ক্লাবে যাওয়া যাবে। কালতো ছুটিরই দিন।

গুড আইডিয়া, মাই সুইট লেডী। তাই চলো। তবে পোষাকটা একটু পাল্টে নিতে হবে। এদিকে চমৎকার একটা প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়, সেটা তোমায় পরে বলবো। —এই বলে উঠে পড়ে টম জলি। সোজা বাথরুমে চলে যায়।

ইথেলও চটপট তৈরি হয়ে নেয় সেই ফাঁকে। টমের ফ্রেশ জামা-ট্রাউজার সব রেডি করে রাখে যাতে তাকে আবার সেজন্যে ঝামেলায় পড়তে না হয়, দেরি হয়ে না যায়। সত্যি সত্যি এ জন্যেই তারা ঠিক ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছে ব্রডওয়েতে। তবে অত্যন্ত তাড়া-হুড়ো করতে হয়েছিল এই যা।

যাই হোক থিয়েটার দেখে খুব খুশি হয়েই ঘরে ফিরেছে টম আর শ্রীমতী ইথেল। পরস্পর পরস্পরের ওভার কোট এবং কোট খুলে নিয়ে দুজনেই বসেছে একটু বিশ্রাম করতে। হঠাৎ ইথেল হাসতে হাসতে বলে উঠলো, মাই ডিয়ার টম, তোমার কিন্তু ভারি ভুলো মন। এ মোটেই ভালো নয়।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

এই যে তোমার গেস্ট আসছেন, তা' আমাকে জানাবার তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তুমি মিস সারা ব্রাইটকে রিসিভ করবে, এন্টারটেন করবে সেটা তো গোপন রাখারই ব্যাপার। বিশেষ করে তোমার অপর বান্ধবী মিস মেরী কলিঞ্জ অসুস্থ বলে পারছে না, সেও তো তোমাদের দুজনের পক্ষে আনন্দ উপভোগের একটা মস্ত সুযোগ। এ ব্যাপার আগেই এমনভাবে ফাঁস করে দিতে হয় কখনো? কী বোকা! এই নাও তোমার প্রিয় বান্ধবী সারার প্রেম-পত্রখানা। তোমারই এক চিঠির উত্তরে সে এই পত্রখানি তোমায় লিখেছে। তোমার পোষাক ঠিক করতে গিয়ে হাতে পড়ে যাওয়ায় আমি স্বাভাবিক আগ্রহবশেই পড়ে ফেলেছি চিঠিখানি। ডোন্ট মাইণ্ড!

হাউ সিলি ইউ টক, মাই লভ! তোমাকে পড়াবার জন্যেই তো চিঠিখানা আমি পকেটে করে নিয়ে এসেছি। আমরা দুজনে মিলে সারাকে স্বাগত জানিয়ে এ চিঠির জবাব দেবো আমাদের বাড়িতে আমাদের দুজনের অতিথি হবার জন্যে। তাহলেই সারার আর বুঝতে বাকি থাকবে না, আমাকে পাবার আশা আর কারোই নেই, তুমিই বিজয়িনী!—এই বলে ইথেলকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে টম। ইথেল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাতে, চোখ-মুখ তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তখনো কিন্তু শেষ হয়নি টমের কথা। ইথেলকে ছেড়ে হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার প্ল্যানটাই এখনো পর্যন্ত বলা হয়নি তোমাকে।

কী প্ল্যান, বলো।

শুনে নিশ্চয় তুমি খুব খুশি হবে। আমার খুব ইচ্ছে, এ বছর থেকে আমি আরেকটি 'থ্যাংকস গিভিং ডে' পালন করবো। আসছে কাল হলো গোটা জাতির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস আর তার পরদিন হবে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। আর কেউ নয়, শুধু তুমি আর আমি। সেদিনটিকে এবার থেকে প্রতি বছর উৎসব-দিন হিসাবে পালন করব।

এক্সসেলেন্ট আইডিয়া ডিয়ারলি! উচ্ছ্বাসের মাথায় এইটুকু বলে চুপ করে যায় ইথেল।

কিন্তু এসো, এখন আমরা সারাকে সেই জরুরী টেলিগ্রামটা করে দি।—বলেই বিসিভারটা তোলে টম জলি। ঠিক টেলি-গ্রাম নয়, ফোনোগ্রাম। ইথেল আর টমের যুক্ত নামে টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে ফোনের বক্তব্যটা চলে যায় কানাডার সারা ব্রাইটের কাছে।

টমের ফোনোগ্রাম শেষ হতেই ইথেল বলে ফেলে, সত্যি সত্যি আমি বিজয়িনী!

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

নারায়ণ দত্ত

উকিলের যেমন মুহুরী, ডাক্তারের যেমন কম্পাউন্ডার, সেকালের কালা জমিদারদের তেমনি পাটোয়ারী। জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী রামনাথ আঠার শতকের কলকাতার তেমনি একজন পাটোয়ারী। কোম্পানীর কাছারীর ক্ষুদে গোমস্তা। নন্দরাম সেন, জগত দাস, রামভদ্র বা গোবিন্দরাম মিত্তিরের সঙ্গে এবং পংক্তিতে বসবার কোন কৌলীন্যই নেই তার। তবু সেকালের কলকাতার বাঙালীদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর নাম কেলবার উপায় নেই। বাঙালী ঐতিহ্যের জাতি, তাই; নয়তো তাঁর নাম লেখা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার দাবী হত। অন্তত তাঁর সেই দাবী উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু সে কাহিনী বুঝিয়ে বলতে গেলে, গোড়া থেকে সব ভেঙে বলতে হয়। অবশ্য সে গল্প বলার আগে কোম্পানীর কলকাতার কালা সমাজে পাটোয়ারীদের কথা ছোট করে বলে নেওয়া ভালো। জন কোম্পানীর হিসেবের খাতা দেখে মনে হয় সতের শ' সালের সুতো ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন 'টোন' কলকাতার পত্তন হল, সেদিন থেকেই কিছু কিছু বণগড়নর কলকাতার কাছারীতে খাজনা আদায়ের কাজে লেগে পড়ে। তারাই সেকালের পাটোয়ারী। বলাবাহুল্য, রালফ্ সৌলডন—নন্দরাম সেনের হাতেই তাদের হাতেখড়ি। এবং আদিকালের কলকাতার পাঠশালায় তাদের পাঠ ভালোরকমই চলছিল, কিন্তু বাদ সাধল কোম্পানী স্বয়ং। তখন কাছারীতে বসেন দ্বিতীয় গোরা জমিদার যোসিয়া বাউচার। সেইসময় কলকাতা কাউন্সিল একটা নতুন হুকুম পাঠালে, কলকাতার জরিপ হবে। চেন, ম্যাপ নিয়ে কলকাতার সীমানা সরহদ্দ চৌহদ্দি সব পাকা করে। কোম্পানী বাউচারকে বললে, ইংরেজ সরকারের আওতায় যে ক'টা বাড়ী আছে, তার প্রতিটির সীমানা সরহদ্দের পাকা ম্যাপের হিসেব চাই। বললে, কলকাতার সব জমির জরিপ করে কতটা বাগান, কতটায় চাষ হয়, কতটা অনাবাদী, কতটায় আবাদ হতে পারে, তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করতে এটা সতেরশ' পাঁচ সালের জুলাই মাসের ঘটনা।

এই জরিপ শেষ করতে লেগেছিল সোটাদুটি দুটি বছর। শুরু করেছিল বাউচার। শেষ করল কিং। আর্থার কিং। সতেরশ' সাত। এবং এরই ফলে কোম্পানীর কাছারীতে একটা ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেল বলতে হবে। কোম্পানী সবিস্ময়ে দেখল, বহু জমি বহু লোক বিনা খাজনায় ভোগ করছে। যতটা জমি দখল করছে লোকে খাজনা দেয় তার অর্ধেকেরও কম। চোখের সামনে এতবড় একটা লোকসান দেখে কোম্পানীর বুকটা টনটন করে উঠল, হায় হায় এতগলো টাকা। কোম্পানী একটা পাকা আইন চালু করলে। ডিহি কলকাতা, সুতানুটী, কলকাতা আর গোবিন্দপুরের বাজারে বাজারে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, অতঃপর প্রতেকটি বসিন্দাদের একটি করে পাট্টা দেওয়া হবে। তাতে তার জমির পরিমাণ, চৌহদ্দী সব লেখা থাকবে আর থাকবে সালিয়ানা খাজনার পরিমাণ। মাসে মাসে কোম্পানীর কাছারীতে খাজনা দিতে আসবার সময় সেই পাট্টাটা হাতে করে আনতে হবে। প্রতিবছর এই পাট্টা নতুন করে 'ইস্যু' করা হবে।

দেশের লোকেদের কাছে ঢ্যাঁড়া পেটান হল আর কাছারীর পাটোয়ারীদের কাছে গেল নতুন পরোয়ানা। তাদের বলা হল খাজনা আদায়ের পাকা খাতা রাখতে। বলা হ'ল সেই খাতায় প্রতিটি মাসের খাজনা উসুলের সঙ্গে সঙ্গে এই পাট্টার বিবরণও লিখে রাখতে হবে। আর বছর শেষে কাউন্সিলকে জানাতে হবে কলকাতার প্রজাসংখ্যা বাড়ল না কমল!

কিন্তু এহ বাহ্য। এই জরিপের ফলে মোক্ষম কোপটা পড়ল পাটোয়ারীদের গলায়। ভূমিকম্পটা সবচেয়ে জোরে তাদেরই নাড়া দিয়ে গেল। তাদের অনেক জাল-জোচ্চুরি-কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেল। দেখা গেল, তাদের বহু রিটার্ণই হুবহু মিথ্যে। জমি সব বিলি হয়েছে বেনামীতে। এবং বলাবাহুল্য এইভাবে তারা বেশ দু' পয়সা কামিয়েছে। অন্ততঃ কোম্পানীর নথিপত্রে এইমর্মেই অভিযোগ করা হয়েছে। রামের দোষে শ্যামের মাথা ভাঙতে কোম্পানী চিরকালই ওস্তাদ। এসময়েও তার ব্যতয় হল না। তারা পুরনো সব পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করার হুকুম দিলে। এবং প্রথমেই তাদের পুরোধা শ্যামাদাস বলে এক পাটোয়ারীর চাকরীটা খেয়ে বউনি করতে বললে।

তবে এইসব দুঃখের মধ্যে একটা সুখের খবর ছিল। কোম্পানী পুরনো পাটোয়ারীদের তাড়িয়ে শুধু নতুন লোকই নিলে না, তাদের নতুন করে মাইনে ঠিক করলে। তনখা বৃদ্ধি হল। মাসমাহিনা চার টাকা। আগে ছিল কত? সতের শ' তিন সালের অক্টোবরে দেখা যায় কলকাতার কেবল বাজারগুলির খাজনা আদায়ের জন্যে চারজন পাটোয়ারী ছিল। মাইনে পেত এক টাকা নয় আনা করে। খাস কলকাতার জমিদারীর জন্য পাটোয়ারী ছিল একজন। মাইনে একটু বেশি— দু টাকা। সুতানুটীর জন্যেও একজন। মাইনে একই। গোবিন্দপুরের জন্যেও একজন পাটোয়ারী ছিল। মাইনে কিছু কম। মাসিক দেড় টাকা।

এই দ্বিতীয় দফায় যেসব নতুন পাটোয়ারীদের নিয়োগ করা হল, মনে হয় এই সপ্তরথীর মধ্যে রামনাথও ছিলেন। কেননা, এর পরে আর নতুন করে গোমস্তা বহালের কোন সংবাদ সেকালের কাগজপত্র ছাঁটকে জোগাড় করা যায় না। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, রামনাথ কোম্পানীর চাকরীতে একেবারে আনকোরা নতুন। সতের শ' চার সালে এক রামনাথকে কোম্পানীর 'রাইটার অফ দি টোন'—হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এ'রা একই ব্যক্তি বলেই মনে হয়। ইনি ঔরঙ্গজেবের নাতি বেদার বখ্‌ত-এর দরুণ জায়গীরের সেলামী বাবদ পঞ্চাশ টাকা সাত আনা সেই সম্রাট-পৌত্র-এর গোমস্তা জিতমল কড়োড়ীকে বুঝে দিয়ে রসিদ নেন।

সে যাই হোক, রামনাথের নতুন মহল হল লাট গোবিন্দপুর। আর গোবিন্দপুরের এক ঘাটেই একদিন প্রত্যুষে এই কাহিনীর যবনিকা উঠল। সেটা সতেরশ' চৌদ্দ সাল। কলকাতায় তখনও বেশ শীতের আমেজ আছে। ফেব্রুআরি মাস। সেই শেষ শীতের কুয়াশা জমা গঙ্গার বুকে ঘষা পেন্সিলে আঁকা ছবির মত হঠাৎ একটা ভারী বজরা ভেসে উঠল। একটু একটু করে নতুন রোদের কুচি গঙ্গার জলে সোনা ছড়াতে লাগল আর সেই বজরাটা যেন অশরীরী প্রেতরাজ্যের রাহুগ্রাস থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিতে লাগল। বজরায় তখন দেখা গেল অনেক মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু। বজরাটা আসছিল দূর দেশ থেকে। তার পালে তখন বিশেষ হাওয়া নেই। মাঝিমাল্লারাও শ্রান্ত, ক্লান্ত। বৈঠা চালাবার আর কোন ক্ষমতাই যেন তাদের আর অবশিষ্ট নেই। অন্তবিহীন পথ একটানা দাঁড় টেনে এসে তাদের সব দম ফুরিয়ে গেছে।

ঘেরাটোপের বাইরে এসে একজন বয়স্ক লোক মাঝিদের কি যেন বললে। বুড়ো অভিজ্ঞ মাঝি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। বললে, হ্যাঁ, কত্তা, কালিঘাট পেরিয়ে এসেছি। এবার কোম্পানীর রাজ্য। এই গঞ্জটাই গোবিন্দপুর। ঐযে মাকুর শব্দ আসছে, ওটা শেঠেদের দাদনি তাঁতিদের তাঁত চলার শব্দ। মাঝির গলায় ঘশুরে টান স্পষ্ট। বুড়ো ঘাড় নাড়লে এবার। বললে, তাইত মনে হচ্ছে। এবার পাশপানে একটা ছোট ঘাট দেখে নৌকা ভেড়াও মাঝি।

অদূরেই চাঁদপাল ঘাট। সেখানে পতাকা উঁচিয়ে রাশিরাশি ডাচ, ইংরেজ বোটের ভিড়। মাঝিমাল্লার গলায় বেয়াড়া কক্‌নিমেশান ইংরাজি গান। কিছুবা হুল্লোড়। মাঝি তন্দুর এগোল না। পাশেরই একটা ছোট স্নানের ঘাটের দিকে লগি ঠেলে এগোতে লাগল।

ঘাটটা ছোট। কিন্তু সেই সাতসকালেই তার ভিড় ছোট নয়। স্নানার্থীদের ভিড়ে ঘাট ভরে গেছে। বুড়ো মাঝি গুন টানতে টানতে হেঁকে জিগ্যেস করলে, এটা কোন গাঁ গ' কত্তা? কর্তাদের নজর তার আগেই বজরাটার দিকে পড়েছিল। বজরাটা বড়। এবং বড়লোকের। তা দেখলেই বোঝা যায়। গঙ্গাস্তোত্র থামিয়ে, ডুব বন্ধ করে একজন চেঁচিয়ে জবাব দিলে, গোবিন্দপুর। জের টেনে সকৌতূহলে পাশের একজন জিগ্যেস করলে, কোত্থেকে আসা হচ্ছে? মাঝি জবাব দিলে না। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটেছিল। বললে, আমরা বরেন্দ্র থেকে আসছি। কলকাতার স্নানার্থী বাসিন্দারা আর প্রশ্ন করলে না। কেবল একপাশে যেসব দু'একজন মহিলা স্নান করছিল, তারা ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে সকৌতূহলে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে জুলজুল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

অবশ্য সেটা নেহাৎই মেয়েলী কৌতূহল। কলকাতার লোকেরা তখনই বেশ নিরাসক্ত। কেননা গোবিন্দপুর-কলকাতা তখন আর ছোট্ট গ্রাম নয়। গঞ্জ। ইংরেজদের ভারী বোলবোলা। বহুদূর থেকে নিত্যি বহু লোক আসে। কেউ ব্যবসা করে। কেউবা চাকরীর উমেদারী করে। কেউ শুধু কৌতূহল নিবারণ করতে আসে। রাজামহারাজারাও আসে। প্রয়োজনে। অপ্রয়োজনে। কত আর কে খোঁজ রাখে।

বৃদ্ধ বজরার অন্দরমহলের দিকে গিয়ে বললে, আর ভয় নেই মা। আমরা কোম্পানীর রাজত্বে এসে গেছি। এরা মুঘলদের তাঁবেদার নয়। আমরা এখন মা গঙ্গার কোলে। আপনারা ইচ্ছা করলে স্নান করে নিতে পারেন। বজরার ত্রস্ত অন্দরমহলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। এবং সেদিনের সেই স্নানার্থী কলকাতা, ফোর্ট উইলিয়মের গোরাসাহেব কেউই বুঝতে পারেনি, কাদের পুণ্য স্পর্শে শহর কলকাতার সেই প্রসারিত বালুচর পবিত্র হল সেদিন।

অবশ্য জানতে দেরীও হয়নি বেশি। কেননা, এই ঘটনার কয়দিন পরেই হুগলী থেকে নবাবী ছিপ এসে লাগল একেবারে গড়ের ঘাটে। কোম্পানীর পাল্কী করে আগন্তুকরা একেবারে সটান গিয়ে উঠল ফোর্ট উপসিঅমে কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের আস্তানায়। উঠেই পাঠালে একেবারে খাস গভর্নরের কাছে জরুরী এত্তেলা। হুগলীর সুবেদার মীর নাসিরের দূত তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। দূতের হাতে খোদ সুবেদার সাহেবের পাঞ্জামোহর করা চিঠি।

হন্তদন্ত হয়ে গভর্নর ছুটে এলেন। মীর নাসির তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, মুর্শিদাবাদে বসে মুর্শিদকুলি খাঁ খবর পেয়েছেন যে, ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের স্ত্রীপুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন ত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সীতারাম রায়ের ফাঁসি হয়েছে দেওয়ানের হুকুমে। বিদ্রোহের অপরাধে। নরহত্যার অপরাধে। কাজেই, মৃত রাজার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক নবাব স্বয়ং। মীর নাসির ইংরেজদের ওপর ভারী সদয়। বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি রবার্ট হেজেসকে চিঠিতে জানিয়েছেন, 'সাহেব জান ত, জাফর খাঁ কোনরকম ছুঁতো পেলেই তোমাদের দুয়ে নেবে। কাজেই যাতে সে সুযোগ সে কোনক্রমেই না পায় সেইজন্যেই আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। যতশীঘ্র পারেন সীতারাম রায়ের বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনদের ধরে হুগলী পাঠাবেন। নতুবা সমূহ বিপদ।"

কোম্পানীকে বলতে হবে না। জাফর খাঁ যে কি চিজ, তা তারা জানে। হাড়ে হাড়ে জানে। তারা দূত-হুজুরকে বললে, একি সর্বনাশের কাণ্ড। বিদ্রোহী সীতারাম রায়ের ছেলেপিলে বউ সব কলকাতায়? তা হুজুররা যখন বলছেন, একেবারে জোর তত্ততাল্লাসী করতে হবে। এখন আপনারা বালাখানায় গিয়ে বসুন। ঠান্ডা হন। তেল-তামাক করুন। আমরা সব দেখছি ব্যাপারটা। এইসব স্তোকবাক্য বলে হুগলীর সুবেদারের লোকজনকে কলুটোলায় সুবেদারের চকমিলান বালাখানায় পাল্কী করে পাঠিয়ে দিয়ে, হেজেস কলকাতার জমিদার স্যামুএল রাউনকে ডেকে পাঠালেন। তাকে ব্যাপারটা ইতিবৃত্তান্ত সব বললে। কাউন্সিলের কাউকে কাউকে ডাকা হল। পাঁচ-মাথা এক করে ঠিক হ'ল যে বিকেলে রাজদূতকে ফোর্ট উইলিঅমে আসতে বলা হবে। আর সেই সময় তাঁর সামনে কলকাতার কালাগোরা সব কোতোয়াল, পাটোয়ারী, নগদী, দারোয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের এজেহার নেওয়া হবে। কোম্পানী যে এই ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানে না, এ থেকে অবিশ্যি সেটা প্রমাণ হবে।

যেই কথা সেই কাজ। সকাল কাটল। দুপুর কাটল। এক সময় শীতের কলকাতা বিকেলের ধূসর জোব্বাটা পরে বুঝি হাওয়া খেতে বেরল। বিকেলের দিকে সেকালে কলকাতার কোর্ট-কাছারি বন্ধ থাকত। সাহেবরা ছড়ি ঘুরিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘুরে বেড়াত। কেউবা গঙ্গার বুকে পানসি চালাত। কিন্তু গরজ বড় বালাই। সেদিন ফৌজদারের অভিযোগের তদারকীর জন্যে সবাই মুখ চুন করে কাছাড়ী এল। এক সময় দিবানিদ্রা শেষে চুমকি দেওয়া ঝলর-ঝোলান সোনাবাঁধান পালকীর মধ্যে বসে মুঘল-দূতও এলেন ইংরেজদের গড়ে। তারপর তাঁর সামনে সুরু হল হাজারো জেরা। প্রতিটি কালা কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতে লাগল জমিদার স্যামুএল। মীর বসিরের চিঠির মর্মার্থ পড়ে শোনান হল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা। সবাই শুনলে। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। বললে, যদি কেউ সত্যি করেই সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লুকিয়ে রেখে থাকে, তারা এর মধ্যে নেই। দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললে সবাই একে একে।

বললে ত, কিন্তু এরপরই সুরু হল মজাটা। মীর বসিরের পাঠান লোকজনদের একজন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, তার মনে হয়, কোম্পানীর নফররা যা বলল, তা ঠিক নয়। সে নিজে মুর্শিদকুলির গুপ্তচর। বলাবাহুল্য, এই খাস কলকাতার মৃত্তিকায় সে বিচরণ করে থাকে, অবশ্য গুপ্তভাবে। একদা এইখানেই সে সীতারাম রায়ের পরিবারের কয়েকজনকে ধরে ফেলেছিল। তাদের সে ধরেও নিয়ে যেত হুগলীতে। কিন্তু বাদ সেধেছিল কোম্পানীর কলকাতার বাসিন্দারা। তারা বললে, এটা ত' আর মুঘল রাজত্ব নয়। এখানে চলে কোম্পানীর কানুন। কাজেই 'দুম' করে ধরে থাকে খুশি যেখানে খুশি নিয়ে গেলে ত' চলবে না। কালা জমিদার আছে হ্যারী মুরে। তার কাছে নিয়ে যেতে হবে এইসব ধৃত ব্যক্তিদের। সে যা বলবে তাই হবে। এইসব কথা বলে কলকাতার বাসিন্দারা সেই সব লোকজনকে ছিনিয়ে নিয়ে হ্যারী মুরের কাছে হাজির করে। তারপর আর সীতারাম রায়ের লোকজনদের তার হাতে দেওয়া হয় নি। শুধু তার নয়, নবাবের অন্যান্য গুপ্তচরদের বদ্ধমূল ধারণা, ওরা এখনও কলকাতায় আছে।

হেজেস সব শুনে বললে, তাই নাকি? ডাক হ্যারী মুরকে। হ্যারী মুর এক পাশে বসেই ছিল। এগিয়ে এসে এজেহার দিলে, কথাটা সত্যি। কয়েকজন লোক গোবিন্দপুরের ঘাটে স্নান করছিল। তাদের সীতারাম রায়ের পরিবারে লোক সন্দেহে তার কাছে ধরে নিয়ে আসে। হ্যারী মুর ত আর তখন সীতারাম রায়ের মাহাত্ম্য জানে না। সে ভাবলে, কি দরকার বাপু এইসব ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার। যারা তাদের ধরে এনেছিল, তাদেরই হাতে সেইসব ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয় সে। ভাবখানা এই, যা ভালো বোঝ কর বাপু তোমরা। আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। হ্যারী মুর এও বললে, ধৃত ব্যক্তিরা বোধ হয় কিছু টাকা খাইয়ে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পায়।

রামনাথ তখন গোবিন্দপুরের খাজনা আদায় করে। সে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে

বললে সে ক তথা হুজুর আমি ত স্বয়ং সেই লোকদের হুগলীর ফৌজদারের লস্করদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে আর্বাবা অনেক রাত হয়ে গেল তার-পর আর তাদের সম্বন্ধে কোন কথা আমার কানে আসেনি

কলকাতার গভর্ণর রবার্ট হেজেস পড়লেন ফ্যাসাদে। আচ্ছা ঝামেলা ত কি-কার কি-কার ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল দূতকে বললেন, ব্যাপারটা ত জটিল বলেই মনে হচ্ছে খাঁ সাহেব। এই ব্যাপারে চর লাগিয়ে তদন্ত করতে হবে। এবং সেটা সময়-সাপেক্ষ। কাজেই হুগলীর ফৌজ-দার মীর নাসিরকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ণ একটি মিষ্টি চিঠি লিখে দিলেন তিনি কোম্পানীর প্রতি মীর নাসিরের যে প্রগাঢ় প্রীতি তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে হেজেস সাহেব লিখলেন যে মহারাজ সীতা-রাম রায়ের কোন লোক যদি কোনক্রমে কলকাতায় লুকিয়ে থাকে তাদের খুঁজে বার করে হুগলীতে পাঠাবার চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি করবে না ফৌজদারের সাধ্যমত ইংরেজ কোম্পানী। কয়েক লাইন এইরকম একটা জোরালো আশ্বাস দিয়ে হেজেস তাঁর চিঠি শেষ করলেন। এবং সেই চিঠি হাতে পেয়েই সেবারের মত বিদায় করলেন হুগলীর মুঘল দূতকে।

কিন্তু ইংরেজরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে শুধু কথাই বলে না; কাজ করে। তারা মুলিক-কুলিখাঁকে চিনত। যে কোন ছলে কোম্পানীকে জব্দ করতে যে তিনি তৎপর এই চিন্তা কিন্তু কোম্পানীকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। কোনরকম চুপ করে বসে থাকা তারা পছন্দ করে বলে মনে করলে না। তার পরদিন গোরা জমিদার স্যামুএল ব্রাউনের ওপর হুকুম হল সারা শহর কল-কাতার বাজারে বাজারে ঢি ঢি করে ঢাঁড়া পিটিয়ে দেবার। মণ্ডেবাজার। সতেরহ-বাজার। নতুনবাজার কোন বাজারই বাদ গেল না। ডাঁহা কলকাতা গোবিন্দপুর, সুতানুটী কোন গঞ্জই ছাড় গেল না। কোম্পানীর লাইনে কর্ণ ঢুলী ঢোলসহরৎ করে জানালে ভূষণার পরাজিত রাজা সীতারাম রায়ের আত্মীয়স্বজন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতায়। যে বা যাহারা তাদের ধরে দিতে বা খোঁজ দিতে পারবে, তাদের নগদ একশ' টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু ঢাঁড়া নয় বাজার সহরে করতে কলকাতার কাজী মাসিন্দারা দেখলে এই মর্মে কাগজে লিখে সেই নোটিশ সহরের বাজারে বাজারে এবং সকল প্রকাশ্য স্থানেও লটকে দেওয়া হল।

তা না হয় হল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। কোতোয়াল কলকাতায় তার চরেদের ধমকাতে লাগল। কোতোয়ালকে ধমকাতে লাগল গোরা জমিদার। কিন্তু কোথায় সীতারাম রায়ের লোকেরা? এদিকে দিন কাটে। সপ্তাহ কাটে। পক্ষ যায়। দেখতে দেখতে ফেব্রুআরি মাসটা গোটাগুটি কেটে গেল। মার্চ পড়ল। মার্চের তিন তারিখ। কোম্পানীর কাছারীতে গোরা জমি-দার স্যামুএল ব্রাউন আলবোলায় টান দিচ্ছিলেন মৃদু মৃদু। তাকিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে কোম্পানীর হিসেবের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় দুটো কালো-পানা লোক হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল। ব্রাউন চমকে উঠলেন, কি ব্যাপার? একটু দূরে কালা জমিদার হ্যারী মুর তার 'টেন রেজিস্টারে' সেদিনের হিসেব তুলছিল, সেও ব্রাউনের চিৎকারে চমকে উঠলে। কি ব্যাপার? লোক দুটো সাপের মত হিস্‌হিস্‌ করে বললে, খবর আছে হুজুর। একেবারে সাহেবের কানের কাছে মুখ টেনে নিয়ে বললে, জোর খবর হুজুর।

—কিসের খবর?

—সীতারাম রায়ের পরিবারের লোকে-দের।

—হোয়াট? ব্রাউন ত একেবারে লাফিয়ে উঠল। ইদানীং স্বয়ং হেজেস সাহেব তাকে তাগাদা দিতে শুরু করেছিলেন। কাজেই ব্রাউন ত হাতে চাঁদ পেল। বলল, ইজ ইট? লোক দুটো তখন একেবারে হেসে বিগলিত। একমুখ হেসে বললে, একেবারে পাক্কা খবর হুজুর। লোক দিন। তাদের বেঁধে নিয়ে আসি। একেবারে পিছমোড়া করে। কৌতূ-হলে চকচক করে উঠল স্যামুএল ব্রাউনের কপিশ চোখের তারা। জিগ্যেস করলে, কোথায় আছে তারা?

—গোবিন্দপুর।

—কার বাড়ী?

—সেই প্রশ্নের যে জবাব দিলে তারা তা শুনে এমনি চমকে উঠল কালা আর ধলা জমিদার দুজনেই যে সেই মুহূর্তে সেই ঘরে বাজ পড়লেও বোধকরি এতটা চমকে উঠত না তারা। গুপ্তচর দুজন বললে, সীতারাম রায়ের লোকজন আছে লাট গোবিন্দপুরে পাটোয়ারী রামনাথের বাড়ী। কয়দিন আগে সেই অবশ্য বলেছিল যে দেওয়ানের লোকেরাই মহারাজ সীতারাম রায়ের পরিবারের লোকেদের ধরে নিয়ে গেছে তার চোখের সামনে। তারপরে সে আর কিছুই জানে না।

গুপ্তচরেরা ভুল খবর দেয়নি। ব্যক্তিগত সমূহ বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও রামনাথ যশোহরের তথা বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতিকে আশ্রয় দিতে ভয় পায়নি। তার নিজের বাড়ীতে রেখেছিল পুরুষদের। মেয়েরা ছিল অন্য এক বাড়ীতে। খবরটা পেয়েই ব্রাউন আর দেরী করলে না। খাস ফোর্ট উইলিয়মে গভর্নরের কাছে চলে গেল। খবরটা তাঁকে জানালে। হেজেস সেই গুপ্তচরেদের সঙ্গে দশজন পুলিশ আর দুজন বিশ্বস্ত গোরা কর্মচারী দিলেন। তারা বীরবিক্রমে সবাইকে ধরে আনলে। পরেরদিন কোনরকম কালক্ষেপ না করে কোম্পানী নিজের লোকজন দিয়ে সীতারাম রায়ের আত্মীয়স্বজন, তাদের সঙ্গে মালপত্র সম্পত্তি সবকিছু হুগলি পাঠিয়ে দিলে। মীর বক্সীর খুশী আর ধরে না।

কারা আশ্রয় নিয়েছিল কলকাতায়? যতদূর জানা যায়, মহারাজ সীতারাম রায় যখন দেখলেন যে যেসব হিন্দু নৃপতিদের ভরসায় তিনি মুঘলকে খাজনা না দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে এবং কোনক্রমেই আর তাঁর স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব নয়, তখন তিনি তাঁর তৃতীয়া মহিষী, একটি শিশুকন্যা ও তাঁর দুই পুত্র কামদেব আর জয়দেবকে বজরা করে পাঠিয়ে দেন রাঢ়দেশ উদ্দেশে। তাঁরাই আশ্রয় নিয়েছিল কোম্পানীর রাজত্ব কলকাতায়। কলকাতার প্রথম রাষ্ট্রিক শরণার্থী তাঁরাই। আর তাঁদের আশ্রয় দিয়ে রামনাথ পাটোয়ারী স্বাধীন-চিত্ত বাঙালীর মুখরক্ষা করেছিলেন। কল-কাতার মুখ রেখেছিলেন। মান রেখেছিলেন। হয়ত শেষরক্ষা হয়নি, কিন্তু মুখরক্ষা হয়েছিল। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ, এই মহৎ প্রচেষ্টা কোনক্রমেই উড়িয়ে দেবার নয়। অনেকে অবশ্য মনে করেন রামনাথ ছিলেন রাজা সীতারামের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। হয়ত বা। কিন্তু আত্মীয়ের জন্যই কে বা এই ধরনের বিপদের ঝুঁকি নেয়? নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে?

এবং এর জন্যে তার নিগ্রহ কম হয়নি। সতেরশ' ষোল সালে বাঙলা থেকে বিলেতে পাঠান এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে রামনাথ তখনও জেলে। তাকে কোম্পানী জরিমানা করেছে। কিন্তু রামনাথ কলকাতা কাছারীর দু' টাকা মাইনের গরীব গোমস্তা। জরিমানা দেবার সংস্থান কোথা তার? তবে সহৃদয় বাঙালীর অভাব হয়নি কলকাতায়। বাঙালী ব্যবসায়ীরা তার জন্যে একশ' টাকা তুলে দিয়েছিল। তবে তাতেও কোম্পানীর রাগ কমেনি। রাষ্ট্রদ্রোহী রামনাথকে তারা ছাড়েনি। তাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, জরিমানার টাকা না পেলে তারা রামনাথকে চাবকাতে চাবকাতে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেবে।

শেষবেশ রামনাথকে সেই অবমাননা সইতে হয়েছিল কিনা সে খবর জানা নেই। অবশ্য হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। তাতে রামনাথের গৌরবের কোন হানি হবে না। রামনাথ স্বাধীন বাঙালীর চিরকালের নমস্য ব্যক্তি। কলকাতার সামান্য কর্মচারী রামনাথ পাটোয়ারীর উদ্দেশে একালের বাঙালীর শতকোটি নমস্কার!

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ছেলেবেলায় টুকু ছিল একমাত্র নিভৃত সঙ্গিনী। জীবনে অনেক গোপন সংবাদ ওর কাছ থেকেই জেনেছি প্রথম। তার আগে অপরিচয়ের ব্যবধানে অন্ধকার ছিল সুদূর, দুস্তর, দুরধিগম্য। বাঙলার পদকর্তা বলেছেন, 'আমার অধিক গুরু, বৈঠক গুরু, গুরু অগণন।' টুকু ছিল তাই। অবশ্য তারও আগে এসেছিল পিপি। গোটা রাত্র একই বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। নারীর হৃদয়, প্রেম যেন এক লহমায় তলিয়ে গেল কোথায়। তখন থেকে কবিতা আমার দু'চক্ষের বিষ। গান আর পাগল করে না আমাকে। লোকে ভাবে, রস-কষহীন, ভয়ংকর কাঠখোট্টা মানুষ। নিতান্ত বদ-খদ স্বভাব। তলিয়ে কে আর কাকে দেখে?

পিপি বলেছিল, 'এই কথা যেন পাথরে চাপা থাকে চিরকাল। যতদিন বাঁচবো কেবল আমি জানবো, আর তুই। এখন বুঝলি তো দেহটা কোন সুখের কাঙাল?'

বলিনি কাউকে। বলা কি যায়? বয়সের বিচারে পৃথিবীর আলো-অন্ধকার আবর্তের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার চেয়ে কিছু নিবিড়। দেহে-মনে ক্লেদ আর পঙ্ক মেখে এমনি করেই চুপি-চুপি বড় হলুম। এখন কোথায় আছে পিপি, সুখে আছে কিনা তা-ও জানিনে। শুধু মনে আছে, এই দেহ সুখের কাঙাল। এখনো একলা হলে থেকে-থেকে আচমকা মনে পড়ে, সেই মুখ, অন্ধকার নিপাট বিছানা আর কান্নার মত অর্থহীন, অস্পষ্ট প্রলাপ। চিবিয়ে, থেতলে বার-বার উচ্চারণ করি সেইসব কথা, আস্বাদ নেই। তিক্ত, বিস্বাদ আফিমের নেশার মত রক্তের ভেতরে ঝিম ধরে খানিক। এই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে নতুন কিছু করা কিংবা ভাবা অন্তত সাময়িকভাবে দুঃসাধ্য মনে হয়।

'জানো, আমি তোমাকে ভালোবেসে-ছিলুম।'

বিশ্বাস করিনি। কারণ, মনটা বিষিয়ে দিয়ে গেছে পিপিই। অথচ সে ছিল ছাড়া-ছাড়ির চরম মুহূর্ত। রক্তে তখন ভাবনার চেয়ে ব্যাকুলতাই বেশী।

'কাল আমরা চলে যাবো।'

সদ্যশাড়িপরা টুকুকে মনে হচ্ছিল নতুন ঊষার মত স্নিগ্ধ, শান্ত, সুদূর। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। অথচ ধ্যানে অনুভব করা যায়। এমন করে পরিপূর্ণভাবে ওকে আর কখনো দেখিনি। পলকে বয়স যেন আমাকে ছেড়ে দিন-মাস-বছর পেরিয়ে অন্য দেশে চলে গেল। অন্য কোনো গ্রহে। যেখানে পাপ নেই, পুণ্য নেই, ভয় নেই, ভ্রান্তি নেই। শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তি। শুধু দেহ, শুধু দীপ্তি।

'যাওয়া মানেই তো আসা?'

'না।' মাথা দুলিয়ে টুকু বললে, 'চাকরী ছেড়ে দিয়েছে বাবা। এবার আমরা দেশে যাবো।'

জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল একবার। আমিই বাঁচিয়েছি। টুকু তা ভোলেনি। সর্বাঙ্গে আগুন মেখে কেঁদে-কেঁদে নির্লজ্জের মত আমাকেই ডেকেছে কেবল।

আজ তাই চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে সবকিছু দেখে নিতে চাই, যা আমার দান, যা আমার স্মৃতি। নির্দ্বিধায় বুকের আঁচল সরিয়ে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত, উদ্ভাসিত হল টুকু। আর মুহূর্তে মন্দির হয়ে গেল শরীর!

'আর কিছু?'

'তৃষ্ণায় যদি কোনোদিন জল না মেলে তাহলে তোমার কাছেই যাবো।'

'যেখানেই থাকি আমি চিরদিন তোমার। শুধু তোমারই।'

সেই যাওয়া এখনো হল না। টুকুকে বুঝি আর দেখা হবে না জীবনে। অথচ

আশা ছিল যাবো, সময় হলে তোমার কাছেই যাবো। টুকু, আজ তুমি কোথায়? অবসরের উন্মনা মুহূর্তগুলি এখনো তোমার কথা ভেবে তোলপাড়। এখনো মনের মধ্যে বেঁচে আছে গ্রাম, দেশ, বনভূমি। আর সেই গ্রাম্য বালিকার সরল, সহজ আত্মদানের স্মৃতি। কাছে রাখতে চেয়ে রাখা গেল না। দেখতে দেখতে যাকে আর দেখা গেল না।

টুকুর হাত ধরে ঘোরা, সে ছিল ছেলে-বেলাকার সাধ।

টুকুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, সে ছিল জীবনে নিয়তি-নির্ধারিত এক অনন্য পরিণতি।

যার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ। না টুকু, না আমি।

দুঃখ তাই অবিরল।

আছে সব। সেই বকুল, লতা-পাতা, কার্পেটে নিপুণ শিল্প! ঝিনুকের ফুল-দানি, মালা, রক্তের গোলাপ! ধুলো আর ধোঁয়ার আড়ালে ম্লান। ঝেড়ে নেবার সময় নেই, মুছে দেখার গরজ নেই। তবু আছে, ভোলেনি কিছুই। একদিন যত্ন ছিল, অকারণ আদর ছিল এদের। আজ শুধু সঙ্গে রয়েছে, প্রাণের মত, প্রত্যঙ্গের মত কাছে কাছে রেখে দিয়েছে টুকু। কিন্তু একদিন বুঝতে পেরেছিলাম, আমরা যত নিকট, ততখানিই দূর। সংসারের নিয়মে লজ্জা দিয়েই সুন্দরকে ঢেকে রাখার, আড়াল করার রীতি। এই ঝিনুক, ওই মালা, রক্তের গোলাপ এরা আমার কৈশোরের বেদনা দিয়ে গাঁথা। আমি এদের চিনি। এত নিকট এত আপন আজ আর টুকুও নয়। অথচ এরা আজ কত দূরের।

মনে রেখেছে সব, সকল কথাই। সেই প্রেম, প্রতিশ্রুতি, অভিমান। অদর্শনের দুঃখ তবে একা আমারই নয়। আড়াল থেকে খোঁজ নিয়েছে, দূরে থেকে খবর পেয়েছে, কেমন আছি, আদৌ আছি কিনা। তবু না জানিয়ে, না শুনিয়ে আচমকা চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছি বলেই কি এত স্থির, এমন অচঞ্চল? যেন জানার মধ্যে ফাঁকি নেই, চিনতে কোথাও বাকি নেই আর। ভেতরে-বাইরে মানুষটা আমি কেমন, কতখানি খাঁটি, চোখ বুজে টুকু তা এক্ষুনি বলে দিতে পারে।

আর আমি কী চেয়েছিলুম? এত পথ হেঁটে এ আজ কার কাছে আসা? সেই টুকুই তো? বালক বয়সে নিরুপায় ছেড়ে দিতে হয়েছে যাকে? তাই বলে যৌবনে আমাকেই ফিরিয়ে দেবে তুমি? কৃপণের মত সরিয়ে নেবে হাত? কথা ছিল, তৃষ্ণায় কাতর হলে কাছে যাবো। তুমি চিরদিন আমার, শুধু আমারই। কিন্তু এ কেমন ছল! দরজাটা খোলা, তুমি নেই! তুমি, সেই তুমি! পৃথিবীর মাঠ-ঘাট এখনো ফুল-ফল-ফসলে পূর্ণ হয়ে আছে। তামাটে খুশি মাখা বসন্তের আসা-যাওয়া তেমনি অবারিত। শুধু বঞ্চনার মরুভূমি আমার ঠিকানা! ধূপ আর ধূসরতা আকীর্ণ করে রেখেছে আমার পথ।

'ভালো আছো তো টুকু?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'দেখতেই পাচ্ছো।'

হাসতে চেয়ে দেহ-মন গুলিয়ে ওঠে। যেন এক্ষুনি বমি করে ভাসিয়ে দেবো ঘর। যাকে চেয়ে এত পথ হেঁটে এখানে আসা, সে আজ কোথায়? এ যে অন্য মানুষ! ত্রিশূলের মত চোয়াল। ভুরুর নিচে শূন্য বাসার মতই দুই চোখে অন্ধকার। পাকানো দড়ির মত দুই হাতে পেতলের বুলি। কাকে চেয়ে কার কাছে এলুম। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারিনে। টুকু সুখে নেই, টুকু ভালো নেই। যেন সব অপরাধ আমার। মুখ ফুটে বলতে পারিনে, তোমাকে ভয়ানক দরকার। একদিন তুমিই কথা দিয়েছিলে টুকু! তাই আসা। এবার কী নিয়ে ফিরে যাই বল তো? কোথায় যাই আমি?

'বিয়ে করেছো নাকি?'

গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ। যেন ঝাল খেয়ে কথা বলছে। শুনে হকচকিয়ে চাই। সঠিক জবাব দিতে বিলম্ব হয়ে যায়। খাতিয়ে দেখতে হয়, ভাবতে হয়। তবে কি আশা করেই বসে ছিল টুকু? পৃথিবরাজের মত আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে নিয়েই পালিয়ে যাবো কোথাও? নিজেকে বাস্তবিক অক্ষম, অপদার্থ মনে হয়।

'করতে হয় তাই করা।' কথা বলতে বলতে হাই তুলি। মুখের সামনে তুড়ি দিই। যেন জীবনে অথবা সংসারে ওলোট-পালোট হয়নি কোথাও। আমি সেই আমিই আছি, টুকু সেই টুকু। এতটুকু নড়-চড় হয়নি কিছুই। তবে কেন কান্না পায়? বুকের ভেতর টন-টনিয়ে ওঠে ব্যথা?

'পথ ভুলে নাকি?'

চেহারায়, অবয়বে উদাস, নিস্পৃহ মনে হয়। কণ্ঠে বিদ্রূপ। ফিরে যাবো? বুকের ভেতরে ছুটন্ত ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ওঠে রক্ত। অত সহজে আঘাত পাইনে এখন। ভুলে গেলে? কেন আসা বুঝতে পারো না? শিশু তো নও। আমিই কি অচেনা হয়ে গেছি তবে? একদিন না চাইতে এই দেহ, এই প্রাণের বিনিময়ে সর্বস্ব পণ করে বসেছিলে? আজ কি ভুলে গেলে টুকু? আমি কিন্তু ভুলিনি কিছুই, এখন ইচ্ছে হলে শুধু দেহ নয়, প্রাণ কেড়ে নিতে পারি। ভাবছো, কি দুর্জয় আমার সাহস! কিন্তু আমি তৃষিত, আর্ত, অসহায়! আজ তুমি ছাড়া গতি নেই। কথা রাখতে ছুটে এসেছি। দূর, দুস্তরতা ঘুচিয়ে আরো নিকট, আরো সংশ্লেষ হতে চাই।

'তোমার স্বামী কোথায়?' চারদিকে তাকাই। আতি-পাতি করে খুঁজি সব।

'কাজে গেছে।' যেন সভয়ে জবাব দিচ্ছে টুকু। গলা কাঁপিয়ে কথা বলে। বেশ মজা লাগে। ভেতরে-ভেতরে একটা সুখ একটা অনির্বচনীয় কৌতুক অনুভব করি।

'একা নাকি? মা হওনি?'

চোখের উপর তর্জনী তুলে ধরল। মাথা দুলিয়ে ময়লা হাসি হেসে আমাকে যেন ঘায়েল করতে চাইল। দাঁতে পাইওরিয়ার ক্ষত। গা ঘিন-ঘিন করে। আঙুলের মত কণ্ঠার হাড়। গো-সাপের গায়ের মত ঘামাচি ভর্তি ঘাড়-গলা কেমন কুৎসিত, খস-খসে। অথচ তুমি কত সুন্দর ছিলে। একদিন মন-ভুলানো রূপ ছিল তোমার।

'আর কেউ নেই?'

'আছে। বুড়ি শাশুড়ি।'

'কোথায়?'

'অন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সব দায় এখন আমার।'

ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, ম্লান দেখাচ্ছিল টুকুকে। যেন সরাসরি অভিযোগ করতে চাইছে। কথায়-কথায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে, সব দোষ আমার। ইচ্ছে করলে সেদিন আমিই বাঁচাতে পারতুম ওকে। বয়সের বিচার করবে না? অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার? বললে এখুনি কান্নায় ভেঙে পড়বে। চিনি তো। এখন বয়স হয়েছে, ছেলের মা হয়েছে টুকু। হোক না পঙ্গু আর বোবা ছেলেই তো? টুকুরই পেটে-ধরা ছেলে। বেশী বোঝাতে গেলেই বলবে, অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অভিজ্ঞতা আমাদের বয়স আর চিন্তার ফসল। আসলে বল না কেন, তুমি ছিলে ভীরু। কাপুরুষ। হ্যাঁ তাই। কিন্তু আজ তো নই। আজ তো কথা রাখতে চলে এসেছি, টুকু। দেয়াল দেখি। ফাটা ছাদ। বর্ষার জলের দাগে বিবর্ণ। ঘুনে ধরা কড়ির গায়ে বাদুড়ের মত ঝুল-কালি। মেঝের এক পাশে কাঁথা-কানি, বিছানার স্তূপ। স্যাঁতসেতে গন্ধ। দড়িতে ঝোলানো জামা-কাপড়। সরে এস টুকু। চেয়ারের কাঁধ থেকে নোংরা কাঁচুলিটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল। হাত ধরে কাছে টানি। বলি, 'কেউ তো নেই। একটু পাশে বসবে না আমার?'

নিপুণ লম্পটের মত হাসতে থাকি। টুকুর ভাবলেশহীন মুখে আরো এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে কে! ও এখন ভয়ে কাঠ। হৃদপিন্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাধা দেবার সাহস নেই। অথচ তেমন করে কাছে আসার তাগিদও নেই আর। দাঁতে দাঁত ঘষি। ইয়ার্কি।

'কথা রাখলে ক্ষতি কি, টুকু?'

'ক্ষতি তোমার নেই, আমার আছে।'

'তবে যে বড় মুখ করে আসতে বলেছিলে?'

'বলেছিলুম বুঝি? তাহলে ভুলে যাও সে কথা। এখন এই ঘর-দোর-সংসারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছি। জট নামিয়ে দিয়েছি এর বাইরে একেই আরো শক্ত, সজীব করে তুলতে চেয়ে। আজ টেনে তুলতে গেলেই ছিঁড়ে যাবে। জীবনটাই নীরস হয়ে যাবে আমার। তুমি কি তা-ই চাও?'

কথায় কি চিড়ে ভেজে? ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা আমাকে উগ্র উন্মাদ করে তোলে। হাত থেকে কাঁচুলিটা ছিনিয়ে নিই। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে দূর দেয়ালের কোলে ছুঁড়ে দিই। মেষের মত গম্ভীর, গাঢ় স্বরে আদেশ করি, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও টুকু!'

মুখে মদের গন্ধ নিয়ে রাত করে ঘরে ফেরে মদন। হাতে কচ্ছপের মাংস। বলে, 'চলে তো এসব?'

উৎসব। ফটো : চিত্রজিৎ ঘোষ

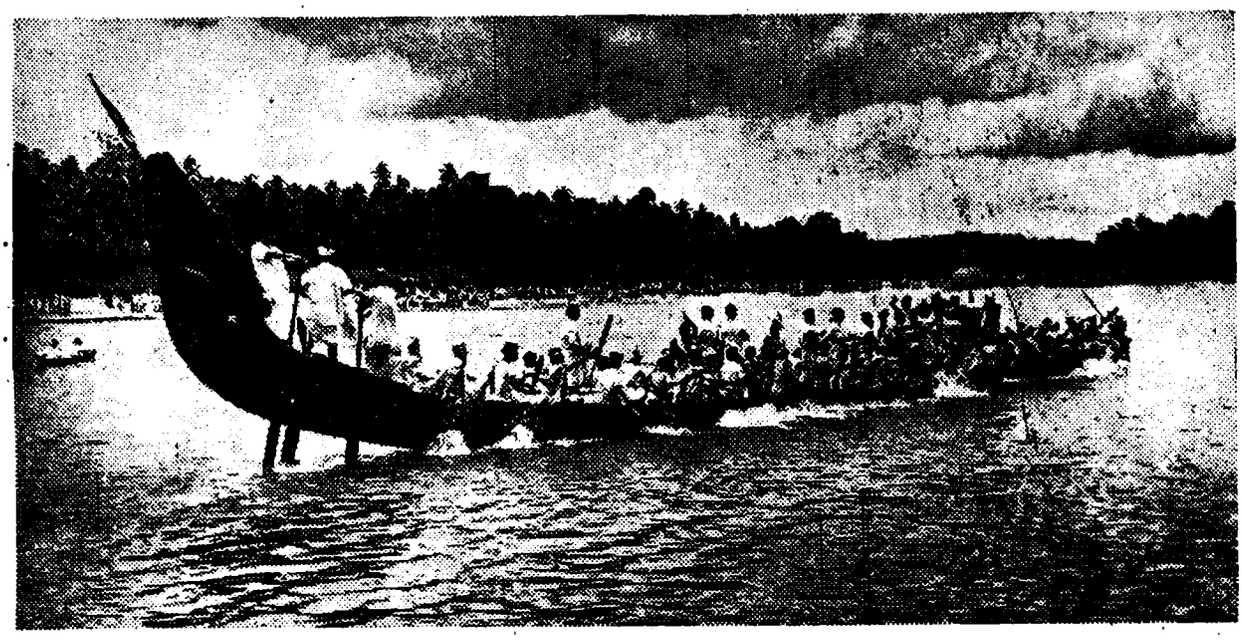

চোখ টিপে সায় দিই।

'আমার আবার না হলে চলে না।' ফোকলা গালে ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে থাকে মদন।

টুকু দুটো গ্লাশ এনে সামনে রাখে। কিছু কাঁচা পেঁয়াজ, লঙ্কা, ছোলা-মটর। বেশ যত্ন নিয়ে দুটি গ্লাশ পূর্ণ করে মদন। গদ-গদ স্বরে বলে, 'নিন। কত জন্ম তপস্যা করলে আপনাদের মত পুণ্যাত্মার সঙ্গ পাওয়া যায় ভাবুন তো?'

তরল আগুন এক নিঃশ্বাসে গলায় ঢেলে শূন্য গ্লাশটা মদনের সামনে রাখি ফের।

'আপনি দেবতা। পায়ের ধুলো দিন।' মাংসের ঝোল মাখা হাতখানাই আমার পায়ে ঠেকিয়ে কপালে, বুকে বুলোতে থাকে মদন। রাগ করে বলে, 'মাগীকে আপনি কী শিখিয়েছিলেন বলুন তো? কেমন মাস্টার ছিলেন আপনি? আমাকে ভক্তি-ছেদ্দা করে না একদম। ঘরে ঢুকলে নাকে কাপড় দিয়ে পালিয়ে যায়। অথচ এখনো আপনাকেই মান্যি করে। কথায়-কথায় খোঁটা দেয়। শোনায়, আমি নাকি আপনার পায়ের যুগ্যি নই। তা একবার বলে-কয়ে, শিখিয়ে দিয়ে যান না কেন?'

এবার টুকু ডাকে।

উঠে যাই।

'কত রাত হবে তোমাদের?'

'গোটা রাতই কাটিয়ে দেবো ভাবছি। তুমি ঘুমোওগে যাও।'

'তাই কি হয়? তুমি থাকবে একটা মাতালের সামনে বসে, আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবো?' মোহিনীর মত হাসি হাসে টুকু। এখন অনেক সহজ, অনেক সরল মনে হচ্ছে ওকে। যেন সেই টুকু। যে একদিন হেসে কাছে এসেছিল, কেঁদে বিদায় নিয়েছিল। এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? অন্ধকার কোন অরণ্যের গভীরে নিজেকে লুকিয়ে রেখে-ছিলে বল তো? বেশ-বাস-প্রসাধনে এ যে অন্য মানুষ। এখন তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আদর করে কাছে টানি, বুকে হাত রাখি। টুকু নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে চায়, আরো নিবিড়। চুলের গন্ধে নাক ডুবিয়ে বলি, 'একদিন আমার জন্যে মরতে চেয়ে-ছিলে। আজ পারো না?'

কথা না বলে একে-একে দেখিয়ে দিলে টুকু। জঙ্ঘায়-যোনিতে-স্তনে সেই দাগ, সেই চিহ্ন। তাহলে আমি এখনো বেঁচে আছি! কলঙ্কের মত সর্বাঙ্গ জড়িয়ে রয়েছি তোমার! দেখে আশ্বস্ত হই, তৃপ্তি বোধ করি। মদনকে মনে হচ্ছে হেয়, অপদার্থ, অর্বাচীন।

ধীরে ধীরে ফিরে এলুম।

মাংস চুষতে চুষতে মদন বললে, 'হল?'

কথা বলিনে। চুপ-চাপ বসে থাকি। মাথাটা ভীষণ ভারি ঠেকছে। ফাঁকা, উদাস, শূন্য মনে হচ্ছে ঘর। দড়ির আলনায় একটিও কাপড় নেই। মেঝের ওপরে বিছানাটা এলোমেলো করে পাতা। দেয়ালে বস্ত্রহরণের ছবি। কড়িকাঠে বাদুড়ের মত ঝুল। কেরোসিনের লালচে আলোয় সবকিছুই রহস্যময় ঠেকে। ক্যালেন্ডারের পাতায় বল্লমের মত সূচ। সন-তারিখের অসংখ্য ফুটো। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মদনের বোবা ছেলেটা জানোয়ারের মত একবার চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল। আমি কি মাতাল হয়ে যাচ্ছি নাকি? পাশেই মড়ার খুলির মত মাংসের বাটি, গ্লাশ, বোতল। গোটা মেঝেটাই যেন কঙ্কাল-করোটিময় এক বিশাল শ্মশান। ও-পাশে জ্বলন্ত সিগা-রেটের টুকরোটা ধোঁয়া ছড়িয়ে জ্বলছে। কাত হল মদন। বমি করল। শেষে হাত-পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিল মেঝেয়। বমির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে দেয়ালের কাছে চলে গেল। মদনের কান্ড দেখে নিজেকে ভীষণ একলা মনে হচ্ছিল। তারপর আমিও ওর দেখাদেখি বমির ওপরে নাক-মুখ ঘসতে ঘসতে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলুম। দু'হাতে প্রায় বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করে ডাকলুম, 'মদন!'

ডাক শুনে এতক্ষণ পরে একটা বাচ্চা ছেলের মতই হু-হু করে কেঁদে উঠল মদন।

মদনের মা চীৎকার করছিল।

'মদন, অ মদন!'

কিন্তু ঘুম ভেঙে পাশের ঘরে যেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। টুকু তখন জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুনের শিখাগুলি হাজার আঙুলে ছাদ-বর্গা-কড়িকাঠ ছুঁতে চাইছে। বোবা ছেলেটা মরে পড়ে আছে। টুকু নিঃসাড়। ধোঁয়া আর মাংস-পোড়া গন্ধে সারাটা ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মদন আমার হাত ধরে টানল। বাসি হাড়-মাংস, বমির ভেতরে গ্লাশ আর বোতল নিয়ে আবার নতুন করে গুছিয়ে বসলুম। মদনকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। এবার আমি ধীরে ধীরে মাতাল হয়ে যাচ্ছিলুম। ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল আমার। অনেক কথা মনে পড়ছিল। বুকের ভেতরে পুড়ে যাচ্ছিল যেন। পাশের ঘরে আগুন ছাই হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার আত্মার মত যোনিহীন, স্তনহীন, জঙ্ঘাহীন টুকু পবিত্র হচ্ছে ক্রমশ।

তুমি কি সুন্দর!

কৃষ্ণা রায়

সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে মুনিদের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সৌন্দর্য মানুষের কাছে চিরকালের আকর্ষণ। আজকের যুগে তো নারীর সৌন্দর্য বিচার নিয়ে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। এ নিয়ে বিতর্ক আছে, থাকবেও। অথচ দেশে-দেশান্তরে এই নয়নলোভন সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা প্রসারিতই হয়ে চলেছে। প্রতিযোগিনীও প্রতি বছরেই বাড়ছেন।

অর্থাৎ পুরুষের চোখের সামনে নারীর সৌন্দর্য বিচারের এই রীতি নারীদেরও গা-সহা হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর নানা চোখে ধরা দেয় নানাভাবে। মায়ামি সমুদ্রসৈকতে, লং-বীচে কিংবা ভূমধ্যসাগরের সোনা-ঝরা উপকূলে সুন্দরী-সভার বিচারকরা সৌন্দর্যের বিচার করেন কত দিক থেকে। শুধু লাবণ্য নয়, সুষমা নয়, সুন্দরীদের দেহকাঠামোও বিচার-বিষয় হয়ে ওঠে। এর পারিভাষিক নাম হল ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিকস্। জনৈক রসজ্ঞের সেই স্মরণীয় উক্তি মনে পড়ে যিনি সুন্দরীদের অঙ্গসুষমার পরিমাপগত বিচারকে উপহাস করে বলেছিলেন : ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিকস্ হল বিকিনি সাঁতারের পোষাকের মতো। এতে যা দেখা যায় সেটা লোভনীয়, কিন্তু যা দেখা যায় না, সেটাই হল আসল, যাকে বলা যেতে পারে ভাইট্যাল।

সুন্দরী নির্বাচনের সময়ে গৌরবর্ণের প্রতি প্রশ্নাতীত পক্ষপাতিত্ব থাকে। ও-দেশে এবং এদেশে সর্বত্রই একই বিচার। চম্পকগৌরী নারীর সুচারু মুখের বর্ণনায় এই দেশের সাহিত্যিকরা পঞ্চমুখ। হয়তো আর্য প্রভাবের জন্যই গৌরাঙ্গীর প্রতি আকর্ষণ জন্মেছিল এদেশে। তন্বী শ্যামার অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা সত্ত্বেও গৌরীর তপ্তকাঞ্চন রূপের কাছে তার ঔজ্জ্বল্য যেন চিরকালই ম্লান। কবি যতই বলুন কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ, এদেশে কৃষ্ণাঙ্গীর প্রতীক্ষার দিন এখনও শেষ হয়নি। এদেশের কবির লেখনীতে নারীর রূপ বর্ণনায় ঘুরে-ফিরে একই উপমা আসে :

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবণিরে

নায়িকার দেহের লাবণ্য চম্পক, শোণফুল ও কনকগিরিকে পরাজিত করেছে। নারীর কোন্ জিনিসটি সুন্দর—এ নিয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকবেও। পুরুষ শিল্পী, কবি ও কথাকার অজস্রভাবে, অজস্রভাষায় এই সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সুন্দরকে সত্যের সঙ্গে সমার্থক ভেবেছেন কবি কীটস্। মানুষের চোখে দেখার আগেই সৃষ্টি হয়েছে সুন্দরের। সে-সৌন্দর্য হৃদয়-বিদারকও। যখন বিদীর্ণ হবার মতো কোনো হৃদয় থাকবে না, তখনও সুন্দর থাকবে। নারীদেহের সৌন্দর্যে সবচেয়ে রহস্যময় বলা হয়েছে তার চোখদুটিকে। সেই অতলতার সন্ধান মানুষের শিল্পদৃষ্টিতে সবচেয়ে কাম্য বস্তু। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা মরিস শ্যাভেলিয়র নাকি বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাঠ্যবস্তু হচ্ছে নারীর চোখ।

প্রকৃতির রাজ্যে ফুলকেই বলা হয় সুন্দর, মনুষ্যজাতিতে রমণীকেই বলা হয় সৌন্দর্যের আধার।—এই উক্তি একজন মঙ্গোলীয় কবির। কখন কাকে সুন্দর দেখায় তার কোনো আইনসিদ্ধ নিয়ম নেই। এ-বিষয়ে একজন আধুনিক মঙ্গোলীয় লেখকের একটি অনুপম অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি পড়েছিলাম তাঁর ছোটগল্পে। গল্পটি বলে সুন্দরের একটি সম্ভাব্য সংজ্ঞা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। গল্পটি এই :

"আপনি কোনোদিন ভেবে দেখেছেন কি একজন আধুনিক তরুণের চোখে নারীর সৌন্দর্য কীভাবে ধরা দেয়? সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক ও প্রসাধন-কলা যুক্ত হয়েছে নারীদেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে। সেই আবরণ ছিন্ন করে প্রকৃত সৌন্দর্য ক'জনই বা উপলব্ধি করতে পারে? আমার দেশের সুন্দরী তরুণীদের লাবণ্যের স্তুতি করে জাতিগত গর্ব প্রকাশ করতে চাই না আমি। আমি আফ্রিকার মালিতে একজন অপরূপা কৃষ্ণাঙ্গী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইয়োরোপের গৌরাঙ্গী স্বর্ণকেশীদের সৌন্দর্যও আমি দেখেছি। কিন্তু যে সৌন্দর্য প্রথম দর্শনেই মন মুগ্ধ করে, জীবনে শুধু একবারই তার দর্শন মেলে বলে আমার ধারণা। স্মৃতিপট থেকে কিছুতেই সেই সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে মুছে ফেলা যায় না।

আমার সত্তর বছরের বৃদ্ধ কাকা এখনও সেই সুন্দরী তরুণীর কথা বলেন যাকে তিনি যৌবনে একবার মাত্র দেখেছিলেন নির্জন স্তেপভূমিতে। আমি এখনও যেন দেখি আমাদের দেশের অশ্বারোহিণী সেই তরুণীটিকে। তার ঘোড়ার খুরে বালুকণা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, তার দীর্ঘ কেশরাজি, সুঠাম তনু, অপূর্ব উজ্জ্বল লাবণ্যদীপ্ত মুখ বহু বৎসর আগেকার সেই স্মৃতিকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে তোলে এ-যুগের তরুণ আমার মনের আয়নায়। আমি যেন এখনও নিজের কানে শুনতে পাই সেই সুন্দরী তরুণীর কোমল কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন : আমি কোন্ পথে গেলে স্তেপভূমি পার হতে পারব বলতে পারেন?

আমার কাকার তরুণ বয়সের কথা। তবু আজও তা কত সত্য। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তাদের তরুণ দিনের কথা মনে করে। কেউ তা ভেবে আনন্দ পায়, কারো বা মনে নেমে আসে স্মৃতির অনন্ত বিষাদ। তরুণ বয়সেই সুন্দরীদের সঙ্গে বেশি সাক্ষাৎ হয়। সেজন্যেই কি এই স্মৃতির অবিনশ্বর উপস্থিতি ঘটে না?

আমার জীবনের এমনি এক স্মরণীয় সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বছর-দশেক আগে। আমরা তিনজন তরুণ লেখক ফিরছিলাম গোবি মরুভূমি দেখে। তখন শীতকাল। বরফ জমতে শুরু করেছে। সারাদিনের ক্লান্তি নেমেছে আমাদের দেহে এবং মনে। ঘুরে ঘুরে অবসন্ন। বাড়ি থেকে এত দূরে। প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ছে। নিজেদের মধ্যে সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে। গাড়ি ছুটছে। আমরা নিঃশব্দে সেই অপসৃয়মান পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

মাঝপথে এসে শুরু হল ঝড়। তুষার-ঝড়। প্রবল হাওয়া বইছে। মনে হল যেন অকস্মাৎ আকাশ এবং মাটি ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ তুষারে। পথঘাট খুব চেনা নেই। মনে হল একটি মরু-প্রান্তর-ঘেঁষা গ্রামের

কাছে এসে গেছি। ওদিকে শীতের ছোট বেলা যায়-যায়। দেখতে দেখতে দিনের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে নেমে এল অন্ধকার। আমরা পথের নিশানা ফেললাম হারিয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন ও বিরক্ত আমরা ভুল পথ নেবার জন্য পরস্পরকে দুষতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম এই দোষারোপে কোনো কাজই হবে না। সেই অন্ধকারে আমরা আকাশের দিকে বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলাম। উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম কোনো কুকুরের ডাক শোনা যায় কিনা। তাহলেই বুঝতে পারব কাছাকাছি কোনো মানুষের বসতি আছে। চলতে চলতে আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছুল পাহাড়ের পাদদেশে একটি সরাইখানার কাছাকাছি। দেখলাম বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কয়েকটা উট। তাদের সারা গা বরফকণায় ঢেকে গেছে। চোখে পড়ল অদূরে সরাই-খানার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ আলোর রেখা। চিমনির ধোঁয়াও চোখে পড়ল। সে যে কি আশ্বস্ত হলাম আমরা বলে বোঝানো যাবে না।

আশ্রয় নেবার জন্য আমরা সেই সরাই-খানায় প্রবেশ করেই দেখা পেলাম একটি তরুণীর। তার মাথায় ছিল ফারের টুপি। ঘরটি একেবারেই সাদাসিধে। আসবাবপত্র কিছুই ছিল না। তবু খুব ভাল লেগেছিল সেই ঘরটি। ভেতরটা বেশ গরম। আমরা ভারী কোট আর পায়ের বুট জুতো খুলে আরাম করে বসলাম। মেয়েটি আমাদের পরিবেশন করে গেল গরম সুগন্ধী চা। আমরা তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছি আর আড়চোখে তাকাচ্ছি আমাদের আপ্যায়নকারিণী তরুণীটির দিকে।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাকে দেখে। তার প্রতিটি ব্যবহার—সামোভার থেকে চা ঢেলে দেওয়া, চুল্লিতে শুকনো কাঠ ঠেলে দেওয়া, আমাদের খেতে দেওয়া, সব তাতেই এমন সুন্দর ও নম্র ভঙ্গি আমাদের প্রশংসা উদ্রেক করল। মনে হল যেন রূপকথার কোনো দৃশ্য দেখছি আমরা।

তার চোখ দুটি ছিল অপরূপ মায়াবী, শান্ত ও স্নিগ্ধ। আমি আর তেমন চোখের দৃষ্টি কোথাও দেখিনি। কালো চুল মাঝ-খানে সিঁথে করা। স্পষ্ট ভ্রূযুগল মুখটিকে সুডৌল সৌন্দর্য এনে দিয়েছিল। সেই ভুরুর নিচে কালো চোখ দুটিকে অপূর্ব রহস্যময় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন জিয়োকোণ্ডার রহস্যময় স্মিতহাসিতে ভরা তার চোখ। কিন্তু যখন মেয়েটি উৎকর্ণ হয়ে বাইরের ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি লক্ষ্য করছিল তখন সেই অতল রহস্যময় চোখে ফুটে উঠছিল উদ্বেগের চিহ্ন, কিছুটা বা ক্লান্তিও।

তরুণীটি কথা বলছিল তার গোবি অঞ্চলের সুরেলা ভঙ্গিতে। হাসবার সময় তার ঠোঁট দুটি নরম সুন্দর হাত দিয়ে ঢেকে রাখছিল। স্তিমিত আলোকে সেই সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গিটি লাগছিল অপূর্ব, সুন্দর, মোহময়। তার মুখের উজ্জ্বলতা যেন আসছিল ভেতর থেকে। এই উজ্জ্বলতা তার সর্বাঙ্গের সৃষ্টি যে-দেহ প্রখর গ্রীষ্মের তপন তাপ গ্রহণ করেছে, বসন্ত কুসুমের সুরভি নিয়েছে আপন করে, সঞ্চারিত হয়েছে শরতের মৃদুমন্দ হাওয়ায়।

তরুণীটির দিকে তাকিয়ে আমার শহুরে প্রসাধন-নিপুণা বান্ধবীদের নিতান্ত নগণ্য মনে হতে লাগল। তাদের উজ্জ্বল প্রসাধনকলায় কখনই কোনো তরুণ মনে এমন আনন্দ এনে দিতে পারবে না যা দিতে পেরেছে গোবি প্রান্তরের সরাইখানার এই সহজ সুন্দরী তরুণী যার সৌন্দর্য প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া।

মধ্যরাত্রিতে ঝড় থামল। আমরা সরাই-খানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আমরা নিজেদের মধ্যে একটি কথাও বললাম না। সামনে বিস্তীর্ণ তুষারাচ্ছন্ন ঘুমন্ত পথ। রাত্রির নৈঃশব্দ ভাঙছে শুধু গাড়ির চাকার শব্দ। মনে হল কথা বললেই আমাদের মনের সেই স্নিগ্ধ মুগ্ধতা যেন ভেঙে যাবে যা এই অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তার করে দিয়েছিল আমা-দের সমগ্র অস্তিত্বে। গভীর নীরবতায় সেই ক্ষণটুকুকে আমরা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রাখতে চাই।"

এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—মোমেন্ট মেড ইটারনিটি, সুন্দরের এই আকাঙ্ক্ষা চিরকালের, সব দেশেরই মানুষের কথা। তাকে কোথায় কখন আবিষ্কার করা যাবে সেকথা কেউ বলতে পারে না। নাগরের আসরে নয়, সমাজসৈকতে নয়, সহস্র লোভাতুর চোখের হিংস্র আলোকের সামনে নয়—এমন কোনো অনাবিষ্কৃত দেশে পথ চলতে অকস্মাৎ সে সামনে এসে দেখা দেবে আর তখনি অনুচ্চারিত কণ্ঠে হৃদয়ের বিস্ময় রূপ পাবে ভাষায় : তুমি কী সুন্দর!

পিছন দিকে জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে যা দেখার মোহিনী ঠিকই দেখে। তবু মাথা ঘোরে না, চোখে শর্ষের ফুল ফোটে না বা দুম করে মরে যাবার মত লজ্জাঘেন্না আসে না তার। শুধু হাতের আঙ্গুলগুলো আরও লিকলিকে খসখসে আর মরামাস খুস্কিওঠা দেখায়। চোখ ফিরিয়ে একবার নিজের হাত দুটোই দেখে নেয় সে। অসম্ভব খড়ি খড়ি চেহারায় নিজেকে মনে হয় আস্ত বাঁদর, যেন পা তুললেই ঘুঙুর বাজবে।

ফের ফুটোয় চোখ রাখে সে। থুতনিতে পিঁপড়ে সুড় সুড় করে, এইটুকু যা উপদ্রব। তবে সহ্যশক্তি থাকলে অনেক দূর অব্দি দেখা যাবে। মোহিনীর এখন ফেরার কথা নয়। শুধু এখন কেন, আসানসোল থেকে লরী ফিরতে পুরো দুটো দিন ও একটা রাত্তির লাগার কথা। পাঁচ মাইল যেতে না যেতে হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এক হেলেগরুর উদয়, এবং চাপা দেবার পর দেখেছে, শুধু গরু নয়, সঙ্গে মানুষও ছিল—দুটি প্রাণীই থেঁৎলে একাকার হয়ে গেছে। গাড়ি পাশের নয়ানজুলিতে কাত হয়ে পড়ে আছে। কাছেই একটা চটি মত বাজার ছিল। সুতরাং মোহিনীর কপাল কেটেছে। চোয়াল টেঁসে গেছে। সারা শরীর

থ্যাঁৎলানো তো বটেই ; দারুণ জ্বরভাবও রয়েছে। আচমকা দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে সে।

কিন্তু সত্যি কি পালিয়ে বাঁচা যায়? বাঁচা মানে তো জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। আকাশভরা রোদে যেমন জীবনের সুখ ছড়ানো, সেই জীবনের নিজের ভিতরও আশাআকাঙ্খা তেমনি ব্যাপক। নিতান্ত লুকোচুরির ছলে নেপথ্য থেকে মঞ্চে উঁকি মারতে গিয়ে মোহিনী দেখে জীবনটা হঠাৎ বড় বেশী ফাঁকা। অর্থাৎ আকাশে শুধু নীলই দেখছিল এযাবৎ; শূন্যতাটা লক্ষ্য করেনি।

খাটে ডাইকরা বালিশ। সেখানে হেলান দিয়ে বড় আরামে আছে রাজেন। বিছানাতেই চায়ের কাপ, খাবারের প্লেট। জলের গ্লাসটা কেন যে পড়ে যাচ্ছে না, এই আশ্চর্য।

পায়ের দিকে সুলতা বসেছে। কপালে দারুণ টিপ, এলানো খোঁপা। বুকের উপর দিকটায় সরু চেন চিকমিক করছে। কাপড় সরে কাল ব্লাউজে টান টান মাংসের ভাঁজ খুব বেশি প্রকট—ইচ্ছাকৃত কিংবা অলক্ষ্যে, মোহিনী জানে না আপাতত। সুলতার একটা পা মাটি ছোঁওয়া, অন্যটা ঝুলছে। জানু দুটোর উপর কাপড় আরও টান টান মনে হচ্ছে। এই সকালে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুলতার শরীর রেডিয়ামের মত তাপ বিকীরণ করছে এবং হারামজাদা রাজেন বেশ আরামে বসে খোসগল্প জুড়েছে।

জানালার বাইরে এদিকটায় যেখানে মোহিনী দাঁড়িয়েছে এক টুকরো সব্জীক্ষেত। সব্জীগুলো যদিও এ শরতে অসম্ভব সবুজ হয়ে আছে, কথামত পরিচর্যার অভাবে বেশ জংলী দেখায়। এলোমেলো ঝাকড়মাকড় আগাছার সঙ্গে তারা একাকার। গেরস্থ কিশোরী শিম লতার সঙ্গে বুনো শিম যেন বা সরীসৃপের মত গা-জড়াজড়ি করে মিথুনলিপ্ত। ঢ্যাঙসের খসখসে গায়ে হাতিশুঁড়োর ঢলাঢলি। বড় সাধের চিকনকোমল লাউলতাকে পিষেছে বুনো আলুর ঢ্যামনা সাপের মত কুঞ্চিত গতর। ঝিংয়ের সঙ্গে তেলাকুচো আর বিষাক্তধুঁদুল। ঠিক সহাবস্থান নয়, ধর্ষণ। মাঝে মাঝে অজস্র রংবেরংয়ের দোপাটি ফুল গাঁদা ফুল আর জিনিয়া ফুটেছে। ভালবাসার ভান—মোহিনীর মনে হয় ; এগুলো ভালোবাসার ফাঁদ। ঘাসফড়িং উড়ছে। বুলবুলি ফিঙে, শালিক দু চারটে ঘোরাঘুরি করছে। নীচে কোথাও ফাঁকা ভিজে মাটিতে—যেখানে ঘাস গজায়নি ঘন ছায়ায়, গুটিকয় ছাতারে পাখি হল্লা করছে। প্রজাপতি উড়ছে। গাংফড়িং উড়ছে। চিরোল ঘাসের পাতায় লালপোকা নীলপোকা হাঁটছে। কাছেই মাচানের ওপর একটা লাউডগা সাপকে শুয়ে থাকতে দেখে মোহিনী। আরামে শুয়ে ব্যাটা যেন দেখছে মোহিনীকে। ভারী জ্বলজ্বলে নীল চোখ। কেন মোহিনীর হঠাৎ হাসি পায়। মনে মনে বলে, দাঁড়া, মজ্যাটা টের পাওয়াচ্ছি। লিকলিকে আঙুল দুমড়ে কিল দেখায় সাপটার দিকে। সাপটা শুয়েই থাকে। মোহিনীর পায়ের কাছে ঝুরঝুর করে মাটি খসার শব্দ হয়। সে দেখে দেয়ালের ভিতে ইঁদুরেরা মাটি জড়ো করেছে। খুব পুরনো এই একতালা দালান। মোহিনীর ঠাকুর্দার পয়সায় তৈরী। ঠাকুর্দার ছেলেটা ছিল বাউণ্ডুলে গোছের। গাঁজা খেত। জমিজমা কল্কেয় নাকি পুড়ে গেছে। মোহিনী তখন ছেলেমানুষ। আজকাল মোহিনীর মনে হয়, মদ খেয়ে মানুষ ফতুর হয়—গাঁজা খেয়ে ফতুর হবে কেন? গাঁজার সঙ্গে নিশ্চয় কিছু ছিল। মেয়েমানুষ? আলবাৎ। গাঁজা আর মেয়েমানুষ—খুড়ি, পদ্য করতে দোষ নেই, গাঁজা আর বাঁজা মেয়েমানুষ। তবে সেই একরকম ভালো। কোন দায়ঝঞ্ঝাট থাকল না। অবশ্যি তার বৌ, সাক্ষীগোপাল মেয়েমানুষ যেটা ছিল, অর্থাৎ মোহিনীর মা, সে বাঁজা ছিল না—তার প্রমাণ মোহিনী। মোহিনী আকাশ থেকে পড়েনি বা পথ থেকে কুড়োন নয়। কিন্তু এটা নিতান্ত বিশ্বাস ছাড়া কী? মোহিনীর চেহারা তার মা বা বাবা কারুর মত নয়। কেবল চোখ দুটো বরাবর লালচে —একটু ঘোলাটে। তা বলে চোখের দৃষ্টিতে কোন খুঁত ধরা পড়েনি আজ অব্দি। শুধু চোখের লালচে ভাব, ঝিমুনি ইত্যাদি মাঝে মাঝে নাকাল করে মোহিনীকে। তার ড্রাইভার হওয়া উচিত হয়নি।

ধুস্ শালা। হঠাৎ সাতপাঁচ ভাবনা গা থেকে পোকা ঝাড়বার মত ঝেড়ে ফেলে ফের ঘুলঘুলিতে চোখ রাখে সে। দেখে সুলতার হাত ধরে টেনে কাছে নিচ্ছে রাজেন। সুলতা, এই কী হচ্ছে বলে, শেষঅব্দি কাছেই যাচ্ছে। ডাইকরা বালিশে দুটিতে পাশাপাশি হচ্ছে। তারপর রাজেন তার রোদপোড়া মুষলের মত উল্কোখুল্কো ঠ্যাঙটা সুলতার কলাগাছের গুঁড়ির মত ডগডগে জানুতে চাপিয়ে দিয়েছে। বিপজ্জনকভাবে কাপড় সরে যাচ্ছে সুলতার। আর রাজেন গলার আংটি পরা মোটা আঙুলে ওর গলার খাঁজ আর ঠোঁট যেন ইঁদুরের মত কুটছে। গালে গাল ঠেকেছে দুজনের। সুলতার চোখটা অবশ্যি এদিকেই। ঘুলঘুলির দিকেই যেন। বড় বড় শান্ত চোখ। গভীর চাহনি। মোহিনীর চোখটা কি দেখতে পাচ্ছে সে? নাঃ, তাহলে তো এরকম ঘটতে থাকত না। আস্তে আস্তে বুকের কাপড় কোমর থেকে নেমে যাওয়া।

স্লে শালা! ঘুলঘুলিতে ইঁদুর। চোখে তার গোলাপী ঠোঁটের ধাক্কাও লাগে যেন। মোহিনী চোখ সরিয়ে নেয়। নিভাঁক ইঁদুরটা সুড়ংগে স্থির হয়ে থাকে। নড়ে না। এ এক উপদ্রব। নীচে থেকে একটা শুকনো ডাল খুঁজে নিয়ে খুঁচিয়ে দিতে যায় মোহিনী। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠে তার। কপালের টাটকা ঘায়ে যে রক্ত জমেছিল এতক্ষণ জানালার রডে ঘেঁষে ঘেঁষলে গেছে। তাই ফের রক্ত উপচে আসে। চোখ ঢেকে যেতে থাকে। হাত দিয়ে চেপে ধরে মোহিনী। সারা মুখে রক্ত নিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। মনে পড়ে না, ওরা কি তাকে কোন রড দিয়ে মেরেছিল? নাকি ঘুষি? কিলচড় অবশ্যি বেদম পড়ছিল। মাথাখারাপ হঠাৎ কোন সজ্জন এসে পড়ে এইটুকুর বিরতি, ভীড়টাও ক্লান্ত, তার ফলে আচমকা দৌড়ে পালিয়েছিল সে। পালাতে পারত না। তবে দুটো ব্যাপার ওকে তখন সাহায্য করেছে। মৃত্যুভয়ে মরীয়া হতে পারা এবং হঠাৎ সামনে ইলমাইলের ট্রাক এসে পড়া। এক ড্রাইভার আরেক বিপন্ন ড্রাইভারকে মদদ্ দিয়েছে। কেবল হাটু আর হাত-ভকতের জন্যে ভাবনা হয়। তারা কি পালাতে পেরেছে? বেচারাদের একপাল করে পুষ্যি।

রোদ খুব কড়া লাগে। ছায়ায় নিয়ে সরে এসে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর মোহিনী এবার শুয়ে পড়ে। নীচে মাটি স্যাঁতসেঁতে। তবে ঘাস পুরু থাকায় তার অসুবিধে হচ্ছে না। নিজের বাগানে চিত হয়ে শুয়ে মোহিনী ওপরে লতাপাতার ফোকর দিয়ে আকাশ দেখতে থাকে। তার সামনে পায়ের ডাইনে-বাঁয়ে আগাছা আর দোপাটির ঝাড়। খুব কাছে না এলে দেখা যাবে না যে এখানে কেউ শুয়ে আছে। আশ্চর্য প্রচণ্ড অভিমান মোহিনীকে অভিভূত করতে থাকে। মোহিনী কাঁদতে পারেনি। এখন মনে হয়, কাঁদতে পারা খুব সুখের ব্যাপার। অথচ কান্না আসে না। অভিমান তাকে গলাতে পারে না। বরং কুটকুট করে পোকার মত দাঁতে খুটে খায়। এ অভিমান তাকে নিষ্পন্দ করে ফেলে। সে চুপিচুপি শ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলে, এই তো ব্যাপার! কী হবে? নিষ্ফল দুটো ঘাসের পরে ভেঙে পড়ে তার। আস্তে আস্তে চোখ বোজে সে। তার কানের জলায়, গালে, জামার কলারে পিঁপড়েরা সারি চলতে থাকে। মগজ লক্ষ্য করে হাঁটে। বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে সে। বুকের ওপর গিরগিটি হেঁটে যায় নির্ভয়ে। দোপাটি খসে পড়ে। তারপর ক্রমশ মনে হয়, চারপাশে উপরে নীচে সব সবুজে পুড়ে যাচ্ছে। আগুন জ্বলছে। মোহিনী পুড়ে যাওয়ার সুখে চোখ খোলে না।

বড় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল মোহিনী। চোখ খুলে প্রথমে সে অবাক হয়। তার সারা শরীর জ্বালা করে। কান সুড়সুড় করে। আর প্রচণ্ড শীতবোধে আচ্ছন্ন মোহিনী বুঝতে পারে, তখন থেকে কেবল ছায়া তাকে বসে ঘিরে রেখেছে। আশেপাশে কিছু উজ্জ্বল রোদ। তা সত্ত্বেও সে রোদের স্পর্শ পায়নি—কারণ ছায়াই আচ্ছাদিত। রোদ আর ছায়া তাকে নিয়ে বাজী ধরেছিল। ছায়ার কবজির বড় জোর—জিতবার ছাড়েনি।

আস্তে আস্তে ওঠে মোহিনী। তার মনে পড়ে যায়, কখন যেন দু-চারবার ঘুমের মধ্যে হেঁটে (এই দিবালোকে) ওই ঘুলঘুলিতে চোখ রেখেছিল কেন। দেখেছিল সুলতা আর রাজেন জড়াজড়ি এইসব উদ্ভিদের মত শুয়ে আছে। ঘরের ভিতর বন্ধকারে আলোর রেশ কিছু দেখা যাচ্ছিল। মোহিনী জানতে পারে, নীচের এই মাটিটা—যাতে আমরা শুয়ে থাকি, তা

জীবজগতের নিজস্ব জিনিষ এবং স্যাঁতসেঁতে সততঃ। জঠরের মত ভিজে। এই ভিজে জায়গাটি থেকেই যা কিছু গজায়—ফুল বা ফোঁড়া। দোপাটির মত স্থির নিঃঝুম উদ্ভিদের ফুলগুলো চারপাশে ফোঁড়ার মত দেখাচ্ছে। অজস্র টাটকা ও বাসি ক্ষতরাশির বিশুদ্ধ ও পচা রক্তে হাত বুলোতে বুলোতে মোহিনী কাঁপা হাঁটে। দু-একটা পাতা ছিঁড়ে নেয়। দাঁতে কাটে। ফের হাঁটে। তার চোখের সামনে একটু করে অন্যান্য জিনিষ অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত হতে থাকে—কেবল এইসব ক্ষত-চিহ্ন বুকে নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পড়ে থাকা জড়াজড়ি শরীরগুলি সে লক্ষ্য করতে পারে। তার দুটো চোখ ক্রমশ ঘুলঘুলি হতে থাকে। দুহাতে চোখ কচলে মোহিনী চলে। বাগানের এপাশে রাংচিতা বেড়ার সামনে এসে একবার দাঁড়ায়। শ্যাওলাধরা পুরনো পৈতৃক বাড়িটা পিছন ফিরে একবার দেখতে সাধ যায়। কিন্তু ঘুলঘুলি ছাড়া আর কিছু প্রবেশপথ না পেয়ে এবং রাজেন ও সুলতার আলিঙ্গন ব্যতিরেকে ভিন্ন কিছু না জেনে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হঠাৎ তার বুক কেঁপে ওঠে। তার ধারণা হয়, বুকের ভিতর দীর্ঘসময় সে দুটো মড়াকে জায়গা দিয়েছে এবং নিজে চিতার মত জ্বলছে। চিতার আগুন উস্কে দিয়ে মড়াদুটোকে নিকেশ করার কুকীর্তি হয় মোহিনীর। আগুন বড় নিষ্প্রভ। বড় ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কাঠ ভিজে। মাটি স্যাঁতসেঁতে। মোহিনী অসহায় ডিমের মত সরতে থাকে। লম্বা পা বাড়িয়ে বেড়া পেরিয়ে যায়। যাবার পথে ছোট ছোট কাঁটা দিয়ে বসানো ক্যাকটাসের সারি তাকে আঁচড়ে দেয়। খাকি পুরু প্যান্টে পা দুটো ঢাকা, ক্যাম্বিসের জুতো—রক্ত ঝরার সুযোগ নেই। কিন্তু তার মনে হয়, তার পোষাকআষাক থেকেও যথেষ্ট রক্ত ঝরে পড়ছে। এবং পিঠের দিকে শার্ট ভীষণ ভিজে—শার্টটা মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ যাবৎ কেঁদেছে মনে হয়। লাল চোখে মোহিনী তাকায়। ঘুলঘুলি দেখে ফেরে। সে সেই ট্রেজারীকক্ষের সেন্ট্রির মত গাড়োয়ালী ইঁদুরটা খোঁজে। অনেক কষ্টের পর ইঁদুর তাকে চার্জ করে : হল্ট। হুকুমদার! এবং মোহিনী একটু হেসে বলে ওঠে : দোস্ত।

এবার হাল্কা মনে ইঁদুরটা সামনে রেখে মোহিনী পাশ কাটায়। নির্জন পীচের পথে চলতে থাকে। দুপাশে হাউসিং এস্টেটের বড় বড় নির্মীয়মান বাড়ির ছায়া পথের দিকে ঢলেছে। বাড়িগুলোর প্রতিকৃতি মাড়িয়ে বাড়িগুলোকে অপমান করবার সাধে সে হাঁটে। বাড়িগুলো তার কাছে অসম্ভব অপ্রয়োজনীয় ঠেকে। সে তাদের কথা খুঁটিয়ে চিন্তা করে। সে জেনে ফেলে, তাদের পিছনে অজস্র ব্যাপার রয়ে গেছে। তাদের ভিত্তির মাটি কেটেছিল যারা, তাদেরও অজস্র ব্যাপার রয়েছে। ইঁটের জন্যে মাটি লেগেছিল। ইঁট পোড়ানো হয়েছিল। বয়ে আনা হয়েছিল। লোহালক্কর চুন সুরকী স্টোন-চিপস্ সিমেন্ট কন্ট্রাক্টর ওভারসীয়ার হাউসিং কমিটি রাজমিস্ত্রী মজুর...অজস্র ব্যাপার তার সামনে আসতে থাকে। এক অখন্ড যোগসূত্রে কয়েক লক্ষ মানুষকে বাড়িগুলো বেঁধেছে। কয়েক লক্ষ মানুষের ভাবনা শ্রম সাধ উদরপূর্তি বেঁচে থাকা এবং মৈথুনের ইচ্ছা থেকে তাদের অস্তিত্ব। অথচ পলকে, চোখের একটি আকস্মিক দৃষ্টিপাতে—যদি না কেউ অন্ধ হয়, যদি না ওই গাড়োয়ালী ইঁদুর সেন্ট্রির উপদ্রব থাকে, এত উঁচু সব নিঃশব্দ বাড়ি অর্থহীন আর অপ্রয়োজনীয় হয়ে চিৎকারে ফেটে পড়ে। মোহিনী জানতে পারে, এ পৃথিবীর সব ঘরবাড়িকে পলকে ভূমিসাৎ করতে একটা ঘুলঘুলিই যথেষ্ট। সুলতা ও রাজেনের জড়াজড়ি শরীর কেন্দ্র করেই সব ঘরবাড়ি খাড়া হয়েছিল। মোহিনী একটু কেসে মনে মনে বলে, যদি একথায় তোমার আপত্তি থাকে, তো বলতে চাই,...মিষ্টি করে শুদ্ধ করে শিশুসুলভ ভাষো একে বলি 'প্রেম-ভালোবাসা'...হ্যাঁ, পরস্পরকে ভালোলাগা মাত্র। সুলতার রাজেনকে ভালো লেগেছে, আমাকে লাগেনি। এই যথেষ্ট। তবে আইন ...আইনের ব্যাপার একটা আছে (মোহিনী মাথা চুলকায়)। আইনটা কিছু নয়। আইন এরকম করা যেতে পারে : দেখুন (কোন মহিলাকে), আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, আপনারও যদি তা লেগে থাকে, আসুন, আমরা ঘরবাড়িতে যাই মৈথুনে লিপ্ত হতে। আর দেখুন ম্যাডাম, ওই ঘুলঘুলিটা বন্ধ না করে জানালাই খুলে দিন বরং। দরজাও খোলা রাখতে পারেন। তবে ঘরবাড়িটা বিশেষ জরুরী। কারণ মানুষ বিছানায় শুতে অভ্যস্ত। নগ্ন মাটি হোক বা ঘাসে ঢাকাই হোক, তা সবসময় ভিজে আর স্যাঁতসেঁতে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে শোয়াটা বেশ আরামদায়ক; কারণ হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ শুতে অভ্যস্ত। সে দাঁড়িয়ে থেকে প্রেমের নিষ্পত্তি করতে পারে না। মোহিনী খুকখুক করে হাসে। তার মনে পড়ে যায়, চমনলাল ট্রান্সপোর্টের ব্রজেশ ড্রাইভার তাকে একদিন বলেছিল, আবে শালা, স্টীয়ারিং তেরা হাতমে হ্যায়, পাকাড় লেগা কৌন? চালা, জোরসে চালা, ব্যায়সা দিল চাহে! হ্যাঁ, স্টীয়ারিং হাতেই রয়েছে, অ্যাকসিলেটর পায়ের নীচে। স্পীডোমিটার সামনে। স্পীড লক্ষ্য কর। ব্রজেশ বলেছিল, উওলোগ সব রকেটবাগারা বানাতা। কহতা হ্যায়, সায়েন্স মেরা হাতমে হ্যায়! তো মেরে দোস্ত, দেখো, সায়েন্স কাঁহা কিস্‌কা হাতমে হ্যায়! বোতামই বলো, আর স্টীয়ারিং বলো, তুমি, মোহিনী ব্যাটাই আসল লোক। তুমি শালা বোতাম টিপলে জাপানে বোমা পড়ে। তুমি শালা চুপসে বসে স্টীয়ারিংটা একটু ঘোরালেই ব্যাস!...সুতরাং, ইয়ার, মৌজসে রও চুপচাপ। সব ঠিক হ্যায়।

সব ঠিক হ্যায়। মোহিনী খুশী হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে ওঠে। হাঁটতে থাকে। নিজের হাতদুটোর প্রতি গর্বে বুক ফুলিয়ে সে চলতে থাকে। চমনলালের গ্যারেজে পৌঁছতেই কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরে। মোহিনী হাত নেড়ে বলে, সব ঠিক হ্যায়।

চমনলালের সামনে গেলে সে হাতের ইসারায় বসতে বলে মোহিনীকে। মোহিনী একটা চেয়ার টেনে গদীর একপাশে বসে। একটু পরে সে বলে, গাড়ি পাঁচ মাইলে পড়ে আছে।

চমনলাল বলে, খবর সব মিলা। দুসরি গাড়ি লো। আভি জানা পড়ে গা। বহুত্ জরুরী।

মোহিনী শুধু একটু হাসে।

ক্যা? কৈ জখম-উখম হুয়া?

নেহী। মামুলী। হাম ঠিক হ্যায়। লেকিন, ফির কুছ অ্যাকসিডেন্ট হোনে সে? মোহিনী জোর হাসে।

ফির্ ঔর এক গাড়ি দে দেগা।

ফির অ্যাকসিডেন্ট হোনেসে?

ফির্ ঔর এক মিল যায়েগা। চমনলালও হাসে। যেত্‌না হোগা, হো যানে দো না ভাই। তুম শেকোগে কিয়া নেহী?

জরুর।

তব্ উঠো, কুছ খা লিয়া?

নেহী।

তো খা লো। এ বুধিয়া, বাবুকো কুছ খিলাও।

চিবিয়ে চিবিয়ে মাংসের হাড়শুদ্ধ খায় মোহিনী। বেড়ালের মত মুখ করে খায়। খেয়ে ঢেকুর তোলে। সিগ্রেট ধরায়। তারপর বলে, বাড়ি হয়ে যাবো।

চমনলাল বলে, ঠিক হ্যায়। গাড়ি লেকে যাও। লেকিন এক বাত...জ্যাস্তি কুছ না পিও। হাতের ইশারা করে সে পানের মাপ দেখায়।...থোড়িসে পিও। গেট ইউরসেলফ্ রিল্যাক্সড্।

পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে মোহিনী হনহন করে বাড়ি ঢোকে। সুলতা দরজা

সৈকত সাথী
ফটো : সুধীর দাস

খুলে অবাক হয়। শান্ত হেসে বলে, এত শীগগীর ফিরলে যে! পরক্ষণে চমকায়।... তোমার কপালে কী?

দরজা নিজেই বন্ধ করে সুলতার একটা হাত ধরে উঠোন পেরোতে থাকে মোহিনী। বলে, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। জোর বেঁচে গেছি।

গায়ের তাপ বুঝতে পেরে সুলতা বলে, একি! তোমার জ্বর। ইস্, গা পুড়ে যাচ্ছে যে।

ও কিছু না, বলে মোহিনী ওকে টেনে বিছানায় বসে পড়ে। পা দুটো ঝুলিয়ে দেয়। জুতো খোলে। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে।

সুলতা বলে, শোও, শুয়ে পড় চুপচাপ। তারপর ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। উঠে দাঁড়ায়। ...গরম জল করে দিই। হাতমুখ ধুয়ে নাও। কপালে কী লাগিয়েছ?

কিচ্ছু না।

সেকি! দাঁড়াও, ডেটল আনি।

থাক্। তুমি এস এখানে।

সুলতা কথা শোনে না। তক্তাপোষের নীচে থেকে বেতের প্যাঁটরা থেকে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে নেয়। তারপর ডেটল আর তুলোর প্যাড নিয়ে আসে জানালার পাশে রাখা একটা কাঠের টব থেকে। কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে একটু হেসে সে বলে—ওই মদ খাওয়াই তোমার কাল হবে, বলে দিচ্ছি। ছিঃ, গাড়ি অনেকেই চালায়। সবাই কি তোমার মত মদ খায়?

মোহিনী চোখ বুজে বলে, খায় না।

অ্যাকসিডেন্ট হল কেমন করে?

হয়ে গেল।

লাফিয়ে পড়েছিলে?

হ্যাঁ।

কেউ চাপা পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

মানুষটানুষ নয় তো?

সুলতার 'মানুষটানুষ' কথাটা শুনতে কেমন লাগে মোহিনীর। সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, একটা বলদও ছিল।

বলদ?

হ্যাঃ। যা ষাঁড় নয়।

সুলতা মুখ ফিরিয়ে বলে, অসভ্য! নাও, চুপচাপ শুয়ে পড়। গায়ে জ্বর, কী খাবে?

মোহিনী একটু হেলান দিয়ে বলে, খাবো না। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি? সুলতা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। ফের গাড়ি? কোথায় যাবে?

আসানসোল।

কথাটা মোহিনী এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন এক ইস্পাতের নলের মধ্যে শাঁই শাঁই করে বুলেট ছুটে গিয়ে কোথাও শব্দ দেয়ালে প্রতিহত হয়। শুধু প্রতিহত নয়, প্রতিধ্বনিতও হয়। তারপর নিজেই অবাক হয়ে যায়। কী বলল সে? কোথায় এ কথাটা কাকে নিয়ে যায়? কী অর্থে পৌঁছে দেয়? তার এই বাড়ি আর 'আসানসোলের' উচ্চারণ —দুয়ে কোন ফারাক করতে পারে না সে। কী উদ্ভট লাগল শব্দটা। গন্তব্যটা।

আসানসোল? সে কোথা?

আছে। বলছি যখন, নিশ্চয় আছে কোথাও। মোহিনী জবাব দেয়।

এর আগে গেছ কখনও?

কী জানি! চমনভাই জানে।

জ্বরের ঘোরে চুল বকছ। শোও। মাথা টিপে দিই।

সুলতা ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এবার। পেটের চাপ মোহিনীর কোমরের পাশের হাড়ে লাগে। নরম কিন্তু টাইট ব্লাউজ মনে হয়। মোহিনী ওকে জড়ায়। বলে, স্নান করনি আজ?

সুলতা উঁচু থেকে ওকে দেখতে দেখতে বলে, করেছি।

কী রান্না করেছিলে?

কী করব? তুমি নেই। শুধু আলুভাতে ভাত আর ডালসেদ্ধ। হঠাৎ গালটা মোহিনীর কপালের ব্যান্ডেজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কোথাও রেখে সুলতা ফের বলে, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে এসো। কে আছে ওখানে?

দুজন আছে।

ওদের বলে দাও, যাওয়া হবে না।

পাগল?

তবে আমিই বলে আসছি।

যাবে, দাঁড়াও।

বলো।

আমার কাছে একবার শোবে?

সুলতা জোর হাসে।...এমন করে বললে যেন...যাও! কই, সরো, শুতে দাও।

সুলতা শুলে মোহিনী অবিকল শুনতে পায় বাইরে পথের ওপর স্টার্ট দেওয়া গাড়ির গরগর শব্দ। শুয়ে-শুয়েই এখান থেকে তার ঝাঁকুনি গায়ে টের পায় সে। এবং বলে, বেশ আরাম লাগে মাইরি। এখন শুয়ে থাকা গেলে কেমন ভালো হত...কিন্তু যাবে না।

চমনভাই আর শালা তার গাড়ি, আর হারামজাদা ওই আসানসোল... সব শালা খচ্চর, মুখের সামনে থেকে খাবারের থালা কেড়ে নেওয়া। রোস। দেখাচ্ছি মজা। আমি বাবা মোহিনী ড্রাই-ভার। মেরা হাতমে স্টীয়ারিং! থোড়ীসে জাহিনা কী যাঁও...ব্যস!

তুমি ভুল বকছ। মাথায় জল ঢালবে, চলো।

রাখো ইয়ার। আভি চুপসে শো যাও। মৌজমে রও।

ছাড়ো। মাথায় জলপটি দিই!

মোহিনী এবার সুলতার কোমরের কাছে হাত দিয়ে টানতে থাকে।

সন্ধ্যার দিকে রাজেন এসে একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। সুলতাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বলে, কী ব্যাপার?

সুলতা প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় থেকেই জবাব দেয়। নিজেকে ঢাকে না। সে বলে, শুয়ে আছি।

ওকি! ঠোঁট কাটল কিসে?

শুধু ঠোঁট না। সুলতা কেমন হাসে। তারপর গলার খাঁজ, বুক, নাভির কাছটা, সর্বশরীরে আঙুল ছুঁইয়ে ক্ষতচিহ্ন দেখায়।

রাজেন অবাক হয়ে বলে, কেন?

ও এসেছিল।

মেরেছে এমনি করে? রাজেন দাঁতে দাঁত চেপে বলে। স্কাউণ্ড্রেল!

সুলতা ওর হাত ধরে টানে। বলে, না। মারে নি। বিছানায় শুয়ে মারামারি হয় না।

রাজেন সপ্রেমে অথচ ব্যঙ্গ করে বলে, তাহলে আদর করেছে?

হ্যাঁ। স্বামীরা যা করে।

সব স্বামীই অমন হারামজাদা নয়।

যেমন তুমি।

রাজেন একটু হেসে বলে, অবশ্যি আমি তোমার স্বামী নই। প্রেমিক।

অন্য একজনের স্বামী তো!

এই বলে সুলতা একটু সরে যায় জায়গা দিতে। ফের বলে, আমার কাছে যারা শোয়, তারা এক রকমই। এস, শোবে না কী? কই, এস। অভিমান হল বুঝি? সোনা, মানিক, এস!

সুলতাকে স্ত্রীলোক জেনেই রাজেন শুতে যায়।

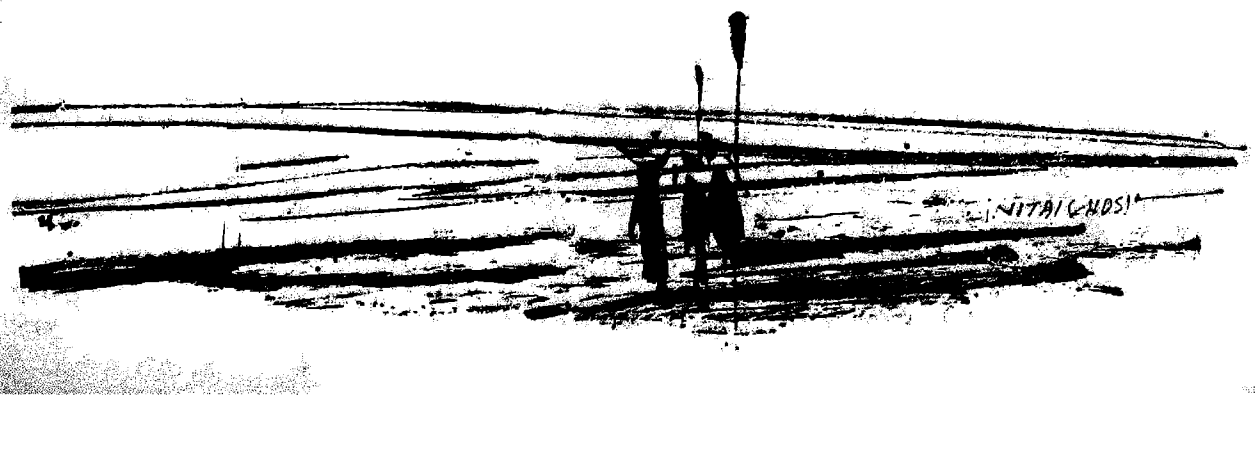

(এক)

ঘুম আসছে না কিছুতে।

নগ্ন আকাশের নীচে চারপাই-এর উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রামস্বরূপ, অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিদ্রার আরাধনা করেছে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে এখন চোখ মেলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশে অনেক নক্ষত্র, রামস্বরূপের মনে হয় যেন চোখের জলের অনেকগুলো ফোঁটা সোনা হয়ে আকাশে ফুটে উঠেছে।—যে চোখের জল কাঞ্চন ফেলেছিল আসন্ন বিদায়ের দিনগুলিতে।

কাঞ্চন দেবীপ্রতিমার মতো সুন্দর মেয়ে, সে খুব কেঁদেছিল, চিৎকার করে নয় নিঃশব্দে। নিঃশব্দে চোখ থেকে উৎসারিত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে ঝরে ঝরে পড়েছিল, রামস্বরূপ তা দেখেছে। নিবিড় যন্ত্রণার নিরুচ্চার অভিব্যক্তি।

যন্ত্রণা যে কত মর্মান্তিক রামস্বরূপ সেদিন অনুভব করে নি, কারণ তার চিত্ত জুড়ে তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উত্তেজনা। উত্তর প্রদেশের গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে সে চলেছে কোলকাতায়, যে কোলকাতা অনেক কাহিনীর কেন্দ্রস্থল, অনেক রোমাঞ্চের রঙ্গমঞ্চ। কোলকাতার সঙ্গে পরিচিত তার গ্রামের মানুষদের কাছে কোলকাতার যে বর্ণনা সে শুনেছে, তা তার চিত্তকে একই সঙ্গে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করেছে। একটা কৌতূহল একটা সম্ভাবনা একটা প্রতিশ্রুতি এবং একটা ভয় প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রিয়ার সঙ্গে বিরহের যন্ত্রণাকে স্তিমিত করে দিয়েছিল। রামস্বরূপ তাই বিদায়-মুহূর্তে কাঁদে নি; কাঞ্চন কেঁদেছিল, কারণ তার সম্মুখে বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না. স্বামীকে ছেড়ে থাকার যন্ত্রণাকে লাঘব করবার মতো কোন উত্তেজনা. কোন অবলম্বন।

কোলকাতায় পৌঁছে প্রাথমিক উত্তেজনার অবসানের পর ক্রমশ রামস্বরূপ বুঝতে পারল কাঞ্চনকে ছেড়ে থাকা কতোখানি কষ্টের। যখন কাজে ব্যস্ত থাকে রামস্বরূপ তখন সময় কেটে যায়; কিন্তু অবকাশ মুহূর্তে কাঞ্চনের অশ্রুসিক্ত মুখখানির স্মৃতি রামস্বরূপকে ব্যাকুল করে তোলে। চারপাইয়ে শুয়ে শুয়ে তাই রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে না রামস্বরূপের।

রামস্বরূপ ভাবে, কাঞ্চন কি ঘুমোতে পারছে; নাকি সেও তারই মতো চারপাই-এর উপর বিনিদ্র রজনী যাপন করছে, এখন এই মুহূর্তে তারই মতো লক্ষ্য করছে চোখের জলের ফোঁটার মতো আকাশের ঐ নক্ষত্রগুলোকে। কোলকাতার পশ্চিম আকাশের তারাগুলোকে হয়তো তার গ্রামের বাড়ীর আঙিনা থেকে এখন দেখা যাচ্ছে, হয়তো এই মুহূর্তে দুজনে একই তারা দেখছে মনে হতেই কাঞ্চনকে কাছে পাবার ব্যাকুলতা আরও তীব্র হয়ে উঠলো রামস্বরূপের অনুভূতিতে। সে চারপাইয়ে পাশ ফিরে শুল এবং ভাবতে লাগলো এই পৃথিবীতেই আছে, মাত্র কয়েকশ' মাইল দূরে, এই আকাশের নীচেই শুয়ে আছে, দুজনের সত্তা দুজনকে নিবিড় করে পাবার জন্য আকুল—কিন্তু পাবার কোন উপায় নেই। এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে দিনের পর দিন কাটাতে হবে, কারণ কবে যে সে দেশে ফিরতে পারবে কে জানে।

এই ধনীগৃহে নতুন কাজ সে পেয়েছে—দশজন ভৃত্যের মধ্যে নবতম এবং কনিষ্ঠতম। কিছুদিন না গেলে ছুটির কথা উত্থাপন করা যাবে না, এবং সেই কিছুদিন যে কতদিন তা অনিশ্চিত। অন্ততপক্ষে এক বছর তো বটেই। এক বছর, ওঃ রামস্বরূপ ভাবতে পারে না কী করে সে এই সুদীর্ঘ সময় কাটাবে। এই যে অস্থিরতা, এই যে যন্ত্রণা আজ রাত্রে সে অনুভব করছে, এক বছর ধরে তা সহ্য করতে হবে মনে হতেই আবার পাশ ফিরে শুল রামস্বরূপ। চোখ বুজে কপাল কুঁচকে সে পড়ে রইল, যেন কপালকে কুঞ্চিত করে ভাবনাকে সে আটকে রাখবে। না ভাবলে যেন কষ্ট কমবে, যন্ত্রণার উপশম হবে।

কিন্তু ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করা দুঃসাধ্য, বিশেষ করে বিনিদ্র রাতের ভাবনাকে। যতবার ভাবা যায়, আর ভাবব না, ততবারই কোন অলক্ষ্য পথে বেহুলার বাসরঘরে সেই সর্পের মতো চিন্তা প্রবেশ করে। রামস্বরূপ সেই অনিবার্য চিন্তার নির্দয় দংশনে ক্ষত-বিক্ষত।

রাত্রি গভীর হয়। আকাশের তারাগুলি স্পষ্টতঃ পশ্চিম আকাশে অনেকখানি সরে গেছে, যে তারাগুলি রামস্বরূপ দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু কাঞ্চন হয়তো দেখতে পাচ্ছিল না, সেগুলো সম্ভবত এখন কাঞ্চনের দৃষ্টির পরিমণ্ডলে এসেছে। কাঞ্চন, কাঞ্চন, মৃদুস্বরে রামস্বরূপ তার প্রিয়ার নাম উচ্চারণ করে, মনে মনে প্রিয়ার যে মুখচ্ছবি মুদ্রিত করে এনেছে চোখ বুজে সে সৌন্দর্য সে স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করে। অযথা এলোমেলো ভাবনার চেয়ে কাঞ্চনের ভাবনাই সুখকর, তৃপ্তিকর। ভাবতেই যখন হবে, তখন কাঞ্চনের কথাই ভাবা যাক।

(দুই)

অকস্মাৎ ভাবনার স্রোতে ছেদ ঘটে। কেননা গেটের দিক থেকে যোগীন্দর সিং-এর পায়ের শব্দ সে শুনতে পায়। যোগীন্দর সিং এ বাড়ীর ড্রাইভার। মাঝে মাঝেই অনেক রাতে ঈষৎ উন্মত্ত যোগীন্দর সিং যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আসে। যাবার সময় দারোয়ানজীকে বলে যায়, ফিরতে রাত হবে। দারোয়ানজী কিছু বলে না, অল্প একটুখানি হাসে এবং যতক্ষণ না যোগীন্দর সিং ফিরে আসে বসে বসে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে।

যোগীন্দর সিং নিঃশব্দে আসে, কারণ বাড়ীর বড় সাহেব কড়া প্রকৃতির লোক। যোগীন্দর সিং-এর এই নৈশ অভিসারের সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছলে যোগীন্দর সিং-এর চাকরি থাকবে কিনা সন্দেহ। প্রচুর ঐশ্বর্য সত্ত্বেও বড়সাহেব সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ।

Caption: Portrait of Mahatma Gandhi

Caption: Mahatma Gandhi in Delhi

এই সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে যোগীন্দর সিং নির্মমভাবে বিদ্রূপ করে। বিদ্রূপ করে যোগীন্দর সিং বড়সাহেবকে, বিদ্রূপ করে রামস্বরূপকে। আজও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ ফেলতে ফেলতে যোগীন্দর সিং এসে দাঁড়ালো রামস্বরূপের চারপাই-এর কাছে, কিছুক্ষণ একটা অদ্ভুত কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো রামস্বরূপের দিকে, যে দৃষ্টির সামনে রামস্বরূপ রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। তারপর এক সময় দাঁত বের করে ফিসফিস করে বললো, কী রে শালা ঘুমোতে পারছিস না।

রামস্বরূপ একথার জবাব দিল না। মদ খেলে মানুষ স্বাভাবিক থাকে না এই তার বিশ্বাস এবং অস্বাভাবিক মানুষের প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনর্থক, তাই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলো মাত্র রামস্বরূপ।

সেই হাসি দেখে যোগীন্দর সিং-এর সমস্ত শরীর যেন জ্বলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, শালার হাসি দেখলে মনে হয় শালার পুরুষত্ব নেই।

তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে যোগীন্দর সিং—অভিসারে যাবার আগে চারপাই বিছিয়ে গিয়েছিল সে, তারই ওপর সে ক্লান্ত মত্ত দেহটাকে নিয়ে ফেলল। শুয়ে শুয়ে রামস্বরূপকে উদ্দেশ করে সে আরও কয়েকটি কথা বলল। বলল, মদ খেয়ে মেয়েমানুষ ভোগ করে আমি এখন পরিতৃপ্ত। দেখ কত সহজে আমি এখন ঘুমিয়ে পড়বো। তুই শালা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের বংশধর, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট কর, আর ঐ জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে থাক।

এই কথা বলে সত্য সত্যই অত্যন্ত সহজে ঘুমিয়ে পড়লো যোগীন্দর সিং। তার গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল রামস্বরূপ। কিন্তু যে জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে থাকবার কথা বলেছিল যোগীন্দর সিং, সে আলো বেশীক্ষণ দেখতে পেল না রামস্বরূপ। অল্প পরেই সে আলো নিভে গেল।

কেন যে যোগীন্দর সিং ঐ জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে থাকবার কথা বলেছিল, তা রামস্বরূপ জানে। ঐ জানালা বড়সাহেবের শয়ন কক্ষের এবং এত অধিক রাত্রে ঐ আলোকিত গবাক্ষ একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে আনে বড়সাহেব স্ত্রীসংগসুখ সম্ভোগ করছেন। অন্তত যোগীন্দর সিং-এর তাই অনুমান।

আলো নিভে গেল। যোগীন্দর সিং-এর অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে ভোগ পরিতৃপ্ত বড়সাহেব এবার অত্যন্ত সহজে ঘুমিয়ে পড়বেন। শুধু জেগে থাকতে হবে রামস্বরূপকে, জেগে জেগে নিদ্রার আরাধনা করতে হবে।

কেন এই শাস্তি, কেন এই যন্ত্রণা। অদৃষ্ট ছাড়া এর অন্য কোন কারণ খুঁজে পায় না অশিক্ষিত রামস্বরূপ। কপালে যা লেখা আছে, তাই ঘটবে, তাই সহ্য করতে হবে। সহ্য করতে হবে এই শারীরিক যন্ত্রণা, এই মানসিক কষ্ট। বড়সাহেবকে এই যন্ত্রণা সইতে হয় না, স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ কদাচিত হয়, তাও অল্প কদিনের জন্য, যখন তিনি টুরে যান। অনেক সময় টুরেও তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। অতএব রামস্বরূপের যন্ত্রণা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, স্ত্রী বিরহের যন্ত্রণা বড়সাহেবকে সইতে হয় না। তাই তাঁর পক্ষে সাত্ত্বিক প্রকৃতির হওয়া অনেক সহজসাধ্য এবং সেই জন্যই সেই সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে কোন মূল্য দেয় না যোগীন্দর সিং, বিদ্রূপ করে। সেই জন্যই নিজের চরিত্রহীনতা, নিজের পদস্খলন নিয়ে কোন লজ্জা নেই যোগীন্দর সিং-এর, বরং রামস্বরূপের প্রাণপণ চরিত্র রক্ষার প্রয়াসকে সে উপহাসের জিনিস বলে মনে করে। নারীদেহে স্বর্গের সুখ সঞ্চিত, সে সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা চরম মূর্খতা বলে মনে করে যোগীন্দর সিং। চরিত্রহীনতা বলে এই অধঃপতনের প্রতি সমাজ ভ্রূ-কুঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর স্ত্রীসংগ থেকে যাতে বঞ্চিত না থাকতে হয়, তার কী ব্যবস্থা করেছে সমাজ—ঐ অন্ধ আত্মাহীন, নির্দয় সংস্থা। ব্যবস্থা করেছে পণ্যশালার, যেখানে নারীদেহ অর্থমূল্যে লভ্য। যে নারী প্রিয়া হতে পারতো, সে নারী পণ্য হয়ে দেহ বিক্রয় করছে। প্রেমহীন, স্নেহহীন জান্তব জীবনের ব্যবস্থা করেছে সমাজ, পশুর পর্যায়ে নামিয়েছে মানুষকে।

রামস্বরূপ পারবে না ঐ পণ্যশালায় যেতে, যতোই কেন না উত্তেজিত করুক যোগীন্দর সিং, বিদ্রূপ করুক, উপহাস করুক এবং প্রলোভন দেখাক। হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই রামস্বরূপকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে যোগীন্দর সিং, কী তার স্বার্থ সেই জানে। নাকি রামস্বরূপের স্বার্থেই। দিনে দিনে রামস্বরূপ যে রুক্ষ হয়ে উঠছে, অনেক রাত যে বিনিদ্র কাটে রামস্বরূপের, যোগীন্দর সিং তা লক্ষ্য করেছে এবং তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়ের সন্ধান দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। অথবা এও হতে পারে যোগীন্দর সিং নিজে নীচে নেমেছে তাই অন্যকেও সমপর্যায়ে নামিয়ে নেওয়ার জন্য তার আগ্রহের অন্ত নেই।

রামস্বরূপ ভাবে। যোগীন্দর সিং-এর প্রতি প্রথমে যে ঘৃণাবোধ করতো, লোকটা মদ খায়, লোকটা চরিত্রহীন, সাত্ত্বিক সত্তার প্রতি কোন মর্যাদাবোধ নেই লোকটার, ক্রমশ রামস্বরূপের মনে হয়, যোগীন্দর সিং-এর কথায় আচরণে কী যেন একটা সত্য আছে, যা তার অধঃপতনকে সহনীয় করেছে। এখন আর সে যোগীন্দর সিং-এর প্রতি সেই প্রাথমিক ঘৃণা অনুভব করে না। বরং যোগীন্দর সিং-এর প্রতি সে একটা আকর্ষণ অনুভব করে। যে জগতের সংবাদ যোগীন্দর সিং নিয়ে আসে, যে জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সে রামস্বরূপকে শোনায়, সে জগৎ রমণীয়, সে জগৎ মাদকতাময়, সে জগৎ

সর্বাধুনিক উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাবরমতী ৬·০০

নারীচরিত্র রচনায় লেখকের আশ্চর্য ক্ষমতা। সাবরমতী লেখকের পূর্ববর্তী সমস্ত নারীচরিত্রকে পরাভূত করে জ্যোতির্ময় আলোকশিখায় ভাস্বর। প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ। চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

নতুন ডিটেকটিভ উপন্যাস

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের

পরলোকে পুলস্ত্য চৌধুরী ৪·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়		জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	
চিহ্ন	৩·৫০	**স্বর্গোদ্যান**	৩·০০
নবেন্দু ঘোষ		সমরেশ বসু	
ভুল ঠিকানা	৩·০০	**উজান**	৪·০০
খগেন্দ্র দত্ত		হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	
চৈত্র-সন্ধ্যা	৫·০০	**অন্য দিগন্ত**	৫·০০
মিহির আচার্য		নীহাররঞ্জন গুপ্ত	
আলোর সহোদর	৪·০০	**মৃগতৃষ্ণা**	৫·০০
ধূসর পদাতিক	৪·০০	**মনবিহঙ্গ**	৫·৫০

ছোটদের ছড়া ও নাটিকা সংকলন

কাজী নজরুল ইসলাম

পিলে পটকা : পুতুলের বিয়ে ৩·০০

হরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী		প্রবোধবন্ধু অধিকারী	
কলতান	৬·৫০	**দিবস রজনী**	৪·৫০

ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

তীব্র মোহ ছড়ায়। তথাপি রামস্বরূপ পারবে না সেই জগতে নেমে যেতে। যে বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা, যে আদর্শবোধ নিয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে, তা পরিত্যাগ করা সহজ নয়। অনেক আত্মনিগ্রহের যন্ত্রণা সইতে পারবে সে, সইতে পারবে না অধঃপতনের যন্ত্রণা। অধঃপতনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে যোগীন্দর সিং, তার হয়তো এ নিয়ে কোন যন্ত্রণাবোধ নেই। কিন্তু রামস্বরূপ জানে এ অধঃপতন মানে কাঞ্চনের প্রতি বিশ্বাস-ভঙ্গ। কাঞ্চন, তার কাঞ্চন, তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে, তারই মত কষ্ট পাচ্ছে। পবিত্র দেহমন নিয়ে সে কাঞ্চনের কাছে যাবে। এখানে অন্য কোন রমণীর সংস্পর্শে এলে কাঞ্চনের সঙ্গে তার আর সেই সম্পর্ক থাকবে না, সেই প্রেমময় মধুময় পরস্পর সম্পূর্ণ নির্ভর স্বাভাবিক সম্পর্ক। শেষ হয়ে যাবে সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে মাধুর্য একটা জান্তব ক্ষুধার উপাদান হয়ে উঠবে কাঞ্চন, মানসিক সম্পর্কহীন দেহ-সম্পর্কের অংশীদার। কাঞ্চনকে সেভাবে ভাবতে পারে না রামস্বরূপ, তাই আদর্শকে আঁকড়ে থাকাই সে ঠিক করলো, যোগীন্দর সিংকে সে স্বীকার করবে না।

(তিন)

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মন পরিবর্তিত হয়, চিন্তার রং বদলায়, ভাবনা মেয়েদের মতো নিত্যনতুন বসনে সাজতে চায়। চেনা পথে মন চলে না, বিচিত্র তার গতি। চিহ্নিত পথ ত্যাগ করে কখন সে নতুন পথে সে পা বাড়ায় অনেক সময়েই টের পাওয়া যায় না।

রামস্বরূপ টের পায় নি, কেমন একটু একটু করে যোগীন্দর সিং তার মনে প্রভাব বিস্তার করেছে—যোগীন্দর সিংকে সে স্বীকার করবে না, একথাটা ক্রমশই যেন জোর করে ভাবতে হয় রামস্বরূপকে আগের মতো সহজ স্বীকার্য নয় এই সিদ্ধান্তটা।

এক বছর কেটে গেছে, অনেক সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত রামস্বরূপের চিত্ত। তথাপি পরাজয় সে স্বীকার করে নি। কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে রামস্বরূপের কাছে, যোগীন্দর সিং-এর জগৎ যেন আরও মনোরম বলে মনে হয়, আরও মোহনীয়। এক-একবার সেখানে যাবার বাসনা অনুভব করে রামস্বরূপ, আর যেন সে সইতে পারছে না এই আত্মনিগ্রহ। যে অবলম্বন এতদিন রক্ষাকবচের মতো রামস্বরূপকে পতন থেকে বাঁচিয়েছে, সে হল কাঞ্চন—কাঞ্চনের চিন্তা, কাঞ্চনের স্মৃতি, কাঞ্চনের রূপধ্যান। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে সে চিন্তা শিথিল, সে স্মৃতি ম্লান, সে রূপ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেক দূরের বলে মনে হয় কাঞ্চনকে; অনেক কাছের হল যোগীন্দর সিং-এর জগৎ, অনেক স্পষ্ট, অনেক প্রত্যক্ষ।

এরই মধ্যে একদিন কামনা যখন দুর্বার হয়ে উঠলো, রামস্বরূপ গেল সেই পল্লীতে, কিন্তু রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলে এলো, কারও অন্দরে সে প্রবেশ করলো না। দুর্বার বাসনাকে শেষ পর্যন্ত বশ করে সে বাসায় ফিরে এলো। ঐ পল্লী দিয়ে যখন সে হাঁটছিল, তার হৃদ্‌পিণ্ডটায় যেন দামামা বাজছিল, সমস্ত হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল। এখনো বাসায় ফিরে চারপাই-এর উপর বসে সে ঈষৎ কাঁপছে, অস্থির, অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। সে যেন ঐ পল্লী দিয়ে হেঁটে এসেছে নিশীথে পাওয়া অসুস্থ অচেতন কোন মানুষের মতো।

বস্তুতঃ ঐ পল্লীটাকে কেমন যেন অবাস্তব অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল রামস্বরূপের। অতগুলো মেয়ে সাজগোজ করে স্বল্পালোকিত দরজায় দরজায় নিজেদের রূপ কিংবা রূপহীনতাকে রহস্যময় করে দাঁড়িয়ে আছে যে কোন পুরুষকে পয়সার বিনিময়ে দেহদানের জন্য এ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রামস্বরূপ। রাস্তার এখানে ওখানে মদ খেয়ে টলছে মানুষ, কোথায়ও বা রাস্তার উপরেই উপুড় হয়ে বমি করছে; তাই দেখে হাসাহাসি করছে মেয়েরা, বিড়ি টানছে, ইসারা ইংগিতে নিমন্ত্রণ করছে পুরুষকে। কোথায়ও হল্লা, কোথায়ও চীৎকার, কোথায়ও সংগীত। বিচিত্র, বিকৃত অন্ধকার।

সে অন্ধকারে ভয় পেয়েছে রামস্বরূপ, তাই সে পালিয়ে এসেছে — দ্রুতপায়ে অতিক্রম করে এসেছে সেই পল্লী, ফিরে এসেছে তার নিভৃত আশ্রয়ে অসুস্থ চিত্তকে সুস্থ করতে। অশান্ত শরীরকে শান্ত করতে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলো না সে চারপাইএ, একসময় শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে ভাবলো আর নয়, এইবার ছুটি নিয়ে দেশে যেতে হবে, কাঞ্চনের কাছে। এক বছর হয়ে গেছে, বড়সাহেব এখন ছুটি দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।

(চার)

আপত্তি করলেন না বড়সাহেব, এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হল। রামস্বরূপ দেশে যাচ্ছে শুনে যোগীন্দর সিং জিজ্ঞেস করল, বউর জন্যে কী নিয়ে যাচ্ছিস, রামু?

—দেখি কী নেওয়া যায়, রামস্বরূপ যোগীন্দর সিং-এর প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিল না, কিন্তু নিজের জন্য তো একটা স্পষ্ট জবাব দরকার। বউর জন্য কিছু একটা নিয়ে যাওয়া দরকার, রামস্বরূপ জানে, শুধু বউ খুশী হবে বলে নয়, কাঞ্চনকে কিছু দিতে পারলে সে যে নিজেও খুশী হয়ে উঠবে। কিন্তু কী নিয়ে যাবে সে, কী দিয়ে কিনবে? প্রত্যেক মাসের মাইনে থেকে সামান্য টাকা নিজের হাত খরচের জন্য রেখে বাকী টাকা সে দেশে পাঠিয়ে দেয়। সেই সামান্য হাত খরচের টাকা থেকে যা বেঁচেছে, তা দিয়ে যাতায়াতের খরচ বাদ দিয়ে বউর জন্য একটা শাড়ী কেনা যায়, কিন্তু আর কিছু বাকী থাকে না। শুধু বউর জন্য শাড়ী নিয়ে যাওয়া কী সম্ভবপর, না শোভন? বাড়ীতে আরো লোক আছে। বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে। এতদিন পরে দেশে ফিরছে রামস্বরূপ, তাদের জন্য কিছু না নিয়ে যাওয়া কি ভালো হবে। কী করবে রামস্বরূপ! একবার ভাবলো, দরকার নেই দেশে যাওয়ার, যখন সকলের জন্য কিছু জিনিষ নিয়ে যাবার সংগতি হবে, তখনি যাবে সে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মনঃপূত হল না তার। ছুটি মঞ্জুর হওয়ার পর থেকেই আনন্দে নেচে উঠেছে তার মন, সে দেশে যাবে, ফিরে যাবে তার প্রিয় পরিবেশে, যে পরিবেশে সে প্রতিপালিত, যে পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠেছে,—ফিরে যাবে তার প্রিয়তমার কাছে, কাঞ্চনের কাছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের যন্ত্রণার এখন অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক, নইলে মানুষের শরীর তার—পদস্খলনকে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়তো শেষ পর্যন্ত সম্ভব নাও হতে পারে।

বস্তুত এই পদস্খলনের ভয়ই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলো। সে দেশে যাবে। কাঞ্চনের জন্য শাড়ী নেওয়া সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না অন্য কারো জন্য কিছু নিয়ে যাওয়া। শাড়ী কিনলে প্রায় শূন্য হাতেই তাকে একমাস দেশে কাটাতে হবে, তাই কোন কিছু না কিনে কিছু টাকা হাতে রাখাই ভালো। এখন ভাবে রামস্বরূপ প্রতি মাসে আরো কিছু কম টাকা দেশে পাঠালে আজ এই সমস্যার উদ্ভব হত না। পারতো সে সকলের জন্যই কিছু উপহার নিয়ে যেতে। কিন্তু তরুণ মন তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করবার জন্যই তখন এতো আগ্রহান্বিত ছিল যে যতটা পেরেছে সব সে দেশে পাঠিয়েছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবে নি।

অবশ্য চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে, ভবিষ্যতের কথা ভাবে নি বলে সংকোচের কোন কারণ নেই রামস্বরূপের। যে টাকা দিয়ে পরিবারের জন্য সে উপহার কিনতো, সে টাকা তো সে নিজের ভোগে লাগায় নি, পরিবারের কাছেই পাঠিয়েছে, তাদেরই প্রয়োজনে লেগেছে। বুঝতে পারে রামস্বরূপ একথা, তথাপি সংকোচ থেকে সে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলো না। সত্যকে বোঝা সহজ হতে পারে, গ্রহণ করা অত সহজ নয়। সহজ নয় বলেই রামস্বরূপের দেশে ফিরে যাবার আনন্দ অনেকখানি ব্যাহত হল।

কাঞ্চনকে কাছে পাবার আনন্দও এমনিভাবে ব্যাহত হল কাঞ্চন যখন জিজ্ঞেস করলো, আমার জন্য কী এনেছ?

কেন যে কিছু আনতে পারে নি, তার হিসেব দিতে হল কাঞ্চনকে এর উত্তর হিসেবে, কিন্তু কাঞ্চন কি সব কথা শুনল, না বুঝল। রামস্বরূপের মনে হতে লাগলো কাঞ্চন কিছুই শোনে নি; সে যে কাঞ্চনের জন্য কিছু আনে নি, এই সংবাদটাই তার শ্রুতিকে বধির করে দিয়েছে, সকল আগ্রহকে নিবিয়ে দিয়েছে। কারণ শুনে কী হবে।

একটা মানসিক অস্বস্তি নিয়ে রামস্বরূপের দিন কাটতে লাগলো। যে আনন্দের আশা নিয়ে সে গ্রামে ছুটে এসেছিল, সে আনন্দকে সে যেন খুঁজে পাচ্ছে না। উপহার আনে নি বলে কাঞ্চন যে তাকে অবজ্ঞা করেছে তা নয়, দীর্ঘ

বিচ্ছেদের পর রামস্বরূপকে সে সমান আগ্রহে আঁকড়ে ধরেছে। বাবা, মা, ভাই, বোন তার ফিরে আসায় খুশী হয়েছে। প্রতিবেশীরা তাকে যেন একটু সমীহ করছে, একটু শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে।

তথাপি রামস্বরূপ বুঝতে পারে তার এক বছরের কলকাতা প্রবাস পরিবর্তন এনেছে; সে পরিবর্তন কোথায়, সে কি তার নিজের চিত্তে, নাকি আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের আচরণে। ঠিক বুঝতে পারে না রামস্বরূপ, তবে একটা স্থূল সত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না, বাড়ীর খাবার খেতে এখন তার কষ্ট হয়। কোলকাতায় ধনীগৃহের সুখাদ্যে অভ্যস্ত হয়েছে সে এক বছর, এখন নিজের বাড়ীর সাদাসিদে দরিদ্র আহার্য—তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। যেটুকু শরীর তার ভালো হয়েছিল কোলকাতায়, আস্তে আস্তে তা শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত নিজের গৃহকে বড় অপরিচ্ছন্ন মনে হয় রামস্বরূপের, অপরিচ্ছন্ন মনে হয় বাড়ীর লোকজনদের, এমন কি কাঞ্চনকেও। এখানে মলিন বসনে প্রায় সকলেই অভ্যস্ত, এক বছর আগে রামস্বরূপকে তা পীড়া দিত না, আজ দেয়। অথচ পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রথমেই যা প্রয়োজন সেই অর্থ নেই রামস্বরূপের, অতএব অপরিচ্ছন্নতাকে মেনে নিয়েই দিন কাটাতে হবে।

হ্যাঁ, সব কিছু মেনে নিয়েই দিন কাটাতে পারে সে এখানে, কেন না এখানে কাঞ্চন আছে। কোলকাতার বৈচিত্র্য, মাধুর্য, উত্তাপ, আলো, উত্তেজনা, আকর্ষণ, কোন কিছু সে চায় না, সে চায় সমস্তটা জীবন এইখানে কাঞ্চনকে নিয়ে কাটিয়ে দিতে, এই দরিদ্র অপরিচ্ছন্ন মলিন জীবন। কাঞ্চন কাছে থাকলে সব কিছু সহনীয়, কাঞ্চনকে ছেড়ে থাকার মতো কষ্টকর আর কিছুই না, কোলকাতার এক বছরের জীবনে সে তা নিঃসন্দেহে বুঝেছে। যদি পারতো সে এখানে থাকতে, যদি জীবিকা অর্জনের সুযোগ থাকতো এই গ্রামে। কোলকাতায় যেতেও আপত্তি নেই রামস্বরূপের, যদি কাঞ্চনকে সংগে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এমনই অবস্থা, কোনটাই সম্ভব নয়। গ্রামে জীবিকা অর্জনের উপায় নেই, শহরে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার উপায় নেই। কী চমৎকার ব্যবস্থা, একটা অসহ্য ক্রোধ ফেনিয়ে ওঠে রামস্বরূপের মনে, কেন এই ব্যবস্থা, কেন এই মর্মান্তিক যন্ত্রণার পীড়ন। যখন রামস্বরূপ ভাবে হয়তো জীবনটাই এইভাবে কাটাতে হবে তখন অকূল অন্ধকারে ভরে যায় তার মন। ভেতরে ভেতরে একটা বিদ্রোহের আলোড়ন অনুভব করে সে, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। রামস্বরূপ জানে কোলকাতায় তার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, জীবিকার্জনের জন্য জীবন যাদের বণ্ডিত, যোগীন্দর সিং আছে, দারোয়ানজী আছে, আরো বহু লোকের দেখা সে পেয়েছে পথে, বাজারে এবং সেই পল্লীতে। কেন তারা সহ্য

চৈতন্যবাস ফটো : প্রভাতী নিয়োগ

করছে, কেন তারা মেনে নিচ্ছে এই নৃশংস ব্যবস্থা।

পরক্ষণেই বুঝতে পারে রামস্বরূপ, মেনে নিতে পারে নি তারা। অনেকের সংগে আলাপ করেছে সে, কেউ কেউ দোষ দিয়েছে অদৃষ্টের, কেউ কেউ দোষ দিয়েছে সমাজ ব্যবস্থার—কিন্তু নতুন সমাজ নির্মাণের পথ তারা জানে না, জানে না বলেই যোগীন্দর সিং মদ মেয়েমানুষে আসক্ত হয়, দারোয়ানজী তুলসীদাসের রামায়ণ নিয়ে ভুলে থাকে। কী নিয়ে ভুলে থাকবে রামস্বরূপ, যন্ত্রণাকে সহনীয় করবে কোন মন্ত্রে? আত্মনিগ্রহ করছে যোগীন্দর সিং, আত্মনিগ্রহ করছে দারোয়ানজী। রামস্বরূপ আত্মনিগ্রহ করতে চায় না, সে চায় এমন কোন ব্যবস্থা হোক যে ব্যবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করবার সুযোগ পাবে সে—বড়সাহেবের মতো। কী করে সেই ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে, কে সেই সুন্দর সমাজ নির্মাণ করবে, রামস্বরূপ জানে না। রামস্বরূপ জানে না সেরকম কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর কিনা। কিন্তু যদি সম্ভবপর হত!

(পাঁচ)

এক মাস সময় কেটে গেল মুহূর্তের মতো। বিদায়ের দিন এলো, কিন্তু রামস্বরূপ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হল না। বিস্মিত হল রামস্বরূপের বাবা-মা, বিস্মিত হল কাঞ্চন। সুখীও হল, কিন্তু সে সুখ অবিমিশ্র নয়। স্বামী যাবে না, স্বামী কাছে থাকবে, কাঞ্চনের এই সুখের সংগে জড়িয়ে আছে অর্থচিন্তা। স্বামী কোলকাতায় না গেলে সংসার কী করে চলবে! একই চিন্তা রামস্বরূপের বাবা-মার, একই অনুভূতি।

রামস্বরূপ বুঝতে পারে, কোন একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার, নির্দিষ্ট দিনে কোলকাতায় রওনা হবার কৈফিয়ৎ, কিন্তু কী কৈফিয়ৎ সে দেবে বুঝতে পারে না। যে কারণ সত্য, সে-কারণ মূল্যহীন। কী দাম রামস্বরূপের হৃদয়-বেদনার,

শারীরিক কষ্টের! কেউ তার মূল্য দেবে না। সে যদি বলে, কোলকাতার নিঃসংগতায় আমি কষ্ট পাই, আমি এইখানে থাকতে চাই, এইখানে বাবা-মা ভাই-বোন এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসারের পরিপূর্ণতার মধ্যে, কে শুনবে সে কথা, কে প্রশ্রয় দেবে এই মনস্তত্ত্বের, এই চিত্তবৃত্তির। দুর্বলতা বলে তা নিন্দিত হবে, পুরুষমানুষের অনুপযুক্ত আচরণ বলে তা সমর্থন পাবে না।

সমর্থন পেল না। মুখে কেউ কোন কথা বলে না, কিন্তু রামস্বরূপ বুঝতে পারে সে যে কোলকাতায় যাচ্ছে না, এটা পছন্দ করছে না কেউ। বাবা গম্ভীর হয়ে গেছে, মার অদৃষ্ট নিয়ে আক্ষেপ ক্রমশ বাড়ছে। আর কাঞ্চন, শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন আর চুপ করে থাকতে পারলো না, একদিন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোলকাতায় কবে যাবে?

চটে উঠলো রামস্বরূপ, ঐ অপ্রীতিকর প্রশ্নটা সে শুনতে চায় না। চটে উঠে বললো, আমাকে না তাড়াতে পারলে বুঝি তোমার শান্তি নেই।

কাঞ্চন চটলো না, শান্তকণ্ঠে বললো, কী যে বলো, তুমিই আমার শান্তি, তুমিই আমার সুখ, সেকথা কি আজ নতুন করে বলতে হবে। তুমি চলে গেলে আমার মতো কষ্ট কেউ পাবে না, তবু তুমি না গেলেও তো নয়। কোলকাতা থেকে তুমি টাকা পাঠালে সেই টাকায় এখানকার সংসার চলতো। তুমি এখানে বসে থাকলে সংসার কী করে চলবে?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কালই চলে যাব আমি, কেউ আমাকে চায় না। সবাই চায় আমার টাকা। টাকার জন্য আমাকে বিসর্জন দিতেও কারো আপত্তি নেই।

অবুঝের মতো উত্তাপ ছড়াতে লাগলো রামস্বরূপ, কাঞ্চন নিরুত্তরে সে উত্তাপের দাহ সহ্য করতে লাগলো।

সে রাতে কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বললো না রামস্বরূপ, মুখ ফিরিয়ে পড়ে রইলো বিছানায়। রাতের কাজের শেষে কাঞ্চন ঘরে এলো, রামস্বরূপের মুখ নিজের দিকে ফেরাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো। রামস্বরূপকে কথা বলাবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করলো। কিন্তু একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার মতো রামস্বরূপ অটল হয়ে রইলো। ক্লান্ত কাঞ্চন তখন বাধ্য হয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো এবং একসময় ঘুমিয়েও পড়লো।

ঘুমোতে পারলো না রামস্বরূপ, অন্ধকারে আর্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। কাল সে চলে যাবে কোলকাতায়। চলে যাবে, চলে যেতে হবেই। এমন কিছু ঘটতে পারে না, এমন কিছু অলৌকিক আশ্চর্য ঘটনা যা এই পৃথিবীতে পরিবর্তন আনবে, এই সমাজে এই সংসারে—যাতে অনিবার্য নিঃসংগতার মধ্যে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে না রামস্বরূপকে, জীবনের যৌবনের মূল্যবান দিনগুলোকে যাপন করতে হবে না নিঃসীম যন্ত্রণার মধ্যে। হয়তো সে পরিবর্তন আসবে, কিন্তু সেদিন রামস্বরূপ থাকবে না, তার জীবন ব্যর্থ হল। দারিদ্র্যের মধ্যে যার জন্ম, দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ তার পক্ষে কদাচিৎ সম্ভবপর। দারিদ্র্যের মধ্যে, বঞ্চনার মধ্যে এবং যন্ত্রণার মধ্যে রামস্বরূপের জীবন যৌবন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে, রামস্বরূপ তা জানে।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। পাশ ফিরে শুলো রামস্বরূপ। যদি ঘরে আলো জ্বলতো, কিংবা আকাশে চাঁদ থাকতো, হয়তো ঘুমন্ত কাঞ্চনকে রামস্বরূপ এখন প্রাণভরে দেখতো। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না— শুধু স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা যেতে পারে কাঞ্চনকে, কিন্তু কাঞ্চনকে স্পর্শ করবে না রামস্বরূপ, নিদারুণ অভিমান হয়েছে তার। কোলকাতায় যাবার কথা কাঞ্চন কেন বলল, যাবার হয় তো সেই নিজেই যাবে, কাঞ্চনের কাছ থেকে যাবার কথা সে শুনতে চায় না। তার মনে হয় কাঞ্চনের জীবনে তার উপস্থিতি পরম প্রয়োজনীয় নয়। কাঞ্চনকে ছাড়া রামস্বরূপ নিজের জীবনকে ব্যর্থ বলে ভাবে, কিন্তু রামস্বরূপকে ছাড়া কাঞ্চন নিজের জীবনকে ব্যর্থ বলে মনে করে না। মনে করলে যাবার কথা সে উচ্চারণ করতে পারতো না।

(ছয়)

একটা তিক্ত অভিমান নিয়ে রামস্বরূপ কোলকাতায় চলে এলো। এবারও আসবার সময় কাঞ্চন অশ্রুপাত করেছে, কিন্তু রামস্বরূপের মনে হয় নি ঐ চোখের জলের ফোঁটাগুলি আকাশের নক্ষত্রের মতো। কাঞ্চনকে ঘিরে যে মাধুর্যের পরিমন্ডল রামস্বরূপকে এতোদিন মুগ্ধ করে রেখেছিল, তা যেন অকস্মাৎ অপসৃত হয়েছে। সাধারণ স্বার্থপর নারীর পর্যায়ে নেমে এসেছে কাঞ্চন।

একটা অবুঝ উত্তপ্ত যন্ত্রণাদিগ্ধ মন নিয়ে অবিচার করলো রামস্বরূপ—সংসারের প্রাথমিক প্রয়োজন না মিটলে অনেক মাধুর্যই অপসৃত হয়, অনেক সম্পর্ক শিথিল হয়, বিকৃত হয়—অনেক অন্যায় অবিচারের জন্ম হয়। শুধু মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু ঠিকমতো মেটাতে পারলে পৃথিবী কতো সুন্দরতর হত, জীবন মধুরতর। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণার অবসান হত।

কলকাতায় পৌঁছে বড়সাহেবের বাড়ীতেই এসে উঠলো রামস্বরূপ। তার বিলম্বের জন্য যদি অন্য লোক নিযুক্ত হয়েও থাকে, তথাপি যোগীন্দর সিং কিংবা দরোয়ানজীর কাছে অন্য চাকরির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এবং যতোদিন অন্য চাকরি না জোটে ততোদিন ওদের আশ্রয়ে থাকাও যেতে পারে। রামস্বরূপের সৌভাগ্যক্রমে তার জায়গায় অন্য লোক নিযুক্ত হয় নি, দেশে গেলে এক মাসের জায়গায় দু-মাস হয়ে যায় বড়সাহেব তা জানেন। তার অনেক ভৃত্যের মধ্যে একটি ভৃত্যের অনুপস্থিতি কিছু বেশিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে এবং তা তিনি সহ্য করেন। শুধু মৃদু তিরস্কার করলেন রামস্বরূপকে এবং তারপর পুনর্বহাল করলেন। রামস্বরূপকে বিলম্বের জন্য বেকার থাকতে হোল না।

রামস্বরূপের শীর্ণ মূর্তি দেখে যোগীন্দর সিং হা হা করে হেসে উঠলো, খুব চেহারা বাগিয়েছিস দেখছি রামু, দু-মাসে বারোমাসের সুখ তুলেছিস শালা।

যোগীন্দর সিং-এর কথার ইংগিত বুঝতে পেরে রঙীন হয়ে উঠলো রামস্বরূপ, কিন্তু প্রতিবাদ করলো না। খাদ্যের অভাবে শরীর খারাপ হয়েছে একথা স্বীকার করা সম্মানজনক নয়।

যোগীন্দর সিং আবার বললো, আমিও ছুটি নিয়েছি জানিস—দু-একদিনের মধ্যেই দেশে যাচ্ছি। বউটাকে অনেকদিন দেখি না। পয়সা দিয়ে অনেক মেয়েমানুষ পাওয়া যায়, কিন্তু বউ যা দিতে পারে, অন্য কোন মেয়েমানুষ তা দিতে পারে না।

যোগীন্দর সিং-এর এই স্বীকৃতি আগে হলে রামস্বরূপের খুব ভালো লাগতো, কিন্তু এবারে কাঞ্চন সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটেছে তার, মাধুর্যের পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে এসেছে স্বার্থপর নারী। সুতরাং যোগীন্দর সিং-এর কথায় সমর্থন জানাবার মতো উৎসাহবোধ করলো না সে, চুপ করেই রইল।

—কী রে শালা, কথা বলছিস না কেন? না কি কথা বলবার মতো শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই শরীরে?

—কী বলবো? অন্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু একথা ঠিক বউ সব দিতে পারে, যা চাই সব দিতে পারে না।

—হুঁ, সাবালক হয়ে উঠেছিস দেখছি। কিন্তু তুই কি সব দিতে পারিস, বউ যা চায়, সব?

দুদিন পরে যোগীন্দর সিং দেশে চলে গেল। যাবার আগে রামস্বরূপকে উপদেশ দিল, যদি পারিস ওপথে যাসনে।

বিস্মিত হল রামস্বরূপ যোগীন্দর সিং-এর পরিবর্তনে। জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? একেবারে সাধু বন গিয়া!

—কিছু নেই, রামু, কোথায়ও কিছু নেই। সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই। একটা কামুক জন্তুর মতো জীবনটা যাপন করে গেলাম।

(সাত)

যোগীন্দর সিং উপদেশ দিয়ে গেছে, যদি পারিস ওপথে যাসনে। কিন্তু পারছে কই রামস্বরূপ। নিজের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস স্ত্রী-সংগ বর্জিত হয়ে জীবনযাপন করা এই তাজা যৌবনে যে কতোখানি কষ্টকর, বিশেষ করে স্ত্রী সংসর্গে যে অভ্যস্ত তার পক্ষে, রামস্বরূপ তা প্রতিদিন অনুভব করে। প্রতি মুহূর্তে সে আকর্ষণ অনুভব করে নিষিদ্ধ পল্লীর, যে-পথে যেতে বারণ করে গেছে যোগীন্দর সিং। চরিত্রহীন লোকটা বহু মেয়েমানুষ ভোগ করে এখন বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বয়সও হয়েছে লোকটার। এখন তাই উপদেশ-বচন আওড়াতে শুরু করেছে। যৌবনে ভোগী যৌবনান্তে যোগীর মতো কথাবার্তা অনেক সময়েই বলে, কী মূল্য

আছে সে কথার? চরম কপটতা, পরম ভণ্ডামি বলে মনে হয় যোগীন্দর সিং-এর উপদেশ।

যোগীন্দর সিং-এর উপদেশ নয়, রামস্বরূপের নিজের চরিত্রে যে সংচেতনা, যে শুভবুদ্ধি এতোদিন ধরে আশ্রয় পেয়েছে, এখনও পর্যন্ত তাই তাকে রক্ষা করছে। মনে মনে অনেকবারই ভেবেছে রামস্বরূপ, আর পারছি না, আজই যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গিয়ে বসেছে দারোয়ানজীর কাছে, তুলসীদাসের রামায়ণ শুনে সে যদি বিস্মৃত হতে পারে শারীরিক ক্লেশ এই আশায়। গতবার কাগুনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা পবিত্র কর্তব্য বলে সে মনে করতো, এখনও করে। কিন্তু এখন পাশাপাশি আর একটি চিন্তা একটু একটু করে অধিকার বিস্তার করছে তার মনে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যই কি সব, নিজের প্রতি কি কোন কর্তব্য নেই? এই যে দিনের পর দিন শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সে, এর থেকে অব্যাহতি পাওয়া কি দোষের! কামনা বাসনা তো শরীরের ধর্ম তাকে সংযত রাখা মনুষ্যত্বের লক্ষণ, কিন্তু তাকে হত্যা করা কোন মনুষ্যত্ব! অথচ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপনে সমাজ তাকে বাধ্য করছে এবং আশা করছে কামনাকে হত্যা করে স্ত্রীর প্রতি সে বিশ্বস্ত থাকবে। অসংযত সে নয়। চরিত্রহীন সে নয়,—অথচ ধীরে ধীরে সে পরাজিত হচ্ছে, সে জানে সে অনুভব করছে, সে পরাজিত হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক পরাজয় শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হোল রামস্বরূপকে। শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রে সেই নিষিদ্ধ পল্লীর একটি ঘরে সে প্রবেশ করল।

কিন্তু যখন সেই ঘরে প্রবেশ করে, হতভাগ্য রামস্বরূপ জানতো না, ঐ ঘরে কী কঠিন সত্য তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কী বিস্ময়, কী বেদনা। কেন না যে মেয়েটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তার মুখ সে ভালো করে দেখতে পায় নি।

রামস্বরূপ ঘরে ঢুকলে মেয়েটি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর রামস্বরূপের দিকে, আলোর দিকে মুখ করে সে দাঁড়ালো। মেয়েটির মুখের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো রামস্বরূপ, এ মুখ যে তার চেনা। মেয়েটিও মৃদু আর্তনাদ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বোধহয় সেও চিনতে পেরেছে রামস্বরূপকে।

একটু পরেই মনে পড়লো রামস্বরূপের, মেয়েটির নাম পুষ্প—তাদেরই গ্রামের মেয়ে। ফুটফুটে শান্ত মেয়েটি রামস্বরূপের ছেলেবেলার খেলার সাথীদের অন্যতম ছিল। রামস্বরূপদের চেয়েও দারিদ্র ছিল ওরা। কিন্তু সেই কঠিন দারিদ্র সত্ত্বেও আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠলো পুষ্প, বড় ভালো লাগতো রামস্বরূপের পুষ্পকে দেখতে। সেই পুষ্প একদিন হারিয়ে গেল। পুষ্পর বাবা বলতো, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি মেয়ের। কিন্তু গ্রামের লোকেরা গোপনে বলাবলি করতো, পুষ্পকে তার বাবা বিক্রয় করে দিয়েছে।

পুষ্পর দিকে আর একবার তাকালো রামস্বরূপ, দরজার কাছে সে তড়িতাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চলবার, কথা বলবার শক্তি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। রামস্বরূপের মনে হল, কী সুন্দর পুষ্প, কিন্তু কী করুণ।

পুষ্পকে দেখতে দেখতে একটা অবর্ণনীয় বেদনায় তার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে গেল, একটা তীব্র কষ্ট তার সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত হোল, সে আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

অস্ফুটকণ্ঠে বললো, আমি যাই।

পুষ্প কিছু বললো না, তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

দরজা খুলে রামস্বরূপ বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে সেই অন্ধকার পৃথিবী। বিচিত্র মানুষ আসংগলিপ্সায় অগ্রসর। নর ও নারী। যে-নারীরা সুযোগ পেলে হয়তো সুন্দর সংসার রচনা করতে পারতো, সং-এর মতো তারা দাঁড়িয়ে আছে দরজায় দরজায়। আর যে পুরুষ শক্তিমান, যার প্রথম কর্তব্য শক্তি দিয়ে মেয়েদের মর্যাদা রক্ষা করা, মেয়েদের পংকে ডুবিয়ে দিয়ে পংকিল আনন্দে তারা প্রমত্ত।

পুষ্পকে দেখে রামস্বরূপ আজ একটা নতুন সত্য উপলব্ধি করেছে—এই যে মেয়েরা দেহ বিক্রয় করে অন্ন সংগ্রহ করছে, এরা কারা? আমাদেরই ঘরের মেয়ে, আমাদেরই গ্রামের মেয়ে। কেউ অপহৃতা হয়ে, কেউ প্রতারিত হয়ে, কেউ নিছক পেটের অন্নের জন্য দেহ-বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে এই পল্লীতে বাসা বাঁধে না।

রামস্বরূপ ভাবে, বেঁচে গেছি আমি, মেয়েদের বিরুদ্ধে এই নৃশংস অপরাধের অংশীদার হতে চলেছিলাম, খুব বেঁচে গেছি। রামস্বরূপের তীব্র বাসনা হতে লাগলো, সে কিছু একটা করে এই সমাজকে বদলে দেবার জন্য যে সমাজে অস্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে পুরুষ যায় গণিকালয়ে—মেয়েরা পরিণত হয় গণিকায়। রামস্বরূপ জানে, কোন কোন পুরুষ স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েও চরিত্রহীন হয়, কোন কোন মেয়ে সুখের মধ্যে লালিতা হয়েও চরিত্রহীনা, কিন্তু সে নিজে চরিত্রহীন নয়, তার গ্রামের মেয়ে পুষ্প চরিত্রহীনা নয়, তথাপি কেন তাকে যেতে হয়েছিল গণিকালয়ে, কেন পুষ্প পরিণত হয়েছে গণিকায়? যে অসুস্থ, বিকৃত, যুক্তিহীন, অন্ধ সমাজ ব্যবস্থায় এই পরিণতি সম্ভব, রামস্বরূপ মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করতে লাগলো।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে রামস্বরূপ। সচেতন হয়ে বুঝতে পারে রাত্রি গভীর হয়েছে। তখন ধীরে ধীরে নিজের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হল। পুষ্পকে উদ্ধার করার কথা ভাবছিল সে। দারোয়ানজীর সংগে পরামর্শ করতে হবে এ বিষয়ে। দারোয়ানজী হয়তো এখনো জেগে আছে, হয়তো শান্ত মনে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে।

কিন্তু বাড়ীর গেটের কাছে পৌঁছে দেখলো, দারোয়ানজী গেটের কাছেই বসে আছে, রামস্বরূপকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো। বললো, বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তুমি তো কখনো এত রাত করে বাড়ী ফের না রামস্বরূপ।

রামস্বরূপ ভাবলো, এখনই দারোয়ানজীকে খুলে বলে সব কথা, পরামর্শ করে ঠিক করে পুষ্পর মুক্তির উপায়, কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো, আজ থাক, আজ বড় ক্লান্ত, কাল সব বলবে সে। তাই দারোয়ানজীকে বললো, দারোয়ানজী আজ রাত অনেক হয়েছে, সব কথা কাল বলব। অনেক কথা বলার আছে।

রামস্বরূপ তার কথা তখন বললো না, কিন্তু দারোয়ানজীর একটি কথা বলার ছিল এবং সে কথা সে তখুনি না বলে পারলো না, বলল, রামস্বরূপ, একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকায় রামস্বরূপ, আবার কি দুঃসংবাদ?

দারোয়ানজী বললো, আজ খবর পেলাম, যোগীন্দর সিং-এর ফাঁসি হবে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না রামস্বরূপ, তারপর একসময় অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ফাঁসি হবে যোগীন্দর সিং-এর, কেন?

—জেলে ফিরে গিয়ে যোগীন্দর সিং দেখে তার বউ আর একটা পুরুষমানুষের সংগে গোপনে প্রণয় করে। রাগী মানুষ—দুজনকেই খুন করে বসে সে। খবরটা শুনে বড় একটা কষ্ট পাচ্ছি রামস্বরূপ। ঘুমুতে পারছি না, রামায়ণ পর্যন্ত ভালো লাগছে না। তাই বাইরে বসেছিলাম।

রামস্বরূপ কেমন নির্বোধ চোখ মেলে তাকায় দারোয়ানজীর দিকে।

অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় সংবাদটা। কেন খুন করতে গেল যোগীন্দর সিং। কী তার যুক্তি। সে যে নিজে সারাজীবন বহু মেয়েমানুষ ভোগ করে বেড়াল, সে অপরাধের তাহলে শাস্তি কি? রামস্বরূপ ভাবে, অপরাধ কারো নয়, যোগীন্দর সিং-এর অপরাধ নেই, যোগীন্দর সিং-এর স্ত্রীর অপরাধ নেই—অস্বাভাবিক জীবনের যন্ত্রণা যে কেমন অনিবার্যভাবে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে, নিজের জীবনেই তো সে তা মর্মান্তিক ভাবে উপলব্ধি করেছে।

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে রামস্বরূপ, অত্যন্ত অসুস্থ। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রামস্বরূপের। সে এগোতে লাগলো অনেকটা মাতালের মতো, এগোতে এগোতে বলতে লাগলো, কাল কথা বলবো দারোয়ানজী, কাল কথা বলবো।

চারপাইটা নগ্ন আকাশের নীচে পাতাই ছিল, রামস্বরূপ গিয়ে তার উপর কোনমতে শুয়ে পড়লো। আকাশে অজস্র নক্ষত্র, কাগুনের চোখের জল কি? তারও তো কষ্ট হচ্ছে, মাসের পর মাস স্বামীকে কাছে না পেয়ে তারও তো কষ্ট হচ্ছে—যেমন কষ্ট হচ্ছে রামস্বরূপের।

হঠাৎ রামস্বরূপের দৃষ্টি পড়লো বড়সাহেবের শয়নকক্ষের দিকে, জানালা তখনো আলোকিত, কেন না শয়নকক্ষে তখনো আলো জ্বলছে।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

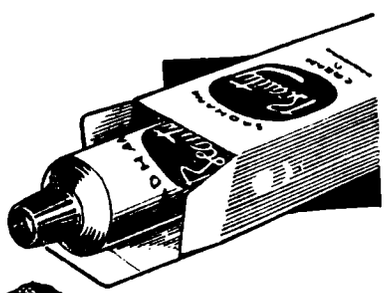

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

সেকালের নায়িকা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রনাথ সরকার

এ-যুগের চলচ্চিত্র প্রেমিকদের কাছে বীরেন্দ্রনাথ সরকার হয়ত সুপরিচিত নন; কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের বীরেন্দ্রনাথকে কিছুকাল আগেও অনেকেই চিনত। বাঙলা-দেশে চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের ধারার সঙ্গে এই মানুষটির নাম নানাভাবে জড়িয়ে আছে। এদের জানা বহু জিনিস, যা অলিখিত সবই একে একে হারিয়ে যাচ্ছে। বাঙলা চলচ্চিত্রে স্রষ্টাস্থানীয় এই মানুষটির কাছে জানতে গিয়েছিলাম, সেকালের বিষয়ে। তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। সে-সব কথা বলতে গিয়ে উৎসাহে কখনও তিনি প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিলেন। মনে হয়েছিল সেই যুগেই তিনি ফিরে গেছেন। কিন্তু আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভেবে। যা শুনেছিলাম শ্রীসরকারের কাছে, তাঁরই ভাষাই উপহার দিচ্ছি আপনাদের।

নিউ থিয়েটার্সের ডিরেক্টর, শিল্পী, টেকনিশিয়ান সবাই মিলে আমরা এক পরিবারের মত ছিলাম। নায়িকা বা অন্যান্য শিল্পী নির্বাচন ইত্যাদির ভার পরিচালকদের ওপরই থাকত। তাঁদের কর্মকুশলতায় ছিল আমার গভীর আস্থা। কাজেই ও নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাতাম না। কোনকিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার মতামত চাওয়া হোত। তখন একটু চিন্তা করতাম।

'দেনা-পাওনা' নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি। উল্লেখযোগ্য হিরোইন তেমন কেউ ছিলেন না এ ছবিতে। 'পল্লীসমাজ'-কে ফেয়ারলি সাকসেস বলা চলে। 'পল্লী-সমাজ'-এর পরিচালনার ভার ছিল শিশির ভাদুড়ীর ওপর। এতে শিশিরবাবু ও'র টিম নিয়ে কাজ করেছিলেন। কাজেই আমাদের তরফ থেকে হিরোইন সিলেকশন ইত্যাদির প্রশ্ন ওঠেনি। কঙ্কাবতী নায়িকার রোলে ছিলেন। তখনকার মান অনুযায়ী উনি বেশ ভালই অভিনয় করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য মোড় ঘুরল 'চণ্ডীদাস'-এ। এ-ছবির নায়িকা ছিলেন উমাশশী। এর আগে 'দেনাপাওনা'য় গাজনের একটি ছোট্ট সিনে, এবং আরো কয়েকটি ছবিতে ইনি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এখানে একাধারে নায়িকা অথবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রামীর চরিত্র-চিত্রণের দায়িত্ব উনি শুধু সুষ্ঠুভাবে পালনই করেননি, চণ্ডীদাসে ও'র মধ্যের শিল্পীসত্তার জাগরণ এবং আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং চণ্ডীদাসেই উনি একটি বিশিষ্ট শিল্পীব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলা যায়। অবশ্য দেবকীবাবুর পরিচালনা এই অভূতপূর্ব সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

নায়িকা হিসাবে ও'র বৈশিষ্ট্য ছিল সংযত অভিনয়। ধীর, স্থির। বিষণ্ণ, চিন্তাশীল এবং উদাসিনী রমণীর ভাবরূপই বোধহয় ও'র প্রতিভা ও চেহারার অনুকূল ছিল বলেই এই ধরনের চরিত্রে ও'র অভিনয় খুলত ভাল। চণ্ডীদাসে দুঃখভাবাবনতা রামীর ভূমিকায় উমাশশী চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তুলেছিলেন যে, ট্র্যাজিক চরিত্রের জন্য নায়িকার প্রয়োজন হলে সবার উমাশশীর কথাই আগে মনে হোত।

চন্দ্রাবতী দেবী

অবশ্য তিনি এরকম আর কোন চরিত্রে অভিনয় করেন নি।

বছর দিন বাদে নিউ থিয়েটার্সে এলেন কানন দেবী। নিউ থিয়েটার্সে আসবার আগেই পপুলারিটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কানন দেবীকে আনবার চেষ্টা চলছিল অনেক দিন ধরেই। তখন 'দেবদাস' ছবি করার কথা হচ্ছে। পার্বতীর ভূমিকায় ও'কে খুব মানাবে—সবাই একবাক্যে সে-কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয়নি। কারণ রাধা ফিল্মের সঙ্গে কানন দেবী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে কানন দেবীর কণ্ট্রাক্ট হয় ১৯৩৬ সালে। দেবকীবাবুর 'বিদ্যাপতি'তে অনুরাধার ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেল। এর আগে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালিত 'মুক্তি'তে প্রমথেশের বিপরীতে কাননকে দেখা যায়। 'বিদ্যাপতি'র কাজ আগে আরম্ভ এবং সমাপ্ত হলেও প্রথম রিলিজ হয়েছিল 'মুক্তি' ১৯৩৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর চিত্রায়। আর 'বিদ্যাপতি' ১৯৩৮ সালের ২২ এপ্রিল। হিন্দী ভাষান্তর অবশ্য বোম্বে ও করাচীতে আগেই রিলিজড্ হয়েছিল। এই দুটি ছবিতে কানন দেবীর জনপ্রিয়তা অসম্ভব বেড়ে যায়।

সংগীতে কানন দেবীর স্বাভাবিক প্রতিভা। এখানে ক্ষেত্র ও সুযোগ্য পরিচালনায় ও'র কণ্ঠ ও প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা সার্থকও হয়েছে।

'বিদ্যাপতি' ও 'মুক্তি'—দুটি ভিন্নধর্মী ছবি। একটি ভক্তিমূলক, অপরটি সামাজিক। কিন্তু বিপরীতমুখী গানগুলি সকলের সমান আদর পেয়েছে। এবং অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রত্যেকটি গানই লোকের মুখে মুখে ফিরত।

ও'র অভিনয়ও খুব সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। এরপর 'সাথী', 'সাপুড়ে' 'হারজিত', 'পরিচয়' ইত্যাদি বহু ছবিতে বিভিন্ন রকমের চরিত্রে সমান দক্ষতায় অভিনয় করেছেন। 'পরিচয়'—হিন্দী 'লগন'-এ কানন দেবী বি এফ জে-এর বিচারে ১৯৪১-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-রূপে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ও'র বৈশিষ্ট্য ছিল রোমান্টিক চরিত্রের অভিনয়ে। চঞ্চল ও শান্ত, গম্ভীর ও লাস্যময়ী উভয় দিকেই

কানন দেবী সমান কৃতিত্বে পরিস্ফুট। ও'র অ্যাক্টিং-এ যেমন ভাইটালিটি ছিল চেহারাও অসম্ভব ফোটোজেনিক। যে-কোন অ্যাঙ্গেল থেকেই ও'র ছবি খুব ভাল আসত। মলিনা দেবী 'বড়দিদি'-তে খুব নাম করেছিলেন। ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট। অনেক আগে মীরাবাঈ এবং আরো অনেক ছবিতে ছোট ছোট রোলে অভিনয় করেছিলেন। তবে 'বড়দিদি'-তে পরিণত অভিনয়ে সত্যিকারের শিল্পীসম্মান পেয়েছেন।

চন্দ্রাবতী ডিগ্‌নিফায়েড আর্টিস্ট। মীরাবাঈ-তে ভক্তিবিহ্বলা 'মীরা' চরিত্রের আবেগ ও সংযমকে একটা মর্যাদা গাম্ভীর্যে উত্তীর্ণ করেই শিল্পী-খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'দিদি', 'বিজয়া', 'দেবদাস'-এ প্রেসিডেন্ট, বিজয়া ও চন্দ্রমুখীর চরিত্রে আপাত শান্তভাবের অন্তরালের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনা-সংঘাতের এমন স্বাভাবিক অভিব্যক্তি একেবারে জাতশিল্পী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

যমুনা দেবী নায়িকা হিসাবে খুবই সাকসেসফুল। তবে এ'কে বড়ুয়ারই সৃষ্টিক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন বলা যায়। প্রতিভা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটে প্রমথেশ বড়ুয়ার সহায়তায়। তাঁরই শিক্ষায় অবাঙালী হয়েও বাঙালী মেয়ের রোলে, যমুনাকে এতটুকুও বেমানান লাগেনি কোন দিন।

সাধনা বোসকে এনেছিলেন মধু বসু। সাধনা 'মীনাক্ষী' বইতে জ্যোতিপ্রকাশের বিপরীতে নায়িকার রোলে ছিলেন। এ'কে বলা উচিত বর্ন্ আর্টিস্ট। তাছাড়া মধুবাবুর পরিচালনায় ও'র অভিনয়ও অল্পদিনে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

ছায়া দেবী কোন বিশেষ টাইপ চরিত্রে স্পেশালাইজড না হলেও সব রকম চরিত্রের অভিনয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন।

ভারতী অপরিণত উচ্ছল কিশোরী চরিত্রের প্রাণবন্ত অভিনয়ে সবাইকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

লীলা দেশাই ঠিক ক্লাস-অ্যাক্ট্রেস্ বলতে যা বোঝায় তা হয়ত ছিলেন না। কিন্তু তার উপস্থিতির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা ছিল চরম আকর্ষণীয়। তাছাড়া ক্যামেরা, ডিরেকশন এসব ত ছিলই। লীলা অভিনয় করেছিল 'দিদি', 'জীবন-মরণ'—এই রকম অল্প কয়েকটি চরিত্রে। কিন্তু সারল্য, চাঞ্চল্য সব মিলিয়ে—একটা চার্ম ছিল যার জন্য দর্শকদের মনে একটা স্থান করে নিতে পেরেছেন।

শ্রীসরকারের কাছে জানতে চাইলাম আপনার আলোচনায় এবং সে যুগের আরো অনেকের মতামতে এইটুকুই বুঝছি তখন সব নায়িকাই সুদর্শনা, এবং সুঅভিনেত্রী ছিলেন। এবং অভিনীত চরিত্রকে সবাই-ই যথাযোগ্য পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তবে সেই যুগকে কানন দেবীর যুগ বলে চিহ্নিত করা হয় কেন এবং অনেক দিকপাল সমালোচক কানন দেবীকেই বা ফার্স্ট লেডী অফ বেঙ্গলী স্ক্রীন বলেন কেন?

'সমালোচকরা কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলেন সে সব টেকনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, আমি দিতে পারব না। তবে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে যেটুকু বুঝি চেহারা, কণ্ঠ এবং অভিনয় সব কিছুর আকর্ষণীয় সমন্বয় ও'র মধ্যে ছিল। সেটা একটা কারণ হতে পারে।

তখনকার দিনে প্লে-ব্যাক সিস্টেম ছিল না। যাঁরা অভিনয় করতেন গানের প্রয়োজনও তাঁদের দিয়েই মেটাতে হোত। ঠিক গাইয়ে বলতে যা বোঝায় তা হয়ত তারা ছিলেন না। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে সঙ্গীত পরিচালক এ'দের দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতেন। কিন্তু ট্রেইনড, মেলোডিয়াস ভয়েস এবং কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী হিসাবে একটা ব্যক্তিত্ব কানন দেবীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। নিউ থিয়েটার্সে সিঙ্গিং-স্টার বলতে উনিই প্রথম।

সেন্সিটিভ, রোমান্টিক অভিনয়ের উপযোগী একটা ইনবেট চার্ম ও'র ছিল। চেহারার মধ্যেও ছিল একটা মোহময় মাদকতা এবং রমণীসুলভ কান্তি। এর আবেদন কম ছিল না দর্শকদের কাছে। এসব মিলিয়েই কানন হয়ত সেকালের অতুলনীয়া ছিলেন বলেই হয়ত সে যুগকে ও'র যুগ বলা হয়।'

"এত গেল ও'দের শিল্পী জীবনের দিক। ব্যক্তিগতভাবে ও'দের সম্পর্কে আপনার মনে কোনো ছাপ নেই? প্রশ্ন করি।

"ও'রা সবাই আমায় খুব সমীহ করতেন, আমার কাজ যাতে সুন্দর হয় সেজন্য সবার নিষ্ঠাও ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। কিন্তু আমায় ঠিক আপনজন ভেবে কেউ হয়ত কনফিডেন্স নিতে পারতেন না। তাই ও'দের মনের কোনো বৈশিষ্ট্যের খবর আমার কাছে অজানাই থেকে গেছে বরাবর। শুধু ও'দের কাজ-কর্মের সুবিধা-অসুবিধার সংবাদটুকুই ছিল আমার জানার এলাকার মধ্যে। তাও অন্যের মাধ্যমে।" —মৃদু হেসে বললেন স্বল্পভাষী, শান্ত মানুষটি।

সন্ধ্যা সেন

শুভ-উদ্বোধন শুক্রবার, ২০শে সেপ্টেম্বর !

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—

শংকর রচিত

চৌরঙ্গী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

উপন্যাসের জনপ্রিয়

প্রযোজনা
সঙ্গীত
তাসীমা ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা
পিনাকী মুখোপাধ্যায়

উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা

এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে।

সবারে আমি নমি

—কানন দেবী

তখন খুবই ছোট। কিন্তু কোন বই হাতে এলেই বুঝি না বুঝি তাই নিয়েই পড়ে থাকতাম। পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত হলে ত কথাই নেই। এমনি-ভাবেই একদিন ভাগবতের গল্পসঞ্চয়নের একটি বই হাতে এল। তারই একটি গল্পে ছিল এক পণ্ডিত রাজাকে রোজ ভাগবত পড়ে শোনান। শোনানর শেষে রোজই প্রশ্ন করেন, "রাজা বুঝলে কিছু?" রাজা হেসে বলতেন, "তুমি আগে বোঝো।" ...এমনি করে কাটল কিছুদিন। হঠাৎ একদিন পণ্ডিতের রক্তে বইল বৈরাগ্যের জোয়ার। পুঁথি রইল পড়ে। সংসার হোল বিষ। একনিমেষে সব ছেড়ে চলে যান বহুদূরে, চেনামহলের সীমানা ছাড়িয়ে। যাবার আগে রাজাকে একটি চিঠি লিখে রেখে যান। তাতে লেখা ছিল শুধু একটি কথা "রাজা বুঝেছি।"

গল্পটি তখন বুঝতে না পারলেও মনে গভীর দাগ কেটেছিল। যেমন কোন রাগের নাম না জানলেও শ্রুতিমধুর সুর সারাক্ষণ প্রাণে গুন গুন করে। আজ জীবনের পরিণত-লগ্নে সেই কথাটি যেন তার সকল ব্যাকুল মাধুর্যে একখানি ছবি হয়ে ওঠে।

সবার অনুরোধে আজ আমার জীবন-দর্শনের ছবি আঁকতে বসে পণ্ডিতের ঐ বক্তব্যকেই একটু পরিবর্তন করে বলতে ইচ্ছে করে, একটি কথা ঠিক না বুঝলেও বোঝার কিনারায় এসেছি যে জীবনে সম্মান, মর্যাদা কেউ হাতে তুলে দেয় না। অতি সহজ বস্তুও পাবার পথে বহু বিঘ্ন। অনেক পোড় খেয়ে, অনেক বেদনা বয়ে, অনেক রক্ত-ঝরা অন্তর্দ্বন্দ্বের বন্ধুর পথে চলে বুঝেছি পৃথিবীটা সরল নয়। কঠিন পর্বতের মত এবড়োখেবড়ো। গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে তাকে সমতল করে নিজের চলার পথ নিজে তৈরী করে নিতে হয়। এই পথের বিবরণ জানাবার তাগিদ এসেছে। জীবনে কোন কাজ এত কঠিন মনে হয়নি, যেমন মনে হচ্ছে আজকের এই আত্মবিশ্লেষণ আর পিছন ফিরে তাকিয়ে স্মৃতিচারণ। যা একান্তই অনুভবের বস্তু, প্রকাশ করতে গেলে তার অনেকখানি রসই অপচয় হয়ে যায়।

জীবনী লেখার পক্ষপাতী আমি নই। ওতে আমার মন কোনদিনই সায় দেয় না। জীবনী লেখা তাঁদের সাজে যাঁদের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব আলোক-

উমাশশী

কৃতজ্ঞতা নিবেদন

স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনেকদূর অবধি আলোর রেশ ছড়িয়ে। সামান্য সাধারণ মানুষ, হিসাবে আমি শুধু বলতে পারি আমার পথচলার কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী। কবির ভাষায় "জীবনে যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নেই"—সেই তুলনা-বিহীনকে অনুভব করার বিস্ময় রোমাঞ্চ। জীবনী লেখার মত স্পর্ধা আমার নেই। অতএব আমার এই প্রচেষ্টাকে কেউ যেন 'জীবনী' ভেবে ভুল না করেন এই আমার বিনীত অনুরোধ।

জীবনের অনেক উপলব্ধির মত আমার আর একটা উপলব্ধ সত্য হোল এই যে ঘটনাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। অনেক সময় ঘটনার জঞ্জালস্তূপ সত্যের রূপকে আবৃত করে। তাই জীবনের ঘটনা বর্ণনায় আমি বিশ্বাসী নই। ঘটনাকে মনেও রাখিনি। ঘটনার অতীত যে অপরূপের কাছে কৃতজ্ঞ-নম্রচিত্তে বলতে পারি "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর", যাঁর অযাচিত করুণায় জীবনের সকল বাধা দৈন্য আলোর বন্যায় ভেসে গেছে, অকল্পিত, অভাবিত অসম্ভবকে না চাইতেই যিনি হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছিল তাঁকে দেখিনি। কিন্তু তাঁর কল্যাণ-স্পর্শ অনুভব করেছি—বারবার আর বারবার বিস্মিত হয়েছি—"এ কেমন করে সম্ভব হোল আমি ত এর যোগ্য নই"—এই বিস্ময়ের, এই আনন্দের কণামাত্রও যদি কারো হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারি তাহলেই আমি ধন্য।

জীবনবিধাতার সেই বরদানের ফলেই হয়ত পেয়েছি সবার ভালবাসা ও উৎসাহ, যা বারবার আমায় এগিয়ে চলবার প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ঋণ ত শোধ হবার নয়। কিন্তু জীবনের অনেক বড় দায়ের মত কৃতজ্ঞতারও একটা মূল্য আছে। তাই জীবনের পাতাগুলো উল্টে দেখবার সময় সবাইকে আমার প্রণাম জানানোর কর্তব্য পালন করার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

কতদিনের কথা। তবু মনে হয় যেন সেদিনের। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যে বয়সে মেয়েরা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হেসে-খেলে বেড়ায়, সেই বয়স থেকেই আমি একলা থাকতে ভালবাসতাম। আপন মনে পুতুল খেলতাম। কতরকম করে পুতুলের ঘর সাজাতাম, বেশ বানাতাম, আবার ভাঙতাম, আবার গড়তাম। এই ঘরসংসার গড়ার নেশাই ছিল আমার সকল সত্ত্বা জুড়ে। এ নেশা আজও কাটেনি। চারপাশে আমার বয়সী মেয়েদের খেলাধুলো কোনটাই আমার মনের মত ছিল না। সবাইকে সভয়ে এড়িয়ে চলতাম। কারণ চেষ্টা করেও খাপ খাইয়ে চলতে পারব না, অজ্ঞাতেই যেন এটা বুঝে ফেলেছিলাম। শিশুমন অনেক দিক থেকে ঠিক বিজ্ঞব্যক্তির চেয়েও প্র্যাকটিক্যাল। অনেক জিনিস দেখেছি, বিজ্ঞদেরও বুঝতে দেরী হয় কিন্তু শিশুরা যেন সহজাত অনুভূতির মত এক নিমেষেই বুঝে ফেলে কোনটা তাদের এলাকার মধ্যে কোনটা নয়। কিংবা অল্পবয়সে ঘা খাওয়ার দরুন আমার অনুভূতি গড়পড়তা অন্য পাঁচটা মেয়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ ছিল এমনও হতে পারে! যাঁরা স্নেহ করতেন তাঁরা বলতেন

বিদ্যাপতি/পাহাড়ী সান্যাল ও কানন দেবী

"লাজুক", অন্যেরা কেউ ভাবতেন "গর্বিনী", কেউ ভাবতো "কুনো"—তবু স্বভাব বদলাতে পারিনি।

যাই হোক, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বাবাকে হারালাম। চারিদিক যেন অন্ধকারে নেমে এল। মনের দিক থেকে বেদনার ভার ত ছিলই। তার ওপর ছিল দুশ্চিন্তার বোঝা। সংসারে আমি, দিদি ও মা ছাড়া কেউ নেই। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই, শোক সামলে ওঠবার অবকাশ শেষ না হতেই একটা প্রচণ্ড দায়িত্বের তাড়না যেন চাবুক মেরে অস্থির করে তুলেছিল। কি করে চলবে? দাঁড়াবার মাটি যেন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। তবু তাকে ধরেই দাঁড়াবার করুণ প্রচেষ্টা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই আবার কোথাও না কোথাও এক টুকরো আলোর দিশা দেখিয়ে মানুষের বাঁচবার প্রেরণা যোগান।

একদিন একলা বসে আছি। আপন মনে ভাবছি আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হঠাৎ মনে হোলো আমার ত কাঁদলে চলবে না। যেমন করে হোক দাঁড়াতেই হবে। অন্তত মায়ের মুখ চেয়েও একটা চেষ্টা করা দরকার। না হলে হয়ত মাকেও হারাতে হবে। চারপাশের পরিবেশে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত। সব সময় মনে হোত আমি এখানের নয়। এই আবহাওয়া পরিবেশ সবের ওপরে আমায় উঠতে হবে। এই সময় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাকে বৌদি বলে ডাকতাম। খুব সংবেদনশীল অন্তর। আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে কতভাবে যে সাহায্য করতেন আজও ভুলিনি। তখন কারো মুখের এতটুকু মিষ্টি কথারই অনেকখানি দাম। বৌদি ছিলেন যেন মরু-ভূমিতে ওয়েসিসের স্বপ্ন।

এমনি সময়েই একদিন আমাদের পরিচিত একজন ছবিতে কাজ করবার প্রস্তাব নিয়ে এলেন। আমায় বললেন, "তোমার চেহারা ভাল, একবার যদি চান্স পাও ব্যস্ আর দেখতে হবে না। মা ও দিদির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। এতটুকু মেয়েকে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে বাইরে কাজ করতে পাঠাব? না, এ হতে পারে না। কিন্তু আমার যতখানি বয়স ছিল, তার চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল অনুভূতি। আবার তার চেয়েও বড় ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, —স্বপ্ন। আমি জেদ ধরলাম এইভাবে কোনরকমে দিনযাপনের গ্লানি বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু ভাল। বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে জন্মানোর অর্থ কি? সুন্দর জীবন এই পৃথিবীরই কোথাও না কোথাও আছেই এবং যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে—যে কোন মূল্যে। তখন হয়ত এমন করে গুছিয়ে ভাবিনি। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাকে যদি গুছিয়ে বলি তাহলে এই রকমটিই দাঁড়ায়।

যাইহোক, একদিন স্টুডিওতে গেলাম। কিন্তু খুব আশাপ্রদ লাগল না। একপাশে বসে আছি ত বসেই আছি। কেউ কথাই বলে না। কাউকে চিনি না। কিন্তু মনে হচ্ছে সবাই হোমরা-চোমরা। আমার দিকে তাকানোটাও যেন তাঁদের পক্ষে সময়ের অপচয়। কেউ বা হয়ত তিরছি চোখে তাকিয়ে অনুগ্রহ করে জিজ্ঞেস করেন "কি নাম তোমার খুকী?"

মনে হোল স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হতাশা ও বিরক্তির শেষ সীমায় প্রায় পৌঁছেছি এমন সময় হাসিমুখে এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সবার মধ্যে একটা যেন সন্ত্রস্ত ভাব দেখা গেল। উনি সোজা এগিয়ে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, "এ কি এমন কাঁদকাঁদ মুখে বসে কেন? ভয় করছে? না খিদে পেয়েছে?"

এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে ছিলাম, ওঁর স্নেহস্পর্শে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। —"দূর বোকা মেয়ে, কান্না কিসের? দেখবে তোমার কত সুন্দর ছবি উঠবে, সবাই দেখবে, কত নাম হবে? এই স্টুডিওটাই সেদিন কত আপনার বলে মনে হবে।"

তারপর যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁকে বললেন—"এতটুকু মেয়েকে এইভাবে বড়দের দলে বসিয়ে রেখেছ কেন? দেখত ভয়ে কেমন জড়সড় হয়ে আছে? যাও একটু বাগান টাগানে ঘুরিয়ে আন।" আমার দিকে চেয়ে বললেন—"গাছে উঠতে পারত? দেখগে গাছ ভর্তি কত পেয়ারা, এক লাফে উঠে পাড়বে আর খাবে।"

দমকা হাওয়ার মত ওঁর স্নেহ মাখানো কথায় মনের মেঘ কোথায় উড়ে গেল।

শুধু প্রথম দিনটিতেই নয়, কর্ম-জীবনের প্রথম যুগে ওঁর স্নেহ, আনুকূল্য ও সহায়তা আমায় যেন আশ্রয় দিয়েছিল। আজ বলতে দ্বিধা নেই, উনি না থাকলে ছবির কাজে নামবার সুযোগই হয়ত পেতাম না। ইনিই তখনকার সুবিখ্যাত পরিচালক স্বর্গত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "জয়দেব" চিত্রে রাধার ভূমিকায় আমার শিল্পীজীবন শুরু হল। এখন যত সহজে এ জীবনকে 'শিল্পীজীবন' আখ্যা দিচ্ছি তখন কি তা অজ্ঞতাসারেও ভেবেছিলাম? বোধহয় না। ৯।১০ বছরের এক অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে শিল্পী শিল্প ইত্যাদি বড় বড় কথা ভাবা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বরং এইটুকুই বলা যায় যে জীবনধারণের প্রয়োজনে অভি-ভাবকহীন, অসহায় এক বালিকা ঐ একটি পথের সন্ধানই পেয়েছিল এবং স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার চরম মুহূর্তে মরীয়া হয়ে খড়কুটোকে অবলম্বন করে বাঁচবার প্রচেষ্টার মত তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেয়েছিল। পরে যদি এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে শিল্পীসত্ত্বা কিছু গড়ে উঠে থাকে তার মূলে আছে বহু সহৃদয় ব্যক্তির সম্মিলিত অবদান। আমার কৃতিত্ব অতি সামান্য।

যাক যা বলছিলাম। আমার মতই চলচ্চিত্রেরও তখন যাকে বলে একেবারে শৈশব অবস্থা। হয়ত আমার চেয়েও আরও শৈশবাবস্থা, কারণ তখনও তার মুখে বুলি ফোটেনি। সেই যুগের চলচ্চিত্রে আমার প্রথম ছবি "জয়দেব"।

এই ছবিতে আমার ছবি ও কাজ মোটের ওপর সকলের ভালই লেগেছিল। একটা মজার কথা অজও ভুলিনি। দক্ষিণাস্বরূপ আমার হাতে এল মাত্র পাঁচটি টাকা। তাই-ই আমার কাছে তখন লক্ষ টাকার সমান। পরে জেনেছিলাম আমার প্রকৃত বেতন ধার্য হয়েছিল ২৫্ টাকা। সে টাকাটা নাকি দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল পাঁচ। বাকী কুড়ি টাকা কার হাত দিয়ে কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিল জানি না। তবে শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এখন ভাবি আমার অনভিজ্ঞতার খেসারত মাত্র কুড়ি টাকার ওপর দিয়েই যদি গিয়ে থাকে সে আর কি এমন বেশী? তবু ত পাঁচটা টাকাও পেয়েছি, তাও ত না পেতেও পারতাম? এইভাবেই আমি চিরদিন জীবনের গরমিলের হিসেব মিলিয়ে এসেছি। তাতে আর যাই হোক ক্ষতি হয়নি। অন্তত গোঁজামিল ত হয়নি। তাতেই আমি খুশি।

আমার ওপর বিধাতার অসীম করুণা যে একেবারে প্রথমেই জ্যোতিষবাবুর মত হৃদয়বান মানুষের কাছে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। উনি যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন তেমনই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি কঠোর। আদরের সঙ্গে সঙ্গে শাসন করতেও ভুলতেন না।

প্রথমদিন সুটিং-এর সময় যখন আয়না ও রিফ্লেকটার ইত্যাদি নিয়ে মুখে আলো ফেলে ছবি নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল, চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম, সারা শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। "আমি পারব না, কিছুতেই পারব না" বলে কান্না জুড়ে দিলাম। জ্যোতিষবাবু কাছে এগিয়ে এসে সেই প্রথম দিনের মত স্নেহ-কোমল স্বরে বললেন "ছিঃ অত ঘাবড়াতে নেই। একটু ধৈর্য ধরে থাক দেখবে আর কষ্ট হবে না।"— দেখলাম সত্যিই তাই।

আবার একদিন সুটিং-এর সময় আমার শট ছিল। কিন্তু সেট তৈরী হতে দেরী হচ্ছে দেখে আমি একেবারে রাধার বেশভূষাতেই পেছনের বাগানে একটা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়ে দেখি একটু উঁচুতে ডালের কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে একেবারে ঠিক ঠেসান দিয়ে বসার চেয়ারের মত হয়ে আছে। চারদিকে রোদ। ঐটুকু মাত্র ছায়া ঢাকা জায়গা। আমি একটা বেশ বড় দেখে ডাঁশা পেয়ারা নিয়ে একলাফে ঐ ডালে উঠে খেতে খেতে কখন আরামে একটু ঘুমের আমেজ এসেছে জানি না।

ওদিকে সেটের সব তৈরী। ক্যামেরা রেডী, শ্রীকৃষ্ণ এসে প্রতীক্ষমান। কিন্তু রাধার পাত্তা নেই। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর যখন সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, কে একজন আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ারা হাতে ঐ গাছের ডালে আবিষ্কার করলেন। জ্যোতিষবাবুর কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলতেই উনি আমার গালে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, "দুষ্টু মেয়ে, পেয়ারা খাবার আর সময় পেলে না। তোমার জন্য সন্ধ্যার কত অসুবিধে, কাজের ক্ষতি এবং সময় নষ্ট হয়েছে জান? আর কখনও যেন কাজের সময় সেটের বাইরে না দেখি।" সেই চড় গালে যত না লেগেছিল তার চেয়ে বেশী লেগেছিল মনে। তখন কাঁদিনি কিন্তু বাড়ীতে এসে কতক্ষণ ধরে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি তার ঠিক নেই। মা, দিদি, কত আদর করে জানতে চাইলেন কি হয়েছে। আমি বলতে পারিনি। ছেলেবেলা থেকে, যত প্রচণ্ড ছিল অভিমান, তার চেয়েও বড় আত্মসম্মান। প্রাণ গেলেও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারতাম না। মনে হোত তাতে যেন নিজেকে ছোট করা হয়। অবশ্য মার কাছে বলতে না পারার কারণ আলাদা। আমার কষ্টের কথা শুনলে মা দুঃখ পাবেন সেই ভয়েই নিজের অনেক দুঃখ ঐ বয়সেও মার কাছেও লুকোতে চাইতাম। হয়ত এই কারণেই আমি ছেলেবেলা থেকেই একটু চাপা প্রকৃতির হয়ে পড়েছি।

যাক অবশেষে মাকে সব বলতে হোল। কারণ আমার কান্না দেখে উনি বড় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সব শুনে বললেন— "দূর পাগল—উনি তোকে খুব ভালবাসেন তাই বকেছেন। বকুনী না খেলে কি কাজ শেখা যায়?"

দাদু/বিকাশ রায় ও সন্ধ্যা রায়

তখন এত দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু আজ মনে হয় ঠিকই ত করেছেন। একজনের কাজের অবহেলায় অন্য সবাইকে কি শাস্তি পেতে হয় তা প্রযোজক জীবনে প্রতি পদে পদে অনুভব করেছি। সবাই হাঁ করে বসে আছে, হিরোইন বা হিরো হয়ত ভ্রুক্ষেপ না করে কোথাও গল্পেই মত্ত, কখনও বা এসে পৌঁছলেনই না; যদি বা পৌঁছলেন কাজে গা নেই বা মুড নেই। সেদিনের ঐ চড়েরই সুদূরপ্রসারী ফল পরবর্তী জীবনের মজ্জাগত নিয়ম ও শৃংখলা। সেদিনের ঐ শাসন ও ভয় না থাকলে কর্মে নিষ্ঠা ও অনুরক্তি নিশ্চয়ই জন্মাত না। তাই এজন্য আজও তাঁকে প্রণাম জানাই।

এরপর ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস-এর কে পি ঘোষ পরিচালিত 'শঙ্করাচার্য'-তে অভিনয় করেছি।

তারপর আস্তে আস্তে ছবি কথা বলতে শিখল। টকির এই সবাক চিত্রের যুগে ম্যাডান থিয়েটারে 'জোর বরাত'-এর নায়িকারূপে আমার প্রথম সবাক অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। ছবিটি রিলিজ হয়েছিল ক্রাউন সিনেমায় (এখনকার উত্তরা) ১৯৩১ সালের ছ'ই জুন।

এ-ছবি আমার প্রথম যুগের কর্মের অধ্যায়ের এক অগ্নিপরীক্ষা বলা যায়।

জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ত অনেকই থাকে। কিন্তু টকির যুগের শুরুতে সাউণ্ড রেকর্ডিং মেসিন যেদিন ম্যাডান স্টুডিওতে এসে পৌঁছল, সেদিন সন্দেহ, দ্বিধা, হতাশা ও ভয়মিশ্রিত যে-বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছিল, তার তীব্রতা আজও ভুলিনি। মেসিনটির চারদিকে ঘুরেফিরে চোখের এ-কোণ ও-কোণ দিয়ে কৌতূহল ভরে সবাই মিলে দেখছিলাম। কিন্তু কৌতূহলের অন্তরালে যে-বস্তুটি মনকে প্রতি মুহূর্তে দমিয়ে দিচ্ছিল, তাকে নির্ভেজাল ভয় বললেই বোধহয় সত্যি কথা বলা হবে।

এখনই 'সাউণ্ড টেস্ট' হবে। কপালে কি আছে কে জানে। হয়ত এইখানেই কাজের 'ইতি' হয়ে যাবে। হায়রে, নির্বাক যুগের সেই সোনার দিনগুলো কে কেড়ে নিল? কেনই বা নিল?

এই সাউণ্ড টেস্টের কত গল্প শুনেছিলাম। কত বিখ্যাত শিল্পী যাঁরা নির্বাক যুগে রীতিমত নাম করেছিলেন, 'সাউণ্ড টেস্টের' দৌরাত্ম্যে তাঁদের ছবিতে কাজ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাইক ফিটিং গলা নয় —অতএব চলবে না ওকে দিয়ে—এই অজুহাতই ত যথেষ্ট।

যে-জীবনে দারিদ্র্য ও অনটন নিত্যসঙ্গী, ছবিতে উপার্জিত সামান্য অর্থে সংসার চালাতে হয়, সে-জীবনে এই যন্ত্রের আবির্ভাবকে অভিশাপ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এ যেন নিষ্ঠুর নিয়তির মত রক্তচক্ষু মেলে অন্ধকারভরা অপেক্ষমান দুর্ভাগ্যের দিনগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

যখন আমায় ডাকা হোল, আমার অবস্থা হোল ফাঁসিকাঠে যাবার আগে অপরাধীর মত। ঠোঁটদুটো শুকিয়ে গেছে, গলা বুজে আসছে। নিজের হৃৎকম্পের শব্দই যেন কানে বাজছে, জিভ আড়ষ্ট, চোখে সর্ষেফুল দেখছি—ঠিক এই অবস্থায় আমায় সংলাপ বলতে এবং গান গাইতেও বলা হোল। মনের এই মুহ্যমান অবস্থায় যতখানি পরিষ্কার করে বলা এবং গাওয়া সম্ভব বললাম। গলাটা কে যেন সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরছে। ফল যা হবার তাই। চাপা গলার ক্লিষ্ট রুদ্ধ প্রাণহীন স্বর নিজের কানেই এত কদর্য শোনালো যে, ইচ্ছে হচ্ছিল মেসিনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই।

দৌড়ে পালিয়ে পাশের ঘরে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইলাম। চাকরী ত গেল। এখন কি উপায়!

কিন্তু না, একটু বাদেই খবর পেলাম চাকরী বহাল তবিয়তেই আছে। প্রথমের

অশিক্ষিতা/মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সর্বেন্দ্র

'নার্ভাসনেস'-কে ওঁরা লিবারালি দেখেছেন। আমার কণ্ঠস্বর অমনোনীত হয়নি।

মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানালাম। 'জোর বরাত'-এর একটা বেদনাদায়ক ঘটনা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

একটা সিনের টেক হচ্ছিল। রিহার্সাল অনুযায়ী যথারীতি সংলাপ বলে গেলাম। সিনের শেষে হঠাৎ ছবির হিরো ইংরাজী ফিল্মের ঢঙে আমায় জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। ...ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সামলে উঠতে সময় লাগল। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, বিস্ময়, বেদনা, অপমান, অভিমান নিজের অসহায় অবস্থার জন্য কষ্ট সব মিলিয়ে একটা নিষ্ফল কান্না যেন মাথা কুটতে লাগল। অল্প বয়স, তখন ভাব-প্রবণতাও প্রবল। তাছাড়া, বাঙালী ঘরের মেয়ে, আবেগের এমন উগ্র প্রকাশে অভ্যস্ত নই। আর এ-কাজ ঘটল তাঁরই পরিচালনায় অভিভাবক ভেবে যাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। যাঁর দায়িত্বজ্ঞানের ওপর আমার এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। যদি অভিনয়কে স্বাভাবিক করবার জন্য এই চুম্বনের প্রয়োজন, তবে আমাকে আগে থেকে বলে মনকে কেন প্রস্তুত করবার অবকাশ দিলেন না?

জ্যোতিষবাবুকেও আমি এ প্রশ্ন করে-ছিলাম। তিনি বললেন, "বললে তুমি রাজী হতে না। ইট ইজ অ্যান এক্সপেরি-মেণ্ট, অত 'টাচি' হলে চলে? আর্টিস্টদের আরো স্পোর্টিং হতে হয়। সাধারণ মানুষ যা কল্পনায় আনতে পারে না, শিল্পীরা অনায়াসে তা পারে বলেই না তারা শিল্পী।" ইত্যাদি অনেক স্তোকবাক্য দিলেন।

কিন্তু যাই বলুন আমার মনের ভার নামল না। নিজেকে বড় অপমানিত মনে হয়েছিল, আমি কি পরিচালকের হাতের ক্রীড়নক? নিজের মতামত, স্বাধীন সত্তা কিছুই থাকবে না? ভেবেছি আর কেঁদেছি।

আজ ত নায়িকাদের সম্রাজ্ঞীর সম্মান। আমার এ-সমস্যা এ-যুগে হাস্যকর। এখন ত নায়ক-নায়িকার একটিমাত্র ইচ্ছে বা সাজেশনই এ-লাইনে বেদবাক্য। এ-আঘাত আজও ভুলিনি। তবে এর মধ্যেও ভাববার কথা আছে বৈকি।

এখন চলচ্চিত্রের অগ্রগতির স্বর্ণযুগ। তবুও বোম্বে ফিল্মে আলিঙ্গন ত আছেই অথবা চুম্বনের প্রায়-চালু অবস্থা। কিন্তু এই প্রগতিশীল যুগেও বাংলা ছবিতে চুম্বনের অবতারণা করা যায় কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। কিন্তু আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে চলচ্চিত্রের শৈশবে, বাংলাদেশেরই এক পরিচালক চুম্বন-এর দৃশ্যের কথা ভেবেছিলেন এবং তাকে ছবিতে প্রয়োগ করার দুঃসাহসও হয়েছিল—এটা প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডের লক্ষণ নিশ্চয়। তাঁর সঙ্গে সমান তালে আমাদের মন পা ফেলতে না পারলেও, দুঃসাহসিক পরীক্ষার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নিশ্চয়ই। ভালমন্দর বিচার ত আপেক্ষিক।

যাই হোক ঐ দৃশ্যে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে নায়ককে দুহাতে ঠেলে দেওয়ার জন্য ছবিটি ঠিক পরিবেশন-যোগ্য হয়নি এবং সেইজন্যই শেষপর্যন্ত ঐ দৃশ্যটি এন জি হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা আজও ভুলিনি। স্টুডিওতে যে বাবুর্চি বা বেয়ারার ওপর আমাদের খাওয়াবার ভার থাকত, আপাতদৃষ্টিতে খুব হাসিখুশি চেহারা। কি বদান্যতা। সবাইকে তাড়াতাড়ি খাওয়াবার সে কি ব্যগ্রতা। কিন্তু ব্যগ্রতার অন্তরালের কাহিনীটুকু আর কেউ জানত কিনা বলতে পারি না, তবে আমার অজানা ছিল না। ওর একটা অভ্যাস ছিল, এক-জনকে খাইয়ে পাঁচজনের হিসেব দেওয়া। উদ্বৃত্তাংশ যেত তারই ছাঁদায়। অন্য সবার ভাগ্যে কি জুটত জানি না। তবে লাঞ্চ বলতে আমার বরাদ্দ ছিল চায়ের প্লেটে দু' স্লাইস পাঁউরুটি, দু-টুকরো আলু ও চার-টুকরো মাংস। ওপর থেকে পরিমাণের সত্যিই নির্দেশ দেওয়া ছিল কিনা বলতে পারি না। তবে আমার হাতে পৌঁছত ঐটুকু এবং তালিকায় থাকত আমার মত চারজনের উপযোগী ভোজ্যবস্তুর হিসেব।

সংকলন : **সন্ধ্যা সেন**

ছায়াতীর/বিনতা রায় এবং বিকাশ রায়

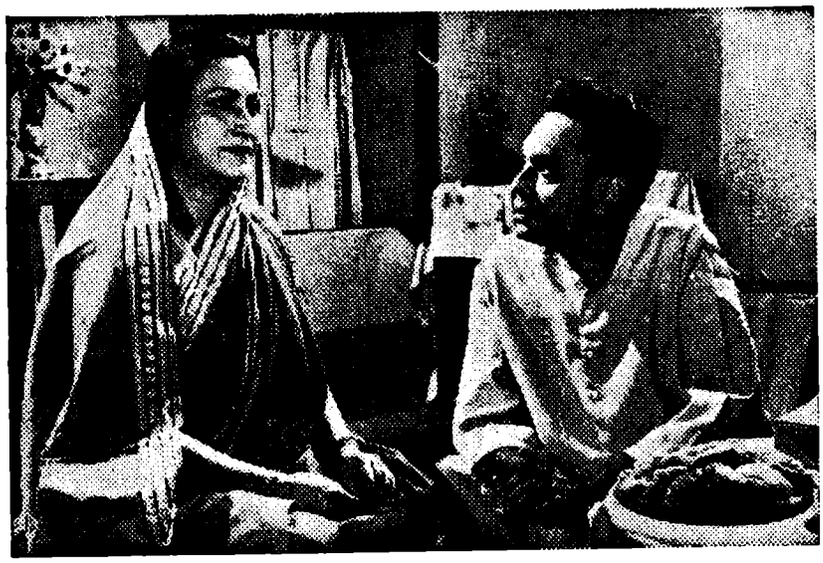

গুপী গাইন বাঘা বাইন/তপন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ

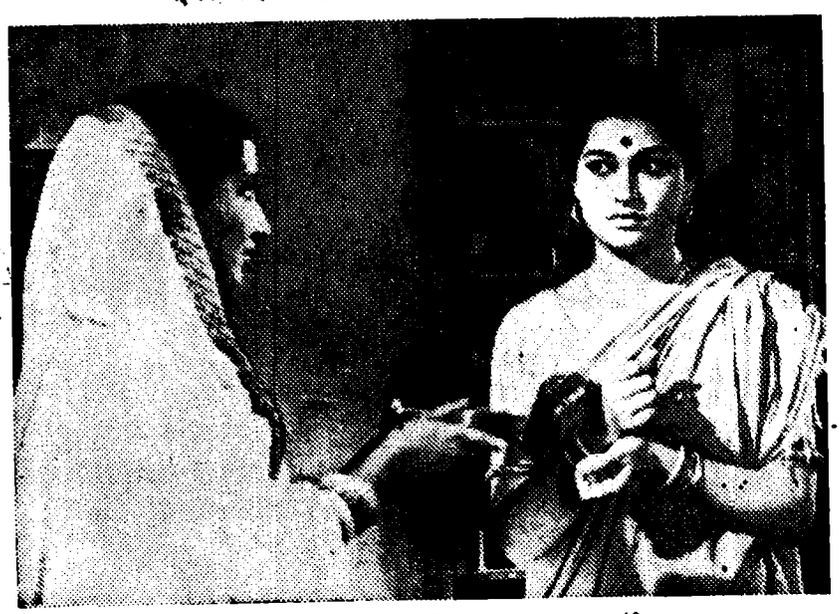

শুকসারী/সাধনা রায়চৌধুরী ও অঞ্জনা ভৌমিক

সাহিত্য রহিত সিনেমা

নির্মলকুমার ঘোষ

ভারতীয় চিত্রজগতের এক দুঃসাহসিক ও অতি-আধুনিক পরিচালক,—বলিষ্ঠ মতবাদ ও মৌল শিল্পকর্মচিন্তায় ও সাধনায় যাঁর খ্যাতি বহুদূরবিস্তৃত হয়ে সাগর-পারেও গিয়ে পৌঁছেছে—সম্প্রতিকালের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সিনেমাকে জড়িয়ে তিনি এমন কিছু কঠোর মন্তব্য করেছেন যার সম্বন্ধে বাংলার চিত্ররূপকারদের অবহিত হওয়া উচিত। তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হলে সে ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দায়িত্ব বন্টন করে নিতে হবে অভিযোগের প্রতিকারার্থে।

এই চিন্তাশীল পরিচালকের বক্তব্যের সারার্থ এই যে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সিনেমা উভয়েই আজ সৃজনীক্ষেত্রে সমান অক্ষম। অবশ্য এর জন্য মূলতঃ ভদ্রলোক দায়ী করেছেন বাংলা সিনেমার শিল্প-বিধ্বংসী চরিত্রকে। সেই নাকি বাংলা সাহিত্যের এই তথাকথিত ব্রাত্যের কারণ।

এঁর বক্তব্যকে সপ্রমাণ করতে ইনি বলেছেন যে বিগত দুই দশকের মধ্যে বাংলা সাহিত্য যে হাজার-হাজার উপন্যাস সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে পাঁচটি কি বড়োজোর ছ'টি সম্মানিত ব্যতিক্রমকে বাদ দিয়ে বিচার করলে বাকি সবগুলিই গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবার যোগ্য।

এই চমকপ্রদ তথ্যের মূল কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে পরিচালক বলেছেন যে আজ যে হাজার-হাজার আগাছা সাহিত্যের নন্দন-কাননকে জঙ্গলে পরিণত করেছে তারা জন্ম নিচ্ছে একটি হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে। সেটা হল,—কি করে কোন রকমে কতকগুলি অতি-উদ্ভট, অবাস্তব দর্শক-কল্পনাকে-উত্তেজককারী চরিত্র ও ঘটনার অতিসরলীকৃত, অতি-নাটকীকৃত সমাবেশে চলচ্চিত্ররূপে উচ্চ-মূল্যে বিক্রীত হওয়া যায় প্রযোজকদের কাছে,—চিত্রোপযোগী কাহিনী রূপে সমাদৃত হয়ে সেইরূপ একটি নির্দিষ্ট ধারণা-দ্বারা আগাগোড়া প্রভাবিত হয়ে। এক ছকে-বাঁধা পদ্ধতিতে নাকি এখনকার যুগের তথাকথিত সাহিত্যকর্মের কুলশীলহীন সৃষ্টি।

এ-কথার নিহিত অর্থ এত পরিষ্কার যে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সেটা এই যে সাহিত্য-শিল্প আজ তার সবকিছু আভিজাত্য, সংস্কৃতি ও রসসম্পদ স্বেচ্ছায় খুইয়ে নিজের উঁচু মাথা বিকিয়ে দিয়েছে কাঞ্চন-মূল্যের জন্য সিনেমার নিম্নরুচি-সার, ব্যবসায়মূলক পঙ্কিল প্রবৃত্তির পায়ে জঘন্য উপায়ে। কি করে সিনেমার তথাকথিত রামধনুর কল্পনায় আঁকা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মনোভাবকে ইন্ধন জুগিয়ে সস্তা মানের আনন্দ-উত্তেজনা-হর্ষ-বিষাদ-সঙ্গীত-প্রেমের ষড়গুণাবলিজারিত মকরধ্বজ

'জোড়া দিঘীর চৌধুরী পরিবার'খ্যাত অজিত লাহিড়ীর
অজস্র অর্থ ও অপূর্ব শিল্পী সমাবেশে আসছে —

বসুশ্রী ও বীণা-য় পরবর্তী আকর্ষণ

তৈরী করা যায়, আজকের সাহিত্যিকেরা নাকি ঠিক সেইভাবেই, সেই পথেই আপনাপন কল্পনা-শক্তিকে নিয়োজিত করে নির্ধারণ করেন তাঁদের কাহিনীর প্লট, সাধন করেন তার বিস্তার, আমদানী করেন তার কাঠামোতে বিশেষ-বিশেষ জাতের, বিশেষ-বিশেষ মেজাজের চরিত্র, ঘটনা-সংস্থাপন, সংলাপ প্রভৃতি। যাতে সেইসব অকিঞ্চিৎকর, শিশুসুলভ কাহিনী উচ্চ-মূল্যে সিনেমার অধিকর্তাদের কাছে বিকোয়। তাদের ডজন-ডজন সংস্করণ হয়। তার ফলে সিনেমা স্টারদের অবিশ্বাস্যরূপে আকাশচুম্বী উপার্জনকে যাতে লেখকরা অনুসরণ করতে পারেন।

অভিযোগটি নিঃসংশয়ে গুরুতর। সিনেমার সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের বাজারী আদর্শকে লক্ষ্য করেই পরিচালক বলছেন সাহিত্য আজ স্বধর্মভ্রষ্ট, অর্থের ও সস্তা জনপ্রিয়তা অপসাধনে লিপ্ত। আর তাই নাকি আজ বাংলা সাহিত্যরচনা পর্যবসিত এমন চরিত্রে যেখানে সরলতা, নিষ্ঠা, ও শিল্পমানসিকতামণ্ডিত, জীবন-দর্শনের মানবিক আদর্শ লোপ পেয়ে প্রতিষ্ঠা নিচ্ছে ক্রমশই একটা বিভ্রান্তি, পল্লবগ্রাহিতাবাদ্ধ।

পরিচালক-সমালোচকের এই তিক্ত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করলে ধরা যায় যে সিনেমা ও সাহিত্যের এই সম-গোত্রীয় আচরণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে আজকের বস্তাপচা সাহিত্য, সৃষ্ট হচ্ছে আমাদের ফরমুলাক্লিষ্ট অপদার্থ সিনেমা। দর্শকের তাৎক্ষণিক ও স্থূল আনন্দের পশরা সাজিয়ে যার নিম্নরুচি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়। আর সিনেমার বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগটি আরো গুরুতর, বাংলা সাহিত্যই নাকি বাংলা সাহিত্যকে তার ক্লেদাক্ত, মোহিনী মায়ায় তীব্র আকর্ষণে টেনে এনে অধঃপতনের অতল খাদে তলিয়ে দিয়েছে।

গড় নাসিমপুর/উত্তমকুমার

বাংলা সাহিত্য তার নিজস্ব প্রজ্ঞা, দীপ্তি ও আভিজাত্যকে সিনেমার দুর্নিবার অর্থাকর্ষণ ও অন্যান্য নিম্নজ মোহের কারণে হারিয়েছে কিনা সে আলোচনা এখন নয়। কিন্তু এমন অভিযোগে দুষ্ট হলে সিনেমার কর্তারাও ক্ষুণ্ণমনে একটা প্রশ্ন করতে পারেন নাকি? সে প্রশ্নটি হবে : সাহিত্য ও সিনেমার এই পারস্পরিক আদানপ্রদান আজ যদি বন্ধই হয়ে যায় তবে তাতে অধিকতর ক্ষতি সাধিত হবে কার? সিনেমার, না সাহিত্যের?

এ-কথা যদি অভিযোগ করে বলা যে নিম্নরুচির একঘেঁয়ে ও বস্তাপচা মাল-মশলা দিয়েই গঠিত সিনেমার জন-প্রিয়তার অক্ষয় সঞ্চয়ভাণ্ডার, এবং শুধু তাই নয়, সেই মালমশলা আমদানি হয় বাংলা সাহিত্যের বড়বাজার বা চোরাবাজার থেকেই, তবে সিনেমা-ও যদি এ-কথা শুনে অভিমান-ভরে বলে বসে : 'চাই না ভাই' তবে এভাবে বিশগুণ, চল্লিশগুণ বেশী দাম দিয়ে তোমার ওই পরমাল কিনে গালাগাল খেতে! আমরা তবে এখন থেকে অন্য বাজার থেকেই মাল কিনব, যেমন ধরুন বিদেশী সাহিত্যের চোরাগলি থেকে, বা কমার্শিয়াল আন্তর্জাতিক সিনেমার দিগন্ত-বিস্তৃত ভাণ্ডার থেকে, চোরাকারবারের অলিগলিতে। আর সেখানে সত্য, ভাই সিনেমা! তোমার জগতেরও বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শক্তিধরের সতর্ক, গোপন আনা-গোনা আছে! তবে আমাদের তফাৎটা কোথায়? থাক ভাই তবে তোমরা তোমাদের সুকর্ষিত, ধ্রুপদীসাহিত্যের উচ্চ মান নিয়ে! তবে সময় থাকতে এটাও ভেবেও দেখো ভাই যে সিনেমার দুয়ার বন্ধ হলে কি সাহিত্যালোকের আজকের বিপুল জন-প্রিয়তার মূলেও কুঠারাঘাত পড়বে না? তার আবেদন কি লোকমানসে বিবর্ণ হয়ে যাবে না?'

অনেকেই হয়তো মনে করেন যে, সিনেমা ও কথাসাহিত্যের মূল লক্ষ্য এক। তাঁরা নিশ্চয় সিনেমার ও সাহিত্যের জাত-কুল নিয়ে এই দ্বন্দ্বের ক্ষুণ্ণ হবেন উভয়েরই ক্ষতির কথা ভেবে। এই মনোভাবাপন্ন লোকেরা, যাঁরা মনে হয় অনেক অধিক সংখ্যক হবেন তুলনায়, তাঁরা বলবেন : শিল্পের সারস্বত প্রাঙ্গনে উভয় সাথীকেই কাহিনীরসের বটবৃক্ষতলে মিলতে হবে। অগণিত কৌতূহলী দর্শক এবং পাঠকের চিরন্তন কাহিনীপিপাসাকে তৃপ্ত করতে হবে। যদিই বা মেনে নেওয়া যায় যে সাহিত্যের ঐশ্বর্য অন্তরঙ্গ, আর সিনেমার যাকিছু সম্পর্ক বহিরঙ্গ, বাইরের ধূলিধূসর পথের, তবুও বোধ করি প্রশ্ন করা যায় যে, জন-প্রিয়তার স্রক্‌ধারায় অভিষিক্ত হওয়াটাই কি সিনেমার সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ?

তাছাড়াও কথা আসতে পারে। পাশ্চাত্যে যথার্থ আধুনিক সিনেমার রূপ-বিশ্লেষণকারীরা আজ বিশেষ দাবী করছেন যে চলচ্চিত্র আজ আর সাহিত্যের স্কন্ধবাহিত, পঙ্গুশিল্প নয়। সে আজ নিজের পায়ে নিজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, চলতে, চিন্তা করতে ও আপন নিজস্ব ভাবে মানুষের মনোজগতকে প্রভাবিত করতে সুরু করেছে এক সম্পূর্ণ পৃথক শিল্পসত্তা নিয়ে। বর্তমান দশকে দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে, ফুলের মতো সহজ সৌন্দর্যে বিকাশিত হচ্ছে সিনেমায় বন্ধন-মুক্ত মন, বিদ্রোহী নবীন পথযাত্রা। সে আজ স্বাধীন জীবনদর্শন সাধনায় লিপ্ত।

এই বিদ্রোহী শিল্পীরা বলছেন, সাহিত্যকৃতির নামে জীবনের বিকৃতীকরণ বর্ণসঙ্করত্ব তাঁরা আর মানবেন না। তাঁরা চান সিনেমায় নিছক মৌলিক রূপ। সাহিত্য ও সিনেমায় বাধ্যতামূলক দুর্বলতাকে, পরস্পরাবলম্বিতাকে আজ নির্বাসন দিতে হবে।

সাগরময়ী/উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

অবশ্য চিত্রশিল্পকৃতির এমন উচ্চতর গ্রামের কল্পনা ও তার বিকাশের বন্যা আমাদের দেশে আসতে হয়তো এখনো বহু দেরী আছে। তবুও মনে হয় সাহিত্যপট ও চিত্রপটের ধর্মবৈষম্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে ও উঠবে আমাদের দেশেও। ক্রমেই বোধহয় দেখব, আমাদের চলচ্চিত্র নিজের ভিন্ন গোত্র, মেজাজ ও চলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। গল্পকথন শীঘ্রই বোধ করি আর সিনেমাকারদের, অন্ততঃ বিদ্রোহী সিনেমাস্রষ্টাদের শিল্পগ্রন্থনের দৈবপ্রসাদ বলে গণ্য হবে না।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি

মহেন্দ্র সরকার

চলচ্চিত্র একটি সর্বগ্রাসী শিল্পমাধ্যম। আর্টের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ছবি, সুর এবং সাহিত্য শিল্পের এই তিন শাখাকেই একত্রে আবদ্ধ না করলে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্যকভাবে সম্ভব নয়। আবার ইনডাস্ট্রির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে একেকটি চলচ্চিত্রের সঙ্গে শুধু পরিচালক বা প্রযোজকই নন আরো অনেক, অনেক কলাকুশলীর ভাগ্য জড়িত। একটা উপন্যাস বাজারে না চললে ক্ষতি শুধু দুজনেরই—লেখকের এবং প্রকাশকের। গায়ক ভাল গান গাইতে না পারলে বা জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম না হলে ক্ষতিটা হয় ব্যক্তিগতভাবে গায়কেরই। কিন্তু চলচ্চিত্রের বেলায় লাভক্ষতির ভাগ বহন করতে হয় অনেককেই। এবং যেহেতু একটি ছবি তৈরীর খরচ বিরাট সেহেতু একজন লেখক বা চিত্রশিল্পী যে-রকম তার সৃষ্টির বিধাতা হতে পারেন, এক চলচ্চিত্রকারের পক্ষে সে ধরনের কিছু হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। চিত্রপরিচালককে অনেক কিছু ভেবে, অনেক আট-ঘাট বেঁধে তবেই একটা ছবি তৈরীর কথা ভাবতে হয়। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই শিল্পী হিসেবে তাঁর অধিকার খর্ব হয়। শিল্পী হিসেবে তিনি যা সৃষ্টি করতে চান, একটা ইনডাস্ট্রিক লোক হিসেবে তা তিনি পারেন না। ফলে অহরহই তাঁর মনে একটা সংঘাত চলতে থাকে। এবং এই সংঘাত নিঃসন্দেহে শিল্পসম্মত চিত্রনির্মাণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। সৃষ্টির ওপরে স্রষ্টার যদি সম্পূর্ণ অধিকার না থাকে, শিল্প যদি শিল্পীকে তর্জনীশাসন করে তাহলে সেই শিল্পের পক্ষে দীর্ঘায়ু হওয়াও অসম্ভব। জ্ঞানের মত আর্ট জিনিসটাও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাকে বাইরে আহরণ করেন না। শিল্পীর অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব। এই নিজস্বতার উদ্ভব তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থেকেই। একজন চিত্রশিল্পী যেমন তাঁর ক্যানভাসে নানা রঙের ব্যবহার করতে করতেই তাঁর ছবির জন্যে প্রয়োজনীয় নিজস্ব রঙটি পেয়ে যান, তেমনি সব শিল্পকেই যেতে হয় এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। চলচ্চিত্র একটি অন্যতম শিল্প (আর্ট অর্থে) হলেও সেখানেও এই ধরনের কোনো ব্যবহারিক সুবিধে নেই। চিত্র-পরিচালক এইখানেই অন্যান্য শিল্পীদের চেয়ে কম অধিকার ভোগ করতে পারেন।

কিন্তু চিত্র-পরিচালককে যদি এই শিল্পীজনোচিত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তাহলে ইণ্ডাস্ট্রি হিসেবে টিকবে কিনা জানি না, আর্ট হিসেবে তার অকালমৃত্যু অবশ্যই হবে। সুতরাং এমন একটা উপায় বার করতে হবে যাতে ছবির ইণ্ডাস্ট্রি—যার সঙ্গে অনেকের ভাল-মন্দ জড়িত—ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অথচ পরিচালকের স্বাধীন শিল্পীসত্তা বজায় থাকে।

আমার ধারণা, আমাদের দেশে যদি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক চিত্রনির্মাণের দিকে পরিচালকরা এবং প্রযোজকরা দৃষ্টি দেন তাহলে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের লাভ বই ক্ষতি হবে না। মূল ছবির সঙ্গে পরীক্ষামূলক দু-তিন রীলের ছবি যদি 'প্যাকেজ ডিল' হিসেবে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হতে থাকে তাহলে কোনো বড় রকমের অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার কথা নয় কোনো পক্ষেরই। এর দৃষ্টান্তও রয়েছে ভূরিভূরি। আগের দিনে অনেক চিত্র-প্রযোজকই মূল ছবির সঙ্গে ছোট ছোট ফিচার সর্ট তুলতেন এবং সেগুলি কখনো কখনো জনপ্রিয়ও হত। প্রথাটি

আবার চালু করলে কিন্তু আসলে ইণ্ডাস্ট্রিরও লাভ হতে পারে। এই ধরনের ছবির দায়িত্ব সহকারী চিত্র-পরিচালকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুযোগ দিয়ে তাঁদের অভিনয়প্রতিভা পরখ করা যেতে পারে। নতুন ধরনের গল্প নিয়ে দর্শকদের রুচি গঠনের কাজটিও ব্যবসায়িক কোনো-রকম ঝুঁকি না নিয়েও অনায়াসে করা সম্ভব হতে পারে।

পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রের মান যত নেমেছে, দুঃখের বিষয়, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির মান তদনুরূপ নয়। আমরা অবশ্য, স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি বলতে বুঝি সরকারী কাণ্ড-কারখানার সেলুলয়েড রূপ, কিম্বা টুরিস্ট সংস্থার কাজে লাগে এই ধরনের কিছু ছবি। কিন্তু সেদিক দিয়ে বিচার করলেও পশ্চিম-বঙ্গের মান মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ফিল্ম ডিভিশনের তোলা ছবিগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তোলা তথ্যচিত্রগুলি তুলনা করলেই বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমকে সিরিয়াসলি নিতে চান না। পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের কৃষি-বিষয়ক ছবিগুলি দেখলে মনে হয় যে বাড়ী বানানোর কনট্রাকট দেওয়ার মতই যেন এইসব ছবির কনট্রাকট দেওয়া হয়। ফলে আন্তর্জাতিক উৎসবগুলিতে ফিল্ম ডিভিশনের ছবিগুলি প্রশংসিত বা পুরস্কৃত হলেও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কখনই শিকে ছেঁড়ে না।

পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে চলচ্চিত্রকে সেখানকার সরকার যেমন সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তা করেন তাহলে পরীক্ষামূলক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি অনায়াসে তৈরী হতে পারে এই রাজ্যেও। এবং এ ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হলে উদ্যমী নতুন চলচ্চিত্রকারের অভাব হবে বলেও মনে হয় না। আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হবেন কিনা সেটাই প্রশ্ন। এবং সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে ছবি করার অধিকার কেন শুধু অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন টেণ্ডার দেওয়া নির্মাতার থাকবে? ফিল্ম লাইনের সঙ্গে আগে আদৌ যুক্ত ছিলেন না এমন পরিচালকও যে ভাল ছবি তুলতে পারেন সে নজির তো হাতের কাছেই রয়েছে। হুসেনের ছবি 'থ্রু দি আইজ অফ এ পেণ্টার'-এর মতন আন্তর্জাতিক পুর-স্কারপ্রাপ্ত ছবি কি পশ্চিমবাংলায় তোলা একেবারেই অসম্ভব? আদপে তেমন কোনো চেষ্টা সরকারী তরফের নেই।

একথা সর্বাদিসম্মত যে, পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রকে দীর্ঘায়ু হতে হলে চলচ্চিত্র-চর্চার কাজটি সম্যক ভাবে করতে হবে। এবং এই চর্চার কাজটি থিওরিটিক্যাল আলোচনায় বা ফিল্ম সোসাইটির মারফৎ কতকগুলি বিদেশী ছবি দেখিয়েই সম্ভব নয়। পরিচালককে চিত্রনির্মাণের স্বাধীন অধিকার দিতে হবে। এবং সেই অধিকার একমাত্র স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র, কাহিনীমূলক চিত্র অথবা পাপেট জাতীয় ছবি তৈরী করতে গিয়েই অর্জন করা যেতে পারে।

বাংলা দেশের ৫ম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

(মাণিকতলা পুলের পাশে। টেলিফোন ঃ ৩৫-৬৫২২)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের

বিশ্বজয়ী ছোট গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে এই প্রথম

কাবুলিওয়ালা

তপন সিংহ

রচিত চিত্রনাট্য অনুসারে নাট্যগ্রন্থনা ও নির্দেশনা

তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়

সংগীত ঃ তিমিরবরণ ঃঃ নেপথ্য কণ্ঠ ঃ দ্বিজেন মুখার্জী

আলো ও মঞ্চ ঃ তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত

শ্রেঃ কমল মিত্র। মিহির ভট্টাচার্য। জীবেন বোস। তরুণ মিত্র। বীরেন চ্যাটার্জী। কৃষ্ণধন মুখার্জী। পরিমল সেন। মাণিক ব্যানার্জী। সুনীত মুখার্জী। অমর বিশ্বাস। দেবব্রত দে। গণেশ সরকার। ইন্দ্রজিৎ। অহীন ভট্টাচার্য। বিল্টু ঘোষ। দিলীপ ভট্টাচার্য। প্রদীপ চৌধুরী। ইরা চক্রবর্তী। রুবি মিত্র। মিলি চ্যাটার্জী। বিল্টু ঘোষ। শ্যামল ঘোষাল ও কালীপদ চক্রবর্তী এবং অনুভা গুপ্তা (ঘোষ)

সিনেমায় বিবর্তন

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের প্রযোজকই বলুন, পরিচালকই বলুন, আর দর্শকই বলুন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমর শেষ হবার পর থেকেই বিশেষ করে বিশের দশকে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বেতার মারফত গান-বাজনা, অভিনয়, সংবাদ সরবরাহ প্রভৃতি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবির শিল্পীদের মুখে কথা শোনবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠলেন। অবশ্য মানুষের মুখের ভাষাকে যন্ত্রের সাহায্যে ধরে রাখবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকরা বহুদিন ধরেই করে আসছিলেন। ১৮৫৭ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিয়োঁ স্কট তাঁর ফোনটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বর-তরঙ্গকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন স্কট কিন্তু কোনো মতেই তাকে পুনর্ধ্বনিত করতে পারেননি। এ বিষয়ে প্রথম সাফল্য লাভ করেন টমাস আলভা এডিসন। তিনি ১৮৭৭ সালে তাঁর উদ্ভাবিত ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বর-তরঙ্গকে (Sound Wave) ধরে রাখতে এবং তাকে পুনর্ধ্বনিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি চেষ্টা করেছিলেন মানুষের কণ্ঠস্বরকে পুনর্ধ্বনিত করার সঙ্গে তার চেহারাকেও সজীবভাবে দেখাতে। দশ বছর ধরে এই চেষ্টার ফলে

তিনি মানুষ বা জীবজন্তুকে জীবন্তভাবে চলাফেরা করতে দেখানোর যন্ত্র 'কিনেটোস্কোপ' উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রে একজন দর্শক একটি গর্তে চোখ রেখে মাত্র ৫০ ফুট দীর্ঘ চলন্ত ফিল্মের সাহায্যে মানুষ বা জীবজন্তুর নড়াচড়া দেখতে পেত। ১৮৮৯ সালে 'পেটেন্ট' নেওয়া এই যন্ত্রের সঙ্গে ফোনোগ্রাফকে জুড়ে এডিসন তৈরী করেছিলেন 'কিনেটোফোন'—যাতে চলন্ত মানুষকে কথা কইতে বা গানের দু-এক কলি গাইতে শোনা যেত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি মানুষের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে স্বরক্ষেপকে নিখুঁতভাবে মেলাতে পারেন নি। চলচ্চিত্রের প্রোজেক্টার ও গ্রামোফোনকে একই শক্তি দ্বারা চালিত করে সবাক চিত্র দেখাবার প্রচেষ্টা ফ্রান্সের চার্লস পাথে, জার্মানীর মেস্টার, ইংলন্ডের জর্জ বাউইক কোম্পানী, হেপওয়ার্থ ডিভাইন গোমো ক্রোনোফোন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই করেছিল; কিন্তু শব্দকে বর্ধিত করবার ও ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে স্বরক্ষেপকে সুসমন্বিত করবার অভাবে এইসব চেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি।

এরই মধ্যে উদ্ভাবিত হল ফোটো-ইলেকট্রিক সেল, যা শব্দবিম্বকে বিপুল ভাবে প্রসারিত করতে পারে এবং তাকে পুনর্ব্যক্ত করার কাজেও সাহায্য করে। এবং এরই সঙ্গে এই সেলে উদ্ভূত তড়িৎ শক্তিকে যথেষ্টভাবে বর্ধিত করবার জন্য জন অ্যামব্রোজ ফ্লেমিং উদ্ভাবন করেন 'থার্মিওনিক ভ্যাকাম টিউব' এবং ডক্টর ডি লী ফরেস্ট উদ্ভাবন করেন, 'অডিওন'। এই উদ্ভাবন-ত্রয়ের ফলশ্রুতি হল—অ্যামপ্লিফায়ার বা শব্দবর্ধনী যন্ত্র। এই অ্যামপ্লিফায়ারের আবিষ্কার মানুষের স্বরকে বহুগুণে বর্ধিত করে বহু জনের শ্রুতিগ্রাহ্য হবার সহায়ক হয়েছিল। অপর দিকে অনেক দিন গবেষণা চালাবার পরে ইউজিন লস্টি নামে জনৈক ইংরাজ শব্দ-তরঙ্গকে (আসলে শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তিত রূপ আলোক-তরঙ্গকে) ফিল্মের ওপর রেকর্ড করার একটি বিশেষ পদ্ধতির 'পেটেন্ট' গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৬ সালে। ছবি ও শব্দ—দুইই ফিল্মে ধৃত হবার ফলে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে শব্দপ্রক্ষেপকে নিখুঁতভাবে মেলানোর বা সিঙ্ক্রোনাইজ করার একটি সুনিশ্চিত উপায় পাওয়া গিয়েছিল। এক দিকে শব্দ-তরঙ্গকে ফিল্মের ওপর ধরতে পারা, অন্য দিকে অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বরকে বহুজনের শ্রুতিগ্রাহ্য করতে পারা—এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিবর্জিত হয়ে উঠেছিল ১৯২৬ সাল নাগাদ। এবং মাত্র তখনই নির্বাক চলচ্চিত্রের বাজারের নিদারুণ মন্দাকে কাটিয়ে ওঠবার উদ্দেশ্যে ভীটাফোন কর্পোরেশনের সঙ্গে মিলিতভাবে আমেরিকার ওয়ার্নার ব্রাদার্স চলচ্চিত্ররাজ্যে শব্দের নতুনত্ব আমদানী করবার জন্য তাঁদের প্রথম সবাক চিত্র 'দ জেজ সিঙ্গার' নির্মাণ করেন ১৯২৭ সালে।

চিত্রের সঙ্গে ধ্বনিযুক্ত হওয়াতে চলচ্চিত্র একটি নতুন আয়তন লাভ করল।—ছবি যেন

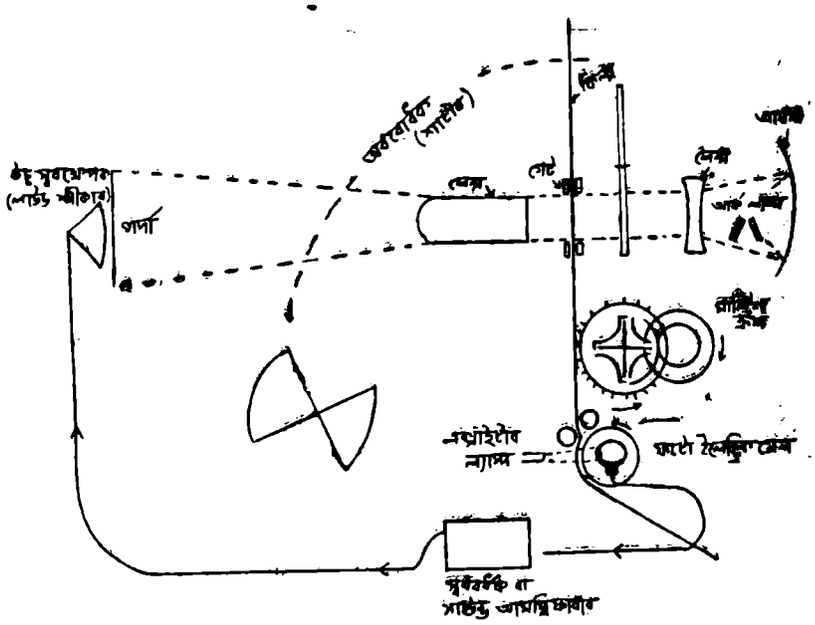

অনেকখানি বাস্তব হয়ে উঠল। শুধু কথা বা গানই নয়, চলার সময়ে মানুষের পায়ের জুতোর শব্দ, মোটরগাড়ীতে ব্রেক কষা বা স্টার্ট দেওয়ার শব্দ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি বা সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস চলচ্চিত্রকে আমাদের বস্তুজগতের মতোই জীবন্ত করে তুলল। কিন্তু সবাক চিত্রকে 'বাকসর্বস্ব' অবস্থা থেকে উদ্ধার করে একটি শিল্পসম্মত রূপ দিতে গিয়ে কিছু কিছু প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) অসুবিধে দেখা দিল। প্রথমেই গানের দৃশ্য তোলার সময়ে দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ গানখানিকে এক নাগাড়ে একটি মাত্র শটে না তুললে গানের উচ্চতা ঠিক রাখা

শীলা/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

যায় না; তাছাড়া গায়ক-গায়িকার কণ্ঠকে সাহায্য ও গানকে বর্ণাঢ্য করবার জন্যে গানের আনুষঙ্গিক যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাদের দ্বারা নিঃসৃত আওয়াজকে গায়ক-গায়িকার কণ্ঠের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় না। তাই গানের দৃশ্য তোলবার জন্যে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিল। এবং এই চিন্তার ফলে জন্ম নিল 'প্লে-ব্যাক' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত যন্ত্রসংগীত সহ গানটিকে আগেই রেকর্ড ক'রে নেওয়া হয়। পরে চিত্রগ্রহণের সময়ে ঐ গানটিকে বাজানো হয় এবং যিনি চিত্রে গান গাইবেন তিনি ঐ গানের (গানখানি হয়ত অন্য গায়কের গাওয়া) সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে গান করেন। দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল, চলন্ত ট্রেন বা মোটর কিংবা অন্য কোনো যানের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকাভিনেতাদের কথোপকথন তোলা। এর জন্যে উদ্ভাবিত হ'ল 'ব্যাক প্রোজেকসন' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ক্যামেরার সাহায্যে চলন্ত যান থেকে বাইরে পটভূমি তুলে নেওয়া হ'ল। স্টুডিওর মধ্যে পরে একটি বড়ো স্বচ্ছ কাঁচের মতো উজ্জ্বল অথচ অস্বচ্ছ পর্দার সামনে নকল ট্রেনের কামরা বা মোটরের ভিতর যেমন যেমন আসন দাঁড় করিয়ে রেখে তাতে শিল্পীদের বসিয়ে প্রয়োজন মতো কথোপকথন হয় এবং পর্দার পিছনে বা ক্যামেরার পাশে রাখা একটি শব্দহীন প্রোজেক্টারের সাহায্যে পূর্বে গৃহীত পটভূমির পজিটিভ চিত্র প্রতিফলিত করা হয়। এই অবস্থায় শিল্পীদের সংলাপসম্বলিত শট গ্রহণ করলে মনে হবে, চলন্ত গাড়ীর ভিতরেই শট নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রথাকেই ব্যাক-প্রোজেকসন পদ্ধতি বলা হয়। এছাড়া কোনো চরিত্রকে দূর থেকে ক্রমে কাছে বা কাছ থেকে ক্রমে বেশ দূরে দেখাবার জন্যে জুম্ (Zoom) লেন্সের ব্যবহার করা হয়। এই 'জুম্' লেন্স আসলে কয়েকটি লেন্সের সমষ্টি এবং এদের একটি 'লেভার'

এর সাহায্যে প্রয়োজন মতো দূরে থেকে কাছে বা কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া যায়। কলা-কৌশলের নানারকম তাগিদে 'অপ্‌টিক্যাল প্রিন্টার' নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে আছে একই সঙ্গে ক্যামেরা ও প্রোজেক্‌টার। যত রকম চমক-প্রদ, চাতুরীপূর্ণ, দৃষ্টি-বিভ্রমকারী দৃশ্য বা শট্‌ ছবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবগুলিই এই 'অপ্‌টিক্যাল প্রিন্টার'-এর সাহায্যে নির্মিত হয়ে থাকে।

সবাক-চিত্রের নতুনত্ব যখন প্রায় পুরা-তনের কোঠায় গিয়ে পৌঁছুল, তখন চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা ঝুঁকলেন রঙীন ছবির দিকে। ছায়াছবির জন্মকাল থেকেই প্রচেষ্টা চলেছে ছবিকে সাদা-কালো না রেখে রঙীন করবার দিকে। ১৮৯৫ সালে মিঃ জেঙ্কিন্স যে রঙীন ছবি দেখিয়েছিলেন তার প্রতিটি ফ্রেম মিঃ বয়েস নামে একজন শিল্পীর হাতে তুলি দিয়ে রং করা। ঠিক এর পর বৎসর মিঃ রবার্ট পল 'মিরাকল' নামে যে সাত রীল দীর্ঘ ছবি দেখিয়েছিলেন, তারই প্রতিখানি ফ্রেম হাতে ক'রেই রঙানো হয়েছিল। এর পরে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছবিকে রঙীন করবার চেষ্টা চলতে থাকল। এবং এ চেষ্টায় প্রথম সাফল্য লাভ করলেন ইস্টম্যান কোম্পানী কোডা-ক্রোম পদ্ধতিতে রঙীন ফিল্ম তৈরী ক'রে। এই পদ্ধতির ফিল্মে ছবি তোলবার ও মুদ্রিত করবার জন্যে বিশেষ ধরণের যন্ত্র-পাতির প্রয়োজন হ'লেও দেখানোর কাজটা সাধারণ প্রোজেক্টারেই চলে। কিন্তু একে টেক্কা মেরে কিছুকালে পরেই চালু হ'ল টেক্‌নিকলার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ ভাবে নির্মিত ক্যামেরার সাহায্যে প্রতিটি শটের তিনটি ভিন্ন রঙের তিনটি ভিন্ন নেগেটিভ ফিল্ম তোলা হয়। পরে মুদ্রণের সময়ে ঐ তিনটি নেগেটিভকে একই পজিটিভের ওপর পরপর ছেপে দেওয়া হয়। এই বিশেষ পদ্ধতিটিই বহু বছর ধরে রঙীন ছবি তৈরীর ব্যাপারে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি 'ইস্ট-ম্যান কলার', মেট্রো-কলার', 'ফেরানিয়া কলার' (ইটালী), প্রভৃতি বহু প্রণালীতে রঙীন ছবি তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে। এ-ছাড়া ছবিকে বাস্তব এবং চোখ ও কানের কাছে ভীষণভাবে আকর্ষণীয় করবার জন্যে সিনেমাস্কোপ, স্টিরিও-ফোনিক সাউণ্ড, ৭০ মিঃ মিঃ, ফিল্মের ব্যবহার প্রভৃতি বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে চলচ্চিত্রের দর্শকদের এই শিল্প-মাধ্যমটির প্রতি অনুরক্ত রাখবার জন্যে।

একটা কথা যথাস্থানে বলা হয়নি। চলচ্চিত্র যখন নির্বাক থেকে সবাক হ'ল, তখন কিছুদিন পরেই বোঝা গেল, ছবিকে যদি আর একটু বেশী গতি না দেওয়া হয়, তাহলে শিল্পীদের সংলাপ ঠিকমতো স্বাভাবিক হয়ে দর্শকদের কানে পৌঁছুবে না। এরই জন্যে আগে ক্যামেরা ও প্রোজেক্‌টার যেখানে এক সেকেণ্ডে মাত্র এক ফুট ফিল্ম ও ১৬খানি ফ্রেম তাদের ভিতর দিয়ে চলতে দিত, এখন সেখানে এক সেকেণ্ডে দেড় ফুট ফিল্ম ও ২৪ খানি ফ্রেম তাদের গেট-এর সামনে দিয়ে যায় অর্থাৎ সবাক যুগে ক্যামেরা ও প্রোজেক্‌টারের স্পীড বা গতি নির্বাক যুগের দেড়া হয়েছে।

চলচ্চিত্রকে নিত্য নব-রূপ দেবার জন্যে পৃথিবী জোড়া চলচ্চিত্রজগতে নিরলস সাধনা চলছে বহু প্রতিভাধরের দ্বারা এবং প্রতিদিনই কিছু না কিছু নূতনত্ব এতে সন্নিবেশিত হচ্ছেই। কাজেই কালকের দেখা ছবি আজকে আমাদের চোখে পুরোনো ঠেকছে স্বাভাবিক ভাবেই।

পুজোর সময় আসছে

শুধু হিন্দী বলে নয়, বাংলা ছবিতেও এমন বিচিত্র বিষয়বস্তু বিরল,...মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'লয়লী আশমানের আয়না' উপন্যাসের চিত্ররূপ,...যে সমাজ ও সম্প্রদায়ের কথা আমরা ভুলে গেলেও ইতিহাস যাদের ভোলেনি.....

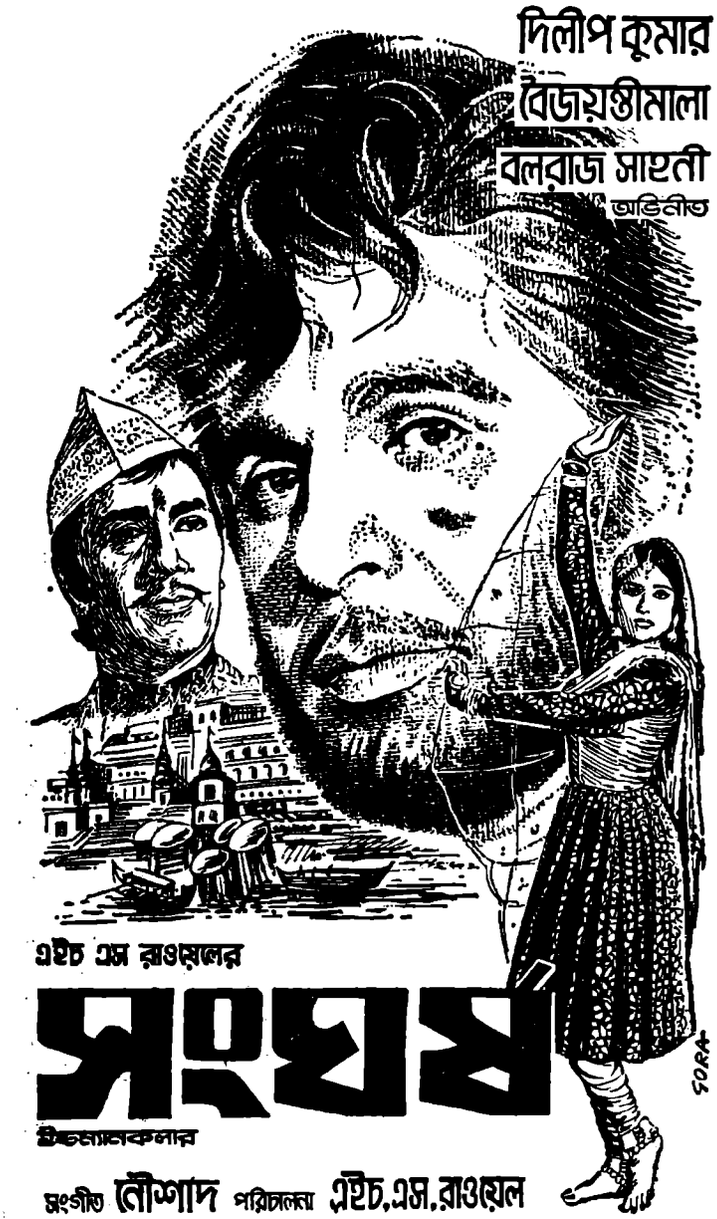

এইচ এস রাওয়েলের

সংঘর্ষ

টেক্‌নিকলার

সংগীত নৌশাদ পরিচালনা এইচ.এস.রাওয়েল

অমরজ্যোতি বাণিজ্য প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

থিয়েটার সম্পর্কে

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক মৌলিক বাংলা নাটক অন্বেষণের জন্যে বেশ একটা তাড়াহুড়া পড়ে গেছে চারিদিকে। আসলে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। বাংলাদেশে প্রতি মাসে ডজনখানেক আধুনিক মৌলিক বাংলা নাটক লেখা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যবসাদার মঞ্চেও তথাকথিত আধুনিক মৌলিক বাংলা নাটক অভিনীত হচ্ছে।

সাধারণ বিচারটা এই ধরনের : লেখক জীবিত সুতরাং লেখা আধুনিক। ব্যাপারটার সঙ্গে এই মুহূর্তে কোন বিদেশী নাটকের মিলের কথা আনা যাচ্ছে না। অতএব লেখা মৌলিক এবং যেহেতু বাংলা ভাষায় লেখা অতএব বাংলা নাটক।

'আধুনিক' কথাটা সাময়িকতার অর্থে ধরা আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাই যে নাটকের ঘটনা আজ, কাল কি গত পরশুর, কি ছ-মাস, কি এক বছর আগের তাকে আমরা সাধারণত বলি 'আধুনিক'।

সমসাময়িকতার বিচারে তাহলে 'আধুনিক' কথাটার মানে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নরকম দাঁড়ায়।

সে-সব জটিলতা বাদ দিয়েও একথা মানতে হবে যে, ঘটনা আধুনিক হওয়াই নাটক আধুনিক হওয়ার লক্ষণ নয়। আসলে নাটকের মননটা আধুনিক কিনা। দু-মাস আগের একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা লেখা হয়েছে এমন নাটকের মননে যদি এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে :

'গণতন্ত্র ফণতন্ত্র সব বাজে। আসলে সামরিক একনায়কতন্ত্রই হলো এদেশের মুক্তির পথ।'

তবে সে নাটক কখনোই আধুনিক নাটক নয়। অথচ যদি মহাভারতের কোন ঘটনা নিয়ে নাটক লেখা হয় এবং তাতে আধুনিক মননের বার্তা পাওয়া যায় তবে সে নাটক নিঃসন্দেহে 'আধুনিক'।

আর যে-সব নাটকের সঙ্গে কোন স্বদেশী বা বিদেশী ছাপানো নাটকের মিল নেই কিংবা মিল এত কম যে চট করে ধরা যায় না, তাকে বলা হয়ে থাকে 'মৌলিক' নাটক।

'মৌলিক' কথাটার ভিত্তি কি? বাংলা নাটকে 'মৌলিক' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে বাংলামঞ্চে মেটমুট বাদ দিয়েছে। তারপর এখন 'মৌলিক' 'মৌলিক' শুনতে শুনতে সন্দেহ হয় 'মৌলিক' কথাটায় মৌলিকত্ব বোঝায় তো? কেননা সত্যটা এই যে, অধিকাংশ বাংলা নাটকের ঘটনা, চরিত্র, সিচুয়েশন এবং প্রয়োজনায় সেট লাইট কম্পোজিসন হয় পুরোটাই, নয় অংশত বিদেশ থেকে নেওয়া। কোন কোন নাটকে ভাব এমন কি সংলাপ পর্যন্ত।

লিখিত সমালোচনায় আমরা সংস্কৃত নাটকের ধ্রুপদীগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আমাদের মঞ্চে ক-টি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয় এখন হচ্ছে কিংবা আগে হয়েছে? ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য সমালোচনায় আমরা জেনে থাকি যে, রবীন্দ্রনাটক পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে অনন্যসাধারণ ব্যাপার। তত্ত্বগতভাবে সমর্থন করাতে কি মঞ্চের লাভ হয়েছে? থিয়েটার উন্নত হয়েছে? বাংলামঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের কদর কিরকম? অতীতে ও বর্তমানে?

তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত যে বিদেশী নাটক থেকে আমাদের শেখবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু যে-ই সম্প্রতি বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর অভিনয়ের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছে, অমনি আধুনিক মৌলিক বাংলা-নাটকের জন্যে তত্ত্বগত হাহাকার শুরু হয়ে গেল।

আসলে, জন্ম থেকে অধিকাংশ সময়েই বাংলা স্টেজ বাংলা নাট্যসাহিত্য থেকে তার পরিপূর্ণ দান গ্রহণ করতে পারে নি।

অন্যদিকে, জনগণ নিরক্ষর সুতরাং জটিল বুদ্ধিজীবী সাহিত্যকর্ম শিল্প-মাধ্যমে উপস্থিত করলে কোনদিনই তাঁরা তা গ্রহণ করতে পারবেন না, এই অন্ধবোধ থেকে এই শহুরে উন্নাসিকতা থেকে বাংলা থিয়েটারকে সচেতনভাবে মুক্ত করার চেষ্টা প্রায় হয়নি বললেই চলে। এবং এই

.....মুক্তি আসন্ন!

আর·ডি·বনশল নিবেদিত
সুধীর মুখার্জী প্রযোজিত ও পরিচালিত
রবীন চট্টোপাধ্যায় সুর-সংযোজিত

দীপ্তি রায়·রীণা ঘোষ·ছায়াদেবী·কমল মিত্র·অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মৃণাল মুখোপাধ্যায়·শৈলেন মুখোপাধ্যায়·তরুণ কুমার অভিনীত

বিশ্ব পরিবেশনা : আর, ডি, বি এণ্ড কোং

আনন্দময়ীর আগমনে আমাদের 'একমাত্র' পৃষ্ঠপোষক

সুখে সম্পদে পরিপূর্ণ ওঁর জীবন। ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি হচ্ছে। আর যেমন ওঁর আয় বেড়েছে, টাকা-পয়সাও বেশ নিরাপদেই আছে। ওঁর দামী গয়না আর দলিলপত্রও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। হ্যাঁ, এসব কাজ আমরাই ওঁর হয়ে করছি—ঠিক যেন উনিই আমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। কাজেই উনি নিশ্চিন্ত। নির্ভাবনায় পুজোর আনন্দ উপভোগ করছেন। আমরা ওঁকে জানাই শুভেচ্ছা। তেমনি আমাদের লক্ষ লক্ষ 'একমাত্র' পৃষ্ঠপোষক —সকলকে।

হীরক জয়ন্তী ১৯০৮—১৯৬৮

চিরস্মরণে সেবায়

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিমিটেড

(স্থাপিত: ১৯০৮ সাল) রেজিষ্টার্ড অফিস: বাওয়ী, বরোদা

ব্যাঙ্কে ৩ বিভাগে ৩০০ এর বেশী শাখা আছে।

বাস ক্রমাগত গড়ে তোলা হয়েছে যে, াহিত্যে সমালোচনায় যা গ্রহণীয় মঞ্চে তা য়। কারণ, জনমন প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত রার দায়িত্ব তাহলে কার? কোন থিয়েটারের? কেন পৌনে দুশো বছরেও জনমন স্তুত হলো না?

যতদিন পর্যন্ত না ইতিহাসের কাছে াংলামঞ্চের এই ঋণ শোধ হচ্ছে, ততদিন ত্যিকারের আধুনিক মৌলিক বাংলা াটকের জন্যে হাহাকার করে কোন ফল বে না।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, শিল্পগত মস্যা হিসেবে কেন সত্যিকারের আধুনিকতা বাংলামঞ্চে প্রতিফলিত হতে পারছে , তার কারণ আধুনিক কনটেন্ট যে াট্যকারদের জানা নেই। কিন্তু একথা ঠিক নয়। হাটেবাজারে গঞ্জে চলতে রতে ট্রামে-বাসে শহরে গ্রামে প্রতিনিয়ত াধকরা আধুনিক জীবনের মুখোমুখি চ্ছেন। কিন্তু সেই পুরোনো কথা, ফর্ম। ভাবে বলতে হবে? ফর্ম সম্পর্কে াংলামঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য বহুদিন ধরেই সচেতন। অধিকাংশই ওয়েল-মেড্ প্লের র্ম কিংবা বিদেশে চর্চিত বছর পঞ্চাশেক গের নতুনতত্ত্বের গোঁজামিলন। আমরা াই জানি, ফর্মের সঙ্গে কনটেন্টের পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মত। আধুনিক কনন্টকে প্রচলিত ফর্মে ফেললে তা কখনোই ার্থই শুভমিলন হতে পারে না। ফলে মন সব নাটকের সৃষ্টি হতে বাধ্য যা ছুতেই আধুনিক জীবনকে প্রতিফলিত রতে পারবে না। এবং নাটককে নিতান্তই াসসর্বস্ব মনে হবে। তাই আজ অব্যবয়িক দলগুলি যখন সংস্কৃত নাটক, ক-নাটক, রবীন্দ্র-নাটক, প্রাচীন বাংলা ক এবং বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও ান্তর নিয়ে এদেশে বহুকাল থেকে ত চেনা সব ফর্ম তছনছ করে চলেছেন ন তাঁরা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের প্রগতিলতার পক্ষেই কাজ করছেন। এইসব চ্ছিন্ন ও একক কাজগুলিই সত্যিকারের ধুনিক মৌলিক বাংলা নাটকের ভিত্তি ম তৈরীর ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট মকা গ্রহণ করেছে।

এমনি গুরুত্বপূর্ণ কারণেই সবিশেষ বে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপা- বহুল প্রয়োজনার বাস্তব-মূল্য ছে।

বাংলা থিয়েটার বিদেশ থেকে নেওয়া লা নাটকও তাই। কালে কালে এর ন একটা নিজস্ব রূপ দাঁড়িয়েছে যে ক বাধ্য হয়েই বাংলা থিয়েটার বলে ন নিতে হয়। কিন্তু এ থিয়েটারের ালীয়ানা ও ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে জই সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। কিন্তু হ প্রকাশেই দায়িত্ব শেষ হয় না। া থিয়েটারকে তার ভারতীয়ত্ব ও ালীয়ানার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা র্কে আমাদের সচেতন হতেই হয়। এর উৎসের দিকে ফিরতেই হয়। অন্তত সংস্কৃত নাটক ও ভারতনাট্যশাস্ত্র বাংলাযাত্রার দিকে। সেদিকে সোজাএগোলে কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার উপযোগিতাকে যাচাই করে নেবে আমরা? মাঝখানে প্রায় পৌনে দুশো বছর পার হয়ে গেছে। ফলে, যত কম সময়ের মধ্যে আমরা দেশজ উৎসের দিকে এগোতে যাবো, সেই সময়ের মধ্যেই আমাদের অত্যন্ত সচেতনভাবে বিদেশী নাটকের চর্চাকে তার উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের হাতে যে অল্প সময় আছে, তারই মধ্যে নানাদেশের, নানাফর্মের নানাবস্তুর, নানানধরনের বিদেশী নাটকের চর্চার দায় অতীতের মত কেবল পুঁথিগত জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে চলবে না (কারণ পুঁথিগত বিদ্যার লাভ, কতকগুলি পুঁথিগত তত্ত্ব,) সেগুলোকে থিয়েটারের কাজে প্রয়োগ করতে হবে এবং আগামী দিনের সত্যিকারের ভারতীয় ও বাংলানাটকের জন্যে, নাটকের আধুনিকতা ও মৌলিকতাকে থিয়েটারের লোকেরা নিজেরা চেনবার জন্যে ও দর্শকদের চেনাবার জন্য বেশ সচেতনভাবেই বিশ্বখ্যাত বিদেশী নাটকগুলির অনুবাদ ও রূপান্তর প্রযোজনা করতে হবে। এরপর যখন সত্যিকারের আধুনিক মৌলিক দেশজ নাটক হবে, তখন তা নিজেদের চিনতেও কোন অসুবিধে হবে না দর্শকদেরও না। মূল লক্ষ্য বিদেশী নাটক করা নয়। আধুনিক, মৌলিক নাটকের অনুসন্ধানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী পথ। আন-

ইনটেলেকচুয়াল আবেগসর্বস্ব থিয়েটারের আকুলতা অন্য কিভাবে কম সময়ে পূর্ণ করতে পারি আমরা? দর্শকতৈরীর কাজও এতে সবচেয়ে কমসময়ে সবচেয়ে বেশী করে করা যাবে। বাংলা নাটকের উৎসের দিকে ফিরতে হলে এ পথই সবচেয়ে প্রশস্ত।

এদেশের অধিকাংশ সমালোচকই এ সত্যকে ধরতে পারছেন না। একই সঙ্গে তাঁরা ব্যবসায়িক মঞ্চের আবেগসর্বস্ব, বুদ্ধিহীন নাটকগুলিকে সহানুভূতিসূচক আলোচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, অন্যদিকে অব্যবসায়িক প্রগতিশীল নাট্যকর্মগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারছেন না। আধুনিক থিয়েটারের নিজস্ব সমালোচকের সংখ্যা এখনো নিতান্ত অল্প। সেই সব সমালোচকদের দরকার, যাঁরা তাঁদের পত্রিকায় শিল্পকর্ম-বহির্ভূত অন্যান্য চিন্তায় আবদ্ধ নন। এই সমালোচকদের নিজেদের দায়হীন বিচারক ভেবে কৃপ্ত হলেই চলবে না। নতুন থিয়েটারের সঙ্গে নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে এবং গঠনমূলক সহযোগী হিসেবেই অংশগ্রহণ করতে হবে। নইলে, শিল্পগতভাবে তাঁদেরও লাভ নেই থিয়েটারেরও লাভ নেই।

রুশ নাট্যকার আন্তন চেখভ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'দ্য সী গাল'-এর নায়ককে দিয়ে এক জায়গায় বলিয়েছেন,—

'ও থিয়েটার ভালোবাসে, ওর ধারণা ও মনুষ্যত্বের সেবা করছে। আর, আমার মতে আজকের থিয়েটার একটা বাজে ব্যাপার। একটা প্রথাসর্বস্ব জড়পদার্থ মাত্র। পর্দা উঠতে যখন দেখি স্টেজের কৃত্রিম আলোয়, তিনদিক ঘেরা দেওয়ালের মাঝখানে, মহৎ গুণী শিল্পীরা খাচ্ছেন, প্রেম করছেন, হাঁটছেন, পোষাক বদলাচ্ছেন, যখন দেখি, অতি তুচ্ছ সব কথাগুলো চেঁচিয়ে বলার পর তার ভেতর থেকে একটা হিতোপদেশ বের করে আনা হলো, অতি সহজবোধ্য, গৃহপ্রাঙ্গনযোগ্য হিতোপদেশ, যখন লক্ষ, হাজাররকম কায়দাকানুন করে সেই এক পুরোনো বক্তব্য একশোবার করে বলা হচ্ছে তখন, সত্যি কথা বলতে কি, রোগাশী আইফেল টাওয়ারের গ্রাম্যতায় বেদনা বোধ করে যেমন করে পালিয়েছিলেন, তেমনি করে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।'

এই সংলাপ লেখা হয়েছে ১৮৯৬ সালে। আমাদের কাছে এ কথাগুলি কিন্তু এখনও প্রাসঙ্গিক।

থিয়েটার সবচেয়ে বড় সামাজিক শিল্প। কিন্তু থিয়েটার এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও প্রমোদোপকরণ হয়েই আছে। থিয়েটার নিয়ে যা কিছু শিল্পকর্ম, এক্সপেরিমেন্ট, যা কিছু সাহিত্যচর্চা, ও অভিনবত্ব, যা কিছু গৌরবের সম্মানীয় ও জীবিত কাজকর্ম চলেছে তা প্রায় সবসময় ঘটেছে ব্যবসায়িক ও নিয়মিত থিয়েটারের বাইরে অব্যবসায়িক ও অনিয়মিত বা অপেশাদারী নাট্যদলগুলির বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাতেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাই। সেখানে থিয়েটারের স্বাস্থ্যের

অগ্নিযুগের কাহিনী/সীমন্তিনী রায়

লক্ষণ টের পাওয়া যায় এদের নিয়মিত অব্যাহত অগ্রগতিতে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে একটিও নিয়মিত আর্ট থিয়েটার কোনদিনই ছিল না, আজ নেই। বাংলাদেশে এবং কোলকাতা শহরেও নয়। এখানে যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে তা হয় ব্যবসায়িক থিয়েটার নয় সৌখীন থিয়েটার। সৌখীন থিয়েটারগুলি সম্পর্কে এই আইডিয়া গড়ে উঠেছে যে এঁরা পাড়ার ক্লাব, অফিস ক্লাব অথবা গ্রুপ থিয়েটার এই তিনভাবে কাজ করে থাকেন। অফিস ক্লাবের থিয়েটারের সোজা কথা হলো সখ, তারা সৌখীন। কখনও একাধিকবার অভিনয়ও করেন, সেটা নেশা। পাড়ার ক্লাবগুলিও তা-ই। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে যে অনেকে সোজাসুজি সৌখীন থিয়েটার বলে থাকেন এই সংজ্ঞাটা একেবারেই গোলমেলে। সখের জন্যে কেউ মাসে পাঁচ দশ দিন মাঠেঘাটে ঘুরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বিনাপয়সায় থিয়েটার করে বেড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এটা তো তাঁদের পেশা নয়। তাহলে কি নেশা? আমরা জানি, তা নয়। কারণ ক্রমাগত নেশায় দশ-বিশ বছর ধরে এতগুলো লোক জীবনপাত করতে পারে না। এর কারণ, ব্যবসায়িক মঞ্চের কাছে থিয়েটার পেশা এবং অফিস ক্লাবের কাছে সখ হলেও গ্রুপ থিয়েটারের কাছে থিয়েটার রীতিমত একটি আদর্শ। গ্রুপ থিয়েটারগুলি নিয়মিত থিয়েটার করে তার কর্মীদের নিম্নতম মাইনে দিতে পারেন, এমন দৃষ্টান্ত পেলে আমরা তাকে পেশাদারী থিয়েটার বলতে পারতুম। আমাদের দেশের সবগুলির মধ্যে একটিও এরকম পেশাদারী থিয়েটার নেই। অথচ এঁদের ওপরেই দেশে-বিদেশে এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের আর্ট থিয়েটারের ভবিষ্যৎ এবং থিয়েটারের শৈল্পিক অগ্রগতি নির্ভর করে। কেবলমাত্র এঁরাই থিয়েটারের জন্য সবচেয়ে সামাজিক জটিল শিল্পকর্মের জন্যে জনমন তৈরী করতে পারেন। বিদগ্ধমণ্ডলীতে তত্ত্বগতভাবে আলোচনায় স্বীকৃত নাট্যকর্মকে মঞ্চে স্থাপিত করে জনগণের কাছে দুঃসাহস রাখেন এঁরাই। এঁরাই ত কর্মে মেলাতে পারেন। পৌনে দুশো বাংলা থিয়েটার যে জনমন প্রস্তুত ক পারেনি, তার প্রস্তুতির দায়িত্ব নিতে প এঁরাই। ইতিহাসের কাছে বাংলা মঞ্চের শোধ করবার দায় এঁদেরই।

ব্যবসায়িক থিয়েটারের নয়। ব্যবস থিয়েটার তার নিজস্ব ব্যবসায়িক ঐ এক ধরনের প্রমোদোপকরণ নি থিয়েটারকে ব্যবহার করে চলেছে। সপ্তাহে তিনদিন নিজস্ব নাটক হয় অন্যান্য দিন অফিস ক্লাব এবং অ এক-আধটি সৌখীন দলের অভিনয় বছরের প্রায় রোজই এই সব মঞ্চ অ উঁচু হারে মঞ্চভাড়া পেয়ে থাকেন। এঁদের নিজস্ব উদ্যোগে সত্যিকারের এক্সপেরিমেন্ট, কোন জটিল সাহি প্রযোজনা হয় না, হয়তো হওয়া সম্ভব কেননা, এক্সপেরিমেন্ট করার ঝুঁকি অনিশ্চয়তার ঝুঁকি। ব্যবসায়িক কখনোই, স্বল্পদিনের জন্যেও গ্রহণ পারেন না। ফলে নিজস্ব যুক্তি তাঁদের বলতে হয় জনমনের অপ্রস্তুতি নিয়মিত থিয়েটারের আর্থিক দায়িত্বের এবং এক ধরনের ঐতিহ্যের ক একান্তই অনড়, অচল, স্থাবর। থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলে কার্যকরী যুক্তিই নয়। বাংলা থিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে ব্যব থিয়েটারের বাইরে একাধিক পেশাদারী দল ও আর্ট থিয়েটা তুলতে হবে এবং এতেই থিয়েটারের

এই কাজ সারা ভারতবর্ষে বে হোক, অন্তত বাংলাদেশে, কো এতদিন শুরু হয়ে যেতে পা ব্যাপারে কোলকাতা কর্পোরেশনে উদ্যোগ নেই। সোসাইটি অ্যাক্টে র দলগুলির ট্যাক্স মকুব করা ছাড়া সরকারেরও নেই। তবু শুরু হতে জাতীয় নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে।

দুর্ভাগ্য আমাদের, এ শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিরাট প্রেক্ষাগৃহ অধিকাংশ দিনই জনহীন অন্ধকারে থাকে। রবীন্দ্রসদন একটি ভাড়াটে মাত্র। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী চন্দ্র এবং আচার্য শিশিরকুমার স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। দুবার সরকার বদল হলো। কেউ করেন নি। কারোরই কোন মাথাব্যথা

তাহলে? বহুদিনের চেষ্টায় ব্যর্থতা পার হয়ে রবীন্দ্রসদন হয়েছে। এখন শ্রদ্ধেয়দের স্বপ্ন দায় অর্থাৎ রবীন্দ্রসদনকে জাত শালায় প্রতিষ্ঠিত করবার কার্যভ অনেক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে লোকদেরই নিতে হবে। থিয়েটা ব্যাপারে আমাদের সবার সামনে এই এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অভিনয় বিভ্রাট

কমল চৌধুরী

অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র পি-ডব্লু-ডি'র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মঞ্চে যন্ত্রকৌশলের প্রয়োগ করে অভিনব সৃষ্টি করতে তার জুড়ি ছিল না। মাথাও ছিল তেমনি। সব ব্যাপারেই নতুন কিছু করা চাই। নতুন কিছু না হলে দর্শক নেবেই বা কেন!

যোগেন্দ্রনাথের জীবনে একবার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। 'নবীনতপস্বিনী' অভিনয় হবে চোরবাগানের গোপাললাল মিত্রের বাড়ীতে। এই নাটকে একজন বাহকের ভূমিকায় ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। সাজপোশাক করবার পর আসল লোকটিকে কিন্তু চেনবার উপায় থাকত না।

অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। একটু পরেই যোগেন্দ্রনাথকে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে।

হঠাৎ তার তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল। পাশেই বাড়ীর চাকর বসে তামাক দিচ্ছে অভিনেতাদের। তাকে বললেন—ওরে দেতো এক ছিলিম আমায়।

চাকরের মেজাজ বিগড়ে গেল। থিয়েটারের চাকরের মেজাজ দেখ না! বেটা বড় বাবু হয়েছে! খেঁকিয়ে উঠে বলল সে—তামুক খাবি তো, নিজে সেজে খা না!

মাথায় রক্ত উঠে গেল যোগেন্দ্রনাথের। পাল্লায় চড় কষিয়ে দিলেন চাকরকে। সেও ছাড়বার না। দুজনে চড়চাপাটি চলছে। হঠাৎ চাকরটি যোগেন্দ্রনাথের চুল ধরে দিল এক টান।

একি! থিয়েটারের বাবু 'চাকর' সেজেছে!

●

যোগেন্দ্রনাথ 'বৃত্রসংহার' নাটকে কলের সাহায্যে একটি মারাত্মক অভিনয় ঘটনাকে জীবন্ত করে রেখে গেছেন।

বৃত্রসংহার নাটকে আছে নিকবন্ধ। নামে এক দৈত্য চরিত্র। দৈত্য শচীদেবীর চুল ধরে শূন্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আঘাতিক দৃশ্য।

যোগেন্দ্রনাথ মঞ্চে হুবহু এই দৃশ্য সৃষ্টি করতে চাইলেন। তিনি নিকবন্ধ। শচীদেবী কাদম্বিনী।

ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়েছিল। শেষ দৃশ্য কিন্তু বড় বেদনাদায়ক।

ওপর থেকে নেমে আসবে নিকবন্ধ। দুই পায়ে ও কোমরে হুক লাগান। নীচে শচীদেবীর ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বাঁধা। তাতে সেই বেল্টে লাগান আছে কড়া। নেপথ্য থেকেই ঠিক আছে সব। নিকবন্ধ নেমে এলে শচীদেব কড়া লাগিয়ে দেবে হুকে।

শূন্য থেকে দৈত্য নেমে এল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ। দৈত্য নামছে শূন্য থেকে। হাত-পা-চুল ছড়াছড়ি। শচীদেবীর চুল ধরে শূন্যে নিয়ে যাচ্ছে নিকবন্ধবেশী যোগেন্দ্রনাথ। কিন্তু একি! আসল ব্যাপারেই ভুল! কাদম্বিনী কড়া লাগাতে ভুলে গেছেন। যোগেন্দ্রনাথ ব্যাপার বুঝতে পারলেন। কিন্তু উপায় নেই। ছেড়ে দিলেই ছিটকে পড়বে শচীদেবীবেশী অভিনেত্রী। ভয়াবহ ব্যাপার। যন্ত্রণায় পরিত্রাহী চিৎকার করছেন কাদম্বিনী। দর্শকরা এমন জীবন্ত অভিনয় দেখেন কখনো। কি অভিনয়!

তারা কিন্তু পেছনের ভুল একেবারেই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কাদম্বিনীর তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ড্রপ সিন পড়ে গেল। থিয়েটারের লোক এসে নামাল কাদম্বিনীকে।

●

অমৃতলাল বসুর 'হীরক চূর্ণ' নাটকের অভিনয় হচ্ছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। এই নাটকে মঞ্চে রেলগাড়ী দেখাবার দৃশ্য আছে। যোগেন্দ্রনাথ ভাবলেন মঞ্চে রেলগাড়ী রাখতে হবে। একটা বৈপ্লবিক কিছু করা চাই।

সে তো ১৮৭৫ খৃঃ এর ব্যাপার। যোগেন্দ্রনাথ অসাধ্য সাধন করলেন। ২৫ ডিসেম্বর বিস্মিত দর্শকরা দেখল মঞ্চের ওপর দিয়ে রেলগাড়ী চলে গেল। চারদিকে তুমুল উত্তেজনা এবং প্রবল উৎসাহ। ড্রাইভারের চরিত্রে ছিলেন স্বয়ং যোগেন্দ্রনাথ। অন্য কাউকে এ-জায়গায় বসান যায় না। শেষে হয়ত চলতে চলতে ট্রেনই বন্ধ হয়ে যাবে।

একদিন কিন্তু হোলও তাই। ড্রাইভার যোগেন্দ্রনাথ। গাইকোয়াড় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। গার্ড হচ্ছেন অমৃতলাল বসু।

এরা তিনজনই ছিলেন সে-কালের মঞ্চ অভিনেতা। একসঙ্গে এদের মঞ্চে দেখতে পাওয়াটা ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ধীরে ধীরে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ আসছে। বাঁশি বাজছে। স্টেজে ঢুকল ট্রেণ। প্রচণ্ড হাততালি চারদিকে।

হঠাৎ একি। ট্রেণ যে দাঁড়িয়ে গেল। নড়ছে না। ড্রাইভার যোগেন্দ্রনাথ বিব্রত। চেষ্টা করছেন, কিন্তু ট্রেনও পণ করেছে আজ আর চলবে না।

বুদ্ধিমান বলে অভিনেতা অমৃতলাল। তিনিই তো গার্ড। লাল নিশান উড়াতে লাগলেন। বিপদের সঙ্কেত। ট্রেণ চলবে না।

ভিন্নস্বাদের ছবি

নির্মল ধর

আজকে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে যে বিরাট সোরগোল চলছে (ব্যাপারটা অবশ্য বিশেষভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।) তার মধ্যে সিনেমাকে অবশ্য এখনও টানা হয়নি। তবে এমন দিন আগে ছিল না। এ নিয়ে কম তর্কাতর্কি হয়নি খোদ আমেরিকায়। ১৯৫০-এর আগে অশ্লীল বোনছা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে হলিউড। আর

চিত্রাভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও রোনটী পাহাড় বিজয়িনী স্বপ্না মিত্রকে এম, আর, পি, রেডিও বাজিয়ে শোনাচ্ছেন—মণি রেডিও প্রোডাক্টস্-এর কর্ণধার শ্রীবিভূতিভূষণ সাহু।

(বিজ্ঞাপন)

এখন তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে আছে সেন্সর বোর্ড। তবে সেখানেও অমৃ-সিনিটির সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। আগে যেখানে 'বিশেষ' কোন ভঙ্গিমার দৃশ্য বা খোলা উরুদেশ সেন্সর বোর্ডের রক্ত-চোখের কারণ হত, আজ সেখানে নির্বিবাদে শুধু উরুদেশ কেন, দেহের প্রায় সব গোপন অন্ধকার কোণগুলোয় হাজার ওয়াটের আলো ফেলে পর্দায় দেখান হচ্ছে। সেন্সর বোর্ড এখন মেনে নিচ্ছে তাই। করার কিছু নেই, পরিচালক-প্রযোজকরা ওসব দৃশ্যের অঙ্গে ওকালতি করে যেসব কথা বলছেন, তাতো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এছাড়া অন্য একটা কারণও ছিল। টি-ভি-র ব্যাপক আক্রমণে সিনেমা যখন কোণ-ঠাসা হবার উপক্রম, দর্শকরা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে নারাজ, তখন দর্শকদের নতুন কিছুর আকর্ষণে বাইরে আনার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা চালালেন প্রযোজক-পরিচালক। আর তাছাড়া আটলান্টিকের ওপারে তখন চিত্র-আন্দোলন ইত্যাদির ঝড় বইছে। হলিউডের লোকেরাও পিছিয়ে থাকবার লোক নয়। এগিয়ে এল তারাও। নগ্নকামিতা, যৌনাবৃত্তি, বিকৃতযৌনাবেগ সবকিছুই জায়গা পেল চিত্রনাট্যে। অবশ্য এসবই যে দেহসর্বস্ব ছবি হল তা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের, পারি-পার্শ্বিক বিশ্লেষণ শুরু হল ছবির মধ্য দিয়ে। চিত্রকলার মত অ্যাবস্ট্রাকটনেস্ এল ছবিতে কারও কারও।

পরিচালক জোশেফ ম্যানকুইংজ্-এর 'অল্ অ্যাবাউট ইভ' তার প্রথম উদাহরণ। বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব ছিল, আর তাছাড়া পাশ-করা যৌনতা তো ছিলই। এ নিয়ে সেন্সর বোর্ড-এর সঙ্গে জোশেফ-এর কম কথা কাটাকাটি হয়নি। এক সুন্দরী অভি-নেত্রী (অ্যানি ব্যাক্সটার) চিত্রজগতের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে ওঠবার জন্য সব কিছু করতে রাজী ছিল—এমন কি যথেচ্ছ স্বৈরাচার পর্যন্ত। তার এই উন্নতির প্রধান বাধা ছিল আরেকজন প্রৌঢ়া অভিনেত্রী (বেটি ডেভিস)। এদের দুজনের মধ্যে অনিবার্যভাবে আরও একটি চরিত্র এসেছিল—এক দুঃসাহসী কামুক নাট্য সমালোচকের স্ত্রীর (মেরিলিন মনরো) একটা দৃশ্যে আছে—মেরিলিন বেশ টাইট পোষাকে ঢুকছে এক পার্টিতে—সামনেই বাঙ্কা লাগল স্বামী জর্জ স্যান্ডার্স-এর সঙ্গে। যত দৃষ্টিকটু, স্যান্ডার্স পরে সে কথা চিন্তা করছে অন্যভাবে। বিষয়বস্তু অভিনবত্ব ও তার সঙ্গে অ্যানি ব্যাক্সটার, বেটি ডেভিসের জামা খোলা অনেক দৃশ্যই সেন্সরের চোখে কুটকুটুনি ধরালেও ছবিটা বেরিয়ে এসেছে খুব সহজেই।

জগৎ বদলাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পাল্টাচ্ছে। কালের বিচারে অবশ্য জেনটা টিঁকবে বা কোন্‌টা টিঁকবে না তা পরের কথা, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজন। তা না হলে আজ ছবিতে যেখানে স্ত্রী-পুরুষকে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখান হচ্ছে, বারো বছর আগে তো তা দৃষ্টিকটু

চৌরঙ্গী/অঞ্জনা ভৌমিক

ছিল। হওয়ার্ড হুগসের 'দি ফ্রেঞ্চ লাইন' ছবিতে একটা নাচের দৃশ্যে ক্যামেরা নায়িকা জেন রাসেলের দুই উরু আর মাঝখানে ধরা ছিল বলে কয়েকটা হলই সে ছবি দেখাতে চায় নি। শেষে হুগস নিজে যেই সব আপত্তিকর জায়গাগুলোর কিছু অংশ বাদ দিলেন, তবে তাঁর (ছবিরও) মুক্তি।

কাহিনী আর ট্রিটমেন্টের ব্যাপার নিয়ে এমন চুলোচুলির অনেক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে পঞ্চাশ দশকের হলিউডে। তখন অতিরিক্ত মদ্যপান ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যাজনিত সমস্যা ছিল সামাজিক অপরাধ। অটো প্রেমিঙ্গারের 'দি ম্যান উইথ দি গোল্ডেন আর্ম'-এর কাহিনী ছিল এ-দুটো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবির নায়ক ফ্র্যাঙ্কির শেষ পরিণতি ঐ বদ-অভ্যাসের দরুণ অমন দুঃখজনক হয়ে দাঁড়াল। কাহিনী ছাড়াও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার ছোট হোটেল ঘরে কিম্ নোভাকের ব্ল্যাসি-য়ারহীন হাতে বোনা জালের পোশাকে ঢাকা অমন সুললিত দেহ কম দৃষ্টিকটু নয়। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের সঙ্গে নায়িকার পোশাকের ঐ উত্তেজক দৃশ্য কম ভোগায়নি পরিচালককে।

আমেরিকায় আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য-ণীয়। ও-দেশে রাজ্যে রাজ্যে সেন্সর বোর্ড ভিন্ন ভিন্ন। তাদের নিয়ম-কানুনও ভিন্ন। যে ছবি ওহিওতে মুক্তি পেল না, ক্যানসাসে হয়ত সে ছবিই জলচল। ১৯৫৫ খৃঃ সুপ্রিম কোর্টের এক রুলিং-এর পর ওহিওর সেন্সর কর্তৃপক্ষের অনেক নিয়ম-নীতি বদলাতে হল। এ রুলিং-এর বিরোধিতা করে সেন্সরশিপ প্রথা তুলে দেবার জন্য আবেদন জানাল ম্যাসাচুসেটস, ফ্লোরিডা আর পেন্সিলভেনিয়া। অপরদিকে ক্যান-সাস, ভার্জিনিয়া, ম্যারী ল্যান্ড, নিউইয়র্ক কিছু বিশেষ বাধা-নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সরশিপ চালু করার পক্ষপাতী রইল। কিন্তু এই বিশেষ বাধা-নিষেধগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলল না, তা কিনা নিউইয়র্ক চিরদিনই কিছু মাত্রা বেশী প্রগ্রেসিভ। হাতে হাতে প্রমাণ দেখা গেল তার। ১৯৫৭য় 'দি গার্ডেন অফ ইডেন' নামে একটা ন্যুডিস্ট ফিল্ম দেখাবার অনুমতি দিল। কিছুদিন আগেই এ ছবিকে 'কদর্য' বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নি। শেষ পর্যন্ত কোর্ট থেকে রায় বেরোল 'নগ্নতা এ ছবিতে অসুন্দর বা অশ্লীল নয়।' আবার এই ছবিই দু-বছর বাদে ম্যাসাচুসেটস সুপ্রিম কোর্ট 'অশ্লীল কদর্য' বলে মামলা রুজু করেছে। ছবিতে একজন বয়স্ক লোক, একজন যুবতী ও একটি শিশুর ন্যুডিস্ট কলোনীতে থাকার অভি-জ্ঞতার কথাই বলা হয়েছে। আবার বিরোধী পক্ষ থেকে এক প্রস্থ মামলা ঝোলানো হল ছবি রিলিজের ব্যাপারে। বিচারক মিঃ হুইটমোর জুরীদের সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিলেন : "কলোনীর সব সদস্যদের নগ্ন দেখানো হয়েছে, খেলাধুলো, স্নানকর সমুদ্রের ধারে শুয়ে থাকা সব সময়ই তা উলঙ্গ। মাত্র গুটিকয়েক দৃশ্যে কোমর পর্যন্ত আবরণহীন দেখানো ছাড়া অবশিষ্ট ছবিতেই বেশ দূর থেকে চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে নিরাবরণ দেহ খুব একটা চোখে পড়ে নি। জামাকাপড়ে ঢাকা তিনটে চরিত্রের পাশে আর সব নগ্ন দেহ-গুলো দৃষ্টিকটু—এই অজুহাতে ছবিটাকে নিশ্চয়ই অশ্লীল বলা যায় না।" বিচারক আরও বলেন, 'হয়ত ছবির উপস্থাপনা কারো কাছে আপত্তিজনক হতে পারে কিন্তু আপত্তি থাকার দরুণ সেটা অশ্লীল হবে—এটা তো সত্য নয়। এ ছবিতে তো কোথাও যৌনতা বা যৌন উত্তেজকমূলক কিছু নেই।'

ব্যাস। 'দি গার্ডেন অফ ইডেন' বেরিয়ে গেল। প্রোডিউসাররা অমনি নায়িকাদের যতখানি সম্ভব নিরাবরণ করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন, তার জন্য ছবির কাহিনী জঙ্গল থেকে শুরু আকাশ পর্যন্ত উড়ল। মেয়েদের বুক আর নিতম্ব কাপড়ে ঢাকা থাকতে চাইল না। টেনেসি উইলিয়ামসের অনেক কাহিনীই আর পুঁথিবন্দী না থেকে সেলুলয়েডে বন্দী হল।

সেন্সরশিপের এ ধরনের দুমুখী আচ-রণ হলিউডের ছবির প্রযোজক আর বিদেশী ছবির পরিবেশকদের মধ্যে একটানা চলতে থাকার ফলে সেন্সরশিপ সম্পর্কে অনেকের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। শিকাগোয় পাঁচজন পুলিশ অফিসারের বিধবা স্ত্রী আর একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গড়া সেন্সর বোর্ড একটা ফরাসী ছবিকে (সম্ভবত 'গেম অফ লভ') দেখাবার অনুমতি দিতে নারাজ হওয়ায় পরিবেশক মামলা দায়ের করলেন কোর্টে। কাহিনীটা ছিল প্রায় বছর পঁয়ত্রিশের এক-জন স্ত্রীলোক ষোল বছরের এক কিশোরকে তার সঙ্গে অবৈধ কাজে লিপ্ত করার ঘটনা নিয়ে। মামলার শুনানীতে বলা হল—ঐ পুলিশ ক্যাপ্টেন বুঝি হাইস্কুল পর্যন্ত পড়েন নি। এবং জ্ঞানগম্যি কিছুই নেই সিনেমা থিয়েটার সম্পর্কে—উনি আবার ছবির বুঝবেন কি?

অলিম্পিক গেমস

ক্ষেত্রনাথ রায়

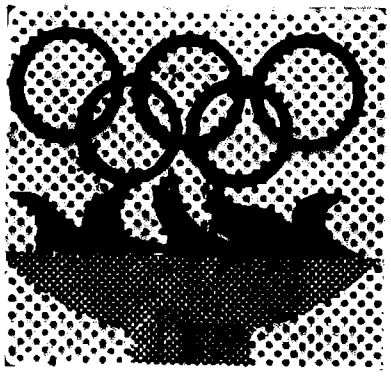

মেক্সিকো সিটিতে আগামী ১২ই অক্টোবর আধুনিককালের ১৯তম অলিম্পিক গেমসের আসর বসছে। জাতীয় সাধীনতা, বিশ্বশান্তি এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে এই অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য এবং শিক্ষিত পরিবারে অলিম্পিক গেমস একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। আজও যদি কোন শিক্ষিত নাগরিক অলিম্পিক গেমসের কথা না জেনে থাকেন তাহলে তাঁর এই অজ্ঞতার কারণে সমগ্র মানবজাতি লজ্জিত! এই অলিম্পিক গেমসের আসর বসে একটি দেশের জাতীয় শক্তি, সংহতি সৃষ্টি জগৎ-সভায় উপস্থাপিত করার এক মঞ্চ। আবার এই অলিম্পিক গেমসের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মহামিলন ক্ষেত্র। অলিম্পিক গেমসের আসরে ধর্ম এবং বর্ণ বৈষম্যের কোন স্থান নেই। অলিম্পিক গেমসের মুখ্য উদ্দেশ্য খেলা এবং শিল্পকলার মাধ্যমে দৈহিক মানসিক শ্রীবৃদ্ধি এবং পৃথিবীর সমাজে স্থায়ী শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর মানবজাতির কল্যাণের জন্যে অলিম্পিক গেমসের পক্ষ থেকে বিশ্বের যুব-সমাজের প্রতি সে কি উদাত্ত আহ্বান—ত্বরীয়ান, তুঙ্গীয়ান এবং তেজীয়ান—অর্থাৎ আরো অগ্রসর হও, আরো সোপান অতিক্রম কর এবং আরও বলিষ্ঠ হও। এই সূত্রে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, দুর্নীতি এবং জাতি-বিদ্বেষের যে কোন সম্ভাবনা আছে তার জন্য অলিম্পিক গেমসের আদর্শ এবং অনুশাসন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবল প্রতিযোগিতার সূত্রেও খেলাধূলার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব যাতে অটুট থাকে তার জন্য জাতির কাছে অলিম্পিক গেমসের তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—জীবনে মানুষের জীবনে সব থেকে বড় কথা হল—জয়লাভ নয়, তেমনি অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণই বড় কথা — জয়লাভ নয়।

অলিম্পিক গেমসের ইতিহাস দুটি যুগে বিভক্ত—প্রাচীন এবং আধুনিক। শুধু গ্রীসের অলিম্পিক গেমস নিয়ে (৭৭৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৯৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন যুগের অধ্যায়। অলিম্পিক গেমসের আধুনিক যুগের সূচনা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। সে জাতি প্রাচীনকালের কথা। গ্রীসের দেবতা জিউসের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি সাময়িকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং কলহ ত্যাগ করে পবিত্র অলিম্পিয়ায় আয়োজিত অলিম্পিক গেমসের সমবেত হতেন। প্রতি চতুর্থ বছর জুলাই মাসে এই অলিম্পিক গেমসের আসর বসতো। গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমস ছিল মূলতঃ গ্রীকজাতির একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। খেলাধূলা ছিল জাতির ধ্যান-ধারণা। খেলাধূলার মাধ্যমে একটি জাতি কি পরিমাণ দৈহিক এবং মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন, বৈদেশিক কুশাসন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে (ভূমিকম্প এবং প্লাবন) প্রাচীন গ্রীসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। ভূগর্ভ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ এবং পৌরাণিক কাহিনী থেকে বলা যায়, যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৩৭০ বছর আগেও গ্রীস দেশে অলিম্পিক গেমসের অস্তিত্ব ছিল। তবে এ সম্পর্কে কোন ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। আধুনিককালের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাসরচয়িতাদের মতে গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের সূচনা ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এবং অবসান ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে। গ্রীসের এই সুদীর্ঘ ১১৭০ বছরের ইতিহাসে ২৯২টি অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করেছি, কোন রাজত্ব চিরস্থায়ী নয় এবং কোন জাতি তার শৌর্য-বীর্য এবং ঐশ্বর্যকে চিরস্থায়ী করতে পারে না। ইতিহাসে মানবজাতির মহান কীর্তিই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। মানবসভ্যতার গর্ব—সুমহান ঐতিহ্যশালী প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় জীবনেও একদিন মহাপ্রলয় নেমে আসে। ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়েও যে গ্রীকজাতি ইউরোপ মহাদেশে এক উন্নত মানবসভ্যতার পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁরাই একদিন আদর্শচ্যুত হলেন। আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের গরিমা এবং পররাজ্য-লুণ্ঠিত ধনরত্ন সমগ্র গ্রীকজাতির চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। লুণ্ঠিত ধনরত্নের দৌলতে গ্রীকজাতি অল্পসময়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে। যাদের জীবনের আদর্শ ছিল মহৎ চিন্তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা একদিন তাদের জীবনেই কিনা মাত্রাধিক্য রণলিপ্সা, বিলাসিতা এবং আলস্য দেখা দিল। অফুরন্ত ভোগ-বিলাসই তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার দেশের লোকের কাছে দেবতার সমান সম্মান লাভ করলেন। তিনিই তখন জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শবান পুরুষ। পররাজ্যলুণ্ঠনকারী সেনানায়ক এবং সৈনিকেরা বীরত্ব এবং স্বৈভাবে অলিম্পিক বিজয়ী এ্যাথলীটদের তুলনায় সমাজে বেশী মর্যাদা পেতে লাগলেন। জনসাধারণ দেখলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অলিম্পিক গেমস বিজয়ী এ্যাথলীটদের তুলনায় দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক এবং সৈনিকদের অবদান অনেক বেশী। যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাসরা দেশের লোকের শ্রমভার কত লাঘব করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য গ্রীকজাতিকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। বিলাসিতা, আলস্য, দুর্নীতি এবং গৃহযুদ্ধে জর্জরিত গ্রীস একদিন রোমকদের পদতলে তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। রোমান রাজত্বকালে পরাধীন গ্রীস তার ঐতিহ্যমণ্ডিত অলিম্পিক গেমসের সংবিধান এবং পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে পারে নি। গ্রীসের অলিম্পিক গেমসে একমাত্র অপেশাদার গ্রীক এ্যাথলীটদেরই যোগদানের অধিকার ছিল। অলিম্পিক গেমসে গ্রীকজাতির অখণ্ড প্রাধান্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে রোমান সরকার পেশাদার রোমান এ্যাথলীটদের আমদানী করলেন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিদেশী সরকারের হস্তক্ষেপে গ্রীস খুবই ক্ষুব্ধ হল। ফলে অলিম্পিক গেমসের আসরে অতীতের শান্ত-সৌম্য পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হল না। ৩৯৪ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে গ্রীক এ্যাথলীটদের সঙ্গে রোমান রাজকর্মচারীদের যে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে রোমসম্রাট প্রথম থিয়োডোসাস চিরতরে অলিম্পিক গেমস বন্ধ রাখার আদেশ দেন। পরবর্তীকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণে অলিম্পিয়ার জিউস দেবমন্দিরের বহু মূল্যবান ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয় এবং শত্রুর আক্রমণে মন্দিরগুলিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এরপর গ্রীস দেশের মাথায় ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসে। দুটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় — ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সর্বগ্রাসী ভূমিকম্প এবং আলফিউস নদীর প্রলয়ঙ্করী বন্যা অলিম্পিয়া উপত্যকার দেবমন্দিরগুলির সমস্ত গর্ব এবং পবিত্রতা চূর্ণ করে দেয়। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি হাজার বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। প্রকৃতি তাঁর অদৃশ্য হস্তে বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের উপর পলিমাটির ঘন স্তর এবং নিবিড় জঙ্গল রচনা করেছিলেন। কিংবদন্তীর সূত্রে এই অভিশপ্ত অঞ্চলটি জনসাধারণের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় বারশত বছর গ্রীসের

স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে
আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হোক

পোস্ট অফিসে পাঁচ বছরের
স্থায়ী আমানত (ফিক্‌স্‌ড ডিপোজিট) পরিকল্পে
অর্থ লগ্নী করুন

- প্রতি ১০০ টাকা পাঁচ বছর পরে বেড়ে হবে ১২৫ টাকা
- আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদ
- অন্তত পঞ্চাশ টাকা হলেই পাসবই খোলা যায়

একই পাস বইতে যতবার খুশি ৫০ টাকা করে জমা করা যেতে পারে

স্টেট ব্যাংক অব্‌ ইণ্ডিয়াতেও এই পরিকল্পে আমানত গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য

আজই যে-কোনো পোস্ট অফিসে খোঁজ করুন

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ)/স স ১৬৬১৩/৬৮

প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষগুলি এইভাবে সমাধিস্থ থাকার পর জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং কঠোর শ্রমে উদ্ধার লাভ করেছে।

জার্মান ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানতঃ তাঁদের আনুকূল্যে এবং সক্রিয় চেষ্টায় অলিম্পিক উপত্যকার সমাধিস্থ ভাস্কর্যশিল্প উদ্ধার লাভ করেছে এবং তাঁরাই অলিম্পিক গেমসের পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব প্রথম করেন। ১৮৫২ সালের ১০ই জানুয়ারী বার্লিনের পণ্ডিত সভায় গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমস সম্পর্কে খ্যাতনামা জার্মান ঐতিহাসিক আর্নস্ট কার্টিয়াসের বক্তৃতা সমগ্র গ্রীক-জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাতীয় অলিম্পিক গেমস পুনঃপ্রবর্তনে গ্রীস তখন বিশেষ উদ্যোগী হয়। গ্রীসের মাটিতে ১৮৫৭, ১৮৭০, ১৮৭৫, ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যে 'প্যান হেল্লেনিক' গেমসের আসর বসে তা প্রাচীন অলিম্পিক গেমসেরই আধুনিক সংস্করণ। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিতে গ্রীস ছাড়া অন্য কোন দেশ অংশ গ্রহণ করে নি।

গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ আধুনিকালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, গ্রীসের এথেন্স শহরে। এই সূত্রে মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের যোজনা হয়েছে। সুদীর্ঘ ১৫০৩ বছর পর গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব হয় বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্‌ এবং দার্শনিক ব্যারণ দা কুবার্তাঁর গবেষণা, অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত শ্রমে। এই মহৎ কাজেই তাঁর কর্মজীবন উৎসর্গীত হয়েছিল। ব্যারণ দা কুবার্তা (মৃত্যু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে) যথার্থই আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের জনক। বিভিন্ন সভ্যদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, কৃষ্টি-সভ্যতা গবেষণা করে তিনি এই পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন দেশের জাতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শৌর্য-বীর্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন খেলাধুলোর অপরিসীম প্রভাব আছে তেমনি বিশ্বে শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় খেলাধুলো এক সার্থক ভূমিকা নিতে পারে। তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের মহান ঐতিহ্য।

গ্রীসের অলিম্পিক গেমসের নিয়মে প্রতি চতুর্থ বৎসরে আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসেরও আসর বসছে। তবে প্রভেদ এই যে, কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নয় এবং একটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের থেকে আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের জনপ্রিয়তা এবং আবেদন অনেক বেশী—সারা পৃথিবী জুড়ে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের দরুন তিনবার অলিম্পিক গেমসের আসর বসেনি — ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে। আসন্ন ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিক গেমসটি ক্রমিক হিসাবে যদিও ১৯তম অনুষ্ঠান, প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের ১৫টি আসর বসেছে। অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী দেশ এবং খেলোয়াড় সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম অলিম্পিক গেমসে যেখানে ১৩টি দেশের ২৮৫জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন সেখানে ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসে ৯৪টি দেশের মোট ৫৫৫৮জন (পুরুষ ৪৮২৬ এবং মহিলা ৭৩২জন) যোগদান করেন। খেলাধুলোর তালিকায় অনেক রদবদলও হয়েছে। বর্তমানে খেলাধুলো ২০ সংখ্যার মধ্যে রাখা হয়েছে। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ছিল ২০ রকমের খেলা, আর ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিকে আছে ১৯টি।

অলিম্পিক গেমসের নিজস্ব পতাকা আছে। পীত, নীল, কৃষ্ণ, হরিৎ এবং লোহিত বর্ণের পাঁচটি বলয় এক বিশেষ আঙ্গিক সৌষ্ঠবে শ্বেত পতাকার বুকে রঞ্জিত। পরস্পর সংযুক্ত এই পাঁচটি বলয় পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান প্রতীক। এই অলিম্পিক পতাকা, অলিম্পিক গেমসের আদর্শ (citius altius, fortius), অলিম্পিক গেমসের তাৎপর্য এবং পূতাগ্নি অলিম্পিক স্টেডিয়ামে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিশেষ আধারে পূতাগ্নি অনির্বাণ রাখার প্রথা ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক গেমস থেকে শুরু হয়েছে। এই পূতাগ্নিরও যথেষ্ট কৌলীন্য আছে। গ্রীসের অলিম্পিয়া উপত্যকায় জিউস দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে ভেস্টা দেবীর সেবাদাসীরা এক ভাবগম্ভীর ধর্মানুষ্ঠানে সমবেত হন। তাঁদের প্রধানা পূজারিণী আতশী কাচে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে যে অগ্নি উৎপাদন করেন বিশেষ মশালে সেই অগ্নি অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বহন করে অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হয়।

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় ঐতিহ্য এবং আকর্ষণের দিক থেকে এ্যাথলেটিক্‌স বিভাগের স্থান শীর্ষদেশে। অলিম্পিক গেমসের তালিকা থেকে এ্যাথলেটিক্‌স বিভাগটি কখনও বাদ পড়তে পারে না। বর্তমানে এ্যাথলেটিক্‌স বিভাগে আছে ৩৬টি অনুষ্ঠান—পুরুষ বিভাগে ২৪ এবং মহিলা বিভাগে ১২। বিগত ১৫টি অলিম্পিক গেমসে বর্তমানের ৩৬টি এ্যাথলেটিক্‌স অনুষ্ঠানে যেসব দেশ স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে তাদের নামের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে আমেরিকা। আমেরিকা মোট ১৮৪টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে—পুরুষ বিভাগে ১৬৮ এবং মহিলা বিভাগে ১৬। পুরুষ বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ের তালিকায় ১ম আমেরিকা (১৬৮টি), ২য় ফিনল্যাণ্ড (২৮টি), ৩য় গ্রেট বৃটেন (২৩টি), ৪র্থ সুইডেন, এবং রাশিয়া (প্রত্যেকে ১০টি)। তালিকায় আরও ২০টি দেশের নাম আছে এবং তাদের স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা দশকের নীচে। মহিলা বিভাগের স্বর্ণপদক জয়ের তালিকা এই রকম : ১ম আমেরিকা (১৬টি), ২য় রাশিয়া (১৩টি) এবং ৩য় অস্ট্রেলিয়া (৮টি)। তালিকায় আরও ১৩টি দেশ আছে, কিন্তু তাদের স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা ৮ সংখ্যার নীচে। প্রথম এগারটি অলিম্পিক গেমসের আসরে (১৮৯৬-১৯৪৮) আমেরিকার প্রাধান্যে বাধা দেওয়ার মত শক্তি কোন দেশের ছিল না। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে রাশিয়ার যোগদানের ফলে আমেরিকা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে। তবুও দীর্ঘ সময়ে অর্জিত তাদের স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা অতিক্রম করা রাশিয়ার পক্ষেও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। আমেরিকা বিগত ১৫টি অলিম্পিক গেমসে বর্তমানের ৩৬টি এ্যাথলেটিক্‌স অনুষ্ঠানে মোট ১৮৪টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। অপর দিকে ৪টি অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা ২৩টি। উভয় দেশের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান। পুরুষ বিভাগের ২৪টি অনুষ্ঠানের মধ্যে আমেরিকা দূরপাল্লার দৌড় এবং ভ্রমণ অনুষ্ঠানে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ২০,০০০ মিটার এবং ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণে আমেরিকা কোন পদকই জয়ী হয়নি। আমেরিকা ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে অপ্রত্যাশিতভাবে দূরপাল্লার দৌড়ে (৫,০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার) প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। মহিলাদের ১২টি অনুষ্ঠানের মধ্যে আমেরিকা স্বর্ণপদক জয়ী হতে পারে নি—৪০০ মিটার দৌড়, ৮০০ মিটার দৌড়, লংজাম্প এবং সটপুটে অনুষ্ঠানে।

অলিম্পিক হিরো

অলিম্পিক গেমসের একটি বছরের আসরে কোন ব্যক্তি অসামান্য ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিলে, তাঁকে 'অলিম্পিক হিরো' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার রীতি আছে এবং সেই সঙ্গে তাঁর নামেই সেই বছরের অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয়। তবে এসবই বেসরকারী অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় না। এখানে উল্লেখ্য, এ্যাথলেটিক্‌স ছাড়া অন্য কোন খেলাধুলোয় এই বেসরকারী উপাধি দেওয়া হয় না। এ পর্যন্ত এ্যাথলেটিক্‌স বিভাগ

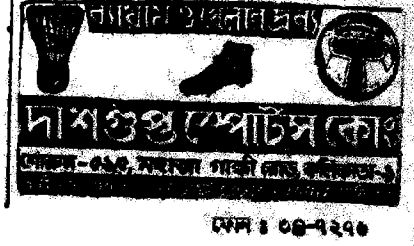

থেকে এই দুর্লভ 'অলিম্পিক হিরো' সম্মান নীচের চারজন এ্যাথলীট পেয়েছেন :

(১) প্যাভো নুরমী (ফিনল্যাণ্ড)—১৯২৪ সালের প্যারী অলিম্পিকে ৫টি স্বর্ণপদক বিজয়ী।

(২) জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা)—১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে ৪টি স্বর্ণপদক বিজয়ী।

(৩) শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস) — ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিকে ৪টি স্বর্ণপদক বিজয়িনী।

(৪) এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) —১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৩টি স্বর্ণপদক বিজয়ী।

সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়

প্যাভো নুরমি (ফিনল্যাণ্ড) : ৯টি

১,৫০০ মিটার দৌড় : ১৯২৪
৫,০০০ মিটার দৌড় : ১৯২৪
১০,০০০ মিটার দৌড় : ১৯২০ ও ১৯২৮
৩,০০০ মিটার টীম দৌড় : ১৯২৪
ক্রস কান্ট্রি (ব্যক্তিগত) দৌড় : ১৯২০ ও ১৯২৪
ক্রস কান্ট্রি (টীম) দৌড় : ১৯২০ ও ১৯২৪
রে ইউরি (আমেরিকা) : ৮টি
স্ট্যাণ্ডিং হাইজাম্প : ১৯ — ১৯০৪ ও ১৯০৮
স্ট্যাণ্ডিং লং জাম্প : ১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮
স্ট্যাণ্ডিং ট্রিপল জাম্প : ১৯০০ ও ১৯০৪

একটি অলিম্পিকে ৫টি স্বর্ণপদক

প্যাভো নুরমি (ফিনল্যাণ্ড) : ১৯২৪ সালের প্যারি অলিম্পিকে ১,৫০০ মিটার ও ৫,০০০ মিটার দৌড়, ক্রস কান্ট্রি ব্যক্তিগত, ক্রস কান্ট্রি দলগত এবং ৩,০০০ মিটার টীম দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়লাভের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে (এ্যাথলেটিক্স বিভাগে) সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

একটি অলিম্পিকে ৪টি স্বর্ণপদক

অলিম্পিকের একই বছরের এ্যাথলেটি অনুষ্ঠানে এই তিনজন এ্যাথলীট ৪টি ক স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন।

অলভিন ক্রায়েনলিন (আমেরিকা) ১৯০০ সালের প্যারী অলিম্পিকে ১ মিটার হার্ডলস, ২০০ মিটার হার্ডল ৬০ মিটার দৌড় এবং লংজাম্পে স্বর্ণপদ জয়।

জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা) : ১৯৩ সালের বার্লিন অলিম্পিকে ১০০ ও ২ মিটার দৌড়, লং জাম্প এবং ৪×১০০ মিট রীলে অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়।

শ্রীমতী ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন (নেদারল্যাণ্ড : ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিকে ১০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডল এবং ৪×১০০ মিটার রীলে অনুষ্ঠা স্বর্ণপদক জয়।

উপর্যুপরি তিনটি স্বর্ণপদক জয়

হাতুড়ি নিক্ষেপ : জন ফ্লানাগান (আমে রিকা)—১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮

ডিসকাস নিক্ষেপ আলফ্রেড অর্ট (আমেরিকা)—১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৮

একমাত্র নজির

একই বছরের অলিম্পিক গেমসে আসরে ৫০০০ মিটার, ১০০০০ মিট এবং ম্যারাথন—দূরপাল্লার এই তিন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের দুর্লভ সম্মান লা করেছেন একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়ার এমি জেটোপেক, ১৯৫২ সালে।

১৯৫২ সালের অলিম্পিক গেম চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপে তিনটি স্বর্ণপদক এবং তাঁর সহধর্মি শ্রীমতী ডানা জেটোপেকোভা জাভেলি স্বর্ণপদক জয় করেন। একই বছরে অলি ম্পিক গেমসের এ্যাথলেটিক্স বিভা স্বামী-স্ত্রীর স্বর্ণপদক জয়ের নজির তাঁ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অলিম্পিক গেমসের আসর

গেমস অনুষ্ঠিত : ১৮৯৬ (এথেন্স ১৯০০ (প্যারী), ১৯০৪ (সেন্ট লু আমেরিকা), ১৯০৮ (লণ্ডন), ১৯১২ (স্ট হলম, সুইডেন), ১৯২০ (এন্টোয়া বেলজিয়াম), ১৯২৪ (প্যারী), ১৯ (আমস্টার্ডাম, হল্যাণ্ড), ১৯৩২ (ল এঞ্জেলস, কালিফোর্ণিয়া), ১৯৩৬ (বার্লি ১৯৪৮ (লন্ডন), ১৯৫২ (হেলসিঙ্ক ফিনল্যাণ্ড), ১৯৫৬ (মেলবোর্ণ অস্ট্রেলিয় ১৯৬০ (রোম) এবং ১৯৬৪ (টোকিও)।

গেমস স্থগিত : ১৯১৬ (বার্লি ১৯৪০ (টোকিও এবং হেলসিঙ্কি) ১৯৬ (লণ্ডন)।

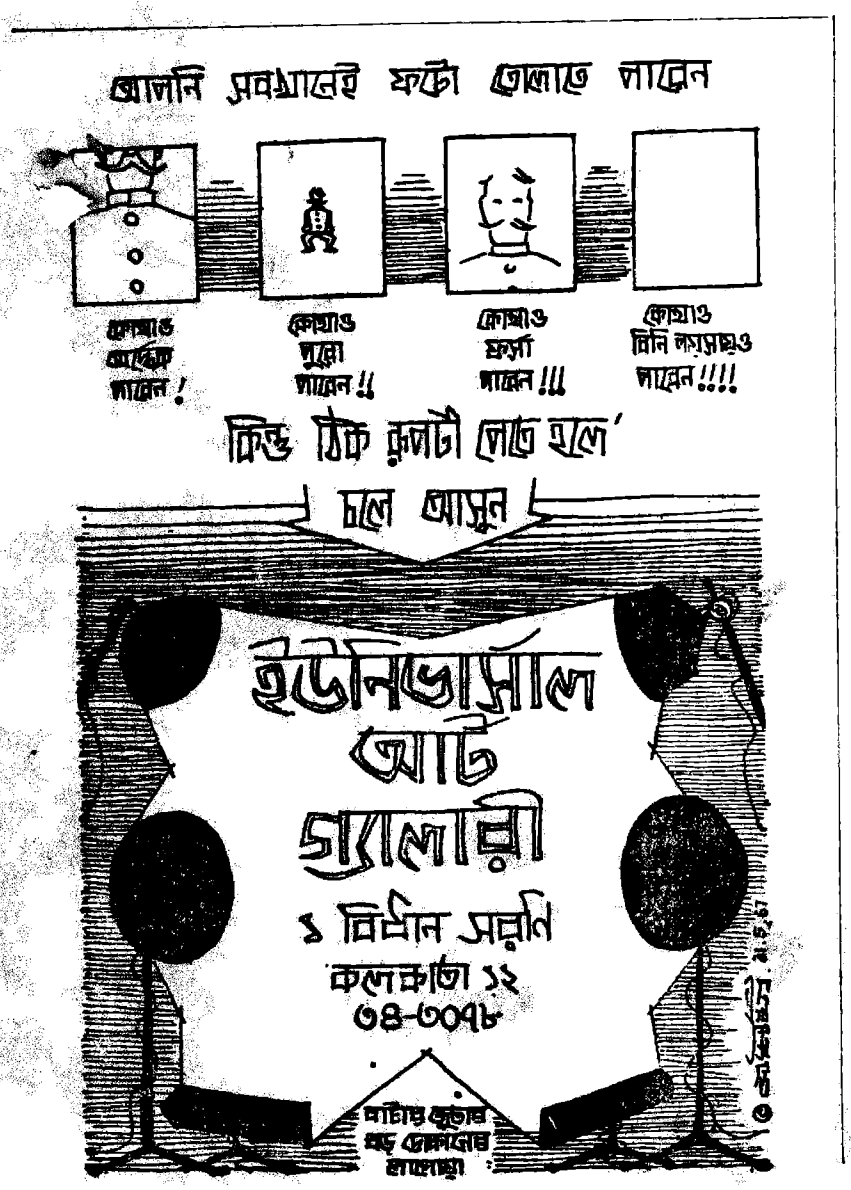

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।